শনিবারের চিঠি

ষান্মাসিক সূচী

কার্তিক ১৩৬৯—চৈত্র ১৩৬৯

সম্পাদক ঃ শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

শ নি বা রে র

চি ঠি

৩৫শ বর্ষ

১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬৯

সম্পাদক :

শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

প্রসঙ্গ কথা

লাল চীনের ভারত আক্রমণ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

মাত্র চার মাস আগে জাপান থেকে ফেরবার পথে হংকংয়ে নেমেছিলাম। হংকংয়ের পথেঘাটে চীনা উদ্বাস্তুদের স্রোত বইছে খবরটা আগেই জানা ছিল। খুব ইচ্ছে হল হংকংয়ে নেমে তাদের অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করি। অনুসন্ধান করি, এই ছিন্নমূল মানুষের দল কেন নিজের দেশ ছেড়ে, স্বজন-পরিজন ত্যাগ করে আজ হংকংয়ের মাটিতে এসে পা ফেলছে। তাদের কি জানা নেই, যে মাটি তারা পেছনে ফেলে এল, সে মাটিতে আর কোনদিনই তারা ফিরতে পারবে না? সেদিককার সকল দরজা তাদের কাছে চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে। তবুও কেন এমন ভাবে দেশ ছেড়ে আসা? কেন এই অনিশ্চিতের পথে ঝাঁপ দেওয়া?

হংকংয়ের উদ্বাস্তুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সে উত্তর আমি নিজেই পেয়েছিলাম। শুনেছিলাম এবং নিজেও বুঝেছিলাম, লাল চীন আজ অন্নহীন ক্ষুধার রাজ্য। জবরদস্তি করে সে ক্ষুধাকে চিরদিন চেপে রাখা যায় না। সে ক্ষুধার আগুন একদিন সারা দেশে হয় লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেয় কিংবা অন্য খাতে চলে, অন্য দেশে গিয়ে মানুষ সে আগুন নেভাবার চেষ্টা করে। হংকংয়ে এসে যে লক্ষ লক্ষ চীনা আজ উদ্বাস্তু হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই সেই ক্ষুধার্ত মানুষ, সম্বলহীন মানুষ। অবশ্য তার পরেও অনেক কথা আছে। সে সব পরে বলছি।

যাই হোক হংকংয়ে চীনাদের ক্ষুধার আগুনের স্বরূপ উপলব্ধি করলাম। এ কথাটা সেদিন বুঝতে আর অসুবিধে হল না যে কম্যুনিস্ট চীন বিরাট এক দুর্ভিক্ষের ভেতর দিয়ে চলেছে। হাতুড়ির জোরে ক্ষমতার দাপটে সেখানকার মানুষের মুখ বন্ধ করা হলেও মানুষের বুকের জ্বালা তাতে বন্ধ হয় না। প্রশ্ন হতে পারে, বিশাল ও প্রাকৃতিক সম্পদে শক্তিশালী চীনে এই দুর্দশা কেন দেখা দিল? এর উত্তর হল—জঙ্গীবাদ ও সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনে। ঠাণ্ডা মাথায় রীতিমত পরিকল্পনা করেই মাও-সে-তুং ও চৌ-এন-লাই উগ্র সাম্রাজ্যবাদী রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, আর এই যুদ্ধায়োজনে দেশের অধিকাংশ সম্পদকে ঠেলে দেওয়াতেই সাধারণ মানুষের জীবনে অনশন অর্ধাশন ও নিষ্পেষণের অভিশাপ অনিবার্যরূপেই নেমে এসেছে।

কিন্তু কেবল ক্ষুধার জ্বালাই হাজার হাজার চীনা নরনারীকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করছে না। কম্যুনিস্ট চীনে প্রবর্তিত 'গণ-কমিউন' ও স্বাধীনতাহীনতার এই

স্বাধীনচেতা চীনা নরনারীর কাছে যে এক আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বগৃহ ও স্ব-পরিবার-পরিজনের শান্ত স্বাধীন পরিবেশকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই কমিউন,—হাজার হাজার নরনারীকে এই খাঁচায় রেখে পোষ মানাবার চেষ্টা হচ্ছে, এক হাতে যুদ্ধের যন্ত্রের মত চালাই করে মাও ও চৌয়ের সাম্রাজ্যবাদী কামানের খোরাকরূপে তুলে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই নিষ্পেষণ ও চরম পরাধীনতার গ্লানি যারা সইতে পারে নি, অথচ দেশে থেকেই বর্তমান প্রভুত্ব-পরায়ণ চীনানেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ ফুটে বলবার বা কোন-প্রকারে প্রতিবাদ করবার সাহস পায় নি তারাও রয়েছে এই উদ্বাস্তুদের দলে। এরই সঙ্গে যুক্ত করে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা যায়—সেটি হল কমিউনের পথ ধরে ভারত তথা এশিয়া ভূখণ্ডে প্রভুত্ব করার যে উদগ্র কামনা মাও ও চৌকে পেয়ে বসেছে তার পরিণামে চীন-ভারত সংঘর্ষ আসন্ন বলে যে-সব চীনা নরনারী অনুমান করতে পেরেছে তারাও দেশ থেকে পালিয়েছে একটু শান্তি-স্বস্তির আশায়। দীর্ঘ ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর সশস্ত্র সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত জীবনের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা এদের রয়েছে তাতে নতুন করে কোন যুদ্ধবাদী পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করা এদের কাছে অসহনীয় বলে মনে হয়েছে, এবং তাকে এড়াবার জন্যে দেশত্যাগও তাদের কাছে শ্রেয় বোধ হয়েছে।

যাই হোক, সব কটি কারণ বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে হয়; সেটি হল এই, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে যে লাল চীনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেই চীনের বর্তমান নেতৃত্ব রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছে এবং এই লোলুপতার বিরুদ্ধে অন্তর্বিপ্লবের চাপা আগুনও ধূমায়িত হচ্ছে।

চীনের কম্যুনিস্ট সরকার মানুষের এই অসন্তোষকে যদি অন্য খাতে বইয়ে দিতে না পারেন তাহলে চীনে অন্তর্বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

ভাবনাটা মনে এলেও এত তাড়াতাড়ি যে তা সত্যে পরিণত হবে সেদিন কিন্তু তা বুঝতে পারি নি। আরও বুঝতে পারি নি যে চীনের কম্যুনিস্ট সরকার জন-বিক্ষোভকে বিপথগামী করার জন্যে ভারতকেই বেছে নেবেন। তাঁরা পুরোপুরি ভারত আক্রমণ করে বসবেন।

চীন কিন্তু অনেকদিন আগেই সে অঙ্ক কষে রেখেছিল। পঞ্চশীল নীতি ঘোষিত হবার তিন মাসের মধ্যেই সে লদাকে ঢুকেছিল। ধীরে ধীরে ভারতের বারো হাজার বর্গমাইল পরিমিত জমি জবরদখল করেছিল। শুধু তাই নয়, ভারতের সঙ্গে হামলা বাধাবার প্রস্তুতি হিসেবে সে ভারতের প্রতিবেশী নেপাল ও পাকিস্তানকে হাত করার চেষ্টায় ছিল। সে চেষ্টা যেদিন সফল হয়েছে বলে সে মনে করেছে, সেদিনই সে আর সাধারণ সীমান্ত সংঘর্ষে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে ব্যাপক ভাবেই ভারত আক্রমণ করে বসেছে।

কেন এই আক্রমণ?

চীনের কম্যুনিস্ট নেতারা নিশ্চয়ই জানতেন যে তার ভারত আক্রমণ সারা বিশ্বে বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। শুধু তাই নয়, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র কোনদিনই পররাজ্য গ্রাস করার জন্যে আক্রমণ পরিচালনা করে না বলে লোকের যে ধারণা আছে সে ধারণাও ধূলিসাৎ হবে। এবং চীনকে তারা নীতিভ্রষ্ট জঙ্গীবাদী দেশরূপে আখ্যায়িত করবে। মোট কথা ভারত আক্রমণ করলে চীন হবে বিশ্বজনমতের কাছে কাঠগড়ার আসামী। এ সব জানা থাকা সত্ত্বেও চীন কেন ভারত আক্রমণ করল সেই কারণগুলি অনুধাবন করা দরকার।

নিষ্পেষিত ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের বিক্ষোভকে অন্যপথে পরিচালনা করা যে চীনের ভারত আক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়। কারণ নিশ্চয়ই আরও আছে। তাহলে সেগুলি কি কি?

১। **এশিয়ার নেতৃত্বের লোভ?** চীন ভারতকেই এশিয়ায় তার নেতৃত্ব লাভের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। ভারতকে জব্দ করার জন্যে চক্রান্ত সে কম করে নি। তার সাম্প্রতিক নমুনা আমরা 'এশিয়ান গেমসে' লক্ষ্য করেছি। এই সব কাণ্ডকারখানার পেছনে একটি সুপরিকল্পিত মতলব রয়েছে। আর সে হল এশিয়ায় চীনের নেতৃত্ব লাভের আশা।

ভারত বিরাট দেশ, চীনও বিশাল। দুটি দেশ দুটি

ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজেদের দেশ গঠনের চেষ্টা করছে। ভারত যেখানে গণতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে, চীন সেখানে ধরেছে একনায়কতন্ত্র বা একদলীয়তন্ত্র কিংবা সর্বাত্মক কম্যুনিজমের পথ। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে ১৯৪৭ সনে ১৫ই আগস্ট, চীনে কম্যুনিস্টরাজ কায়েম হয়েছে ১৯৪৯ সনের সেপ্টেম্বরে। গণতন্ত্রের পথ ধরে ভারত গত কয়েক বছরে বৈষয়িক ক্ষেত্রে অনেকখানি উন্নতি করেছে, সর্বাত্মক কম্যুনিজমের পথ ধরে চীন সে ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে নি। আর তা পারে নি বলেই কি চীন জনশক্তি ও অস্ত্রশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে এশিয়ার নেতৃত্ব হাত করতে চায়? এ জন্যেই কি তার ভারত আক্রমণ?

২। **রুশ-ভারত মৈত্রীতে ফাটল ধরানো?** চীন রুশ-ভারত মৈত্রীকে ভাল চোখে দেখে নি। সে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হিসেব কষে রেখেছে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কেন না পৃথিবীতে ধনতন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট সমাজব্যবস্থার সহাবস্থান অসম্ভব। পিকিংয়ের চোখে ভারত হল ধনতন্ত্রী দেশ। আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারত ধনতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেই ভিড়ে পড়বে। কারণ ভারতের নিরপেক্ষ নীতির উপর চীনের কম্যুনিস্ট সরকারের আস্থা নেই। কাজেই ভারতকে সাহায্য করা মানে হল শত্রুকেই সমর্থ করে তোলা। রাশিয়া যখন ভারতকে মিগ জেট সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে তাঁরা ভারতে মিগ বিমানের কারখানা তৈরি করে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন—সে সময় ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে চীন কি রুশ-ভারত মৈত্রীতে ফাটল ধরাতে চায়? পিকিং সরকার জানেন, রাশিয়া নিজের স্বার্থেই চীনকে চটিয়ে ভারতকে রণোপকরণ সরবরাহ করবে না। রাশিয়ার উপর চাপ দেবার জন্যেই কি চীনের এই ভারত আক্রমণ?

৩। **তেলের ক্ষুধা?** তেলের দিক দিয়ে চীন রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল। সে এই নির্ভরতা ঘোচাতে চায়। আর সে জানে, তেলের দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে না পারলে আজকের যুগে প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। ইন্দোনেশিয়া থেকে সে কিছুটা তেল সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছে। তার ধারণা, নেফা অঞ্চলেও প্রচুর তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেফা এবং সম্ভব হলে আসামের তৈল-এলাকা দখল করে এর তৈল-সম্পদকে যদি উদ্ধার করা যায় তাহলে চীনের তেলের জন্যে পরনির্ভরতা ঘুচবে। আকসাই চীনের সড়ক নির্মাণের জন্যেই যেমন মূলতঃ চীন লদাকে ভারতের জমি জবরদখল করেছে, তেমনই এই তেলের তৃষ্ণায় কি সে নেফা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলকে লক্ষ্য করে আক্রমণ পরিচালনা করছে? চীন মনে করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। চীনের এ চিন্তাই কি তার ভারত আক্রমণকে ত্বরান্বিত করেছে?

৪। **তিব্বতের অশান্তি?** চীন জানে বেয়নেটের জোরে তিব্বতকে ঠাণ্ডা করলেও আসলে তিব্বত এখনও ঠাণ্ডা হয় নি। মনের দিক দিয়ে তিব্বতীরা চীনের শাসনকে মেনে নেয় নি। আর তা নেয় নি বলেই তারা সুযোগ খুঁজছে। উপযুক্ত সময়ে তিব্বতে বিরাট গণঅভ্যুত্থান ঘটবে। সে অভ্যুত্থান ঘটবে তিব্বতে চীনা শাসনের বিরুদ্ধে। চীনের কম্যুনিস্ট সরকারের ধারণা, এই অভ্যুত্থানে ভারত তিব্বতীদের সাহায্য করবে। চীন কি তিব্বত থেকে আরও অনেকটা দূরে এগিয়ে এসে তিব্বতের নিরাপত্তা রক্ষা করতে চায়? সেজন্যেই কি তার ভারত আক্রমণ?

৫। **কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় রুশ নেতৃত্বকে বরবাদ?** সর্বশেষ, কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন কারণ হয়তো এই যে, স্ট্যালিনপন্থী বাস্তু কম্যুনিস্টনেতা মাও-সে-তুং সোভিয়েট রাশিয়ায় ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে স্ট্যালিনবাদের উচ্ছেদ ও কম্যুনিস্ট-জগতে রাশিয়ার অগ্রগামী নেতৃত্বে গাত্রদাহ বোধ করছেন। আজকের বিশ্ব-পরিস্থিতিতে এই কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্বেই আমরা বলেছি, স্ট্যালিনবাদী মাও-মার্কা নেতৃত্বাধীন চীন ভারতকে গ্রাস করে সারা এশিয়ায় তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তার করতে চায়। কিন্তু এ বিস্তার-বাসনা আসলে সর্বগ্রাসী; অর্থাৎ সারা কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় রাশিয়ার নেতৃত্বকে বরবাদ করে দিয়ে চীনা কম্যুনিজম কায়েম করাই মাও-সে-তুং ও চৌ-এন-লাইয়ের কাম্য। তার জন্যে আগে চাই এশিয়ায় অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব; এবং ভারতগ্রাসকে এই পথে অগ্রসর হওয়ার অপরিহার্য প্রথম পদক্ষেপ-

রূপে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, যেখানে ক্রুশ্চেভ কিউবা পরিস্থিতিতে এক আশ্চর্যরকম সংযমের পরিচয় দিয়ে বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধকে ঠেকিয়েছেন, সেখানে মাওয়ের নীতিই হল 'spread of communism through guns'—গোলাগুলীর পথে কম্যুনিজমের প্রসার করা। কিউবা থেকে সরে আসায় পিকিং ও তার চেলা আলবেনিয়ার কাছে প্রতিদিন সোভিয়েট রাশিয়াকে তীব্র তিরস্কার শুনতে হচ্ছে। সোভিয়েট ও আমেরিকা যুদ্ধবিধ্বস্ত বা যুদ্ধক্লান্ত হলে পিকিংয়ের প্রভুত্বের পথ পরিষ্কার হত, সে মতলব হাসিল না হওয়াতেই লাল চীনের এই বোখামি। এই জঙ্গীবাদও কম্যুনিস্ট চীনের ভারত আক্রমণের একটি বড় কারণ। অথচ কম্যুনিজমের অন্যতম উদ্গাতা ও ভাষ্যকার লেনিন স্বাধীন জাতির আত্মবিকাশকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন, জাতির সত্যকার স্বাধীনতাই তাকে যথার্থ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পথে স্বতঃই অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু তাহলে কি হবে, মাও ও চৌ মার্কা কম্যুনিজম বর্তমানে এক ভয়ানক গুণ্ডামার্কা বিভ্রান্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আক্রান্ত ভারত

চীনের ভারত আক্রমণের আরও বহু কারণ থাকতে পারে। সে সব কারণ যাই-ই হোক না কেন, চীন তার পশুশক্তির দাপটে ভারত আক্রমণ করে ইতোমধ্যেই তার বেশ কিছু অংশ গ্রাস করেছে—এটাই হল ঘটনা। অবশ্য যে-চীনকে ভারত বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘে যার সদস্যপদের জন্যে ভারত এখনো আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করে চলেছে, সেই চীন বন্ধুর পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করায় ভারত বিস্ময়বিমূঢ় না হয়ে পারে নি। এই বিমূঢ়তা বা বিহ্বলতা ছিল বলেই তাকে প্রথম দিকে খানিকটা পিছু হটতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে বলেছেন, 'যতই সময় নিক, মূল্য যতই দিতে হোক না কেন, ভারত তার পবিত্র ভূমি থেকে শত্রুকে হটিয়ে দেবেই।'—তাঁর সে কথা একটি ধ্রুব প্রতিজ্ঞা ছাড়া আর কিছু নয়।

এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত পৃথিবীর দুই শিবিরভুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং নিরপেক্ষ সমস্ত দেশের কাছ থেকে নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য চেয়েছে, এবং অন্ততঃ পঞ্চাশটি দেশের কাছ থেকে সমর্থন ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন প্রভৃতি কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ইতোমধ্যেই অস্ত্রাদি দিয়ে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এ নিশ্চয়ই খুব আনন্দের ও ভরসার কথা। তাহলেও সবচেয়ে বড় কথা নয়। এই বিপদের মুখে সবচেয়ে বড় কথা যেটি সেটি হল ভারতবাসীর লৌহদৃঢ় ঐক্য। এই আক্রমণের মুখে ভারতবাসীর মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ এসেছে, নেমেছে স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেমের প্লাবন।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষায়, দেশের মর্যাদা রক্ষায় আসমুদ্র হিমাচল আজ দুলে উঠেছে—'হটাবই, হটাবই, আমাদের মাতৃভূমি যারা গ্রাস করতে এসেছে সে শত্রুকে আমরা উৎখাত করবই।'

বিস্মিত হয়ে দেখেছি, দেখছি, স্বদেশের বিপদে গোটা জাতি আজ দল ও মতের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় সরকারের পেছনে দাঁড়িয়েছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তাদের মনে সর্বস্ব নিবেদনের সংকল্প।

এটাই জীবনের লক্ষণ। যে জাতির এ জীবনীশক্তি আছে সে জাতির মৃত্যু নেই। শত প্রতিকূলতা, শত বিপদের মধ্য দিয়েও তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। ভারতের সে জীবনীশক্তি আছে, এ বিপদের মধ্য দিয়েও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভারত বাঁচবেই, এবং সে তার পরিপূর্ণ মর্যাদা নিয়ে বাঁচবে। কোন দুশমনই চিরকালের জন্যে তার এক ইঞ্চি জমিকেও পায়ের তলায় রাখতে পারবে না।

সীমাংসা প্রস্তাব

ইতোমধ্যেই ভারত-চীন সীমানা মীমাংসার উদ্দেশ্যে চীনের কাছ থেকে দু বার দুটি প্রস্তাব এসেছে। প্রথম প্রস্তাবটিতে (২৪ অক্টোবর) লাল চীন সরকার বলতে চেয়েছেন যে ১৯৫৭ সনের ৭ই নভেম্বর তারিখে উভয় পক্ষের 'প্রকৃত কর্তৃত্বাধীন এলাকা' থেকে উভয়পক্ষকে আরও ২০ কিলোমিটার বা সাড়ে বারো মাইল পেছনে

হটে যেতে হবে। কিন্তু ভারত এ প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারতের পক্ষ থেকে চীনকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, চীন ১৯৬২ সনের ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ববর্তী লাইনে ফিরে গেলেই শুধু চীনের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করা সম্ভব।

চীন ভারতের এই সুস্পষ্ট ঘোষণার জবাব দিয়েছে শক্তির দম্ভ দেখিয়ে। অর্থাৎ এর পরই চীনের পক্ষ থেকে আর একটি প্রবল ধাক্কা এসেছে। চীন ভারতের আরও কিছু পরিমাণ জমি গ্রাস করেছে। তার পরেই আবার সে নতুন ফাঁকির ফাঁদ পেতেছে। ২১শে নভেম্বর চীনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে আবার একটি নতুন প্রস্তাব। প্রস্তাবটি প্রথমে সোজাসুজি ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয় নি। গভীর রাতে বিদেশী সাংবাদিকদের ডেকে প্রথমে তা সরবরাহ করা হয়েছে। এবং রেডিও থেকে তা প্রচারও করা হয়েছে। পরে সরকারী ভাবে সে প্রস্তাব এসেছে ভারত সরকারের কাছে। এ প্রস্তাবটিকে এক কথায় বোঝাতে গেলে বলতে হয়, এটি হল নতুন বোতলে ঢালা পুরনো মদ। অর্থাৎ একে যত বাড়িয়ে বাড়িয়ে, যত বিশেষণে বিভূষিত করেই প্রচার করা হোক না কেন, বাইরের ধূম্রজাল সরিয়ে ফেললে দেখা যাবে এটি নতুন কলেবরে সেই পুরাতন প্রস্তাব। অথচ এই প্রস্তাব নিয়েই লাল চীন সারা দুনিয়াকে, বিশেষ করে এশিয়া-আফ্রিকার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে বোঝাতে চাইছে যে, চীন সরকার হলেন নির্ভেজাল শান্তিবাদী! সে বারবার শান্তি প্রস্তাব পেশ করছে, আর ভারত বারবার তা প্রত্যাখ্যান করছে।

কিন্তু ধন্যবাদ আমাদের জাতীয় নেতৃত্বকে। কপট চীনের এ চাতুরী তাঁরা সহজেই ধরে ফেলেছেন। তাই দ্বিতীয় প্রস্তাবটিকে এখনও প্রত্যাখ্যান না করলেও, এ প্রস্তাবের উপর কোনরকম আস্থা স্থাপন করেন নি। তবুও এ প্রস্তাবের কয়েকটি শর্তের বিশ্লেষণ চেয়ে ভারত সরকার চীনের কাছে নোট পাঠিয়েছেন এবং তার উত্তরও পাওয়া গিয়েছে। সেই উত্তরের ভিত্তিতেই শেষ প্রস্তাবটির বিচার চলছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি কি? লাল চীন তার দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলেছে, ২১শে নভেম্বরের মধ্যরাত্রির পর থেকে (অর্থাৎ ইংরেজী মতে ২২শে নভেম্বর থেকে) তার সৈন্যবাহিনী 'এক তরফা' যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করবে এবং ১লা ডিসেম্বর তারা ১৯৫৯ সনের ৭ই নভেম্বর চীন ও ভারতের মধ্যে যে নিয়ন্ত্রণাধীন সীমারেখা ছিল তা থেকে ২০ কিলোমিটার অর্থাৎ সাড়ে বারো মাইল পেছনে সরে যাবে। ভারত এ প্রস্তাব গ্রহণ করুক বা না করুক চীনের সিদ্ধান্ত তাতে কোনরকমেই প্রভাবান্বিত হবে না। কিন্তু ওই সীমারেখায় ফিরে যাবার পর ভারত যদি ১৯৬২ সনের ৮ই সেপ্টেম্বরের সীমান্তকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে তবে চীন প্রত্যাঘাত করবে।

এখানে ভারতের উপর লাল চীনের পুনরাক্রমণের ইচ্ছা বা ইঙ্গিতটি এতই সুস্পষ্ট যে তা আর বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। হুমকি দেখিয়েই লাল চীনের কর্তারা আক্রান্ত ভারতকে তাঁদের তিন দফা লাল আপোস বটিকা সেবন করাতে চান। আর ভারত যদি ভড়কে গিয়ে তাঁদের সেই 'শান্তির হুমকি' একবার মেনে নেয় তা হলেই তো কেল্লা ফতে! তা হলে লাল চীনের গুণ্ডাশাহী বেশ কিছু সময় হাতে পেয়ে সুযোগ মত ভারত পুনরাক্রমণের ইচ্ছাটি পূরণ করতে পারবে। এই অসৎ মতলবটিকে ঢেকেঢুকে লাল চীন শান্তি প্রচারে নেমে পড়েছে এমন ভাবে যে তাকে এখন প্রতিদিন গোটা দুনিয়ার দোরে দোরে ধরনা দিয়ে বলতে শোনা যাচ্ছে, বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে সবাই মিলে যেন আন্তর্জাতিক দস্যুতার নায়ক মাও-চীনের তিন দফা আপোস প্রস্তাব ভারতকে মেনে নিতে বাধ্য করে। শয়তানীরও একটা সীমা থাকা উচিত। ওদের প্রস্তাব গ্রহণ করে বিশ হাজার বর্গ মাইল ভারত-ভূখণ্ড আপোসে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে পুনরাক্রমণের অপেক্ষায় থাকার ব্যবস্থাটি নিঃসন্দেহে অভিনব। কিন্তু চীনের চতুরতা বোঝবার মত সামান্য বুদ্ধিটুকুও আমরা চীনা-প্রেমে হারিয়ে ফেলেছি এমন মনে করাও মাও-সে-তুং এবং চৌ-এন-লাইয়ের ঠিক হয় নি।

মীমাংসার আলাপ-আলোচনা শুরু হবার আগে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে চীনা বাহিনী যেখানে ছিল সেখানে তাদের ফিরে যেতেই হবে, ভারত সরকারের সেই কথার কোনরকম নড়চড় হওয়া সম্ভব নয়।

ভারতের প্রস্তাবটি যে খুবই সঙ্গত তা বিশ্বের অধিকাংশ

দেশই স্বীকার করেছে। আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নাসের প্রায় একই ধরনের একটি প্রস্তাব ভারত ও চীনের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পিকিং সরকার সেটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ক্ষেত্রে পিকিং সরকারের যুক্তি রাষ্ট্রপতি নাসেরের গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চীনই যে ভারতের উপর আক্রমণ শুরু করেছে সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। চীন সরকার যদি ম্যাকমেহন লাইনকে চীন-ভারত সীমান্ত বলে স্বীকার নাও করেন, তবুও ১৯৫৯ সনে চৌ-এন-লাই চীনা বাহিনী ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম করবে না বলে শ্রীনেহরুকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। আর তা করতে গেলেই চীনা বাহিনীকে ম্যাকমেহন লাইনের ওপারে ফিরিয়ে নিতে হয়। নিজের জমিতে আক্রমণকারীর সৈন্য-বাহিনী রেখে ভারত কোনদিনই আলোচনায় বসতে পারে না। ভারতের কাছে এটি মর্যাদার প্রশ্ন।

যাই হোক, এই যুদ্ধের মীমাংসা ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হলেও তিনি এখনো নিরুদ্যম হন নি। মোটামুটি ভারতের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই তিনি আবার যে মীমাংসা প্রয়াস শুরু করেছেন তা মার্শাল টিটো প্রভৃতিরও সমর্থন লাভ করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার গোষ্ঠীনিরপেক্ষ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই সমর-নিবৃত্তির জন্যে। এ ব্যাপারে বর্তমানে ঘানার প্রেসিডেন্ট নক্রুমা ও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণের প্রচেষ্টার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা চলে। তা ছাড়া ডিসেম্বর মাসে সিংহলে এশিয়া আফ্রিকার যে ছয় রাষ্ট্র সম্মেলন আহূত হয়েছে তার ফলাফলের দিকেও আজ সারা পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ। কাজেই মীমাংসার সম্ভাবনা যে মোটেই নেই তা বলা যায় না।

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা ব্যাপারে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের তিব্বতের কথাটা মনে পড়ে। এই সীমান্ত বিরোধ নিয়ে আলোচনা করবার সময় তিব্বতের কথাটাও পুনর্বিবেচিত হওয়া উচিত। তিব্বত বর্তমানে সম্পূর্ণভাবেই চীনের গ্রাসে। দলাইলামা তাঁর প্রায় পঞ্চাশ হাজার অনুচর নিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। কতকাল তাঁরা ভারতের উপর বোঝা হয়ে থাকবেন? আর তিব্বতের অভ্যন্তরেও রয়েছে তিব্বতীদের বিক্ষোভ। দলাইলামা ও তাঁর অনুচরবর্গের এই স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন ও তিব্বতের অভ্যন্তরের তিব্বতীদের বিক্ষোভের কারণ হল তিব্বতীরা চীনের অধীনস্থ হয়ে থাকতে চায় না। তারা তিব্বতের স্বাধীন অস্তিত্বের স্বীকৃতি চায়। ইতিহাস বলে ১৭২৭ সনের পূর্বে তিব্বত ছিল সম্পূর্ণ ভাবেই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৭২৭ সনেই তিব্বত চীনা বাহিনীর নিকট হার মেনে তিব্বতের একাংশে চীনের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। কিন্তু চীনের এই কর্তৃত্ব বরবাদ করার জন্যে তিব্বত বহুবার চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এখনও তিব্বতীদের মনে সেই বিদ্রোহের দাবাগ্নি জ্বলছে।

কাজেই কবে চীন তিব্বতের একাংশ গ্রাস করেছিল তাই বলে তিব্বত চীনেরই অংশ এই যুক্তিতে তিব্বতকে চীনের কবলে ঠেলে দেওয়া ন্যায়নীতিবিরুদ্ধ। তা ছাড়াও কথা আছে। চীন ও ভারত এই দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মাঝখানে তিব্বত যদি স্বাধীন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকে তাহলেই চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের চিরস্থায়ী মীমাংসা সম্ভব। আমেরিকার কাছে যেমন কিউবা, চীনের কাছে যেমন উত্তর কোরিয়া, তেমনি ভারতের কাছে স্বাধীন তিব্বতের গুরুত্ব অসীম। ভারত তাই কোনদিনই তিব্বত ও তিব্বতীদের কথা ভুলে যেতে পারে না।

আন্তর্জাতিক বিধির বিচারে

চীন বরাবরই নিজেকে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার অধীশ্বর বলে ভেবে এসেছে। কমিউনিস্ট রাজত্বেও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। একমাত্র জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও ভারত বাদে এই অঞ্চলের আর সব দেশকেই চীন তার রাষ্ট্রীয় এলাকা বলে দাবি করে। ভারত বলতে আবার আমরা যে ভারত বুঝি চীন তা মানতে রাজী নয়। শুধু যে ভারতের উত্তর সীমান্তের পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল জমির উপর তার দাবি তাই নয়, নেফা, মণিপুর, নাগাভূমি সমগ্র আসাম, এমন কি আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জকেও লাল চীন তার খাস তালুক বলে মনে করে। তা ছাড়া ভারতের আশ্রিত রাজ্য ভূটান, সিকিম, স্বাধীন নেপাল, বর্মা, মালয়, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলির উপরেও লাল চীনের আছে লোলুপদৃষ্টি।

লাল চীনের লোলুপতার ঔদ্ধত্য আজ এত সীমাহীন যে, কাজাখস্তান, কিরঘিজিয়া, তাজিকিস্তান প্রভৃতি সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলিকেও তারা সুযোগ পেলেই নিজেদের হৃতভূমি বলে দাবি করে। ওই সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলি সম্বন্ধে চীনের বক্তব্য: '১৮৬৪ সনে চুণ্ডচাক চুক্তির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া ওই এলাকাগুলি চীনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।'

পামির সম্বন্ধেও লাল চীনের অভিযোগ: '১৮৯৬ সনে রাশিয়া ও বৃটেন চুপিসারে ওই অঞ্চলটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।'

লাল চীনের এই সাম্রাজ্য-লালসার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে ১৯৫৪ সনে পিকিং থেকে প্রকাশিত 'এ ব্রীফ হিস্ট্রী অফ মডার্ন চায়না' নামক গ্রন্থে। তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত "হৃত" ভূমিগুলি এখনই ফেরত চাইবার মত দুঃসাহস লাল চীনের নেই, কারণ নানাভাবে তাকে আজ রাশিয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তা ছাড়া রাশিয়ার সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধেও চীন অচেতন নয়। তাই আপাততঃ বিভিন্ন গ্রন্থে ও মানচিত্রে ওই এলাকাগুলিকে নিজের বলে দেখিয়ে সে ভারতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেছে। ভারতের উপর আজ এই ব্যাপক আক্রমণ শুরু করার আগেও চীন কয়েক বছর ধরে শুধু মানচিত্র ও দলিলপত্রে তার অধিকারের দাবি জানিয়েছিল। সুতরাং সে রকম শক্তি অর্জন করতে পারলে লালচীন যে একদিন রাশিয়ার কাছেও তার হৃত জমি ফেরত চাইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখন চীন তার সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ করেছে চিরকালের বন্ধু ভারতকে। এই পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাতকে নিছক অর্থহীন নিষ্ঠুরতা বলে মনে করলে খুবই ভুল হবে। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়েই চীন এই রক্তের নেশায় মেতেছে। ১৯৫৭ সনের মধ্যে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে ১৯৫৯ সনের সেপ্টেম্বরেই চৌ-এন-লাই প্রথম ভারতের পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল ভূমি চীনের বলে দাবি করে বসে। এর আগে আর কখনো ভারতের সঙ্গে চীনের সীমান্ত বিরোধের কথা শোনা যায় নি। এমন কি চীনা ভূগোলে মিথ্যা সীমানার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে চৌ-এন-লাইই সে সবকে 'ও কিছু নয়, ও কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। যাই হোক চীন জানে ভারতই এশিয়ায় তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। যতদিন ভারতে গণতন্ত্রী শাসন অটুট থাকবে ততদিন চীনের অন্তহীন সাম্রাজ্যবাদী লালসার সামান্যতম পরিতৃপ্তিরও সম্ভাবনা নেই। আর ভারত যদি হার মানে তখন কেউ থাকবে না এশিয়ায় যে লাল চীনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারবে।

চীন আজ ভারতের যে এলাকার উপর দখল দাবি করেছে তার পেছনে কোন ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বা আন্তর্জাতিক আইনগত সমর্থন নেই। চীনের একমাত্র বক্তব্য, ওই এলাকাগুলির কোনটি দেড়শো বছর, কোনটি দুশো বছর, এমন কি কোনটি চার-পাঁচশো বছর আগে তিব্বতের ছিল। অতএব তিব্বত অধিকারবলে সেই-ই এখন ওইসব এলাকার মালিক, এবং সবই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এমন আজগুবী যুক্তি ইতিপূর্বে কোন নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পক্ষেও দেখানো সম্ভব হয় নি। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে ওই সব এলাকা কয়েক শো বছর আগে তিব্বতেরই ছিল তাতে চীনের দখলিস্বত্ব কিভাবে প্রমাণ হয়? মাত্র পনেরো বছর আগেও ভারত, পাকিস্তান, বর্মা, সিংহল প্রভৃতি বৃটেনের ছিল, তাই বলে আজ আবার কি বৃটেন ওইসব এলাকার উপর দখল দাবি করতে পারে? আন্তর্জাতিক আইনের এটা হল সবচেয়ে বড় কথা যে, স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, একবার চুক্তির মাধ্যমে যে স্থান অন্য রাষ্ট্রের হাতে চলে যায়, তার উপর ভবিষ্যতে আর কখনও ন্যায়সঙ্গত-ভাবে দাবি জানানো যেতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম রাজ্য আলাস্কা, যা আয়তনে ভারতের প্রায় অর্ধেক, একদিন রাশিয়ার উপনিবেশ ছিল। ১৮৬৭ সনে মাত্র ৭২ লক্ষ ডলার মূল্যে রাশিয়া ওই বিশাল ভূখণ্ডটি যুক্তরাষ্ট্রকে বিক্রয় করে। আজ কি রাশিয়া পঁচানব্বুই বছর বাদে আবার বলতে পারে যে, ওই বিক্রয়চুক্তি বাতিল, আলাস্কা ফেরত চাই আমার? এভাবে যদি পৃথিবীর সব দেশ সব দেশের কাছে যে কোন একটা কারণ দেখিয়ে জমির দখলদারী দাবি করতে থাকে তবে কি একদিনও পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে? এই কারণেই এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হল যে, উভয়পক্ষের স্বীকৃতিতে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে একবার যে রাষ্ট্রীয় লেনদেন হয়ে যায় তা উভয় পক্ষ তো মানতে বাধ্যই, অন্য সকল রাষ্ট্রও মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু চীন আজ এই আইন মানতে রাজী নয়, শত শত বছরের স্থিতাবস্থাকে সে আজ বন্দুকের জোরে ওলট-পালট করে দিতে উদ্যত।

ভুটান থেকে বর্মা পর্যন্ত বিস্তৃত ৭৫০ মাইল দীর্ঘ ম্যাকমেহন সীমান্ত রেখা চীন আজ মানতে রাজী নয়। কারণ চীনের দাবিমতে সে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল ভারত ও তিব্বতের মধ্যে। আর তিব্বতের ওই রকম চুক্তি স্বাক্ষরের অধিকার ছিল বলে চীন স্বীকার করে না। কিন্তু ১৯১৪ সনে যে সিমলা কনভেনশনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেখানে চীনের প্রতিনিধি কি উপস্থিত ছিলেন না? সেখানে তাঁর সেই উপস্থিতি যে অনধিকারচর্চা তিব্বতী প্রতিনিধির কাছ থেকে তাঁকে কি সেদিন সে মর্মে তিরস্কার হজম করতে হয় নি? সে কথা থাক, আসলে

এখানে চীনের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির প্রশ্নটাই বড়, না সত্য ঘটনা বড়? চীন না চাইলেও তিব্বত যে স্বাধীনভাবে সেদিন ভারতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, তিব্বত সেদিন প্রকৃতই স্বাধীন ছিল? ভারত না চাইলে কি উপায় আছে পশ্চিমবঙ্গ বা কেরলরাজ্যের অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে চুক্তি করার? যদি তারা তা করতে পারে কোনদিন, তবে সেদিন এ অবাঞ্ছিত সত্য স্বীকার করে নিতেই হবে যে, ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন উপেক্ষাকারী ওই রাজ্যগুলি স্বাধীন হয়ে গেছে। ভারত তখনও তাদের উপর সার্বভৌমত্ব দাবি করলে সে দাবি সকলের কাছে যুক্তিহীন বলেই বিবেচিত হবে।

স্বাধীন তিব্বত একদিন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে চুক্তি করে যে সীমান্ত স্বীকার করে নিয়েছে তা তিব্বতের অধিকারিরূপে লাল চীনও আজ মেনে নিতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে ১৯১৪ সনে ভারত ও তিব্বতের সম্মতিক্রমে ম্যাকমেহন লাইন সীমান্ত স্থির হয়ে যাওয়ার পর ১৯৫০ সন পর্যন্ত এ নিয়ে তিব্বত বা চীন কেউই কোন প্রশ্ন তোলে নি। এমন কি ১৯৫১ সনে চীন তিব্বত দখল করার পরেও চার বছর পর্যন্ত এ নিয়ে কোন আপত্তি করে নি, তারপর চুপিসাড়ে চীন যে কয়েক বছর ধরে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তা প্রকৃতপক্ষে ভূমিচুরি ছাড়া কিছুই নয়, যা এখন প্রকাশ্য লুণ্ঠনের রূপ নিয়েছে। আর এই লুণ্ঠনের সমর্থনেই সে আজ যুক্তির নামে কতকগুলি গায়েরজোরী অজুহাত সৃষ্টি করে চলেছে, যা পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের পক্ষেই সমর্থন করা সম্ভব হয় নি।

শান্তি-মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথে ভারতবর্ষ একান্তভাবে যে নিরপেক্ষনীতি অনুসরণ করে আসছিল চীনা দস্যুদের আক্রমণ তার ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত এনেছে। আগেই বলেছি এই অভাবনীয় বিপদে ভারতবর্ষ অকম্যুনিস্ট ও কম্যুনিস্ট সব দেশের সহানুভূতি ও সাহায্য চেয়েছে। এ পর্যন্ত অনেকগুলি দেশই অকুণ্ঠভাবে তাদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এদের একটিও কম্যুনিস্ট দেশ নয়। বিপদেই যদি বন্ধুর পরিচয়, তাহলে ভারতের এই জীবন-মরণ সংকটে 'ভারতবন্ধু' কম্যুনিস্ট দেশগুলিও আজ নীরব কেন? এই প্রশ্ন আমাদের ব্যথিত করবে, কিন্তু বিস্মিত করবে কী? কম্যুনিজমের প্রকৃত চেহারা যাঁরা জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এতে বিস্মিত হবেন না। তবু আমরা আশা করব, জঙ্গী কম্যুনিজমকে গণতান্ত্রিক পথে শোধন করবার, সহজ-সরল করবার এবং অন্য শিবিরের সন্দেহ-সংশয় ও বৈরীভাব হ্রাস করবার যে পথ ক্রুশ্চেভ গ্রহণ করেছেন, তা আরও এগিয়ে যাবে এবং ভারতের ওপর দস্যুতার জন্যে কম্যুনিস্ট বলেই লাল চীন সোভিয়েট রাশিয়ার তিরস্কার ও বিরোধিতা থেকে অব্যাহতি পাবে না।

ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি

চীনা বাহিনীর ভারত সীমান্ত অতিক্রমকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে যখন স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেমের বান ডেকেছে তখন দেশপ্রেমিক সব মানুষের কাছেই ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে মনে হবে। অনেক টালবাহনার পর কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় কার্যকরী সমিতিতে যে প্রস্তাবটি পাস হয়েছে তাও সর্ববাদীসম্মত হয় নি। কয়েকজন বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট নেতা তো এই অধিবেশনে যোগই দেন নি, উপস্থিত সদস্যবর্গেরও এক তৃতীয়াংশের ভোট গেছে প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে। যে কোন মর্যাদাসম্পন্ন জাতির পক্ষে এ কাজ অসম্মানকর। দেশ যখন শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করছে, তখন সেই দেশের এক শ্রেণীর নাগরিকের এইরূপ আচরণ অমার্জনীয় অপরাধ। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, ভারতে রুশপন্থী কম্যুনিস্ট আছে, চীনপন্থী কম্যুনিস্ট আছে, কিন্তু ভারতপন্থী কম্যুনিস্ট নেই।

কম্যুনিস্টরা আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী, সে কথাটা আমাদের জানা আছে। আমাদের বক্তব্য এখানে এই যে, ভারতের বিপদে যে কম্যুনিস্টগণ ভারতের সর্বসাধারণের সঙ্গে এক হয়ে সেই বিপদের মোকাবিলা করবেন শুধু মাত্র তাঁদেরই ভারতপন্থী কম্যুনিস্ট হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে। এক্ষেত্রে তাঁরা রুশ কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। দেশপ্রেম কাকে বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রুশ কম্যুনিস্টগণ সমগ্র বিশ্বকে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। যে সব ভারতীয় কম্যুনিস্ট তেমনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবেন তাঁদেরই আমরা ভারতপন্থী কম্যুনিস্ট বলব। আমরা মনে করি, দেশপ্রেমহীন আন্তর্জাতিক প্রেম একটা তত্ত্ব হতে পারে, কিন্তু সে তত্ত্বকে কোনদিনই সত্যে রূপ দেওয়া যায় না। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতায় কোন বিরোধ নেই, বরং তা পরস্পর পরস্পরের সহযোগী।

এই যুদ্ধের পরে

আজ হোক, কাল হোক, এই যুদ্ধ একদিন থামবেই। কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ এবার থেকে ভারতকে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দারুণ বিপদের মুখে জাতির মধ্যে সেই স্বদেশী যুগের মত যে জীবনের জোয়ার প্রকাশ পেয়েছে তাকে নবজীবন গড়ার পথে বহুমুখী গঠনকর্মের পথে পরিচালিত করতে হবে। দুর্নীতি ও নিষ্ক্রিয়তার মরুতে তাকে শুকিয়ে যেতে দেওয়া চলবে না।

নিন্দুকের প্রতিবেদন

নারায়ণ দাশশর্মা

সম্পাদক মহাশয়, আমাকে মার্জনা করুন। এবার আমি প্রতিবেদন রচনায় অক্ষম হয়েছি। ব্যর্থ হয়েছে বহু প্রহরের অধ্যবসায়ী প্রয়াস। আমাকে মার্জনা করুন। বিপরীতমুখী বহু আবেগের অয়ন ও প্রত্যয়ন বায়ু আমার চিন্তার স্রোতে যে জটিল তরঙ্গভঙ্গ সৃষ্টি করেছে, তার মধ্য থেকে একটি সুসংবদ্ধ প্রতিবেদন রচনা করার উপযুক্ত মন অন্বেষণ করতে আমি একান্ত অপারগ হয়েছি। আমাকে মার্জনা করুন।

আজ আপনাকে এবং আপনার মারফত পাঠকবর্গকে এই যে চিঠি লিখতে বসেছি তা প্রতিবেদন শিরোনামায় রচিত হলেও প্রতিবেদন নয়, পত্র মাত্র; আমার অক্ষমতার কৈফিয়ত পত্র।

গত একমাসকাল আমাদের জনমানসে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যে ঘটনাবলী প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য ও সমালোচনা অকস্মাৎ তুচ্ছ, নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর এক কলমের জিমন্যাস্টিক বলে প্রতিভাত হয়েছে অনেকের কাছে। ঘটনা যতটুকু তার চাইতে ঘটনার প্রতিক্রিয়াতে পট-পরিবর্তন দেখা দিয়েছে দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে। রক্তের নদী বয়েছে হিমরেখার ঊর্ধ্বে, সীমান্তের সে শোণিতরেখায় ভারত হয়েছে সীমন্তিনী; শান্ত গুম্ফায় 'মণিপদ্মে হুং' মন্ত্র আবৃত্তি করতে গিয়ে তোয়াংয়ের প্রধান লামার ললাটে কুঞ্চন এনেছে মর্টারের কর্কশ নির্ঘোষ, মঠ ছেড়ে চলে আসতে আসতে তাঁর কানে বেজে উঠেছে দলাই লামার প্রত্যয়-দৃঢ় আশীর্বাণী—'দেওয়া তেভ তোমার শো।'—সকল প্রয়াসে সাফল্য আসুক তোমাদের; বেতার-তরঙ্গে বেজেছে প্রধানমন্ত্রীর বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরে অঘোষিত যুদ্ধের বেদনার্ত ঘোষণা; রাষ্ট্রপতি হাতে তুলে নিয়েছেন আপৎকালীন ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিধান; কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা ও তেজপুর থেকে অমৃতসরের কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে বিস্মৃতপ্রায় সেই সংসপ্তকী প্রতিজ্ঞাবাণী—করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে। মরণপণ জীবনযজ্ঞের প্রত্যন্তে বসে আমি তাই সক্ষম হই নি মুদ্রিত পৃষ্ঠার রসাস্বাদন করতে, আমার স্বাভাবিক নিন্দাবাণী কুণ্ঠিত লজ্জায় মরমে মরে গেছে।

মনে পড়েছে বারংবার:

রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে সেই কবিতার অলস্ত পঙ্‌ক্তিগুলি, যা সম্প্রতির পরিপ্রেক্ষিতে জীবন্ত সত্য হয়ে উদ্ভাসিত:

বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জনমাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;
"যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল",
উঠেছে আদেশ,
"বন্দরের কাল হল শেষ।"

কিন্তু না। মা-ও আজ কাঁদে না, প্রেয়সীর নয়নও জ্বলন্ত ক্রোধে প্রতিজ্ঞা-উদ্ভাসিত।

বন্দরের কাল শেষ হয়ে গেছে। এসেছে আদেশ। দিব্যুকের প্রতিবেদনে আজ কোন্ প্রসঙ্গ আলোচিত হবার যোগ্য? কোন্ মুক্ত সাহিত্যকর্ম?

যে-সাহিত্য আজ পাঠযোগ্য তা মহাভারত। তা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। আজকের বাণী—ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নির্জন পার্বত্য-ভূমি আজ তার শান্তবর্জিত অপবাদ ঘুচিয়েছে; নূতন কুরুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেখানে। সেই নূতন কুরুক্ষেত্রের উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে আজ নূতন মহাভারতের পুরনো এক পরিচ্ছেদের দিকে চোখ পড়েছিল। সে পরিচ্ছেদ সেই অঙ্গীকার পত্র, মাত্র আট বছর আগে বৈশাখের এক কবোষ্ণ বিপ্রহরে ভারত ও চীন যা রচনা করেছিল; তার শুরুতে আছে:

"চীন জন-গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় গণসরকার এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সরকার চীনের তিব্বত অঞ্চল ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নীত করতে অভিলাষী হয়ে এবং চীন ও ভারতের জনগণের তীর্থ-যাত্রাদি সুগম করার উদ্দেশ্যে, বর্তমান চুক্তি সম্পন্ন করার সঙ্কল্প করেছেন, যে চুক্তি হবে এই কটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

১. পরস্পরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা,

২. পারস্পরিক অনাক্রমণ,

৩. অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পারস্পরিক অহস্তক্ষেপ,

৪. উভয়ের সমান অধিকার ও সুবিধা, এবং

৫. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।"

মনে হতে পারে চীন সরকার বুঝি এই অঙ্গীকারগুলি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, বিস্মৃত হওয়া দূরের কথা চৌ-এন-লাইয়ের স্মৃতিতে আজও সকলই স্পষ্ট, সেই পাঁচটি মূলনীতি স্মরণ করেই তাঁর কার্যকলাপ চলেছে অদ্যাবধি।

প্রথম নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ চীন তার সৈন্য-বাহিনীকে ভারতীয় ভূখণ্ডে পাঠাবার আগে সেই বিশেষ ভূখণ্ডটি যে আসলে চীনের অন্তর্গত এ কথা ঘোষণা করতে ভোলে না। কয়েক সহস্র বর্গমাইলের দাবি নিয়ে যে সীমান্ত-মনোমালিন্যের শুরু, চীনা বাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে-দাবিরও সমান তালে অগ্রগতি ঘটেছে। জানি না চীনের সর্বশেষ মানচিত্রে গোটা কাশ্মীর এবং ব্রহ্মপুত্রের উত্তরবর্তী সমগ্র আসাম উপত্যকার গায়ে কোনও দুর্বোধ্য চীনা নাম জুড়ে একটি চীনা প্রদেশ বানানো হয়েছে কিনা; এখনও না হয়ে থাকে যদি তবে অদূরভবিষ্যতেই তেমন দাবিও যে পেশ হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেন না, চীন ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

দ্বিতীয় নীতি স্মরণ করে চীনা বাহিনী শুধুই আত্মরক্ষা করে যাচ্ছে; আক্রমণ কদাপি নয়। ভারতের সীমান্ত ঘাঁটি থেকে জনপদে, জনপদ থেকে উপত্যকায়, উপত্যকা থেকে নগরে, ক্রমশঃ চীনের আত্মরক্ষার ব্যূহ বিস্তৃত হয়েছে মাত্র। তোমার ঘরে আমি ঢুকে বসব, তাতে যদি আমাকে ধাক্কা মেরে সরাতে চাও তবে আমি আত্মরক্ষার গরজে তোমাকে মারব—মোটামুটি এই হল চীনা-বাহিনীর কথিত অনাক্রমণ নীতি। এবং আত্মরক্ষার এই অনাক্রমণমূলক নীতি ফলবতী করার উদ্দেশ্যে ভারী মর্টার, স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রতি-ক্রিয়ারোধী পার্বত্য কামান ইত্যাদি যন্ত্রপাতি তারা লেকা ও লাদাকে আমদানি করেছে।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রতি-শ্রুতিবদ্ধ বলেই ভারতের শাসনতন্ত্র, বিধি-ব্যবস্থা, সরকার ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পিকিং রেডিয়োতে হিংস্র কুৎসা রটনা করার সময় চীন প্রথমে একটু লজ্জা বোধ করত। সেই কারণে হস্তক্ষেপের কার্যকলাপ চালানোর জন্য চীন তো যথাসম্ভব ভারতেরই জ্যোতিবাবুদের উপর ভার দিয়েছিল। তারা যদি এ মহান দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয় তখন নেহাত অগত্যা চীনকে স্বয়ং এ কাজগুলির ভার নিতে হবে। এ অপরাধের দায়িত্ব চীনের নয়, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির।

সমান অধিকার এবং পারস্পরিক উপচিকীর্ষার নীতিতে চীন সরকার সর্বাপেক্ষা বেশী আস্থাবান। নেফার যুদ্ধে চীন তিব্বতের মালভূমির সুবিধা পাচ্ছে অথচ ভারতকে সৈন্য পাঠাতে হচ্ছে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে, এই অসমান ব্যবস্থায় সাম্যবাদী চীন অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছিল। সেইজন্ত ওদের অভিলাষ যে যুদ্ধটা যত শীঘ্র সম্ভব ওয়ালং বমডিলা সে-লা উপত্যকার পার্বত্য-ভূমি ছেড়ে ডিব্রুগড়, তেজপুর ও পাণ্ডুর সমতলভূমিতে নেমে আসুক। সেখানে সমান জমির ওপর যুদ্ধ হোক সমানে সমানে।

আর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান? খরগোশের সঙ্গে শৃগাল, মেষশাবকের সঙ্গে বৃক, হরিণের সঙ্গে বাঘ যে-জাতীয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্ত চিরকাল লোলুপ, ভারতের সঙ্গে চীন তো এই মুহূর্তে তেমনি সহাবস্থানের জন্ত জীবন পণ করেছে। চীনের উদরে যদি ভারত শান্তিতে অবস্থান করে, কটকর উদ্গারের অশান্তি যদি চীনকে অযথা পীড়িত না করে তবে এশিয়া তথা বিশ্বে শান্তি যে শ্মশানের চাইতেও অচল হয়ে দেখা দেবে তাতে আর সন্দেহ কী? তিব্বতের সঙ্গে চীনের যেমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আমাদের সঙ্গেও তেমন হোক না কেন!

কিন্তু পরিহাসের উৎসাহ আজ সত্যই খুঁজে পাচ্ছি না। মর্মে মর্মে আজ মত্ত আশা প্রমত্ত সাপের মতন ফুঁসে উঠছে; উত্তেজনায় ভাষা খুঁজে পাই না তাকে প্রকাশ করার।

কিংবা শুধু তাই নয়। বৃহৎ একটি পরিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে আমার পরিহাস-প্রবণতা অভিভূত হয়ে পড়ছে; সেই বৃহৎ পরিহাসের স্রষ্টা স্বয়ং ইতিহাস।

ঠিক যে মুহূর্তে ইউ. এন. ও.তে ভারতের প্রতিনিধি দাবি জানিয়েছেন, চীনকে যেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য করে নেওয়া হয়; কুয়োমিন্টাং সরকারের পরিবর্তে কম্যুনিস্ট সরকারের প্রতিনিধিকে যেন দেওয়া হয় নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী আসনের একটি; বিশ্বের পাঁচ প্রধানের অন্ততম করে যেন বরণ করা হয় চৌ-এন-লাইকে—ভিটো অধিকার সমেত; সেই মুহূর্তে কমিউনিস্ট চীনের সৈন্তবাহিনী শুভ্র গিরিবর্ত্মে হামাগুড়ি দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছে শান্তিময় বমডিলার বুকে ছুরি বসাতে। ইতিহাস ছাড়া এমন প্রচণ্ড পরিহাস আর কে করতে পারে?

দুই

এই পটভূমির সামনে দাঁড়িয়ে নিন্দুকের পক্ষে সাহিত্য-প্রতিবেদন রচনা সহজ নয় এবং সম্ভবতঃ সঙ্গতও নয়। নাম উল্লেখ করব না, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে এবারে কোন্ সাহিত্যিকের একখানি পুস্তক নিয়ে প্রতিবেদন রচনা করার কথা আমি চিন্তা করছিলাম। বর্তমান পারিপার্শ্বিকে সেই ব্যক্তি ও তাঁর রচনাকে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী নিন্দা—যদি লিখতেও পারতাম কোন রকমে—পাঠকের চোখে কী অনাকর্ষণীয় হয়ে দেখা দিত তা কি আপনি বুঝতে পারছেন?

সেই সাহিত্যিক সম্বন্ধে আমার মোটামুটি মূল্যায়ন হত এই: ইনি যখন প্রথম লিখতে শুরু করেন তখন তাঁর মধ্যে প্রতিশ্রুতির স্ফুলিঙ্গ দেখে আমরা যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছিলাম; অতঃপর সেই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসঘাতকতায় পর্যবসিত হল, কদর্য অশ্লীলতায় রুচি-বিকার ছাড়িয়ে তাঁর রচনা আর কোন শ্রেয়সের পথে উত্তীর্ণ হতে পারল না; এবং এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের প্রথমেই হিসাবে ভুল ছিল, কেন না উক্ত সাহিত্যিক আদৌ কোন শ্রেয়সের প্রতি আস্থাবান ছিলেন না; কিঞ্চিৎ অর্থ ও প্রতিপত্তির জন্ত সাহিত্যে নূতনত্বের একটি ভঙ্গি প্রদর্শন করা তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল এবং সেই নূতনত্বের জন্তই শ্রেয়সের ইঙ্গিত তাঁর রচনায় প্রচার-কার্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। সাগরজলের দুর্নিবার আকর্ষণে নয়, গলায় বোল্তা জলে তিনি নেমেছিলেন ডোবার বড় মাছের ঝাপটে সন্ধের টানে; সমুদ্রের প্রতিশ্রুতি ভাঁওতা মাত্র, বস্তুতঃ মেছোবাজারের শুঁটকির ব্যবসায়ে দু পয়সা কামানোই তাঁর মূল এবং গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

ফ্যাসিজমও অনুরূপ অপরাধে অপরাধী। বস্তুতঃ যে কোন রাষ্ট্রীয় ইজমের মধ্যে এই একটি সাধারণ লক্ষণ বর্তমান: ইজম্ অর্থই হচ্ছে রাষ্ট্রের সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি অপরাধ ও অত্যাচারকে কোন-না-কোন যুক্তি-যুক্ততার যাথার্থ্য দিয়ে নির্দোষ করার পদ্ধতি।

ফ্যাসিজমের চাইতেও কমিউনিজম অধিকতর মারাত্মক এই কারণে যে ফ্যাসিজম একটি দেশের আত্যভিমানকে সম্বল করে মাথা তোলে বলেই অপর সমস্ত দেশের মানুষের কাছে তার হিংস্রিতার লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে; পক্ষান্তরে কমিউনিজম আন্তর্জাতিক 'ইজম্' বলেই তার হিংস্রিতা অধিকমাত্রায় ব্যাপক, দেশ-দেশান্তরে তার অনায়াস সংক্রমণ।

হিটলার যখন য়ুরোপ-বিজয়ের নেশায় প্রমত্ত, তখন একজন মাত্র কুইস্‌লিং জন্মেছিল নরোয়ে রাজ্যে; একমাত্র অর্থ বা অনুরূপ কোন উৎকোচ ছাড়া আক্রান্ত দেশে হিটলারের সপক্ষে বিভীষণ-বাহিনী সৃষ্টি করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র যদি আজ অপর রাজ্য কুক্ষিগত করতে চায় তবে উৎকোচ ছাড়াই অসংখ্য বিভীষণ তাকে সাহায্য করতে উদ্‌গ্রীব হবে। কমিউনিজম একটি ইজম্ মাত্র হলে এ ব্যাপার অসম্ভব ছিল, আন্তর্জাতিক ইজম্ বলেই এই অঘটন প্রতি মুহূর্তে ঘটছে।

সম্প্রতি একটি জনশ্রুতি শোনা যাচ্ছে, ব্যাঙ্ক অফ চায়নার ভারতবর্ষে যে-সকল ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিল এদেশের কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতাকে নিয়মিত উৎকোচ দান। এ জনশ্রুতির সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে, কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, এ জনশ্রুতি অংশতঃ সত্য হলেও যে কজন গৃহশত্রু অর্থের বিনিময়ে চীনের পক্ষাবলম্বন করতে প্রস্তুত হয়েছেন তার চাইতে বহু বেশী সংখ্যক "আদর্শবাদী ও সৎ" কমিউনিস্টকে চীন বিনা মূল্যে স্বপক্ষে পেতে পারবে—যদি নেফা ও লাদাকের পর্বতচূড়া থেকে তাকে প্রহারেণ ধনঞ্জয় করে হান রাজ্যে ফেরত পাঠানো না হয়।

এই সকল বেদনাদায়ক অবিসংবাদ সত্যের ভিত্তিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক কমিউনিজম নামক যে মারাত্মক বস্তুটি তাকে নিন্দা না করে ব্যক্তি হিসাবে কমিউনিস্টদের ভর্ৎসনা করার কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাই না।

আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের মুখোশটি যে-কোন ইজমের মুখোশের মতই সুন্দর। শোষণের স্থায়ী অবসানের স্লোগান তার কণ্ঠে। স্বয়ং শোষণ করার সময় সে স্লোগান দ্বিগুণ তারস্বরে ধ্বনিত করতে তার ভুল হয় না। রাষ্ট্রের ক্রম-অবলুপ্তি তার ঘোষিত আদর্শ, নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রযন্ত্রের হাড়িকাঠে কোটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বলি দেবার সময় সেই আদর্শের মন্ত্র পড়ে উৎপীড়নের খড়্গাকে শোধন করে নেয় সে। শ্রেণীহীন সাম্যের মন্ত্র তার বীজমন্ত্র। শাসক-শ্রেণীর স্বার্থে শাসিত-শ্রেণীর কণ্ঠরোধ করার সময় সে সকলকে বিশ্বাস করাতে চায় যে সাম্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় এই কণ্ঠরোধ।

ভারতের সৌভাগ্য যে সেই মুখোশের অন্তরালে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের আসল মুখটি সে দেখতে পেয়েছে। সীমান্তের যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়ের অনেক আগেই, যুদ্ধের শুরুতেই সবচেয়ে বড় যে জয়লাভে ভারত সৌভাগ্যবান তা হচ্ছে এই: কমিউনিজমের আসল চেহারার পরিচয়-লাভ। এই জয়ের লগ্নে আমরা যেন তৃণাদপি নগণ্য জ্যোতিবাবুদের নিন্দায় শক্তির অপব্যয় না করি, ব্যক্তির চাইতে পার্টি হোক আমাদের ঘৃণার লক্ষ্যস্থল; পার্টির চাইতে বেশী ঘৃণ্য হোক মতবাদ; এবং কমিউনিজমকে ঘৃণা করতে শিখে আমরা যেন অপর কোন ইজম্‌কে আমন্ত্রণ না জানাই। কেন না, ইজম্ মাত্রই মনুষ্যত্বের শত্রু।

শতাব্দীব্যাপী আয়ুষ্কালে অসংখ্য ভুল করেছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন; কিন্তু চৌ-এন-লাইয়ের ভারত আক্রমণের মত এত বড় ভুল আর করে নি। প্যারী কমিউনের উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গের মধ্যে যে মতবাদের জন্ম, নেফা ও লাদাকের অভিশপ্ত মিস্-অ্যাডভেঞ্চারে বেউলে হয়ে আসা সেই কমিউনিজমের মৃত্যুর ঘণ্টা ধ্বনিত হয়ে গেল। দেয়ালের গায়ে লেখা

হয়ে গেছে পরিহাস-প্রিয় ইতিহাস-পুরুষের শতাব্দীর পরিহাস: সভ্যতার সূতিকাগার ভারতবর্ষে রচিত হল একটি অসভ্যতার সমাধিস্থল।

মৃত্যুকালে ওকে আর নিন্দাবাদে বিদ্ধ করব না। কমিউনিজম শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলুক।

চার

এবং নিন্দাবাদ করব না সেই সব বাঙালী সাহিত্যিককে যাঁরা চীন, রাশিয়া ও অন্যান্য চুনোপুঁটি কমিউনিস্ট দেশ দেখে এসে সেই সব দেশ ও কমিউনিজমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা হুজুগের আনন্দে নির্বোধের মত প্রশংসা করেছিলেন তাঁরা এখন লজ্জায় আনত-শির। আর যারা জ্ঞানপাপী, তারা নির্লজ্জের মত এখন আবার সুর পালটিয়ে চীনের নিন্দায় অর্বাচীনতার চূড়ান্ত দেখাতে ত্রুটি করবে না জানি। এ ছাড়া রয়েছে কিছু-সংখ্যক মূলতঃ বিবেকী শিল্পী যাঁরা সত্যই কমিউনিজমের মোহে অন্ধ হয়ে বিবেককে অজ্ঞাতসারে খুইয়ে বসে আছেন। তাঁদেরই উদ্দেশ করে কিছু বলার বোধ হয় প্রয়োজন আছে। কেন না এঁদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক প্রতিশ্রুতিবান্ তরুণ বর্তমান, কমিউনিজমের ভরাডুবি হয়ে যাবার পর ব্যর্থতার দংশনে এঁদের শিল্পীমন বন্ধ্যাত্বদশা প্রাপ্ত হয়ে যাবে; শিল্পী হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে ইজমের ব্যক্তিত্বনাশী নাগপাশ থেকে এঁদের অবিলম্বে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী মহলের পুরোভাগে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম শোনা যায়। যদিও বুদ্ধিজীবী কিংবা কমিউনিস্ট-কোনও দিকেই তাঁকে আমি উল্লেখযোগ্য বলে মনে করার খুব যুক্তি খুঁজে পাই না, তবু দৃষ্টান্তস্বরূপ হীরেন্দ্রবাবুর একটি স্বল্পপরিচিত প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ আমি উদ্ধৃত করব।

প্রবন্ধটি চার বছর আগে রচিত। প্রসঙ্গ তারও দু বছর আগে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তাই। শিরোনামা: যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব। হীরেন্দ্রবাবু তাতে লিখেছেন:

“সোভিয়েটের প্রতি অনুরাগ আমাদের অনেককে অন্ধ করে রেখেছে, শ্লেষের সঙ্গে এ-কথা প্রায়ই শোনা যায়। অনুরাগ যে কিছুটা অন্ধ হবে, এ তো স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং অভিযোগে বিস্মিত বা বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আর আমি অন্তত বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই স্বীকার করতে যে···বিতণ্ডায় সোভিয়েটের পক্ষ সমর্থন করার জন্য আমার মন পূর্ব হতেই যেন প্রস্তুত রয়েছে। একান্ত নির্বিকার ও নিরাসক্ত বিচারক-মন নিয়ে মানুষ থাকতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। তাই আমরা সোভিয়েটের ও অন্যান্য সোশালিস্ট দেশের পক্ষাবলম্বী শুনলে আমি লেশমাত্র লজ্জা বা সংকোচ বোধ করি না।”

উদ্ধৃতিটি প্রধানতঃ সোভিয়েট সম্পর্কে বটে কিন্তু অন্যান্য সোশালিস্ট দেশের উল্লেখও স্পষ্ট। আর চীন সম্পর্কে অনুরূপ উক্তির ভূরি ভূরি উদাহরণ হীরেন্দ্রবাবুদের রচনা থেকে উদ্ধৃত করা অত্যন্ত অধিক অধ্যবসায়-সাপেক্ষ নয়।

তাহলে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীর, মনে রাখবেন পেশাদার পলিটিক্যাল এজিটেটরের নয়, বুদ্ধিজীবীর সরল স্বীকারোক্তি এই। একটি পররাষ্ট্রের প্রতি, যার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবেই অপূর্ণ হতে বাধ্য, ‘অনুরাগে অন্ধ’ হওয়ার জন্য ‘বিচলিত হওয়ার কিছু নেই’ এবং যেহেতু ‘নিরাসক্ত বিচারক-মন নিয়ে মানুষ থাকতে পারে না’ সেই কারণে সোশালিস্ট দেশের অন্ধ পক্ষবলম্বন বুদ্ধিজীবীর পক্ষেও ‘লেশমাত্র লজ্জা বা সংকোচ’-এর কারণ নয়।

এই প্রবন্ধেই সগর্বে উল্লেখ করেছেন ইনি এঁরই রচিত আর একটি প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ, যাতে আছে “দেশভক্তিতে আমি কারও কাছে হার মানি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি সত্যের অপলাপ না করে বলতে পারি যে সোভিয়েটও আমার দেশ।” এই পুরাতন উক্তির পুনরুক্তি করে হীরেন্দ্রবাবু বক্তব্য করেছেন “এ-কথা বলেছিলাম স্মরণ করে আমি লজ্জিত নই।”

এবং এই সকল নির্লজ্জতার পরিচয় এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী দিয়েছেন যে-প্রবন্ধে তার শিরোনামা 'যুগসন্ধি (অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের সঙ্কট) ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব'। বুদ্ধিজীবী মাত্রেই অতঃপর হীরেনবাবুর মত লজ্জিত না হয়ে উপায় থাকে না।

এই জাতীয় প্রবন্ধাদির কথা মনে করেই আমার আশঙ্কা হয় কমিউনিস্ট ও আধা কমিউনিস্ট মহলে বুদ্ধিজীবীর যে অংশ হীরেনের মত অনুরাগে বন্দী হয়ে আছে, কমিউনিজমের মৃত্যু হলেও তাদের মুক্তি দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। না হলে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের অভিঘাতে যেমন হাওয়ার্ড ফাস্টের মোহমুক্তি ঘটেছিল, আজকে নেফা ও লাদাকের অভিঘাতে একজন সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও মোহমুক্তি ঘটল না কেন?

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির শৃঙ্খলার মধ্যেও যাঁরা সত্যকার সংবেদনশীল সাহিত্যিক তাঁদের মধ্যে একজনও আর্থার কোয়েসলার [কমিউনিস্ট পার্টিতে আমি সাত বছর কাজ করেছি—সাত বছর ঠিক যতদিন জেকব লাবানের কন্যা র‍্যাচেলের পাণি প্রার্থনায় লাবানের ভেড়া চরিয়েছিল। যখন সময় পূর্ণ হল, তার অন্ধকার শিবিরে বধূ হল অভিসারিকা; কেবল তার পরদিন ভোরবেলা জানতে পারল সে যে তার প্রণয়োপচার উৎসর্গ হয়েছে যার পায়ে সে রূপসী র‍্যাচেল নয়, সে কুৎসিতা লীয়া।] একজনও ইগনাজিও সিলোন [যেদিন আমি কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে এলাম, সেদিন আমার বিষণ্ণ দিন, অশৌচ-পালনের মত বিষণ্ণ, আমার মৃত যৌবনের স্মৃতিতে অশৌচ।] অথবা একজনও রিচার্ড রাইট [যে গল্পগুলি আমি লিখেছি তাদের কথা আমার মনে পড়ল, যে-গল্পে কমিউনিস্ট পার্টিকে এক সম্ভাবিত গৌরবের ভূমিকায় আমি বসিয়ে এসেছি, সে গল্প সব ফুরিয়ে গেছে। অন্তরে অন্তরতলে আমি যে তেমন করে আর গল্প লিখতে পারব না, জীবনকে আর অনুভব করতে পারব না তেমন স্পষ্টতা দিয়ে, প্রকাশ করতে পারব না আর তেমন আশা তীব্রতা, তেমন করে আর দিতে পারব না প্রত্যয়ের পূ প্রতিশ্রুতি।] দেখা দিল না কেন, এই উত্তরহীন প্র আমার এই মুহূর্তের বিস্ময়। চীন কেন ভারত আক্রম করেছে তারও চাইতে দুর্বোধ্য লাগে, সে আক্রমণে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী মহলে শুভ প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত মাত্র নেই কেন? প্রতারিত কোয়েসলার, বিষণ্ণ সিলোন, প্রত্যয়-চ্যুত রাইটের মত একজন মোহমুক্ত কমিউনিস্ট সাহিত্যিক যদি আজ বাংলাদেশে দেখা দিত তবে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি একটু আশা প্রকাশ করতে পারতাম।

এই সব প্রাক্তন কমিউনিস্ট বিষণ্ণ সাহিত্যিকেরা পূর্ণতায় চরিতার্থ নন সত্য, কিন্তু এঁদের ব্যর্থতার মধ্যে সাহিত্যিক সংবেদনশীলতার ইঙ্গিত মেলে, যে-ইঙ্গিত বাঙালী তরুণ কমিউনিস্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে খুঁজে না পেলে বুঝতে হবে, তাঁরা তবে সেই অর্থে সাহিত্যিক যে অর্থে হীরেন্দ্রবাবু বুদ্ধিজীবী।

সম্পাদক মহাশয়, নিন্দুক এবার প্রতিবেদন লিখতে পারল না প্রধানতঃ এই আশঙ্কার কারণে, যে নিন্দার অকারুণ্যে পাছে কোন বাঙালী কমিউনিস্ট সাহিত্যিক কোয়েসলার-সিলোন-রাইট হবার ক্ষীণ সম্ভাবনাও হারিয়ে ফেলে।

নেফা ও লাদাকের বিস্ফোরণের চাইতে বেশী তাৎপর্যময় সেই অনাগত পদধ্বনির জন্য আমি উৎকর্ণ।

*
* *

ছবি

নীলকণ্ঠ

বেঁচে সুখ নেই...

ঘোরানো সিঁড়িটার শেষ ধাপে পা দিয়ে কথাটা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিলেন মোটর-গাড়ি মেরামত কারখানার মালিক রাঘব বসাক। খাকী ট্রাউজার, সাদা শার্ট, পায়ে কাবলি। সাড়ে চার হাত মানুষ। গায়ের রঙ আলকাতরার চেয়ে সামান্য কম কালো। তলপেট জুড়ে বিপুল একটা থলথলে চর্বির থলে—রাঘব বসাকের ভুঁড়ি ট্রাউজার থেকে এক হাত বেরিয়ে। গায়ে ভালুকের মত লোম বোতাম-খোলা শার্টের ফাঁকে বুকের কাঁচাপাকা অসুন্দর বনময় ঈষৎ হাওয়ায় কখনও কখনও এ ওর গায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। মুখখানা বুলডগের মত। ঘাড় নেই বললেই হয়। যে কোনও সাধারণ মানুষের বাইসেপের থেকেও চওড়া হাতের কবজি। বাঁ হাতের কবজিতে একটা ঘড়ি বাঁধা—আর যে কারুর হাতে দূর থেকে দেখলে যাকে বেবি বেন বলে ভুল করা আশ্চর্য নয়। পায়ের দাগ যদি হিমালয়ের কোনও চত্বরে রেখে আসতে পারতেন রাতের অন্ধকারে রাঘব বসাক তাহলে ইয়েতিদের পায়ের ছাপ বলে আবার হৈ-হৈ করে তুফান তুলতে আটকাত না খবরের কাগজের চায়ের কাপে। আণ্ডারওয়্যার থেকে গায়ের গেঞ্জি, শার্ট-প্যান্ট তো বটেই, পায়ের জুতো কোনওটাই রেডিমেড সওদা করা যায় কলকাতায়ও—টাকা দিলে বাঘের দুধ মেলার কাহিনী জব চার্নকের প্রিয় যে শহরে নিছক কিংবদন্তী নয়, ইমপসিবল্ প্রোজেক্ট।

এই কুৎসিত কদর্য চেহারায় প্রচণ্ড শক্তির আভাসে রাঘব বসাককে মানুষ না বলে বনমানুষ বললে ভুল হয় না; কোদালকে কোদাল বলার চেয়েও যথার্থ কিছু বলার থাকে যদি, তা-ই বলা হয় সুনিশ্চিত।

রাঘব বসাকের শরীরে যত জোর, ট্যাঁকের জোর তার চেয়ে অনেক বেশী। এত বেশী টাকা লোকটার যে হিংসেও করে না কেউ; কারণ করে লাভ নেই। এক ছেলে রাঘব বসাকের। বসাকদের বংশেরই একমাত্র সন্তান। কোনও ভাই বিয়ে করে নি। প্রত্যেকের অবশ্যই রীতিমত সচ্ছল নয় শুধু—উজ্জ্বল। রাঘব বসাককে এক পয়সা খরচা করতে হয় না, ছেলের পড়াশুনো থেকে শুরু করে খানাপিনা পর্যন্ত কিছুর জন্যেই। বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের পর এখনও যা পায় তা খরচ করবে কী করে রাঘব বসাকের রীতিমত এক্সপেনসিভ ওয়াইফ—মিসেস বসাক ভেবে পায় না। রাঘবের একজন অবিবাহিত বড় ভাই রাঘবের সংসারে থাকে। কাঁচা বাজার থেকে শুরু করে ছেলের স্বাস্থ্য এবং মিসেস বসাকের বিউটি পর্যন্ত অটুট রাখার একরি রেসপনসিবিলিটি তাঁর। তিনি এত রাশভারি লোক যে রাঘব বসাক সংসারের অথবা বউ-ছেলের সং-সাজার বাজেটে নাক ঢোকাতে দুঃসাহস করেন না, ছেচল্লিশ বছরে আজ মাস ছয়েক হল কাবলি-পরা ইয়া বড় পা রীতিমত দেবার পরও।

কখনও যদি দুর্লভ কোনও বিস্ময় কলকাতার বাজারে যার পাত্তা পাওয়া কয়েক বছরের ব্যাপার হয়, তো জাপান থেকে, হংকং থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে কখনও গিফ্ট কখনও স্মাগলিংয়ের মহিমায় বন্ধুর হাত দিয়ে এসে ওঠে বসাকের সেক্রেটারিয়েট টেবলে। রাঘব বসাককে কেউ কিছু দিতে পারলে সে নিজেকে নিদারুণ ইম্পর্ট্যান্ট মনে করার সুযোগ পায়। যদিও সে এবং তার হঠাৎ ভাগ্যে ঈর্ষাতুর অন্যেরা প্রায় সবাই জানে, দু-একদিনের বেশী নয়, যত দুর্লভ সংগ্রহ হোক সেই চিজ, তার মেয়াদ বসাকের টেবলে। সেখান থেকে ছেলের কাছে চালান হয়ে যাবে চোরা মাল। রাঘব বসাকের মনে দাগ কাটে না কিছুই—না মানুষ, না মেয়েমানুষ; না তাদের দেওয়া কোনও মুহূর্ত।

এই রাঘব বসাক যখন বলেন, যখন-তখন বলে বসেন: 'বেঁচে সুখ নেই'—তখন সেটাকে কেউ মনে করে ঠাট্টা; কেউ ভাবের প্রতি কটাক্ষ; কেউ বা ভাবে হয়ত খুঁজে পাবার মেজাজের দুর্গন্ধ ঠেকুর। দু-একজনের মনে পড়ে কয়েক বছর আগেও রাঘব বসাক মিস্ত্রি ছিল

মোটর-গাড়ির কারখানার। সেই লোক যদি শহরের সবচেয়ে ব্যয়বহুল গ্যারেজের মালিক হয়, তবে তার মুখে এই উক্তি না মানালেও মেনে নিতে হয়। যেমন মেনে নিতে হয় বনমালার বেডরুমে কামিনী রায়ের আঁকা কালীঘাটের পোটোর আনট্‌ কপি।

আজ একা রাঘব বসাক রাবণের তৈরি স্বর্গে যাবার অসম্পূর্ণ সিঁড়ির মতই স্পাইর্যাল স্টেয়ার্সের শেষ ধাপে পা দিয়ে স্বগত করলেন: বেঁচে সুখ নেই। যদি কেউ সুখ কী সে কথা জিজ্ঞেস করত বসাককে তাহলে তার জবাব তিনি খুঁজে পেতেন না। সেই জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মা মারা যাবার দুঃখ ছাড়া প্রকৃত আর কোনও দুঃখ রাঘব বসাকের কপালে জুটেছে কিনা বলা শক্ত। সেই মায়ের কথা বসাকের অবচেতন মনের কোথাও নেই, কারণ একবারও তাঁকে বুকের দুধ খাওয়াবারও পর্যন্ত সময় পান নি বসাকের মা। রিটার্ন টিকিট কাটা পরকালের রেল ছেড়ে দেবার সবুজ সিগন্যাল তখন হাওয়ায় উড়ছে, শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে জীবনের স্টেশন-মাস্টার: লাইন ক্লিয়ার। মিস্ত্রি থাকাকালীনও আরামে ছিলেন না রাঘব বসাক বটে, তবে গ্রাসাচ্ছাদনের অথবা আশ্রয়ের অভাব থেকে সেদিনও বঞ্চিত ছিলেন না হতভাগ্য রাঘব বসাক। সব ভাই-ই তাঁর দায়িত্ব নিতে রাজি ছিল সানন্দে।

স্কুল ছেড়ে মোটর-গাড়ি মেরামতের মিস্ত্রি হবার গোঁ রাঘব বসাকের নিজের। দাদারা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু বাধা দেন নি। মা-মরা সবচেয়ে ছোট ভাই। বাধা দিলে আরও বিগড়োবে। তার চেয়ে মিস্ত্রিগিরির শখ দুদিনেই মিটে যাবে। ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরবে সুবোধ বালকের মত। স্কুলে ভর্তি হবে আবার। এই ছিল বড় ভাইদের ধারণা। সে গুড়ে বালি দিয়ে মিস্ত্রি রাঘব আজ বসাক্‌স্ অটোকিওরের একচ্ছত্র সম্রাট হবার সাধনায় ছোট বড় কোনও অসুবিধার মুখোমুখি হন নি একথা মিথ্যে বলবার কোনও কারণ নেই, কারণ সেগুলো একটাও দুঃখ দেয় নি বসাককে। বরং উত্তেজনা দিয়েছে, বিপদ উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দ দিয়েছে, গতি দিয়েছে বসাকের চলার গতিতে। কেবল দেয় নি রাঘব বসাককে 'বেঁচে সুখ নেই' এই মুদ্রাদোষ থেকে মুক্তি।

রাঘব বসাককে এই এখনই যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বসতো বেঁচে সুখ নেই কেন, এমন কি বসাক নিজেই যদি সে প্রশ্ন করতেন, তাহলে তার উত্তর দেবার মত আর একজনও সেখানে ছিল না। সেখানে নয়—কোনওখানেই না। একজন ছিল সেই ঘরের মধ্যে। সিঁড়ি থেকে একটা স্টেপ নেমে যার ঘরে গিয়ে ঢুকবেন আর একটু বাদেই রাঘব বসাক। সেই একজন—যার নাম চম্পাবতী। ঘুমিয়ে ছিল তখনও দুপুরের আগুন বিকেলের আলো হবার পর। নিশ্চিন্ত আলস্যে, নির্ভয় স্বাচ্ছন্দ্যে, নিরুপদ্রবে ঘুমোচ্ছিল যে, সেই একজনও কিন্তু জানত না রাঘব বসাকের মুদ্রাদোষ—'বেঁচে সুখ নেই' কেন—এর উত্তর।

শুয়ে ছিল রজনীগন্ধার একফালি স্বপ্ন সেই খাটে। বয়স হয়েছে রজনীগন্ধার। চম্পাবতীর জীবনেও অপরাহ্নের আলো এসে পড়েছে অবশেষে। তবু আশ্চর্য শরীর চম্পার। আকাশের যৌবনস্বপ্ন একদিন ছেয়েছিল এই শরীরে। অতল জলের অপরূপ বিষণ্ণ গম্ভীর আহ্বান কাঁপছে পাতলা ঘুমন্ত দুটি বঙ্কিম ওষ্ঠের ডানায়। পাতলা কাপড়ের তলায় ঈষৎ হেলেপড়া বুকের দুরন্ত আভাস। একটা হাত ঘুমের মধ্যেও একটা বুক আগলাচ্ছে। আর একটা হাত বন্দুকের মত পাশে পড়ে। পায়ের ওপর কাপড় উঠে গেছে অনেকখানি। নিটোল গোল সাদা পা। গলার একটা হার উঠছে নামছে নিশ্বাস নেওয়া আর ফেলার তালে তালে। মাথার চুল বালিশে, বালিশের দু পাশে পেছনে খাটের সীমানা ছাড়িয়ে অন্ধকার রাতের মত ব্যাপ্ত, বিপর্যস্ত, ঘন।

রাঘব বসাক ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন খাটের কোণ ধরে চুপ করে। এই শরীর—প্রতিটি প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত এই শরীরের মুখস্থ হয়ে গেছে তাঁর। চোখ বেঁধে দিলেও কোথাও পৌঁছতে হোঁচট খেতে হবে না তাঁকে। বহুবার পড়া পুরনো বই আজ দুপুর থেকে হঠাৎ আবার পড়ার দারুণ ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল তাঁকে। ভেবেছিলেন, 'বেঁচে সুখ নেই' বলার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারবে চম্পার শরীর। কেন ভেবেছিলেন এমন অসম্ভব উদ্ভট চিন্তা তার হদিস পেলেন না হাতের নাগালের মধ্যে চম্পাকে পেয়েও

আবার কেন সাংঘাতিক ক্রাসট্রেশানের সেই চাড় মনের দরজা-জানলা সব ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে—কি করে তা বসাক বলবেন!

চম্পার ঘর থেকে নিঃশব্দতর নিষ্ক্রান্তিতে বেরিয়ে এলেন স্পাইর্যাল স্টেপস্ বেয়ে নীচে; সেখান থেকে রাস্তায় তাঁর প্রিয় স্টেশন-ওয়াগনে। চাবি দিতেই আওয়াজ করে কেঁদে উঠল, কেঁপে উঠল যান্ত্রিক আত্মা। বনেটের বক্ষপঞ্জর ভেদ করে সেই কান্না অপরাহ্ণের উত্তুরে হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল ঈষৎ। গাড়িটাও গাড়ির মালিকের মত বলতে চাইল: বেঁচে সুখ নেই। বলতে পারল না তবুও। রাঘব বসাকের হাতে ষ্টিয়ারিং। গাড়ির মুখ তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছেন মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটের দিকে। মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটেই তাঁর প্রথম মেয়েমানুষ থাকত। এখন থাকে কিনা তিনি কিছুই জানেন না। তবুও চম্পার কাছ থেকে পালিয়ে তিনি যেতে চাইলেন বিমলির কাছে। বিমলির চেয়ে কুচ্ছিত শরীর মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটে একটিও ছিল না আজ থেকে দশ কি পনেরো বছর আগে। তখনই তার শরীরে ঘুণ ধরেছে; এখন সে কেমন আছে জানবার জন্যে যাচ্ছেন না সেখানে রাঘব বসাক। কিসের জন্যে তবে যাচ্ছেন সেখানে রাঘব বসাক তাও জানেন না। শুধু জানেন, চম্পা—চম্পাবতীর কাছে বেঁচে সুখ নেই যেমন, তেমনই সুনিশ্চিত, বিমলির কাছে একদিন বেঁচে সুখ ছিল।

মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটের সেই চিলেকোঠায় সবচেয়ে সস্তার ঘরখানাতেই বিমলি আছে। তার মুখে বসন্তের দাগ এখনও, আজ এত বছর বাদেও মেলায় নি।

বিমলিকে বরাবর মনে রাখার আরও একটা কারণ ছিল বসাকের। প্রথম দিনই বিমলি একটা সাংঘাতিক কথা বলেছিল বসাককে। বলেছিল, বসাকের বিপুল পয়সা হবে। তার কারণ, বিমলি যা বলেছিল সেইটাই কোনওদিন ভোলবার নয়। বসাকের একটা আঙুল নাকি ছোট। কোন্ আঙুলটা? বিমলি বসাকের আঙুল ধরে বলেছিল, এইটে। বসাক কোনওদিন যাচাই করেন নি বিমলির কথামত তাঁর একটা আঙুল অন্য লোকদের স্বাভাবিক মাপের সেই আঙুলের চেয়ে সত্যি ছোট কিনা! এখন পর্যন্ত বিমলির কথা যে মিথ্যে হয় নি, এ কথা বিমলির কাছে আজ এত বছর বাদে আসবার আগে তাঁর অনেকবারই মনে হয়েছে। আজ আবার মনে হল তাঁর।

বিমলিকে বসাক চিনলেন; কিন্তু বসাককে বিমলি হঠাৎ চিনতে পারে নি। বসাক তার চেনার চেষ্টা দেখে হেসে ফেলতেই বিমলি গদগদ হয়ে উঠল: বড়বাবু! রাঘব বসাকের হাসি আজও বদলায় নি; বাঘের গায়ের ডোরার মত তা বদলাবার নয় বলেই বোধ হয়। কি করবে বিমলি তার দশ-পনেরো বছর আগের বড়বাবু—রাঘব মিস্ত্রিকে নিয়ে ভেবে পায় না কিছুতেই। ঘরে লোক আছে। দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না এত বড় লোককে। রাঘব বসাকের সব খবর রাখে সে। মিস্ত্রি থেকে বাবু হয়েছেন যে রাঘব—সত্যিকারের মস্ত বড়বাবু, সে খবর রাখে বিমলি। আর মনে পড়ে, রাঘব মিস্ত্রির ছোট একটা আঙুল ধরে বিমলি বলেছিল—রাঘব একদিন বিপুল পয়সা করবে। দশরথের কাছে বর চাইবার সময় এসেছে আজ কৈকেয়ীর। কিন্তু কী বর চাইবে বড়বাবুর কাছে ভেবে পায় না বিমলি। তার একটাও ছেলে নেই।

পাশের একটা ঘরে, চোরা কুঠুরীর চেয়েও ছোট আর অন্ধকার ঘরে রাঘব বসাককে টিনের চেয়ারে বসতে দেয় বিমলি অতি সঙ্কোচের সঙ্গে। চেয়ারটা ক্যাঁচ্ করে ওঠে; আরও জুত করে বসেন বসাক। ঘরের ঠাণ্ডা মেঝের একটা বাচ্চা মেয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, তার ঠোঁটে ঝুলছে একটা চুষি।

নিজের ঘরে ফিরে যায় বিমলি। কতক্ষণে বার করে দেবে সন্ধ্যের বউনিকে, তারই মতলব কিছুতেই মাথায় খেলে না তার। আরও অধৈর্য হয়ে ওঠে সে।

একটু বাদে হঠাৎ বাচ্চা ঘুমন্ত মেয়েটার তারস্বর শুনে দৌড়ে আসে পাশের চোরা কুঠুরীর চেয়েও ছোট আর অন্ধকার ঘরে। এসে দেখে মেয়েটা জেগে উঠেছে প্রচণ্ড কান্নার সঙ্গে। তার মুখে চুষিটা নেই। তাকিয়ে দেখে টিনের চেয়ারে রাঘব বসাকের মুখে সেই চুষি। দু চোখ বন্ধ বসাকের। চোখের গহ্বরের দু কোণ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। মাতৃস্তনের আস্বাদ বঞ্চিত রাঘব বসাকের ঠোঁট সেই চুষি লেহন করছে দেখলে 'বেঁচে সুখ নেই'—এ কথা কে বলবে?

সংকট সাহিত্যের সংজ্ঞা

চিত্ত ঘোষাল

প্রতিদিনের মত আজও ছেলেটি তার মানসীকে ট্রামে তুলে দিয়ে চলে-যাওয়া ট্রামের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রামের জানলায় নিরাভরণ নিটোল হাতের ভর রেখে বসে আছে মানসী, পাখির পালকের মত নরম একটা হাত—কত রোমাঞ্চ, কত রহস্যের প্রতিশ্রুতি ওই একটি হাত, কী স্নিগ্ধ। ছেলেটি তাকিয়ে আছে ক্রমবিলীয়মান সেই হাতটার দিকে। আর ভাবছে, এই মুহূর্তে কী সে ভাবতে পারে? ধরে নেওয়া যাক, সে ভাবছে, বর্তমানের সীমারেখা পেরিয়ে ভবিষ্যৎ যেদিন সত্য হয়ে উঠবে, সেদিন সে আর এতদূরে দাঁড়িয়ে ওই বিলীয়মান হাতটার দিকে তাকিয়ে থাকবে না। সেদিন এক পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে হাতের ওই কোমল শৈত্যকে সে নিজের বুকে টেনে নেবে, নিঃসঙ্কোচে ডুব দেবে ওর রহস্য আর রোমাঞ্চের অতল গহ্বরে। ট্রামস্টপ পেরিয়ে ট্রামের গতির সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে চলেছে এক অপূর্ব রোমান্টিক কল্পনা। কিন্তু আচমকা ধাক্কা খেল সেই অপরূপ গতি। একেবারে প্রায় গায়ের ওপর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটি। ষোড়শী। অভাব আর দৈন্যের তাড়নায় যৌবনের লালিত্য তার হারিয়ে গেছে। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একপলকে দেখে নিল ছেলেটি। তেলের অভাবে গায়ের চামড়া তার ফেটে ফেটে গেছে। কুৎসিত কর্কশ মুখটা হয়ে উঠেছে ভীষণ, সারা হাতটায় তার পুঁজগলা ঘা। আর এই হাতটাই কিনা প্রায় তার গায়ের ওপর! সমস্ত মনটা তার একনিমেষে বিষিয়ে উঠল। মুচড়ে মুচড়ে যেতে লাগল তার কল্পনার আনন্দ।

• • •

রোজই গ্যাংম্যান তাকে দেখে, লাইনের ধারে ছোট্ট পুকুরটায় সে আসে তার খানকয়েক বাসন নিয়ে। কাটিয়ে যায় অনেকখানি সময়। কাজের অছিলায় আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গ্যাংম্যান, দেখে মেয়েটি। একদিন মেয়েটিই তাকে বলল, 'তুই কি রকমের মরদ রে? এতটুকু সাহস নেই তোর?' সাহস যথেষ্টই ছিল গ্যাংম্যানের কি কোথায় যেন ছিল একটু সঙ্কোচ তাই কথায় চেষ্টা করে সে পারল না তার আহ্বানে তার কাছে এগিয়ে যেতে ছাউনি তোলার সময় এল গ্যাংম্যানের। মনটা যে আজ তার ভীষণ রকমের ফাঁকা। শুধু সে একবা মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে দিয়ে যাবে তার চলে যাবা খবরটা। মেয়েটি তাকে আহ্বান জানাল, জলজল করে তার সিঁথির সিঁদুর। গ্যাংম্যান জিজ্ঞেস করে, 'তো সোয়ামী আছে?' জবাব শোনে, 'হ্যাঁ আছে। তাতে তোর কি?' ঝোপের আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে তুলে দেয় তার দেহ, তার যৌবন। হাতটা কেমন যে ভিজে ভিজে লাগে গ্যাংম্যানের। 'তোর বাচ্চা আছে?' 'হ্যাঁ আছে।' বলে মেয়েটি। পায়ে পায়ে পিছু হাঁটতে থাকে গ্যাংম্যান। মেয়েটিকে অবাক করে দিয়ে একসময় সে পেরিয়ে আসে ঝোপ, পুকুর, রেল লাইন—সারা মনটা তার ধিক্কারে ভরে উঠেছে।

• • •

গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিস যেদিন মশাল হাতে পথে পথে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন মানুষকে, সেদিন যত না ছিল সংকট, তার চেয়ে সংশয় ছিল অনেক বেশী। ডায়োজিনিস মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা জানা নেই, তবে শিপ্রা নদীর উজান বেয়ে, বিদর্ভ-বিদিশার অন্ধকার পেরিয়ে, ধানসিঁড়ি ক্ষেত ডিঙিয়ে জীবনানন্দ আবর্জনা-বহুল নাটোরে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর বনলতা সেনকে, যিনি পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে জিজ্ঞেস করেছিলেন: 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' সংশয়ের নিবৃত্তি হয়েছে বটে কিন্তু আলোছায়ার রহস্যঘেরা গাছের গুঁড়িতে বেড়ালের নখ-আঁচড়ানোর পরিসমাপ্তি ঘটল না। আসলে মাইকেল যেদিন চিরাচরিত পদ্ধতিকে অগ্রাহ্য করে রাক্ষস রাবণকে দিলেন পরিপূর্ণ মানবিক মর্যাদা, বোধ হয় যথার্থ সংকটের শুরু হল সেইদিন থেকে। আর এই সংকট সাহিত্যিক মনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করল আধুনিক যুগে—যুদ্ধোত্তর পরিবেশে'।

জীবনজোতনার জটিলতার আবর্তিত মানসিকতা জটিলতর হয়ে উঠে সরলীকরণকে উপেক্ষা করে খুঁজছে নবনীকরণকে। অনাবশ্যককে পরিহার করে আবশ্যকীয়কে নিরাভরণরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষার আধুনিক মানসিকতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর তারই ফলে আধুনিক সাহিত্য যেন ক্রমশঃ পিছু হেঁটে চলে যাচ্ছে সেই বঙ্কিমের যুগে যেখানে পরিশেষে নায়ক-নায়িকাকে মিলিত করে দিয়ে গোটা উপন্যাসটার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে লেখক পাঠককে বলছেন, 'ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।' বর্তমান যুগের সাহিত্যশিল্পে সরাসরি কিছু বলা না থাকলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে স্নিগ্ধ কোমল সৌন্দর্য যত সত্যই হোক, অধিকতর সত্য হচ্ছে গলিতকুষ্ঠ কদর্য হাতের নিষ্করুণ নগ্নতা, মানুষ অপেক্ষা নারীদের ব্যভিচার। 'সানাই'য়ের সেই মেয়েটি যে কবিকে অতিব্যঞ্জনার দোষ দিয়ে বলেছিল, 'আপনি বলার কথাকে এত বাড়িয়ে বলেন যে আসল কথার খেই হারিয়ে যায় আমাদের কাছে।' কবি তাকে বলেছিলেন: 'ওগো মেয়ে, অমন যৌবন-বিনম্র কমনীয় দেহ থাকতে কেন সন্ধ্যাসমাগমের আভাস পেয়েই মুকুর সামনে রেখে চম্পক আঙুল দিয়ে নিপুণ হাতে বেণী বেঁধে, নীলাম্বরী দিয়ে দিয়ে দেহকে আবৃত করে, কপালে কুঙ্কুমের টিপ এঁকে, খোঁপায় ফুল গুঁজে অপরূপ ভঙ্গিমায় বাতায়ন পাশে এসে দাঁড়াও?' সুন্দরকে সত্য করে তোলায়, তাকে ললিতায়িত করার এই অনাবশ্যকতাকে একটু প্রশ্রয় দিতে হয়, মৃত্যুকে দূর থেকে দেখে ভেবেছিলেন কবি—তা দুর্জয়, নির্মম। কিন্তু যখন তা কাছে এল, কবি দেখলেন, তা শান্ত, সুন্দর। অত্যাধুনিক সাহিত্য সেই পৃথিবীব্যাপী মৃত্যুকে হৃদয় দিয়ে যত না উপলব্ধি করতে পেরেছে, তার চেয়েও বেশী করেছে দেহ আর আবেগ দিয়ে। তাই মৃত্যুর মধ্যে দেখছে তারা শায়ক-বিদ্ধ হরিণীর যন্ত্রণা। আর সেই কারণেই চেতন এবং অচেতন স্তরে দেখা দিয়েছে সার্বিক জৈবিক আলোড়ন। জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য জীবনের রূপাভাস দেবে সত্য কিন্তু সেই রূপায়ণ যখন নিত্য-সত্য এবং শাশ্বত-সত্যের সমন্বয়ে বিধৃত হবে, তখনই তার মধ্যে আসবে সংকট মুক্তির প্রতিশ্রুতি, আত্মনির্ভর জীবনের স্ফূর্তি। তার অভাবই হবে সংকটের বার্তাবহ। যার আওতায় পড়ে অত্যাধুনিক সাহিত্যের দেশীয় ভাগই।

নগ্নতা এবং সংগ্রাম যেমন জীবনের ক্ষেত্রে নিত্য-সত্য, তেমনি এরই মধ্যে জীবন পায় সত্যানুসন্ধিৎসার মুক্তি। অপরদিকে জীবন চায় একটা পরিচ্ছন্ন মানসিকতা। সেটা কতকটা কাঞ্চনজঙ্ঘার স্পর্শ-কামনার মত। সাহিত্য একদিকে যেমন এই ব্যথা-বেদনার প্রকাশ-মাধ্যম, আর একদিকে তেমনি এই আকাঙ্ক্ষিত মানসিকতার দিশারী। ঔপন্যাসিকের আত্মকৃত্য যে রোমাঞ্চ-সঞ্চার নয়, কথকতা, তা বর্তমান কালের সাহিত্যিকেরা অস্বীকার না করলেও পুরোপুরি স্বীকার করেন নি বলেই যত সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। জীবন তাই পরিচ্ছন্নতাকে খুঁজতে গিয়ে বারবার 'টাইগার-হিলে'র চৌহদ্দির মধ্যেই পাক খেতে খেতে দেখেছে এমন কতকগুলো বিকৃতি, যা জীবনকে ক্রমশঃই ভয়াবহ করে তুলছে। এক পরিষ্কার মন নিয়ে পাঠক আমি চলেছি তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে পাহাড় পর্বত, চড়াই উৎরাই পেরিয়ে হিংলাজ-দর্শনে, কিন্তু সেই বিশুদ্ধ মন নিয়ে হিংলাজ দেখে কি আমরা ফিরতে পেরেছি? সে প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গেছে যখন কুন্তীর প্রচ্ছন্ন নগ্নতা আমার সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বতঃই প্রশ্ন এসেছে —এটা কি মন, না দেহ? না, দেহ-মনের বাইরে এক রোমাঞ্চকর বিকৃত উন্মাদনা? সাহিত্য জীবনদ্যোতক হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু এই অহেতুক আবরণ-উন্মোচন প্রয়াস তথা অতিশয়োক্তিতেই আপত্তি। তন্ত্রাচারের মধ্যে তান্ত্রিক যতই সত্য এবং শিবের সন্ধান পাক না কেন, তা সে সুন্দর বর্জিত বীভৎস সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। গ্যাংম্যাম ফিরে গিয়ে যত 'স্টান্ট'ই দিক, যত শুভ ইঙ্গিতের দ্যোতকই হোক না কেন, তার পূর্বাচারের নগ্নতাকে ভুলে যাওয়া এবং তারই মধ্যে সাধারণ পাঠকের পাক খেয়ে মরার বিরাম থাকবে না। এবং বর্তমান সাহিত্যমানস সেই অতিচারিতাকে জীবন-সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আরোপ করেছে বলেই সে নৈর্ব্যক্তিক থাকতে পারে নি, তাই সেই কুৎসিত হাতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন লেখক, কুন্তীর কমনীয়তাকে আবৃত করে পাঠকের সামনে এসে দেখা দিয়েছে লেখকের দৌর্বল্য। সেই জন্যেই আমার

'আমি'র প্রত্যাশা শব্দকে মেনে যেতে বাধ্য হয়েছে লেখকের স্পষ্ট বাক্য-অভিব্যক্তির কাছে।

আমার মনে হয়, বিশেষ মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন-সমস্যার সমাধান করতে গেলেই সমস্যা বাড়বে এবং সংকট জটিলতর হতে বাধ্য হবে। অবশ্য যদি সে মতাদর্শ সর্বজনীন এবং শাশ্বত-সত্যাশ্রয়ী না হয়। আবার সর্বজনীন মতাদর্শও সংকটের সৃষ্টিকারক হতে পারে যদি তার সঙ্গে কমনীয় সৌন্দর্যের আত্মীয়তা না থাকে। নিছক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে যেমন যথার্থ সত্যের বিচার সম্ভব নয়, তেমনি আবার অধ্যাত্মবাদও সম্পূর্ণ সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে কি না সন্দেহ। জড়-বাদীদের কথায়—ধর্মকে অগ্রাহ্য করে যে নিরীশ্বরবাদী মন গড়ে ওঠে, তাই হচ্ছে মানবিকতা। এবং সেই ধর্মকে অস্বীকার করতে গিয়ে আধুনিক আত্মরত ব্যক্তি-সর্বস্বতা এমন উগ্র আকার ধারণ করেছে এবং এমন ভাবে সাহিত্যে তার মোহজাল বিস্তার হয়ে পড়েছে যার প্রভাব যেমন ব্যক্তিমানসের নিরপেক্ষ সমীক্ষা কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তেমনি সাহিত্যিকেরাও তার মধ্যে এক ধরনের রতিবিলাসের সন্ধান পেয়ে নবাবিষ্কারের আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এটা যে কোন আবিষ্কার নয়—এর মধ্যে কোন মৌলিকতা নেই। এটা নিছক একটা সংকীর্ণ সূত্রের ভাষ্য। দুই আর দুই-এ চার হয়, তা আঙ্কিক সত্য, কিন্তু জীবনসত্যে তা যে কোনদিন পাঁচ বা ছয় হয়ে দেখা দেবে না, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। আর জোর করে এই চারকে জীবনক্ষেত্রে আরোপ করলে সম্ভাবনারই অপমৃত্যু ঘটানো হবে—যা দু-একটি ছাড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটছে। সৃজনধর্মিতার সত্যই হচ্ছে স্বীকৃতির মাধ্যমে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সাহায্যে লক্ষ্যে নির্বিঘ্ন উত্তরণ। অপরদিকে ভাষ্যকারের সত্য হচ্ছে, কোন এক বিশেষ মতের বিশ্লেষণ তথা সরলীকরণ। প্রথমটায় আছে সীমার মাঝে সীমা-হীনতার আনন্দ আর দ্বিতীয়টাতে আছে বন্ধনের যন্ত্রণা। অত্যাধুনিক সাহিত্য এই সৃজনধর্মিতাকে হারিয়ে জৈবিক চেতনার মুখাপেক্ষী হয়েছে বলেই জীবনে যত সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং সাহিত্যেও এই জটিলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। মৌলিকতার বিলুপ্তি এবং সেই সঙ্গে জৈব-চেতনার উন্মাদই হচ্ছে যথার্থ সংকটের সংজ্ঞা। মীমাংসা-শাে ভাষ্যকারের প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ নির্দিষ্ট সূত্রে ব্যাখ্যা সেখানে যেমন আবশ্যক তেমনি তার ব্যাখ্যা ব্যাকরণের প্রত্যয়ের তারে বাঁধা একতারা। কিন্তু ে শাস্ত্র সপ্তস্বরের সম্মিলন, সেই সাহিত্যের জগতে কো নির্দিষ্ট সূত্রের আমদানি ঘটিয়ে চরিত্রায়নের মাধ্যে দলগত নীতির ব্যাখ্যাতা হওয়া গেলেও আনন্দ-প্রাচুর্য সে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে, ফলে যথার্থ মন তাকে সর্ব বলে কখনই স্বীকৃতি দেবে না। এবং আধুনিক মন যে সূত্রের মধ্যে জগৎ ও জীবনকে আনন্দ তথা মুক্তি দিতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছে, তাদেরই ভাষায় তা হচ্ছে "We set out from real active men, and on the basis of their real life-process we demonstrate the development of the ideological reflexes and echoes of this life-process." অর্থাৎ একেবারে সেই মেহনতি মানুষ, যাদের মুক্তি হচ্ছে পচাই বা ভোদকা আর নীতি হচ্ছে দেহসর্বস্বতা, তাতেও আপত্তি নেই যদি সেই জঠর-সর্বস্ব জীবন এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্য দিয়েও একটি সুস্থ নীতি, ও পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের সন্ধান পায়। সূত্রকারের বক্তব্য সেখানে আরও ঋজু। আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বললেন: "Morality, religion, metaphysics, all the rest of ideology and their corresponding forms of consciousness thus no longer retain the semblance of independence. They have no history, no development, but men developing their material production and their material intercourse alter, along with their real existence, their thinking and the products of their thinking." —মন্ময়তা নয়, দৈহিক তন্ময়তা, উৎপাদনের আনন্দ; যেখানে প্রেমিকাকে নিঃসংকোচে মাতা-পিতার যৌন-জীবনের কাহিনী নিয়ে চিঠি লেখা যেতে পারে। কারণ সূত্রকারের কাছে জীবন যখন চেতনা-নির্ভর নয়, পরন্তু চেতনাই জীবন-নির্ভর সেখানে বিকৃতিও প্রগতি হতে পারে কিন্তু সামাজিক জীবনের কাছে তা সংকটের আর এক চরমতর মুহূর্ত যেখানে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত

হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের কথায় সেখানে : 'আপনারে শুধু বেড়িয়া বেড়িয়া ঘুরে মরি পলে পলে।' কথাসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সুন্দর মন্তব্য আছে,'…যে মাত্রাবুদ্ধি এবং ইঙ্গিত কৌশল কাহিনীকে পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত করে, অথচ অযথা কদর্য করে না, তার কথা কারো মনে থাকছে না, অথবা ইচ্ছে করেই মনে রাখছে না। কদর্যতার পাষাণখণ্ডকে ছেদক করে সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে নিষ্কাশিত করা ওস্তাদ কারিকরের কাজ। সে কাজের ছেনী সাধারণ নয়, ছেনী চালনাও অসাধারণ নৈপুণ্যের অপেক্ষা রাখে।' অত্যাধুনিক কালেও ছেনী আছে কিন্তু নৈপুণ্য গেছে—তাই ওস্তাদ কারিকরদের মাত্র কয়েকজন ছাড়া বেশীর ভাগই বাস্তবতার অজুহাতে হয় মনোরম যৌন-অপচার, নয় অতিবাস্তবতার নারকীয় তন্ত্রাচার করছেন। এই প্রসঙ্গে উপেনবাবুর আর একটি পরিষ্কার মন্তব্য লক্ষণীয় : 'বাস্তবতার দোহাই পেড়ে যাঁরা অতি-বাস্তবতার দড়ি নেড়ে বাঁদর নাচান, জীবনের সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেলা দেখান বস্তুতঃ অবাস্তবেরই ; অতি-বাস্তবতার আরাধনা পদ্ধতি দিয়ে তাঁরা আবাহন করেন অবাস্তবতারই উপদেবতার।' ফলে সাধারণ জীবন সাহিত্যে সংকটমুক্তির সন্ধান করতে গিয়ে ওই উপদেবতার ভর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে পড়ছে। নৈরাশ্য এবং নৈরাজ্যের জগৎ জুড়ে চলেছে এই বাঁদর-নাচের খেলা।

জীবনের সামগ্রিকতা কোন বিশেষ মত বা আদর্শের অপেক্ষা রাখে না। বাস্তবতার বাইরে শিল্প বা সাহিত্য নয় এবং বস্তুসত্তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য কখনই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু যে সাহিত্যে বস্তুর অতীত সত্তা উপেক্ষিত, সে সাহিত্য কখনই মনোময়তার দাবি করতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে—সে সাহিত্য উৎকেন্দ্রিক। সমন্বয়ই হচ্ছে যথার্থ সুস্থতা। বর্তমান সাহিত্যে এই সুস্থতাবোধ সীমায়িত হয়ে গেছে বলেই যত গোল বেধেছে। আরও বেশী গোল বাধিয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে এই অপ-প্রচারের গাজন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সার্থকতা সেখানেই যেখানে পরীক্ষার সাহায্যে একটি অবিনশ্বর শিল্প-সামগ্রার সন্ধান মেলে। কিন্তু একটু বিশেষভাবে অনুধাবন করলে বর্তমান সাহিত্যে এই মিলনোৎসব সম্বন্ধে মনে আশঙ্কা জাগে। সংশয়ক্লিষ্ট ও সংকটাকীর্ণ মন তখন নাটোরের বনলতা সেনকে নিয়ে অহেতুক কামনার উল্লাসে দিক্‌ভ্রান্ত হতে বাধ্য, এবং বর্তমানে এটাই সাহিত্যে ধ্রুব হয়ে উঠছে। কারণ তারাশঙ্কর প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত অত্যাধুনিক যুগের সমরেশ বসু, বিমল মিত্র, বিমল কর বা নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি সাহিত্য-কর্ণধারেরা চৈতন্যের তপস্যায় আস্থাবান নন।

●

ধূলিকণা

কুমুদ ভট্টাচার্য

এক বিরাট অস্তিত্ব। এক বিশাল চলমানতা।
অনাদ্যন্ত এক কাল।
দূর থেকে ওদের দিকে চেয়ে আছি।

এই অবিশ্রান্ত পটভূমিকায়
নিজের বিশ্বাসযোগ্য ভূমিকাটি কী—
মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করি।
বৃথাই চেষ্টা করি।

আদি আর অন্ত—
অথবা বলা ভাল অনাদি আর অনন্ত—
তার মধ্যে নিজেকে কোথাও খুঁজে পাই না।

যেটুকু বা পাই, সে তো না পাওয়াই।
একটি ধূলির কণা
হাতে নিতে না নিতে উধাও।
কতটুকু বিশ্বাস্যতা
এই ধূলিকণার ?

বর্ণ-পরিচয়

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমি কী, সে কথা না বলাই ভাল
বিশ্বের সাথে কী বা আছে পরিচয়—
আমার আছে কি রোশনাই আলো,
বেগুনী রঙের নীলাটা যে কথা কয়?
পোখরাজে নীল আগুন কী বলে—
পান্না-সবুজ অরণ্যে খেলে ঢেউ—
পদ্মরাগের মর্মরে জলে
রঙের নিশান,—সে কথা জানে কি কেউ?
মহাজগতের রশ্মি কোথায়
আপন খেয়ালে ছড়ায় আকর্ষণ,
নির্দেশ তার কেবা খুঁজে পায়,
চুম্বকে তার মেলে কি নিদর্শন?

আকাশের বুকে ইন্দ্রধনুর মাঝে
সাতরঙা মেখে জীবনের ইঙ্গিত—
স্বর্ণকটে সপ্ত অম্বরাজে—
সপ্ত সুরেই জেগে ওঠে সঙ্গীত।
তিন কোণা কাচ দেয় সন্ধান
এই দেহাধারে আলোর বিশ্লেষণে,
সপ্তরশ্মি করে আলো দান
নিখিল প্রকৃতি-স্বরূপের আয়োজনে।
তন্ত্রশাস্ত্রে পাই সে সাধন—
মহাকাল রূপ মন্ত্রের পরিচয়—
স্থূলের ক্ষেত্রে সব কম্পন
সৃষ্টি করিয়া শক্তিতে গতিময়,
দূর হতে করে মানুষের দেহে
নূতন বীর্য নবরূপে সঞ্চার—
ম্রিয়মাণ দেহী পায় নিজ দেহে
নূতন করিয়া বাঁচিবার অধিকার।

অনুভবি' সেই তন্ত্রসাধনা,
বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে জাগে আজ
সুপ্ত-চিন্তা-প্রসূত চেতনা—
নিখিল বিশ্বে ছন্দিত রূপসাজ।
আলোকের মাঝে জন্ম লভিয়া
অণুতে অণুতে গাহে তারি জয়গান,
সপ্তরঙের তরণী বাহিয়া
প্রাণের সাগরে চলে সেই অভিযান।
এ নরদেহের বর্ণসাম্যপাতে
অনুপপত্তি ঘটায় যে ব্যাধিভার—
রঙের ক্ষুধাও আছে তারি সাথে,
তাহারই প্রসাদে নিরাময় হবে তার।
যা দিয়ে মোদের দেহসমষ্টি—
তারই মাঝে রূপে জাগে অভিন্ন নাম—
যে ছিল রহসি, সূক্ষ্মদৃষ্টি
দেখায় তাহারি লীলাখেলা অবিরাম।

রঙের বাহার কে দেখিতে পায়—
কোন্ রঙে গড়া আমার মুরতিখানি—
সাতরঙা সে কী, বিশ্ব যেথায়
কোটিরূপে সেই অরূপের সন্ধানী?
আজ্ঞাচক্র মূলাধার হতে,
ছয়ের শাসন ভেদিয়া সহস্রারে
সপ্তরশ্মি চলে কোন্ স্রোতে
মহাজাগতিক তরঙ্গে বারে বারে!
সপ্ত-আলোর খেলায় মগন
আড়ালে যেজন পালন করিছে সবে,
সেই আলোময় অরূপ শরণ
আমার জীবনে নামিয়া আসিবে কবে?

—

পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি. এইচ. ডি., রাজরত্ন, জ্ঞানজ্যোতিঃ রচিত "Gem Therapy", "The Science of Cosmic Ray Therapy" এবং "Magnet Dowsing" নামক তিনখানি পুস্তক পাঠান্তে এই কবিতার জন্ম।

বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহ

শ্রীতারকপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যেক ভাষাতেই প্রচলিত প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে সেই ভাষাভাষী জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিচয় নিহিত থাকে। সর্বসাধারণের এই স্বতঃস্ফূর্ত বচনগুলির মধ্যে বিশেষ কালের এবং বিশেষ অবস্থার নির্ভুল ঐতিহাসিক চিত্রও পাওয়া যায়। এই সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিলে এই প্রবাদ-প্রবচনগুলি যে কোন ভাষার অমূল্য সম্পদ। বাংলা ভাষার অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচনগুলির একটি বিস্তারিত কোষগ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় বাংলা ভাষার সেই অভাব দূর করিয়া এদেশের জ্ঞানপিপাসু বিদগ্ধজনের তথা সর্বসাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শুধু বর্তমানে নহে ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরপুরুষগণ তাঁহার এই শ্রম ও বৈদগ্ধ্যের অবদানকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সহিত অভিনন্দিত করিবে। তাঁহার বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহ গ্রন্থটি বিরাট; ইহাতে প্রায় দশ হাজার বাংলা প্রবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং ভূমিকায় গ্রন্থকারের আলোচনাটি অতীব মনোজ্ঞ হইয়াছে। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িলে গ্রন্থকার যে কি বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা দেখিয়া শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। গ্রন্থকার কেবলমাত্র প্রবাদগুলি সংগ্রহ করেন নাই উপরন্তু বহুস্থলে প্রবাদগুলির ব্যাখ্যা, টীকা ও উৎপত্তিনির্ণয়ও করিয়াছেন, এবং বহু ক্ষেত্রে পাঠান্তর এবং তুলনীয় অন্য প্রবাদও উদ্ধৃত করিয়াছেন। সমস্ত মিলিয়া এক কথায় গ্রন্থখানি অপূর্ব।

এই বিরাট সংকলনের মাঝে মাঝে কচিৎ দুই-একটি প্রবাদের অর্থ যথাযথ দেওয়া হয় নাই বা এক-আধটি ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা বা টীকা দেওয়া হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক। আমি বর্তমান প্রবন্ধে সেইরূপ উদাহরণ কয়েকটি দিতেছি; দিতেছি এই আশায় যে ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সামান্য ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইয়া গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে। নতুবা মক্ষিকাবৃত্তি লইয়া এই বিরাট গ্রন্থের দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই নাই, কারণ এ কথা ভালভাবেই জানি যে, অপর কেহ যদি এইরূপ একটি দশ সহস্র প্রবাদ-সংকলন গ্রন্থ লিখিতেন, সম্ভবতঃ তাহাতে ইহার বহুগুণ দোষ দৃষ্ট হইত; তদুপরি এই বিশাল গ্রন্থে দোষ যেটুকু আছে তাহা—"নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষিবাঙ্কঃ।"

প্রবাদ-সংখ্যা—২৬৩, পৃষ্ঠা—১১৬ :

"আগে থাকে উল্লা ভুল্লা পরে হয় উদ্দীন
তলের মহম্মদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন।"

প্রবাদটির কোন টীকা দেওয়া নাই; দেওয়া প্রয়োজন। প্রবাদটির অর্থ এই যে যখন সামান্য অবস্থা থাকে তখন (গ্রাম্য মুসলমানের) নামের বিশেষ সৌষ্ঠব থাকে না—আতাউল্লা, রহমতুল্লা ইত্যাদি নামই থাকে। অবস্থার কিছু উন্নতি হইলে উল্লা, তুল্লা উঠিয়া গিয়া উদ্দীন হয়, যেমন আতাউল্লা আফতাবউদ্দীন হয়; এবং তাহার পরেও অবস্থার আরও উন্নতি হইলে "মহম্মদ আফতাবউদ্দীন" "সেখ আফতাবউদ্দীন মহম্মদ"-এ পরিবর্তিত হয়; অর্থাৎ তলের মহম্মদ উপরে যায়—অথবা পাঠান্তরে "আগের মহম্মদ পিছনে যায়।" কয়েক বৎসর পূর্বে দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্র—৩৮৫, পৃ—১২৬ : "আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ"

টীকায় আছে—একসঙ্গে সিদ্ধ হয় না। ব্যাখ্যাটি ঠিক নহে। আদা কেহ সিদ্ধ করে না। প্রবাদটির অর্থ এই যে, আদা 'সারক' (অর্থাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কারক) এবং কাঁচকলা 'ধারক' (অর্থাৎ কোষ্ঠ বদ্ধকারক) সেইজন্য 'আদায় কাঁচকলায়' অর্থাৎ বিরুদ্ধ সম্পর্ক।

প্র—৫১৮, পৃ—১৩৬ :

"আক্কিয়ে তালা গাঁজাই চোর
ভদ্রক আলার ঘরে সবাই শোর।"

প্রবাদটির কোন টীকা বা ব্যাখ্যা না দেওয়া থাকায় প্রবাদটি সাধারণবোধ্য হয় নাই। প্রবাদটি উড়িয়া-ভাষার একটি প্রবাদ হইতে গৃহীত। মূল প্রবাদটি এই :

"আফিঙ্গিরা চোর গঞ্জিকা ভোল
গুলাপঞ্জিকা ঘরে নিত্য গোল।"

অর্থাৎ আফিংখোর চৌর্যপ্রবণ হয়, গঞ্জিকাসেবী ভোলানাথ এবং যাহারা বিড়ি প্রভৃতি খায় তাহাদের মধ্যে (কে কাহার দিয়াশলাই লইল, ইহা লইয়া) সর্বদাই গণ্ডগোল হইয়া থাকে।

প্র—৬৭৭, পৃ—১৪৯ : "আসল ঘরে মশাল নেই ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া"।

প্রবাদটির মূল পাঠ—"আসল ঘরে চাল নেই ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া" এবং এই পাঠটিই সম্যক প্রযোজ্য; কারণ যেখানে বাসগৃহে চাল (আচ্ছাদন) নাই সেখানে ঢেঁকিশালে চন্দ্রাতপ দেওয়ার হাস্যকরতা ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে।

প্র—৮০৬, পৃ—১৬০ :

"উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।"

মূল গল্পটি দিলে প্রবাদটি বুঝিবার সুবিধা হইত। গল্পটি এই যে এক ব্যক্তি কোন কারণে গ্রামদেবতা গোবিন্দকে খই দিবে মানত করে; পরে মনোরথ সিদ্ধ হইলে মানত পরিশোধ করে না। একদিন সে ধামায় করিয়া খই আনিতেছিল এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় উঠিল এবং প্রবল বায়ুবেগে তাহার ধামার খই উড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন সে এই ক্ষতিটি মানসিক পরিশোধের কাজে লাগাইল এবং বলিতে লাগিল—"উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ"—তাহা হইলেই গোবিন্দকে খই নিবেদন করা হইল। ইহার অনুরূপ প্রবাদ (প্র—৫৩৪০। পৃ—৫৩১) "কাটলে পড়িল কলা গোবিন্দায় নমঃ।" মূল অর্থ এই যে অধিকারচ্যুত সম্পত্তি বা বস্তু দেবতাকে বা সৎকার্যে দান করা।

প্র—৯৪৪, পৃ—১৭২ : "একজন চরকা-কাটুনী তিনজন খি ধরুনী।"

ইহার পাঠান্তরটি দিলে ভাল হইত। পাঠান্তর—"রাজার মা সুতো কাটুনী তিনজন তার খি-ধরুনী।" অর্থাৎ বড় কেহ যখন কোন সাধারণ কাজও করে, তখন সে বহু লোকের সাহায্য পায়, এবং সাধারণ কার্যও একটা অসাধারণতার পর্যায়ে উন্নীত হয়।

প্র—১৮৮৫, পৃ—২৪৭ : "কু-কাটুনী খড়ি খাবার যম।"

টীকা দেওয়া হইয়াছে—১। খড়ি—খাগ, একজাতীয় ইক্ষু। "গোফ উভ কৈল তারা যেন খড়িবন।" (কবিকঙ্কণ), খড়ি শব্দ জ্বালানি কাঠ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়, যথা—"খড়িবেচা হৈয়ে তার খড়ি যে জোগায়" (মাণিকচন্দ্রের গান—গ্রীয়ারসন)।

মূলে ভুল করার জন্য এত উদাহরণ প্রভৃতি সত্ত্বেও প্রবাদটি অবোধ্য রহিয়া গিয়াছে। খড়ি ঠিক একপ্রকার ইক্ষু নহে, একপ্রকার শরজাতীয় গাছ, জলা-জমিতে হয়, এবং ইদানীং বহু স্থলে পাটকাঠির পরিবর্তে পানের বরোজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ প্রবাদের সহিত সে খড়ির কোন সম্পর্ক নাই। এখানে খড়ি অর্থে লিখিবার খড়ি। যাহারা টেকোয় সুতা কাটে তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী ও মধ্যমার দ্বারা টেকোটি ঘুরাইতে হয়, ফলে ওই জায়গায় সুতাটি অঙ্গুলি ও টেকোর সংস্পর্শে আসিয়া ময়লা হয়, তদুপরি টেকো ঘুরাইতে ঘুরাইতে অঙ্গুলি ঘর্মাক্ত হইয়া যায়; সেই জন্য যাহারা টেকোয় সুতা কাটে তাহারা কাছে এক টুকরা খড়ি রাখে এবং মাঝে মাঝে তাহাতে আঙুল ঘষিয়া লয়। আ-কাটুনী বা কু-কাটুনী খড়ি খাবার যম প্রবাদটির অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে অকর্মণ্য ব্যক্তি কাজ করিতে পারে না, কিন্তু তাহার হাতে উপকরণের অযথা অপচয় হয়।

প্র—২২৩৮, পৃ—২৭৬ : "খুচরা কাজের মুজরা নাই।"

টীকায় দেওয়া হইয়াছে—মজুরা—মাফ, ছাড়। টীকাটি ঠিক নহে; এখানে মুজরা শব্দের অর্থ মজুরী, পারিশ্রমিক। প্রবাদটির অর্থ এই যে, বড় কাজ হিসাবের মধ্যে পড়ে। খুচরা কাজ মজুরীর সময়ে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম যথেষ্ট।

প্র—২৩০২ পৃ—২৮১ : "খোঁড়া কি জগন্নাথের সেখো?"

টীকা দেওয়া আছে—সেখো—সাথী, কারণ জগন্নাথ বিগ্রহের হাত পা টুঁটো; টীকাটি ঠিক নহে। সাথী হইতেই 'সেখো' আসিয়াছে কিন্তু এখানে সেখো অর্থে জগন্নাথের সাথী নহে। সেখো অর্থাৎ তীর্থযাত্রীর সঙ্গী। এবং জগন্নাথ অর্থে এখানে জগন্নাথধাম। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত (এবং কচিৎ এখনও), তীর্থযাত্রায় পেশাদার সেখো পাওয়া যাইত, তাহারা অনভিজ্ঞ যাত্রীদের সঙ্গে করিয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে তীর্থভ্রমণ করাইয়া আনিত।

জগন্নাথের সেবো' অর্থাৎ জগন্নাথধাম যাত্রার দাবী। রেল হইবার পূর্বে যখন হাঁটাপথে যাইতে হইত তখনকার দিনে শ্রীক্ষেত্র যাইবার দুর্গম ও দূরপথে খোঁড়ার পক্ষে সখোগিরি করা অসম্ভব। প্রবাদটি ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত।

প্র—২৯৫৩, পৃ—৩৩৬ : "চার চোখে চাওয়া"

টীকা দেওয়া আছে বিবাহের সময় শুভদৃষ্টি। অর্থ তাহা নহে, প্রকৃত অর্থ যে কোন দুইজনের সামনা-সামনি চাওয়া। চলিত কথায় প্রায়ই বলিতে শোনা যায়—"একপাড়ায় থাকি সকাল হলেই চার চোখে চাওয়াচাওয়ি হবে ওঁর সঙ্গে এই সামান্য ব্যাপারে ঝগড়া করি কি করে ?"

প্র—৩২৩০, পৃ—৩৬১ : "ছিল ঢেঁকি হল শূল, কাটতে কাটতে নির্মূল।"

কোন টীকা দেওয়া নাই। ইহার একটি পাঠান্তর আছে—"ছিল ঢেঁকি হল ভুল (তুলা দাঁড়িপাল্লা), কাটতে কাটতে নির্মূল।" অর্থাৎ আনাড়ী ব্যক্তি কোন কিছু তৈয়ারী করিতে গেলে প্রথমে বড় জিনিসকে কাটিতে কাটিতে ছোট করিয়া ফেলে, তারপর একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলে।

প্র—৩৭৪৭, পৃ—৪০৩ : "তবু ত বেহু বাল্লিনি।"

কোন টীকা নাই। মূল গল্পটি দিলে বুঝিবার সুবিধা হইত। গল্পটি গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট কিন্তু এই সংকলনে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট এমন কি অশ্লীল প্রবাদও আছে। গল্পটি এই যে এক মূর্খ গ্রাম্যযুবক শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় তাহার মাতা শ্বশুর-বাড়িতে তাহাকে গ্রাম্যশব্দের পরিবর্তে শুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করিতে শিখাইয়া দেয়। তদনুসারে শ্বশুরালয়ে গিয়া সে "নুনের" পরিবর্তে "লবণ" ও ভাতের পরিবর্তে "অন্ন" বলায় তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী পুলকিতা হইয়া সমাগতা আত্মীয়া ও প্রতিবেশিনীগণকে প্রকাশ্যেই বলিলেন—"দেখেছ জামাই কি সভ্য!" ইহা শুনিয়া জামাতা বলিলেন—"মা-ঠাকরুণ এইতেই আপনার···ফেটে মরলা, তবু ত এখনও (গরুকে) বেহু বলি নি।"

প্র—৩৭৬৭, পৃ—৪০৫ : "তালগাছের আড়াই হাত"

টীকা দেওয়া আছে, অর্থাৎ তালগাছকে একহাত প্রমাণ করিয়া মাপা। যথার্থ অর্থ না করিয়া প্রবাদটির কষ্ট-কল্পিত অর্থ করা হইয়াছে। প্রবাদটির উদ্ধৃতিতেও একটু ভুল আছে। প্রবাদটি হইবে "তালগাছের শেষ আড়াই হাত।" লোক-মুখে সংক্ষিপ্ত হইয়া "তালগাছের আড়াই হাত" দাঁড়াইয়াছে। প্রবাদটির অর্থ এই যে তালগাছের প্রথম দিকটা ওঠা কঠিন নহে, কিন্তু শেষ আড়াই হাত ধারাল কাঁটার মত গোড়াসমেত পাতা থাকায় ওঠা ভয়ানক কঠিন। অর্থাৎ কোনও কাজের প্রথম দিকটা সহজ কিন্তু শেষরক্ষা করাই কঠিন।

প্র—৪২১১, পৃ—৪৪১ : "দুঃসময় হলে পোড়া শোলটাও হাত থেকে পালায়।"

টীকায় আলালের ঘরের দুলাল, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত প্রভৃতি হইতে উদাহরণ দেওয়া আছে, কিন্তু মহাভারতের গল্পটি—রাজা শ্রীবৎসের উপর শনির দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার দুর্দশা, এবং রানী চিন্তার হাত হইতে পোড়া শোলমাছ পালাইবার উপাখ্যানটি দিলে প্রবাদটির ইতিহাস বুঝা যাইত।

প্র—৪৪৫৫, পৃ—৪৬১ : "ন চাষা সজ্জনায়তে"

কোন টীকা নাই। সমগ্র শ্লোকটি দেওয়া উচিত ছিল :

"অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে দোলায়াং যদি গচ্ছতি
তথাপি জাতিমাহাত্ম্যাৎ ন চাষা সজ্জনায়তে।"

প্র—৪৪৬০, পৃ—৪৬১ : "নড়ল ডোঙা ত ডুবল গোড়া"

প্রবাদটি উল্টা লেখা হইয়াছে, হইবে—"নড়ল গোড়া ত ডুবল ডোঙা" সামান্যমাত্র নড়িলেই যে ডোঙা উল্টাইয়া যায় অথবা ডুবিয়া যায় তাহাই লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ। যাঁহারা কখনও ডোঙায় চড়িয়াছেন তাঁহারা রসিকতাটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্র—৪৮৭৬, পৃ—৪৯৪ : "পরে পরেই মড়ক কাটানো"

প্রবাদটির উৎপত্তি যে গল্প হইতে সেটি না দেওয়ায় অর্থবোধ হয় না। গল্পটি এই যে একবার এক গ্রামে ওলাউঠায় মড়ক হইয়াছিল। অবস্থা অনেকটা শান্ত হইলে ভিন্ন গ্রামবাসিনী এক আত্মীয়া এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করে যে মড়কটা তাহাদের কিরূপ কাটিল। বৃদ্ধা তাহাকে উত্তর দেয়—"বড় ছেলের বউটি মারা গিয়াছে, এবং মেজ জামাইটি আসিয়াছিল সেও মারা

গিয়াছে, বাড়ির কাহারও কিছু হয় নাই—যাহাই হউক মড়কটা পরে পরেই কাটানো গিয়াছে। (অর্থ এই যে বধূ পরের মেয়ে, জামাতাও পরের ছেলে।)

প্র—৪৯৮৮, পৃ—৫০২ : "পাঁচে ধরে বত্রিশে খায় আর সকলে রস পায়।"

টীকায় আছে—পাঁচে পূজলে পাথরে···ইত্যাদি ৫০৩৩ দ্রষ্টব্য : "পাথরে পূজিলে পাঁচে পীর হয়ে পড়ে।" "পাঁচে পূজলে পাথরে সেও পীর হয়ে পড়ে।" (হুতোম প্যাঁচার নকশা)

টীকার দ্বারা অর্থবোধ তো হয়ই না উপরন্তু অবান্তর উদাহরণের জন্য ভুল বোঝা হয়। প্রবাদটি অনেকটা ধাঁধার মত। অর্থ এই যে—(খাদ্য) পাঁচ আঙুলে ধরে, বত্রিশ দাঁতে চিবাইয়া খায়, কিন্তু তাহা হইতেই দেহের অবশিষ্ট সকল অংশ রস গ্রহণ করে।

প্র—৪৯১৪, পৃঃ ৫০৩ : "পাঁঠা ছেঁড়াছিঁড়"।

জামাইবাবিকের উদাহরণ দেওয়া আছে কিন্তু প্রবাদটির উৎপত্তি যাহা হইতে তাহা দিলে বুঝিবার সুবিধা হইত। পল্লীগ্রামে বারোয়ারি পূজায় বলি দেওয়া পাঁঠার ভাগ লইয়া যে ঝগড়া হয় তাহা হইতেই প্রবাদটির উৎপত্তি। 'ছেত্তা'র (যে কাটে) প্রাপ্য 'মুড়ি' বা মাথা, পুরোহিতের প্রাপ্য আছে, পূজার উদ্যোক্তাদের ভাগ আছে, অনেকের পুরুষানুক্রমিক বার্ষিক প্রাপ্য ভাগ আছে ; এই সব ব্যাপার লইয়া পাঁঠা ভাগ করিতে করিতে প্রায় কিছুই থাকে না, অথচ এই ব্যাপারে কলহ হয় প্রচুর।

প্র—৫১২৫, পৃঃ ৫১২ : "পীরিত আগুন কাপ রয় না প্রকাশ।

প্রবাদটিতে একটি ভুল আছে, প্রবাদটির ঠিক পাঠ হইবে—

"পীরিত আগুন কাপ রয় না অপ্রকাশ।" অপ্রকাশ শব্দের অ লুপ্ত হইয়া অর্থবোধে অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে।

প্র—৫২৬৮, পৃঃ ৫২৩ : "পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি"। টীকা দেওয়া আছে—পেয়াদার আরাম বা আয়েসের সুযোগ আর। মূলতঃ অর্থ ঠিকই আছে কিন্তু ব্যাখ্যা অভাবে প্রবাদটি ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। মূল প্রবাদটি এই—"ভূতের আবার জন্মদিন, পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি।" সুশীলবাবুর গ্রন্থেই প্রবাদটি এ পরিবর্তিত রূপে আছে—(প্র—৬৩২১, পৃঃ ৬০৭) "ভূ আবার জন্মদিন, পেয়াদার আবার বিয়ে।"

ভূতের জন্মদিন কোনটি? না যেদিন লোকটি ম ভূত হইল—অর্থাৎ একই লোকের মানুষ হিস যেদিন মৃত্যুদিন ভূত হিসাবে সেই দিন জন্মদি কাজেই ভূতের জন্মদিন বলিয়া বিশেষ কোন দিন না তেমনই পেয়াদাকে সর্বত্রই পেয়াদার পোশাকেই যাই হয়, শ্বশুরবাড়ির গ্রাম বলিয়া বিশেষ বেশবাস করিব উপায় নাই ; তাহা ব্যতীত প্রয়োজন হইলে শ্ব বাড়িতেও পত্রবাহক হইয়া যাইতে হইতে পারে শ্বশুরবাড়িতেই সমন ধরাইতে হইতে পারে।

প্র—৫২৫৪, পৃঃ ৫২৩ : "পেঁয়াজ পয়জার দুই হল।"

টীকায় আছে—১। অর্থাৎ জাত যাওয়া ও জু খাওয়া। ২-পা পেঁয়াজও গেল পয়জারও হল। ৩। কেম তোরাপ পেঁয়াজ পয়জার দুই তো হল।—নীলদর্পণ।

এখানেও মূল কাহিনীটি না দেওয়ায় প্রবাদটি ঠি বুঝিতে পারা যায় না। গল্পটি এই যে একজন লো পেঁয়াজ চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ে, এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে যে পেটের দায়ে সে এ কাজ করিয়াছে পঞ্চায়েতের বিচারে এই স্থির হয় যে যদি সে এক সের পেঁয়াজ খাইতে পারে তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, নতুবা তাহাকে বিশ ঘা জুতা খাইতে হইবে। চোর এক সের পেঁয়াজ খাইতে পারিবে বলিল এবং তদনুসারে পেঁয়াজ খাইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি খাইয়াই নাকের জলে চোখের জলে হইয়া আর খাইতে পারিল না। তখন পূর্ব সিদ্ধান্ত মত তাহাকে বিশ ঘা জুতা খাইতে হইল।—অর্থাৎ—পেঁয়াজ পয়জার দুইই হইল।

প্র—৫০৫৮, পৃঃ ৫০২ : "ফুলের দায় ছোটা গলায়"—

টীকায় দেওয়া আছে—ফুলের মধ্যে মালা আর কুটুমের মধ্যে শালা—(১৯১৪ দ্রষ্টব্য)। প্র—১৯১৪, "কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা, গাছের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা।" এত টীকাতেও প্রবাদটির অর্থ বোঝা যায় না। অনুরূপ একটি প্রবাদ (প্র—৫০৬০, পৃঃ ৫০২)—"ফুলের সোহাগে লটার আদর"—টীকায় দেওয়া

হইয়াছে—সটা-ফুলের কেশর। মূল অর্থের জন্ত এটিও বোঝা যায় না।

সটা, ছটা, ছোটা—এগুলির অর্থ হইতেছে সুতার মত আঁশ (কলাগাছের বা অন্তান্ত গাছের) যাহা দিয়া মালা গাঁথা হয়। প্রবাদটির অর্থ এই যে ফুলের খাতিরে সুতার বা ছোটার আদর। স্ত্রীর খাতিরে শাশুড়ী বা শালার, অথবা মেয়ের জন্ত জামাইয়ের আদর করিবার তুলনায় ব্যবহৃত হয়।

প্র—৫৩৭৫, পৃ—৫৩৩—"বউটি ভাল বটে, টৌকনা খেয়ে বাটনা বাটে।"

টীকা দেওয়া আছে—টৌকনা—টোকর বা ঠোকর, আঘাত অর্থে। টীকা অনুসারে অর্থ এই হয় যে বধূটি বড় ভাল, শাশুড়ী ননদ অথবা স্বামীর নিকট মার খাইয়াও সংসারের কাজ করিয়া যায়।

গোল বাধিয়াছে টৌকনা কথাটির অর্থ লইয়া। টৌকনা কথাটি আসিয়াছে টুকিয়া টুকিয়া খাওয়া হইতে (মূলতঃ ঠুকরিয়া খাওয়া বা ঠোকর হইতে—শব্দানুকার) অর্থাৎ টৌকনা অর্থে মুড়ি জলপান প্রভৃতি যাহা টুকিয়া টুকিয়া খাইতে হয়। (তুলনীয় বাকুড়া জেলার ভাষায়—ভিজানটা না খেয়ে—ভিজান অর্থাৎ পান্তা বা ভিজা ভাত) এই প্রকার টুকিয়া খাইবার পাত্রকে 'টুকনী' বলে যাহা হইতে লোকের সমস্ত বাসনপত্র বিক্রয় হইয়া গেলে একেবারে "টুকনী সার" হইয়াছে বলা হয়। এই প্রবাদটি ব্যাজস্তুত ; অর্থ এই যে—বধূটি এমন ভাল (?) যে জলপান খাইয়া তবে গৃহকর্ম আরম্ভ করে। প্রবাদটিতে 'বাটনা বাটে'র স্থলে 'কুটনো কোটে' 'কাটনা কাটে' প্রভৃতি পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

প্র—৭৫৮০, পৃ—১০০ : "রাজার বাড়ি চুরি, হারি কি পারি।"

কোন টীকা নাই ; উৎপত্তির গল্পটি দিলে ভাল হইত। রাজার বাড়িতে রানীর একটি হার চুরি যায়। চুরি ধরিবার জন্ত এক জ্যোতিষী ব্রাহ্মণকে ডাকা হয় ; সে তত কিছু জানে না, লোক ঠকাইয়া খায়। কিন্তু এ রাজবাড়ি। তাই সে ভয় পাইয়া স্বগতোক্তি করিতেছিল—"রাজার বাড়ি চুরি হারি কি পারি।" অর্থাৎ কৃতকার্য হইতে পারিব কি না। এদিকে রাজবাড়ির দুই দাসী হারি ও প্যারী যাহারা হারটি চুরি করিয়াছিল তাহারা ইহা শুনিয়া ভাবিল যে ব্রাহ্মণ তো ঠিক তাহাদের ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা চুপিচুপি ব্রাহ্মণের কাছে গিয়া দোষ স্বীকার করিল। ফলে পুকুর ঘাট হইতে রানীর হার উদ্ধার হয়, এবং ব্রাহ্মণেরও প্রচুর অর্থ ও যশোলাভ হয়। "আন্দাজে ঢিল ফেলা" অর্থে প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

প্র—৭৬১৩, পৃ—১০২ : "রাতারাতি বামনা হইল মহারাজ"।

টীকায় আছে : "বঙ্গে ব্রাহ্মণকে গৌরবে মহারাজ বলা হয়। অর্থটি ঠিক নহে, কারণ তাহাতে রাতারাতি কথাটির অর্থ হয় না। প্রবাদটি সত্যনারায়ণের ব্রতকথা (শঙ্কর আচার্য কৃত) হইতে গৃহীত। সত্যনারায়ণের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণের সহসা অবস্থা ফিরিয়া যাওয়াতে কাঠুরিয়ারা অবাক হইয়া যায়।

"কাষ্ঠ কাটিবারে যায় কাঠুরে সকল
ব্রাহ্মণের বাটী যায় খাইবারে জল।
দেখিয়া বিস্ময় বড় চাষার সমাজ
রাতারাতি ব্রাহ্মণ হইল মহারাজ।"

অদৃষ্ট বা দৈব কৃপায় হঠাৎ বড়লোক হইলে তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

প্র—৭৭৬৬, পৃ—১১৫ : "লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং।"

কোন টীকা দেওয়া নাই।

অনুরূপ প্র—৮৯৯৬। পৃ. ৮১৪ :

"রাজার পুতের হাতী মালীর পুতের ব্যাং
রাজার পুতের রক্তপাত, মালীর পুতের ঠ্যাং।"

দুইটি প্রবাদই এক গল্প হইতে উদ্ভূত। এক রাজার পুত্র ও মালীর পুত্র (পাঠান্তর কামারের) একই সময় জন্মগ্রহণ করে ; তদনুসারে উভয়ের কোষ্ঠিফল একই হয়। একদিনের ফল ছিল প্রাপ্তিলাভ ; সেদিন রাজার পুত্রকে তাহার মাতুল একটি হস্তী উপহার দেন। মালী আশা করিয়া আছে যে তাহার পুত্র কি পায়। সন্ধ্যাবেলা মালীর ছেলে একটি ব্যাঙের পায়ে সুতা বাঁধিয়া টানিয়া আনিতেছে দেখা গেল। অপর একদিনের কোষ্ঠিফল ছিল অঙ্গহানি। সেদিন রাজপুরীতে সকলে ভটস্থ। কোন অস্ত্র রাজপুত্রের নিকট লইয়া যাওয়া নিষেধ। তবু

া কাটিতে গিয়া রাজপুত্রের মধ্যে কোণটা কাটিয়া গিয়া
ক্তপাত হইল। রাণীও সেদিন ছেলেকে কোন বাবাম
ামনে হাত দিতে দেয় নাই। হঠাৎ প্রাচীরের একটা
াংশ ছেলের পায়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল এবং একটি
া একেবারে বাদ গেল। তাই প্রবাদটির অর্থ এই যে
া বেলা বড়লোকে বেশী পায় কিন্তু ক্ষতির বেলা
িদের ক্ষতিই বেশী হয়।

প্র—৭৮৫১, পৃ—৭২২ : "পত্রায় রুধির ফুরিয়ে যাওয়া"

টীকায় দেওয়া আছে—অর্থাৎ অপব্যয়ে টাকা ফুরাইয়া
াওয়া। প্রবাদটিতে 'পত্রায় রুধির' কথাটির ব্যাখ্যা
াকিলে ভাল হইত। কালীপূজায় বলির পর একটা
াটির পত্রায় সামান্য রক্ত ও এক টুকরা মাংস (সমাংস
ধির) নিবেদন করা হয়। মাটির পত্রা ও পরিমাণ অল্প
লিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই উহা শুকাইয়া যায়। তাই
বাদটির অর্থ—পরিমিত সম্পদ ফুরাইয়া যাওয়া।
অপব্যয়েই হউক আর প্রয়োজনেই হউক।)

প্র—৭৮৮২, পৃ. ৭২৫ : "শাপে বর।"

টীকায় ঈশ্বর গুপ্ত হইতে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত পর্যন্ত বহু
াহরণ দেওয়া আছে। কেবল প্রবাদটির উৎপত্তি যাহা
ইতে রামায়ণের সেই উপাখ্যানটি দেওয়া হয় নাই। রাজা
শরথ মৃগভ্রমে মুনিকুমার সিন্ধুকে বধ করিলে সিন্ধুর পিতা
ন্ধমুনি দশরথকে শাপ দেন যে তিনি পুত্রের অদর্শনজনিত
ঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। রাজা দশরথ তখনও
পুত্রক তাই তাঁহার 'শাপে বর' হইল, কারণ পুত্র হইলে
বে তো তাহার অদর্শনজনিত দুঃখ।

প্র—৭৯৫৩, পৃ. ৭৩১ : প্রবাদটির অর্থ ঠিক দেওয়া
য় নাই, অথচ এ প্রবন্ধে তাহা লিখিতেও পারিতেছি না;
ারণ প্রবাদটি অকথ্যরূপে অশ্লীল। উহা ভবিষ্যৎ
ংস্করণে পরিত্যাজ্য।

প্র—৮০২২, পৃ. ৭৩৬ : "শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়"
। "শ্রাদ্ধ গড়ান"

টীকায় আছে—শ্রাদ্ধের ভোজের সময় দেওয়াটি
াত্মীয়র গণ্ডগোল ও গালাগালিতে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান
ারামারিতে পরিণত হয়। বহু উদাহরণ দেওয়া
াছে কিন্তু মূল গল্পটি দেওয়া নাই বলিয়া অর্থ পরিষ্কার
য় নাই। গড়ান কথাটি চাকা বা গাড়িতেই প্রযুক্ত হয়,
াতে প্রযুক্ত হইল কেন?

প্রবাদটির উৎপত্তি এক নির্বোধ যজমান ও কোপন-
স্বভাব পুরোহিতের গল্প হইতে। শ্রাদ্ধ করাইতে বসিয়া
পুরোহিত বলিলেন, "বল নমঃ", যজমান বলিল, "বল নমঃ"
পুরোহিত বলিলেন, "বল নমঃ নয় শুধু নমঃ", যজমান বলিল
"বল নমঃ নয় শুধু নমঃ"। পুরোহিত রাগিয়া উঠিয়া
বলিলেন, "ওরে অনড়্বান, শুধু নমঃ"। যজমান পুনরায়
তাহাই বলিল। এবার পুরোহিত ক্রোধান্ধ হইয়া যজমানকে
এক চপেটাঘাত করিলেন। যজমানকে পূর্বে শিখানো
হইয়াছে যে পুরোহিত মহাশয় যাহা বলিবেন ও করিবেন
তাহাই বলিতে ও করিতে হইবে। অতএব সেও চড়টা
ফিরাইয়া দিল। এইরূপে যজমান পুরোহিতে মল্লযুদ্ধের
মত হস্তাহস্তি করিতে করিতে দাওয়া হইতে উঠানে
গড়াইয়া পড়িল, এবং যখন লাউমাচার নীচে পর্যন্ত
গড়াইয়াছে তখন যজমানের বৃদ্ধা পিসি বলিলেন—"শ্রাদ্ধ
কতদূর গড়াবে আগে বলে রাখলে গোবর দিয়ে সবটা
নিকিয়ে রাখতাম, লাউমাচার তলাটা নোংরা।"

প্র—৮১৯৮, পৃ. ৭৯১ :

"হিংসা সবাই করতে পারে
কেবল পুত বিয়তে নারে।"

পাঠটি ভুল আছে। প্রকৃত পাঠ হইবে—"হিংসায়
সব করতে পারে, কেবল পুত বিয়তে নারে।" অর্থাৎ
সপত্নী কিংবা জাতির প্রতি হিংসার (ঈর্ষা, অসূয়া
বশবর্তী হইয়া আর সব করা যায়, কিন্তু পুত্রবতী হওয়া
যায় না—এ ব্যাপারে অদৃষ্টের কৃপা ছাড়া গতি নাই।

পরিশেষে আবার বলিতেছি যে ডাঃ দের বিরাট
গ্রন্থের দোষানুসন্ধান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। প্রবা
সংগ্রহ করিবার সময় যাহাদের মুখ হইতে শোনা তাহাদে
ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে, ফলে তাহাদের ভ্রান্তি ব
অপব্যাখ্যা গ্রন্থে সংক্রামিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক
তাই এ গ্রন্থে যে সামান্য ত্রুটিগুলি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে
সেগুলি সম্বন্ধে লিখিলাম। যদি ভবিষ্যৎ সংস্করণে গ্রন্থ
পরিমার্জিত হইয়া নির্ভুল ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় তাহা হইলে
আমার শ্রম সফল হইয়াছে বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে
করিব। আর একটি কথা,—এই বিরাট সংগ্রহে কতকগুলি
অতিপ্রচলিত প্রবাদ দেওয়া হয় নাই, সেগুলি সন্নিবি
হইলে গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ কোষগ্রন্থ হয়।

খোলা জানলা

সুশীলকুমার নাগ

আশ্চর্য। আমি কী করে এত অসভ্য হলাম তা আমি এখনও বুঝতে পারছি না। আমার শিক্ষা আর রুচি সবকিছুই আমি গলা টিপে মেরেছি। আজ আমি একটা পশুর মত হয়ে গেছি। একটা কুৎসিত আক্রোশে আজ আমি মীরাকে আঘাত করেছি। মীরা জানে না, জেনেশুনে আর ইচ্ছে করেই আমি ওকে আঘাত করেছি। নিজের হিংস্রতায় আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু তবুও, এখন আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি, পাশবিক হিংস্রতায় আমিও একটা পশু হয়ে গেছি।

ওটুকু লিখেই ডায়েরীর পাতাটা বন্ধ করে রাখল অভিজিৎ। অবসন্ন হয়ে পড়ল সে ওটুকু লিখতেই। মাথাটা ভার ভার লাগছে। দপদপ করছে কানের দু পাশের শিরাগুলো। কলমটা বন্ধ করে রেখে ডায়েরীটা ডেস্কের ভেতরে রাখল। টেবল-ল্যাম্পটাকে সরিয়ে রাখল একটু পেছন দিকে। ইচ্ছে করলে নিভিয়েও দিতে পারত বাতিটাকে, কিন্তু তা দিল না। ল্যাম্প-কভারটাকে একটু ঘুরিয়ে রাখল মাত্র। আলোটুকু আড়াল করল সে।

আলো সহ্য করতে পারছে না অভিজিৎ। চোখে এসে লাগছে বড়। কটকট করছিল চোখ দুটো। মাথার দপদপানিটাও কেবলই বেড়ে চলছিল। আলো যেন ছুঁচ হয়ে বিঁধছিল মাথার ভেতর। খোঁচা মারছিল মস্তিষ্কের কোষে কোষে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল মাথাটাতে। আলো অসহ্য মনে হচ্ছিল। আলো—শুধুই আলো নয়, অভিজিৎ মনে মনে ভাবল। আলোর একটা আঘাত করারও ক্ষমতা আছে। যন্ত্রণা দেবার ক্ষমতা। পলাতকী মনকে ক্রমাগত তাড়া করতে থাকে আলোটা। যেখানে যত অন্ধকারেই গিয়ে লুকোতে চাও, দেখবে সে সেখানেই তার সত্য রূপটা তুলে ধরেছে। বড় বেশী নির্মম ভঙ্গীতে সে তোমাকে বলবে, সত্য ওই অন্ধকারে লুকিয়ে নেই। এই দেখ, সত্য আমার এই আলোকে। চোখ মেলে দেখ একে। চিনে নাও ভাল করে।

কিন্তু অভিজিৎ এখন তা চায় না। চায় না আলোটা ওর চোখের সামনে দপদপ করে জ্বলুক। সত্যের সামনে ঝিলমিল করে হাসুক। তাই সে আলোটাকে আড়াল করে দিল। একটু অন্ধকারে বসবে সে। নিজেকে নিয়ে একটু গোপনে বসবে। একান্তে নিজেকে নিজে দেখবে। আজ সে নিজেই নিজের পরীক্ষক হতে চায়। বিধাতার মত নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করবে নিজেকে। নিজের প্রতিটি আচরণকে। আর এমনই একটা মানসিক অবস্থার জন্য অন্ধকারই ভাল—আলো নয়।

না, ঠিক তাও নয়। অন্ধকারে মনটা কেমন যেন অবশ হয়ে পড়ে। চিন্তাশক্তি সহজেই হার মেনে যায়। জমাট অন্ধকারের মতই জমে যায় চিন্তাটাও। খাত হারিয়ে ফেলে। অন্ধকারের শুরুটাও অন্ধ, শেষটাও তাই। ওতে কোন মীমাংসার সীমান্তে পৌঁছনো যায় না।

তা ছাড়া, কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব থাকে মনে। একটা অসহায়তায় অবশ হয়ে যায় মনটা।

তার চাইতে অভিজিৎ মনে মনে ঠিক করল, সে আলোতেও থাকবে না, অন্ধকারেও না। তাই সে বাতিটা একেবারে নিভিয়ে দিল না, ঘুরিয়ে রাখল। সরিয়ে রাখল একটু দূরে। যাতে আলোর তীব্রতাটা চোখে না লাগে। আলো দেখলেই মনকে ঢেকে রাখার একটা ঝোঁক থাকে মানুষের। আলোতে আসার আগে তাই সে নিজেকে বহু যত্নে আড়াল করে নেয় নিজের আসল চেহারাটাকে, নির্দোষ হয়ে বাইরে বের হয় সে।

কিন্তু সেটা ভুল চেহারা। নকল মানুষ সেটা। তা না হলে অভিজিতের মত একটা মানুষ কি করে এমন একটা কাজ করল। যে কাজের জন্য নিজেকে তার পশুর মত মনে হচ্ছে। একটা জঘন্য পাশবিকতার রূপ যেন। কী বিকৃত রুচির মনটা ওর। কুৎসিত। কদাকার ওর মনের চেহারাটা। তাই সে ওর মানসিক বিকৃতির বশেই নির্মমভাবে আঘাত করেছে মীরাকে। মীরার

সুন্দর নিটোল শরীরটাকে এক কুৎসিত উল্লাসে ক্ষতবিক্ষত করেছে।

অথচ নীরা ওর কোন ক্ষতিই এখন করে নি। একটু আগেও সে বুঝতে পারে নি যে, অভিজিৎ নামে ওর ভালবাসার স্বামীটি ওকে তীব্রভাবে আঘাত করার জন্য এক বিশ্রী চক্রান্ত করেছে মনে মনে। এবং শেষ পর্যন্ত সে তা করেওছে। নীরার সম্পূর্ণ অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে অভিজিতের ঘৃণ্য চক্রান্তটা।

সন্ধ্যার দিকে একটু বাইরে বেরোবে বলে প্রস্তুত হচ্ছিল অভিজিৎ। জানত সে, এখন বেরনো চলে না। শরীরটা ওর কদিন থেকেই খারাপ যাচ্ছে। রোজই রাতের দিকে একটু জ্বর জ্বর হয়। খাওয়াতে তেমন রুচি নেই। চোখ দুটো গর্তে ঢুকে যাচ্ছে দিনকে দিন।

ডাক্তার দেখানো হয়েছে। ওষুধের ব্যবস্থাও। ওর এই শরীরে ঠাণ্ডা লাগানো বারণ। এ শরীরে ঠাণ্ডা লাগানো খুবই খারাপ। কিসের থেকে কী হয় বলা যায় না কিছুই। তাই কদিন থেকে সন্ধ্যার পর আর বেরোয় না অভিজিৎ। ঘরে বসে বইটই পড়ে। গল্প করে একটু-আধটু নীরার সঙ্গে। কিন্তু যেই বিনায়ক আসে অমনি ওর কথা বন্ধ হয়ে যায়। বিনায়কের সামনে কেমন যেন আর মন খুলে কথা কইতে পারে না সে।

অথচ এই বিনায়ক অভিজিতেরই বাল্যবন্ধু। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুজনে। অভিজিৎ শান্ত স্বভাবের ছেলে। চিরকালই গণ্ডগোল আর হল্লোড় থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখত নিজেকে। খেলাধুলার আসরটাকে ও চিরদিনই দূর থেকে দেখে এসেছে। তাই পরবর্তী জীবনে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে বইয়ের পাতায়।

কিন্তু বিনায়ক তেমনি ছেলেবেলা থেকেই বইটাকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখে খেলাধুলার আসরে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বয়স হলে বিদ্যা খানিকটা হয়েছে বটে কিন্তু অভিজিতের তুলনায় তা নেহাতই নগণ্য, তবু এর জন্য ওর মনে কোন ক্ষোভ নেই। অভিজিৎ ওকে এ নিয়ে আগে অনেক বলেছে। কিন্তু ওর ভ্রুক্ষেপ নেই। একটুও লজ্জা না পেয়ে স্পষ্টই বলত, দেখ্ অভি, এই বিদ্যাই বল্ আর অর্থই বল্, সব এই শরীরটার জন্য। এটাকে শক্ত করে তুলতে পারলে তবেই ওগুলোর সদ্ব্যবহার হবে। নইলে পঙ্গু শরীরে বিদ্যাটাও পঙ্গু হয়ে থাকবে। অর্থ শুধু চিকিৎসা খাতেই যাবে। কাজ নেই আমার অমন বিদ্যাচর্চা করে। তোদের বিদ্যা তোদেরই থাক্। অভিজিৎও ওকে পাল্টা আক্রমণ করেছে। বলেছে, শুধু শরীরের জোর নিয়ে ষাঁড়ের চলে, মানুষের চলে কি? বিদ্যাই মানুষের মনে জোর আনে।

ওই কথার জবাবে বিনায়ক বলেছে, দেখ্, তোর সঙ্গে পণ্ডিতী তর্কে আমি পারব না। কিন্তু একটু জোর দিয়েই বলব যে, মানুষের শরীরে ষাঁড়ের মত জোরের দরকার নাও থাকতে পারে কিন্তু মানুষের মত জোর থাকা চাই নিশ্চয়ই। তা নইলে মানুষটা কেঁচোর মত হয়ে যায়। ওটা তখন শুধুই একটা ওজনে-ভারি বস্তু হয় মাত্র। এ ছাড়া আর কোন কাজেই তা লাগে না।

বেশ বেশ, তুই তোর শরীর নিয়েই বেঁচে থাক্। আমাকে আর জ্বালাসনে ভাই।

প্রসঙ্গটা বন্ধ করতে চেয়েছে অভিজিৎ নিজেই। জানত, কোন যুক্তি দিয়েই বোঝানো যাবে না ওকে।

ঠাট্টা করছিস বটে, কিন্তু একদিন তুই নিজেই বুঝবি ওই শরীটাকে বাদ দিয়ে শত বুদ্ধির জট পাকিয়েও বাঁচা যায় না কোনমতে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝব ভাই, বুঝব। এখন তুই থাম্ তো।

থেমেছিল বিনায়ক। প্রসঙ্গটা বন্ধ হয়েছিল তখনকার মত। স্বস্তি পেয়েছিল অভিজিৎ। স্বস্তিতেই ছিল অনেক—অনেক দিন। বোধ করি কয়েকটা বছর। কেন না তার কয়েকদিন পরেই একটা চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যায় বিনায়ক। খেলাধুলার জন্যই ওর চাকরি। সাহেবের খুব খাতিরের লোক বিনায়ক। বেশ আছে সে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, খেলা করছে। দিনের ভিতর একবার গিয়ে অফিসে দেখা দিয়ে আসছে। বাস্, ওই-ই ওর চাকরি। এ সব সে জানিয়েছিল অভিজিৎকে চিঠিতে।

তারপর একদিন জানাল, আগের কাজটা সে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে বাঙ্গালোরে। আগেকার কোম্পানির সাহেবের সঙ্গে কি একটা ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল ওর। কথা কাটাকাটি থেকে মারামারি। বাস্, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। নতুন কোম্পানি আরও ভাল, আর বেশী মাইনের প্রতিশ্রুতি সেখানে।

কিন্তু সেটাও বেশীদিন টেকে নি। সেখানেও কি এক গণ্ডগোল। আবার অন্যত্র। এমনি করে পাঁচটা বছরের মধ্যে পাঁচ বার কাজ বদলে হঠাৎ যেন আবার কোথায় চলে গিয়েছিল বিনায়ক। বছরখানেক ওর আর কোন খবর পায় নি অভিজিৎ। কোথায় যে উধাও হয়ে গিয়েছিল ছেলেটা—দেখা নেই সাত বছর যাবৎ।

হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে। দেখাটা এতই আকস্মিক যে, প্রথমে ওকে চিনতেই পারে নি অভিজিৎ। চেনা সম্ভবও ছিল না। এই পরিবেশে এমন সময় যে ওকে দেখতে পাবে, তা সে সুস্থ মাথায় কল্পনাই করতে পারে না। অভিজিতের ধারণা, কেউ তা পারত না।

কেন না, সেদিন আলো-ঝলমল বিরাট শামিয়ানার নীচে বসে ও আর নীরা এবং আরও সহস্র লোক যখন উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল, তখন কে জানত, এর চেয়েও আরও কোন বিরাট উত্তেজনা অপেক্ষা করছে।

তাই বিনায়ককে দেখার পরও অভিজিৎ কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না যে, সে যা দেখছে তা সত্যি কি না। সাত বছর পর তার আবাল্য বন্ধু বিনায়ককে সে ট্র্যাপিজে দোল খেতে দেখছে—এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না অভিজিৎ।

কিন্তু তবু তা সত্যি ছিল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সে ট্র্যাপিজের দিকে তাকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে তার পাশে বসা নীরাকে পর্যন্ত বলতে পারে নি ওর কথাটা।

যখন বলল, তখন নীরাও অবাক। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল ওরও। একটা অসহ্য উত্তেজনায় ওর চোখও অস্থির হয়ে উঠেছিল। ওদের, অর্থাৎ ওর স্বামীর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওই উঁচু ট্র্যাপিজে পরম নিশ্চিন্ততায় দোল খাচ্ছে। লাফাচ্ছে এখান থেকে সেখানে। এটা ছেড়ে ওটাকে ধরছে নির্ভুল হিসাবে। আবার শুধু পা খানা ট্র্যাপিজে আটকে শরীরটাকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে নীচে। অন্য প্রান্তের ট্র্যাপিজের মেয়েটা হঠাৎ নিজের জায়গা ছেড়ে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। দুজনেই ঝুলছে। একজনের কোন অবলম্বন নেই। আর একজন শুধু পায়ের পাতাটুকুর ভরসায় ঝুলছে। কখন কী হয় কে জানে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায় সকলের।

তার ওপরে আবার যদি জানা যায়, ওই দুঃসাহসী লোকটা তাদেরই অতিপরিচিত একজন, তো কেই বা অসহ্য আনন্দে বিস্মিত না হয়। বিস্মিত নীরাও হয়েছিল। বলেছিল, যাঃ, ও লোক কক্ষনো তোমার সে বন্ধু নয়।

অভিজিৎ বলেছিল, বেশ, খেলা শেষ হয়ে গেলেই দেখতে পাবে। আর শেষ পর্যন্ত অভিজিৎ যখন সত্যি সত্যি ওকে ডেকে নিয়ে এল বাইরে তখন বিশ্বাস নীরার হয়েছিল বটে, তবু কি এক চাপা উত্তেজনায় তখনও ওর চোখ দুটো চকচক করছিল। দুই বন্ধুর চোখেও পুলকের বিচ্ছুরণ।

কিন্তু সেই পুলকের আলোই যে কী করে ধীরে ধীরে প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হল তা ভেবে আজ অবাক হয়ে যাচ্ছে অভিজিৎ। অবাক হচ্ছে নিজের আজকের চেহারাটা দেখে।

* * *

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ হল। বোধ হয় নিত্যকালী নীচে নামছে। নীরার কি জ্ঞান হয়েছে এতক্ষণে? নাকি আবার গরম জল আনতে যাচ্ছে? সেঁক দিতে বলেছে ডাক্তার। কোমরে নাকি বেশ চোট লেগেছে। কপালের পাশটা বেশ খানিকটা কেটেছে। না, ঠিক কাটে নি, থেঁতলে গেছে।

চিন্তাটাকে আবার ঠিক করে ভাঁজ করে নিল অভিজিৎ। এখন ওর মনে হচ্ছে, থেঁতলে গেছে আর থেঁতলে দেওয়া হয়েছে—কথা দুটোতে তফাত আছে ঢের। একটার অর্থ হচ্ছে, ব্যাপারটা আকস্মিক ভাবে হয়েছে। আর একটার অর্থ, একটা চক্রান্তের খেলা। কেউ একটা চক্রান্ত করেছিল কাউকে থেঁতলে দেবে, আঘাত করবে সম্পূর্ণ অসহায় মুহূর্তে। কে সেই চক্রান্তকারী? অভিজিৎ নামের এই সভ্য মার্জিত ভদ্রলোকটি নাকি! এই নিরীহ লোকটিই নাকি তার স্ত্রীকে আঘাত করবার এক জঘন্য মতলব করেছিল? কি আশ্চর্য!

হঠাৎ কেমন একটা অস্বস্তিকর গরম বোধ হল অভিজিতের। আবহাওয়াটা কেমন যেন অস্বাস্থ্যকর।

সত্যিই তো, আজকের আবহাওয়ার খবরটা তো আজ দেখে নি সে। কি লিখেছিল সেখানে? সন্ধ্যার পর একটা ভ্যাপসা গরমের কথা উল্লেখ ছিল কি।

কি জানি, কি লিখেছে। অভিজিৎ আবহাওয়া প্রসঙ্গ বাদ দিল। যত সব বাজে স্পেকুলেশন খবরের কাগজওয়ালাদের। যখন বলবে, যেদিনই বলবে, আজ আবহাওয়া বেশ ভাল থাকবে সেদিনই অভিজিৎ দেখেছে নির্ঘাত বৃষ্টি নেমেছে কিংবা ঝড় উঠেছে। একেবারে বোগাস খবর।

তবু অভিজিৎ হাত বাড়িয়ে জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিল। একটু হাওয়া আসতেও পারে। মাথাটা ঠাণ্ডা হবে তাহলে। চিন্তা করতে পারবে স্থিতধী অধ্যাপক অভিজিৎ রায়। পরিষ্কার আলো বাতাস ছাড়া চিন্তাও করা যায় না ভালভাবে।

তা নইলে অভিজিৎ ভেবেছিল, নিত্যকালীকে ডেকে নীরার খবরটা নেয়। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। এলোমেলো চিন্তায় আসল কথাটাই ভুলে গেল।

আচ্ছা, আমি নিজেই তো গিয়ে দেখে আসতে পারি, নীরা এখন কেমন আছে? তা না করে এখানে বসে বসে ভাবছি কেন? অভিজিৎ নতুন করে ভাবল। এ এক আচ্ছা বোকামি যা হোক। অনর্থক দুশ্চিন্তায় ভুগছি। কিন্তু তবু যেতে পারল না সে। জানে পাশের ঘরে নীরা শুয়ে আছে। তবুও ওই ঘরটুকু পর্যন্ত যেতে পারল না সে। এ দেওয়ালটার ওপারে কি করে যাবে সে? এ যে ইট চুন সুরকির দেওয়ালই নয়। অভিজিৎ নামের এক ভদ্রবেশী স্বামীর যত জঘন্যতা আর কদর্যতার সে দেওয়াল আরও কঠিন, আরও বেশী শক্ত।

আচ্ছা, নীরা কি জ্ঞান ফিরে পেলেই বুঝতে পারবে কেন অভিজিৎ ওকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল? নাকি তখনকার মতই অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে শুধু? অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে ওর দিকে? বুঝতে চেষ্টা করবে, কারণটা কি?

কিন্তু চেষ্টা করেও কিছুই বুঝতে পারবে না নীরা। কোনদিনই বুঝতে পারবে না, এই শিবতুল্য মানুষটির মধ্যেই কী করে একটা শয়তান শুঁয়োপোকা দিন দিন বড় হচ্ছিল। বাড়ছিল পোকাটা। বিষও বাড়ছিল ততই। একদিন তাই কামড়ে দিল।

তবে বিশ্বাস কর নীরা, তোমাকে আঘাত করাটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। আমি শুধু চেয়েছিলাম তোমার ওই নিটোল পুষ্ট শরীরটাকে একবারের জন্য একটু কাবু করতে। শুধু মাত্র একটিবারের জন্যে তোমার শারীর-শক্তির পরাভব—তোমার যে শরীরটাকে আমি খুবই ভালবাসতাম। আবার ভয়ও করতাম। ভয় করতাম, কেন না তোমার শরীরটা আমার তুলনায় অনেক বেশী শক্ত আর সতেজ ছিল। যৌবনের রসে তার প্রতিটি স্তর অসম্ভব রকমের পুষ্ট ছিল। রসাল ছিল তোমার দেহ-ভাণ্ড।

চিন্তা নয়, মনে মনে নীরার সঙ্গে কথাই বলে চলেছে অভিজিৎ। যেন নীরা ওর পাশের চেয়ারটাতেই বসে আছে। শুনছে কান পেতে ওর অস্ফুট যত কথা—ওর মনের কথা। যেমন আগে শুনত ওর কাছ থেকে পৃথিবীর নানা দেশের সব বিখ্যাত লোকদের কথা। বিরাট জীবন আর বিখ্যাত জীবনী। জীবনী নয়, এক একটা বিচিত্র নাটক যেন। কথায় কথায় সেই লোকগুলো তখনকার মত যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। বক্তা আর শ্রোতা দুজনেই যেন দেখতে পেত তাঁদের। শুনতে পেত তাঁদের ছায়া-মিছিলের কথা।

অভিজিতের কথার শেষে একটি মৃদু দীর্ঘতর নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করত নীরা, প্রায়ই তুমি এঁদের কথা বলো। এঁদের অমর প্রাণকে চিন্তা দিয়ে আর অনুভূতি দিয়ে ছুঁতে পার না অভি?

অভিজিৎও নীরার গভীর-গম্ভীর প্রশ্নের উত্তরে তেমনি করেই বলত, ঠিক চিন্তা দিয়ে ছোঁয়া নয় নীরা, এক-একসময় আমার মনে হয়, আমিও যেন আর আমি নেই। ওঁদেরই সঙ্গে মিশে গেছি। ওঁদেরই মত অশরীরী হয়ে গেছি। আর তাই ওঁদের অতৃপ্ত আত্মার অস্ফুট গুঞ্জন তুলছি।

বলতে বলতে নিজেই হঠাৎ থেমে যেত অভিজিৎ। সম্বিৎ ফিরে পেত যেন। আর তার পরই একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বলত, হুঁ, বড় বেশী রোমান্টিক শোনাচ্ছে আমার কথাগুলো, তাই না নীরা?

নীরা কিছুমাত্র হালকা সুর না মিশিয়েই বলত, কই, আমার তো তেমন কিছু মনে হয় নি। বরং ভালই লাগছিল তোমার সহজ সরল কথাগুলো শুনতে। আচ্ছা অভি, নিজের মানসিকতার সরল অভিব্যক্তিকেই কি তোমরা রোমান্টিসিজম বল?

কেন বল তো ?—ছোট্ট প্রশ্ন করত অভিজিৎ।

এমনিই জানতে চাইছি।—নীরার সংক্ষিপ্ত জবাব।

জানতে তো চাইছ, কিন্তু এত গম্ভীর হয়ে গেছ কেন ?

মনে মনে প্রসঙ্গটা বদলানোর জন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ত অভিজিৎ। জানত, এতে চটে যাবে নীরা। আর ওর ওই চটে যাওয়ার ভঙ্গীটা দেখতে খুব ভাল লাগত অভিজিতের। তাই বলত ওরকম পাশ-কাটানো কথা।

আর শেষ পর্যন্ত নীরা ঠিকই চটে যেত। বলত, এই তোমার এক বিশ্রী দোষ অভি। কিছু জানতে চাইলে কক্ষনো তুমি সোজা করে কিছু বলবে না। আমি জানি, তোমার সব কথা আমি বুঝি না। বুঝতে পারবও না। তাই তুমি আমায় তোমার অনেক কথাই বল না। আর সেজন্যেই তো আমার ভয়, তোমার মনের নাগাল হয়তো আমি কোনদিনই পাব না।

বলতে বলতে সত্যি গম্ভীর হয়ে যেত নীরা। আর ওর অবস্থা দেখে ওর মনটাকে একটু হালকা করার জন্যে অভিজিৎ কথায় সহজ চপল সুর মেশাত।

বলত, মনটা তো আর একটা পাকা আম বা ডাঁসা পেয়ারা নয় নীরা যে হাত বাড়িয়েই তাকে মুঠোর নাগালে আনবে ? হাত বাড়ালে মন পাওয়া যায় না, মন বাড়িয়েই মনকে ধরতে হয়।

বুঝি না তোমার ওসব বড় বড় কথা।—ঝাঁজের সঙ্গেই উত্তর দিত নীরা।

কিন্তু আজ এ মুহূর্তে আর সেসব কিছু নয়। এখন এই প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে অভিজিৎ যে অস্ফুট কথা বলছে, সেসব কথায় চটবে না নীরা। মুখ গম্ভীর করবে না শুনে। কিংবা হয়তো শুনতেই পাচ্ছে না সে। আর কোনদিনই হয়তো ওরকমভাবে কথা বলতে পারবে না ওরা—অভিজিৎ মনে মনে ভাবল। আর পারবে না আগের মত সহজ সুরে কথা বলতে। কারণে অকারণে হাসি-ঠাট্টা করতে।

একটা ব্যবধানের পর্দা ঝুলবে দুজনের মধ্যে। একটা অদেখা প্রাচীর। সংকোচের দেওয়াল। একটা পাপ-বোধের সংকোচ।

যদিও অভিজিৎ নিশ্চিতরূপেই জানে, নীরা ওর পাপ-চক্রান্তটার কথা কিছুই জানে না এখনও। টের পায় নি ওর মনের কুৎসিত মতলবটার কথা। হয়তো ঘুণাক্ষরে সন্দেহও করতে পারবে না ওকে।

শুধু ভাববে, অভিজিৎ নামের এই অতি-শিক্ষিত অতি-সুরুচির লোকটা হঠাৎ একদিন খেপে উঠেছিল তার স্ত্রীর ওপর। ওদের বিবাহিত জীবনের তিন তিনটে বছরের মধ্যে যা হয় নি, একদিন আকস্মিকভাবে তাই হল। আচমকা একটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিল তাকে সিঁড়ি থেকে। নীচে পড়ে গিয়েছিল সে। কেটে গিয়েছিল তার কপালের বাঁ পাশটা। কোমরে চোট লেগেছিল খুব। অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিল সে ব্যথার চোটে। ব্যস্, তার বেশী আর কিছু নয়। কাটা দাগ মিলিয়ে যাবে একদিন। কোমরের ব্যথাও চিরদিন থাকবে না। তাই আবার আগের মত হয়ে যাবে সে। সহজ আর সুন্দর হবে। স্বামীর ওটুকু দোষ কোন্ স্ত্রীই বা মনে করে রাখে চিরকাল! স্ত্রী হয়তো মনে রাখে না, কিংবা রাখবে না। কিন্তু স্বামী ? সে কি ভুলতে পারবে কোনদিন ? ক্ষমা করতে পারবে নিজের কুটিল চক্রান্তটাকে ?

তা পারবে বলে মনে হয় না অভিজিতের। কেন না, অপরাধটা যদি সে সহজভাবে করত তাহলে হয়তো দুদিন পরেই তা মিটে যেত। শেষ হয়ে যেত অপরাধ-পর্ব। কিন্তু তা হয় নি বলেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না সে। অপরাধটা গোপন বলেই তার মীমাংসা হবে না কখনও।

গোপনতার জ্বালাই এই। ওপর থেকে হাত বুলিয়ে তাকে ছোঁয়া যাবে না। বোঝা যাবে না একটুও আসলে সে আছে কি নেই। তার অস্তিত্বের একটু সাড়াও পাওয়া যাবে না কোনমতে। বরং যতই হাত বাড়াবে তাকে ধরতে ততই সে আরও গভীরে চলে যাবে। তল থেকে অতলে। অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে। আর তোমার বিবেকের অসতর্ক মুহূর্তে সে মাথা ঠেলে উঠবে। ছোবল মারবে তোমার বাইরের মনকে অন্ধকার থেকে। ওর আকস্মিকতায় আর বিষের জ্বালায় দিশেহারা হয়ে যাবে তুমি। অবাক হয়ে যাবে ভেবে তোমার ভেতরে এত বিষ কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন ? কেমন করে সংগ্রহ করেছ এ বিষ ?

অবাক হচ্ছে অভিজিৎও। চিরকালই সে ধীরস্থির

প্রকৃতির লোক। যা কিছু করে, ভেবেচিন্তেই করে। কিন্তু এরকম চিন্তা তো সে আগে কোনদিনও করে নি! দর্শনের কত জটিল তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে সে, কিন্তু জীবনের এই সহজ দিকটার কথা তো ভেবে দেখে নি কখনও। ভেবে দেখে নি একটা জীবনের মধ্যে যে জটিলতা সারা পৃথিবীর দর্শন দিয়েও তার কোন মীমাংসা করা যায় না কেন? জীবন তবে কি? সে কি তবে শুধু কতকগুলো জটিলতার গ্রন্থি? যা কোন মানুষই কোনদিনই খুলে শেষ করতে পারবে না! তাহলে মানুষ জীবন কাটাবে কি করে?

অভিজিতের চিন্তাটা ক্রমশঃ অন্ধকারের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলছিল। কোন খেই খুঁজে পাচ্ছিল না সে। ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল চিন্তাশক্তি। হঠাৎ পায়ের পাতায় একটা মশা কামড়ে দিল। সচেতন হয়ে উঠল সমস্ত শরীরটা। একটু নড়েচড়ে বসল সে। পা দুটোও তুলল চেয়ারের ওপর। মশাটা যে জায়গাটায় কামড়ে ছিল সেখানটাতে হাত দিয়ে চুলকলো। জ্বালাটা কমল একটু। চিন্তার জটিলতা থেকে ছাড়া পেল মনটা।

এতক্ষণে একটু সহজ হল মনটা। একটু খোলা হাওয়া পেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অভিজিৎ। কিন্তু আবার ওর এও মনে হল, শরীরটার একটু জ্বালা মনটা সইতে পারল না কেন? চট করে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে ফেলে শরীর বাঁচানোর জন্য তৈরি হয়ে গেল কেন? তবে কি শারীর-চিন্তাটাই মানসিক চিন্তার চেয়ে প্রবল?

আবার নিজ খাতে বেয়ে এল অভিজিতের চিন্তাটা। স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সামনে ওর সমস্যাটা। যেটাকে সে কোনদিনই চোখ মেলে দেখতে চায় নি, সেটাই এবারে ভেসে উঠল চিন্তাপটে। এবারে আর কোন অস্পষ্টতা নেই। নেই কোন ছায়া ছায়া ভাব। রঙে আর রেখায় সে ছবি স্পষ্ট উদ্ভাসিত।

অথচ এই ছবিটাকেই দেখতে ভয় পায় অভিজিৎ। ভয় পেত বহুদিন থেকে। তাই ছবিটার কথা মনে উঠলেই চোখ বুজত সে। চোখ বুজে মনের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইত। কিন্তু তা হত না।

মাঝে মাঝেই ভেসে উঠত ছবিটা। হাজির হত চোখের সামনে। দারুণ অস্বস্তিতে তখন নীরার কাছ থেকে দূরে চলে যেত সে। পালিয়ে যেত—পালানো যায় না জেনেও। শেষ পর্যন্ত ধরাও পড়ত। নীরার কাছে নয়—নিজেরই কাছে।

পুকুরের জলে গাছের ছবি যেমন সামান্য হাওয়ায় কাঁপতে থাকে তেমনি বর্তমানের ভীরু মনে অতীতের ছবিটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। এবারে একেবারে স্থির ছবিটা। বড়ই প্রত্যক্ষ। আর পালানোর পথ নেই। চোখের সামনে স্থির হয়ে আছে ছবিটা। চোখ সরাবার উপায় নেই অভিজিতের। দেখবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, তবুও দেখতে হচ্ছে।

অভিজিৎ দেখছে, নীরা নববধূর বেশে সেজে একটা ঘরে ঢুকল। পরনে লাল চেলী। মুখটা প্রসাধনের সাধনায় সুন্দরতর। চোখে ঈষৎ লজ্জা, কাজলের গাঢ় সূক্ষ্ম রেখা। দীঘল চোখে লজ্জা ছাড়াও আরও কিছু আছে। ঠিক কি, তা বুঝতে পারছে না অভিজিৎ। সে শুধু অপলকে চেয়ে নীরাকে দেখছে। যে নীরাকে সে অনেক আগে থেকেই চেনে এ যেন সে নয়। তার নাম করে আর তার শরীরটাকে নিয়েই অন্য এক মেয়ে এসে ঢুকেছে ওর ঘরে। এর সাজ ভিন্ন। এর চলন আর এক রকম।

তাই বিস্মিত চোখ মেলে দেখছে অভিজিৎ। দেখছে, মেয়েটি ঘরে ঢুকে চারদিক একবার ভাল করে দেখে দরজাটা বন্ধ করল সন্তর্পণে। ধীর পায়ে এগিয়ে এল সে। এত ধীরে যে পিঁপড়েও বোধ করি ওর চলাটুকু টের পেল না। ওর দিকে একবার চেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা। গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়াল। দু হাতে দুটো সিক ধরে ফাঁক দিয়ে মুখটাকে বাড়িয়ে দিল।

বাইরে আলো দেখা যাচ্ছে। আলো দেখছে নীরা। বাড়ির ওদিকটাতে নারকেল গাছ আছে কয়েকটা। সে গাছের পাতায় পিছলে-পড়া আলো দেখে পুলকিত হয়ে উঠল।

জানলার সিকে গাল নাক ঘষে মিষ্টি করে বলল, দেখছ, কি চমৎকার আলোর কুচোগুলো! গলে গলে পড়ছে যেন!

অভিজিৎ চুপ করে বসেই রইল। ওর কথার কোন জবাব দিল না। শুধু মন দিয়ে নীরার সুখানুভূতিটাকে ধরতে চাইল।

একটু পরে নীরা আবার বলল, কি, কথা বলছ না যে? ভাল লাগছে না?—বাইরের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল।

না, তেমন আর লাগছে কই?—নিরাসক্ত জবাব দিল অভিজিৎ।

এবারে ঘুরে দাঁড়াল নীরা। অবাক চোখে বলল, সে কি! ওই সবুজ পাতার সাদা দাঁতের হাসি তোমার ভাল লাগে না!

হয়তো লাগত। কিন্তু এখন লাগছে না।

কেন?

দেখতে পাচ্ছি না যে।

উঃ, কি ভীষণ দুষ্টু তুমি। আমি ভাবলাম, এ আবার কি! চাঁদের আলো ভাল লাগে না, এ তো ভাল কথা নয়! এর পর হয়তো তোমার আমাকেই ভাল লাগবে না।

তা যদি বল তো সত্যি কথা বলতে গেলে আমার কাছের চাঁদের আলোর চাইতে প্রিয়বস্তুও আছে।

কি?

চাঁদপানা মেয়ে।

আহা! আর বাজে বাজে কথা বলতে হবে না।—কপট ঝাঁজের সুর নীরার গলায়।

ওই তো, সত্যি কথা বলার ওই দোষ।

কি দোষ?

মেয়েরা কিছুতেই তা বিশ্বাস করবে না। অথচ মিথ্যে কথা বল, মেয়েরা কান পেতে শুনবে। শুনে খুশী হবে। নিজেরা বুঝবে লোকটা মিথ্যে কথা বলছে তবুও মন দিয়ে শুনবে।

কি রকম?—জানা কথাটাই আর একবার জানতে চাইল নীরা।

ধীরে ধীরে অভিজিতের পালঙ্কটার পায়া ধরে দাঁড়াল।

অত্যন্ত স্বাভাবিক রকম। যে মেয়েটা নিজেই জানে রূপ-নামের বস্তুটা তার নেই, তাকেও যদি দিনের পর দিন বলতে থাক, তার রঙটা কালো হলেও তার মধ্যে একটা শ্রী আছে, অনেক ফরসা রঙের চাইতে ওটা ভাল; তার নাকটা মোটা আর ভোঁতা হলে যদি বল মুখের এই গড়নের ওপর এমনি নাকটাই মানিয়েছে ভাল, চোখ দুটো ভাবলেশহীন হলেও যদি বল, ও চোখে একটা বেশ মধুর আবেশ আছে তো দেখবে একদিন সে তাই বিশ্বাস করছে।

অর্থাৎ মেয়েদের গায়ের গড়ন আর রঙ যদি বা কখনও সুন্দর আর পরিষ্কার হয় তো হতেও পারে। কিন্তু তাদের মাথাটা কোনদিনই পরিষ্কার হয় না এই তো?

কই, আমি তা বলি নি তো?

উঃ, বাব্বাঃ কি ভীষণ মিথ্যুক তুমি। এইমাত্র যা বললে পরমুহূর্তে তা অস্বীকার করছ?

অভিজিতের মিথ্যাভাষণে আশ্চর্য হয়ে যায় নীরা।

যা অসত্য তা অস্বীকার করাই তো বিধেয়।—অভিজিৎ সহজভাবেই বলল।

কি সত্য?

মেয়েরা সত্যটা বোঝে, তবু মিথ্যাকে বিশ্বাস করতেই ভালবাসে। সত্য বোঝে বলেই প্রমাণ হল, তাদের মাথাটা সব সময় অপরিষ্কার নয়। এই মুহূর্তে তোমাকে সুন্দর বলাতে তুমি অবিশ্বাস করলে না আমার কথাটা। অবশ্য—

কথাটা শেষ করতে পারল না অভিজিৎ।

মাঝপথেই ওকে থামিয়ে দিয়ে নীরা বলে উঠল, থাক্ থাক্, আর অবশ্য দিয়ে কাজ নেই। শেষে কী বলতে কী বলে ফেলবে তার ঠিক নেই।

আমার কথাকে তুমি ভয় পাও?

পাই না আবার! যা মুখ, ও মুখের কাছে দাঁড়াতে পারলে তো!

তাহলে বস।

কেন?

দাঁড়াতে না পারলে আর কি করবে?

না, এখন আমি বসেও থাকতে পারব না। সারাদিন যা মেহন্নত গেছে।

বেশ, তাহলে শুয়ে ঘুমোও।

হঠাৎ ওর মুখের কাছে মুখ এনে নীরা বলে ফেলল, ঘুমুতে দেবে তো।

চোখ দুটো ওর দুষ্টুমিতে নাচছিল।

ওর কথার আর কোন জবাব না দিয়ে অভিজিৎ অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

আর নীরা কাঁকনে চুড়িতে ঝুমঝুম শব্দ তুলে বড় ড্রেসিং টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘাড় নীচু করে হাতের চুড়িগুলো খুলে রাখল ড্রেয়ের ভেতর। গলার হার কানের দুলও। তারপর আচমকা একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখল, অভিজিৎ তখনও ওদিকে চেয়ে বসে আছে।

বলল, ওকি, তুমি এখনও বসে আছ কেন?

দেখছি।

থাক, আর দেখে কাজ নেই।

কেন?

এমনি।

বেশ।—বলে অভিজিৎ শুতে যাচ্ছিল, কিন্তু শোওয়া আর হল না।

বড় আয়নায় স্পষ্ট দেখতে পেল অভিজিৎ নীরার সমস্ত শরীরটা কী ভীষণ পুষ্ট। যৌবনের রসে সতেজ একটা শরীর। বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি। অভিজিতের শরীর ও মন কি এক উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল মুহূর্তে। নিঃশ্বাস হল দ্রুততর। কান দুটো গরম লাগছে। কি যে করবে অভিজিৎ, ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু কিছুই করা হল না।

হঠাৎ আয়নাটা'তে ওর আর নীরার ছবি দুটো পাশাপাশি দেখেই চমকে উঠল সে। আঁতকে উঠল ভয়ে।

নীরার বলিষ্ঠ সুন্দর শরীরটার পাশে কী ভীষণ দুর্বল আর ছোট দেখাচ্ছে তাকে। মানুষীর কাছে মানুষ নামের একটা পোকা যেন। যেমনি পাতলা তেমনি ছোট। কত অসহায় মনে হচ্ছে তাকে ওই মানুষীটার কাছে। কী ঘৃণ্য, কদাকার। হঠাৎ উত্তেজনা উধাও। অবশ হয়ে এল অভিজিতের দেহ-মন। আর যেন সে পুরুষ নয়। স্বামী নয় নীরার। মনটা কুঁচকে কেঁচো হয়ে গেল। নির্জীব হয়ে পড়ে রইল বিছানায়।

একসময় নীরা এসে ওর পাশে শুয়েছে। ওর চুলের গন্ধ এসেছে ওর নাকে। দেহের গন্ধ। অভিজিৎ যেন নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছিল না। হারিয়ে গিয়েছিল কোন্ অতলে!

একবার নীরা ফিসফিসিয়ে বলল, কি হল, সত্যি সত্যি কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

অভিজিৎ ঘুমের ভান করে কাঠ হয়ে পড়ে রইল। সে বুঝেছে, কথা বলতে গেলেই বিপদ। জেগে থাকাটাই ভয়ঙ্কর।

কিন্তু তবুও বিপদ কাটল না। নীরার একটা হাত আলতো ভাবে তার বুকের ওপর ঠেকল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে হাতটা আবার নড়েচড়ে উঠল। চিবুক ছুঁয়ে গেল আঙুল দুটো। সিরসিরিয়ে উঠল অভিজিতের শরীরটা। ভিতরে ভিতরে একটা প্রবল উত্তেজনা। তবুও নীরার সমস্ত শরীরের মাপটার কথা মনে করে কিছুতেই হাতটাকে ধরতে সাহস পেল না অভিজিৎ। জানাতে পারল না নীরাকে, ওর হাতটা কী অসহ্য যন্ত্রণা আর পুলকই না জাগাচ্ছে ওর মনে।

তাই চুপ করে শুয়েই রইল সে। যন্ত্রণাটা সহ্য করল দাঁত চেপে। আর পুলকটুকু উপভোগ করল চুরি করে আপন মনে। সে জানত, নীরার দেহের নানা কোষে এ রকম অনেক অসহ্য পুলকের ভাণ্ড জমা করা আছে। একটু চাপ দিলেই সে রস পেতে পারে অভিজিৎ। স্বাদ নিতে পারে অজানা দেহের। যে স্বাদ মধুর, গভীর।

কিন্তু তবু সে পারল না। এত কাছে নীরার শরীরটা জেগে আছে। জেগে আছে কোন্ এক ব্যাকুলতায়। সমস্ত দেহ-কোষে এক গভীর প্রতীক্ষা নিয়ে শুয়ে আছে নীরা, তবু অভিজিৎ সে প্রতীক্ষায় সাড়া দিতে পারল না। মনে মনে লোভের হাত বাড়াল সে। নীরার দেহের প্রতিটি অঙ্গে ঘুরল সে তার লোভী মন নিয়ে। লালসার লালায় জিভটা চটচটে হয়ে উঠল। একসময় বোধ হয় শূন্যতার বিস্বাদে নীরস হয়ে উঠল লোভের মুখটা।

বিরক্তিতে পাশ ফিরে শুলো সে। ওই শরীরটা থেকে একটু দূরে থাকতে চায় সে। যে শরীরটা ওকে খেপিয়ে তুলছে নিয়ত। কামড়ে ধরতে চাইছে ওর সমগ্র অস্তিত্বটাকে। হয়তো গিলেই ফেলতে চাইছে।

অথচ অভিজিৎ নিজে ওটাকে আক্রমণ করতে পারছে না। যা পারা ওর উচিত ছিল তা পারছে না বলেই নিজের ওপর আরও বেশী রাগ হল তার। রাগ হল নীরার শরীরটার ওপরও। কী বিশ্রী রকমের সুন্দর আর

হ্গোলই না নীরার শরীরটা। ওরকম ভাল নয়। শরীরটা খত বেশী পুষ্ট না হলেও চলে।

নিজের মনকে জোর করে সরিয়ে আনল নীরার কাছ থেকে। তারপর কখন একসময় যেন ঘুমের ভান করতে করতে সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল সে।

একটা পাতা ওলটানো হল যেন। একটি ছবি দেখা হল অভিজিতের। অনেকদিন আগের একটা ছবি। এতদিন বন্ধ ছিল ছবির খাতাটা। চাপা পড়েছিল ছবিটা।

প্রায় তিন বছর আগে কোন এক রাতে আঁকা হয়েছিল ছবিটা। এতদিনের কর্মব্যস্ততায় সে খাতা বন্ধ ছিল। ছবিটা চোখের আড়ালে পড়েছিল। হয়তো কিছুটা বিস্মৃতির ধুলো পড়েছিল খাতাতে। কিন্তু আজ— আজকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পায়ে পায়ে অনেক দূর হেঁটে চলে গিয়েছিল সে। বর্তমানের আঘাত পেয়ে অতীতের পথ ধরেছে সে। তাই পুরনো ছবির খাতাটা হাতে এসে ঠেকল তার। পাতা উলটে দেখল, সেই এক রাত্রের ভীষণ ছবিটা। যেটা পুরনো হলেও নষ্ট হয় নি এতটুকু। তার রঙ আর রেখা সবই স্পষ্ট। ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল সে ছবি। আর বেশীক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সে। তাড়াতাড়ি পাতা ওলটাল। আড়াল করতে চাইল আবার।

কিন্তু তবু শান্তি পেল না অভিজিৎ। আর একটা ছবি এসে দাঁড়াল চোখের সামনে। আর এক পাতার ছবি। একটু ছোট এ ছবিটা। কিন্তু শক্ত তুলির আঁচড়। প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। বক্তব্যে উন্মুখ। এটা ওদের দুজনের ছবি নয়—তিনজনের। সে নীরা আর বিনায়ক।

অভিজিতের অন্যতম বন্ধু হিসেবে নীরার সঙ্গেও এখন ওর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। প্রায় প্রতিদিনই একবার বিনায়ক আসে। হাসি-ঠাট্টা গাল-গল্পে মেতে ওঠে ওরা। কিছুটা সময়ের বুকে খুশীর আবীর ছড়ায় ওরা। প্রাণ খুলে হাসে নতুন করে প্রাণ পাবে বলে।

সেদিন তখনও বিনায়ক আসে নি। অভিজিৎ অনেকক্ষণ থেকেই বলছে, চল নীরা, ছুটো গেম খেলা যাক। আজ শরীরটা বড্ড ম্যাজম্যাজ করছে।

ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে অভিজিৎ। কিন্তু নীরার ওঠবার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

আবার সে জিজ্ঞেস করল, কি হল? উঠছ না কেন? তোমার বই পড়াটাই বেশী হল?

আমার ভাল লাগছে না খেলতে, তুমি বরং বিনায়কবাবু এলে খেল।

বিনায়কের সঙ্গে খেলা আর তোমার সঙ্গে খেলা এক নয়।

তা তো এক নয়ই। ওর সঙ্গে খেলে তো আর জিততে পারবে না?

সে তো তোমার সঙ্গেও পারি না।

তবে?

তবে আর কি? হেরেই খুশী হব। খেলাটা যার কাছে খুশীর ব্যাপার নয়, তার কাছে জেতা আর হারা একই। দুই-ই সমান অর্থহীন। চল এবার, একটু চটপট করে নাও।

লক্ষীটি, আজ থাক্। কাল খেলবখন। কেমন যেন ভাল লাগছে না আজ।

বেশ, তবে থাক্।

নীরার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কথাটা বলল অভিজিৎ। তারপর চলে গেল নিজের ঘরে।

বাড়ির ভেতরেই এ খেলাটার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল অভিজিৎ। ব্যাডমিন্টন তার বড় প্রিয় খেলা। তা হোক, শরীর ভাল না লাগলে নীরাই বা কি করে খেলবে। ঘরে এসে সেও একটা বই নিয়ে বসল।

একটু পরেই বিনায়ক এল। হুড়মুড় করে ওপরে উঠে এল সে। একবার এঘর একবার সেঘর উঁকি মেরে দেখল। তারপর অভিজিৎকেই বলল, কিরে, দুজনে দু ঘরে বই নাকে গুঁজে বসে আছিস যে? দেখেশুনে মনে হয়, তোরা দু ঘরের দুই ভাড়াটে। বলি ব্যাপারটা কি?

বই থেকে মুখ তুলে অভিজিৎ বলল, কেন? এক ঘরের ভাড়াটে হলে কি দুজনকে সব সময় একসঙ্গে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে হয় নাকি?

না, তা বলি নি।—ওর কথাটার ঠিকমত জবাব দিতে পারল না বিনায়ক।

তবে কি বলছিস ?

বলছিলাম কি, আজ খেলবি না ?

না, ওর শরীরটা ভাল নেই আজ।

কি হয়েছে ?

হয় নি কিছুই, তেমন ভাল লাগছে না আর কি।

খাঃ, ওসব কিসসু না। আসলে নভেলের টানে পড়েছে। তাই ওটা ছেড়ে আর উঠতে চাইছে না।

বলেই ওর কথার আর অপেক্ষা না করে ওঘরে চলে গেল বিনায়ক।

আর একটু পরেই অভিজিৎ দেখল, নীরার হাতটা ধরে প্রায় টেনেই নিয়ে চলেছে বিনায়ক নীচে।

নীরা শুধু বলছে, ছাড় ছাড়! আস্ত ডাকাত একটা।—বলেই একবার কটমট করে বিনায়কের দিকে চাইল নীরা।

খোলা দরজা দিয়ে অভিজিৎ তাকিয়ে দেখল, নীরার চোখ দুটো একটু কটমট করলেও মুখটা হাসি হাসি।

নীরাকে সেখানেই ছেড়ে দিল বিনায়ক। বলল, স্রেফ দু মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে তৈরি হয়ে নেওয়া চাই।

হবে বাপু, তাই হবে। আচ্ছা গুণ্ডা যাহোক।—বলে চলে গেল নীরা। র‍্যাকেট নিয়ে এল অভিজিতের ঘরে। বলল, কই, তুমি এখনও বসে আছ ? চল শীগগির।

তোমরা যাও, আমি আসছি।—খুবই ধীর কণ্ঠে বলল অভিজিৎ। কথার সুরে একটুও রাগ বেরিয়ে পড়তে দিল না।

নীরাও তাই কিছুমাত্র চিন্তা না করে বিনায়কের সঙ্গে নীচে নেমে গেল।

সেদিন শেষ পর্যন্ত নীচেই নামে নি অভিজিৎ। নিজের ঘরেই বসেছিল। ভেবেছিল অনেক কিছু।

ভেবে দেখেছিল, বিনায়ক যে নীরার ইচ্ছার ওপর জোর করেছে, হয়তো শরীরের ওপরেও খানিকটা, তাতে নীরা রাগ করে নি, বরং ওই একটু অত্যাচারে খুশীই হয়েছিল সে।

মেয়েদের ওপরে অত্যাচার করাটা তাহলে দোষের নয় নাকি ? নাকি অনাত্মীয় বলেই ওই জুলুমটুকু মেনে নিয়েছে নীরা ? সহ্য করেছে যা সহ্য করা উচিত নয় তাই ?

শেষ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি অভিজিৎ সেদিন। করতে পারে নি কোন মীমাংসা।

কিন্তু আর একটা জিনিস সেদিন চোখে পড়েছিল অভিজিতের। দেখেছিল, বিনায়ক আর নীরার শরীর দুটো পাশাপাশি বড় মানায়। সুন্দর দেখায় একটি বলিষ্ঠ পুরুষ আর একটি বলিষ্ঠ নারীকে। দুটোই প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। জীবনের বৃহত্তর আঙিনায় যেন ওরকম বলিষ্ঠ যুগলেরই নিমন্ত্রণ থাকে। স্বাগত জানায় ভরা-স্বাস্থ্যের নর আর নারীকে।

আর নীরার পাশে ওর নিজেকে বড়ই বেমানান লাগে। বড় কুৎসিত। দুর্দান্ত সিংহীর পাশে নিরীহ মেষশাবক যেন। অন্যায় আর অসুন্দর ভাবে কেমন করে যেন সিংহীর পাশে বসেছে মেষটি। শিং খাড়া করে হাস্যকর বীরত্ব দেখাতে চায় সে।

ওরকম চিন্তায় একটা দারুণ গ্লানি এসেছিল অভিজিতের মনে। ঘৃণায় মনটা কেঁচোর মত ছোট হয়ে গিয়েছিল, গুটিয়ে গিয়েছিল একেবারে। নীরার পাশে ওকে কী বিশ্রী কদর্যই না দেখায়। তুচ্ছ মনে হয় নারীর পাশে নরকে। ঠিক কি রকম যে দেখায়, তা সে সেই রাতেই আয়নাতে স্পষ্ট করে দেখেছে, আর ওই ছবিটা চোখে ভেসে উঠলেই বড় অসহায় মনে হয় অভিজিতের। একটা দারুণ হতাশা।

অথচ, ওদের দুজনের মধ্যে এই ব্যবধানটা বিয়ের আগে তো কই কারও নজরে পড়ে নি! কেন পড়ল না এত বড় একটা ফাঁক ? যে ফাঁকটা কোন কালেই ওরা ভরিয়ে তুলতে পারবে না, সেটা দুজনেরই চোখ এড়িয়ে গেল কি করে ? নাকি একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়েকে ভাগ্যক্রমে পেয়ে যাচ্ছে বলেই তখন আর সে ফাঁকটুকু দেখতে চায় নি অভিজিৎ ? একটি যৌবনপুষ্ট শরীরের লোভে আর একটি বিরাট সত্যকে চোখ বুজে উপেক্ষা করতে চেয়েছিল সে ?

আর নীরা ? সে কি করেছিল ? কি ভেবেছিল সে ? সেও তবে দেখতে পেল না কেন ? নাকি সেও দেখতে চায় নি ? নীরা হয়তো সেদিন শুধু অভিজিতের স্নিগ্ধমধুর মানসিকতাকেই আশ্রয় করতে চেয়েছিল। চেয়েছিল একটি রুচির বাসা। একটি মার্জিত পরিচ্ছন্ন সংসার।

তাই দুজনার কারোরই নজর পড়ে নি সেদিন। দুজনার মনটাকে দুজনেই জেনে আর বুঝে খুশী হয়েছিল সেদিন। খুশী হয়েছিল খুশীর সংসার পাততে পারবে জেনে। রেজেষ্ট্রি করে নিয়েছিল দুজনের খুশীর ইচ্ছাটাকে।

কিন্তু আজ? আজ অভিজিৎ স্পষ্টই দেখছে—আজ ইচ্ছাটুকু উধাও, রেজিষ্ট্রীটাই আছে। একটি শীলমোহর দেওয়া কাগজমাত্র। তার বেশী আর কোন মূল্যই নেই এটাতে।

খেলার শেষে ওরা ওপরে উঠে এল। দুজনে একত্রে ওর ঘরে। শ্রান্ত প্রসন্ন ভাব।

নীরা এসেই বলল, কি হল, তুমি গেলে না যে? এত সামান্য কারণে তোমাদের রাগ হয় যে কিছুই বুঝি না।

বিনায়ক বিস্মিত ভাবে বলল, রাগ? রাগ কেন?

নীরাই ওর কথার জবাব দিল। বলল, ওই যে ও তখন একবার ডেকেছিল, কিন্তু আমি যাই নি তাই।

ঠিক তা নয়।—সহজ সুরেই বলেছিল অভিজিৎ, তোমার পক্ষে ওরকম একটা চিন্তা করাই স্বাভাবিক বটে। কেন না ও অবস্থাতে তুমিও শুধু রাগই করতে। তোমার চিন্তার পরিধির বাইরেও যে কিছু ঘটে বা ঘটতে পারে, তা তুমি ভাব নি।

তেমন কিছু ঘটেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।—নীরার কথাতেও একটু বিরক্তি প্রকাশ পেল।

তোমার মনে হওয়ার অপেক্ষায় ঘটনা আটকে থাকে না।—কথাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গম্ভীর সুর এসে গেল অভিজিতের।

আর বিনায়ক এবারে চোখ বড় বড় করে বলল, ও বাব্বা, এ যে পণ্ডিতী লড়াই শুরু হয়ে গেল দেখছি। কী ভীষণ শক্ত শক্ত সব কথা। যেন এক একটা থান ইট। মা বাপু, এ অবস্থায় আমার পালানোই উচিত।

সব সময় ঠাট্টা করো না বিনায়ক।—নীরা বলে উঠল।

ঠাট্টা আর করলুম কোথায়। এ রকম মারাত্মক জিনিস নিয়ে কি ঠাট্টা করা যায় নাকি?

কই বললে না, তোমার কি হয়েছিল? এবারে অভিজিতের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করল নীরা।

নাই বা বললাম। তাহলে আবার আমার বীর বন্ধুটির ভয় আর ঘুচবে না।

দেখ, অভি, তোর মত শক্ত শক্ত কথা আমি বলতে পারব না। তা ছাড়া তোর সঙ্গে যুক্তিতেও আমি পারব না। তবে এটুকু বলব, গায়ে ছুঁচ ফোটালে আমারও ব্যথা লাগে। কিন্তু সেটা তবু সইতে পারি, কেন না একটু পরেই সেটা খুলে ফেলতে পারি। কিন্তু বঁড়শী বেঁধাকে সইতে পারি না। কেন না, ওতে আঘাতটা শরীরটাকে কামড়ে ধরে থাকে। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া প্রতিটি সংসারেই বোধ হয় হয়। কিন্তু সেটাকে কেউ ইচ্ছে করে জটিল করে কি? বললেই তো হয়, এজন্য আমি যাই নি। তা নয়, মিছিমিছি কতকগুলো শক্ত কথার ছোঁড়াছুঁড়ি।

বাঃ, তুই তো আজকাল বেশ বলতে শিখেছিস বিনয়।—প্রচ্ছন্ন ঠাট্টায় বেঁকে উঠেছিল অভিজিতের মুখটা।

না ভাই, বলার কায়দার চাইতে জীবনটাকে সহজ ভাবে কাটানোর কায়দাটাই আমি শিখতে চেয়েছি। ওটুকু হলেই আমি খুশী হব। আচ্ছা, এবারে আমি চলি। রাত হয়ে যাচ্ছে।

বলেই কারও উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বেরিয়ে গিয়েছিল সে। আর ঘরের মধ্যে দুটো কাঠ-পুতুলের মত কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে রইল ওরা দুজন। কি এক বিষণ্ণতায় থমথম করছিল ঘরটা। দারুণ কিছু একটার অপেক্ষায় উৎকীর্ণ হয়েছিল ঘরটা। অপেক্ষা করছিল এমন একটা কিছুর জন্য যা কখনও এ ঘরে ঘটে নি।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তেমন কিছুই ঘটল না। দু-একটা টুকরো-টাকরা কথা অবশ্যই হয়েছিল। কিছু প্রশ্নোত্তর। তারপর একসময় নীরা চলে গিয়েছিল পাশের ঘরে। আর অভিজিৎ তার বইটাকে তুলে ধরেছিল চোখের সামনে। অঘটনটা সেদিন ঘটতে গিয়েও ঘটে নি। বেঁচে গিয়েছে কোনমতে।

* * *

কিন্তু আজ আর বাঁচল না। একটা চক্রান্তের পোকা দিন দিনই বাড়ছিল মনে। বড় হচ্ছিল একটু একটু করে। আজ এতদিন পর সে তার ছোবল দিতে পারল। বিষ ঢালতে পারল সুযোগ বুঝে। এতদিনে তার বিষের সঞ্চয় পুরো হয়েছিল। তাই আজ সে সবটুকু ঢালতে পারল। ঢেলে সুখী হল।

মনে মনেই খিড়বিড় করে উঠল অভিজিৎ। ডান পাটা ঝিঁঝিঁ করে উঠছে। রক্ত চলতে পারছে না ঠিক করে। একপাশে চাপ পড়ছে তাই। একটু নড়ে-চড়ে বসল সে। ঝাঁকুনি লাগল চিন্তাতে। আর তাতেই চিন্তার সুতোটি ছিঁড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেটাতে আবার গিঁট দিতে চাইল সে। কিন্তু তবুও খানিকটা সুতো বাদ পড়ল। বাদ পড়ল কিছুদিনের ঘটনা। মনে পড়ল আর একদিনের ঘটনা। সামান্য ঘটনা। কিন্তু আজ এখন অভিজিতের মনে হচ্ছে ওটা সামান্য হলেও তার প্রতিক্রিয়া সামান্য ছিল না কোনমতেই। সেদিন যেটাকে তুচ্ছ মনে হয়েছিল, আজ সেটাই শাখা-প্রশাখায় অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে অভিজিৎ নিজেই নিজের চিন্তার দৈন্য দেখে। এত বড় একটা জিনিসকে সেদিন কত অকিঞ্চিৎকরই না মনে হয়েছিল।

তা ছাড়া ব্যাপারটাও ছিল প্রায় তাই।

অনেকক্ষণ থেকেই খাবার জন্য ডাকছিল নীরা। কিন্তু উঠি উঠি করেও ওঠা হয়ে উঠছিল না অভিজিতের। একটা লেখা নিয়ে তখন সে দারুণ ব্যস্ত। খসখস করে লিখেই চলেছিল সে। আর মুখে মাঝেমাঝেই বলছিল, এই—এই যে এলাম বলে। আর পাঁচ মিনিট।

অনেক পাঁচ মিনিটই ওরকম করে চলার পর এক-সময় নীরা এসে ওর হাত থেকে কলমটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

বিরক্ত হল অভিজিৎ। তবু শান্ত ভাবেই বলল, আঃ, কি হচ্ছে। দাও কলমটা। কাজের সময় বড্ড বিরক্ত কর।

আহা, আর নিজে যে সেই থেকে আমায় বসিয়ে রেখেছ তার বেলায়? আমার বিরক্তি হয় না?

তাহলে তুমি না হয় একটু বিশ্রামই করে নাও। তাহলেই তো হয়।

আজ্ঞে না, তা হয় না। তোমার কথামত আমার বিশ্রাম হবে নাকি?

না, ঠিক তা নয়। বলছিলাম কি—

কিচ্ছু বলে কাজ নেই। আগে চল, তারপর কথা।

উঃ, তোমার সঙ্গে আর কিছুতেই পারা যাবে না দেখছি।—বলেই এদিকে ঘুরল অভিজিৎ।

আর তখনই ওর নজরে পড়ল নীরার সেদিনের সুসজ্জিত চেহারাটি। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল নীরাকে। এমনিতেই সে সুন্দর। তারপর সামান্য একটু প্রসাধনের ছাপ পড়লেই আরও চমৎকার দেখায় তাকে। সাধারণ একটা শাড়ি আর ব্লাউজেই অপরূপ শ্রী জেগে ওঠে ওর দেহে। মাদকতা আনে অভিজিতের চোখে। একটা কিসের ইচ্ছা কিলবিল করতে থাকে ওর শিরাতে ধমনীতে। একটা লোভের ইচ্ছা।

সেদিনও ওর দিকে চোখ পড়তেই সেই ইচ্ছাটা ছুটে বেড়াতে লাগল ওর রক্ত-নালীতে। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ না করে সে নীরার কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আর চোখে চোখ রেখে বলল, এ রকম যে কর, তোমার ভয় করে না?

কিসের ভয়?—অভিজিতের ঝুঁকে-পড়া ভাবটাকে ঠেকিয়ে নীরা বলল, তা ছাড়া কী আবার করলাম আমি?

নীরার কাঁধে হাত রেখে আরও কাছে এসে অভিজিৎ বলল, এই যে ছিনিমিনি কর, এটা কি? উলটে আমি যদি আবার কাড়াকাড়ি করতে যাই তবে?

তবে আবার কি? কাড়াকাড়ি করেই দেখ না, পেলে তো?

কলমটা নাই বা পেলাম, কিন্তু ওই সুযোগে আর যা পাব তাতেই তো আমার লাভ।

ওকে জড়িয়ে ধরে নীরা বলল, কিসের লাভ?

তোমাকে কাছে পাওয়ার লাভ।

সেকি পাও না?

হয়তো পাই, কিন্তু এমন করে পাই না। আর যা পাই, তা নিতে পারি না।

তবে চেষ্টা করে দেখ।

ওকে ছেড়ে দিল নীরা। দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে।

ঠিক বলছ?—অভিজিতের মনে সংশয়, তবুও সে খুশী। আর তারপরই অঘটনটা ঘটল। একটু আগেও সেকথা ভাবতে পারে নি অভিজিৎ। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল।

কলমটা ছিনিয়ে নেবার ভান করে নীরার সুন্দর করে সাজানো শরীরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অভিজিৎ। আর তৎক্ষণাৎ হাতের এক ঝটকায় ওকে বসিয়ে দিল নীরা পালঙ্কের ওপর।

কেমন একটা বিশ্রী হেসে জিজ্ঞেস করল অভিজিৎকে, পেলে কিছু? এবারে বোধ হয় ওতেই পেট ভরবে। হুঁঃ, সহজভাবে কিছু দিলে যারা নিতে জানে না, তাদের কত দুর্দশাই না হয়।

হঠাৎ ভীষণ এক বিরক্তিতে ঘর ছেড়ে চলে যায় নীরা।

আর লজ্জায় গ্লানিতে মাথা হেঁট করে বসে থাকে অভিজিৎ। এবং সেই হেঁট মাথাটা উঁচু করে তোলবার জন্মেই আজকের এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে সে। ঘটিয়েছে নির্ভুল হিসাব করে। সেদিন যে পৌরুষটা ওর মাথা হেঁট করেছিল হেরে যাওয়ার লজ্জায় আজ সেটাকে তুলে ধরতে চেয়েছিল সে। ওর পৌরুষকে জেতাতে চেয়েছিল সে। খুশী করতে চেয়েছিল ওর মার-খাওয়া মনটকে।

শুধু সে বারই নয়, আরও অনেক বারই দেখেছে অভিজিৎ ওর শরীরটাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে চায় নীরা। দেয়ও। এই ক্ষোভটাই অভিজিতের মনে অনেক দিন থেকে গর্জন করে ফিরছিল।

নীরা যেন ওকে স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল, তুমি তোমার শিক্ষা আর রুচি নিয়ে আছ, তাই থাক। ভাল করে কথা বলতে পার, তাই বল। কিন্তু শরীর নিয়ে বাহাদুরি করা কেন বাপু? ওই তো একটুখানি শরীর, একটা প্যাকাটির মত, পলকা, তা নিয়ে আবার সমানে সমানে তাল দেবার চেষ্টা কেন? যা পাচ্ছ, যা দিচ্ছি, তাই নাও। যা দিই নি, তার জন্ম অভিযোগ করা কেন? তোমার দুর্বল শরীরে ওর চেয়ে বেশী সইবে না।

নীরা সম্বন্ধে ও রকম একটা ধারণা হওয়াতেই মনে মনে নীরাকে একদিন শক্ত আঘাত করার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছিল অভিজিৎ। নীরাকে শুধু বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল সে যে শরীরটা কিছু কম হলেও একটা নারীকে পরাজিত করার মত যথেষ্ট শক্তিই তাতে আছে। কখনও যে সে নীরার ওপর কোন অত্যাচার করে না, তার কারণ, শক্তির অভাব নয়—শক্তির গভীরতা।

কিন্তু তবু অন্ততঃ একবার সে নীরাকে বুঝিয়ে দেবে যে, শক্তি ছিল বলেই তার অপব্যবহার সে করতে চায় নি।

আর তাই সে আজ করেছে। ধাক্কা মেরে নীরাকে যখন সে ফেলে দিয়েছে তখন দেখেছে ওর চোখে কী দারুণ বিস্ময়।

* * *

তবুও এত কথার পরও কেন মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে অভিজিতের? যে যুদ্ধে সে নিশ্চিত ভাবেই জিতেছে এবং অনেক পরিকল্পনার পরই জিতেছে, তবু তার জয়ী মনটা খুশী হচ্ছে না কেন? কেন তার কেবলই মনে হচ্ছে, এবারে সে আরও বেশী করে হারল। চরম পরাজয় ঘটল তার শিক্ষার আর রুচির।

তাহলে কি অনেক পরিকল্পনার পর নিজেকেই নিজে গলা টিপে মারল সে!

আবার একটা যন্ত্রণাবোধ তার দেহে ছড়িয়ে পড়ল। অসহ্য মনে হল যন্ত্রণাটা। কী করবে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠল। বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

দরজার সামনে এসেই থমকে দাঁড়াল। একবার একটু দেখে আসবে নাকি সে নীরাকে? এখন কেমন আছে সে?

বেশীক্ষণ ভাবতে হল না। ওঘরের দরজা খুলে নিত্যকালী বেরিয়ে আসছিল।

অনেক ভেবেচিন্তে তাকে জিজ্ঞেস করল অভিজিৎ, নীরা এখন কেমন আছে?

এখন তো ভালই আছে। পালি বলছে, ওষুধ খাবে না, কিছুই হয় নি তার।

অ।—বলেই থেমে গেল অভিজিৎ।

তারপর ঘরের ভেতর যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতে একসময় সিঁড়ি বেয়ে নীচেই নেমে গেল সে। বেরিয়ে গেল বাড়ির বাইরে।

* * *

দুটো দিন দারুণ অস্বস্তিতে কাটল তার। কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারছিল না। কোন কাজ করতে পারছিল না শান্তিতে। ঘরেও স্বস্তি পাচ্ছিল না। বাইরেও না।

নীরা ভাল হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে প্রায়। কাজও করে সবই।

কিন্তু ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না অভিজিৎ। কথাও বলতে পারে না সহজভাবে। কেমন একটা অপরাধবোধে বোবা হয়ে থাকে সে।

যন্ত্রণা—অসহ্য যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় ওর। কি করবে, কোথায় যাবে, কিছুই ভেবে পায় না।

অথচ কিছু একটা না করলেও শান্তি নেই। এইভাবে আর কিছুদিন থাকতে হলে মরে যাবে সে। মানসিক যন্ত্রণাটাকে চাপতে গিয়েই একদিন মরে যাবে।

সব কাজে ভুল হয়ে যাচ্ছে ওর। যা হবার নয়, তাই হচ্ছে আজকাল। বিশ্রী হয়ে উঠেছে মনটা। একটা কাজের কথা মনে রাখতে পারে না সে।

আজ সকাল থেকেই ডায়েরীটা খুঁজছে সে। কিন্তু কোথাও সেটা খুঁজে পাচ্ছে না। কোথায় গেল ডায়েরীটা? তার অতি প্রয়োজনের জিনিসটা। এটা না হলে তার কোনমতেই চলে না। চলবে না কোন রকমেই। এটাই এখন তার একমাত্র সম্বল।

মনের যত যন্ত্রণা তা কথা দিয়ে এখানেই ধরে রাখে সে। রেখে আনন্দ পায়।

এ এক আশ্চর্য! মানুষ তার দুঃখকেও সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেখতে ভালবাসে। দুঃখটা তখন আর শুধুই দুঃখ নয়, একটা আনন্দও আনে।

অথচ তার এতবড় সান্ত্বনার জিনিসটাই গত দুদিন ধরে পাচ্ছে না সে। পাগলের মত তন্নতন্ন করে খুঁজেছে সর্বত্র, কিন্তু পাচ্ছে না। আবার মুখ ফুটে নীরাকে জিজ্ঞেসও করতে পারছে না।

আজও সারাটা দিন গেল। সব কাজই হল উড়ো উড়ো মন নিয়ে। বিকেলে কলেজ থেকে এসেও খুঁজল খানিকটা, কিন্তু পেল না। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে একসময় নীরাকেই জিজ্ঞেস করল আমতা আমতা করে, আচ্ছা, আমার ডায়েরীটা দেখেছ কোথাও?

ওর জামাকাপড়গুলো সাজিয়ে রাখছিল নীরা। সহজভাবেই বলল, হ্যাঁ, সেটা তো আমার কাছেই আছে।

অপ্রত্যাশিত আনন্দে চকচক করে উঠল অভিজিতের চোখ দুটো: তাই নাকি! দাও তো ওটা আমাকে।

মুখ বুজে নিজের ঘরে চলে গেল নীরা। এসে ডায়েরীটা দিল অভিজিৎকে।

আর তৎক্ষণাৎ সেটাকে একবার উলটে-পালটে দেখতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল অভিজিতের যে ডায়েরীটার কয়েকটা পাতা শেষের দিকে ছেঁড়া।

তারপর ডায়েরীটার দিকে তাকিয়েই বলল, এটার ভেতর থেকে পাতাগুলো ছিঁড়ল কে?

আমি।—সহজ কণ্ঠেই বলে ফেলল নীরা।

তুমি!—বিস্ময়ের আর শেষ রইল না অভিজিতের।

হ্যাঁ, আমি।

কেন?

কারণ, যা-তা কতকগুলো কথা লিখেছ বলে।

ওগুলো যা-তা কথা বলে তোমার মনে হল?

তা ছাড়া আর কি? আমি জঘন্য হয়ে গেলাম, আমি পশু হয়ে গেলাম—এই তো তোমার কথা?

হ্যাঁ। এগুলো কি সত্যি নয়?

একটুও না। যতসব বাজে কথা।

সত্যি বলছ? তোমার একটুও ঘৃণা নেই আমার ওপর? একটুও কুৎসিত মনে হচ্ছে না আমাকে?

মোটেই না। বরং তুমি ভালই করেছ আমাকে আঘাত করে। আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি এখন।

সত্যি? সত্যি এগুলো তোমার মনের কথা নীরা?

আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, আমরা অত বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারি না।

বলতে বলতে ওর কাছে এগিয়েই এসেছিল নীরা। ওর চেয়ারের হাতলের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল একটু। বোধ করি, গত দুদিনের গুমোট ভাবটা কাটাবার জন্য নীরাও ব্যস্ত হয়েছিল মনে মনে। সামান্য সুযোগ আসতেই তাই প্রাণপণে ঝুঁকে পড়ল।

আর অভিজিৎ অভাবনীয় আনন্দে ওকে জড়িয়ে ধরল। হয়তো আরও একটু গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতে চেয়েছিল। কিন্তু নীরা বাধা দিল।

বলল, ছাড়, কি হচ্ছে! দেখতে পাচ্ছে যে।

কে?

ও বাড়ির পাখিটা।

বলেই উলটোদিকের বাড়ির বারান্দায় ঝোলানো পাখিটাকে দেখাল নীরা। অভিজিৎ তাকাল ওদিকে।

আর সেই পলকে নীরা চলে গেল বেশ একটু দূরে। কিন্তু তবুও অভিজিতের বুকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল।

চুড়ি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দশগাছা হাল-ফ্যাশানের চুড়ি গড়ানোর পর গৃহিণীর মুখে হাসি আর ধরে না। সকলকে দেখানো হয়ে গেছে। বাকি ছিল শুধু পিত্রালয়। এবার তাও হয়ে গেছে।

ফিরে এসে তিনি আনন্দিতচিত্তে নানা গল্প করে চলেছিলেন। এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ একটু রহস্য-পূর্ণভাবে বললেন, চুড়িগুলো ওখানে একটা ভাল কাজেও লেগে গিয়েছিল, তা জান?—চোখে একটু তির্যক ইশারা।

কি?—আমিও বললাম কৌতূহলী হয়ে।

ওই দিয়ে একজনের মেয়ে দেখানোও হয়ে গেল।

মেয়ে দেখানো!

হ্যাঁ।

বল কি!

হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে সব সময়ে আসত একটা মেয়ে। দিনরাত ওখানেই পড়ে থাকত। বাড়ি যেতেই চাইত না। আমরাই বকে বকে পাঠাতাম। বাড়িতে কেউ নাকি ওকে দেখতে পারত না। কাকার বাড়ি তো! আজকালকার কাকা! হবেই।

তার পর? তার পর?

অনেক বয়স হয়ে গেছে। তবু বিয়ে হয় নি। পয়সারই অভাব। রূপও এমন কিছু যে ফেটে পড়ছে তা নয়, সাধারণই। রঙ ফরসাই। খড়ি উঠছে গা দিয়ে তেলের অভাবে। পা দুটির গড়ন ভারি চমৎকার। একটু দুধের সর বা কমলালেবুর খোসা-বাটার প্রলেপ পাগালে;—আর গোড়ালির গড়ন—আহা, চকচকে নিটোল, গোলাপের পাপড়ির মত নরম। আমারই হিংসে হত দেখে।

তার পর? আসল কথাটার কি হল? গোড়ালির বর্ণনা পরে হবে।

হ্যাঁ, হঠাৎ একদিন শোনা গেল, একজন অল্প টাকায় বিয়ে করতে রাজি, কিন্তু গয়নাটয়না থাকা চাই। তিনিই আসছেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেখতে সেদিন। আমার চুড়িগুলো ছিল নতুন আর মাপেও হয়ে গেল ঠিক—কাজেই ওগুলো তার বলেই চালানো হল।

সব পার তোমরা।—কিছু বিরক্ত হয়েই বললাম।

কি আর করা যায়। ওইটুকুতেই একটা হিল্লে যদি হয়ে যায় মেয়েটার। মেয়েটাকে আমরা সবাই ভাল-বাসতাম খুব। এমন গল্প বলতে পারত রসিয়ে মজিয়ে জমিয়ে যে সবাই শুনত মন্ত্রমুগ্ধের মত। হাত উলটিয়ে, ভুরু কাঁপিয়ে, চোখ নাচিয়ে, উঃ, কি তার গল্প বলার ধরন! মেয়েটার মাকে তো হাঁকিয়েই দিয়েছিলাম, কিন্তু মেয়েটাকে পারলাম না। কি রকম মিনতি করতে লাগল। পায়ে ধরতে বাকি শুধু। যেন ওর জীবনমরণ নির্ভর করছে আমার চুড়িগুলোর ওপর।

মেয়েটা নিজে—নিজে এসেছিল চাইতে? বল কি!

হ্যাঁ, নইলে আর বলছি কি! ওর মুখ দেখে এত কষ্ট হচ্ছিল যে কিছুতেই পারলাম না ফেরাতে। মায়া হতে লাগল।

তার পর?

তার পর আর কি। দেখানো হল। গরীব মানুষ। কত কষ্ট করে খাবারদাবারের যোগাড় করল। খেয়ে-দেয়ে বর মশায় গান শুনতে চাইলেন। মেয়েটা গান ভাল জানে না। তবু তার কি প্রাণান্ত চেষ্টা! ভাল তো হচ্ছিলই না, কিন্তু বন্ধুগুলো কি ছোটলোক! মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে হাসছিল আর গান থামলেই উৎসাহ দেখিয়ে আর একটা আর একটা বলে চিৎকার করছিল। মেয়েটাও এমনি বোকা, গেয়েই চলেছে। একটা, দুটো, তিনটে। গলদঘর্ম—তবু গেয়েই চলেছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে চিরেও যাচ্ছে, তবু গেয়ে চলেছে। কিছু

শতধা খণ্ডিত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

১

শহরে ঘুরেছি ঢের : চেনামুখ অচেনাই লাগে।
সজ্জিত পোশাকে যত ভ্রাম্যমাণ বিলাসী নাগর
বিগত নর্তকীবৃন্দ স্মৃতিচিত্রে রাখে পুরোভাগে,
বণিকের ব্যবসায়ে মুনাফার গোপন স্বাক্ষর।
ক্রমেই উঠছে গড়ে দিকে দিকে অনিন্দ্য প্রাসাদ,
কংক্রীটে উদ্যান ঢাকে, গাছপালা ফুল ভূলুণ্ঠিত ;
আবাল্য বিধবা নারী ফিরে চায় আকাঙ্ক্ষিত স্বাদ,
সমস্ত শহর তীব্র মত্ততার কোলাহলে স্ফীত।

২

চেনামুখ অন্তর্হিত, বন্ধুরা নতুন বন্ধু খোঁজে,
প্রেমিক-হৃদয়ে লুপ্ত স্নিগ্ধতার আর্দ্র রশ্মিচ্ছটা ;
অনিশ্চিত আতঙ্কেই নিজস্ব দিনের চোখ বোজে,
চতুর শিকারী মাখে স্বর্ণরেণু শরীরে কিছুটা।
সাজানো দোকানগুলো সন্ধ্যাকালে বিদ্যুৎ-আভায়
আরোপিত রূপরঙ্গে রোমাঞ্চিত, চঞ্চল ঈষৎ ;
খণ্ডিত নায়ক খোঁজে প্রতিশ্রুত শিল্পভাবনায়
একটি মণ্ডিত মুখ, অনুভবে, প্রণয়ে মহৎ।

৩

শহরে ঘুরছে প্রাণ, দিকে দিকে সন্দিগ্ধ আলোক,
রজনীগন্ধার টবে হাওয়া এলে শেষ চঞ্চলতা ;
মুমূর্ষু গরুর হাড়ে চঞ্চু রেখে শকুনীর চোখ
কোথাও খুঁজবে ফের মাত্রারিক্ত মাংসে উজ্জ্বলতা।
সন্দিগ্ধ আলোকে তুমি জানবে না প্রকৃত স্বরূপ।
রজ্জুকে ভাববে সাপ ছায়াময় রম্য জ্যোৎস্নালোকে ;
বন্ধুর সহিষ্ণু ডাকে ভাববে শত্রু ডাকছে তোমাকে,
মনে হবে নষ্ট ঘ্রাণ দেবালয়ে সুরভিত ধূপ।

৪

সন্দিগ্ধ আঁধারে তুমি নিজেকেই করবে কুঞ্চিত,
দেখবে দয়িতাচোখে অন্য এক মুগ্ধ প্রেমিকের
স্পর্শের বিদ্যুৎদাহ। যে দিকেই যাও প্রতীকের
সন্ধান না পেয়ে মন জ্বলে পুড়ে শতধা খণ্ডিত।

*

বুঝতেই পারছে না। আমার এমন রাগ হচ্ছিল যে কি বলব—

তার পর? শেষে কি হল? বিয়ে হল?

নাঃ, পছন্দ হল না। মুখে বলল বটে অন্য কথা, কিন্তু আসল কথাটা হল টাকা। নেব না নেব না বলে ঢং করছিল শুধু। নেবার ইচ্ছে ষোল আনাই। চুড়িগুলো ফেরাতে এসে মেয়েটার কি দশা! আমি একটু আহা করতেই আর সামলাতে পারল না। কেঁদে ফেলল ভ্যাক করে। টস্‌টস্ করে জল পড়তে লাগল চোখ দিয়ে। ভাঙা গলায় কেবল বলতে লাগল, তাহলে এত করে গান গাওয়াবার কি দরকার ছিল! অপমানটা টের পেয়েছিল পরে। তাই লজ্জার একশেষ একেবারে।

শুনে সত্যিই দুঃখিত হলাম। মুখেও বললাম, ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়। মেয়েদের ওপর এই অত্যাচার কবে শেষ হবে কে জানে!

কিছুদিন পরে গৃহিণীর পিত্রালয় থেকে চমকপ্রদ খবর এল। গৃহিণী চিঠি হাতে করে ছুটে এসে চোখ বড় বড় করে বললেন, শুনেছ? সেই মেয়েটার নাকি একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছিল। মেয়েটা বলেছে, আর বেরুব না। কিছুতেই না, মরে গেলেও না।

ঠিক হয়েছে। এই তো চাই। মেয়েরা কেবলই যার-তার কাছে রূপ দেখিয়েই বেড়াবে?

হ্যাঁ, তুমি তো তা বলবেই। তোমার কি?

বলা বাহুল্য, গৃহিণী একমত হতে পারলেন না।

কিছুদিন পরে আরও চমকপ্রদ সংবাদ এল গৃহিণীর পিত্রালয় থেকে।

মেয়েটির কাকা নাকি তাকে দূর হতে বলেছিলেন। তা সে তাঁর কথা শুনেছে। পাড়ার একটি সদ্য-ভাল-চাকরি-পাওয়া সুপুরুষ ছেলের সঙ্গে দূর হয়েই গেছে।

—

কাহিনীকার

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দুর্মদ যৌবন,—তার অতৃপ্ত কামনা লয়ে বুকে
রাত্রি অন্ধকারে ঢাকি সংসারের পরিচিত মুখ,
ভয়ে ভয়ে চুপে চুপে চোরের মতন
হয়তো এসেছ কোনদিন
এসেছ একেলা কিংবা এ পথের পথিক যে-জন
চেনাশুনা অন্ধকার গলিঘুঁজি দিয়ে
হাত ধরে এনেছিল আমার বা আর কোনও
সন্ধ্যার বাসরে।
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস যেথা একাধিক সহস্র রজনী—
গুমরিয়া মরিয়াছে নিষ্ফল আক্রোশে ;
জীবনের ক্ষয়ক্ষতি অশেষ বঞ্চনা
পুঞ্জীভূত বেদনায় কাঁপে থরথর ;
তবু সেথা ক্ষণভৃঙ্গনের ফেনিল উচ্ছ্বাস আছে,
আপাত-রম্যতা কিছু, অবসাদ
নিষিদ্ধ ফলের জন্য অন্বেষণ জৈবজীবনের।
হয়তো আস্বাদ তার লেগেছে মধুর
হয়তো আশ্চর্য বলে' আকর্ষণ তার।
অনাঘ্রাত কুসুমের গন্ধমধু আহরণ তরে
ভ্রমরের আবেগ-চুম্বন
অনায়াস-লভ্য নয় ;
তার তরে আছে প্রেম-উৎসর্গের স্বর্গীয় মহিমা।
সে তো তোমাদের তরে নহে।
হেথা আছে প্রেমের বিলাস—
সম্ভোগের উপকণ্ঠে
আছে এক অসহ্য উদ্বেগ
উদগ্র কামাগ্নি জ্বালা অগ্নিগর্ভে নির্বাপণ তার
কয়েক মুহূর্তমাত্র
স্থিতি তার আরণ্য উল্লাসে।

ফিরে ফিরে আসিয়াছ তাই
নয়তো ছুটেছ চলে উপবাসী আত্মার দুয়ারে।

তারপর বুঝিলে যখন
একই পানপাত্রে ঢালা ফেনায়িত সুধা ও গরল
তবু তার আকর্ষণ স্নায়ুরন্ধ্রে জাগায় কম্পন
তখন এসেছ শুধু না আসাই অসম্ভব বলে।

নিজের সময় মেপে
অথবা সময় যেথা আমাদের দেয়াল-ঘড়িতে
ঘণ্টার কাঁটায় তোলে টাকার হিসাব ;
ভাল মন্দ কম বেশী
তাই দিয়ে যাচাই করেছ
দেহের কদর কিংবা নিরাসক্ত আদরের দাম।
যাচাই কর নি মন—
মনের অতলে যেথা যম-যন্ত্রণায়
আশার মুকুলগুলি একে একে ঝরে বেদনায়।
দেখ নি তো যে অসহ্য রিক্ততার জ্বালা
অবিরাম দহিতেছে এ জন্ম জীবন,
স্পর্শ করে দেখ নি তো দেহাতীত যে পরম ধন
অপব্যয়ে অপচয়ে হয় নি নিঃশেষ
কঠিন নির্মোক তার ;
তবু যদি স্পর্শ পায় মহৎ প্রাণের
মুক্তি পায় সত্য মূল্যে তার,
আলোকে পুলক জাগে এ চির-আঁধার কারাগৃহে।

তোমরা যে আস বন্ধু
অন্বেষিতে রাত্রি-সহচরী,
উতলা মুহূর্তগুলি
কামনার অধৈর্য আবেগে
দুই হাতে করিতে লুণ্ঠন,
ফেনায়িত ক্লেদপঙ্কে রচিয়া শয়ন
বাসর জাগিতে চাও মূঢ়ের মতন।

আর কিছু দেখ না , দেখেছ কেবল
লুব্ধ কামার্ত চোখে
এ দেহের সুঠাম গঠন,
পীনোন্নত পয়োধর অধর-পল্লব
শ্রোণিভারে অবনত এ দেহের মন্থর ভঙ্গিমা,
নীবিবন্ধ স্খলিত বসনে
দেখেছ অবাক হয়ে রতি বাসনার
ভোগলুব্ধ নিগূঢ় ইঙ্গিত।

তোমরা এসেছ শুধু সম্ভোগ তৃষ্ণায়
আরণ্যক জাগুয়ার সম
নখদন্তে ভয়ঙ্কর প্রমত্ত চঞ্চল,
নিষ্পেষণে এ দেহের সমস্ত শোণিত
নিঃশেষে করিতে পান দৃঢ় আলিঙ্গনে ;
তারপর ফেলে যেতে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মত।

আমাদের কিছু তাতে যায় আসে নাকো,
বহুভোগ্যা আমরা স্বৈরিণী।
শুধু তোমাদের কাছে মিনতি মোদের,
যা দেখেছ ভুলে যাও,
যা পেয়েছ পণ্যমূল্যে
দিও নাকো কিছু তার দাম—

শুধু এইটুকু দয়া
এইটুকু অনুকম্পা ভরে
আমাদের জীবনের অন্ধকার বাতায়নগুলি
খুলিয়া দিও না গর্বভরে
নিরুৎসুক চোখের সম্মুখে।
স্তব্ধ কর অকুন্ঠিত অলজ্জ বর্ণনা,
ক্ষান্ত কর স্পর্ধিত লেখনী
ধুয়েমুছে ফেলে দাও
রঙ-করা তুলির লেখন,
ভাগ্যের লেখন নিয়ে নিষ্ঠুর জল্পনা
বন্ধ কর—
বন্ধ কর ভ্রষ্টাচার স্বধর্মের গ্লানি।

জগৎসংসারে যদি কিছুমাত্র মূল্য থাকে
বারনারী সেও নারী বলে'
সে কেবল নির্বিশেষ আত্ম-উৎসর্গের,
এ দেহের চরম দুঃখের
নিদারুণ সমাপ্তির করুণ কাহিনী,
তার যে কাহিনীকার
"আদিরস কীর্তনীয়া" নহে ;
সে এখন অনাগত
অগ্রদূত "যুগ-যন্ত্রণার"।

*

আলমারির আত্মকাহিনী

সাধনা মুখোপাধ্যায়

কখনো ছিলাম বনে ঘাসেদের অন্তরঙ্গ,
মাটির স্তনের গন্ধ আমাকে বিভ্রান্ত করে তাই ;
এ বিলাস সামগ্রীর বন্ধলয় নিয়ত আসঙ্গ,
তার থেকে ছুটি পেয়ে আমি আজ মুক্ত হতে চাই।
উইকে প্রশ্রয় দিই চূর্ণ হয়ে যদি আমি ফের
মাটি হয়ে যাই আর প্রাণের সে অমৃত সুখের
স্বাদ পাই পুনরায়, আকাশ ঘরের ছাদ হয়,
হাওয়া জল ফুল পাতা পরিচিত স্বরে কথা কয়।

দোকানী বলুক যাই বর্মার টিক্ আমি নয়,
স্বদেশী আম্রতরু আমার পুরনো পরিচয়।
মুকুল ধরেছে কত গন্ধে আমত্ত কিশলয়ে,
হাওয়া উঠন হল ফাগুন গেছে কথা কয়ে।

রসালো রসাল কত রসনার সেবায় নিহত,
চাই নি নিজের সুখ দিয়েছি সাধ্যে আছে যত।
ভাবি নি এতে কি ক্ষতি ভাবিও নি এতে কি যে লাভ,
তার এই পরিণতি আজ আমি মৃত আসবাব।

তোমরা যখন এসে আমার বুকের দেখ শোভা,
কাচের টি-সেট আর জাপানী পুতুলগুলো বোবা,
আমাকে আধার ভাব ভঙ্গুর এরা সব যাতে,
ছোঁয়ার বাইরে থেকে রূপ আনে ঘরের সভাতে,
তখন একটু ভেবো আর কোন চাইনেকো দয়া,
আকাশের শ্বাস নিয়ে ছিলাম যে মাটির তনয়া।
আজকে বন্দী আমি তোমাদের খুশীর কবাতে,
আমার স্বরূপ গেছে জুটেছে এ মন্ত্র বরাতে,
বিকৃত এ অবয়ব কাচের এ নিষ্প্রাণ মুখ,
নিজের অতীত মুছে তবু দিই তোমাদের সুখ।

—

নিকষিত হেম

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

এক সপ্তাহ নিতান্ত কম সময় নয়, ওর মধ্যে কত পরিবর্তনই তো হতে পারে। তা যে মনোতোষ জানে না তা নয়। তবে কী পরিবর্তন যে হয়েছিল তা তার জানা ছিল না। তাই ওই খোঁটা তাকে খেতে হল।

বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে উপরে নিজের ঘরে যেতে যেতে হাঁক দিয়ে বলে গেল মনোতোষ: আজ কিন্তু আমি বাড়িতেই আছি, চা-টা যেন পাই।

চা সে পেল প্রায় আধঘণ্টা পর; চা নিয়ে এলেন অন্নপূর্ণা স্বয়ং।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই তিনি বললেন, এ আবার কি বদ অভ্যাস হল তোর, আগের মত খাওয়ার ঘরে চা খেতে গেলি নে কেন?

মনোতোষ বিব্রত হয়ে বলল, কাল থেকে তাই যাব।

কিন্তু চায়ের বাটিতে দুটি চুমুক দেবার পর ভেতরের উত্তাপটুকু সে আর চেপে রাখতে পারল না; বলল, তুমিই তো পর পর প্রায় পনর দিন আমার এই ঘরে চা পাঠিয়ে আমার ওই বদ অভ্যাসটা করিয়েছ। তবে আবার গাল দাও কেন? নীচে থেকে একটা হাঁক দিলেই নীচের ঘরেই চলে যেতাম আমি।

শুনে কিন্তু হাসলেন অন্নপূর্ণা; বললেন, বাবা রে বাবা, ছেলের আমার এখনই এই মেজাজ, ডাক্তার হয়ে বেরুলে না জানি কি হবে!

মনোতোষ তাতে আরও বিরক্ত হয়ে বলল, মেজাজ কি সাধে হয়? তোমার প্রথম দোষ, তুমি আমায় ডাক নি; দ্বিতীয় দোষ, চা নিয়ে এই তোমার উপরে উঠে আসা। কেন, ভূতিকে না পাঠিয়ে তুমি নিজে এলে কেন?

কারণ না থাকলে কি আর আসি।

কি কারণ?

ভূতি এখন অন্য কাজ করছে।

কি কাজ?

খুব ভাল কাজ রে মণ্টু, আর খুব দরকারী কাজ।—বলে হাসলেন অন্নপূর্ণা।

তারপর তিনি কথাটা বুঝিয়েও বললেন: গত চার-পাঁচ দিন যাবৎই করছে, কর্তাও এই সময়ে কোর্ট থেকে ফিরে আসেন কিনা। তিনি এলেই ভূতি যায় তাঁর পায়ে বাতের তেল মালিশ করতে। এতদিন তো আমিই ও কাজ করছিলাম। সেদিন ওঘরে যেতে আমার একটু দেরি হয়েছিল বলে বুঝি রাগ করেই তিনি সেদিন ভূতিকে দিয়ে মালিশ করিয়েছিলেন। তার পর থেকেই দেখছি ভূতি বলতেই অজ্ঞান। এখন ভূতি মালিশ না করলে তাঁর চলেই না, বলেন যে ওর অর্ধেক যোগ্যতাও নাকি আমার নেই।

শুনতে শুনতে বিরক্তি কেটে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল মনোতোষের মুখ; অন্নপূর্ণা থামতেই প্রায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মনোতোষ বলল, শুশ্রূষার কাজে ভূতির হাত, মা, সত্যিই খুব ভাল। আমি তো অনেক দিন থেকেই দেখছি, অন্য অনেকের চেয়ে অনেক ভাল শুশ্রূষা করতে পারে ওই ভূতি।

বটে!—বলে অন্নপূর্ণা আরও বেশী হাসলেন বলেই হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করে মনোতোষ বলল, আমি কিন্তু মা তোমার সঙ্গে তুলনা করবার জন্য ও কথা বলি নি।

বললেও দোষ ধরতাম না আমি।—অন্নপূর্ণা স্মিত মুখে উত্তর দিলেন: সত্যিই ওর হাতের কাজ খুবই ভাল, আর সব কাজই তাই। কিন্তু আমি ভাবছিলাম—

কি?

ভূতির এত গুণ সবই যদি তোর চোখে পড়ে থাকে তবে ওকে এত গালাগালি দিস কেন তুই?

গালাগালি দিই?

দিল বইকি। গেঁয়ো ভূত বললে গালাগালিই তো দেওয়া হল।

শুনে প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল মনোতোষ, তারপর একটু লজ্জিত; শেষে কিন্তু হেসেই সে বলল, ভূতি বুঝি তোমার কাছে নালিশ করেছে?

নালিশ কেন করবে—দুঃখ করল।

তা গেঁয়োকে গেঁয়ো বলব না তো কি?

বলা উচিত নয়। কানাকে যে কানা বলতে নেই তা বইয়ে পড়িস নি তুই? ভূতি ভেবেছে যে সে গেঁয়ো বলেই তাকে কোথাও তুই নিয়ে যেতে চাস নে।

বলেছে নাকি? মেয়েটার পেটে পেটে দুষ্টুবুদ্ধিও তো তাহলে কম নেই মা!

না রে মন্টু।—বলে কিন্তু মাথা নাড়লেন অন্নপূর্ণা: দুষ্টু বা ভাল কোন বুদ্ধিই ওর নেই। তবে নেই যে তাই ওর ওপর ঠাকুরের আশীর্বাদ বলতে হয়। নইলে কি ওর মত পোড়াকপাল নিয়েও এমন হেসেখেলে দিন কাটাতে পারত মেয়েটা!

খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো বললেন অন্নপূর্ণা; করুণায় কোমল তাঁর কণ্ঠস্বর। সুতরাং মনোতোষ কৌতুক করেও প্রতিবাদ করতে পারল না, সমর্থন করতেও লজ্জা লাগল তার।

একটু পরে অন্নপূর্ণাই আবার বললেন, ওর সঙ্গে এখানে একটু সমঝে কথা বলিস মন্টু। কদিনের জন্যেই বা ও এসেছে, গেঁয়ো বা বোকা বলে ওর মনে আঘাত দিস নে। আর আসছে রবিবার ওকে নিয়ে আমি দক্ষিণেশ্বর যাব ঠিক করে রেখেছি। মনে থাকে যেন—তোকেও সঙ্গে যেতে হবে।

অত কথার কিছুই তো জানে না তুলসী; জানে না সামনে ভবিষ্যতের গর্ভে যা অদৃশ্য হয়ে আছে সেই তার অদৃষ্টকেও। সে শুধু দেখল তার মন্টুদার পরিবর্তনটুকুই, যে এতদিন অত অনুরোধসত্ত্বেও কিছুই তাকে দেখাতে নিয়ে যায় নি সেই লোকই হাসি-হাসি মুখে সেদিন তাদের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠল, আর তা ছাড়া যে জিনিস সে নাকি কোনদিনই দেখে নি তাদেরই একটি, মানে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখবার জন্য। তাতেই খুশী যেন মনে আর ধরে না তার; সে উৎফুল্ল হয়ে বলল, ঠাকুর তাহলে তোমাকেও টান দিলেন মন্টুদা?

লাজুক লাজুক হাসি হেসে মনোতোষ উত্তর দিল, ঠাকুরের কথা তো জানি না—আমি দেখছি যে তুই আমাকে বাড়ি থেকে টেনে বের করলি।

শোন কথা! শুনলে তো কর্তামা?—অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল তুলসী।

তখন বিজয়গর্বে বুক যেন ফুলে উঠেছে তার; সেই গর্বের প্রকাশ তার মুখে এবং চোখে। অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা সে উচ্চারণ করে থাকলেও তার আর একটা চোখ গিয়ে পড়ল মনোতোষের মুখের উপর; সে চোখে অনুচ্চারিত আর একটি প্রশ্ন: কেমন জব্দ!

যেন তা বুঝতে পেরেই মনোতোষ বলল, তবে এই যাওয়া পর্যন্তই। ওখানে পুজোটুজো করতে পারব না আমি—তা কিন্তু মা প্রথমেই তোমাকে বলে রাখলাম।

তা কি আর জানি নে আমি!—অন্নপূর্ণা একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললেন: তুমি না বলতেই জানি।

কিন্তু তুলসী বেপরোয়ার মত বলে উঠল: আচ্ছা আচ্ছা, আগে চল তো মন্দিরে। তখন দেখব পুজো না করে কেমন থাকতে পার তুমি।

মন্দিরেও ওই ভাবই তুলসীর—একটা যেন জয় করবার নেশায় পেয়েছে তাকে। ভবতারিণীর মন্দিরের সদর দেউড়ি পর্যন্ত গিয়েই থমকে দাঁড়িয়েছিল মনোতোষ; তুলসী তখন আকাশ থেকে পড়বার মত মুখ করে বলল, ওমা, এ কি কাণ্ড তোমার মন্টুদা! ঠাকুরবাড়ির দোর থেকে কেউ ফিরে যায় নাকি! না না, ভেতরে চল তুমি, পুজো না করলেও দর্শন তো হবে।

কি একটা তিথিই বুঝি সেদিন ছিল। যাত্রী অনেক এসেছে। দেউড়িতে সংখ্যা তাদের তুলনায় কম হলেও সংকীর্ণপরিসর স্থানটুকুতে ভিড় বেশ ঘন। সেই ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওকথাটা বলেছে তুলসী—তাই কণ্ঠস্বরে আবার উদ্বেগের কম্পনও আছে। সে স্বর আরও যাদের কানে গিয়েছে তারাও বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছে ওই তুলসীরই দৃষ্টি অনুসরণ করে মনোতোষের মুখের দিকে। অতগুলি বিরুদ্ধ শক্তিকে ঠেকাতে পারল না মনোতোষ। কথা আর না বাড়িয়ে সেও অঙ্গনে গিয়ে প্রবেশ করল।

তারপর অসহায় অবস্থা তার।

সামনে তুলসীর টান, পেছনে ভিড়ের ঠেলা—এগিয়ে না গিয়ে উপায় নেই। স্রোতের জলে হালকা একটি কুটোর মত অবস্থা মনোতোষের। ভবতারিণীর মন্দিরের বারান্দায় ওঠবার পর একটি যেন ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে গেল সে।

কিন্তু মন্দ লাগছে না তো! দেখতে দেখতে এক-সময়ে সবিস্ময়ে অনুভব করল মনোতোষ যে মন্দিরের সব দৃশ্য ভালই লাগছে তার। মন্দিরের মধ্যে মনোরম পুষ্পসজ্জা। ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে চুয়া চন্দন ও ধূপের সৌরভ। অপ্রাকৃত চিন্ময় দেবতাকে না চাইলেও অত রূপ রস শব্দ ও গন্ধ যেন হেঁচে এসে ধরা দেয় প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে। এড়াতে পারে নি মনোতোষ। আর ভালও লাগছিল তার। ভাল লাগছিল যারা পুজো করে তাদেরও। পরনে শুচিবাস, সসম্ভ্রম পদক্ষেপ, ভাব-বিহ্বল মুখ, সাগ্রহ দৃষ্টি সকলেরই। বিগ্রহের দিকে চেয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ায় তারা, তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে। মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় বিশেষ করে মেয়েদের গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করবার ভঙ্গিটি দেখে।

অন্নপূর্ণা বাইরের একটি দোকান থেকেই ফলমূল মিষ্টান্ন কিনে নিয়ে এসেছিলেন। ঠোঙাটি তিনি পুরোহিতের হাতে দিলেন দেবতাকে নিবেদন করে দেবার জন্ম। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলেন তিনি; তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তুলসীও।

তন্ময় হয়ে দেখছিল মনোতোষ। হঠাৎ তুলসীর কণ্ঠস্বর কানে এল তার: আমার তো কিচ্ছু নেই মণ্টুদা, ঠাকুরকে দেবার জন্ম দুটো পয়সা দেবে আমাকে?

সুপ্তোত্থিতের মত জেগে উঠল মনোতোষ, দেখল যে তুলসী একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। পরক্ষণেই পকেটে হাত দিয়ে যা তার হাতে ঠেকল সব মুঠো করে তুলে সে তুলসীর হাতে দিল তা।

প্রাঙ্গণে নেমে আসবার পর সে কী উল্লাস তুলসীর। একসঙ্গেই দুজনেরই মুখের দিকে চেয়ে অন্নপূর্ণাকে সে বলল, দেখলে তো কর্তামা? আমি আজ পুজোও করালাম মণ্টুদাকে।

বাঁধ তখন ভেঙেছে।

শীতকাল। মধ্যাহ্নের তখনও অনেক দেরি। মন্দিরের উত্তরে প্রকাণ্ড উদ্যান সকালের কাঁচা রোদ গায়ে মেখে ঝলমল করছে। পঞ্চবটীর নীচে লুকোচুরি খেলা চলেছে আলো আর ছায়ায়। লোকে লোকারণ্য সেখানে। সাজের যেমন বৈচিত্র্য, বয়সেরও তেমনি। সাধু বা ভিখারীর গায়ে গা ঠেকিয়ে চলেছে গৃহী; মহিলাদের পায়ে পায়ে কিশোরী বা শিশু। যাত্রী নয়, পুজো করতে আসে নি—এমনও কত লোক সেখানে এসে জুটেছে শীতের ছুটির দিনটিকে প্রিয়জনকে নিয়ে উপভোগ করবার জন্ম। মন্দিরের যেমন, উদ্যানের চারিদিকে তেমন দেয়াল নেই, পুজো ওখানে থাকলেও নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান নেই তার। সাধু-সন্ন্যাসীর সাজ যাদের তারাও প্রাণ খুলে গান গাইছে ওখানে। যুবক-যুবতীরা উল্লসিত, শিশুরা উদ্দাম। বাঁধভাঙা প্রাণ বন্যার বেগে ছড়িয়ে পড়েছে—কোন কোন ধারা তার এঁকেবেঁকে ছুটে যাচ্ছে ভাগীরথীর দিকে।

মন্দিরের ঘাট থেকেই যাত্রী নিয়ে নৌকো যায় ওপারে বেলুড় মঠে। দু-পাঁচ মিনিট পরে পরেই বড় বড় এক-একখানি নৌকো যাত্রীবোঝাই হয়ে ছেড়ে যাচ্ছে।

ঘাটে দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্য কিছুক্ষণ দেখবার পর তুলসী বলল, আমরা বেলুড় মঠে যাব না কর্তামা?

তেমন পরিকল্পনা ছিল না অন্নপূর্ণার; তিনি সকাল সকাল এসেছিলেন ভবতারিণীর মন্দিরে পুজো দিয়েই বাড়ি ফিরে যাবেন মনে করে। তবু তুলসীর প্রশ্ন শুনে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ফুর্তির কথা শুনলি তো মণ্টু?

সঙ্গে সঙ্গেই তুলসীও মনোতোষের মুখের দিকে চেয়ে আবদারের স্বরে বলল, যেতেই হবে মণ্টুদা। বেলুড় মঠও তো শুনলাম যে খুব এক বড় তীর্থ। আজ এত কাছে এসেও ওখানে যদি না যাই তবে জীবনে আর হয়তো কোনদিন যাওয়াই হবে না।

ভাটির সময় সেটা। ভাগীরথী সম্পূর্ণ শান্ত। দেখতেও সুন্দর। ছোট ছোট এক একটি তরঙ্গের মাথায় পড়ে রোদ জলছে এক একটি সোনার প্রদীপের মত। মনোতোষ তুলসীর মুখের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে সেই আলো-ঝলমল ভাগীরথীকে দেখল কিছুক্ষণ; তারপর ফিরে আবার তুলসীরই মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, চল্ তাহলে—এত যখন তোর সাধ।

নতুন নির্মল হাফ-বার সাবানে
কাচলে আপনার কাপড়চোপড় হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর

অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চেয়ে কথাটা সম্পূর্ণ করল সে: তবে আমরা একটা আলাদা নৌকো নেব মা—পাঁচজনের নৌকোতে বা ভিড়।

৭

নৌকোতে থাকতেই অন্নপূর্ণার মুখখানি ভার ভার হয়েছিল, বেলুড় মঠে পৌঁছবার পর বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।

কিন্তু তুলসীর অবস্থা প্রায় বিপরীত। ভাবে সে উৎফুল্ল, আচরণে উদ্দাম। যতক্ষণ নৌকোতে ছিল, ততক্ষণ কেবলই বকবক করেছে; ডাঙায় নামবার পর সে গতিতেও চঞ্চল।

অন্নপূর্ণা একবার ধমক দিয়েছিলেন, তুলসী হেসেই উড়িয়ে দিল তা।

এবার আর কৌশলে নয়, খোলাখুলিই জেদ করছে সে, মনোতোষকে বারবার বলছে ঠাকুর প্রণাম করতে।

মন্দিরে শ্বেতপাথরের মনোহর মূর্তি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের। জীবনে যেমন তিনি ছিলেন, মূর্তিতেও তাই। স্বর্গই মর্ত্যে নেমে এসেছিল, জীবদেহেই পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়েছিল শিবের। ভাস্করের সৃষ্টিতেও সেই ভাব। ওপারের শ্রীশ্রীভবতারিণীর মত নয়। এ মন্দিরের যিনি ঠাকুর, সামান্য মানুষেরই রূপ তার, কিন্তু করুণাঘনতায় অসামান্য।

কী সুন্দর ঠাকুর মণ্টুদা!—দর্শনমাত্রই উচ্ছ্বসিত তুলসী।

তারপর সেই তার অনুনয়, অনুযোগ, অভিমান।

এমন সুন্দর ঠাকুর, তবু তোমার প্রণাম করতে ইচ্ছে হয় না?—তুলসী বলল মনোতোষকে।

উত্তর না দিয়ে একটু কেবল হাসল মনোতোষ।

অন্নপূর্ণার অনুকরণে গলায় আঁচল দিয়ে তাঁরই মত হাঁটু গেড়ে বসেছিল তুলসী, মাথা নোয়ানোর আগেই মনোতোষকে সে অনুরোধ করল প্রণাম করতে।

তারপর ওই অভিযোগ। কিন্তু ওই হাসিটুকু ছাড়া আর কোন সাড়া সেই মনোতোষের।

অন্নপূর্ণা নিজে ততক্ষণে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তুলসী তখন মাথাটা ঘুরিয়ে তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে বলল, তুমি বল কর্তামা, মণ্টুদাকে প্রণাম করতে বল তুমি।

কিন্তু উত্তরে অন্নপূর্ণা বেশ একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বললেন, নে, খুব হয়েছে। নিজে তুই প্রণাম করবি তো কর্। নইলে উঠে চল্ এখন।

তা আদেশ তখনই পালন করেছিল তুলসী।

বাহু দুখানি সামনের দিকে প্রসারিত করে নাটমন্দিরের মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল তুলসী। বুঝি সম্পূর্ণ তৃপ্তি তাতে হল না বলে পরক্ষণেই আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত তার। কিন্তু তাতেও শেষ হল না। দণ্ডবৎ প্রণামকে গুটিয়ে পুনরায় হাঁটুগাড়া ভঙ্গিতে আনবার পর পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে আবার মনোতোষকে সে বলল, এত করে বললাম, তবু কথা রাখবে না মণ্টুদা, প্রণাম করবে না তুমি?

এবার উত্তর দিল মনোতোষ: তুইই তো দুবার প্রণাম করলি। ওতেই আমারও হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু শুনে যেন শিউরে উঠল তুলসী; বলল, অমন কথা বলো না মণ্টুদা, বলতে নেই।

একটু থেমেই সে আবার বলল, আমার জন্যে আজ তুমি অতই যখন করলে তখন একটা প্রণামও এখানে কর। দেখছ না সবাই প্রণাম করছেন!

হাঁটু গেড়েই তো বসেছিল তুলসী। যে প্রার্থনা তার কণ্ঠে বেজে উঠল সেই প্রার্থনাই তখন ফুটল তার চোখের দৃষ্টিতেও। সেই চোখে চোখ পড়তেই একটা যেন টান লাগল মনোতোষের ঘাড়ে। দুর্বার সে আকর্ষণ। প্রতিরোধ করতে পারল না মনোতোষ। তখন দু পা এগিয়ে গিয়ে তুলসীর পাশেই সেও হাঁটু গেড়ে বসল। তুলসী আবার মাথা নোয়াল, সঙ্গে সঙ্গে মনোতোষও।

কিন্তু কোথায় ঠাকুর? বিগ্রহ আছেন তাঁর মন্দিরে, বেশ খানিকটা দূরে। এখানে তখন ওরাই তিনজন। প্রণাম সেরে মাথা তুলতেই আবার তুলসী ও মনোতোষের চোখাচোখি হয়ে গেল। লাজুক-লাজুক ভাব মনোতোষের—ভাল লাগলেও তা স্বীকার করতে চায় না যেন। কিন্তু তুলসীর ভাব বিপরীত—ভীরু-ভীরু মুখ আর নয় তার, অনুনয়ে সজলও নয় চোখের দৃষ্টি। মনোতোষের মুখের দিকে চেয়ে চোখ দুটি তার খঞ্জনের মতই নেচে উঠল, কিন্তু তার মুখের হাসি যেন ছুটে গিয়ে অঞ্জলির ফুলের মতই অন্নপূর্ণার পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল।

দেখলে তো কর্তামা? মণ্টুদাকে প্রণামও করালাম আমি।—বলল তুলসী।

কিন্তু একেবারে অন্য ভাব অন্নপূর্ণার। মুখে তাঁর একটুও হাসি নেই; চোখের দৃষ্টি তাঁর ওদের দুজনকে ছেড়ে, নাটমন্দির ছেড়ে, গর্ভগৃহে ঠাকুরের মূর্তিকেও বিদ্যুদ্বেগে অতিক্রম করে মরুভূমির মধ্যে ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বিনীর মত কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। অমন যে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের ঘোষণা তুলসীর তার কোন উত্তরই দিলেন না তিনি; শুধু বললেন, চল্ এখন।

বলতে বলতেই চলাও শুরু হল অন্নপূর্ণার।

তবু ভ্রূক্ষেপ নেই তুলসীর, তখনও নিজের ভাবেই সে বিভোর, নিজের আনন্দেই উৎফুল্ল। অন্নপূর্ণার পায়ের

কেই তাকিয়েছিল সে, মুখের দিকে নয়। তখনও ন তার পড়ে আছে মনোতোষের ওপর; সুতরাং ন্নপূর্ণার আদেশ মত উঠে দাঁড়াবার পরেও মনোতোষের খের দিকেই তার চোখ দুটিও চলে গেল।

মনোতোষকেও সেই কথা বলল তুলসী, দেখলে তো ণ্টু দা, প্রণাম করিয়ে তবে ছাড়লাম।

উত্তরে মনোতোষ বলল, ছাড়লি আবার কোথায়, এই তো সঙ্গেই রয়েছিস তুই।

আহা, সেই কথা হচ্ছে নাকি। আসল কথা, প্রণামও তুমি করলে। এখন বল তো, তোমার ভাল লাগল কি না?

ভাল জায়গায় বেড়াতে এলে ভাল তো লাগেই।

তাহলেই তো ভাল বলে মানছ তুমি?

তা আর মানব না কেন? দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, এসব ভাল জায়গা বলেই তো রোজই এত লোক এখানে আসে। তবে বেড়াবার জন্তে এর চেয়েও ভাল জায়গা আছে।

কোথায়?

থমকে দাঁড়াল মনোতোষ; সোজাসুজি তুলসীর চোখের দিকে চেয়ে সে বলল, শিবপুরের বাগান, যাবি সেখানে?

তুলসী আরও উৎফুল্ল হয়ে বলল, ওমা, যাব না কেন? আমি তো কলকাতায় এসে পর্যন্তই সব ভাল ভাল জায়গা দেখতে চাইছি। তুমি নিয়ে যাওনা বলেই তো আমার যাওয়া হয় না।

তখনই উত্তর দিল না মনোতোষ। মঠের সীমানার বাইরে খানকয়েক ট্যাক্সি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখানে আসবার পর হাত ঘুরিয়ে কবজিতে ঘড়ি দেখল সে এবং তারপর অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চেয়ে বলল, যাবে মা বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে? এখনও অনেক বেলা আছে।

না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর, গম্ভীর কণ্ঠস্বর অন্নপূর্ণার। শুনে মনোতোষ ও তুলসী দুজনেই চমকে উঠল; ভাল করে অন্নপূর্ণার মুখ দেখবার পর তো একেবারে স্তম্ভিত।

অন্নপূর্ণা থামেন নি, এখন যেন আরও জোরে পা চালিয়ে দিলেন তিনি। বিব্রত মনোতোষ তখন বিপন্নের মত বলল, তা, না যাও না যাবে, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ তুমি? ট্যাক্সি তো এখানে।

তবুও থামলেন না অন্নপূর্ণা; চলতে চলতেই বললেন, ট্যাক্সি নয়, বাসে যাব।

কেবল তীক্ষ্ণই নয় অন্নপূর্ণার কণ্ঠস্বর, সংকল্পে দৃঢ় তা। ওই দৃঢ়তাই তাঁর হাঁটার ছন্দেও। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছেন তিনি। মুহূর্তের জন্ত পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল মনোতোষ ও তুলসী; পরক্ষণেই তুলসী ছুটে গেল অন্নপূর্ণার দিকে। কর্তামার গা ঘেঁষে চলা চাই তার।

বাড়ি ফিরেও ওই ভাবই অন্নপূর্ণার। ঠাকুরকে সাহায্য করবার জন্তে অন্ত ঝি আছে; তবু তুলসীকেই তিনি বললেন, সারাটা দিনই তো হেসেখেলে বেড়ালি ফুর্তি। এখন শীগগির গিয়ে কাজে লাগ্। গোছগাছ সব করে দিলে তবেই না রান্না বসাবে ঠাকুর।

কর্তৃত্বের কঠোর স্বরে হুকুমই করেছেন অন্নপূর্ণা। আর আগের চেয়েও যেন গম্ভীর তাঁর মুখের ভাব। হুকুমের অসঙ্গতিটুকু দেখিয়ে দেবে কি, তার কর্তামার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতেই পারে না তুলসী।

সদ্গোপ চাষীর বিধবা মেয়ে নিরক্ষরা তুলসীও বুঝতে পেরেছিল যে কথায় যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী বলেছেন অন্নপূর্ণা। সুতরাং সেদিন হুকুম তামিল করার চেয়ে আরও একটু বেশীই করেছিল তুলসী, মনোতোষকে এড়িয়েই চলেছিল সে।

কিন্তু পরদিন সকালে মনোতোষ নিজেই হাঁক দিয়ে ডাকল তুলসীকে; সে কাছে আসতেই বলল, আজ আর কাল দু'দিন আমার সময় হবে না, আর পরশুর পর দিন কলকাতার বাইরে যাব আমি। সুতরাং পরশু দিনটাই ঠিক থাকল।

তুলসী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কিসের দিন মণ্টু দা?

উত্তর হল: পরশু দুপুরবেলায় তোকে নিয়ে বেরব আমি, শিবপুরের বাগান দেখিয়ে আনব।

সেই লোভনীয় প্রস্তাব। শুনেই আশা ও উৎসাহে তুলসীর চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিভে গেল তা। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করল, কর্তামাকে বলেছ মণ্টু দা? তিনিও যাবেন তো?

যেতে চান যাবেন। না চান তো তোকে একাই নিয়ে যাব।

চমকে উঠল তুলসী। তার প্রশ্নের তো উত্তর দেয় নি মনোতোষ। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিজস্ব একটি সংকল্প সে ঘোষণা করেছে। তেমনি তার চোখ দুটিও যেন কেমন কেমন। তৎক্ষণাৎ তুলসীর কণ্ঠে কোন উত্তর ফুটল না।

কিন্তু মনোতোষই আবার বলল, চুপ করে রইলি যে? যাবার ইচ্ছে নেই নাকি তোর?

তুলসী বিপন্নের মত বলল, ইচ্ছে কেন থাকবে না, কিন্তু—

তবে আর কিন্তু থাকতে নেই। পরশু যাব আমরা, মনে থাকে যেন।

ঝড়ের মত কথাটা বলল মনোতোষ, বলে ঝড়ের মতই চলেও যাচ্ছিল সে ; তখন তুলসী বলল, শোন।

মনোতোষ মুখ ফেরাতেই তুলসী জিজ্ঞাসা করল, নিয়ে যে যাবে মণ্টুদা, ওখানে দেখবার আছে কি ?

মনোতোষ মুচকি হেসে উত্তর দিল, নিজের চোখেই তো দেখবি, আগে শুনে কি হবে ?

আহা, বলই না শুনি একটু।

বলব কী ! বলে কি শেষ করা যায় ? কত রকমের গাছ সেখানে, কত রকমের ফুল। সারাদিন ধরে দেখলেও সব দেখা হয় না।

সুরটা চটুল, তুলসীও হেসে ফেলে বলল, তাহলে তো মুশকিল মণ্টুদা, হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা হয়ে যাবে না ?

না।—ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল মনোতোষ : কারণ ক্লান্ত হলে বসবার অনেক জায়গা আছে ওখানে।

কেমন জায়গা ?

বৃন্দাবনে কুঞ্জ ছিল শুনিস নি ? সেই রকম। গাছ-পালার আড়ালে ফুলভরা লতা দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট এক-একখানা যেন ঘর, বেশ আরাম করে বসে থাকা যায় সেখানে, কতজনে শুয়েও থাকে।

বল কি !

হ্যাঁ রে, শোয় ; কেউ একা একা, কেউ কেউ জোড়া জোড়া।—বলেই আবার হাসল মনোতোষ।

এবার অন্যরকমের হাসি, মনোতোষের মুখে সম্পূর্ণ নতুন, কিন্তু তুলসীর চোখে যেন নয়। তার গাটা হঠাৎ যেন সিরসির করে উঠল, চোখ নামিয়ে নিল সে।

তখন মনোতোষ বলল, অমন করছিস কেন ? বিশ্বাস হয় না ?

খুব হয়।

তবে হাসছিস যে ?

তবে কি কাঁদব ?

বলতে বলতে চোখ তুলল তুলসী ; ভ্রূভঙ্গি করে সে আবার বলল, কাঁদাতেই চাও নাকি তুমি ?

বলেই চলে যাবার জন্ত পা বাড়িয়েছিল তুলসী, মনোতোষ তখন বলে উঠল, ও কি ! কি হল তোর ?

বিস্মিত, না বিপন্ন কণ্ঠস্বর মনোতোষের ? কিন্তু তখন অত ভাববার সময় নেই তুলসীর ; উত্তরে সে শুধু বলেছিল, কিছু না, আমি এখন যাই।

কিন্তু আসল কথাটা ? যাবি তো পরশু ?

পরশু আগে আসুক তো।—বলে ওখানে আর দাঁড়ায় নি তুলসী।

তারপর তখনকার অসম্পূর্ণ ভাবনাটাই যেন পায়ে পায়ে সাথী তুলসীর—রাত্রে ঘুমের মধ্যেও সঙ্গ ছাড়ে না। 'হ্যাঁ' আর 'না'র চিরন্তন দ্বন্দ্ব নিরন্তর চলেছে তুলসীর মনের তলে তলে। একবার একটা জিতছে, আবার ওটা—হেরে গেলেও কোনটাই হার মানতে চায় না।

সেই জন্যই তৃতীয় দিন তার নিজের মুখের উত্তর তার নিজের কানে যেতেই চমকে উঠেছিল তুলসী।

সেদিন মনোতোষ আবার কথাটা তুলতেই বেঁকে বসল তুলসী। সে বলল, না মণ্টুদা, আমি যাব না।

মনোতোষ বিস্মিত হয়ে বলল, তার মানে ?

মানে আবার কি—আমি যাব না।

কারণ ?

ভাল লাগছে না।

তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। কিন্তু অকস্মাৎ মনোতোষের চোখ দুটি যেন ধকধক করে জ্বলে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলল, তাহলে তোমারই খামখেয়ালি ?

উত্তর দিল না তুলসী। মাটির দিকেই তো তাকিয়ে ছিল সে, এখন শানবাঁধানো মেঝেতে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে আঁচড় কাটবার ব্যর্থ চেষ্টা শুরু হল তার।

দেখে অসহিষ্ণু মনোতোষ আবার বলল, মুখে কথা নেই যে ?

তবুও নিরুত্তর তুলসী। মনোতোষ তখন দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে বলল, তোমার তাহলে সবই ঢং—না ?

একটা যেন চাবুকের আঘাত পড়েছে তুলসীর মুখের উপর। বিবর্ণ মুখ তুলে মনোতোষের মুখের দিকে চেয়ে গাঢ়স্বরে সে বলল, তুমি মিছিমিছি রাগ করছ মণ্টুদা—আমি কোন দোষ করি নি।

তাহলে সব দোষ বুঝি আমার ?

ছি, তা কেন ?

তবে ?

প্রায় এক মিনিট পর উত্তর দিল তুলসী ; বিকৃত কণ্ঠে সে বলল, সব দোষ আমার অদৃষ্টের—তা তুমি বোঝ না কেন মণ্টুদা !

বলেই তাড়া-খাওয়া পশুর মত ছুটে বেরিয়ে গেল তুলসী।

[ক্রমশঃ]

প্রাণপাথেয়

শ্রীদেবব্রত রেজ

[পূর্বানুবৃত্তি]

৩

আমরা সবাই গৃহহীন, সবাই ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছি। ঘর মানে শুধু আচ্ছাদন দেওয়া ভূমিখণ্ড নয়, চেতনার স্থায়ী আশ্রয়ও। ভাবের ঘর, আদর্শের বাতাবরণ।

ওপরে আচ্ছাদন দেওয়া যে সব ভূমিখণ্ডকে আমরা ঘররূপে ব্যবহার করি সেগুলোও আমাদের স্থায়ী নয়। আমাদের লক্ষ লক্ষ বাসগৃহ মাটির তৈরি, ঘাসে পাতায় ছাওয়া; এত ভঙ্গুর যে প্রতি বৎসর বৈশাখী ঝড়ে এদের হাজার হাজার ধূলিসাৎ হয়ে যায়, বন্যায় এদের হাজার হাজার জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আরও হাজার হাজার দেনার দায়ে বিকোয়, আরও হাজার হাজার দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, শাসকের অত্যাচারের ভয়ে পরিত্যক্ত হয়। আমাদের গোটা সমাজ-জীবনটা এই অস্থায়ী ভঙ্গুর বাসগৃহের উপর নির্ভরশীল। তাই বুঝি আমাদের চিন্তার কাঠিন্য নেই, সংকল্পের দৃঢ়তা নেই, আর নীতিবোধও অস্থায়ী। তাই বুঝি আমাদের যৌনজীবনে পরিচ্ছন্নতা নেই, তার পদে পদে কর্দমাক্ত অশ্লীলতা। এত ক্ষুদ্র-পরিসর অস্থায়ী বাসগৃহের মধ্যে যৌনজীবন শালীন হয়ে ওঠে না। যৌনজীবনের আনন্দময় উজ্জ্বল প্রকাশের জন্য চাই প্রচুর পরিসর, জীবনের স্থায়িত্ব, নির্দিষ্ট জীবন-দর্শন। সুস্মিতার মত বেশীর ভাগ মানুষের জীবনে প্রথম যৌন-অভিজ্ঞতা গ্লানিতে ভরা, অতর্কিতে পথে কুড়িয়ে পাওয়া; উদ্দেশ্যহীন, ভবিষ্যৎহীন।

যাযাবর আস্তানার মত এই সব কুঁড়ে ছাড়া যে সব পুরীগুলো চৌধুরী বাড়ির মত, দেব-মন্দিরের মত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সেই সব পুরীতেও এ যুগের মানুষের গৃহ পাবার আশা নেই।

এদের প্রত্যেকটা পাষাণ ক্ষুধিত। এদের গুপ্ত কোণে কোণে নিষিদ্ধ প্রবৃত্তিচরিতার্থতার সম্ভাবনা। যেন মানুষের অবচেতন মন অট্টালিকার আকার নিয়ে রয়েছে।

অর্থাৎ কুঁড়ে বল, প্রাসাদ বল, কোথাও আমাদের উপযুক্ত ঘর নেই। আমরা গোটা জাতিটা ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ যুগের ক্ষেত্রে এখনও আমরা বাসভবন তৈরি করি নি।

মন-বোঝানো যে বাসভবনগুলোতে আমরা বাস করছি, আমাদের দেহের সেই বাসভবনগুলো, আমাদের মনের সেই বাসভবনগুলো হাসপাতালের এক একটা কেবিনের মত; তফাত শুধু এই যে, হাসপাতালের প্রত্যেক শয্যার বাঁধা চিকিৎসক থাকে, বাঁধা সেবিকা থাকে, কিন্তু আমাদের এই রোগশয্যাগুলো অবজ্ঞাত হয়ে চিকিৎসক-সেবিকাবিহীন হতাশার শয্যারূপে পড়ে রয়েছে।

যে সকালের মুখের ওপর চেয়ে সুস্মিতা তার পথের নির্দেশ পেতে চাইল, সে সকালেই কলকাতার একটা হাসপাতাল থেকে আভা পেল ছাড়পত্র।

গত সন্ধ্যায় তাপস কোনও এক সময় এসে হাসপাতালের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে তার অলক্ষ্যে সরে গেছে।

প্রায় তিন সপ্তাহ আভা হাসপাতালে পড়েছিল। এর মধ্যে তথাকথিত আত্মীয়েরা কেউ দেখতে আসে নি। তাপসও আসে নি। তাপসের ব্যবহারে আভার মনে

বিশেষ কোনও ক্ষোভ জমায় নি, এর চেয়ে বেশী ওর কাছ থেকে আশা করে নি আভা।

হাসপাতালের গেটের বাইরে এসে আভা তাপসের ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল।

এই কয়েক দিনে সব যেন বদলে গেছে।

শোক-পর্বের ক্রমাগত অশ্রুপাতের পর প্রকৃতি যেমন চোখে নতুন ঠেকে তেমনি এই সকালটা আভার চোখে নতুন ঠেকল। এতদিন তার চোখ বেয়ে ক্রমাগত অশ্রু ঝরে ঝরে তার ভেতর-বার দু দিককেই এমন মার্জিত করে দিয়েছে যে জগৎটা বাইরে ভেতরে নতুন ভাবে প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হল।

আসলে অত্যাসন্ন মৃত্যুর গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে সাময়িক আনন্দে তার চিত্ত ভরে উঠেছে। হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে সামনে প্রবহমান জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজের একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নিতে চাইল। হয়তো অজ্ঞাতসারে কোথাও একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেল। দ্বিধা না করে ট্রামে উঠল।

নিজেদের বাড়ির গলির মুখে আভা যখন রিক্শা থেকে নামল, তখন সকালবেলার মোহের লেশমাত্র লেগে নেই তার চোখে কিংবা মনে। রিক্শাওলা প্রাপাগণ্ডা পেয়ে কানা গলিটাকে ঠুং ঠুং আওয়াজে সচকিত করে বাইরে বড় রাস্তায় জনমানব আর যানবাহনের ভিড়ে মিলিয়ে গেল।

কিন্তু তখন আর একটা শব্দতরঙ্গে গলিটা উপদ্রুত হয়ে উঠেছে। সংকীর্ণ তিন হাত পরিসর গলিটা স্যাঁৎসেঁতে আধো অন্ধকার। গলির মাঝখানের ইট-বাঁধানো চলাচলক্ষম সরু পথটা যেন পরস্পর-আবদ্ধ দু পাটি পুরনো দাঁতের মত। দু পাশের ইটগুলো শেওলাধরা। প্রত্যেকটি বাড়ির দরজার বাইরে এক এক ঢিপ জঞ্জাল।

গলিতে ঢুকে গোটাকয়েক দরজা পেরিয়ে আভাদের বাড়ির দরজা। এই দরজাটার পরে ভিতরে একখানা ঘর। লোনাধরা দেওয়াল। ঘরের ভেতরটা বাসীমুখের গহ্বরের মত।

একটা খোলের উদ্‌ভ্রান্ত বাদ্যতরঙ্গ খোলা দরজার মুখ দিয়ে রুগ্ন মানুষের মুখনিঃসৃত নিঃশ্বাসের মত মুহুর্মুহুঃ বের করে দিচ্ছে এই ঘরটা। আভা বাসীমুখের গহ্বরের মত এই বাইরের ঘরটিতে ঢুকে তার অদ্ভুত দুর্গন্ধে অভিভূত হয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের ভেতর একটা নড়বড়ে তক্তপোশের ওপর বসে আভার বাবা অর্ধোন্মাদের মত অঙ্গ সঞ্চালন করে দ্রুত খোল বাজাচ্ছেন। অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে নড়বড়ে তক্তপোশটাও তালে তালে নড়ছে।

বাবার পিছনে দরজার ভিতর দিয়ে আর একখানা ঘর দেখা যাচ্ছে। এই ঘরের মেঝেতে আভার সর্বকনিষ্ঠ ভাই উপুড় হয়ে একটি পুরনো দেশলাইয়ের খোল থাবায় ধরে ঘন ঘন মাটিতে ঠুকছে, কখনও কখনও সেটা মুখে পুরে চুষছে। কাছাকাছি কোথাও মায়ের ভাঙা কাঁসার মত কণ্ঠস্বর একটা বেসুরো পর্দায় উঠছে আর নামছে। স্বামীকে গালিগালাজ করছেন তিনি।

আভার বাবা বাজাতে বাজাতে ঘেমে নেয়ে উঠেছেন। আভাকে প্রথমটায় যেন দেখেও দেখেন নি। হঠাৎ বাঁ হাতের একরাশ রোম দিয়ে কপালের ঘাম মুছে খোলের দড়িটা গলা গলিয়ে বের করে খোলটাকে সযত্নে পাশে রেখে আভাকে জিজ্ঞেস করলেন, টাকা এনেছিস?

আভা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে উত্তর দিল, না।—শরীরটা এত দুর্বল যে আভা দাঁড়াতে পারছে না। দরজার এক পাটি বন্ধ করে সেটার ওপর ভার রেখে দাঁড়াল।

কালচে হলুদ রঙের বাঁকা কয়েকটা দাঁত বের করে বৃদ্ধ হাসির ভঙ্গীতে বিদ্রূপ করে বললেন, না! এতদিন করছিলি কী? দেহটা তো পাত করেছ দেখছি। রোজগারের বেলায়ই শূন্য?

হঠাৎ ক্রোধে ফেটে পড়ে চিৎকার করে বৃদ্ধ বলে উঠলেন, বিনা পয়সায় ইজ্জত বিলিয়ে দিতে পারব না আমি।

মা এসে ইতিমধ্যে ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়েছেন আভা বিহ্বল হয়ে বলল, তোমাদের ইজ্জত?

বাবা চিৎকার করে বলে উঠলেন, আমার নয় তো কি তোর?

বাবার চিৎকারে মেঝের উপর শিশুটা পরিত্রাহি চিৎকার করতে শুরু করল। মা তাড়াতাড়ি শিশুটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। তবু

শুটা চিৎকার করছে। মা এবার তাঁর বুকের মধ্যে শুটিকে চেপে ধরলেন। শিশু এক মুহূর্ত চুপ করে আবার গুণ বেগে চিৎকার করে উঠল। তখন মা তাকে ভালাতে শুরু করে বলতে লাগলেন, চুপ চুপ খোকন, দিদি দুধ এনেছে, চুপ।

কয়েকবার এই কথা শুনে শিশু চুপ করল। মা আভাকে হাত ধরে টানতে টানতে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেলেন।

মা বললেন, আভা, তোর কি চেহারা হয়েছে?

আভা থতমত খেয়ে গেল।

এবার খুব নিম্নস্বরে আভার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, বিপদ কেটে গেছে তো ভালয় ভালয়?

তার কোলের শিশুটা আভার কোলে যাবার জন্যে ধড়ফড় করে উঠল। আভা নিজের অজ্ঞাতসারে দু পা সরে গেল। সরে গিয়ে মায়ের চোখের দিকে চেয়ে দেখল। মা তার চোখে কি জানি কী পড়ে ফেললেন: ভালয় ভালয় কী যায় মা! আমি তো জানি, দশ-দশটি ধরেছি আমি। যেন দশ-দশবার জন্মেছি। তা শরীরটা একটু সেরেছে?

দেখছ না?—ম্লান কটু হেসে বলল আভা।

এই মেদপিণ্ডটা থেকে সে জন্মেছে এ কথা আভা ভাবতে পারে না। চোখ দিয়ে জল ঝরল—নিজের প্রতি করুণায়।

তার চোখে কী একটা পড়ে মা কথা ঘুরিয়ে ফেললেন নিমেষে: থাকবি এখানে কটা দিন?

আভা উত্তর দেয় না। মায়ের দিকে স্থিরনেত্রে চেয়ে থাকে। যেন অচেনা কোন নতুন প্রাণী দেখছে এই প্রথম।

মা বললেন, না না, থাকবি কেমন করে! তার তো আবার হুকুম চাই।

কার হুকুম?

কার কাছে আছিস এখন?

রাস্তায়।

রাস্তায়? ওমা, সে কি! আমার মেয়ে তুই রাস্তায় আছিস?

না, তোমার মেয়ে আমি নই।

শোন কথা। হা পোড়া কপাল, মেয়ে বলে তুমি আমার মা নও!

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন মা। কোলের শিশুটা মায়ের ক্রন্দনবিকৃত মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। আভা এক চক্র ঘুরে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতে মা কান্নাটা গিলে বললেন, শোন্ আভু, শোন্, একটা কথা শোন্।

আভা মায়ের দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। মা তাকে কিছুক্ষণ আটকে রাখার জন্যেই হয়তো বললেন, ছেলেটাকে একবার কোলে নিবি? আমার তো—

আভার আপাদমস্তক রিরি করে উঠল দুর্জয় ঘৃণায়। মা নিম্নস্বরে বললেন, ওপরে একজন নতুন ভাড়াটে এসেছে। রেশন অফিসে চাকরি করে। আমাদের কিছু কিছু সুবিধে করে দেয়। এ বাড়িতে থাকলে তোকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারে। থাক্ না দিনকয়েক এখানে আভু।

চাকরি!—বিস্মিত হল আভা: আমি কি লেখাপড়া জানি যে চাকরি করব?

মা তার কথায় কি রকম একটা মোচড় দিয়ে বললেন, কেন? চাকরি কি কেবল একই রকম হয়?

মাথার মধ্যে কী যেন একটা ঘটে গেল। আভা ছুটে বেরিয়ে গেল। মায়ের কোলে তার কনিষ্ঠ চিৎকার করে কেঁদে উঠল। বুড়ো বাবা খোলটা আবার ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়ে তার দু দিকে দু হাতে প্রবল বেগে দু হাতের চাপড় দিলেন। সেই শব্দ যেন আভাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ির বাইরে ঠেলে ফেলে দিল।

আভার মা ছুটে এসে স্বামীর কোলের ওপর খোলটায় জোরে একটা লাথি মারলেন। বৃদ্ধ হিংস্র পশুর মত রুখে উঠলেন।

আভার মা মুহূর্তের জন্যে ভয়ে পাংশু হয়ে গেলেন। তারপর মুখ-ঝামটা দিয়ে থকথকে বিষের মত কটা কথা বলে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

আ মরণ বাবার! বাবা না হাতী! কিসের বাবা যে বাবাগিরি ফলাচ্ছ? বলে কিনা ইজ্জত বিকোচ্ছি। তোমার ইজ্জত? তোমার চোদ্দপুরুষের কারও ইজ্জত আছে নাকি?

কথাগুলোর আঘাতের টাল সামলাতে এই লোকটারও কয়েকটা মুহূর্ত সময় লাগল। তারপর খোলটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে এক লাফে তক্তপোশ থেকে নেমে মেঝের থেকে একটা বটি তুলে নিয়ে স্ত্রীর পিছনে ধাওয়া করলেন। স্ত্রী তখন কোলের শিশুটাকে মেঝেতে নামিয়ে রেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নতুন ভাড়াটিয়া বাবুর দরজায় টোকা দিয়ে মিহি সুরে ডাকছেন, মলয়বাবু, ও মলয়বাবু, এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি নাকি? ওদিকে যে আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

বুড়ো সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনলেন। তারপর বটিটাকে কলতলার দিকে ছুঁড়ে মাথা হেঁট করে বাইরের ঘরে ফিরে এলেন। কলে সবেমাত্র জল আসছে—কুলকুচো করার মত শব্দ উঠছে কলের মুখে।

৪

এরই মধ্যে শহরের দিনটা তপ্ত হয়ে উঠেছে। রাজপথের দু ধারে পদব্রজীদের জন্য নির্দিষ্ট শানবাধানো পথের পাড়ের ওপর যেখানেই ছায়া সেখানেই বেওয়ারিস মানুষের ঠেলাঠেলি। আভা ওদেরই মত বেওয়ারিস আভা, তবু ওদের ভিড়ে দাঁড়াতে পারল না। তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে কাঁধের আঁচলটা ঘোমটার মত মাথায় তুলে চলতে শুরু করল।

কত বিপণি পাশে রেখে, কত মানুষের হাট পেরিয়ে, কত যানবাহনের সংকটের ভেতর দিয়ে, কত সময় পার করে যে আভা এক কালীবাড়ির সামনে পৌঁছেছে তার হিসেব এখানে অবান্তর। সময়ের অদৃশ্যস্রোত তাকে সারাদিন ঠেলতে ঠেলতে বিকেলের কোলে এই কালীবাড়িতে এনে ফেলেছে।

মানুষের অবচেতনের কী অদ্ভুত গতি। যখন সে শুধু নিজের গতিতেই চলে তখন সে সমস্ত দেহমনকে ঠেলে ঠেলে এমন একটা বাস্তব পরিবেশের মধ্যে এনে ফেলে যেখানে তার আকাঙ্ক্ষা বা আশংকা বিশেষ কোন বস্তুকে আশ্রয় করে সাংকেতিক রূপ ধারণ করে।

মার্বেল-বাঁধানো নানা রঙের শতরঞ্জের মত কালীবাড়ির মেঝেতে মানুষের জীবন আর নিয়তি যেন অদৃশ্য দাবাখেলায় বসেছে। আভা চেয়ে রইল কালীমূর্তির দিকে।

এই যে! দাবাখেলার শতরঞ্জ পেতে রেখেছি আমার সামনে। এখানে বসে যাও। নিয়তির সঙ্গে যতক্ষণ পার পাল্লা দিয়ে খেল। কিন্তু সাবধান, এখানে চালে ভুল হলে নিস্তার নেই। চালের ভুলগুলো একে একে জমায়েত হয়ে তোমার জীবনের সবচেয়ে সেরাধন রাজাকে যখন আটক করবে তখন নিয়তি তোমার জীবনের কিস্তিমাত করে ওই ছোট্ট মৃৎখণ্ডটির মধ্যে পোঁতা ওই যূপের জোড়া কাঠের মধ্যে তোমার শ্বাসরোধ করে আমার এই শাণিত খড়্গ দিয়ে তোমাকে আমার তৃপ্তির জন্য বলি দেবে।

মন্দিরের মধ্যে পুরোহিতের হাতে ঘণ্টা বেজে উঠল। কে একজন দীর্ঘশ্বাসে শাঁখ বাজিয়ে দিল। আভা আচ্ছন্নের মত কালো পাথরের কালীমূর্তির দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল বানের খেপা জলের মত মৃত্যু চারিদিক ভাসিয়ে এগিয়ে আসছে। বানের সংকেত দিচ্ছে কারা শাঁখ আর ঘণ্টা বাজিয়ে।

এ মৃত্যু চেনা মৃত্যু নয়। যে মৃত্যুর সঙ্গে সে হাসপাতালে পথেঘাটে পরিচিত। এ মৃত্যু যখন দেখা দেয় তখন বাস্তব জগতের প্রত্যেকটা পদার্থ ক্রূর হয়ে ওঠে। গাছের পাতার কিনারায় কিনারায় কী যেন নিষ্ঠুর ঝিলিক দেখা দেয়, পিচঢালা জনহীন কালো পথের উপর কী একটা জীবন্ত লুব্ধ ভাব জাগে; যেন পথটা পথচারিকে গ্রাস করতে চায়; পথের ধারে বড় বড় কাচের আবরণগুলো কী একটা দুর্বোধ্য নিষ্ঠুরতায় চকচক্ করে, পরনের শাড়ির চওড়া পাড় জীবন্ত সাপের মত সারা দেহকে লেপ্টে লেপ্টে জড়িয়ে ধরে। হাতের বুটিদার চুড়ী প্রত্যেকটা বুটিতে এক একটা চোখ বের করে ভয় দেখায়। সমস্ত পদার্থ ভয়ের নখে-দন্তে-চক্ষুতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর এই ভয়ের পিছনে পিছনে আসে ওই কালীমূর্তির মত অপরিমেয় মৃত্যু—সমুদ্রের মত মৃত্যু। দেহের মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর।

পথের ধারে বাড়ির দরজা, উপরে জানলাগুলো, রোয়াকের কানায় ছায়া, প্রাসাদচূড়ে ঘড়ি, পথচারিণীদের গায়ের অলঙ্কার, কারও খোঁপার কুণ্ডলী, কারও কানের

মুকো, কারও কপালের টিপ, এমন কি পথের ধারে বিত্যক্ত কাঁচের টুকরো, সিগারেট-বাক্সের ঝকঝকে ও তার অংশ, ভিখিরী মেয়ের গলায় কাঁচের পুঁতিটা র্বত আকারের কোথাও না কোথাও নখদন্তচক্ষু বর করে। এই স্বচ্ছমৃত্যুর সমুদ্রকূলে শাঁখ ঝিনুকের ত পড়ে থাকে।

সহসা এই স্বচ্ছমৃত্যু সমুদ্রের ঢেউ তাকে আচ্ছন্ন করে ফলল। কালীবাড়ির মার্বেল শত্তরঞ্চের এক কোণে টু গেড়ে প্রণামের ভঙ্গীতে অচেতন হয়ে পড়ে গেল। এই মৃত্যুর হাত থেকে বুঝি আত্মরক্ষা করার জন্যে।

এর পর আভা যখন উঠে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। পা দুটো এত পরিশ্রান্ত যে আর চলতে চাইছে না। ভারী হয়ে গেছে দুটো মরা গাছের গুঁড়ির মত। মনে পড়ল একদিন এক ক্যামেরাম্যান এই পা দুটো দেখে বলেছিল, আপনি এ কালের মিনার্ভা, কাদার বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজপথে চেয়ে দেখে চতুর্দিকে আলো জ্বলে উঠেছে।

আলোকিত কলকাতা সে এক ধরনের অরণ্য। এই আলোও একটা আবরণ। তীব্র রঙিন আলোয় শত রকমের জঘন্যতা আবৃত। অন্তঃসারশূন্যতার ওপর এই আলোর আবরণ যে মোহজাল সৃষ্টি করে তা নিউরটিকের খুশির মত। আভা আবার চলতে আরম্ভ করে। চলতে চলতে চোখে পড়ে চিত্রগৃহের কোমরে কাঞ্চীর মত উজ্জ্বল আলোকের ঘের। এই কাঞ্চীর নীচে দর্শনলোভাতুর জনতা। যেন কাঁচের মানুষেরা। ওদের চোখ থেকে কাঁচে প্রতিফলিত জৌলুস ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। প্রাণের আনন্দ নয়, আতুর নেশার বিচ্ছুরণ। অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে চিত্রে দেখার নেশা। আভার নিজেরই একখানা প্রতিকৃতি একটা চিত্রগৃহের দেওয়ালে স্থূল রুচির অতিস্পষ্ট রেখা রঙে চিত্রিত রয়েছে। কয়েকজন যুবক ও বৃদ্ধ সেই চিত্রটার দুই উদ্ধত বুকের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছে।

পূর্ববাংলা থেকে পলাতক, পেশায় জমিদারের চাটুকার, পিতার সঙ্গে প্রথম কলকাতায় এসে আশ্রয়াভাবে কয়েকটা দিন তাকে ফুটপাথে কাটাতে হয়েছিল। ঠিক খোলা ফুটপাতে নয়, একটা চিত্রগৃহের সম্মুখে ঢাকা ফুটপাথের একধারে। যা তার বিমূঢ় চোখে নগরীর বিস্ময় বলে প্রথম আঘাত করে তা এই চিত্রগৃহের প্রাচীরে চিত্রিত এক চিত্রাভিনেত্রীর প্রতিকৃতি। নারীর চরম রূপ দেখেছিল নাগরীর রূপে। আর পড়েছিল এই প্রতিকৃতির নীচে নাগরীর এমন এক প্রশস্তি যা সুরায় উন্মত্ত রমণী-রূপের চাটুকারদের মুখেই সম্ভব। পল্লীর অসংস্কৃত মন রঙিন চিত্র আর মুদ্রিত চাটুবাক্যের প্রভাব এড়াতে পারে নি; শিশু যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব কিংবা শয়নকক্ষের দেওয়ালে নিজের ছায়ার প্রভাব এড়াতে পারে না।

তা ছাড়া সবচেয়ে যে অর্বাচীন শিল্পপ্রচেষ্টা তার মধ্যে এমন একটা স্থায়িত্বের, পরিবেশ থেকে মুক্তির, এমন একটা ছলনা থাকে যা মানুষ মাত্রকেই প্রভাবিত করে।

নাগরিক সভ্যতায় আসল মানুষের চেয়ে মানুষের প্রতিবিম্বের মূল্য বেশী। এখানে মানুষের সত্তার বিকাশ যত না থাকে তার চেয়ে ঢের বেশী থাকে সেই সত্তার স্বাক্ষর পদার্থে পদার্থে। পথের ধারে বিপণির বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে, সংবাদপত্রের চিত্রে চরিত্রে মানুষের প্রতিবিম্ব। বিশেষ রূপের বিশেষ ভঙ্গীর মুদ্রণ। সভায় সমিতিতে বক্তৃতায় আলাপে প্রত্যেক মানুষ নিজেকে কোন একটা বিশেষরূপে মুদ্রিত করতে সচেষ্ট। এমন কি পথ চলার সময়ও মানুষ একটা অদৃশ্য রকমকে অদৃশ্য দর্শকদের সম্মুখে নিজের একটা প্রতিবিম্ব ফেলার জন্যে সদা-সচেষ্ট। এখানে হওয়ার চেয়ে কওয়ার, রূপান্তরণের চেয়ে মুদ্রণের মূল্য বেশী। এখানে প্রধান হল সাজসজ্জা। নিজেকে সবাই যেন চিত্রে পরিণত করতে চাইছে।

অলঙ্কারে অলঙ্কারে নিজের প্রদর্শনযোগ্যতা প্রকাশের জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন। এই যে ক্রমাগত বাইরের ওপর নিজের ছাপ দেবার জন্যে ব্যস্ত সভ্যতা এর এমনি একটা জাদু আছে যা সর্বকালের অনিশ্চিতধর্মী মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। আভাকেও করেছিল।

চিত্রগৃহের প্রাচীরে চিত্রিত চিত্র-তারকার নানা বর্ণের দেহবন্দনা দেখে নিজেকেও ওই ভাবে মুদ্রিত করার নেশা জেগেছিল তার। এই নেশা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল।

আভার বাইরের অলঙ্কার ছিল না। তাই ভঙ্গীর অলঙ্কার কুড়িয়েছিল খুব সহজে কলকাতার নারীজীবন

থেকে। কী সর্বাত্মিক চেষ্টায় সে চালচলনের অলঙ্কারগুলো সংগ্রহ করেছিল তা সে-ই জানে। চলার গমক থেকে বেণী রচনার পারিপাট্য, চাহনির ঈষৎ বক্রতা থেকে দাঁড়ানোর বেখিল ভঙ্গীটা পর্যন্ত অতি সযত্নে আয়ত্ত করেছিল পথে পথে ঘুরে ঘুরে। আর, এই সাধনায় সে সিদ্ধিলাভও করেছিল। এই সিদ্ধি দেখে প্রযোজক তাপস তাকে স্টুডিয়োতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

তার নিজের প্রাচীর-চিত্রটার দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল আভা। এই ছবিটার সঙ্গে তার মুহূর্তে মুহূর্তে দিনে দিনে বদলে যাওয়া যে রূপ তার কোনও সম্পর্ক নেই। এই ছবিটার মধ্যে সে একপ্রকারের অমরত্ব লাভ করেছে। এই চিত্রিত আভার চোখে ঘুম নেই, ওর গণ্ডে যে রক্ত বর্ণ তা ম্লান হয় না, ওর বক্ষের যে স্ফীত ঔদ্ধত্য তা কোনও রূপে কোনও পরুষ ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয় না, ওর মুখে যে হাসি তা কখনও বিলীন হয় না। ও লক্ষ লক্ষ মানুষের চিত্তের কালো পর্দায় কামনার রক্তাক্ষরে আঁকা হয়ে গেছে। ওর ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, ওর মান নেই, অপমান নেই ; ও রূপকথার। একসঙ্গে তার ছুটো রূপ দেখল সে। এক রূপে সে অমর, অপর রূপে খড়ির মূর্তির মত ক্ষণভঙ্গুর। এই চিত্রটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছুটি যুবক নিম্নস্বরে তার খড়িমূর্তিটার কলঙ্ক-কাহিনী নিয়ে আলোচনা করছিল। আভা চেয়ে দেখল ওদের মুখের দিকে। লালসার তৈলাক্ত হাসিতে ভেসে গেছে ওদের মুখমণ্ডল।

আচ্ছন্নের মত আরও কয়েক পা এগিয়ে পথের পাশে একটা রেস্তোরাঁর প্রবেশমুখে বসানো বৃহৎ আয়নার মধ্যে নিজেই নিজের পলাতক রূপটাকে খুঁজে দেখতে চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের প্রতিবিম্বের পাশে আর একটা মুখের প্রতিবিম্ব ভেসে উঠল। অত্যন্ত চেনা একজন মানুষের। দর্পণের লোকে ছুজনের দেখা হল। অভিনেত্রীর অভ্যস্ত হাসির ঝিলিক উঠল ঠোঁটের কানায়। ঘুরে চেনাজনকে নমস্কার করল।

রেস্তোরাঁর প্রবেশপথে আভাকে দেখে আমেদ কী একটা নেশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল, চলুন ভিতরে যাই।

ভিতরে প্রবেশ করে পালিশ-করা কাঠের একটা ছোট্ট কামরার মধ্যে ছুজনে মুখোমুখি বসল। বয় এসে সামনে দাঁড়াতে হুকুম করল আমেদ, চারটে পোচ, ছুখানা পুডিং, ছুটো ফাউল-কাটলেট আর ছু পেগ—

আভা বয়ের দিকে চেয়ে বলল, সরি, ছু পেগ নয়, এক পেগ।

আমেদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আভার দিকে চাইল। আভা হেসে বলল, কী করে জানলুম, এই তো? আমরা যে জানতে পারি আমেদ!

ইতিমধ্যে আমেদ সিনেমা-জগতে কিছুটা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। নতুন নতুন গানে ভিনদেশী সুর বসিয়ে জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। মিণ্ট থেকে সদ্য বেরিয়ে-আসা চকচকে পয়সার মত তার গানের পসার হয়েছে। তার এই জনপ্রিয় সুরগুলো ঠিক সুর নয়, এগুলো সুরের সঙ, চিত্রবিচিত্র শব্দ মিলিয়ে সৃষ্টি। মানুষের নিছক শারীরিক ছন্দগুলোকে তালের মালায় গেঁথে পরিবেশন করেছে আমেদ। এর মধ্যে চিৎকারধ্বনি থেকে শিশুর প্রলাপ পর্যন্ত গাঁথা। চিৎকার থেকে চর্বণ, সব মিলিয়ে তৈরী এই সব সুর। কিন্তু এই সব রচনার বিনিময়ে টাকা আসছে। এই প্রবাহ এখনও স্ফীত প্রবাহ নয়, হয়তো একদিন ডিকেন্সের 'টেল অব্ টু সিটিজ' বইয়ে প্যারীর রাজপথে ফাটা মদের পিপে থেকে যে পথ-ভাসানো প্রবাহের বর্ণনা আছে সেই রকম প্রবাহে অর্থ আসবে।

না, এক পেগ নয়, ছু পেগই আন।

বয় সেলাম করে চলে গেল।

আমার একার জন্তই ছু পেগ। এই সাক্ষাৎকারটার সম্মানে।

[ক্রমশঃ]

আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

শুধু ইজের পরা বাচ্চা মেয়েটা জীবনের প্রথম যেদিন রাস্তা থেকে সিনেমার বিজ্ঞাপনের কাগজ সংগ্রহ করে মায়ের হাতে এনে দিল সেদিন ওর মা বাবা দুজনেরই আনন্দ আর ধরে না।

মা বললেন, দেখ বুলুর কাণ্ড।

বাবা বললেন, দেখি দেখি।—বলে কাগজখানা টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে পড়তে আরম্ভ করলেন।

মা তখন বুলুর বড় ভাই খোকনের হাতের বিজ্ঞাপনটা নিয়ে নিলেন।

খোকন বলল, জান মা, ওকে ওরা কোনদিনই দেয় না। ও শুধু পেছনে পেছনে দৌড়য়।

বুলু বলল, না মা, দেয় কিন্তু। দাদা আর ওরা সবাই আগে নিয়ে নেয় সেইজন্তে।

মা বাবা বুলুকে কাড়াকাড়ি করে আদর করলেন।

সেই বুলু ক্রমে বড় হল, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরল।

সিনেমার বিজ্ঞাপন ও এখন নিজে ধরে না। কিন্তু রাস্তার ধারে গেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে কান পেতে শোনে ওদের মাইকের ঘোষণা: সন্ধ্যে ছটা রাত নটার প্রদর্শনীতে দেখতে পাবেন। আসুন, দেখুন—রতনকুমারের অপূর্ব অভিনয়-দীপ্ত কথাচিত্র…

আর শুনতে হয় না বুলুর, শোনাও যায় না। কথাগুলো রূপকথার রাজকুমারের ডাকের মতই বুলু-কন্তাকে টানে।

হৃদয়ের ঢেউ গোপন করে বুলু মাকে গিয়ে বলে, মা, আগের শনিবারে তুমি আমাকে কি বলেছিলে মনে আছে?

কি বলেছিলাম?

বা, মনে নেই? ওই যে, তুমি সিনেমায় গেলে, আমি যেতে চেয়েছিলাম, তুমি বললে যে পরে একদিন যাস তুই?

হ্যাঁ, তাই কি?

আজ আমি যাব।

মা বেকায়দায় পড়ে চুপ করলেন। পরক্ষণে বলে উঠলেন, কি ছবি?

বুলু মাকে চেনে। বলল, ছবি খুব ভাল নয়। কি যেন নাম—ময়ূরপঙ্খি।

মা উল্লসিত হয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ দমে গেলেন আবার। বললেন, নামটা তো ভালই। ভাল নয় তবে যাবি কেন?

বুলু জ্ঞানবতীর মত বলল, না, শুনলাম যে বেশ শিক্ষণীয় ছবি।

মা এবার এক হাত নিলেন: ও, শিক্ষণীয় হলে বুঝি ছবি ভাল হয় না?

বুলু তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে উঠল, বা, তা হবে না কেন। তবে নাচ-গান বেশী নেই, আর অভিনয়ও খুব ভাল হয় নি।

কে বললে?

শুনেছি আমি।

আছে কে কে?

কোথায়?

কোথায় আবার—ওই ছবিতে?

ও—ওই যে মিত্রা দেবী আর কে যেন, ও হ্যাঁ, রতনকুমার।

মা চোখ নীচু করে মনোভাব গোপন করে গেলেন। পরে বললেন, তা হোক, অত সিনেমায় যাওয়া ভাল নয়। একটা ভাল ছবি এলে পরে দেখো।

বুলুর মন ভেঙে গেল। বলল, খালি পরে দেখ আর পরে দেখ। আমি যেন—

শেষ করতে পারল না কথাটা। আবার মাইকের আওয়াজ শুনে কান খাড়া করে থেমে গেল বুলু।

শেষাংশ শোনা গেল—আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কিন্তু কোথায় উপস্থিত হতে হবে বোঝা গেল না। বুলু এক দৌড়ে বাইরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হল : হাজরাপাড়া পূজা-প্রাঙ্গণে ক বিরাট জলসার আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতার শিষ্ট শিল্পিবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন। আপনাদের পস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

প্রার্থনা পূরণ করবার ব্যাকুল বাসনা নিয়ে বুলু চলে গল আবার মায়ের কাছে।

কিন্তু মা তখন রওনা হয়েছেন পাশের বাড়িতে াওয়ার জন্য.।

বুলু সঙ্গে যেতে যেতে বলল, মা, কোথায় যাচ্ছ ?

মা বললেন, তুই থাম্। আসছি আমি, একটু কাজ াছে।

বুলু থামতে পারল না। বলে ফেলল, বেশ, সিনেমায় যদি না যেতে দাও তাহলে জলসায় আমি যাবই কিন্তু।

মাও থামলেন না। বলে গেলেন, আসছি দাঁড়া।

কিছুক্ষণ পরে পাশের বাড়ির লিলি এসে বুলুকে বলল, কিরে, তুই যাবি না ?

বুলু বলল, কোথায় ?

সিনেমায় ? মাসীমা তো মেসোমশাইকে ফোন করে অফিস থেকে ফেরবার পথে সিনেমার টিকিট করে নিয়ে আসতে বলল। আমার মাও যাবে তো।

বুলুর রাগ হল খুব। কিন্তু চেপে গিয়ে বলল, না রে, আমি সিনেমায় যাব না। আমি জলসায় যাব।

জলসার কথা এর মধ্যেই ভুলে গিয়েছিল লিলি। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ও হ্যাঁ, তাই চল্। আমিও জলসায় যাব।

কিন্তু মা এ পরামর্শের কিছু জানতে পারলেন না। তিনি সিনেমায় যাওয়ার সময় দুর্বল বোধ করে বুলুকে বললেন, তুই কাল যাস।

বুলু গাম্ভীর্যসহকারে সম্মত হল।

মা যাওয়ার পরে লিলিকে সঙ্গে নিয়ে দাদা খোকনের সঙ্গে জলসার গান শুনে আসতে বুলুর কোনই অসুবিধে হল না। মা আসবার আগে কিছু অনুষ্ঠান বাকি থাকতেই ফিরে আসতে হল এই মাত্র।

খবরটা চেপে পরের দিন সেই শিক্ষণীয় ছবিটিও দেখল বুলু।

বিরতির সময় হল থেকে বেরিয়ে দাঁড়াতেই পরের দিনকার নিমন্ত্রণ পেল : যাত্রাগান, যাত্রাগান। কলকাতার প্রসিদ্ধ পীতাম্বর অপেরার যাত্রাগান। মাত্র তিন রাত্রির জন্য। আগামীকাল রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় কাজি-পাড়া পূজাপ্রাঙ্গণে যুগান্তকারী যাত্রা-নাটক 'বাংলার বীরাঙ্গনা' অভিনীত হইবে। আপনাদের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। টিকিটের হার—

টিকিটের হার শোনবার ধৈর্য ছিল না বুলুর। খোকন এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। তাকে বলল, খুব ভাল দল না কি রে দাদা ?

খোকন বলল, উঃ, বিশ্বাস করবি না, ভয়ানক ভাল দল! ওরাই তো কলকাতায় ফার্স্ট হয়েছিল!

তাই নাকি ?

তবে কি ?

খুব চিন্তায় পড়ে গেল বুলু।

লিলি নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, হলে কি হবে, কাল আর যেতে দেবে নাকি ?

বুলু সমর্থন করে বলল, নাঃ।

খোকন বলল, আমি তো যাবই।

লিলি বলল, আপনার কি! আপনি ছেলে, আপনি তো পালিয়েও যেতে পারবেন।

খোকন চোখের একটি ভঙ্গী করে বলল, সাহস থাকা চাই।

কিন্তু শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল তখনই। তাড়াতাড়ি করে ঢুকে গেল সবাই।

ফেরবার পথে খোকনের বন্ধু বটু জুটল সঙ্গী।

দু-চার কথার পরে বটু বলল, কাল তোরা যাবি যাত্রাগানে ? আমিও যাব। একসঙ্গে যাওয়া যেত।

খোকন বলল, আমি তো যাবই।

বটু বলল, কেন, বুলুরা যাবে না ?

বুলু হতাশ স্বরে বলল, মা যেতেই দেবে না।

একদিনের জন্যে আর কি হবে।—মায়ের কাছে বলবার কথাটা আস্তে করে বলে দিল বটু।

লিলি বলল, আমার তো হবেই না।

খোকন উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, অত ভয় পেলে কি আর হয় ?

বটু বলল, তাই তো। বুলুকেও আমি তাই বলছি।

এবার খোকন চুপ করে রইল। বুলুকেও সাহসী হয়ে কথাটা ঠিক কিনা তা বুঝতে পারল না। অবশ্য তা না হলে লিলিই বা কী করে যায়? ভাবনায় পড়ল, কিছু বলতে পারল না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাত্রাগানে কারোরই যাওয়া হল না। আর মাত্র একদিনের জন্যে—এই শেষ—আর যাব না, ইত্যাদি সব কথাই বলা হল। কিন্তু সেদিন মায়ের নিজের কোন দুর্বলতা ছিল না বলেই নির্দয়ভাবে নিষেধ করে দিলেন।

বটু খোকনের কাছে খবর নিতে এল। খোকন অবস্থাটা গোপন করে বলল, না রে—যাব না আমরা কেউ। খবর নিলাম ভাল করে, শুনলাম যে অতি বাজে দল। কি হবে শুধু শুধু রাত জেগে। পয়সা নষ্ট আর শরীর নষ্ট।

খোকনের এই প্রকার জ্ঞানাধিক্যে বটু সন্দিগ্ধ হল। বলল, লিলিরাও যাবে না বুঝি?

খোকন অনাসক্ত কণ্ঠে বলল, কে, লিলিরা? নাঃ, ওরাও যাবে না মনে হয়।

বটু একটু চুপ করে হজম করে নিল। শেষে বলল, নে, এক গ্লাস জল খাওয়া, নয়তো বুলুকে দিতে বল্—তুই তো কুঁড়ের বাদশা!

বাধ্য হয়ে খোকন বুলুকেই ডাকল জল দিতে।

বুলুর হাত থেকে জল নিয়ে খেয়ে গ্লাসটা ফিরিয়ে দেবার সময়টুকুর মধ্যেই বটু খোকনকে বলল, আমিও শুনেছি যাত্রা ভাল নয়। বরং চল্ আজ সন্ধ্যের সময় বাঁধের ওপর বেড়াই গে। কি বল বুলু?

আচমকা প্রস্তাবে বুলু বিব্রত হয়ে পড়ল। একটু হেসে বলল, কি জানি। আমি কি বলব, দাদা জানে।

বটু বলল, ওর সঙ্গেই তো যাবে। আমি বলছিলাম যে আমার বোনও প্রায়ই বাঁধে বেড়াতে যায় তো। ওর সঙ্গে আলাপ করতে পারতে। তা ছাড়া সবাই একসঙ্গে মিলে বেড়ানোর একটা আলাদা মজা।

কী বলবে বুঝতে না পেরে বুলু বলল, দেখা যাক, মা কী বলে।

এতে আর আপত্তি করবেন কেন।—তাড়াতাড়ি বলে উঠল বটু।

এবার খোকন কথা বলল, আমি এখনই কিছু বলতে পারি না রে। আচ্ছা, তোরা যাস—চেষ্টা করব।

বটু সোৎসাহে বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা ঠিক যাব আমরা গিয়ে সূর্যাস্ত দেখব ওখানে।

কিন্তু বটু চলে যাওয়ার একটু পরেই মাইকের ধ্বনি এগিয়ে আসতে লাগল।

খোকন, বুলু, বুলুর মা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ভাল করে শোনাবার জন্যে গাড়িটা প্রায় থেমে থেমে চলতে লাগল, আর মাইকের বুক-কাঁপানো আওয়াজে বলতে লাগল: আগামীকাল সন্ধ্যে সাতটায় খাগড়াবাড়ি কালি-বাড়িতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক অভিনীত হবে। আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

গাড়ি চলে গেল আবার বলতে বলতে। আর ওরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

বুলুর মা সর্বাগ্রে ধাতস্থ হয়ে ধমক দিয়ে উঠলেন, এই সব শুনতে শুনতে তোদের মাথাই খারাপ হয়ে যাবে নাকি? চল্, ভেতরে চল্।

আসলে কথাটা রাগ করে বললেন নিজেকেই। কারণ কিছুক্ষণ পরে পাশের বাড়ির লিলির মা বেড়াতে এলে তার কাছে দুঃখ করে বললেন, মানুষগুলোকে ওরা পাগল করে দেবে নাকি। একদিনেই তিন জায়গায় যদি ভাল ভাল থিয়েটার যাত্রা সিনেমা থাকে তবে মানুষ কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টায় যাবে বলুন দেখি! আর মাথাই বা লোকের কী করে ঠিক থাকে?

লিলির মাও সমর্থন করে বললেন, সত্যি। বড়ই মুশকিলে ফেলে এক-একদিন।

কিন্তু এত সব থাকতে খোকন আর বুলু যখন নদীর ধারে বাঁধের ওপর বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করল, সানন্দে রাজী হলেন বুলুর মা। বলে দিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসবে।

খোকন আর বুলু একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। এক ঘণ্টাও হবে না।

রাস্তা থেকে বাঁধে ওঠবার মুখে আর একবার মাইকের ঘোষণা শুনে থমকে দাঁড়াল ওরা।

আগামীকাল খাগড়াবাড়ি কালি-বাড়িতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের—

আর দাঁড়াল না ওরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বুলু ল, এটা সেইটেই—

খোকন বলল, হ্যাঁ, সেই খাগড়াবাড়িটাই।

কোথাও না বসে পায়চারি করে গল্প করছিল ওরা। াকন আর নিজের বোনকে আগে রেখে বুলুর পাশাপাশি ওয়ার চেষ্টায় মাঝে মাঝে সফলও হচ্ছিল বটু। হাতে াত নেবার প্রচেষ্টাও একবার যখন জয়যুক্ত হল, তখন শ্চিন্ত হল বটু। এরপর আসল কাজ মানে হাতের ধো ছোট করে ভাঁজ করা চিঠিটা গুঁজে দিতে শুধু একটু যোগের অপেক্ষা।

ফেরবার পথে সুযোগ মিলল।

সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কিশোরী বুলুও বুঝতে পারল যে ওটা কী। অত ছোট ভাঁজ করা কাগজটা যেন বুলুর শরীরের ভতরে বাইরে আগুনের হলকা চালিয়ে দিল। ভয়ে ফলতেও পারল না। হাতের মুঠিতে মোচড়াতে মোচড়াতে অবশেষে এক ফাঁকে ব্লাউজের ভেতরে রেখে দিল।

বাড়িতে সুযোগমত চিঠিখানা পড়ল বুলু।

অনেক আকুল প্রেমের কথার শেষে ছিল, আগামীকাল এইখানে আবার তোমার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনা করি। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে বলে বিকেলে একা এস। ইতি, একান্ত তোমারই—

প্রেমের চিঠি বুলুকে নিষিদ্ধ ফলের আনন্দ-শিহরণ দিল। বুক ঢিব-ঢিব করছিল। তা সত্ত্বেও আরও বার দুই পড়ল চিঠিখানা। ভয়ে আর অস্বস্তিতে ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল। অবশেষে আরও বার দুই পড়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে কিছুটা আরাম বোধ করল।

রাত্রে ঘুম হল না। বারবার মনে মনে বলতে লাগল, এসব অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়। চিঠিটা পড়াই উচিত হয় নি। ছিঃ, ভয়ানক অন্যায়।

পরের দিন উঠতে অনেক বেলা হল। মুখ হাত ধুয়ে চা জলখাবার খেয়ে মায়ের ফরমায়েশে দু-একটা কাজ করতে করতেই ওরা একদল এসে পড়ল। মাইকের ধ্বনি রাধার কানে শ্যামের বাঁশির আওয়াজের মত মনে হল বুলুর। থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণে বাইরে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আগাগোড়াই শুনতে পেল, বাদ গেল না কিছু।

অদ্য বেলা পাঁচ ঘটিকায় শহীদবেদীর মাঠে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় কলকাতার বিখ্যাত আর্টিস্ট—

পাশের ছেলেটি মৃদু ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিল: এই, আর্টিস্ট না, বক্তা।

ঘোষক বিরক্ত হয়ে বলল, আরে, তাতে কি হয়েছে? একই কথা—ওরা বুঝবে।

পরমুহূর্তে মাইকে মুখ এনে বলে চলল, বিখ্যাত বক্তা বিপিন বসু বক্তৃতা করবেন। দলে দলে আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এল আবার যাত্রাগানের নিমন্ত্রণ।

অকস্মাৎ নিতান্ত অকারণে বুলুর মনটা পরিষ্কার হয়ে উঠল। ওর মনে হল এ সংসারে অন্যায় বলে কোন কর্ম নেই। সবই ভাল।

এবং এই মনের ঢেউ বুলুর বাইরের গতি ছন্দেও প্রকাশ পেল। ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক লাফাতে লাফাতে নয়, অনেকটা যেন নাচতে নাচতে ভেতরে গেল।

বুলুর বাঁধ যেন ভেঙে গেল।

বিকেলে জনসভায় কিছুক্ষণ থেকে সময়মত বটুর প্রার্থনাও পূরণ করে এল বুলু। ফিরে এসে আবার সভায় বসে সভা ভাঙলে জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলে এল।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

বটুর শেষ চিঠিতে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র বর্ণনার শেষে জংসনের ট্রেন ধরবার জন্যে একেবারে স্টেশনে উপস্থিতি প্রার্থনা করল।

এ প্রার্থনাও পূরণ করল বুলু।

প্ল্যাটফর্মে এক কোণে গিয়ে বসে ছিল বুলু। ভয়ে ভাবনায় বুকের কাঁপুনি ক্রমে বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বটুর দেখা নেই।

কথা ছিল বটু একবার দেখা দিয়ে জিজ্ঞেস করবে, কোথায় যাচ্ছ? তারপরে পাশের গাড়িতে উঠবে। জংসনে গিয়ে বটু নামিয়ে নেবে।

গাড়ির ঘণ্টা পড়ল, কিন্তু বটুকে দেখা গেল না। বটু এসে সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করবে। কাজেই এলে দেখা হবেই।

অবশেষে বটু এল। এবং গাড়িও এল।

কথামত সব কাজই করল বটু। বুলুকে দেখিয়ে দেখিয়ে পাশের কামরায় উঠল। কিন্তু তার একটু পরেই যে কাজটা করতে বাধা হল সেটা আর বুলু দেখতে পেল না।

গাড়ি ছাড়বার মিনিট দুই আগে বটুর বাবা এক ভদ্রলোককে তুলে দিতে ওই কামরারই সামনে এসে পড়লেন। শুধু এলেন না, ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে গেলে তিনি ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, ভিড় নেই বেশি।—আরও কিছু বলতেন, কিন্তু বটুকে দেখে থমকে গেলেন। বললেন, একি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বটু পাথর হয়ে গেল।

তিনি আবার ধমকের সুরে প্রশ্ন করলেন, কোথায়?

বটু কোনমতে বলল, এক বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি।

বলা কওয়া নেই, অত বন্ধুত্ব চলবে না। নেমে এস।

বটু তখন পাথর।

নেমে এস বলছি।

এত লোকের সামনে পিতার অবাধ্য হতে পারল না বটু। অবশ্য চিন্তাও কিছু করতে পারল না। কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে নেমে এল।

নতুন ব্যাগ, মাত্র কিছুক্ষণ আগে কেনা।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও ছেড়ে দিল। বটু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল অপসৃয়মাণ পরের কামরাটার দিকে। একবার ছুটে যাবার জন্যে পা বাড়াল যেন। কিন্তু বাবার দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল। গাড়ি চলে গেল। বটুও বাবার সঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা হল।

জংশন স্টেশনটা বুলুর জানা ছিল না। নেমে দাঁড়াল পরের কামরার দিকে চোখ রেখে।

অনেক লোক নামল, কিন্তু বটু নামল না। লোক নামা শেষ হল, লোক উঠতে আরম্ভ করল। বুলুর বুকের মধ্যে ধক্ করে একটা শব্দ হল যেন। পরক্ষণে ভাবল, নিশ্চয়ই ভিড়ে আটকে গেছে—এইবার নামবে।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেই কামরার ভেতরটা দেখা যায়। কিন্তু পা তুলতে গিয়ে ওর মনে হল পা যেন পেরেক দিয়ে আটকানো আছে।

তারপরে ওঠা নামা দুই পর্যায়ই শেষ হল। রইল শুধু হকারদের আনাগোনা চিৎকার আর চা ও খাবার খাওয়ার ভিড়।

বুলু তখন জ্ঞান আর অজ্ঞানের দুই সীমারেখার মাঝখানে। এই অবস্থায় অকস্মাৎ অত্যন্ত হালকা বোধ করল। পা পরীক্ষা করে দেখল, পাও বেশ হালকা। একটু পায়চারি করে নিল। বটুর কথা সম্ভবতঃ ভুলে গেল। ওর জীবনে সবচেয়ে বেশীবার শোনা কথাটা বেশ স্মরণ হতে লাগল: আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। গাড়ির সঙ্গে লোকজন ঘরবাড়ি সহ গোটা প্ল্যাটফর্মটা ওর চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করল কেন বুঝতে পারল না বুলু। একটু হাসল।

কিন্তু পরক্ষণে হাসি বন্ধ করে আবার গম্ভীর হয়ে গেল। আর যে সময় নেই।

হঠাৎ দুই হাত মুখের ওপর লাউডস্পীকারের ভঙ্গীতে ধরে উচ্চস্বরে বলে উঠল, আগামীকাল হাজরাপাড়া পূজাপ্রাঙ্গণে এক বিরাট জলসার আয়োজন করা হয়েছে। আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

ঝিমিয়ে পড়া প্ল্যাটফর্ম মুহূর্তে সচকিত উল্লসিত এবং উত্তেজিত হয়ে উঠল।

বুলু বলে যাচ্ছে, আগামীকাল হাজরাপাড়া পূজা-প্রাঙ্গণে—

স্টেশনের লোকজন অনেক কৌশলে ওকে প্ল্যাটফর্মেই আটকে রাখল, বাইরে যেতে দিল না। ও সেখানেই এদিক-ওদিক করে 'উপস্থিতি প্রার্থনা' জানাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ওর বাবা মা ট্যাক্সি করে এসে পড়লেন। বটু একটা কাজ করেছিল; ফিরেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল যে বুলু বোধ হয় জংশনে গেছে।

বুলু এখন কোথাও যেতে পারবে না বলল। তার অনেক কাজ। আগামী কাল—

চোখের জল মুছতে মুছতে মা বাবা কোনমতে ওকে গাড়িতে তুলে বাড়িতে নিয়ে এলেন।

এখনও বুলুর চিকিৎসা চলছে। ভাল হবে কিনা বলা যাচ্ছে না।

—

শনিবারের চিঠি Centenary

সজনীকান্ত দাস

ভাব্‌তে মনে লাগ্‌ছে চমৎকার—
নব নবতি বছর পরে শতেক হবে পার।
আজিকে সেই কল্পনাতে রঙ ধরে মোর মন-খানাতে,
বাতাস বহে নৃত্য-চপল ছন্দ ঝনৎকার।
মনের সে রঙ ছড়িয়ে পড়ে সব-'মাসিকে'র পাতার 'পরে,
আকাশপথে 'হকার' কহে, আজ্‌কে শনিবার।
সহর গ্রামে পথের বাঁকে —'শনির চিঠি' উচ্চে হাঁকে,
কেউ বা খুসী, খোঁচা খেয়ে কারো বা মন ভার!
ভাব্‌তে মনে লাগ্‌ছে চমৎকার।

তোমার হাসি ছড়িয়ে দিকে দিকে,
সবার মনের মেঘে সেদিন কর্‌ছ লঘু ফিকে।
ব্যঙ্গ তোমার রোদের মত ঝলক হেনে যাবে, যত
আঁধার-ঘরে আঁধারী জীব চাইবে অনিমিখে।
যেথায় যত ঝুটো মেকী কেইবা ন্যাকা কেইবা নেকী,
কোন্ যুগে কি ঘট্‌ল ফাঁকি তাই রাখিলে লিখে;
হঠাৎ-গুরু গজায় কিসে সোহং স্বামী হয় শ্রীবিশে,
মেকী খাঁটি ধরলে সঠিক ভুল্‌লে না চিক্‌চিকে।
তোমার হাসি ছড়ায় দিকে দিকে।

খোঁচা খেয়ে খিঁচিয়ে ওঠে কারা!
চকিত আলোর ঝল্‌কানিতে চামচিকেদের সাড়া।
নকল সিংহাসনের 'পরে বস্‌ত যারা গর্বভরে
চৌমাথাতে এনে তাদের কর্‌লে তুমি তাড়া।
পাঁজির পাতার বিজ্ঞাপনে সাহিত্য কয় যে নূতনে
বারবনিতা যাদের ঘরের বধূ সালঙ্কারা,
তরুণ নামের অন্তরালে লুকায় যারা কালেকালে
পড়ল ধরা, কঠোর বাণে হঠাৎ দিশেহারা।
খোঁচা খেয়ে খিঁচিয়ে ওঠে তারা।

বলত যারা, নোংরা কর ফিরি—
সেদিন তারা সবাই এসে বস্‌বে তোমায় ঘিরি।
জানি তাদের খ্যাতি হবে, যোগ দেবে এই মহোৎসবে
কায়াবিহীন তখন সবাই ছায়া অশরীরী,
তাদের নাতি নাতিনীরা কেউ প্রগল্‌ভ, কেউ সুধীরা,
উপল-পথে কেউবা চপল ঝরণা ঝিরি-ঝিরি।
যেথায় যত তরুণ আছে রঙিন হবে তোমার আঁচে,
কালিকলম প্রগতি আর কল্লোল স্বাচ্ছরি!
তোমার কথাই করবে তারা ফিরি।

মণি-মুক্তা তখন হবে খাঁটি—
বীণাপাণি উল্লাসেতে সাজবে পরিপাটি।
সেদিন নরেশ রাধাকমল বস্তি মাঝেই রইবে অমল,
পাখোয়াজে বোল ফোটাবে ধূর্জটিরই চাঁটি।
জানি সেদিন হেমাঙ্গকা পরবে সত্য হাসির টীকা,
মলদা ছেড়ে ধূপছায়া তার ভুলবে খুঁটিনাটি!
সেদিন তোমার আড্ডা ঘরে মিলবে এরা পরস্পরে,
আসবে তারা আজকে যারা দুয়ার আছে আঁটি।
মণিমুক্তা তখন হবে খাঁটি।

কত কথাই জাগছে আজি মনে,
প্রকাশ করতে ভাষা না পাই থাকুক সংগোপনে।
ভাবী দিনের প্রেমেন কি সে দৈনিকেতে কলম পিষে
মনের দুখে কাল কাটাবে আঁধার কক্ষ-কোণে?
শৈলজা কি ছুটবে কাশী, মুরলী কি ছাড়বে বাঁশী,
গজল কবি ভজবে নবী ক্রমিক বিবর্তনে!
অচিন্ত্যেরই চিন্তা-জ্বরে আগুন দেবে বুদ্ধ ঘরে—
ডুব দেবে কি শরৎচন্দ্র শ্রীরূপনারায়ণে?
কত কথাই জাগছে আজি মনে।

সেদিন যেন তোমার বক্ষ কোলে
অতীতকালের হাসি মোদের মুক্তা হ'য়ে দোলে।
আমরা তখন থাকব কোথায় হয়ত হেথায় হয়ত হোথায়,
নূতন ন্যায়ের পাঠ নেব কোন্ নৈয়ায়িকের টোলে।

সেদিন মোদের মনের প্রীতি জাগাবে কোন্ কল-গীতি
তুমি যেদিন রাজার মত উঠ্‌বে চতুর্দোলে।
মোদের চিত্ত স্রোতের ধারা তোমার চিত্তে হবে হারা—
বক্ষে মোদের ফসল তব, কে দেবে তাই ব'লে ?
থাক্‌ব তবু তোমার বক্ষে কোলে।

মরুর পথে আজকে অভিযান,
পূর্ণিমাতে অমানিশির মিল্‌বে কি সন্ধান ?
আজকে যারা আঁধার পথে ক্ষীণ আলোকে কোনো মতে
অনেক আশায় বুক বাঁধিয়া চল্‌ছে গেয়ে গান।
সেদিন শানমগুলীরা পাহাড়-ভাঙা পথের পীড়া
বুঝ্‌বে কি হায়, গলার প'রে বিজয়-মাল্যখান ?
তুমি শুধুই জানবে সখি কোন্ সোনা আর চকমকি,
আজকে নিবিড় অন্ধকারে করল দীপ্তিদান।
মরুর পথে আজকে অভিযান।

কল্পনাতে আজকে দেখি খালি—
অরুণ রবির কিরণ এসে বিদায় দিল কালি।
দেখছি মনে দূরের ছবি মলিন হ'য়ে এল রবি,
একটি ঘরে বস্‌ল কারা ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি'—
হাসি গল্প গানের সাথে কালির আঁচড় পাতার পাতে—
কেউ কহে, "বাঃ বেড়ে হ'ল," "নিছক গালাগালি"—
আবার চলে কাটাকুটি কাজের মাঝে মনের ছুটি,
ফুল কুড়িয়ে গাঁথছে মালা ভাবী দিনের মালি—
কল্পনাতে আজকে দেখি খালি।

তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে—
নবতি-নব বছর পারের টুক্‌রা কালের তীরে !
যেথায় মোরা ক'জন মিলে ঝাঁপ দিয়েছি হিম সলিলে,
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘট ভরেছি নীরে !
তারা কি আর কর্‌বে মনে জন্ম দিনের শুভক্ষণে,
দেখবে চেয়ে এড়িয়ে আসা আঁধার চিরে চিরে !

সেদিনে হায় কোন্ ষোড়শী বাতায়নে রইবে বসি',
মোদের ছন্দ বাজবে কি তার চরণ-মঞ্জীরে।
তারা কি আর চাইবে পিছন ফিরে।

কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি—
ক্ষতি কি তায়, পৃথ্বী বিপুল কাল সে নিরবধি!
মোরা জানি নূতন এসে নেবে তোমায় ভালবেসে
সাগর পানে বিপুল বেগে বইবে তব নদী!
মোদের শ্মশান-ভস্ম 'পরে জানি সুদূর যুগান্তরে—
রইল পাতা ভাবী কবির অচল পাকা গদি।
আজ জেনেছি ছুটবে তুমি প্লাবন করি নূতন ভূমি,
নারবে বাধাবন্ধ কোনো রাখতে তোমায় রোধি।
কালের স্রোতে হারাই মোরা যদি!

ভাবতে মনে লাগছে চমৎকার—
নব-নবতি বছর পরে শতেক হবে পার।
রঙে তোমার, তোমার লেখায়, তোমার ছন্দে, তোমার রেখায়,
দেখছি মনে কালের চাকা ঘুরছে অনিবার।
শুনছি কানে দূরের বাণী মৃত্যুপারের কলহাসি,
দম্ভভরা চরণ-শব্দ বিজয়-মত্ততার—
অসীম সে কাল পড়ল ধরা মোর আঙিনায় কলস্বরা
তটিনী সে, নয় মহাকাল বিপুল ক্ষুরধার!
ভাবতে মনে লাগ্‌ছে চমৎকার।

—

[শনিবারের চিঠি ভাদ্র ১৩৩৫ হইতে পুনর্মুদ্রিত।]

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাশ্চাত্য-প্রভাব

শ্রী[illegible]াংশু মৈত্র

সাত

'জীবনদেবতা'র বিলম্বাদিত তত্ত্ব বা জটিল ভাবগ্রন্থির উন্মোচনের চেষ্টা করার আগে নারী সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক ভাবাদর্শের যে স্বতোবিরোধ পূর্বে আলোচিত হয়েছে, উর্বশী এবং অন্যান্য কবিতার সূত্রে, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই স্বতো-বিরোধ রবীন্দ্রনাথে কি উৎকট রূপ গ্রহণ করেছে তা অনুধাবন করলে দেখা যায় যে প্রতীচ্যে George Sand, Marcel Proust এবং শেষে D. H. Lawrence এই বিরোধের বিবর্তন যতটুকু চিত্রিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ এই সনাতন ভারতবর্ষে শান্তিনিকেতন-বাসী হয়েও তাঁদের বহু পশ্চাতে ফেলে গিয়েছেন। নারীর মধ্যে কল্যাণী আর মোহিনীর যে অন্যোন্যব্যাঘাতী যুগ্মসত্তা রোমান্টিককে শেষ পর্যন্ত আত্মকরুণার (self-pity) প্রবল আবেগে আত্মনাশে প্ররোচিত করেছে ওই মোহিনীকে অধিকারের ঈপ্সায়, সেই যুগ্মসত্তার ধারণাই আবার নারীর মধ্যেই এই বিরোধের চেতনা আরোপ করেছে—নারী নিজেই নিজের মধ্যে জননী আর প্রিয়ার সংঘাত অনুভব করে, কখনও বা অনুভব করে সহাবস্থান, কখনও বা অপূর্ব দ্বৈতলীলা। Bernard Shaw-এর Candida নাটকে নারীর এই দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্বে জননীর চূড়ান্ত জয় প্রদর্শিত হয়েছে বটে কিন্তু Shaw দেখাচ্ছেন এই জননী আর প্রিয়া, কল্যাণী আর মোহিনী, লক্ষ্মী আর উর্বশী যখন একজন পুরুষের বদলে একাধিক পুরুষে আপন যুগ্মসত্তার সার্থকতা খোঁজে তখন যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধান হল একটি সত্তার বলিদানে। Shaw নিজেকে anti-romantic বলে প্রচার করতেন। তাই আদি জননীকে রেখে আদি মোহিনীকে বিসর্জন দিয়েছেন, কেন না সুস্থ জীবনের মূল্য শিল্পের চেয়ে বেশী এবং সুস্থ জীবন যাপন করতে হলে ওই ঘরভাঙা অকল্যাণীকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে জননী আর প্রিয়ার সহাবস্থানই ক্লাসিক্যাল ভাবধারায় স্বীকৃত এবং গতানুগতিক দিনযাপনে জননী হন গিন্নী আর প্রিয়া হন দাসী। পুরুষেরও জাতীয় অধোনয়ন ঘটে। তিনিও হয়ে দাঁড়ান ভর্তা বা কর্তা এবং দাস। কালক্রমে গিন্নী-কর্তা সম্পর্কই সর্বগ্রাসী হয়ে স্ত্রী-পুরুষের অন্য সত্তাকে নিগরণ করে। কিন্তু এমন অলক্ষিতক্রমে এই বিবর্তন বা অধোবর্তন ঘটতে থাকে যে সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ এই পরিবর্তনকে লক্ষ্যই করে না। যে ক্ষেত্রে অবশ্য প্রিয়াত্বের আত্যন্তিক অসদ্ভাব থাকে প্রথম থেকেই সে ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বের অঙ্কুরেই বিনাশ হয় থাকে শুধু ভর্তা আর ভৃত্য, যেমন আবহমান কালের হিন্দু বিবাহে। আমাদের এই বিবাহে নারী আর পুরুষের ব্যক্তিসত্তার কোনও স্বীকৃতিই নেই, আছে শুধু জীবযাত্রাপালনের দায়। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা আসার ফলে আমাদের ভাবলোকে এবং সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদে যে পরিবর্তন ঘটছিল তার ফলে বিলম্বিত বিবাহ এবং নারীর ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণের সুযোগ এবং প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে শাস্ত্রমর্মানভিজ্ঞ অথচ শাস্ত্রের দোহাই-পাড়া, হিন্দু-বিবাহের আধ্যাত্মিক মূল্যের ধ্বজা-ধারীদের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, যদি মনুকে নিয়েই টান দিতে হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণের জন্যে হিন্দু-বিবাহের ব্যবস্থা নয়, হিন্দুর বিবাহ একান্নবর্তী পরিবার এবং তদ্ভিত্তিক সমাজের রক্ষার জন্যে—মূলতঃ পুত্রোৎপাদনের জন্যে। সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে মনুর যে শ্লোকার্ধ যত্রতত্র উদ্ধার করা হয়—যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা—রবীন্দ্রনাথ মনুর সেই স্থান থেকেই প্রকরণ উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে আসল কথাটা হল নারীর পক্ষে স্বামীর হর্ষোৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা। কারণ ওই একই জায়গায় মনু বলেছেন :

'যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে।

(হিন্দু-বিবাহ—রবীন্দ্রনাথ)

বিবাহ সম্বন্ধে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রতীচ্য সংস্পর্শের ফল এবং তা যে প্রথম প্রকট হয় নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিয়েছেন; তার যুক্তিও বিস্তার করেছেন এবং শেষে তাকেই কাম্য বলে মেনেছেন :

'বিবাহ সম্বন্ধে ইংরেজিশিক্ষার কী প্রভাব তাহা আলোচনা আবশ্যক। পুরুষ শাস্ত্রচর্চাবান এবং স্ত্রী শাস্ত্রচর্চাহীন, মন্ত্রহীন হয়, ইংরেজি মতে ইহা প্রার্থনীয় নহে। বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের একীকরণ ইংরেজি বিবাহের উচ্চ আদর্শ। কিন্তু সে একীকরণ সর্বাঙ্গীণ একীকরণ। কেবল সাংসারিক একীকরণ নহে, মানসিক একীকরণ। স্বামী যদি বিদ্বান হয় এবং স্ত্রী যদি মূর্খ হয় তবে উভয়ের মধ্যে মানসিক একীকরণ সম্ভবে না, পরস্পরের মধ্যে সম্যক ভাবগ্রহ চলিতে পারে না। একটি প্রধান বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকে।

'জীবনের সমুদয় কর্তব্যসাধনে স্ত্রীর সহযোগিতা, ইহাও ইংরেজি বিবাহের আদর্শ।...যাঁহারা বলেন হিন্দু বিবাহের এইরূপ আদর্শ, তাঁহাদের কথা প্রমাণাভাবে এখনও মানিতে পারি না। হিন্দু বিবাহে মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায় মিলন ঘটিয়া থাকে কি না বিচার্য। আমরা স্ত্রীকে সহধর্মিণী নাম দিয়া থাকি বটে, কিন্তু মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই; কেবল স্বামীকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহারা স্বর্গে মহিমান্বিতা হন। ইহাকে উচিত মতে স্বামীর সহিত সহধর্ম বলা যায় না।...স্ত্রী-পুরুষে শিক্ষার ঐক্য নাই, ধর্মব্রতপালনের ঐক্য নাই, কেবলমাত্র জাতি-কুলের ঐক্য আছে।

'অনেক শিক্ষিত লোকে ইংরেজিশিক্ষার গুণে এই ইংরেজি একীকরণের পক্ষপাতী হইয়াছেন। হৃদয় মনের স্বাভাবিক নিগূঢ় ঐক্য থাকা প্রযুক্ত দুই স্বাধীন ব্যক্তির স্বেচ্ছাপূর্বক এক হইয়া যাওয়াই ইংরেজি একীকরণ; আঠা দিয়া এবং চাপ দিয়া জোড়া, সে অন্য প্রকার একীকরণ। উক্ত ইংরেজি আদর্শের প্রতি যদি কোনো কোনো শিক্ষিত লোকের পক্ষপাত দেখা যায়, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। উহা অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজি শিখিয়া যে কেবলমাত্র অমটুকু উপার্জন করিব তাহা হইতেই পারে না, ইংরেজি ভাব উপার্জন না করিয়া থাকিবার জো নাই।' (হিন্দু-বিবাহ)

কিন্তু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক এই নূতনতর বিবাহের পক্ষপাতী হলেও এ বিবাহ সম্ভব তখনই যখন নারী অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারিণী। তা না হলে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিধির মত এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবজীবনে অপ্রযোজ্য এবং অসার্থক হয়েই থাকে। ফলে বাসনা আর বাস্তবে বাধে নিরন্তর দ্বন্দ্ব রোমান্টিকের মনে। নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ আর নারীর সামাজিক মূল্য, এই দুইয়ের বিরোধ এখনও পর্যন্ত আমাদের উপন্যাসের মূল উপজীব্য, এমন কি গত বছরে প্রকাশিত তারাশঙ্করের 'শুকসারী কথা'-য় পর্যন্ত। ইংলণ্ডে ভিক্টোরীয় যুগ পর্যন্ত নারীকে এই দ্বন্দ্বের আধার হিসেবে দেখা গেলেও সেখানে নারীর অবস্থা প্রাচ্যের তুলনায় অনেক বেশী সহনীয়, বিশেষ করে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা এবং জাতিভেদের কুপ্রথার অনুপস্থিতি এবং উত্তরাধিকার বিধির নিরপেক্ষতা সেখানে সামাজিক পরিবেশকে এত পঙ্কিল করে নি। ওদের বিবাহ ব্যাপারেও নীতি ও ধর্মের দিক থেকে নারী আর পুরুষ সমান। মেয়েমানুষের ওখানে খারাপ ভাল দুই হবার স্বাধীনতা আছে প্রচুর। তাই ডিকেন্সের উপন্যাসে Agnes-ও সম্ভব Nancy-ও (Oliver Twist) সম্ভব আবার তার বহু আগেই, Nancyর জনয়িত্রী Moll Flanders-ও সম্ভব।

শুধু নারীর ব্যক্তি-সত্তার স্বীকৃতির ব্যাপারেই নয়। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এই পাশ্চাত্ত্য অনুপ্রবেশের সমর্থন রবীন্দ্রনাথে সশ্রদ্ধ আবাহনের মত শোনায় :

'সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাদৃত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখনও জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর-একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্বেই আমাদের পিতামহেরা

তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন। আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্বেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা তো পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। যাহারা প্রপিতামহের মধ্যেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন্ বর্তমানের তাড়নায়, কোন্ ভবিষ্যতের আশ্বাসে। পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে সে প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে। তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা পরিবর্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে; আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মত জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।...

'অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড় মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনপণ করিয়াছেন।...

'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।...

'একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যে-দিন অকস্মাৎ পূর্বপশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আহ্বান হইল; সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল।...

'এমনি করিয়া আমরা যে দিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।' (পূর্ব ও পশ্চিম। শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেন কি এর পরেও বলবেন রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য-পাপ-অবিদ্ধ এবং তাতেই তাঁর গৌরব?)

রোমান্টিক যুগ এবং তারই পরিণতি-পুষ্ট অনুবৃত্তি ভিক্টোরীয় যুগের রবীন্দ্রনাথে এই সাগ্রহ প্রতীচ্য স্বীকরণ। আরও স্মরণীয় যে সেই যুগসন্ধিকালে ফরাসী সাহিত্যের অবাধ আস্বাদনে ঠাকুর পরিবারের বিদগ্ধ আবহাওয়া ফরাসী প্রসূনের গন্ধ-স্নিগ্ধ। Benjamin Constant, Henri Beyle (Stendhal), Balzac, Aurore Dupin (George Sand), Gustave Flaubert. Emile Zola, Maupassant, এমন কি Pierre Loti পর্যন্ত পঠিত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মূলেই, অনুবাদে নয়। এই সব ফরাসী ঔপন্যাসিকদের সকলের সম্বন্ধে অবশ্যই স্নিগ্ধ কথাটি ব্যবহার্য নয়। George Sand-এর সঙ্গে Flaubert-এর আকাশ-পাতাল পার্থক্য এবং ওই কথাটি যদিও বা George Sand দাবি করতে পারেন, ফ্লবেয়ার তো একেবারেই নন। ইংলণ্ডে ওই সময় Walter Scott-এর একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু নারী সম্পর্কে Scott-এর দৃষ্টিভঙ্গী রোমান্টিক শুধু একটি অর্থে যে তিনি নারী পূজক। নারী হয় দেবী নয় বা মনোহারিণী। নারীর সত্তায় অন্তর্দ্বন্দ্বের তিনি বিশ্লেষণ করেন নি অর্থাৎ নারীর মধ্যে কল্যাণী আর অলক্ষ্মীর অন্তর্বিরোধ, তার নিজেরই প্রাপ্তি আর প্রাপণীয়ের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান, এ সব তাকে তেমন ভাবায় নি। অনাস্বাদিতকে কেবল আস্বাদনের ইচ্ছা আর যা পাওয়া গিয়েছে তাতে অতৃপ্তি, রোমান্টিকের এই যে আপনাকে কেবলই ছাড়িয়ে যাবার ইচ্ছা, কেবলই প্রকৃতির সদা-পরিবর্তমান গতিমুখে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে আপন সার্থকতা খোঁজা—নারীর মধ্যে এই চিত্তবৃত্তির আরোপ করেছেন George Sand এবং Turgenev। এই আরোপ পুরুষের ওই চেতনার নারীর ওপর প্রক্ষেপ নয়। ওই চেতনা যদি পুরুষের চিত্তে সহজাত হয় তাহলে নারীর চিত্তেও তাই এবং দুইয়ের মধ্যেই ওই চিত্তবৃত্তি রোমান্টিসিজমের প্রকাশ। প্রতীচ্য নারী-চরিত্রে রোমান্টিসিজমের যে প্রকাশ George Sand-এর প্রথম দিকের উপন্যাসে তাকে সরল বা naive বলা চলে। তাঁর নায়িকারা জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের

দাবদার নন ; তাঁরা দাবি করেন মানসজীবনে সমান অংশীদারী। ব্যক্তিগত জীবনে George Sand-এর স্বামীত্যাগের পেছনেও বোধ হয় এই রোমাণ্টিক চেতনাই কাজ করছিল। জীবনে বৈচিত্র্যের তৃষ্ণা, যাকে বলা যেতে পারে নিজেকে নব নব রূপে পাবার ইচ্ছা। এই সব নায়িকার মধ্যে গৃহিণীর উন্মেষই হল না। তাদের জননীসত্তা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল। তাদের প্রিয়া-সত্তার তাড়নাতেই তারা কেবল বলে—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা। Flaubert-এ এই মানসিকতার বিকৃত প্রকাশ যাকে Babbit বলেছেন romanticism walking on all fours. তাঁর মাদাম বোভারি জীবনের অর্থহীন পৌনঃপুনিকতার মধ্যে আপনার ব্যক্তি-সত্তাকে ক্ষয় করতে না চেয়ে জীবনপিপাসায় আর্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বৈচিত্র্য খুঁজতে গেল নাগর থেকে নাগরান্তরে। রোমাণ্টিক আদর্শকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করতে গিয়ে Flaubert তাঁর নায়িকাকে ক্লেদ-বিলাসে নামালেন, বললেন যেন, 'এই তো তোমার রোমাণ্টিক আদর্শবাদ!' নারীর প্রিয়া-সত্তার মক্ষিকাবৃত্তিতে নিমজ্জন। Zola-তেও এই ফ্লেবেয়ারীও নায়িকার পুনরাবৃত্তি। তবে Zola কোনমতেই নিজেকে রোমাণ্টিক বলতে দিতে নারাজ। তাঁর কথা হল scientific determinism। Taine-এর প্রভাব Zolaতে অতি তীব্র। Nana-তে Zolaর বক্তব্য হল এই যে, আদর্শ-কাদর্শ ছেড়ে সোজা এই কথাটা বাপু স্বীকার কর যে মানুষ পরিবেশের এবং প্রবৃত্তির দাস এবং এই মানুষ এমন কিছু আহা-মরি জীব তো নয়ই বরং এক Nana-ই সমগ্র ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায়ের আভি-জাত্যের জৌলুষ নিঃশেষে হরণ করে নিতে পারে। এই মনোভাবেরই প্রকাশান্তর হল বোদলেয়ারের প্রকৃতি ভাব-কল্পে—যে প্রকৃতির পুরুষকে গ্রাস করেই আনন্দ। প্রিয়াত্বের অধোগতি এই ধারায় Zola-তে এসে বিরতি লাভ করল, কিন্তু কিছু পরেই রোমাণ্টিক চিত্তবৃত্তির আর একটি সুপ্ত বা এতাবৎকাল উপচীয়মান কিন্তু অপ্রকট ধারা আত্মপ্রকাশ করল Andre Gide ও Marcel Proust-এ। জিদ্-এ একদিকে চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আর অন্যদিকে তাঁর ধর্ম বা নীতি-চেতনা। তাঁর সম্ভবত প্রথম উপন্যাস *La Porte etroite*-এ নায়িকা নিজের মানুষী প্রেম বা কামকে বলি দিচ্ছে নিজের ধর্মোপলব্ধির বেদীতে। অবশ্য এই উপলব্ধি একান্তই ব্যক্তিগত এবং বিশ্লেষণ করলে এ দ্বন্দ্বও ওই নারীহৃদয়ে কল্যাণী আর অলক্ষ্মীর দ্বন্দ্বের নামান্তর। [জিদ্-এর বিখ্যাত উপন্যাস *L' Immoraliste*-এ পুরুষের প্রজাপতি-বৃত্তির বৈজ্ঞানিক সমর্থন। স্ত্রী জীবিত থেকে সেই বৃত্তির কর্ষণায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। স্বামীর যক্ষ্মা তাতে সংক্রামিত হয়ে তার কাম্য জীবনান্তটি ঘটলে, স্বামী গুটিপোকা, প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেলেন উত্তর আফ্রিকায় আদিম জীবনের কাননে। এ উপন্যাসে নারী রোমাণ্টিক নায়িকা নয়—পুরুষই Madame Bovaryর স্থলাভিষিক্ত। নারী সম্বন্ধে এ নায়কের কোনও রোমাণ্টিক মোহ নেই।] নারী দ্বিধায় প্রেমিকের কাছে আত্মদানে অসমর্থ। ঠিক এর পরেই আসে Proust-এর *A la recherche du temps perdu* (The Remembrance of things past)। রোমাণ্টিক এখানে প্রিয়ার বর্তমানতার চেয়ে অবর্ত-মানতাই বেশী কামনা করে, কেন না সামনে না থেকে সেই বাঞ্ছিতা তার ভাব-কল্প দিয়ে নায়কের মন ভরে রাখে; দৈনন্দিন জীবনের নিরর্থক অকিঞ্চিৎকরতা তার ঔজ্জ্বল্যকে ঢেকে দেয় না। এই মানসিকতাকে Proust-এর Theory of Absence বলা হয়েছে। Proust এই ধারণাকে মনস্তত্ত্বের একটি স্বাভাবিক ধারা বলে গ্রহণ করেছিলেন। Proust-এর আগে Stendhal আর একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল Theory of Crystallization। এতদনুসারে মানুষের যেমন সর্বদাই রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনা তেমনি সর্বদাই প্রেমসংক্রমণের সম্ভাবনা। কোন বিশিষ্ট প্রেমাস্পদের উপস্থিতির সে-জন্যে কোনও প্রয়োজন নেই। তবে কেউ উপস্থিত হলেই, গলানো চিনি যেমন সুতোর আশ্রয়ে দানা বেঁধে ওঠে, তেমনি মনের সঞ্চিত নিরাধার ভালবাসা সেই ব্যক্তির আধারে কেলাসিত হয়ে ওঠে। Proust-এর প্রেম এতই পরিশ্রুত, এত চৈতন্যসর্বস্ব, এতই কল্পনানির্ভর যে কোনও ব্যক্তির উপস্থিতি সে প্রেমের পথে বাধা। দুষ্প্রাপ্যতা কিংবা শারীরিক অনুপস্থিতি কিংবা ঔদাসীন্য এমন কি সন্দেহ ও অসন্তোষ পর্যন্ত প্রয়োজন Proust-এর প্রেমকে জিইয়ে রাখবার জন্যে। একই সঙ্গে ঘৃণা ও প্রেম,

সন্দেহ ও আস্থা, ঈর্ষা ও নিষ্ঠার এই বিচিত্র দোলা Proust-এর আগে ফরাসী সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছিল ফুরহান রাসিনের নাটকে। এই উপন্যাসে Proust আবার নিজেই উপস্থিত রয়েছেন Marcel-এর চরিত্রে। তাতে উপন্যাসখানি হয়েছে আরও কৌতূহলোদ্দীপক। Proust-এর উপন্যাসে রোমান্টিসিজমের ধারক কিন্তু নায়ক, নায়িকা নয়।

ইংরেজী উপন্যাসে শিভ্যালরি বা দেবীকরণ প্রচুর পাওয়া যাবে কিন্তু আলোচ্য যুগে ইংলণ্ডে নারীসত্তার আগালোচিত অন্তর্দ্বন্দ্বের বা নায়কের চিত্তে নায়িকার ওই অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের প্রতিফলন সুলভ নয়। ফরাসী উপন্যাসে রোমান্টিক নায়িকার এই যে বিবর্তন দেখানো হল এদেশে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এবং গল্পে সেই বিবর্তনের ধারা রক্ষিত, পরিবর্ধিত এবং তীক্ষ্ণায়িত হয়েছে। কবিতায় নারীর স্ববিরোধী রূপের যে রোমান্টিক উন্মোচন দেখা গিয়েছে, গল্পে এবং উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেই রূপকে আরও সুবোধ্য, সুসীম এবং বিশিষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর গল্প এবং উপন্যাসের কালানুক্রম অনুসরণ না করেও রোমান্টিক নায়িকার রূপোদ্ভেদ স্তরে স্তরে অনুধাবন করা যায় এবং পাশ্চাত্ত্য পটভূমিকাটি স্মরণে রাখলে এই বিবর্তনের অনুপ্রেরণার মূল সহজেই ধরা যায়। অবশ্য সব গল্প বা উপন্যাস যে সৃষ্টি হিসেবে সমান সার্থকতা অর্জন করেছে তা নয় কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের প্রতিপাদনে সেগুলির মূল্য অনস্বীকার্য।

লক্ষ্মী আর উর্বশীর উপন্যাসে অবতারণ রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই ঘটিয়েছেন :

'মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।' (বর্তমান psychologyর ভাষায় uterine and clitoritic)

'এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।

'ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

'আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।'

'দুই বোন' উপন্যাসে শর্মিলা লক্ষ্মী আর ঊর্মিমালা উর্বশী—জননী আর প্রিয়া। ঊর্মির হাতে শর্মির পরাজয়। জীবনে নারীসত্তায় যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাস্তব প্রয়োজনের চাপে ভোঁতা হয়ে গিয়ে তার ব্যক্তিসত্তারই বিলোপ ঘটায় রবীন্দ্রনাথ সেই অন্তর্দ্বন্দ্বকে অনুকূল পরিবেশে অতিশয়িত রূপ দিয়ে ট্র্যাজিক সীমা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে হঠাৎ রাশ টেনেছেন। শশাঙ্কমালির স্পর্শে ঊর্মির প্রিয়াত্ব প্রখর হয়ে উঠেছিল বলেই এ কথা মনে করা সমীচীন নয় যে তার মধ্যে অন্য প্রবণতাটি নেই। সেটি ছিল বলেই পরিণামে সে আপনাকে সামলেছে। এইখানেই ইউরোপীয় প্রবৃত্তি-মুখী জীবন-দর্শনকে রবীন্দ্রনাথ সবলে তাঁর ভারতীয় নিবৃত্তিমুখী বা নিরাতিশয্যের জীবনদর্শন দিয়ে অভিভূত করেছেন এবং এ অভিভবে অবাস্তব বা unrealistic কিছু যে নেই, জীবনে রোজ কি ঘটে, কি আপোসরফাতে জীবন চলেছে তা একটু স্মরণ করলেই উপলব্ধি করা যাবে। আপোসরফাই হল জীবন। জীবনের দাবিতে শর্মি আপোস করল আর ঊর্মির উর্বশী-লীলার অবসান ঘটল। অবশ্য শশাঙ্ক আর শর্মি আর ঊর্মি ঠেকে শিখল যে সর্বনাশের গহ্বর পায়ের কত কাছে মুখব্যাদান করে আছে। অলক্ষ্মী উর্বশীর নিজের মধ্যে এই পরিচয় পেয়ে ঊর্মিও কি শঙ্কিত ত্রস্ত হয়ে উঠল না ?

উপরে 'দুই বোন' থেকে উদ্ধৃতির চতুর্থ প্যারাগ্রাফে একটি ব্যাপার কিন্তু লক্ষণীয়। তৃতীয় প্যারায় জননীকে বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অলংকার আছে কিন্তু উচ্ছ্বাস নেই, যাথার্থ্য আছে আতিশয্য নেই। এই বর্ণনার মূল কথা সংযম। কিন্তু চতুর্থে প্রিয়াকে বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন বলে আর শেষ করে উঠতে পারছেন না। জননীর বর্ণনায় শুধু দীপক অলংকার আর প্রিয়ার বর্ণনায় দীপক, সার, কারণমালা এবং রূপক অলংকারের ছড়াছড়ি। জননী শুধু জীবনধারণের প্রচুর উপকরণ দান করেন। তিনি যা দেন তা ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায়। আর প্রিয়া যা দেন তা অনির্বচনীয়, তা হৃদয়ের

মণিকোঠায় স্বর্ণবীণায় ঝংকার-পরম্পরায় মাধ্যমে তুলে নিয়ে যায় অতীন্দ্রিয় লোকে। বীণাটি স্বর্ণের হলে যে সুরসম্পদ বাড়ে তা নয় তবে প্রিয়াকে সোনার পুতলী ভিন্ন আর কিছু বললে যেন হীনোক্তি করা হয়। রবীন্দ্রনাথে এই প্রিয়া-পক্ষপাত বিশেষ অনুধাবনযোগ্য, কেন না এই পক্ষপাত আছে বলেই রবীন্দ্রনাথ এত শঙ্কান্বিত, এত সতর্ক, কেবল নিজেকে সামলে সামলে চলেন। এবং অংশতঃ এই কারণেই প্রিয়া-জননী দ্বন্দ্ব তাঁর সৃষ্টিতে এত প্রাধান্য অর্জন করেছে। এটি তাঁর মধ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য দ্বন্দ্বের একটি দিক মাত্র, কিন্তু অতি বিচিত্র এর জন্ম প্রকাশ।

'দুই বোন' আর 'মালঞ্চ' একই স্রোতের দুটি ধারা হলেও সরলা-নীরজা আর শর্মিলা-ঊর্মিমালার সমীকরণ সম্ভব নয়। চারজনের চরিত্রে উপাদানের পার্থক্য এবং কম-বেশী আছে। সে পার্থক্য বিশেষ করে সরলা আর ঊর্মিমালা নামের মধ্যেই প্রকট। তা ছাড়া ঊর্মি আর শর্মি যেমন দুটি তত্ত্বের প্রতীক মাত্র, বাস্তব বৈশিষ্ট্যে ন্যূন, সরলা আর নীরজা তা নয়। এরা প্রতীকধর্মিতা ছাড়িয়ে রক্তমাংসের জীব হয়ে উঠেছে, ফলে ঈর্ষা এই উপন্যাসে যেমন সূচিতীক্ষ্ণ রূপ নিয়েছে এমন রবীন্দ্রনাথে আর কোথাও নয়। মূলতঃ কিন্তু সরলা যা বলেছে সেইটিই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কথা। সরলা স্বেচ্ছায় জেলে যাবার আগে আদিত্যকে বলে গেল:

'আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্ত-কালের শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ক'রে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্যে।'

তবু যে সাক্ষাৎকারে সরলা এই কথা আদিত্যকে বলেছিল সেই সাক্ষাৎকারেরই অন্তে আদিত্য সরলার একটি চুম্বন-প্রত্যাশায় চাতকের মত চেয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ:

'পুরুষের চোখ ছল ছল করে উঠল।

'সরলা কাছে এসে নীরবে মুখ তুলে ধরলে।'

এখানে 'পুরুষ' শব্দের ব্যবহারেই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। রুগ্ন নীরজার কাছ থেকে আদিত্য এখন আর চুম্বন আশাও করে না, কামনাও করে না। নীরজা মৃত্যুর আক্ষেপের মধ্যেও, যে সরলা বা প্রিয়া বা অলক্ষ্মী তার সংসার গ্রাস করল তাকে, প্রাণপণে ঠেকাতে চায়:

'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।'

রবীন্দ্র-সাহিত্যে মূর্তিমতী অলক্ষ্মী হল বিনোদিনী-পরবর্তী সমগ্র বাংলা সাহিত্যের নায়িকাদের প্রসূতি শরৎচন্দ্র তো স্বীকারই করেছিলেন যে তিনি 'চোখের বালি ছত্রিশ বার পড়েছিলেন তবু তাঁর হাতে বিনোদিনী কিরণময়ীতে রূপান্তর শিল্পের অবনয়ন, উন্নয়ন নয়। কি যুগচেতনা যে অগ্রসর হয়েছে তার প্রমাণ শরচ্চন্দ্রে sense of waste-এ। বিনোদিনীকে জীবনে স্বীকৃ দিতে রবীন্দ্রনাথ নারাজ। তার ব্যর্থ জীবন সমাজে চোখে অপচয় নয় কিন্তু কিরণময়ীর মূল্য স্বীকার ন করা যে সমাজেরই ভীরুতা ও দুর্বলতার পরিচায়ক ত শরচ্চন্দ্রে প্রকট। কিরণময়ীকে তাই কাশী পাঠিয়ে সমস্য মিটানো যায় না। তাকে পাগল করে দিতে হয়।

বিনোদিনী শুধু প্রিয়া। 'দুই বোনে' প্রিয়াজাতী স্ত্রীকে বর্ণনা করতে রবীন্দ্রনাথ যা যা বলেছেন তার সব বিনোদিনীতে প্রযোজ্য। মহেন্দ্রের সংসার সে ভাঙে কিন্তু মহেন্দ্রের নিজের জীবন উল্লাসে উদ্বেগে প্রতীক্ষা হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। লক্ষ্মী (মেয়ে) আশা তার আক্রমণে পর্যুদস্ত। 'দুই বোনে' ঊর্মিমালা নিজেই শশাঙ্ককে ছেড়ে যায়, এখানে বিনোদিনীকে ছাড়াতে হয়। তারও কারণ কালের ব্যবধানে, গ্রাম্য, নিজের অধিকার সম্পর্কে অচেতন, অন্য-নির্ভর বিনোদিনীর আধুনিকা, অধিকার-চেতন, স্বপ্রতিষ্ঠ ঊর্মিতে রূপান্তর। কেউ যদি মনে করে বিনোদিনীর পূর্বতনী হল গিয়ে রোহিণী বা কুন্দনন্দিনী তাহলে গোড়াতেই ঘটবে প্রমাদ। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে রোহিণী বা কুন্দনন্দিনী নারীসত্তার স্বাভাবিক দিকের প্রকাশ নয়; তারা বিকৃত। অস্বাভাবিক পরিবেশে বা ব্যক্তিগত দুস্ত্যাজ্য কুরুচির ফলে নারীর ওই বিরূপতা প্রাপ্তি। নারীর মধ্যে দুই সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বে প্রিয়া-সত্তার ক্ষণে ক্ষণে স্বরাট লাভ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অজ্ঞাত ছিল তো বটেই, তাঁর মনের সনাতনী প্রবণতা এ তত্ত্ব স্বীকারই করতে পারত না। রোমান্টিসিজমের অকুণ্ঠ প্রকাশের জন্য আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাহলে বিনোদিনীকে প্রত্যাখ্যান করার মত নিষ্ঠুরতা রবীন্দ্রনাথে সম্ভব হল কী করে? এ হচ্ছে Shakespeare-এর Falstaffকে নিয়ে ব Mercutioকে নিয়ে সেই বিপদের বৃত্তান্ত। চরিত্র আপ

বেগে এবং লেখকের আন্তর রসে প্রবৃদ্ধ হতে হতে এমন রে পৌঁছে গেল যে তাকে দেখে লেখক স্তম্ভিত। এ যে অলক্ষ্মীর স্বর্গলাভ হতে চলেছে। অথচ 'চোখের বালি' রচনার সাত বছর পরেই পুত্র রথীন্দ্রনাথের তিনি বিধবা-বিবাহ দিয়েছিলেন। সাত বছর আগে কেন তিনি সাহিত্যে এ ব্যবস্থার সমর্থন করতে পারলেন না? বিদ্যা-সাগরের প্রতি তাঁর মনোভাবে আর বঙ্কিমের মনোভাবে স্বর্গে মর্ত্যের দূরত্ব। তিনিই তো ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে তৎকালে অগ্রচারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মহেন্দ্র আর বিনোদিনীর এলাহাবাদ পর্বের চূড়ান্ত মুহূর্তে নিম্নলিখিত কথোপকথনে বিনোদিনীর প্রতীকী অলক্ষ্মী সত্তাকে উদ্‌ঘাটিত করতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধা করেন নি।

মহেন্দ্র। কেন মরিলে না……। তুমি মরিলে কত মঙ্গল হইত ভাবিয়া দেখ।

বিনোদিনী। তাহা জানি, কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে, ততদিন আমি মরিতে পারিব না।

মহেন্দ্র। যতদিন তুমি না মরিবে, ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না—আমিও নিষ্কৃতি পাইব না। আমি আজ হইতে ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে তোমার মৃত্যু কামনা করি।…তুমি যাও। আমাকে ছুটি দাও। আমার মা কাঁদিতেছেন। আমার স্ত্রী কাঁদিতেছে—তাহাদের অশ্রু আমাকে দূর হইতে দগ্ধ করিতেছে। তুমি না মরিলে,…আমি তাঁহাদের চোখের জল মুছাইবার অবসর পাইব না।

কিন্তু রোমান্টিক নায়িকা বিনোদিনী নিজের প্রেমকে মহেন্দ্রের মাধ্যমে Crystallise করার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রান্তরে ধাবমান হল। তার তৃপ্তি নেই অনায়াস-লভ্যকে পেয়ে। কিন্তু সেই বেহারীই যখন এল কাছে তখন বিদ্রোহিনী সাহসিকা বিনোদিনী তার হাতে নিজেকে দিতে পারল না। অনেকে বলবেন বিধবার সংস্কার কি এত সহজে যায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে সমাজের সত্যকে শিল্পরূপ দিয়েছেন—hold the mirror up to nature, এই তো মহৎ সাহিত্যিকের কর্তব্য। কিন্তু মহৎ সাহিত্যিক যিনি তিনি অনাগতকেও আবাহন করেন, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে বীজাকারে দেখা দেয়। এই জন্যেই তো তিনি স্রষ্টা। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ স্ফুরণ রবীন্দ্রনাথ কল্পনায় প্রত্যক্ষ করলেন না। সে সম্ভাবনা আজ আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছে বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একে কল্পনাতেও স্বাগত জানাতে পারেন নি। রমা বাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে পত্রে তিনি বলছেন :

'মেয়েরা হাজার পড়াশুনো করুক, এই কার্যক্ষেত্রে কখনই পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নাবতে পারবে না।… যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাহিরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না।…যদি বল পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোনো কাজেরই কথা নয়। কেন না গোড়ায় যদি স্ত্রী পুরুষ সমান বল নিয়ে জন্মগ্রহণ করত তাহলে পুরুষদের বল স্ত্রীদের উপর খাটত কি করে। যদি এ-কথা ঠিক হয় যে, বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, তবে একথা নিশ্চয় যে, মেয়েরা কখনই পুরুষদের সঙ্গে (কেবল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে) বুদ্ধিতে সমকক্ষ হবে না।…যদি বা এমন বিবেচনা করা যায়, এক সময় আসবে যখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই আত্মরক্ষা উপার্জন প্রভৃতি কার্যে সমান রূপে ভিড়বে…তৎসম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি, আর সমস্ত সম্ভব হতে পারে, স্বামীকে ছাড়তে পার, বাপ ভাইয়ের আশ্রয় লঙ্ঘন করতে পার—কিন্তু সন্তানকেও ছাড়বার জো নেই।…অতএব আজকাল পুরুষ আশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসঙ্গত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়।…কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী অধীনতা মানুষকে সহ্য করতেই হয়; সেগুলিকে যদি অধীনতা হীনতা বলে আমরা ক্রমাগত অনুভব করি তবেই আমরা বাস্তবিক হীন হয়ে যাই এবং সংসারে সহস্র অসুখের সৃষ্টি হয়। তাকে যদি ধর্ম মনে করি তাহলে অধীনতার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি।…কেউ কেউ হয়তো বলবে, পুরুষের আশ্রয় অবলম্বনই যে স্ত্রীলোকের ধর্ম এটা বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কেন না এটা একটা কুসংস্কার। সে সম্বন্ধে এই বক্তব্য, প্রকৃতির যে অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল নিয়ম, তা স্বাধীন ভাবে গ্রহণ এবং পালন করা ধর্ম।…প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের অধীনতা কেবল তাদের ধর্ম বুদ্ধির উপরে রেখে দিয়েছেন তা নয়,

নানা উপায়ে এমনি আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে, সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি নেই।...স্ত্রী-পুরুষের অবস্থা পার্থক্য সম্বন্ধে আমার এই মত; কিন্তু এর সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার কোন বিরোধ নেই, মনুষ্যত্ব লাভ করার জন্ত স্ত্রীলোকের বুদ্ধির উন্নতি ও পুরুষের হৃদয়ের উন্নতি, পুরুষের যথেচ্ছাচার ও স্ত্রীলোকের জড় সংকোচ তার পরিহার একান্ত আবশ্যক। অবশ্য, সেকালেরও পুরুষ সম্পূর্ণ স্ত্রী এবং স্ত্রী সম্পূর্ণ পুরুষ হতে পারবে না এবং না হলেই বাঁচা যায়।'

অতএব 'নারীকে আপন ভাগে জয় করিবার' অধিকার দেবার অর্থ রবীন্দ্রনাথের কাছে, একই কর্মক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের tug of war করা নয়। ফলে বিধবা-বিবাহ যে একটি মাত্র অবস্থায় সমাজে চলিত হতে পারে সেই অবস্থাটাই রবীন্দ্রনাথের কাছে কাম্য নয়। কিন্তু বিনোদিনীর বিশিষ্ট ক্ষেত্রে এ সমস্যাটি ছিল না। বেহারীই প্রার্থী হয়ে এসেছিল, বলা যেতে পারে, তপঃক্লিষ্টা বিনোদিনীর কাছে। কিন্তু বিনোদিনী তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলল :

'কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।......ভুল করিয়ো না। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।'

এ শুধু বিনোদিনীর বিধবা-সুলভ দ্বিধা বা ভীরুতা নয়—শুধু মহেন্দ্রের জাতি-কুল খোয়াবার ভয় নয়। বিনোদিনীর বক্তব্য হল যে বিবাহের ফলে সেও সমস্ত গৌরব হারাবে। তস্মাৎ? এই হল রবীন্দ্রনাথে সেই প্রেম-বিবাহে দ্বন্দ্ব—ভারতীয় আর প্রতীচ্য দ্বন্দ্ব—classical দৃষ্টিভঙ্গী আর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বন্দ্ব। রোমান্টিক নায়িকা বিনোদিনীর ভয়, বেহারী আর সে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একান্ত কাছাকাছি এলে, তাদের মধ্যে সব আড়াল ঘুচে গেলে, বেহারী আর তার মধ্যে প্রিয়াকে খুঁজে পাবে না। প্রিয়ার প্রিয়াত্ব সংরক্ষণের জন্তে বিবাহ অবিধেয়। Proust-এ আমরা দেখেছি প্রিয়ার অনুপস্থিতিতেই বা অসতীত্বেই নায়কের প্রেমের শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ। তার রক্তমাংসের উপস্থিতি স্বপ্ন-প্রতিমাকে কেবল আঘাত করে, স্বপ্নকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায় না। Proust-এর নায়কের কিন্তু বিবাহ ঘটেছিল এবং তার পরে প্রয়োজন হয়েছিল নায়িকার অসতীত্বের নায়কের ঈর্ষার, নায়িকার অনুপস্থিতির, নায়কের সন্দেহের এবং এতজ্জাতীয় আরও অনেক কিছুর। রবীন্দ্রনাথ ক্ষেত্রে প্রতীচ্য রোমান্টিকদের পেছনে ফেলে আরও এগিয়ে গিয়ে বিবাহকেই অসম্ভব করে তুললেন, আর প্রতি ক্ষেত্রে নায়িকা বিবাহে অসম্মতি জানাল। অসম্মতি জানাল কিন্তু প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্তেই। নিজের রাক্ষসী-গ্রাস থেকে, উর্বশী-মায়া থেকে নায়ককে বাঁচাল জননীর মত স্নেহে এবং করুণায়। উর্বশী-লক্ষ্মী দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসেই (গোরা আর নৌকাডুবি এ আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক) নায়ক-নায়িকার বিবাহ-মিলন অসম্ভব করে তুলল। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজমের এ এক অদ্ভুত প্রকাশ। ভারতীয় ঐতিহ্য, মানুষের স্বাভাবিক মিলন-কামনা, সমাজের দাবি—সব কিছুকে অভিভূত করে দিল রোমান্টিকের প্রিয়া-বিরহ-বিলাস। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রেমের পূর্ণতা উপলব্ধি করেন বিরহে, মিলনে নয় :

তুই যদি যাস দূরে
তোরি সুরে
বেদনাবিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে আলোকে,
বিরহ বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্মের নিকটতম দ্বার—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার।

(পূর্ণতা : পূরবী)

[ক্রমশঃ]

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

বিক্রমাদিত্য হাজরা

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে যে-বনে গাছ নেই, সে-বনে "এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে" অর্থাৎ ভেরেণ্ডা গাছও বৃক্ষ বলে মর্যাদা লাভ করে। শুনতে পাই, সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্যে 'দেশ' পত্রিকা নাকি সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎকর্ষের মাপকাঠি। কথাটা শুনে সংস্কৃতের ওই শ্লোকটি মনে পড়ল।

'দেশ' পত্রিকা নিয়মিত পড়ি এ কথা জোর গলায় বলতে পারব না। অপচয় করার মত অত সময় কোথায় হাতে? তবে এ-দেশের যে পত্রিকার বহুল প্রচার নেহাত কৌতূহলবশতঃ হলেও মাঝে মাঝে সে পত্রিকার কিছু কিছু সংখ্যা উলটিয়ে দেখি বইকি।

আমার তো মনে হয় যদিও অনেক বছর ধরে 'দেশ' াত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, তবু আজও এর গা থেকে াতুড়ের গন্ধ দূর হয় নি। দৈনিক সংবাদপত্রের গর্ভে র জন্ম, এবং আজও এর সারা গায়ে সংবাদপত্রের গন্ধ ড়িয়ে রয়েছে। নিছক সাংবাদিকতাই যে এই পত্রিকার নেকখানি অংশ জুড়ে থাকে শুধু তাই নয়, এই ংবাদিকতার মান দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা থেকে ন্নত নয়। সাহিত্যবিষয়ক সাময়িকপত্রের সঙ্গে যে ংবাদিকতার যোগ আছে আমি তা অস্বীকার করছি না, বিধ দেশ-বিদেশের সংস্কৃতিগত সংবাদ এবং তৎসংক্রান্ত লোচনা সাময়িকপত্রে অপরিহার্য। কিন্তু এই দু জাতের ংবাদিকতার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রকৃতিগত ও গুণগত পার্থক্য ত্যাশিত।

আমার সামনে 'দেশে'র চারখানি সংখ্যা রয়েছে। খতে পাচ্ছি প্রতিটি সংখ্যাতেই এমন অনেক প্রসঙ্গ ক যা যে-কোন দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠা খুললেই দিন আমরা দেখতে পাই। কয়েকটি আমি এখানে খ করছি: কোন সাম্প্রতিক ঘটনার উপর একটি দকীয় আলোচনা, কয়েকটি কার্টুন ছবি, সিনেমা-র ও কোন কোন ছবি সম্পর্কে অল্প-স্বল্প আলোচনা, -প্রদর্শনীর আলোচনা, মস্কো বা ওয়াশিংটনের চিঠি, বিজ্ঞানের দু-চারটে খোঁজখবর ইত্যাদি। এ-সব বিষয়ের উপর বিশদ এবং গভীর আলোচনার মত জায়গার স্বভাবতঃই অভাব থাকে, এবং আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞ সমালোচকদেরও নিয়োগ করা হয় না। তার ফলে দৈনিক পত্রিকায় যা পাই সেই জিনিসই একটু ভিন্ন ভাষায় সরবরাহ করা হয় 'দেশে'র প্রায় অর্ধেকটা জায়গা জুড়ে। এই নিছক পুনরাবৃত্তির সার্থকতা কী?

একটা সার্থকতা অবশ্য সহজেই চোখে পড়ে। এতগুলো পৃষ্ঠা ভরাট করার জন্য কোন রকম চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না। দৈনিক পত্রিকার তলানিতে যা জমে তাইতেই কার্যসিদ্ধি। কিন্তু আর কোন সার্থকতা কি আছে?

বস্তুতঃ, দৈনিক পত্রিকার কতকগুলো বিভাগকে আত্মসাৎ করে 'দেশ' কোন উদ্দেশ্যই সাধন করে না। আমাদের দেশে কতকগুলো ইংরাজী ভাষায় রাজনৈতিক-ধর্মী সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে যেগুলোকে প্রকৃতই দৈনিক পত্রিকার পরিপূরক বলে গণ্য করা যায়, কারণ তারা বিশ্বরাজনৈতিক পরিস্থিতির এমন এক সর্বাঙ্গীণ চিত্র দিতে প্রয়াসী যা দৈনিকের পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব নয়। কিন্তু 'দেশে' যে সামান্য রাজনৈতিক আলোচনা থাকে তার মূল্য দৈনিকের যে-কোন একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের চেয়ে বেশী বা ভিন্ন নয়। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও 'দেশে'র বক্তব্য আর দৈনিক 'আনন্দবাজারে'র বক্তব্যে কোন তফাত নেই। সিনেমা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে এই একই কথা বলা চলে। অথচ 'দেশ' পত্রিকা যাঁরা পড়েন তাঁরা দৈনিক পত্রিকা পড়েন না বা তাঁদের দৈনিক পত্রিকা না পড়লেও চলে এ কথা নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া সঙ্গত নয়।

'দেশে'র সম্পাদক মশাই হয়তো আত্মপক্ষ সমর্থনে বলবেন যে তাঁদের নীতি হল থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়ের নীতি। দৈনিকে যা সাধুভাষায় লেখা হয়

তাঁরা তাই চলতি ভাষায় ভাষান্তরিত করেন। দৈনিক 'আনন্দবাজার' যদি অশোককুমারকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সিনেমা অভিনেতা বলে মন্তব্য করেন তো তাঁরা উত্তমকুমারকে সেই সম্মানটি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এবং সাংস্কৃতিক জগতের অধিকাংশ কার্যকলাপই তো ঘোড় বড়ি খাড়ার ব্যাপার!

এই ঘোড় বড়ি খাড়ার যুক্তি অবশ্য অকাট্য। কাজেই যারা দৈনিক পত্রিকা পড়েন তাঁদের অবশ্যই সাপ্তাহিক 'দেশে'র গ্রাহক হওয়া উচিত।

'দেশে' পর্যায়ক্রমে মস্কোর চিঠি ও ওয়াশিংটনের চিঠি নামে দুটি ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করেছিলাম, বোধ হয় এই আলোচনায় দুই বিখ্যাত অঞ্চলের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক জীবনের অনেক মূল্যবান ফার্স্ট্হ্যাণ্ড তথ্য জানতে পারা যাবে। পড়ে দেখলাম, হরি হরি! এ নেহাতই দৈনন্দিন সংবাদ প্রকাশের এক নতুন চাল। গদগদ ন্যাকামিব্যঞ্জক ভাষায় রিপোর্টাজের ভঙ্গীতে সংবাদ প্রকাশের যে রীতিটি দু-একটি বামপন্থী পত্রিকা প্রথম শুরু করেছিল, সম্প্রতি 'দেশে'র (এবং আনন্দবাজারের) কাছে তা অত্যন্ত প্রিয় রীতি হয়ে উঠেছে। উল্লিখিত দুটি বিভাগে সেই রিপোর্টাজের ঢঙে খবরের কাগজের খবরই সরবরাহ করা হচ্ছে। ১লা ভাদ্রের সংখ্যায় মস্কোর চিঠিতে মস্কোয় অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলন সম্পর্কেই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সাত্রকে কেমন দেখাচ্ছিল, এরেনবুর্গ কেমন ভাবে বসেছিলেন প্রভৃতি দু-চারটি খবর জানা গেল। খুব সম্ভব খবরগুলো 'সোভিয়েত দেশ' থেকে নেওয়া। এই সম্মেলনে আলোচিত বিষয় ও তার সম্পর্কে বিচারশীল মতামতের ধার দিয়েও যান নি লেখক, কারণ তাতে পাঠকদের জানা জিনিসের চেয়ে বেশী কিছু জেনে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। ১০ই কার্তিকের ওয়াশিংটনের চিঠিতে আলোচনার বিষয় ইলিশ মাছ, মেরেডিথ এবং লেখকের দুই নিগ্রো বন্ধু। প্রথম দুটিই সংবাদপত্রের খবর; একমাত্র তৃতীয়টিতেই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশের খানিকটা সুযোগ ছিল বলে এর জন্য তিনি আধ কলমের বেশী জায়গার অপব্যবহার করেন নি।

'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক খুবই দয়ালু। আমাদের বাঙালীদের স্মৃতিশক্তি কম বলে দৈনিকে পড়া বিষয়গুলো যাতে ভুলে না যাই সেজন্য একটি সাপ্তাহিক বার করছেন। যাতে আমাদের হজমের কোন ব্যাঘাত না হয় সেজন্য অনেকক্ষণ ধরে যেমন রোগীর জন্য বার্লি জ্বাল দেওয়া হয় তেমনি করে বিষয়গুলো যথাসাধ্য লঘুপাক করে একেবারে তরল অবস্থায় সরবরাহ করছেন।

একটি স্বল্পকলেবরের পত্রিকাকে যদি রাজনীতি, সাহিত্য এবং দৈনিক পত্রিকাসুলভ খবর ও সাংবাদিকতার বাহন করে তোলা যায় তবে কোন একটি বিষয়ও যথোচিত গুরুত্ব পায় না। আমি কিছুতেই ভেবে পাই না যে দৈনিক পত্রিকায় যে সব জিনিসের সঙ্গে প্রতিদিন আমাদের সাক্ষাৎ ঘটছে, একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সেই জিনিসগুলোই সরবরাহ করবে কেন? দৈনিকে স্টেইন-বেকের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার খবর যে ভাবে যতটুকু দেওয়া হয় সাপ্তাহিকের ক্ষেত্রেও তাই যথেষ্ট বলে গণ্য হবে কেন? আর 'দেশে'র সম্পাদক মশাই যদি এ কথা ধরে নিয়ে থাকেন যে 'দেশে'র অনেক পাঠক দৈনিক পত্রিকা পড়েন না তাহলে আমার তো মনে হয় সেটা সমগ্র পাঠক-সমাজকে অপমান করা। কোন পাঠক যদি দৈনিক পত্রিকা না পড়েন তবে তাঁর যে মানসিক ক্ষতি হবে তা পূরণ করার দায়িত্ব কোন সাময়িকপত্রের পক্ষে নেওয়া সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়।

বস্তুতঃ, ক্ষমার অযোগ্য আলস্য এবং সৃজনী-কল্পনার শোচনীয় অভাব—এই দুটি কথা দিয়ে 'দেশ' পত্রিকার পিছনে যে পরিকল্পনা রয়েছে তাকে ব্যাখ্যা করা যায়। সেই সঙ্গে আর একটি অমার্জনীয় অপরাধ যুক্ত হয়েছে পাঠক-সমাজকে অর্বাচীন স্কুলের ছাত্র বলে গণ্য করা। আলোচনার অংশে পাতার পর পাতা যে হালকা ভাষা, মামুলী কথা আর গতানুগতিক বিবরণ থাকে তার পিছনে রয়েছে এই মনোভাব যে পাঠকগোষ্ঠী এর চেয়ে ভারী জিনিস গ্রহণ করতে অক্ষম।

সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনার কথাই ধরা যাক। ৩রা কার্তিক সংখ্যার 'দেশে' "পূর্বপত্র" নামে একটি ফিচার ছাপা হয়েছে; তার মধ্যে লেখক মণীন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক বিবরণ আছে। যদিও সিনেমার কাগজ 'উল্টোরথ' থেকে প্রেরণাটা এসেছে, তবু বয়স্ক লেখকদের

প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু যে বিবরণ ছাপা হয়েছে তা কি মণীন্দ্রবাবুর সাহিত্যকৃতির প্রতি পাঠকদের এক ইঞ্চি আগ্রহ জন্মাতেও সক্ষম হবে? বিবরণটির মধ্যে প্রধানতঃ রয়েছে মণীন্দ্রবাবুর জীবন-যাত্রা ও তাঁর অতীত জীবনের কিছু কিছু তথ্য। তাঁর লেখা কয়েকখানা বইয়ের নামই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে। এইটুকুতে একজন লেখকের কতটুকু যে পরিচয় পাওয়া গেল তা আমার বুদ্ধির অগম্য। একজন লেখকের সঙ্গে দেখা করা হচ্ছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে—তাঁর শিল্পী-সত্তাকে বোঝা এবং জানার জন্য। তাঁকে তাঁর নিজের বই সম্পর্কে কোন মতামত জিজ্ঞেস করা হল না, তাঁর বিভিন্ন বইয়ের পিছনে কোন প্রেরণা কাজ করেছিল তা জানতে চাওয়া হল না, তাঁর সাহিত্য-ধর্ম কি এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হল না। লেখাটি পড়ে মনে হল এ যেন কোন কাল্পনিক সাক্ষাৎকারকে অবলম্বন করে একটি রম্যগল্প রচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর সবকিছু বিষয়কেই যদি রম্যরচনা করে তোলা হয় তবে হয়তো কোনদিন ভাত খেতে বসে দেখব যে পাতের উপর 'দেশে'র কয়েকটি পাতা পড়ে রয়েছে আর তাতে লেখা রয়েছে ভাত-রাঁধার ও খাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে একটি রম্যরচনা।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (এই বিবরণের লেখক) অবশ্য রচনার শেষে একটু critical হওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন: 'যৌবনের গজদন্ত-মিনারে আজও যে শিল্পীর অক্ষত অবস্থান, তিনি দূরের মানুষ। আমার যৌবন নেই, আমি তাঁর নাগাল পাই না—পাব না।'

যৌবনে তিনি পা দিলেন কবে যে তাঁর যৌবন যাবে? সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা-বর্জিত ধোঁয়াটে কথার শুধু ধ্বনি-মাধুর্যে মুগ্ধ হওয়ার বয়সটা হল কিশোরের। তিনি আজও কৈশোর পার হন নি বলেই এ ধরনের অর্থহীন চালিয়াতি দিয়ে নিজের সাহিত্য-বোধের দীনতাকে প্রকাশ করতে চাইছেন।

আমার সামনে 'দেশে'র যে কটি সংখ্যা রয়েছে তাতে সাহিত্য সম্পর্কে আর কোন আলোচনা নেই। তবে ১৭ই কার্তিকের সংখ্যাতে একজন পাঠকের একটি চিঠিতে গল্প উপন্যাসের আলোচনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি চোখে পড়ল:

'চিন্তা করবার মতো প্রায় কিছুই এর মধ্যে পাইনি। অধিকাংশ স্থলে যুক্তি নেই, বেশিরভাগই অত্যন্ত সাধারণ ও সাদামাঠা কথা, যা আমরা, (যারা কিছুই জানি না বা বুঝি না) যে কেউই বলতে পারতুম, (ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোনো কোনো পাঠকের পত্রই তার প্রমাণ) আর যা আছে, তা বিভ্রান্তিকর ও নিতান্ত একপেশে।'

চিন্তাশীল পাঠকের এই মন্তব্য যে নিরপেক্ষ সত্যভাষণ এ কথা বিনীতভাবে স্বীকার করে নেওয়া ভাল। যে লেখাটির কথা পাঠক বলেছেন তা খুব সম্ভব আমি পড়েছি (যদিও আমার সামনে নেই বলে তা থেকে কোটেশন দিতে পারছি না)। কিন্তু এ লেখার ত্রুটির জন্য সমালোচকের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে লাভ নেই। আট-দশ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধের মধ্যে এক বছরের সমস্ত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের আলোচনা করা শিবেরও অসাধ্য, এবং ভরসা করি সমালোচক এখনও শিবত্বপ্রাপ্ত হন নি। এত অল্পপরিসরের মধ্যে এতগুলো বইয়ের কোনরকম আলোচনা করা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র জাজমেণ্ট দেওয়া যায়। কিন্তু কোন সৃজনী সাহিত্য সম্পর্কে কোন সমালোচকেরই জাজমেণ্ট দেওয়ার কোন অধিকার নেই; তিনি শুধু অত্যন্ত বিনীতভাবে নিজের ব্যক্তিগত মতামত হিসাবে কোন বইয়ের মূল্যনিরূপণ করতে পারেন; তাও অবশ্য উপযুক্ত যুক্তি এবং বিশ্লেষণের সাহায্যে। এককথায় কোন বই সম্পর্কে রায় দিয়ে দেওয়া একটি অমার্জনীয় অপরাধ। এবং 'দেশ' পত্রিকার সুযোগ্য স্বনামধন্য পরিচালকগণ দিনের পর দিন তরুণ সমালোচকদের সেই জঘন্য অপরাধ করতে বাধ্য ও প্ররোচিত করছেন। দোষ ততটা সমালোচকদের নয়, যতটা সম্পাদকের বা সম্পাদনার কাজে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের।

এক জাতের লেখক আছে যারা সরস্বতীর দরজায় কিছুদিন মাথা ঠোকাঠুকি করে ব্যর্থকাম হয়ে অবশেষে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে তারা আসলে এক-একজন খুদে রবীন্দ্রনাথ, আর সেই কারণেই পাঠ্যপুস্তকের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাদের বিরাট প্রতিভা আটকে থাকতে পারে

না। তখন তারা স্কুল-কলেজের সীমানা ত্যাগ করে পত্রিকার সম্পাদকদের পিছনে 'দাদা দাদা' করে ঘুরতে থাকে। এই সব তরুণ সুশ্রী সুবেশ গুম্ফহীন লেখকদের সম্পাদকেরা খুব ভালবাসেন। তার একটা কারণ হ্যাভলক এলিস সাহেব বলে গিয়েছেন, আমি আর তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আর একটি কারণ হল এদের মত নির্জলা চাটুবাক্য প্রয়োগ করতে আর কেউ পারে না। সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশের হাতেখড়ি হিসাবে সম্পাদকেরা এদের হাতে নতুন প্রকাশিত বইগুলো দিয়ে দেন সমালোচনার জন্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা দশ বিশ বা ত্রিশ বছর ধরে সাধনা করছেন তাঁদের বই সমালোচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাদের হাতে যাদের সাহিত্য সম্বন্ধে অল্প-স্বল্প জ্ঞানও হয় নি। ফল যা হয় তার পরিচয় মিলবে 'দেশ' পত্রিকার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে।

অনেক বইয়ের আলোচনাতেই চার-ছ লাইনের বেশী জায়গা দেওয়া হয় না, কোন বইয়ের আলোচনায় যদি আধ কলম ব্যয় হয় তবে বলতে হবে বইটি ভাগ্যবান। এটা সাহিত্য পত্রিকা, তাই বইয়ের আলোচনার এই দুর্দশা। পক্ষান্তরে একটি ছায়াছবির আলোচনার জন্য অনায়াসে দু-চার কলম ব্যয় করা হয়। ১৭ই কার্তিকের সংখ্যায় শিশির চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'উপন্যাস-পাঠের ভূমিকা' বইখানির আলোচনায় আধ কলম ব্যয় করা হয়েছে, আর ওরা কার্তিকের সংখ্যায় 'কুমারী মন' নামে একটি ছায়াছবির আলোচনায় ব্যয় হয়েছে বিজ্ঞাপনের অংশ বাদ দিয়ে নীট তিন কলম। এই পক্ষপাতের কারণ কি এই যে একটি ছবি তৈরি করতে দু-এক লাখ ব্যয় হয় আর একটি বই প্রকাশ করতে ব্যয় হয় মাত্র দু-এক হাজার? এই ভাবে হিসাব করলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে 'দেশে'র মতে সাহিত্যের চেয়ে সিনেমা অনেক উঁচু স্তরের শিল্প কর্ম।

আমার সামনে যে কয়েক সংখ্যার দেশ রয়েছে তার মধ্যে বইয়ের আলোচনা বেশী নেই, শারদীয় পত্রিকাগুলির আলোচনাতেই বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে। সমালোচনার নমুনা হিসাবে উপরে উল্লিখিত শিশিরবাবুর বইটির আলোচনাই ধরা যাক। বইটি আমি পড়ি নি। কাজেই বইয়ের দোষগুণ সম্পর্কে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সমালোচনাটি যে কতখানি বিভ্রান্তিকর সেই দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত···পাঁচটি অধ্যায় ব্যয়িত হয়েছে উপন্যাস জিনিসটি কি এবং গতিপ্রকৃতি বোঝাতে।' অবশিষ্ট দুটি অধ্যায়ে কয়েকজন বাঙালী ঔপন্যাসিকের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। সমালোচক বলছেন, 'সম্প্রতিকালে বাঙালী লেখক অবশ্য তাঁর মতে মুষ্টিমেয়।' অবশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন, 'সমগ্র আলোচনায় বেশ জটিলতা আছে, তবে সামগ্রিকতা নেই।' এই শেষের লাইনটি হচ্ছে সমালোচকের মন্তব্য; আগের অংশটুকুতে শুধু বইটিতে কী আছে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিচয় এমন ভাষায় দেওয়া রয়েছে যাতে সমালোচকের বিরূপতা সুপ্রকাশ। বইটির নাম দেখেই বোঝা যায় যে উপন্যাস সম্পর্কে তত্ত্বমূলক আলোচনাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য; শেষে কিছু বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্বকে উদাহরণীকৃত করার জন্য। কাজেই পাঁচটি অধ্যায় তত্ত্বমূলক আলোচনায় ব্যয় করার মধ্যে কী অপরাধ আছে বুঝলাম না। 'কোটেশন-কণ্টকিত বিশুদ্ধ আলোচনায় অবশ্য বিদেশী লেখকের রচনা ও তাঁদের মতবাদই প্রাধান্য পেয়েছে।'—কিন্তু তাতেই বা অপরাধের কী আছে? বাংলাদেশে উপন্যাসের আলোচনামূলক কখানাই বা বই আছে এবং তাতে কটাই বা মৌলিক তত্ত্ব উত্থাপিত হয়েছে যে বৈদেশিক লেখকদের দ্বারস্থ হওয়া অপরাধ বলে গণ্য হবে? বাংলাদেশে যদি অনেক আলোচনা থাকত, তাহলেই বা বিদেশের আলোচনার খোঁজ-খবর নেওয়ায় দোষের কি আছে? জ্ঞানের রাজ্যেও জাতি-বিদ্বেষ আছে নাকি? লেখকের মতে বাংলাদেশে মাত্র দশজনের বেশী ঔপন্যাসিক নেই; এতেই বা অভিযোগের কি আছে? লেখক কজনকে প্রকৃত ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দেবেন তা নির্ভর করে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী ও মূল্য-মানের উপর। পরিশেষে সমালোচক তাঁর চরম সাহিত্যবোধের পরিচয় হিসাবে রায় দিয়েছেন যে বইটিতে জটিলতা আছে, সামগ্রিকতা নেই। কথাটাকে সমালোচক ব্যাখ্যা করেন নি; কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে এমন অনায়াস মন্তব্য সব সময় করা সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধের বইয়ের সমগ্রতা বলতে কী বোঝায়? আলোচনার শেষ নেই, কাজেই লেখক লেখা শুরু করার সময় নিজের মনে একটা সীমারেখা ঠিক করে নেন। লেখকের লক্ষ্য অনুযায়ী লেখাটি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে কিনা সমালোচকের তাই দ্রষ্টব্য। আমার তো মনে হচ্ছে শিশিরবাবু উপন্যাসের ভূমিকা লিখতে গিয়ে তত্ত্বমূলক আলোচনাকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন; ঔপন্যাসিকদের আলোচনা আনুষঙ্গিক সংযোজন মাত্র। কাজেই খুব সম্ভব লেখকের সীমারেখার মধ্যে লেখক সম্পূর্ণতা অর্জন করেছেন।

বস্তুতঃ, এ জাতের সমালোচনার সঙ্গে সমালোচনার তত্ত্ব রীতি বা পদ্ধতির কোন সম্পর্ক নেই। লেখকের বক্তব্য ও প্রয়োগের মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকলে সমালোচক তা উল্লেখ করতে পারেন। লেখকের বক্তব্য কতখানি যুক্তি-বিচারের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে সমালোচক তা দেখবেন। তিনি যদি ভিন্ন মতের অধিকারী হন, তবে নিজের চিন্তাধারা অনুযায়ী লেখকের চিন্তার দুর্বলতা দেখাতে পারেন। পরিশেষে সমালোচক রচনা-নৈপুণ্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন। কিন্তু এসব কিছুই না করে সমালোচক স্বয়ম্ভূ বিচারকের মত কতকগুলো অকপোলকল্পিত অভিযোগ যদি চাপিয়ে দেন লেখকের উপর তবে সে সমালোচনা বড়জোর সমালোচকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের নিরিখ হতে পারে, সাহিত্যের মানোন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে সে সমালোচনার কোন উপযোগিতা নেই।

আমি যে সমালোচনাটি উল্লেখ করলাম সেটির মধ্যে 'দেশে'র সমালোচনার চারিত্রিক বিশেষত্বটি উপস্থিত। এর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। যদি গোষ্ঠীভুক্ত লেখক না হন, অথবা যদি খুব খ্যাতনামাদের কেউ না হন তবে যে-কোন লেখকের যে-কোন বইয়ের কপালে 'দেশ' পত্রিকায় এ জাতের সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী। বইয়ের বক্তব্যের অন্তরঙ্গ আলোচনায় না গিয়ে বহিরঙ্গের নিতান্ত নন্‌এসেনসিয়াল কতকগুলো কল্পিত বা প্রকৃত দোষ-ত্রুটি দেখানোতেই এই সমালোচনার দায়িত্ব শেষ হয়। অথচ এই সব অর্বাচীন ইঁচড়েপক কাণ্ডজ্ঞানহীন সমালোচকদের ভাষায় যে দম্ভ আর ভণিতার অভিব্যক্তি ঘটে তা যে-কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেবে।

'দেশ' সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা, কাজেই দু-একটি গল্প আর দু-একটি ধারাবাহিক উপন্যাস প্রতি সংখ্যাতেই স্থান লাভ করে। গল্প উপন্যাস নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদকের বৈষয়িক বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'দেশে'র সম্পাদকের আধুনিকত্বে সত্যিই সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী বলেই তিনি গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করেছেন, রম্য-রচনার আশ্চর্য অর্থকরী সম্ভাবনার দিকটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

শ্রীশঙ্করের আশ্চর্য নোংরা গ্রন্থ 'চৌরঙ্গী'র নাম সকলেই জানেন। নাগরিক হোটেলের কেচ্ছার এই বিবরণীটি সুপ্রসিদ্ধ 'দেশ' পত্রিকাতেই স্থানলাভ করেছিল। এতদিনে বইটি শত সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে বলে ভরসা রাখি। 'দেশে' সম্প্রতি বিকর্ণ-রচিত 'দণ্ডকশবরী' নামে আর একটি কদর্য ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হচ্ছে যা প্রায় 'চৌরঙ্গী'র মত জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলে আশান্বিত হয়ে উঠেছি। আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, সমাজ-নীতির তত্ত্বমূলক আলোচনা এবং উপন্যাস, এ তিনের বিচিত্র সমন্বয়ে এই যে জারজ সন্তানটির জন্ম হয়েছে স্বভাবতঃই এর পিতামাতা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এই রম্য-বস্তুটির তাই কোন শ্রেণী নিরূপণ করতে পারছি না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমি স্পষ্ট অনুমান করতে পারছি এমন একটি চটচটে মদিরা-পাত্রের গায়ে মাছির মতই পাঠক-মন এমন লেপটে থাকবে যে টেনেও তাকে সরিয়ে দেওয়া যাবে না। এর প্রতি পরিচ্ছেদেই একটি করে রোমাঞ্চকারী সিচুয়েশন।

১লা ভাদ্রের সংখ্যায়: 'দেখলাম নাটকের শেষ দৃশ্য কমেডি নয়, চরম ট্র্যাজেডি সেটা। ধড়মড় করে উঠে বসল দু জন গাছ-তলার তৃণশয্যা ছেড়ে। রঙিলা-বেলোসা, আর না চয়ন নয়—কাবোঙ্গার কোতোয়ার। সর্বসমক্ষে টাঙ্গির কোপ মারার ভঙ্গি করলেও জনান্তিকে তাকেই বরণ করেছে আগুন-বরণ মেয়েটি।'

১০ই কার্তিকের সংখ্যায়: 'নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মেঝেতে ছড়ানো আছে খড়ের বিছানা। অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। শীতল একটা নারীদেহ! উন্মুখ প্রতীক্ষায় সেও বুঝি নিমেষ গুনছিল। অন্ধ আদিম আবেগের বুকে নিঃশেষ হয়ে যায় দুজন।'

১৭ই কার্তিকের সংখ্যায়: 'সে রাত্রে অফিসার ভদ্রলোকটিকে সরবরাহ করতে হয়েছিল আরও একটি ম-কারযুক্ত পদার্থ! মাড়িয়া মুবতী মেরিয়া!'

কিন্তু এ ধরনের খুচরো খুচরো দু-চারটে কোটেশান দিয়ে এ বইয়ের লোকোত্তর মহিমার একাংশও প্রকাশ করা যাবে না। বস্তুতঃ বইয়ের প্রতিটি ঘটনা, চরিত্র সংলাপ প্রভৃতি সবকিছুরই একমাত্র উদ্দেশ্য একের পর এক শিহরণকারী নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করা। সহজে কি আর এ লেখা 'দেশ' পত্রিকার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে?

'দেশ' সম্পর্কে আরও অনেক বলার আছে। কিন্তু আপাততঃ মুলতুবী রইল।

* * *

বানর যে অনুকরণপ্রিয় জীব সে সম্পর্কে একটি গল্প সকলেরই জানা আছে। এক টুপিওয়ালার সবগুলো টুপি একদল বানর হস্তগত করে ঠিক মানুষের মত করেই মাথায় বসিয়ে দিয়েছিল। টুপিওয়ালা অনেক কাকুতিমিনতি করেও যখন টুপিগুলো আদায় করতে পারল না, তখন রেগে গিয়ে নিজের মাথার টুপিটিও মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর আশ্চর্য, দেখাদেখি বানরগুলোও যার যার মাথার টুপি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এই গল্পটির মধ্যে বলতে চাওয়া হয়েছে যে অনুকরণপ্রিয়তায় বানরের তুল্য আর কিছু পাওয়া যায় না।

অনেকে যে বলেন 'অমৃত' 'দেশে'র হুবহু নকল, আমি তার প্রতিবাদ করি। বস্তুতঃ বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব বজায় রাখার জন্য 'অমৃতে'র সম্পাদক নানানভাবে চেষ্টা করছেন। আমি মেপে দেখেছি 'দেশে'র তুলনায় 'অমৃত' প্রস্থে আধ ইঞ্চি ছোট ও দৈর্ঘ্যে আধ ইঞ্চি বড়। 'অমৃতে'র হরফগুলোও হুবহু একরকমের নয়। বিভিন্ন বিভাগের জন্য পৃষ্ঠা বণ্টনেও 'অমৃত' নিজস্ব নীতি অনুসরণ করছে। এত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও 'অমৃত'কে 'দেশে'র অন্ধ-অনুকরণকারী বলে শুধু নিন্দুকেরাই গাল দিতে পারে।

তবে হাঁ, 'দেশে' যা আছে, 'অমৃতে' তা আছে; 'দেশে' যা নেই, 'অমৃতে' তা নেই—এমন আশ্চর্য সামঞ্জস্য একমাত্র যমজ সন্তানের মধ্যেই দেখা যায়। 'অমৃতের'ও অর্ধেকটা জুড়ে সেই দৈনিক পত্রিকা-সুলভ সাংবাদিকতা, সেই সম্পাদকীয়, সিনেমা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি সংবাদ, প্যারিসের চিঠি, সাপ্তাহিক সংবাদ, চিঠিপত্র প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসের সমাবেশ। মস্কোর চিঠিতে যদি থাকে ওদেশের স্থাপত্যের বিবরণ তো প্যারিসের চিঠিতে থাকে প্যারিসের ফ্যাশানের আলোচনা (অমৃত, ২রা কার্তিক) অর্থাৎ কলকাতায় বসে যে-সব জিনিসের খবর অনায়াসে সংগ্রহ করা যায় এ-সব বৈদেশিক পত্রে তার থেকে অন্যবিধ কোন জিনিস থাকে না। থাকা সম্ভবও নয়; কারণ এ সব চিঠি তো লেখা হয় কলকাতায় বসেই।

অতিবাস্তবতা অনেক সময়ই অবাস্তবতার কাছাকাছি চলে যায়। কোন কোন আধুনিক লেখক বাস্তবের বীভৎস চিত্র অঙ্কন করার লোভে সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করে যান। যেমন ১০ই কার্তিকের 'দেশে' প্রকাশিত শান্তিকুমার মিত্রের লেখা "অনুর্ভব" গল্পটি। গল্পের নায়ক ক্লান্ত হয়ে রাত্রিবেলা নিজের বস্তির ঘরে গিয়ে শুয়েছে। হঠাৎ 'কি যেন অন্ধকারের মাঝে তার ক্লান্ত দেহটাকে আঁকড়ে ধরছে।···অসীম মরিয়া হয়ে সেই অদ্ভুত পিণ্ডটাকে হাত দিয়ে চেপে আর জাপটে ধরেই চমকে উঠেছে। এ যে, এ যে···কোন সন্দেহই নেই। একটা দেহ, একটা তীব্র নিরাবরণ ক্ষুধা তাকে গ্রাস করতে চাইছে।···সেই দেহ-পিণ্ডটাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে অন্ধকার ঘরের আরো অন্ধকার কোণে ঠেলে ফেলে দিল।' নিরাবরণ ক্ষুধা বলাতে যে মেয়েটিকে বোঝানো হচ্ছে সে-ও একই বস্তির বাসিন্দা হলেও নায়কের কাছে অপরিচিতা। বেচারা লেখকের জন্য অনুকম্পা হয়। অবদমিত কামনার লেখক হয়তো দিনরাত কামনা করেন যে এমন একটি আশ্চর্য ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটুক; কিন্তু হায়! তা ঘটে না। আর ঘটে না বলেই বাস্তবতার নামে এমন অবাস্তবতা আমদানি করতে হয় গল্পে।

কিন্তু অতিবাস্তবতায় 'দেশ' 'অমৃত'কে ছাড়িয়ে গেছে এ ধারণা ভুল। লক্ষ্মণের মতই 'অমৃত' অবশ্যই দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। দীপংকর ঘোষের 'অন্ধকারের ঘোড়া' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে ২রা কার্তিকের 'অমৃত'তে। নায়ক জানতে পারল যে তার প্রেয়সী মালতী খারাপ মেয়ে। জানা সত্ত্বেও কথাটা অবিশ্বাস করে সে বোন মিনুকে মালতীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিল কারখানায় কাজের চেষ্টায়, কিন্তু মিনু আর ফিরে এল না। খারাপের সংস্পর্শে ভাল যে এত তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায় তা জানা ছিল না। অবশ্য আমরা যা জানি তাই যদি ঘটবে তবে আর তা অতিবাস্তব হবে কী করে?

অতএব আশংকার কোন কারণ নেই। আমি অত্যন্ত জোর গলায় এ ভরসা দিতে পারি যে 'অমৃত' কখনও 'দেশে'র থেকে পিছিয়ে থাকবে না। 'দেশ' যতই এগিয়ে যেতে চেষ্টা করুক, 'অমৃত' তার নাগাল ধরবেই।

*

সংবাদ-সাহিত্য

চীন-ভারত

ভারতবর্ষের উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত জুড়িয়া চীনা সৈন্যের ব্যাপক অগ্রগতি এবং ভারতীয় ঘাঁটি দখল প্রথম পর্বে অতি দ্রুততার সহিত প্রায় নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ও কয়েক সহস্র বর্গমাইল ভূখণ্ড ম্যাজিকের মত আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। প্রথম ধাক্কায় বিভীষিকা এমন লণ্ডভণ্ড প্রলয় আকার ধারণ করিয়াছিল যে হরবল্লভ রায়ের মত আমাদেরও মনে হইয়াছিল "নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে!" কিন্তু একটু ধাতস্থ হইতেই বুঝিলাম, না আমরা মরি নাই। শুধু তাহাই নহে, আশ্চর্য বিস্ময়ের সহিত আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম আসন্ন বিপদের মুখে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ একতাবদ্ধ হইয়া কি বিপুল শক্তির পরিচয় দিতে পারে। আকস্মিক বিপর্যয়ের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও দৃঢ়চিত্ততা আমাদের অনেকখানি বিপন্মুক্ত করিয়াছে বটে কিন্তু শত্রু এখনও ভারতের মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া আছে। যে কোনও উপায়ে তাহাদের দূরীভূত করাই এখন ভারতবাসীর মরণপণ প্রয়াস হওয়া উচিত। আমাদের জাতীয় সরকারের সহিত জনগণের সহযোগিতার যে চিত্র আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাইতেছি তাহাতে যথেষ্ট আশার উদ্রেক হইয়াছে। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে যে যাহা পারে সাধ্যমত অর্থ-অলঙ্কার দিতেছে, দেশের যুবকবৃন্দ সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য দলে দলে আগাইয়া আসিতেছে, রক্তদানের জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে, পাড়ায় পাড়ায় মাঠে ময়দানে চীনা পাশবিকতার বিরুদ্ধে জনসভায় ক্ষুব্ধ চিত্তের ধিক্কার বর্ষিত হইতেছে—নবভারতের এই ঐক্যবদ্ধ রূপটি আমাদের অগোচরে ছিল, চীনা আক্রমণ না ঘটিলে হয়তো প্রকাশের সুযোগ ঘটিত না।

স্বাধীনতালাভের পর এই পনেরো বৎসরকাল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা লইয়া ভারত সরকার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি অপেক্ষা দেশের গঠনমূলক কাজে পুরাপুরি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। দেশের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-সংকটের সমাধান করাই ছিল আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। বিদেশী রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার চিন্তা আমাদের নেতাদের কল্পনাতেও আসে নাই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ঠিক করিয়াছে কি ভুল করিয়াছে সে প্রশ্ন রাষ্ট্রনীতির অতি জটিল তর্কের বিষয়। আমরা সেই সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া এখন এক হাতে ঘরের শত্রুদের এবং অন্যহাতে বহিরাগত শত্রুদের যাহাতে নির্মূল করিতে পারি সেই চেষ্টাই করিব। বহু বিলম্বে হইলেও সরকার কর্তৃক ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি হইতে বাছাই করা দেশদ্রোহীদের কারাগারে প্রেরণ আমাদের ভবিষ্যৎকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ করিয়াছে। যে 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে' প্রবাদে আমরা এতকাল নির্ভর করিয়া আসিতেছিলাম, আজ দেখা গেল তাহাও ঠিক হয় নাই। খোদ কৃষ্ণকেই নির্বাসিত করা হইল এবং দারুণ সংকটের দশ আনা কাটিয়া গেল ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। তাহার উপর বিদেশী শক্তির সহায়তা আমাদিগকে আরও শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মোটের উপর প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর এখন সবদিক দিয়াই আমরা অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছি। এখন ধীরে সুস্থে অতি সতর্ক পদক্ষেপে চলিবার সময়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সাম্প্রতিকতম বক্তৃতায় (২৭. ১১. ৬২) শুনিলাম:

"চীনাদের আক্রমণে ভারতের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। ইহার পর ভারত আর কখনও কোন জালে পড়িবে না।…

চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিবে। এই সংগ্রাম কয়েকদিন অথবা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে শেষ হইবে না। এই যুদ্ধ কয়েক বৎসরও চলিতে পারে। মানসিক ও সামরিক উভয় দিক হইতেই আমাদের ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই কথাটি সকলকে বুঝিতে হইবে যে, ভারত কখনও আক্রমণকারীর নিকট নতি স্বীকার করিবে না। পরিণামে যাহাই ঘটুক এবং যে কোন মূল্যই দিতে হউক, ভারত চীনা আক্রমণের প্রতিরোধ করিবে।···

চীনা আক্রমণের সর্বপ্রকার ধাক্কা আমাদের সহ্য করিতে হইবে। প্রয়োজনের সময় বন্ধুদের নিকট হইতে সাহায্যকে আমরা অভিনন্দন জানাইব। কিন্তু বন্ধুদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে। সঙ্কটের সময়ে যে সকল মানুষ নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া যায় এবং বন্ধুদের সাহায্যের আশায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে তাহারা তাহাদের স্বাধীনতা হারায়। প্রধানতঃ জাতির মনোবলই আক্রমণ ও অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া থাকে। যতদিন না আমাদের মনোবল ভাঙিয়া পড়ে ততদিন পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের পরাভূত করিতে পারিবে না।···

যেভাবে ভারতবাসীরা তাহাদের সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া চীনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়াছে তাহা অত্যন্ত আনন্দের। যদিও চীনা আক্রমণে ভারতকে অনেক দুঃখ এবং দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে তথাপি একদিক হইতে ভারতের ভালই হইয়াছে। এই আক্রমণ আমাদের ঘুম হইতে জাগাইয়া দিয়াছে এবং আমরা জীবনের কঠোর বাস্তবতাকে উপলব্ধি করিয়াছি।" [যুগান্তর]

আমাদের মনের ভাব জওহরলালের এই বক্তৃতায় সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়াছে। ধর্মে সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যে বিত্তশালী এই বিরাট ভারতবর্ষকে আর্থিক সামরিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে আরও উন্নত করিয়া 'মহাভারত'রূপে গড়িয়া তুলিতে এখন আমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব।

* * *

দেশের জনগণ অর্থ-অলঙ্কার দিতেছেন, শ্রমিকেরা শ্রম দিতেছেন, লেখকেরা জাতিকে অভয়মন্ত্র শুনাইতেছেন, গায়কেরা মুক্ত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান গাহিয়া জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, সংবাদপত্রেরা সত্য সংবাদ, সুচিন্তিত মন্তব্য ও চিন্তানায়কদের বাণী ও বিবৃতি পরিবেশন করিয়া সংকটকালে জাতির পথনির্দেশ করিতেছেন—এ সকল সবাত্মক প্রচেষ্টা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। এই সময়টায় সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। যুগান্তরে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত "লাল চীনকে চিনুন" ও আনন্দবাজারে ধারাবাহিক প্রকাশিত "দেশে দেশে কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ" চীন ও কম্যুনিস্ট জগৎ সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল করিয়া তুলিতে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

আমরা সাহিত্যের কারবারী, সুতরাং সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চীনের মতিগতি দৃষ্টে কিছুকাল পূর্বে যে কয়েকটি উক্তি করিয়াছিলেন তাহারই কিছু উল্লেখ করিতেছি। ১৯৫৮ সনে তাসকেন্দে বহু আলোচিত অ্যাফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে তিনি চীনা লেখকদের উগ্র সমরবাদী মনোভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য বিরোধও করিয়াছিলেন। তাহারই উল্লেখ করিয়া ১৯৫৯ সালে মাদ্রাজে তিনি বলিয়াছিলেন :

"I shall re-affirm here what I stated in a much larger literary conference in an atmosphere vitiated by provocative political propaganda, sponsored and fanned by Chinese writers claiming to be protagonists of peace. I said, 'The spirit of the writer is the song of freedom. We have fought against Imperialism and Colonialism and will continue to fight against all injustice and wrongs to humanity, social and political, against all aggression on life in any form.··· We believe that although the writer cannot ignore the political struggle he has a deeper obligation to himself and to humanity which

is to liberate spirit of man through the excellence of creation."

অতঃপর এই সম্মেলনেই তিনি বলিয়াছিলেন :

"We shall resist enmity with our life, but even in a moment of greatest danger we shall be nobody's enemy. While we consider the Indian soil holy and her honour sacred and pledge everything to defend them, we shall cherish no ambition of conquest over other lands ; we shall not tolerate aggression against our country and shall never offend against the honour of another country.

But let us not deceive ourselves by a complacent acceptance of disguised enmity as friendship, for that will be treachery, the worst crime against human values."

—ইহা খাঁটি ভারতীয় আদর্শের কথা।

এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের দুইজন সাহিত্যিকের জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দানের কথা স্মরণ করিতেছি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জগত্তারিণী ও শরৎ পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত দুইটি স্বর্ণপদক ও কিছু অর্থালঙ্কার এবং শ্রীমনোজ বসু তাঁহার "চীন দেখে এলাম" গ্রন্থের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নরসিংহদাস পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত এক হাজার টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দিয়া দেশরক্ষায় সাহায্য এবং সাহিত্যিক সমাজের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। সাহিত্যিকেরা ইঁহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইবেন এই ভরসায় সংবাদটুকু পুনঃসম্প্রচার করিলাম।

অজ্ঞাত ব্যক্তির পত্র

চীনা আক্রমণ সম্পর্কে নানা ধরনের আদেশ-উপদেশ-নির্দেশমূলক পত্র আমরা নিত্যই পাইতেছি। ২৩শে নভেম্বরের প্রাতঃকালীন ডাকবিলিতে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির একখানি পত্র পাইলাম। ভাষা এবং ভা দিয়া ইহাতে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া য পত্রটিতে প্রেরকের কোন নাম নাই। কিন্তু পরিচিত এবং লেখক আমাদের অত্যন্ত দেখেন বলিয়া বোধ হইল। নানা দিক করিয়া এই পত্রটিকে পত্রস্থ করা আমরা করিতেছি। পত্রটি পড়িয়া যাঁর যা ইচ্ছা অনুম লইবেন। আমরা পত্রটি হুবহু নীচে উদ্ধৃত করি

কল্যাণীয়েষু,

কিছুদিন আগে একটা বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দে কিম্ভূতকিমাকার একটা ক্ষুধার্ত দানব যেন অভিশাপের মত আমাদের দিকে তাড়া করে তার ভয়ে যে যেদিকে পারে দৌড়চ্ছে, সামনে পথ রোধ করে দাঁড়ায় সে সাহস কারও অতি বড় আসন্ন ধ্বংসের দিকে চেয়ে থাকে স্বপ্নের মধ্যে আমার মনে হল, দানবটা যেন পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ করে দে সংকটের সময় পৃথিবীর অরণ্য-পর্বত-প্রান্তর এব পাতা হি-হি করছে, জলের উপরিভাগ শিউরে শিউ কাকগুলো অশান্তভাবে উড়ে উড়ে কা-কা করে এই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে সহসা জেগে উ বাকি রাতটুকু আর ঘুমুতে পারি নি। বাইরে তাকিয়ে দেখি ঘরবাড়ি গাছপালা—সমস্ত প্র হয়ে কী যেন শুনছে, আকাশ একটা বিশ্বব্যা বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। দূর আকা ভাল করে চাইতেই মনে হল যেন একটা অনি চোখ ছলছল করে আমার দিকে চেয়ে আছে। প্রকৃতি আর নিস্পন্দ নিথর রাত্রির দিকে চেয়ে থাকতে একটা অনির্বচনীয় পুলকে আমার সমস্ত উঠল। বিরহমিলন হাসিকান্নার উজ্জ্বল পৃথিবী অন্ধকারে চুপি চুপি ধরা দিলে আমার কাছে— গাঢ়তম আকুলতায়। আমার সর্বাঙ্গ এবং সম উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র পৃথিবীর কী একটা বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করলেম।

সে রাত্রিটা যে মোহজাল বিস্তার করে স্বপ্নজাগরণের মধ্যে আমার চোখের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল মাত্র কদিনের মধ্যেই তার রূপ গেল পালটে। পৃথিবীটা যে ঈশ্বরের একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ, তীব্র বেদনার সঙ্গে এই সত্যটা আমাকে উপলব্ধি করতে হল। তখন মনে হল এখানে মানুষের মত বেঁচে এবং মানুষের মত মরে গেলেই যথেষ্ট, তার বেশী কিছু চাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সুখ-দুঃখের জোয়ারভাটা খেলিয়ে জীবনটা আমার নদীর বাঁকের মত নানা দিকে মোড় নিয়েছে, সরকারী কাটা খালের মত নিয়ন্ত্রণের বন্ধন মেনে চলে নি কখনও। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কত কী দেখলেম। একদিকে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত যান্ত্রিক সভ্যতার রথ তার জয়ধ্বজা তুলে ঘর্ঘর রবে এগিয়ে চলেছে—কোনও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেও তার চলার শেষ নেই। আবার অন্যদিকে নদীর তীর, গাছের ছায়া, আমের বোল, কোকিলের কুহুতান, প্রভাতসূর্যের নবীন আলো, স্রোতস্বিনীর তরল কলস্বর, তরুর মর্মর, দূরাগত মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি আমাদের মনটাকে উদাসীন বাউলের মত শিশুসুলভ মহিমায় মণ্ডিত করে রেখেছে। আমাদের জীবনে দুয়েরই প্রয়োজন আছে। আজকের পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে কোনটাকেই নৈবচ বলা চলে না। কিন্তু যে সভ্যতার অগ্রগতি পররাজ্য-আক্রমণের নির্লজ্জ লোলুপতায় তার সীমানা হারিয়ে ফেলে বস্তুতঃ তাকে শুধু ধিক্কার কেন, বজ্রকঠিন পৌরুষের সঙ্গে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাকে রোধ করতেই হবে।

আজ ভারতের সীমান্তে অনধিকার প্রবেশ যারা করেছে তারা কোনদিন ভারতবর্ষের মিত্র ছিল না। সহস্র সহস্র বছরের ইতিহাসে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এক-আধজন ফা-হিয়েন বা হিউয়েন চাংকে দিয়ে প্রীতির পরিমাপ করার চেষ্টাটা নিতান্ত ভণ্ডামি মাত্র হবে আজ তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। ভারতবর্ষের সীমান্ত বিপন্ন হয়েছে, একটা বিপুল পরিমাণ ভূখণ্ড তার হাত থেকে শত্রুর কবলিত হয়েছে, তার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঘোরতর দুর্দিন এসেছে, এর ছাপিয়েও আজ তাঁদের কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছে যাঁরা দেশরক্ষার কঠিন শপথ নিয়ে দুর্ভেদ্য শীতের মধ্যে সীমান্তের রণাঙ্গনে মৃত্যুপণ লড়াই করে চলেছেন দেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। ভারতবর্ষের সেই বীর সন্তানদের অপরিসীম কষ্টের কথা ভেবে দুফোঁটা চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কী মূল্য আমরা দিতে পারছি! ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা কি চিরদিন শুধু ইষ্টনাম স্মরণ করেই যাব, তরবারির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করতে কোনদিন শিখব না! এই তো সময় এসেছে, অকর্মণ্যতার খোলস ছেড়ে আসল সত্তার বাইরে আসার প্রকৃত সময়। কথা নয়, কাজের দিন এখন। পণ্ডিতের বাগবাহুল্যে শুধু ধুলো উড়ে আমাদের দৃষ্টিকে সহজেই আচ্ছন্ন করে। সেই রন্ধ্রপথে এসে শত্রুসৈন্য আমাদের মাটিতে কায়েম হয়ে বসবে—এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কী হতে পারে!

জীবনটা মন্দাক্রান্তা তালে ঠিক এগিয়ে চলছিল। শান্তিময় সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত এবং শত সহস্র নক্ষত্রখচিত রাত্রি—এরই উদয়বিলয়ে একটি একটি করে প্রত্যহের মালা গেঁথে চলেছিলেম। ক্লান্তিকর একঘেয়ে জীবনধারার মধ্যে প্রাণটা যখন হাঁফিয়ে ওঠে তখন মাঝে মাঝে মনে পড়ে বিরলবসতি বিজন বাংলাদেশের গ্রামের কথা। সেই শান্তিময় পরিবেশ, সেই অনন্ত নৈঃশব্দ্য, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, জলে একটিও নৌকো নেই—জ্যোৎস্না জলের উপর ঝিকমিক করছে, পরিষ্কার রাত্রি, নির্জন তীর, বহু দূরে ঘনবৃক্ষবেষ্টিত গ্রামটি সুষুপ্ত, কেবল ঝিঁঝি ডাকছে, আর কোন শব্দ নেই।

কদিন পরেই বসন্তকাল আসছে। দক্ষিণের হাওয়া বইতে শুরু করবে এবার। এ সময়টা একটু-আধটু গানবাজনার সময়—এ সময়টা যদি কেবলই রুশ, চীন, পাঠানের অরাজকত্ব, মগের মুল্লুক এবং পৃথিবীর যত শয়তানের প্রতি নজর রাখতে হয়, তাহলে তো আর বাঁচি নে। জীবনে তো বসন্তকাল বেশি আসে না। ইতি ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

is to liberate spirit of man through the excellence of creation."

অতঃপর ওই সম্মেলনেই তিনি বলিয়াছিলেন :

"We shall resist enmity with our life, but even in a moment of greatest danger we shall be nobody's enemy. While we consider the Indian soil holy and her honour sacred and pledge everything to defend them, we shall cherish no ambition of conquest over other lands ; we shall not tolerate aggression against our country and shall never offend against the honour of another country.

But let us not deceive ourselves by a complacent acceptance of disguised enmity as friendship, for that will be treachery, the worst crime against human values."

—ইহা খাঁটি ভারতীয় আদর্শের কথা।

এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের দুইজন সাহিত্যিকের জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দানের কথা স্মরণ করিতেছি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জগত্তারিণী ও শরৎ পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত দুইটি স্বর্ণপদক ও কিছু স্বর্ণালঙ্কার এবং শ্রীমনোজ বসু তাঁহার "চীন দেখে এলাম" গ্রন্থের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নরসিংহদাস পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত এক হাজার টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দিয়া দেশরক্ষায় সাহায্য এবং সাহিত্যিক সমাজের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন। সাহিত্যিকেরা ইঁহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইবেন এই ভরসায় সংবাদটুকু পুনঃসম্প্রচার করিলাম।

অজ্ঞাত ব্যক্তির পত্র

চীনা আক্রমণ সম্পর্কে নানা ধরনের আদেশ-উপদেশ-নির্দেশমূলক পত্র আমরা নিত্যই পাইতেছি। ২৩শে নভেম্বরের প্রাতঃকালীন ডাকবিলিতে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির একখানি পত্র পাইলাম। ভাষা এবং ভাব দুই দিয়া ইহাতে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতে পত্রটিতে প্রেরকের কোন নাম নাই। কিন্তু চিঠি পরিচিত এবং লেখক আমাদের অত্যন্ত স্নেহের দেখেন বলিয়া বোধ হইল। নানা দিক বিবে করিয়া এই পত্রটিকে পত্রস্থ করা আমরা সমীচীন করিতেছি। পত্রটি পড়িয়া যাঁর যা ইচ্ছা অনুমান করি লইবেন। আমরা পত্রটি হুবহু নীচে উদ্ধৃত করিলাম :

কল্যাণীয়েষু,

কিছুদিন আগে একটা বড্ড অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলে কিম্ভূতকিমাকার একটা ক্ষুধার্ত দানব যেন মূর্তি অভিশাপের মত আমাদের দিকে তাড়া করে আসছে তার ভয়ে যে যেদিকে পারে দৌড়চ্ছে, সামনে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ায় সে সাহস কারও হচ্ছে না অতি বড় আসন্ন ধ্বংসের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্বপ্নের মধ্যে আমার মনে হল, দানবটা যেন এবার পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ করে দেবে—সেই সংকটের সময় পৃথিবীর অরণ্য-পর্বত-প্রান্তর এবং গাছে পাতা হি-হি করছে, জলের উপরিভাগ শিউরে শিউরে উঠছে কাকগুলো অশান্তভাবে উড়ে উড়ে কা-কা করে ডাকছে এই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে সহসা জেগে উঠে সেদিন বাকি রাতটুকু আর ঘুমুতে পারি নি। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘরবাড়ি গাছপালা—সমস্ত প্রকৃতি উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনছে, আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রু বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। দূর আকাশের দিকে ভাল করে চাইতেই মনে হল যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ ছলছল করে আমার দিকে চেয়ে আছে। এই নীরব প্রকৃতি আর নিস্পন্দ নিথর রাত্রির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা অনির্বচনীয় পুলকে আমার সমস্ত মন ভরে উঠল। বিরহমিলন হাসিকান্নার উজ্জ্বল পৃথিবী রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি ধরা দিলে আমার কাছে—নব রূপে, গাঢ়তম আকুলতায়। আমার সর্বাঙ্গ এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র পৃথিবীর কী একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করলেম।

সে রাত্রিটা যে মোহজাল বিস্তার করে স্বপ্নজাগরণের মধ্যে আমার চোখের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল মাত্র কদিনের মধ্যেই তার রূপ গেল পালটে। পৃথিবীটা যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ, গভীর বেদনার সঙ্গে এই সত্যটা আমাকে উপলব্ধি করতে হল। তখন মনে হল এখানে মানুষের মত বেঁচে এবং মানুষের মত মরে গেলেই যথেষ্ট, তার বেশী কিছু চাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সুখ-দুঃখের জোয়ারভাটা খেলিয়ে জীবনটা আমার নদীর বাঁকের মত নানা দিকে মোড় নিয়েছে, সরকারী কাটা খালের মত নিয়ন্ত্রণের বন্ধন মেনে চলে নি কখনও। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কত কী দেখলেম। একদিকে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত যান্ত্রিক সভ্যতার রথ তার জয়ধ্বজা তুলে ঘর্ঘর রবে এগিয়ে চলেছে—কোনও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেও তার চলার শেষ নেই। আবার অন্যদিকে নদীর তীর, গাছের ছায়া, আমের বোল, কোকিলের কুহুতান, প্রভাতসূর্যের নবীন আলো, স্রোতস্বিনীর তরঙ্গ কলস্বর, তরুর মর্মর, দূরাগত মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি আমাদের মনটাকে উদাসীন বাউলের মত শিশুসুলভ মহিমায় মণ্ডিত করে রেখেছে। আমাদের জীবনে দুয়েরই প্রয়োজন আছে। আজকের পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে কোনটাকেই নৈবচ বলা চলে না। কিন্তু যে সভ্যতার অগ্রগতি পররাজ্য-আক্রমণের নির্লজ্জ লোলুপতায় তার সীমানা হারিয়ে ফেলে বস্তুতঃ তাকে শুধু ধিক্কার কেন, বজ্রকঠিন পৌরুষের সঙ্গে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাকে রোধ করতেই হবে।

আজ ভারতের সীমান্তে অনধিকার প্রবেশ যারা করেছে তারা কোনদিন ভারতবর্ষের মিত্র ছিল না। সহস্র সহস্র বছরের ইতিহাসে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এক-আধজন ফা-হিয়েন বা হিউয়েন চাংকে দিয়ে প্রীতির পরিমাপ করার চেষ্টাটা নিতান্ত ভণ্ডামি মাত্র হবে আজ তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। ভারতবর্ষের সীমান্ত বিপন্ন হয়েছে, একটা বিপুল পরিমাণ ভূখণ্ড তার হাত থেকে শত্রুর কবলিত হয়েছে, তার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঘোরতর দুর্দিন এসেছে, এসব ছাপিয়েও আজ তাঁদের কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছে যাঁরা দেশরক্ষার কঠিন শপথ নিয়ে দুর্ভেদ্য শীতের মধ্যে সীমান্তের রণাঙ্গনে মৃত্যুপণ লড়াই করে চলেছেন দেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। ভারতবর্ষের সেই বীর সন্তানদের অপরিসীম কষ্টের কথা ভেবে দুফোঁটা চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কী মূল্য আমরা দিতে পারছি! ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা কি চিরদিন শুধু ইষ্টনাম স্মরণ করেই যাব, তরবারির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করতে কোনদিন শিখব না! এই তো সময় এসেছে, অকর্মণ্যতার খোলস ছেড়ে আসল সত্তার বাইরে আসার প্রকৃত সময়। কথা নয়, কাজের দিন এখন। পণ্ডিতের বাগবাহুল্যে শুধু ধুলো উড়ে আমাদের দৃষ্টিকে সহজেই আচ্ছন্ন করে। সেই রন্ধ্রপথে এসে শত্রুসৈন্য আমাদের মাটিতে কায়েম হয়ে বসবে—এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কী হতে পারে!

জীবনটা মন্দাক্রান্তা তালে ঠিক এগিয়ে চলছিল। শান্তিময় সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত এবং শত সহস্র নক্ষত্র-খচিত রাত্রি—এরই উদয়বিলয়ে একটি একটি করে প্রত্যহের মালা গেঁথে চলেছিলেম। ক্লান্তিকর একঘেয়ে জীবনধারার মধ্যে প্রাণটা যখন হাঁফিয়ে ওঠে তখন মাঝে মাঝে মনে পড়ে বিরলবসতি বিজন বাংলাদেশের গ্রামের কথা। সেই শান্তিময় পরিবেশ, সেই অনন্ত নৈঃশব্দ্য, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, জলে একটিও নৌকো নেই—জ্যোৎস্না জলের উপর ঝিকমিক করছে, পরিষ্কার রাত্রি, নির্জন তীর, বহু দূরে ঘনবৃক্ষবেষ্টিত গ্রামটি সুষুপ্ত, কেবল ঝিঁঝি ডাকছে, আর কোন শব্দ নেই।

কদিন পরেই বসন্তকাল আসছে। দক্ষিণের হাওয়া বইতে শুরু করবে এবার। এ সময়টা একটু-আধটু গানবাজনার সময়—এ সময়টা যদি কেবলই রুশ, চীন, পাঠানের অরাজকত্ব, মগের মুল্লুক এবং পৃথিবীর যত শয়তানের প্রতি নজর রাখতে হয়, তাহলে তো আর বাঁচি নে। জীবনে তো বসন্তকাল বেশি আসে না। ইতি ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

একটি বর্ষ অতিক্রম করা যে কতখানি সাফল্যের ও আনন্দের হইতে পারে তাহা মাসিক শনিবারের চিঠির ১ম বর্ষ (ভাদ্র ১৩৩৪ হইতে শ্রাবণ ১৩৩৫) পূর্ণ হওয়ায় ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৩৫) সজনীকান্ত দাস রচিত "শনিবারের চিঠি Centenary" কবিতাটিতে রূপ পাইয়াছে। সজনীকান্তের মতে "ইহাতে সেদিনকার সাহিত্য-পরিবেশের এবং আমাদের ভবিষ্যতের একটা ছবি ছিল, যাহা চিত্তাকর্ষক ও স্মরণীয়।" সেদিনকার দুই বছরের সামান্য মূলধন আজ পঁচিশ বৎসরের বিপুলতায় পৌঁছিয়াছে। আজ চৌত্রিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে পুনরায় উক্ত কবিতাটিকেই আমাদের হর্ষপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হিসাবে প্রকাশ করিলাম। কবিতাটি এই সংখ্যার উনসত্তর হইতে বাহাত্তর পৃষ্ঠায় পুরাতন শনিবারের চিঠি হইতে ব্লক মুদ্রিত করা হইয়াছে। কাল এবং পাত্রের কিছু সময়জনিত গরমিল থাকিলেও আমাদের বর্তমান ভাব ও ভাবনা কবিতাটির সহিত সম্পূর্ণ একাত্মক।

শনিবারের চিঠি নববর্ষের যাত্রা শুরু করিয়াছে দেশের ঘোরতর সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে। যুদ্ধজনিত বর্তমান অবস্থায় যথানিয়মে পত্রিকা প্রকাশ করা রীতিমত কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের দামামা না বাজিতেই বাজারে কাগজ দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা এইভাবে বিপর্যয়ের দিকে চলিতে থাকিলে কাগজে কলমে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং গ্রাহকদের নিকট মুখ দেখাইব কী প্রকারে ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি।

নূতন বৎসরে যে সকল অগ্রিম গ্রাহক ও ক্রেতা পাঠক আমাদের প্রতি এবং সাহিত্যের প্রতি প্রীতিবশতঃ শনিবারের চিঠির সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিতেছেন এবং বিশেষ করিয়া নবাগত যাঁহারা সম্পর্কযুক্ত হইতে আসিলেন তাঁহাদের সকলকেই আমাদের সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাইতেছি। মুষ্টিমেয় যে কয়জন বিবিধ কারণে সম্পর্কটুকু রাখিতে পারিলেন না আশা করিতেছি তাঁহাদের প্রতিকূলতা দূর হইলে পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত হইবেন। সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতা অনুগ্রাহকবর্গকেও আমাদের নমস্কার জ্ঞাপন করিতেছি।

শনিবারের চিঠির লেখকগোষ্ঠীতে বাংলা দেশের হাল আমলের নামী এবং জনপ্রিয় কিছু লেখককে না পাইয়া কেহ কেহ ইহার কারণ জানিতে চাহিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমরা এই নিবেদন করিব, যে কয়জন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সাহিত্যিক ইহার সহিত বর্তমানে যুক্ত আছেন বাংলা সাহিত্যের আকাশে স্থায়ী জ্যোতিষ্করূপে তাঁহারা স্বীকৃত হইয়াছেন। শনিবারের চিঠিতে প্রবীণ অথবা নবীন কবি কথাসাহিত্যিক প্রবন্ধকার যাঁহারই রচনা প্রকাশিত হউক না কেন চিন্তাশীল বলিয়া তাঁহারা সমাদৃত হইয়া থাকেন। অতি নোংরা ক্লেদাক্ত মাসী-পিসীমাকা নিছক ছেলেভুলানো এবং টাকের উপর টেকো গোছের গল্প-কাহিনী লিখিয়া অথবা ভাষা ও প্লটের নানা কায়দা-কসরত দেখাইয়া যাঁহারা তথাকথিত 'পপুলার' হইয়াছেন তাঁহাদের রচনায় শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠা কদাচ কলঙ্কিত হইতে পারে না। প্রতিভাবানের কদর করায় এবং গুণীর নিকট আদৃত হওয়াতেই শনিবারের চিঠির প্রকৃত সার্থকতা। নববর্ষের যাত্রারম্ভে আমাদের সকল লেখককেই সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিতেছি।

—

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮০৮

শনিবারের
চিঠি
৩৫শ বর্ষ
২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

সম্পাদক :
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

চীন ও ভারত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। অবৈরিতার দ্বারা বৈরিতাকে জয় করা যায় নি। অহিংসার দ্বারা হিংসার উদ্যত ফণা শান্ত হয় নি। তার বিষদন্তের গোড়ায় সঞ্চিত হলাহল প্রেম ও প্রীতির দুগ্ধপানে অমৃতে পরিণত হয় নি। বৈরিতা হিংসা নূতন চীনের জন্মগত ধাতু। অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আছে, চীন একদা ভারতবর্ষ থেকে বুদ্ধের বাণী ও ধর্মকে বহন করে নিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছিল, সে বাণী সে ধর্ম নূতন চীন তার অভ্যুদয়ের রক্তস্রোত দিয়ে মুছে ফেলেছে। তার সাক্ষী ইতিহাস। ইতিহাস বুঝি অমোঘ। বিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্রের বিশ্বধর্ম চীনে সৃষ্টি করেছে হিংস্র পররাজ্যলোলুপ সমাজতান্ত্রিক চীন—আর ভারতবর্ষে সৃষ্টি করেছে গণতান্ত্রিক নব মহাভারত। সমাজতান্ত্রিক নবীন চীনের জন্মদিনে জন্মলগ্নে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তাকে অভিনন্দিত করে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে বলেছিলেন, জয়তু মহাচীন। ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি নরনারীর শুভেচ্ছা এবং প্রীতি গ্রহণ করো। সেদিন চীন পৃথিবীতে কয়েকটি স্বধর্মাবলম্বী সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া অপর কোন দেশের সমর্থন পায় নি। স্বীকৃতি পায় নি। মহাচীনের সমরধর্মী নায়ক সে সম্প্রসারিত হস্ত বিপন্ন জলমগ্ন ব্যক্তির মত সাগ্রহে ধরে বলেছিল—আমরা তোমাদের ভাই। চীন এবং ভারতের বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্ব কোনদিন ছিন্ন হবে না। চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ—বিশ্বভ্রাতৃত্বই নাকি তার আদর্শ।

আমরা বিশ্বাস করেছিলাম। আমরা সকলকেই বিশ্বাস এবং ভ্রাতৃপ্রেমের আগ্রহে গ্রহণ করতে চেয়েছি। আমরা কারুর বৈরী নই—আমাদের কেউ বৈরী নয়। নব-মহাভারতের মহান আদর্শকে সফল করতে অস্ত্র নির্মাণ করি নি, সমর-বিভাগকে প্রাধান্য দিই নি। নির্মাণ করেছি ভূমিকর্ষণের যন্ত্র—উৎপাদন করতে চেয়েছি অন্ন। তার সঙ্গে বস্ত্র। শিক্ষায় স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছি মানুষের জীবন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক চীন—সমাজতন্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা করলে তার ধাতু অনুযায়ী। অস্ত্র চাই তার—সম্প্রসারিত করবে সে তার আদর্শকে। তার আদর্শকে যে বিশ্বাস করে না সে তার মিত্র কি করে হয়?

কোরিয়াতে সে নিজের আদর্শ প্রচারের ছলে প্রবেশ করলে। অর্ধেক কোরিয়াকে করলে গ্রাস। আসলে চেঙ্গিজখানের চীনসত্তা তার সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতা, রাজ্যলোলুপতাই নবীন চীনের সমাজতন্ত্রের মুখোশ পরে হয়েছে অভ্যুদিত। সে মুখোশটা গেল খসে। কুয়েময়ে সে দিলে হানা। ফরমোজা তার চাই। কিন্তু সেখানে আমেরিকার প্রবল শক্তির সম্মুখে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হল। রাজ্যতৃষ্ণায়, রক্ততৃষ্ণায়, তার উদ্যত ছুরিকা সহজ শিকার ভেবে ঘোরালে দক্ষিণ দিকে। নিশ্চিন্ত ভারতবর্ষের পিঠে বসিয়ে দিলে তার ছুরি।

কুয়েময়ে ব্যর্থ চীন—নিশ্চিন্ত বন্ধু ভাই বলে অভিহিত ভারতবর্ষের হিমালয় সীমান্ত আক্রমণ করে বসল। হিমালয়ের পশ্চিমপ্রান্তে লাডাক অঞ্চল থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নেফা পর্যন্ত সুদীর্ঘ সীমান্তের দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ এলাকা। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হিমাচল, মহাপ্রস্থানের পথরেখা অঙ্কিত, কৈলাস পর্বত, মানস-সরোবর চিহ্নিত যে দেবতাত্মা হিমাচল ভূমি

একটি বর্ষ অতিক্রম করা যে কতখানি সাফল্যের ও আনন্দের হইতে পারে তাহা মাসিক শনিবারের চিঠির ১ম বর্ষ (ভাদ্র ১৩৩৪ হইতে শ্রাবণ ১৩৩৫) পূর্ণ হওয়ায় ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৩৫) সজনীকান্ত দাস রচিত "শনিবারের চিঠি Centenary" কবিতাটিতে রূপ পাইয়াছে। সজনীকান্তের মতে "ইহাতে সেদিনকার সাহিত্য-পরিবেশের এবং আমাদের ভবিষ্যতের একটা ছবি ছিল, যাহা চিত্তাকর্ষক ও স্মরণীয়।" সেদিনকার দুই বছরের সামান্য মূলধন আজ পঁয়ত্রিশ বৎসরের বিপুলতায় পৌঁছিয়াছে। আজ চৌত্রিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে পুনরায় উক্ত কবিতাটিরেই আমাদের হর্ষপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হিসাবে প্রকাশ করিলাম। কবিতাটি এই সংখ্যার উনসত্তর হইতে বাহাত্তর পৃষ্ঠায় পুরাতন শনিবারের চিঠি হইতে হুবহু মুদ্রিত করা হইয়াছে। কাল এবং পাত্রের কিছু সময়জনিত গরমিল থাকিলেও আমাদের বর্তমান ভাব ও ভাবনা কবিতাটির সহিত সম্পূর্ণ একাত্মক।

শনিবারের চিঠি নববর্ষের যাত্রা শুরু করিয়াছে দেশের ঘোরতর সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে। যুদ্ধজনিত বর্তমান অবস্থায় যথানিয়মে পত্রিকা প্রকাশ করা রীতিমত কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের দামামা না বাজিতেই বাজারে কাগজ দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা এইভাবে বিপর্যয়ের দিকে চলিতে থাকিলে কাগজে কলমে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং গ্রাহকদের নিকট মুখ দেখাইব কী প্রকারে ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি।

নূতন বৎসরে যে সকল অগ্রিম গ্রাহক ও ক্রেতা পাঠক আমাদের প্রতি এবং সাহিত্যের প্রতি প্রীতিবশতঃ শনিবারের চিঠির সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিতেছেন এ বিশেষ করিয়া নবাগত যাঁহারা সম্পর্কযুক্ত হইতে আসিলে তাঁহাদের সকলকেই আমাদের সকৃতজ্ঞ নমস্ক জানাইতেছি। মুষ্টিমেয় যে কয়জন বিবিধ কার সম্পর্কটুকু রাখিতে পারিলেন না আশা করিতে তাঁহাদের প্রতিকূলতা দূর হইলে পুনরায় গোষ্ঠীভু হইবেন। সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতা অনুগ্রাহকবর্গকে আমাদের নমস্কার জ্ঞাপন করিতেছি।

শনিবারের চিঠির লেখকগোষ্ঠীতে বাংলা দেশে হাল আমলের নামী এবং জনপ্রিয় কিছু লেখককে ন পাইয়া কেহ কেহ ইহার কারণ জানিতে চাহিয়াছেন ইহার উত্তরে আমরা এই নিবেদন করিব, যে কজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সাহিত্যিক ইহার সহিত বর্তমানে যুক্ত আছেন বাংলা সাহিত্যের আকাশে স্থায়ী জ্যোতিষ্করূপে তাঁহারা স্বীকৃত হইয়াছেন। শনিবারের চিঠিতে প্রবীণ অথবা নবীন কবি কথাসাহিত্যিক প্রবন্ধকার যাঁহারই রচনা প্রকাশিত হউক না কেন চিন্তাশীল বলিয়া তাঁহারা সমাদৃত হইয়া থাকেন। অতি নোংরা ক্লেদাক্ত মাসী পিসীমাকা নিছক ছেলেভুলানো এবং টাকের উপর টেক গোছের গল্প-কাহিনী লিখিয়া অথবা ভাষা ও প্রটের নানা কায়দা-কসরত দেখাইয়া যাঁহারা তথাকথিত 'পপুলার' হইয়াছেন তাঁহাদের রচনায় শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠা কদাচ কলঙ্কিত হইতে পারে না। প্রতিভাবানের কদর করায় এবং গুণীর নিকট আদৃত হওয়াতেই শনিবারের চিঠির প্রকৃত সার্থকতা। নববর্ষের যাত্রারম্ভে আমাদের সকল লেখককেই সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিতেছি।

—

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৫-২৮৩৩

শনিবারের চিঠি
৩৫শ বর্ষ
২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

সম্পাদক:
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

চীন ও ভারত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। অবৈরিতার দ্বারা বৈরিতাকে জয় করা যায় নি। অহিংসার দ্বারা হিংসার উদ্যত ফণা শান্ত হয় নি। তার বিষদন্তের গোড়ায় সঞ্চিত হলাহল প্রেম ও প্রীতির দুগ্ধপানে অমৃতে পরিণত হয় নি। বৈরিতা হিংসা নূতন চীনের জন্মগত ধাতু। অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আছে, চীন একদা ভারতবর্ষ থেকে বুদ্ধের বাণী ও ধর্মকে বহন করে নিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছিল, সে বাণী সে ধর্ম নূতন চীন তার অভ্যুদয়ের রক্তস্রোত দিয়ে মুছে ফেলেছে। তার সাক্ষী ইতিহাস। ইতিহাস বুঝি অমোঘ। বিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্রের বিশ্বধর্ম চীনে সৃষ্টি করেছে হিংস্র পররাজ্যলোলুপ সমাজতান্ত্রিক চীন—আর ভারতবর্ষে সৃষ্টি করেছে গণতান্ত্রিক নব মহাভারত। সমাজতান্ত্রিক নবীন চীনের জন্মদিনে জন্মলগ্নে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তাকে অভিনন্দিত করে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে বলেছিলেন, জয়তু মহাচীন। ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি নরনারীর শুভেচ্ছা এবং প্রীতি গ্রহণ করো। সেদিন চীন পৃথিবীতে কয়েকটি স্বধর্মাবলম্বী সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া অপর কোন দেশের সমর্থন পায় নি। স্বীকৃতি পায় নি। মহাচীনের সমরধর্মী নায়ক সে সম্প্রসারিত হস্ত বিপন্ন জলমগ্ন ব্যক্তির মত সাগ্রহে ধরে বলেছিল—আমরা তোমাদের ভাই। চীন এবং ভারতের বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্ব কোনদিন ছিন্ন হবে না। চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ—বিশ্বভ্রাতৃত্বই নাকি তার আদর্শ।

আমরা বিশ্বাস করেছিলাম। আমরা সকলকেই বিশ্বাস এবং ভ্রাতৃপ্রেমের আগ্রহে গ্রহণ করতে চেয়েছি। আমরা কারুর বৈরী নই—আমাদের কেউ বৈরী নয়। নব-মহাভারতের মহান আদর্শকে সফল করতে অস্ত্র নির্মাণ করি নি, সমর-বিভাগকে প্রাধান্য দিই নি। নির্মাণ করেছি ভূমিকর্ষণের যন্ত্র—উৎপাদন করতে চেয়েছি অন্ন। তার সঙ্গে বস্ত্র। শিক্ষায় স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছি মানুষের জীবন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক চীন—সমাজতন্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা করলে তার ধাতু অনুযায়ী। অস্ত্র চাই তার—সম্প্রসারিত করবে সে তার আদর্শকে। তার আদর্শকে যে বিশ্বাস করে না সে তার মিত্র কি করে হয়?

কোরিয়াতে সে নিজের আদর্শ প্রচারের ছলে প্রবেশ করলে। অর্ধেক কোরিয়াকে করলে গ্রাস। আসলে চেঙ্গিজখানের চীনসত্তা তার সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতা, রাজ্যলোলুপতাই নবীন চীনের সমাজতন্ত্রের মুখোশ পরে হয়েছে অভ্যুদিত। সে মুখোশটা গেল খসে। কুয়েময়ে সে দিলে হানা। ফরমোজা তার চাই। কিন্তু সেখানে আমেরিকার প্রবল শক্তির সম্মুখে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হল। রাজ্যতৃষ্ণায়, রক্ততৃষ্ণায়, তার উদ্যত ছুরিকা সহজ শিকার ভেবে ঘোরালে দক্ষিণ দিকে। নিশ্চিন্ত ভারতবর্ষের পিঠে বসিয়ে দিলে তার ছুরি।

কুয়েময়ে ব্যর্থ চীন—নিশ্চিন্ত বন্ধু ভাই বলে অভিহিত ভারতবর্ষের হিমালয় সীমান্ত আক্রমণ করে বসল। হিমালয়ের পশ্চিমপ্রান্তে লাডাক অঞ্চল থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নেফা পর্যন্ত সুদীর্ঘ সীমান্তের দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ এলাকা। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হিমাচল, মহাপ্রস্থানের পথরেখা অঙ্কিত, কৈলাস পর্বত, মানস-সরোবর চিহ্নিত যে দেবতাত্মা হিমাচল ভূমি

রাজ্যের অংশমাত্র নয়, যে ভূমি ভারতবর্ষের পরমতীর্থ। ভারততীর্থের অঙ্গনের একাংশে চীন আজ নাস্তিক্যবাদ প্রচারে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে এসে অতর্কিতে প্রবেশ করে আক্রমণ করেছে। আমি মনশ্চক্ষে দেখছি—সমতল ভারতে, মন্দির-শীর্ষে শীর্ষে যেন কিসের কালো ছায়া পড়েছে। এ বিশ্বাসঘাতকতা আমরা প্রত্যাশা করি নি। চীনের ইতিহাস জেনে মনে রেখেও বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে মানুষের মনের বদল হয়—মানুষের ধাতু-প্রকৃতি অগ্নিদহনে পরিশুদ্ধ হওয়াই প্রকৃতিধর্ম।

এ বিশ্বাস আমাদের ভ্রান্ত নয়। এ মহাসত্য। মানুষকে পরিশুদ্ধ হতেই হবে। কিন্তু চীনের পক্ষে তা এখনও সত্য হয় নি, সম্ভবপর হয় নি। সে সম্ভবপর করতে হবে ভারতবর্ষকে তার এই বিশ্বাসঘাতকতাকে ব্যর্থ করে তার অতর্কিত আঘাতকে ফিরিয়ে দিয়ে তার অস্ত্র হস্তচ্যুত করে। তার লোলুপ আসুরিক শক্তিকে দিব্য-শক্তির পদানত করে। তাতেই হবে চীনের অশুভ বুদ্ধির শাপমোচন। চীনদেশের সীমান্তরেখা অতিক্রম করে ভারতবর্ষ একপাদপরিমিত ভূমিতেও পদক্ষেপ করে অগ্রসর হবে না। কিন্তু তার সীমান্ত পবিত্র দেবভূমির মধ্যে একপাদপরিমিত ভূমিতেও একটি মাত্র চৈনিকের বলদৃপ্ত অবস্থান ভারতশক্তি সহ্য করবে না। তার অঙ্গ শপথ : কোন ছলনায় আমরা আর প্রতারিত হব না, কোন মিথ্যাকে আর সত্য বলে বিশ্বাস করব না। কোন অন্যায়কে ভিতরে বাহিরে আমরা সহ্য করব না, কোন ন্যায়কে কণামাত্র পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। কোন ত্যাগেই আমরা কুণ্ঠিত হব না। কোন লোভকেই আমরা প্রশ্রয় দেব না। শক্তির দৃপ্ততায় উন্মত্ততাকে আশ্রয় করব না, কোন ভয়েই আমরা বিমূঢ় হব না। সকল ভীরুতা হোক নিঃশেষে দূরীভূত, সকল জড়তা হোক অপসারিত। এই সংকল্পে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ। পৃথিবীতে মানুষের মধ্য দিয়ে দিব্যশক্তির জাগরণের এইতো লক্ষণ। সে শক্তির জাগরণ দেখতে পাচ্ছি—এক বিরাট ঐক্যের মধ্যে চল্লিশ কোটি নর-নারীর আত্মত্যাগের আগ্রহের মধ্যে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু বলেছেন, এই সংকটের মধ্যে তিনি বিচিত্র দৃশ্য দেখেছেন; জননী ভারতমাতার মুখ-মণ্ডলের উপর থেকে বর্তমান আবরণ উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে; এক নূতন রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন মা আমাদের। সে নূতন রূপ যার দৃষ্টি আছে সেই-ই দেখছে। তিনি একলা দেখছেন না। সে রূপ আমিও দেখছি। যুগে যুগে কালে কালে এমনই রূপে বারবার আমাদের মহিমান্বিতা মা প্রকটিতা হয়েছেন। ঠিক এই ভাবেই জাতীয় ঐক্যের মধ্যে জীবনভক্তির পবিত্র সংকল্পের মধ্যেই দশপ্রহরণ ধারিণী মহিমময়ী মূর্তির আবির্ভাব হয়। বিশ্বের আকাশ আলোকিত হয়। সেদিন কাশী থেকে এসেছিলেন এক অন্ধ শিখ সন্ন্যাসী। তাঁর জীবনের সম্বল একখানি মাত্র কম্বল দিতে এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রের যোদ্ধাদের জন্য। পাঞ্জাবের সাবৃত্তি দেবী এক কিশোর পুত্রকে নিয়ে এসেছেন। হাতে তাঁর টেলিগ্রাম—যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর স্বামী নিখোঁজ। এর অর্থ নিষ্ঠুর। সাবৃত্তি দেবী চোখের জল ফেলেন নি। শুষ্ক চক্ষে এ মহাযজ্ঞে পুত্রকে সমর্পণ করতে এসেছেন—পিতার শূন্য স্থান পূর্ণ করবে পুত্র। রাজপুত বৃদ্ধ এসেছেন তাঁর পৌত্রদের নিয়ে। নিজে যোদ্ধা ছিলেন, পুত্রেরাও যুদ্ধে বিগত; বীর রাজপুত নাতিদের নিয়ে এসেছেন তারা দেবে মাতৃগৌরব মহাযজ্ঞে জীবনাঞ্জলি। ধনী এসেছে ধন নিয়ে, মানী এসেছে মান নিয়ে, গুণী এসেছে গুণ নিয়ে, নারী এসেছে সেবা নিয়ে—তার আভরণ নিয়ে, যুবক-যুবতী আসছে তাদের বুকের রক্ত নিয়ে, শক্তি নিয়ে। হবে না এ মহাআবির্ভাব? আবির্ভাব হয়েছে বুকের মধ্যে আমাদের, কল্পনার মধ্যে আমরা শুনতে পাচ্ছি আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে বরাভয়। চণ্ডীতে শুনেছি দেবী বলেছিলেন :

> ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
> তদা তদা অবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং।

জয় সুনিশ্চিত। শত্রুকে ভয়ের কোন হেতু নেই, কারণ শত্রু অন্যায়ে অধিষ্ঠিত। হিংসায় পাশবিক। মিথ্যায় সে ভ্রান্ত। একমাত্র ভয় আমাদের নিজের পাপকে। লোভের এক মহাভয় আছে। আজ সকল লাভের লোভকে সংবরণ করতে হবে। ত্যাগের এই পবিত্রতম যজ্ঞের মধ্যে লাভের লোভকে সম্বরণ কর।

হিংসার পাপের এক ভয় আছে। আজ এই বিরাট ঐক্যের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষে যেন হিংসার ছুরিকায় তাকে খণ্ডিত না করি। আজ একটি মহাবোধে আমরা জাগ্রত হই—এই বিরাট জাতীয় দেহের আমরা এক একটি জীবকোষ। একে আমরা অন্য থেকে পৃথক নই। আর এক ভয়—সে এক মহাপাপকে। বিশ্বাসঘাতকতাকে। কায়ার ছায়ার মত ঐক্যের পশ্চাতে পশ্চাতে পার্শ্বে পার্শ্বে এরা ফেরে। এরা আছে। এরা অন্যায়কে ন্যায় বলে গ্রহণ করে, মিথ্যা এদের সত্য হয়, দেশ এদের বিমাতা হয়, জাতি এদের পর হয়। ধর্ম এদের সুমতি দিন। অন্যথায় তারই নির্দেশে জাতীয় বোধ এদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়ে আঘাত করুক।

বন্দেমাতরম্। জয় হিন্দ্।

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

গুরুনিন্দা

এক

রবীন্দ্রনাথের দুর্জয় সারস্বত অভিমানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন সজনীকান্ত। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাকে ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ব্যবহারও করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা তো করতে পারলেনই না, উপরন্তু গুরুনিন্দা করে কবিগুরুর ক্রোধ নিজের উপরই ডেকে আনলেন। সজনীকান্ত সরস্বতীর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু দুষ্টা সরস্বতীর প্ররোচনা যে তাঁকে বারবার পথভ্রষ্ট করেছে তার নিদর্শনও তাঁর জীবনে দুর্লভ নয়। রবীন্দ্র-বিদ্রোহী তরুণদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে শনিবারের চিঠির একেবারে দলে টানা হয়তো সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু তাঁকে শনিবারের চিঠির অনুকূলে আনা যে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, এ উপলব্ধি সজনীকান্তের হয়েও হল না। 'নির্বোধ হঠকারিতা'র ফলে তিনি কবিগুরুর উদ্দেশে আঘাত হেনে বসলেন।

তখন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন মাস। মাসিক শনিবারের চিঠির উদ্যোগপর্ব চলছে। কুরুপাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রের আয়োজন হচ্ছে পূর্ণোদ্যমে। কিন্তু সজনীকান্ত বলছেন, সেই উদ্যোগপর্বেই ভীষ্মপর্বের বিষাদযোগ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। "নিজের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিপক্ষীয় দলের সমর্থকদের ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে আমাদের একমাত্র প্রেরণা ও আদর্শ স্বয়ং জনার্দনই সাময়িকভাবে শনিবারের চিঠিকে নয়, একমাত্র আমাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন।" [আত্মস্মৃতি-১, পৃ ২৭৮]

যাকে সজনীকান্ত বলছেন 'নিজের অবিমৃষ্যকারিতা', 'নির্বোধ হঠকারিতা', সেই বস্তুটি হল 'নটরাজ' গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বিচিত্রা' মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রা'র সেই প্রথম আত্মপ্রকাশ বাংলা সাময়িক-পত্রিকার ইতিহাসে নানা দিক দিয়েই অভূতপূর্ব ঘটনা বলে বিবেচিত হবে। যতগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হয়েছিল, প্রতি মাসে গদ্যে-পদ্যে রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনা হল সেগুলির অন্যতম। 'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যার প্রথমেই কবিগুরুর 'নটরাজ' গীতিনাট্যটি সুসজ্জিত অঙ্গসজ্জায় বিভূষিত হয়ে প্রকাশিত হল। এই 'নটরাজ'কে নিয়ে সেদিন রবীন্দ্র-রসিকসমাজে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সজনীকান্তের মনে হল, "নটরাজ রবীন্দ্র-প্রতিভার আরোহণ নয়, অবতরণ।" "ভাবের দিক দিয়া তাহা পুরাতন রবীন্দ্রনাথেরই অনুকরণ, এবং অক্ষম অনুকরণ, ছন্দ ও মিল শিথিল।"

এই কথাগুলিই সজনীকান্ত একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের আকারে লিপিবদ্ধ করলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে লেখাটি উদ্দীপনার সঙ্গে পড়াও হল। রচনাগুণে লেখাটি ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সেনের ভাল লেগেছিল। তিনি 'অরসিক রায়' ছদ্মনামে ওটিকে সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন। তখন তারানাথ রায় ছিলেন 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক। সাপ্তাহিকখানির খুব প্রতিপত্তি ছিল। 'অরসিক রায়ে'র "নটরাজ" 'আত্ম-শক্তি'তে ১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাসের ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ তারিখে এবং আশ্বিনের ২৭ তারিখে পাঁচটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, প্রবন্ধটি সে-যুগে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। যথাকালে লেখা ও লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছল। সজনীকান্তের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন হয়ে উঠল বিরূপ। "নটরাজ" প্রবন্ধটিই ছিল গুরু-শিষ্যের প্রথম সংঘাতের মূলে। সুতরাং তার একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক।

দুই

প্রবন্ধের ভূমিকাতেই সজনীকান্ত তাঁর মূল বক্তব্যটি স্পষ্ট করলেন। তিনি বললেন :

"আমাদের সৌভাগ্য যে বঙ্গবাণীর দরবারে 'নটরাজই' রবীন্দ্রনাথের একমাত্র অর্ঘ্য নহে। ঋতুরঙ্গশালায়ও ইতিপূর্বে বারবার তাঁহার ডাক পড়িয়াছে; তিনি কবিতা ও গানের অপূর্ব পুষ্পসম্ভার লইয়া বহুবার তথায় উপস্থিত হইয়া অজস্র দানে রঙ্গশালা ছাইয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সমসাময়িক তাঁহারা তাঁহার পুষ্প-অর্ঘ্যের মধুগন্ধে বিহ্বল হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। সে পুষ্পমাধুর্য ও সৌরভ ম্লান হইবার নহে, অনন্ত অনাগত কালেও তাহা অমলিন অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিবে।"

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীই ছিল সজনীকান্তের আদর্শ। মুক্তকণ্ঠেই তিনি ঘোষণা করলেন, "তিনি ইতিপূর্বে যাহা দিয়াছেন তাহাকেই আদর্শ করিয়া আমি তাঁহার এই নূতন দানের বিচার করিব।" [আত্মশক্তি, ৯ই ভাদ্র, ১৩৩৪]। সজনীকান্ত আরও বললেন :

"বিশ্ববাণীর দরবারে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যত-খানি গৌরব তাহার পনেরো আনা রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই। বিচারের দ্বারা তাঁহাকে ছোট করিতে গেলেই আত্মহত্যা করা হইবে। অনেকে এইজন্য আমাদিগকে মহা অপরাধে অপরাধী করিবেন। যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে তাহা প্রকাশ করিলে যদি মহাপাতকও হয় আমরা তাহার শাস্তি মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসি বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের বিচার করিতেছি। শ্রদ্ধা ও স্নেহের বিচার সকল ক্ষেত্রেই মার্জনীয়।"

রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসেন বলেই রবীন্দ্রনাথের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন—এ উক্তি সত্ত্বেও প্রবন্ধটি রচনাকালে লেখকের মনে অন্যান্য চিন্তাও যে বিরাজমান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে যখন তিনি বলছেন :

"তিনি বিশাল মহীরুহের মত দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া পথশ্রান্ত পথিক ও তাপিতকে ছায়াদান করিতেছেন। কিন্তু তাহার পাদদেশে যে সকল লতাগুল্ম অতীব সংকোচে আকাশের রৌদ্র বায়ু ও মৃত্তিকারস আহরণ করিয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছিল একে একে তাঁহার আওতায় সকলগুলি প্রায় শুকাইয়া আসিল; যে কটি জীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া টিকিয়া আছে 'নমুনা'রূপ তাঁহার ভক্ত সেগুলিকেও আর বুঝি বাঁচিতে দেয় না। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসিনী প্রতিভা এক প্রকাণ্ড অভিশাপের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

এই বক্তব্যকেই স্পষ্টতর করে সজনীকান্ত লিখলেন :

"প্রত্যেকের দেয় আছে—প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ক্ষুদ্র বৃহৎ দিবে। কিন্তু বাণী-মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত যাঁহারা—অন্য সকলের দান উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা শুধু রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই বাণীর অর্চনা সারিতে চাহিতেছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথেরও অপমান করা হইতেছে এবং উপেক্ষিত সাধকদিগকেও নিস্তেজ ও দুর্বল করিয়া দেওয়া হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ ভাল লিখিতেছেন কি মন্দ লিখিতেছেন তাহা বিচার করিবার সাহস কাহারও নাই। অর্ধ শতাব্দীর অভ্যাসের মোহে তিনি যাহাই লিখিতেছেন, চরমতম কাব্য হইতে তুচ্ছতম বাজার হিসাব পর্যন্ত সকলই সাদরে সাহিত্যভোজে উপাদেয় ভোজ্যরূপে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে এবং নিরীহ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে যাহা পাইতেছ তাহাই মাথায় তুলিয়া লও, লোভ করিবার মত বস্তু অন্য কুত্রাপি কিছুমাত্র নাই।"

সাহিত্যে এই একেশ্বরবাদ সজনীকান্তের মতে সর্বনাশের সূচনাকারী। এই একেশ্বরবাদের প্রতিবাদেই তিনি প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। "আমার উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণে যেন যাচাই করিয়া সমস্ত জিনিস গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক সাহিত্যসেবীই যেন তাহার প্রাপ্য সম্মান বুঝিয়া পায়।"

অর্থাৎ সজনীকান্তের সেদিনকার বক্তব্য ছিল মূলতঃ দুটি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথার মণি সন্দেহ নেই; কিন্তু অন্ধভক্তি কোন ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান আমরা মাথা পেতে গ্রহণ করব, কিন্তু তাঁর নিকৃষ্ট বা অসার্থক সৃষ্টিগুলিকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই আমাদের বর্জন করতে হবে। বলাই বাহুল্য, পূর্বসূরির প্রতি এই বিচারই উত্তরসূরির ক্ষেমংকর কৃত্য। সজনীকান্তের দ্বিতীয় বক্তব্য হল, রবীন্দ্রেতর গুণী শিল্পীকেও আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এখানে সম্ভবত তাঁর মনে তাঁর অন্তরঙ্গ গুরু মোহিতলালের কথাই বিশেষভাবে উদিত হয়েছে। বস্তুতঃ, এই দৃষ্টি-

ভঙ্গিতেই সেদিনকার রবীন্দ্র-বিদ্রোহী তরুণদের সঙ্গে সজনীকান্তের যুগপৎ মিল ও অমিল খুঁজে পাওয়া যাবে। তরুণেরা রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাঁর স্থলে অন্য গুরুর [অচিন্ত্যকুমারের সাক্ষ্য অনুসারে তাঁদের ক্ষেত্রেও মুখ্যতঃ মোহিতলাল] প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। পক্ষান্তরে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য স্বীকার করে নিয়েই নূতন গুরুকে আহ্বান করেছেন।

তিন

'নটরাজ' সম্পর্কে সজনীকান্তের বিরূপতার প্রধান হেতু হল এই যে, এই গীতিনাট্যটি "গতানুগতিকতা দোষদুষ্ট।" সজনীকান্ত সেদিন 'বলাকা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে মহৎ সৃষ্টি বলে স্বীকার করেছিলেন। এ মত তাঁর গুরু মোহিতলালের মতেরই অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে মোহিতলাল একবার বলেছিলেন, "বলাকার পর রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়াছেন একথা যে বলে সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে?"

সজনীকান্ত 'পূরবী'র মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের শক্তির কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছেন, কিন্তু তবু তিনি বলছেন:

"পূরবীর প্রায় সর্বত্রই তিনি পুরাণো কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—অথচ পুরাতনের সে প্রাণশক্তি হারাইয়াছেন। তাহার পরই তাঁহার পতন হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের সে সংযম ও বাঁধুনী পূরবী হইতেই নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বহু স্থানে তিনি আপনাকে আপনি অনুকরণ করিয়াছেন। পুরাতন কবিতার ভাব ভাষা এমন কি পংক্তির পর পংক্তি লইয়া তিনি ঢালিয়া সাজিয়াছেন কিন্তু পূর্বের সুষমা ও শক্তি নষ্ট হইয়াছে। বিধিদত্ত অপূর্ব প্রতিভাবলে তিনি যে মাঝে মাঝে মনের বার্ধক্যকে জয় করিয়া প্রচণ্ড শক্তিতে অপূর্ব বস্তু সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন নাই একথা সত্য নহে। তবে এখন তাঁহার শক্তি প্রকাশ কচিৎ কদাচিৎ লক্ষিত হয়।"

'নটরাজ' রবীন্দ্রনাথের অবনতিরই সাক্ষ্য বহন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। সজনীকান্ত বলছেন:

"মাঝে মাঝে কবি ভাব ও রসের অতীন্দ্রিয় লোকে বসিয়া যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার বিশ্ববিজয়িনী বাণী স্থানে স্থানে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই ৫৮ পৃষ্ঠা লেখার মধ্যে এই অপরূপ রস এত অল্প যে মন ব্যথিত হয়—ইহা রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত হয় নাই।"

পুনশ্চ:

"বহুস্থলে কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অধিকাংশ কবিতা ও গান অত্যন্ত সাধারণ গোছের, ছন্দ, রস, শব্দ ও ভাবের যে বাঁধুনীর জন্য রবীন্দ্রনাথের এত খ্যাতি নটরাজ পালায় রবীন্দ্রনাথ সেই বাঁধুনী বজায় রাখিতে পারেন নাই। তিনি যেন শব্দ ও ছন্দ লইয়া খেলা করিয়াছেন মাত্র, শিল্পসৃষ্টি করেন নাই।"

প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে লেখক বলেছেন খুঁটিনাটি নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন না, বৃহৎ অসঙ্গতি ও রসাভাস ইত্যাদিরই শুধু উল্লেখ করবেন। শুধু উল্লেখই নয়, দুর্বল স্থানগুলি বেছে বেছে উদ্ধৃতি সাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বক্রকটাক্ষ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

চতুর্থ কিস্তিতে লিখছেন:

"উদ্বোধন কবিতার শেষের অংশটি পড়িয়া আমাদের হতাশার সঞ্চার হইয়াছে। এই অংশটিতে আমরা রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যের নিকট রবীন্দ্রনাথের পরাজয় লক্ষ্য করি। ইহা অবশ্য সর্বত্র দোষের নহে, কিন্তু এখানে সত্য-সুন্দরের উপাসক রবীন্দ্রনাথ বীভৎস বিদ্রোহ রসের মোহে পড়িয়াছেন। শব্দের ও ছন্দের ঝঙ্কার আছে কিন্তু অর্থ-সঙ্গতির অভাব মনকে পীড়া দেয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা এই কবিতাটি পাঠ করিলেই আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন। রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মধ্যে সুন্দরের লাগি অর্ঘ্যমালা সাজাইতে দেখিতেছেন, এমত সময়ে

'অকস্মাৎ কোমলের কমল মালায় স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে;
মুহূর্তে অম্বর বক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা-ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার ক্রন্দন।'

মনে হয় নজরুলী কবিতা পড়িতেছি, রসাভাব স্পষ্ট,

কদর্যতা একই হইয়া উঠিয়াছে। কাঁসা ও দামামার মিল ভাল হয় বটে কিন্তু কাঁসাকে দিয়া দামামা বাজাইলে আমাদের পৌরাণিক সংস্কারকে ক্ষুণ্ণ করা হয়।"

"'শরতের ধ্যান' কবিতাটি সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া মনে হয় না। গীতাঞ্জলির 'শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে' 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' কিম্বা 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরী খেলা' ইত্যাদি গানের সহিত তুলনা করিলে এই কবিতাটির দৈন্য ধরা পড়িবে। এই ধরনের কবিতা 'নাচঘর' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাতে প্রায়শঃই পড়িয়া থাকি।

'শরতের বিদায়' গানটি সত্যেন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ। তাও আবার ১১ লাইন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছন্দ বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন নাই। দুর্গতি ইহাকেই বলে।"

এই জাতীয় বক্রকটাক্ষসহ 'নটরাজে'র ক্রটিবিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে প্রবন্ধের উপসংহারে সজনীকান্ত বলছেন, "নটরাজ পালায় প্রাণের সেই বেগ নাই, গতিহারা স্রোতের মত ইহা শৈবালদামে পূর্ণ বলিয়া আমরা বিচারের দ্বারা সেই শৈবালদাম সরাইয়া জলের সন্ধান করিয়াছি, অন্যায় কিছু করিয়াছি বলিয়া মনে করি না।"

এইখানেই প্রবন্ধটি সমাপ্ত হলে লেখকের বক্তব্য শুধুমাত্র 'নটরাজে'র কাব্যবিচারে সীমাবদ্ধ বলে গ্রহণ করা যেতে পারত। কিন্তু প্রবন্ধের উপসংহারে সজনীকান্ত একেবারে শনিবারের চিঠির প্রবক্তারূপে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। গুরুর উদ্দেশে শিষ্য উপদেশামৃত বর্ষণ করেছেন। কবির লেখনীতে যখন আর তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত রচনার সৃষ্টি হচ্ছে না তখন, তাঁর কর্তব্য, অক্ষম সৃষ্টির চেষ্টা পরিত্যাগ করে বেত্রদণ্ড গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অনাচার ও অনাসৃষ্টির উপযুক্ত শাস্তিবিধান করা। সজনীকান্ত লিখছেন :

"রবীন্দ্রনাথ যদি আপনার মরিচাধরা তরবারি লইয়া ছন্দ-কৌশল দেখাইবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে শানাইয়া বঙ্গ-সাহিত্যে অনাচারের স্রোত বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেও আমাদের মঙ্গল। যে সাহিত্য ও ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ বুকের রক্ত দিয়া এতকাল পুষ্ট করিয়া আসিলেন তাহাকে রক্ষা করিবার ভার আজ তিনি গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। বাংলা সাহিত্যে দিনে দিনে ভাবে ও ভাষায় যে বীভৎসতা ও কুরুচি প্রসার লাভ করিতেছে তাহা দূর করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের মত শক্তিশালী লেখকের চেষ্টা আবশ্যক। সাহিত্যে সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি অসুন্দরকে সংহার করিবার জন্য রুদ্র মহাকালের ডম্বরু নিনাদও প্রয়োজন। সুন্দরকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে অসুন্দরকে হনন করিতে হইবে। আজ আমরা বাঙলাদেশে এই অসুন্দরের বীভৎস নৃত্য সর্বত্রই দেখিতে পাইতেছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ আজও জীবিত আছেন, তাঁহার অপূর্ব সৃষ্টিগুলি বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারে পুরাতন হইবার পূর্বেই অতি নূতনের চাপে সেগুলি লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এতটা বীভৎসতার বন্যা কেন বহিতে সুরু করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমাদের একান্ত প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংহার মূর্তিতে একবার অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গবাণীর পূজামণ্ডপে আগাছার উচ্ছেদ করিয়া সুন্দরের জয় ঘোষণা করুন, যে সুন্দর, যে শিব তাঁহার এতকালের উপাস্য দেবতা তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়াও যে তিনি কেন নিশ্চেষ্ট আছেন বুঝিতে পারি না।"

চার

প্রবন্ধশেষে সজনীকান্ত লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে যাহা দিয়াছেন তাহা তৌল করিয়া দেখিবার মত তুলাদণ্ড আজিও সৃষ্ট হয় নাই এবং কোন-কালেই হইবে না। তাঁহার দান পর্বতের মত গুরুভার, এক্ষেত্রে শুধু নটরাজ পালা-গানখানি লইয়াই তাঁহার শক্তির বিচার করিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র, আমি তাহা করি নাই। আমি একান্ত ভাবে 'নটরাজ' বইখানিরই সমালোচনা করিয়াছি—রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করি নাই।"

সজনীকান্তের এই উক্তি সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, তাঁর গুরুভক্তি অবিমিশ্র ছিল না।

যুগসন্ধির জন্য তাঁর মনেও কতকটা জ্ঞাতসারে কতকটা অজ্ঞাতসারে ক্রিয়াশীল ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর চিত্তে তা কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে তাও তিনি ভেবে দেখেন নি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সজনীকান্ত যখন এই পাঁচ-কিস্তি গুরুনিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন প্রায় সেই সময়েই তিনি শনিবারের চিঠির সমর্থন কামনা করে রবীন্দ্রনাথকে চিঠিপত্র লিখছেন। তাঁকে লেখা কবিগুরুর ২৮ কার্তিক ১৩৩৪ ও ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ তারিখের দুখানি চিঠি [পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রকাশিত] পড়লেই তা বুঝতে পারা যায়।

সজনীকান্তের এই 'দুই-আমি'র পারস্পরিক আত্ম-প্রবঞ্চনাকেও আমরা পূর্বে যুগসন্ধির অনিবার্য লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছি। কিন্তু অরসিক রায়ের ছদ্মনামে সজনীকান্ত আত্মগোপন করতে পারলেন না। গুরুর কানে শিষ্যের এই কুকীর্তির কথা অনুরঞ্জিত ও অতিরঞ্জিত হয়ে নানা সূত্রে প্রেরিত হল। বিপদ এল আরেক দিক থেকে। সজনীকান্ত তখন 'প্রবাসী'র কর্মচারী। নবাগত 'বিচিত্রা' 'প্রবাসী'র প্রতিদ্বন্দ্বী। 'বিচিত্রা'র অত্যুৎসাহী সমর্থকগণ কবিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, কুকর্মটি সজনীকান্তের হাত দিয়েই হয়েছে বটে, কিন্তু এর মূলে 'প্রবাসী'র কর্তাদের গোপন হস্তও বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ এই ব্যাপারে রামানন্দবাবুকেও টেনে আনার চেষ্টা হল। সজনীকান্ত প্রমাদ গণলেন। এবং কৃত অপরাধের জন্যে কবিগুরুর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লিখলেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে সজনীকান্তের চিঠি এবং সঙ্গে সঙ্গে একই দিনে লেখা রবীন্দ্রনাথের উত্তর গুরুশিষ্য সম্পর্কের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। তাই পত্র দুখানি উদ্ধারযোগ্য :

সজনীকান্তের পত্র :

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৭

শ্রীচরণকমলেষু,

সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র কয়েক সংখ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত আপনার 'নটরাজ' গীতিনাট্যখানির সমালোচনাটি লইয়া কিছুদিন যাবৎ গোপনে ও প্রকাশ্যে একটু আন্দোলন চলিতেছিল পরম্পরায় তাহার আভাস পাইয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার কিছু জবাবদিহি করিবার আছে কি না ভাবিয়া তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া এতকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই বা পত্র লিখি নাই। কিন্তু গত পরশু ও কাল প্রশান্তবাবুর সহিত দুই-একটি কথাবার্তার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, অবিলম্বে আপনার নিকট আমার নিজের দিকটা খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক, নতুবা আমার সহিত অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জড়াইয়া অকারণে তাহাদের ক্ষতি করার চেষ্টা চলিতে পারে।

সমালোচনাটি আমার লেখা। অরসিক রায়ের নামের আড়ালে আমি যে-কারণেই আত্মগোপন করিয়া থাকি, ভাবিয়াছিলাম ওই নামটিই ওই প্রবন্ধটি সম্পর্কে অন্য আলোচনার অবকাশ দিবে না। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি বাংলা দেশে লেখার দ্বারা লেখার বিচার হয় না, লেখকের কুলজীকোষ্ঠীরও প্রয়োজন হয়। এ দেশের লোকেরা সত্য-অনুসন্ধিৎসু, গোপনতম সত্যটি তাহারা টানিয়া বাহির করিবেই ; কারণ কোন বিশেষ বস্তুর উপর স্বকপোলকল্পিত বিশেষ উদ্দেশ্যটি আরোপ করিতে না পারিলে তাহাদের সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখানো হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।...

আমি শুনিয়াছি আপনি এই লেখাটি সম্পর্কে একাধিক পত্র পাইয়াছেন, তাহার একটিতে নাকি লেখা আছে আমি অপরের প্ররোচনায় প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম,...ইহাও কেহ বলিয়া থাকিবেন যে, যেহেতু আমি 'প্রবাসী' অফিসের বেতনভোগী কর্মচারী এবং যেহেতু 'বিচিত্রা' পত্রিকাটি ব্যবসায়ক্ষেত্রে 'প্রবাসী'র প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই হেতু শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে দিয়া এই প্রবন্ধ লিখাইয়া 'বিচিত্রা'কে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপনাকে জানাইতেছি যে আমার লিখিত উক্ত সমালোচনাটিতে সত্য, মিথ্যা, বাতুলতা, প্রলাপ, ঔদ্ধত্য, ঈর্ষা যাহা কিছু আছে তাহা সম্পূর্ণ আমার, অন্য কাহারও তাহাতে বিন্দুমাত্র প্ররোচনা বা অংশ নাই।...

যে রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে বেনামীতে 'মেঘনাদ বধে'র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, যিনি বয়সের হিসাব ভুলিয়া গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ [বড় দাদা], চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহিত সত্যের খাতিরে দ্বন্দ্ব করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর নন-কো-অপারেশন আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী

নৈতিক ভয় দূর করিবার জন্য "সত্যের আহ্বান" করিয়াছিলেন, তিনিই যদি আজ কাহাকেও স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করিতে দেখিয়া গোপন অনুসন্ধান ও হীন চক্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।...বাংলা দেশের মানুষকে আপনি ৬৭ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন, আমার ভয় হয়, পাছে যাহারা নিরন্তর আপনাকে ঘিরিয়া থাকে, তাহাদের ফেরে পড়িয়া আপনি ভুল করেন।...

আমার এই ২৬ বৎসরের জীবনে মানুষকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পাই নাই, সুতরাং ভুল করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনি বহুবর্ষ যাবৎ এই পৃথিবীর হালচাল দেখিয়া আসিতেছেন, আপনি ভুল করিবেন না, এ বিশ্বাস আমি করিতে পারি। আপনার অনেক ভক্ত আছে। কেহ কাছে থাকিতে পায়, কেহ পায় না। দূরে যাহারা থাকে তাহাদের ভক্তি বিন্দুমাত্র কম নহে। অন্তত, আমার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ এবং এতকাল খোরাকও রবীন্দ্রনাথই যোগাইতেছেন। আমার ভক্তি বা শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ করেন তাহা হইলেই আমার চরমতম শাস্তি ঘটিবে। আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া অন্তত সেই শাস্তিটুকু হইতে আমাকে রেহাই দিবেন।—প্রণত শ্রীসজনীকান্ত দাস

রবীন্দ্রনাথের উত্তর :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আত্মশক্তিতে কয়েক সংখ্যা ধরে নটরাজের যে সুদীর্ঘ নিন্দাবাদ প্রকাশ হয়েছিল সেটা তোমার লেখা বলে আমি জানতুম না বা সন্দেহ করি নি। বাইরে থেকে চিঠি পাই। তার উত্তরে লিখি, যাঁদের আমি বন্ধু বলে বিশ্বাস করি তাঁরা আমার নিন্দা-প্রচারে আনন্দ বোধ করেন, এত বার বার ইহার প্রমাণ পাইয়াছি যে ইহাতে আমি বিস্মিত হই না এবং এ কথা লইয়া আলোচনা করিতে আমার লেশমাত্র ইচ্ছা নাই।

নিঃসন্দেহ আমার দীর্ঘকালের কাব্যরচনায় মন্দ লেখা বিস্তর আছে। সেইগুলির উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া ইতিপূর্বে তুমি কখনো লেখ নাই। সম্প্রতি যদি আমার কোনো লেখা মন্দ হইয়া থাকে সেটা কি পাঁচখানা কাগজ ভরাইবার মতো এতই অসহ্য মন্দ? এ সম্বন্ধে তোমার মত যদি আমাকে লিখিয়া জানাইতে, আমার কৈফিয়ৎ আত্মীয়ভাবে তোমাকে জানাইতে পারিতাম। কিন্তু আত্মশক্তিতে তোমার সহিত পাল্লা দিতে পারি না, সে কথা তুমি জানো। এমন অবস্থায় ছাপার কাগজের উচ্চাসনে গুপ্তভাবে বসিয়া আমার প্রতি সরাসরি বিচারে যথেচ্ছ দণ্ড বিধান করা তোমার পক্ষে সহজ কিন্তু এমন কাজ তুমি করিতে পারো তাহা সন্দেহ করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

মেঘনাদ বধের সমালোচনা যখন লিখিয়াছিলাম তখন আমার বয়স ১৫। তা ছাড়া তখন মাইকেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল না। বঙ্কিম ও মহাত্মাজির সঙ্গে আমার যে দ্বন্দ্ব তাহা নৈতিক; তাহা কর্তব্যের বিশেষ প্ররোচনায়। বঙ্কিমের কোনো গ্রন্থের সাহিত্যিক সমালোচনা যদি করিতাম তবে প্রধান ঝোঁক দিতাম তাঁহার গুণের উপর, ত্রুটির উপর নহে, কারণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। শ্রদ্ধাই পজিটিভ গুণকে বড় করিয়া দেখে। এই জন্যেই রাজসিংহের সমালোচনা করিয়াছিলাম।

এত কথা লিখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি তোমার কথা জানাইয়াছ বলিয়াই লিখিতে হইল। ইতি ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ক্রমশঃ]

নব বাণী

বনফুল

১

সন্তানের গাঢ় রক্ত-শতদল 'পরে
স্বদেশের বাণীমূর্তি রেখেছে চরণ:
পায়ে রক্ত-অলক্তক, কুন্দেন্দুবরণ
রোষদীপ্ত তাম্রবর্ণ: লীলায়িত করে
সপ্তস্বরা বীণা নাই, খরশান অসি
বিচ্ছুরিছে নব সুর—'নয়, নয়, নয়'—
রুদ্ররাগে তূর্যরবে কহিছে নির্ঘোষি'
—'ললিত সঙ্গীত নয়, বলির সময়'।
হংস তার শ্যেনসম উড়িছে গগনে।
প্রলয়ের পূর্বাভাস বিস্ফুরিছে তার
দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে: প্রদীপ্ত নয়নে
জ্বলিতেছে অন্তর্দাহ—সুতীব্র ধিক্কার।
জ্বলিতেছে অগ্নি-শিখা রুক্ষ কেশ-পাশে
অগ্নির বারতা আজি আকাশে আকাশে।

২

অসন্দিগ্ধ সে বারতা সুস্পষ্ট বচনে
করিছে ঘোষণা—বলিতেছে বারম্বার—
'তব অক্ষমতা-পথে তোমার অঙ্গনে
প্রবেশ করেছে শত্রু—এ দোষ তোমার।
দূর কর অক্ষমতা, অক্ষমতা পাপ।
শান্তির মুকুট শিরোশোভা সমর্থের,
দুর্বলের নহে: নিদারুণ অভিশাপ
বীর্যবলে মুছে ফেল বীর, সক্ষমের
সার্থক স্বাক্ষর উদ্ভাসিত হোক আজি
তব দৃপ্ত আচরণে, তবেই পারিবে
সর্ব-শুভ্রা ভারতীর অর্চনার সাজি
সাজাইতে সগৌরবে,—শত্রুরা হারিবে।
ভারতীর রূপান্তর হবে তা না হ'লে
আসিবে সে কালী-রূপে মুণ্ডমালা গলে।'

—

দণ্ড দাও

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দণ্ড দাও, দণ্ড দাও, দণ্ডদাতা দণ্ড দাও মোরে,
দেশের সীমান্তে মোর শত্রু এসে হানিল আঘাত
আর আমি শয্যাপরে তন্দ্রামগ্ন সুখ-স্বপ্নঘোরে
দেশেরে ভেবেছি মাটি, দেশপ্রেম প্রেম ধূলিসাৎ ;
মূর্খ মেনে ধন্য হোক ; আমি কবি আনন্দ দুলাল
দেশ নাই দায় নাই—বুনে যাই কল্পনার জাল।

কিন্তু এ কি অকস্মাৎ মাটি যেন মার কণ্ঠে ডাকে!
আমারই মায়ের কণ্ঠ—সে আকুতি ; রে ভ্রান্ত সন্তান
জেগে ওঠ, আমার দাসত্ব সাথে দাসত্বের পাকে
কণ্ঠ তোর রুদ্ধ হবে ; বক্ষে তোর চাপিবে পাষাণ ;
আত্মার হইবে মৃত্যু, চিত্ত চির হইবে কাঙাল
ভাবের বিগ্রহ চূর্ণ ; অমৃতের পাত্র ভেঙে যাবে,
শস্যক্ষেত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে ওদের ক্ষুধার পঙ্গপাল
আসিয়া বসিবে। মৃত্যু শুষ্ক মরুতে হারাবে—
জীবন নদীর ধারা। তবু ভাবি এ চিত্তবিভ্রম—
মাটি নাকি কথা কয়! এ কি ভ্রান্তি বিচিত্র নির্মম॥

এ কি দেখি, মাটির ললাটে যেন রক্তধারা ঝরে—
আমারই মায়ের মত! কত আগে আমারে বাঁচাতে
মা আমার পড়েছিল প্রস্তরসঙ্কুল পথপরে—
এমনই রক্ত ঝরেছিল ; ভেদ শুধু বিশীর্ণ ধারাতে
আর অজস্র ধারাতে। ভ্রম নাই ভ্রম নাই আর
মা আমার ক্ষমা কর, চিনেছি মা, চিনেছি এবার॥

মাটি নয় মাটি নয় মা আমার জন্মজন্মান্তরে—
পূর্বপুরুষের ক্রমে। এ-দেহ এ-মাটির কণায়—
এ মাটির ঊর্ধ্বে যে আকাশ মন মোর সেথায় সন্তরে
আমার আত্মার জন্ম এদেশে বিচিত্র ভাবনায়—
শক্তি মোর এরই অন্নে—শান্তি মোর এরই বক্ষোনীড়ে—
মাটিতে মাখানো ছিল ভাব ভাষা সব আমাদের
জন্ম মৃত্যু সাধ আশা এ দেশে সীমান্তরেখা ঘিরে—
সে মায়ে ভেবেছি মাটি, ক্ষমা নাই এ অপরাধের।

দণ্ড দাও দণ্ডদাতা, শুধু দাও সাধিবারে পণ—
শত্রুরে করিতে জয় যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ড নির্বাসন।

—

মেক-আপ

অচ্যুত গোস্বামী

বিষয়গৌরবের দিক থেকে বাংলা এখনও জনসাধারণের চোখে খানিকটা অবজ্ঞাত। কিন্তু বাংলায় যারা ফার্স্ট ক্লাস পায় তাদের সম্পর্কে এ কথা খাটে না। বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস একটি দুর্লভ ঘটনা। পর পর পাঁচ বছর বাংলায় একজনও ফার্স্ট ক্লাস না পাওয়ায় নীলাদ্রি যেবার ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে বেরিয়ে এল সেবার এ নিয়ে কাগজপত্রে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছিল।

খবরটা প্রকাশিত হওয়ার পরেই শান্তিনিকেতন থেকে একটি উচ্চ বেতনের বিশেষ পদ গ্রহণের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তখন শুরু হব-হব করছে। সেখান থেকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে তাকে জানানো হয়েছিল যে রীডারের পদের জন্য যদি তার আগ্রহ কিছুমাত্র থাকে তবে সে যেন অবিলম্বে একটি আবেদন-পত্র পাঠিয়ে দেয়। এসব তো গেল নিতান্তই দেশীয় ব্যাপার। যখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার কাছে তিন বছরের জন্য অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে কাজ করার প্রস্তাব এল তখন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবাই একবাক্যে বলল এ রকম একটা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করলেই সে বুদ্ধিমানের কাজ করবে।

নীলাদ্রি কিন্তু দেশীয় আর বিদেশীয়ের মধ্যে কোন পক্ষপাত করল না। সমস্ত প্রস্তাবের জবাবেই সে শুধু একটি কথাই বলল। ভাগ্যক্রমে পরীক্ষার ফলটা ভাল হয়েছে বলেই সে বাকি জীবনটা কোন মোটা মাইনের চাকরি নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে কাটিয়ে দেবে না। ভাল ছেলে মাত্রেই যদি মোটা মাইনের চাকরি নিয়ে দৌড়য় তবে দেশের কাজ, দশের কাজ, আদর্শের জন্য সংগ্রাম করবে কারা? যারা থার্ড ক্লাস পায় তারা?

মা নেই নীলাদ্রির। বাবার কাছে গিয়ে সে বলল, বাবা, আমি কলকাতা যাচ্ছি বছর তিনেকের জন্যে। এই সময়ের মধ্যে আমি কী করি না করি তা জানতে চাইবে না। যদি টাকাপয়সা কিছু না পাঠাই সেজন্যে কোন অভিযোগ করবে না।

বৃদ্ধ বাবা ভাবলেন ছেলে তাকে পরীক্ষা করছে। মনে মনে হাসলেন একটু। রত্ন ছেলে। তার সুবুদ্ধির উপর তিনি নিশ্চয়ই নির্ভর করতে পারেন। বললেন, বেশ তো, তুই যা না কলকাতা। আমি কি তোর কাছে কোন কৈফিয়ত চাইছি? তুই টাকা না পাঠালেও আমার দিন এক রকম করে চলে যাবে।

বাবা যদি বাধা দিতেন, তবে নীলাদ্রি বাধা জয় করত। বস্তুতঃ বাবা প্রচণ্ডভাবে বাধা দেবেন এবং সে বাধার বিরুদ্ধে তাকে রীতিমত একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করতে হবে এটা সে একরকম ধরেই নিয়েছিল। অনাবশ্যক ভাবে খানিকটা নাটক করতে হবে ভেবে সে বাবার কাছে যাওয়ার আগেই মনে মনে যথেষ্ট বিরক্তি বোধ করেছিল। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলের সঙ্গেও বাবা যদি একগুঁয়ের মত বেয়াড়া রকমের তর্ক জুড়ে দেন তবে সেটা কি একটা বিশ্রী ব্যাপার নয়!

কিন্তু বাবার সঙ্গে নাটক একটুও জমল না দেখে নীলাদ্রি আরও বেশী বিরক্তি বোধ করল। বাবা যদি ছেলের ইচ্ছায় বাধা না দেয় তবে সে আবার কেমন বাবা? বাবারা যদি এ রকম আধুনিক হয়ে ওঠে তবে তো ছেলেদের দারুণ বিপদ। তবে তারা লড়াইটা করবে কার বিরুদ্ধে?

খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নীলাদ্রি বলেছিল, আমার কাছ থেকে কিন্তু নিয়মিত চিঠি-পত্তর আশা করো না বাবা।

বুড়ো বাপকে মাঝেমাঝেও এক-আধখানা চিঠি লিখবি না রে নীলু?

যদি লিখি তো সেও বেশ কিছুদিন অন্তর।

বলছিস বটে, কিন্তু তা তুই নিজেই পারবি না রে

নীলু। বুড়ো বাপের খবরটা নেবার জন্তেও তো তোকে চিঠি লিখতে হবে বোকা।

বলে ছেলের নির্বুদ্ধিতা দেখিয়ে দিতে পেরেছেন ভেবে বাবা পরম আনন্দে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন।

কোনরকমে রাগটা চেপে রেখে নীলাদ্রি বলেছিল, পারি কি না পারি দেখে নিয়ো বাবা।

বাবার সঙ্গে এই আলাপের দু-চারদিন পরেই নীলাদ্রি কলকাতা চলে এসেছিল। আগরতলার ছেলে নীলুর সেই প্রথম কলকাতা আসা। মানে এর আগে যে দু-একবার সে কলকাতা আসে নি তা নয়, কিন্তু সে নেহাতই দু-চারদিনের জন্য। এম. এ. পড়ার জন্তও তাকে কলকাতা আসতে হয় নি, কারণ সে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছিল। অবশ্য পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাকে দিনকয়েক কলকাতায় থাকতে হয়েছিল।

সেরকম দু-চারদিনের জন্য কলকাতায় থাকার কোন মানে নেই। তাতে কলকাতাকে চেনা যায় না; কলকাতার একজন হওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু নীলাদ্রি এখন শুধু কলকাতায় বাসই করবে না, কলকাতার একজন হতে হবে তাকে। কলকাতার প্রত্যেকটি লোকের মর্মমূলে প্রবেশ করবে সে। তবে তো তার আদর্শ সার্থকতা লাভ করবে। কলকাতা হল বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র, ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। তার আদর্শ যদি কলকাতায় জয়ী হয় তবে তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

দুই

আগরতলা থেকে প্লেনে চড়ে নীলাদ্রি কলকাতা এল। জানলার কাছে বসে প্রায় সারাটা সময়ই সে নীচে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ছিল। সব সময়ই যে দৃষ্টি অবনত ছিল তা নয়, মাঝে মাঝে মেঘের উপর দিয়ে যাচ্ছিল প্লেনটা; তার ফলে পৃথিবীটাও দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছিল। তবু ভাগ্য ভাল যে পদ্মা নদী দেখা গেল আকাশ থেকে। আড়াই মাইল চওড়া প্রকাণ্ড নদীটাকে মনে হল যেন আড়াই হাত চওড়া একটা প্রকাণ্ড মফস্বল শহরের নর্দমা। নৌকোগুলোকে মনে হচ্ছিল মোচার খোলের মত; ভিতরের মানুষগুলো যেন পেনসিলের চেয়েও ছোট। মাত্র আড়াই হাত পথ যেতে পুরো এক মিনিট সময় লাগল প্লেনটার। সত্যি, কী আস্তে আস্তে চলে প্লেন মানুষের অনুভূতিতে! সে যে একশো মাইল বেগে চলছে শরীরের ইন্দ্রিয় দিয়ে তা অনুভবই করা যায় না।

সময়মত টেলিগ্রাম করা সত্ত্বেও এয়ার-পোর্টে মেসো-মশাই কোন লোক পাঠান নি দেখে নীলাদ্রি মনে মনে বেশ রুষ্ট হল। মেসোমশাইয়ের কাছে বয়সের দিক থেকে সে হয়তো নেহাতই নাবালক; কিন্তু সে যে ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রীধারী ছেলে এ কথা তো তাঁর মনে রাখা উচিত ছিল। স্বাধীন ভারতে আত্মীয়তার সম্মান না থাক, বিদ্যার সম্মানটা তো থাকা দরকার। মেসোমশাইয়ের না হয় যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তাঁর ওকালতী বুদ্ধির কাছে না হয় ফার্স্ট ক্লাস থার্ড ক্লাস একাকার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাঁর তো দুই বিদুষী কন্যা আছে। বড়টি তো ইকনমিক্স না হিস্ট্রী না পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়ছে। আর কেউ না বুঝুক, তাদের তো অন্ততঃ বোঝা উচিত ছিল ফার্স্ট ক্লাসের মর্যাদা কতখানি। বাড়িতে যখন গাড়ি রয়েছে, তাদের পক্ষে একবার এয়ার-পোর্টে চলে আসা এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না।

এতখানি অবজ্ঞার দক্ষিণা লাভ করে সে যদি এখন মেসোমশাইয়ের বাড়িতে না উঠে কোন হোটেলে গিয়ে ওঠে তবে ঠিক হয়। কিন্তু নীলাদ্রি ভেবে দেখল, হোটেলে আর কদিন থাকা সম্ভব! সে এসেছে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে। হোটেলে সে অভিমান করে গিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু মেসোমশাই যদি তার অভিমানকে মূল্য না দেন? তখন তো তাকে মাথাটা আরও নীচু করে সেই মেসোমশাইয়ের বাড়িতেই গিয়ে উঠতে হবে। তার চেয়ে সোজাসুজি মেসোমশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে ওঠাই ভাল। সে গিয়ে তো অন্ততঃ এ কথা বলতে পারবে যে তাঁরা তাকে ভুলে থাকতে পারেন বটে, কিন্তু সে তাঁদের কথা ভুলতে পারে না।

যারাই মফস্বলে বাস করে তারাই বুদ্ধি করে কলকাতায় দু-চার ঘর আত্মীয় তৈরি করে রাখে। এক জায়গায় বারবার উঠতে অসুবিধে হলে ঘুরে-ফিরে বিভিন্ন বাড়িতে ওঠা যায়। কিন্তু নীলাদ্রির বাবার মোটা বুদ্ধিতে

তো নিতান্ত সাধারণ বৈষয়িক বিবেচনারও কোন স্থান নেই। কাজেই এতবড় কলকাতা শহরে মেসোমশাইরাই তাদের একমাত্র আত্মীয়। তাঁর কাছে ওঠা ছাড়া নীলাদ্রির আর অন্য গতি নেই।

এ কথা অবশ্য ঠিক মেসোমশাইয়ের বাড়িখানা দেখতে-শুনতে ভাল। লোকসংখ্যার তুলনায় বাড়িতে ঘর আছে অনেকগুলো। কিছুদিন আগে যখন সে পরীক্ষা দিতে এসেছিল, তখন তাকে একটা গোটা ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন তো সে ছিল নিতান্তই একজন পরীক্ষার্থী—সাড়ে তিনশো জনের মধ্যে একজন। তখনই যখন তাঁরা তাকে একখানা ঘর দিয়েছিলেন তখন ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার পর নিজের ব্যবহারের জন্য একখানা আলাদা ঘর তো সে অনায়াসেই পেতে পারবে।

গাড়িটা অবশ্য প্রায় সব সময়ই মেসোমশাইয়ের কাজে লাগে। তবু বিশেষ দরকারের সময় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললে তিনি যে গাড়িখানা তাকে দু-একবার ব্যবহার করতে দেবেন না এ কথা মনে করা সঙ্গত নয়।

অতএব নীলাদ্রির ট্যাক্সি হ্যারিসন রোড পেরিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের মারোয়াড়ীদের শ্রীছাঁদবর্জিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিন্দুক আকৃতির বাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে ঢুকল। একটি গেটওয়ালা দোতলা বাড়ির সামনে সে ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল। ট্যাক্সি থেকে নামতে নামতে ভাবল, এতবড় বাড়ির সামনে নামছে দেখে তার প্রতি ট্যাক্সিওয়ালার সম্ভ্রমবোধ নিশ্চয়ই আর একটু বাড়বে। সেটুকু বজায় রাখার জন্য তাকে ন্যায্য ভাড়ার উপর আট আনা বকশিশ দিতে হবে।

রাস্তায় নেমে নীলাদ্রি একটু ইতস্তত: করতে লাগল। মেসোমশাইয়ের চাকরের নামটা মনে পড়ছে না যে তাকে ডাকবে। আবার ড্রাইভারের সামনে গাড়ি থেকে নিজের হাতে বিছানা ট্রাঙ্ক নামাবে সেটাও ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না। কী করা যায় এখন?

এমন সময় মুশকিল-আসানের মত বাড়ি থেকে চাকরটা বেরিয়ে এল। নীলাদ্রিকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে খৈনির দাগ-লাগা দাঁতের পঙ্‌ক্তি বিস্ফারিত করে বলল, দাদাবাবু এসেছেন!

নীলাদ্রির তখন এমন আনন্দ হয়েছে যে অনায়াসে চাকরটাকে জড়িয়ে ধরতে পারত। কিন্তু তা না করে সে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, হ্যাঁ রে। তুই মালপত্তরগুলো নামিয়ে নে তো ভাই, আমি ড্রাইভারকে মীটারটা বুঝিয়ে দিয়ে আসি।

আট আনা বকশিশ দেওয়া সত্ত্বেও ড্রাইভার একটা সেলাম পর্যন্ত দিল না দেখে নীলাদ্রি মনে মনে চটে গেল।

মালপত্তর নিয়ে চাকর চলে গেল ভিতরের দিকে, আর নীলাদ্রি ঢুকল বৈঠকখানা ঘরে। মেসোমশাইকে আগে একটা প্রণাম ঠুকে দেওয়া দরকার।

বৈঠকখানা ঘরটা যে খুব ছোট তা নয়। তবে টেবিল চেয়ার আলমারিতে এমন ঠাসা যে ছোট বলে মনে হয়। মক্কেলের ভিড় এমন যে একখানা চেয়ারও খালি নেই। তারই ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে নীলাদ্রি এগিয়ে গিয়ে টেবিলের অপর দিকে উপবিষ্ট মেসোমশাইকে প্রণাম করল।

মেসোমশাইয়ের মুখখানা এমনিতেই হাসি-হাসি। কাজেই তাকে দেখতে পেয়ে বিশেষ করে হাসলেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না। বললেন, আরে, নীলাদ্রি যে! থাক্ থাক্। তারপর কী মনে করে? খবর-টবর না দিয়ে?

টেলিগ্রাম পান নি?

টেলিগ্রাম! ও—হ্যাঁ, পরশু একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম বটে। দেখ কাণ্ড! একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এত কাজে ব্যস্ত থাকি—

এত লোকের সামনে নীলাদ্রি আর মেসোমশাইকে অপ্রস্তুত করতে চাইল না।

সে তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি।

তারপর, বাড়ির সব ভাল তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভাল কথা, তুমি না কিছুদিন আগে একটা পরীক্ষা দিতে এসেছিলে? কী পরীক্ষা যেন?

এম. এ.।

এম. এ.! বেশ বেশ। পাস করেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি।

ওই হল। ফার্স্ট ক্লাসও যা পাস করাও তাই। কে আর গেজেট খুলে দেখতে যাচ্ছে কার কোন্ ক্লাস হল। কি সাবজেক্ট ছিল তোমার?

বাংলা।

মাটি করেছ! ইকনমিক্স বা অন্য কোন সাবজেক্ট হলে আমি তোমাকে মার্চেন্ট অফিসে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম।

চাকরির জন্যে আমার ভাবনা নেই। বর্ধমান য়ুনিভার্সিটি তো আমাকে রীডারের পোস্ট অফার করেছে।

বর্ধমান ইউনিভার্সিটি! মানে প্রফেসরের চাকরি? শুনেছি, প্রফেসররা কাঁধে গামছা ফেলে বাজার করতে যান, বাজার করে ওই পথেই রাস্তার কলে চান করে আসেন। ভাড়াটে বাড়িতে তো জলের বড্ড অভাব!

যতটা শুনেছেন অতটা অবশ্য ঠিক নয়।

যাক গে, তুমি তাহলে প্রফেসরের চাকরি নিচ্ছ?

না মেসোমশাই। আপাততঃ আমি কোন চাকরি করব না ভেবেছি।

গুড আইডিয়া। ব্যবসা-ট্যাবসা করবে বুঝি? তোমার ওকালতিটা পাস করা উচিত ছিল নীলাদ্রি। বাংলার বুদ্ধি নিয়ে ব্যবসা হয় না।

আজ্ঞে, আমি ব্যবসাও করতে চাই না।

বটে? তাহলে তুমি কী করতে চাইছ?

দেশের কাজ।

এতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত মক্কেলরা নীলাদ্রিকে একটি উৎপাতবিশেষ বলেই মনে করছিল। এবার তারা কৌতূহলী হয়ে নীলাদ্রির দিকে তাকাল। তাদের মুখ দেখে মনে হল তারা যেন একটি আজব জীব দেখছে।

মেসোমশাই বললেন, তার মানে তুমি পলিটিক্স করতে চাইছ? দেখ নীলাদ্রি, এই বয়সেই মন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা ভাল নয়। এমন কী পয়সা পায় মন্ত্রীরা বল দেখি? আড়াই হাজার তিন হাজার টাকার অঙ্কটা শুনতে অবশ্য ভালই লাগে। কিন্তু সে তো পাঁচ বছরের জন্যে। আর একবার মন্ত্রী হলে তুমি তো অপরের গোলামি করতে পারবে না। না নীলাদ্রি, তোমার ওকালতি পড়া উচিত ছিল। এই দেখ না—আমি কি একজন মন্ত্রীর তুলনায় খুব কম রোজগার করি? অথচ আমার চাকরিটা স্থায়ী—পার্মানেন্ট। সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যেতে পারব। কি বলেন আপনারা, পারব না?

বলে তিনি গর্বভরে মক্কেলদের দিকে তাকালেন। একজন মক্কেল বলে উঠল, বেশী বেশী। আপনি সা[illegible] সত্তরের চেয়েও বেশী বয়স অবধি কাজ করতে পারবেন।

এ লোকটার মনে হয় পুরো ফী দেওয়ার ইচ্ছে নেই। নীলাদ্রি ভাবল।

মেসোমশাই, টাকার চেয়েও বড় জিনিস পৃথিবীতে আছে। আচ্ছা, আমি এবার ভেতরে যাই। আপনা[র] কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে।

তাই যাও। টাকার চেয়েও যা বড় জিনিস তার ক[থা] মেয়েরা শুনতে বেশী ভালবাসবে।

ভিতরের দিকে যেতে যেতে নীলাদ্রি পিছন থেকে সমবেত কণ্ঠের প্রচণ্ড হাস্যধ্বনি শুনতে পেল।

মেসোমশাই—মানে শিবদাস মুখোপাধ্যায়, বার-অ্যাট-ল, মক্কেলদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না। মফস্বল থেকে এসেছে কিনা—তাই বুদ্ধিটা একটু কেমন-কেমন রয়ে গিয়েছে।

একজন মক্কেল জিজ্ঞেস করল, ছেলেটি আপনার কে হয়?

আমার ভায়রাভাইয়ের ছেলে।

তাই বলুন! ওইসব ছেলের বুদ্ধি একটু মোটাই হয়।

মাসীমা আর তাঁর বড় মেয়ে শম্পা বারান্দায় গদি-আঁটা মোড়া পেতে বসেছিলেন। সামনে একটা টেবিল-ফ্যান ঘুরছে। মনে হয় এখানে বসার কারণ এই যে এখান থেকে উঠোনের ও-পাশের রান্নাঘরটা দেখা যাবে। আর কর্মরত ঠাকুরকেও চোখে চোখে রাখা সম্ভব হবে।

নীলাদ্রিকে দেখে শম্পা উঠে দাঁড়াল।

কী ভাগ্যি! নীলুদা এসে গিয়েছে মা। কোন খবর-টবর না দিয়ে?—বলে মোড়াটা তার দিকে এগিয়ে দিল।

নীলাদ্রি মাসীমাকে প্রণাম করে মোড়ার উপর বসে বলল, খবর না দিয়ে নয়—টেলিগ্রাম করেছিলাম।

তবে বোধ হয় সে টেলিগ্রাম এখনও বাবার ড্রয়ারে ঘুমিয়ে রয়েছে।

মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নাকি একটা খুব বড় পাস দিয়েছ বাবা? সোনার মেডেল পেয়েছ?

এখনও পাই নি। পাব।

তবে তো একটা ভাল চাকরি পেয়ে যাবে এবার।

চাকরি করব না মাসীমা।

তবে কী করবে?

আদর্শ প্রচার।

কী জানি বাবা! বুঝি না তোমাদের ওসব হাল-শনের কথা। আমাদের কালে আমরা দেখেছি, কে প্রথমে একটা চাকরি নিয়েছে, তারপরে একটা ...য় করেছে। তারপর ছেলেমেয়ে হলে তাদের হাতে ...সার তুলে দিয়ে গঙ্গাযাত্রা করেছে।

মাসীমার কিন্তু ফ্যাশন কম নয়। এই বয়সেও তিনি ...টান শাড়ি ঘুরিয়ে কুঁচি দিয়ে পরেন, মুখে স্নো-পাউডার-...জ মাখেন। ঘরের মধ্যে চলাফেরার সময়েও পায়ে ...চলভেটের স্যাণ্ডেল থাকে।

নীলাদ্রি যত জোরে হাসল, শম্পা তার চেয়ে বেশী ...রে হাসল। বাবা-মার শারীরিক স্থূলতা শম্পা এখনও ...য় নি, তবে লক্ষণ দেখে মনে হয় আর কয়েক বছরের ...ধ্যেই তার দেহ চার-ছ গুণ আয়তন লাভ করবে। এ ...ড়িতে এসে নীলাদ্রি তাই বেশ একটু অস্বস্তি বোধ ...রে। সে খর্বকায়, লম্বায় প্রস্থে দু দিক দিয়েই কম। ...টা এ বাড়ির তুলনায় বেশ ফরসা, আর মুখটা বেশ ...টোল বটে, কিন্তু নাক-চোখগুলো ছোট ছোট।

শম্পা বলল, মার সঙ্গে এখন তর্ক করতে বসবে নাকি ...লুদা?

না। যা খিদে পেয়েছে, বরং এক কাপ চা পেলে—

দোহাই তোমার—মার সঙ্গে তর্ক শুরু করো না। ...র চেয়ে আমার ঘরে চল। চায়ের কথা এখন ঠাকুরকে ...া চলবে না। দেখি, ইলেকট্রিক স্টোভে যদি—

মাসীমা প্রশ্নকে দিলেন: শক খাওয়ার জন্যে বুঝি?

না, না, আমি নয়।—শম্পা তাড়াতাড়ি বলল, ...াদেবকে দিয়ে—অবশ্য সে যদি রাজি হয়।

শম্পার সঙ্গে যেতে যেতে নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করল, কই, ...মি তো কোন মন্তব্য করলে না?

কি সম্পর্কে?

আমি যে আদর্শ প্রচার করতে চাই সে সম্পর্কে?

আগে বুঝি তোমার আদর্শটা কী জিনিস। মেয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবার মতলব না আর কিছু? তবে তো মন্তব্য করব।

শম্পার ঘরে এসে ড্রেসিং-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা দেখল নীলাদ্রি। সে অবাক হয়ে দেখল যে তার চুলে বা জামা-কাপড়ের ভাঁজে একটুও বৈলক্ষণ্য ঘটে নি। স্নো-পাউডার মাখা মুখে একটুও ধুলো বা কালির দাগ লাগে নি। এটা সে মোটেই আশা করে নি। তার কেমন যেন মনে হচ্ছিল দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে নিশ্চয়ই তার দেহ ও দেহ-সজ্জা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

একটা ইজিচেয়ারের উপর নিজের দেহকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিয়ে নীলাদ্রি চোখ বুজে একটা তৃপ্তিসূচক নিঃশ্বাস ফেলল। বড্ড ক্লান্তি বোধ হচ্ছে; তার এখন একটু বিশ্রাম দরকার। এ কথা ঠিক, দীর্ঘ ভ্রমণ হলেও সময়ের দিক থেকে মোটেই দীর্ঘ নয়। মোটমাট আড়াই কি তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে। প্লেনে তো থাকতে হয়েছিল মাত্র ঘণ্টাখানেক। তবুও এত ক্লান্তি বোধ করছে কেন সে?

তার কারণ কি এই যে সে একটা দীর্ঘদিনের পরিচিত অভ্যেসকে চিরকালের মত ত্যাগ করে একটি নতুন পরিচিত অভ্যেসের দিকে যাত্রা করেছে? জীবনের একটা অধ্যায়কে সে ফেলে এসেছে, সে অধ্যায়টা ছিল শুধু সারি সারি জীর্ণ মলাট আর হলদে কাগজের বইয়ে ঠাসা। অন্য যে অধ্যায়ে সে চলে এসেছে সেখানে শুধু কাজ। কাজ আর মানুষ। ব্যস্ততা আর সংঘর্ষ। তাই স্বাভাবিক মানসিক উদ্বেগটাই কি ক্লান্তির রূপ নিয়েছে?

তিন

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নীলাদ্রি দারুণ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ল। সকাল ছটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, বেলা বারোটায় ফেরে। স্নান খাওয়া এবং সামান্য বিশ্রামের পর বেলা তিনটের সময় বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে রাত দশটা হয়। মেসোমশাই বা মাসীমার সঙ্গে দেখা প্রায় হয়ই না। তবে শম্পার সঙ্গে দিনে অন্ততঃ একবার করে রোজই দেখা হয়। সে থাকে দোতলায়—শম্পার ঘরের ঠিক পাশের ঘরে। কাজেই দেখা না হয়ে উপায় কি।

বিশেষ করে পরীক্ষা দিতে হবে বলে শম্পা আজকাল একটু বেশী রাত অবধি পড়ে।

শম্পা ইকনমিক্সে অনার্স নেবে। নীলাদ্রি পাস-কোর্সে ইকনমিক্স পড়েছিল মাত্র। তবুও সে যে শম্পাকে কিছু কিছু সাহায্য করতে না পারে এমন নয়। নীলাদ্রি সম্পর্কে শম্পার বেশ ভাল ধারণা হয়ে গিয়েছে। বাবার কাছে তো সে স্পষ্টই স্বীকার করেছে, বাংলার ফার্স্ট ক্লাস হলেও নীলাদ্রি ছাত্র হিসাবে খুব যে খারাপ তা কিন্তু বলা যায় না।

শম্পার মনে নিজের সম্পর্কে ভাল ধারণা সৃষ্টি করতে নীলাদ্রি চেষ্টার ত্রুটি করে নি। এ সব ব্যাপারে অনাবশ্যক বিনয়কে সে প্রশ্রয় দেয় না। সে যে ম্যাট্রিকে ইংরেজীতে ফার্স্ট হয়েছিল, আই. এস-সি. পড়েছিল এবং কেমিস্ট্রীতে লেটার নিয়ে জলপানি পেয়েছিল—তা সে বিস্তারিত ভাবে বলেছে শম্পার কাছে। এম. এ তে ফার্স্ট ক্লাসটা যে সে আকস্মিকভাবে পায় নি তার প্রমাণ সে বি.-এ.তেও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এসব খবর শম্পা এখন জানে।

শম্পার মুখে নীলাদ্রির প্রশংসা শুনে শুনে শিবদাসবাবু এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে তিনি নীলাদ্রিকে সহদেববাবুর নামে একটা পরিচয়পত্র দিয়ে দিলেন। সে পত্রখানির মূল্য যে তার জীবনে কী হতে পারে নীলাদ্রি তখন তা জানত না। সহদেববাবুর নাম সে অবশ্য শুনেছিল। বাংলা দেশের তিনি একজন বিখ্যাত নেতা; কাজেই যে-কোন সংবাদপত্র পাঠকের পক্ষে তাঁর নাম না জেনে উপায় নেই। কিন্তু তিনি এত বিখ্যাত বলেই তাঁকে নিয়ে নীলাদ্রির অসুবিধে। তিনি যখন বিখ্যাত হয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর একটা নির্দিষ্ট বর্ণক্রম আর চিন্তাধারা আছে। তেমন একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার সঙ্গে কি নীলাদ্রি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে? নিজের আদর্শবাদের সঙ্গে তো সে কোনরকম আপস করতে পারবে না। তার পুঁথি-পুস্তক পড়া মগজের মধ্যে আদর্শের একটা সুস্পষ্ট ছক তৈরি হয়ে গিয়েছে; তার অনুচ্ছেদ, অনুচ্ছেদের অনুচ্ছেদগুলো পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং সুনির্ধারিত।

বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটেই সহদেববাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি। জমিদারের ছেলে তিনি। এখন আর জমিদারি নেই বটে, তবে ধান চাষ বা মাছ চাষের উপযোগী বিরাট বিরাট মহলের তিনি মালিক। সে-সবের খবরদারী করার জন্য দস্তুরমত একটি কাছারি ঘর রাখতে হয়েছে বাড়ির বাইরের দিকে। যারা জমিজমার সম্পর্কে তাঁর কাছে আসে না তাদের রিসিভ করার জন্য তাঁর অবশ্য অন্য আর একটি হাল-ফ্যাশনের আসবাবে সজ্জিত ড্রয়িংরুম আছে। কাজেই দিনের পর দিন তাঁর কাছে যাতায়াত করেও অনেকে তাঁর বৈষয়িক দিকটার কথা জানতেও পারে না।

কাজেই নীলাদ্রি যখন সহদেববাবুর বাড়িতে ঢুকল তখন সেও তার সম্পদের উৎস জানতে পারল না। সহদেববাবুর টাকা আছে বুঝতে পেরে অবশ্য সে কিছু মনে করল না। সে সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে এটুকু জানত যে দেশনেতা হতে গেলে টাকা দরকার—তা সে টাকাটা যেদিক থেকেই আসুক। টাকা ছাড়া বড় কিছু করা যায় না এটা বাস্তব সত্য। এবং সে সে-জাতের আদর্শবাদী নয় যারা বাস্তবকে অস্বীকার করে।

কিন্তু সহদেববাবুর ড্রয়িংরুমটা দেখে সেও খুশী হতে পারল না। একজন দেশনেতার যে এত জমকালো ড্রয়িংরুম হতে পারে এটা তার কল্পনায় ছিল না। সে নিজে যে একটু-আধটু বিলাসিতার পক্ষপাতী ছিল না এমন নয়। কিন্তু একজন দেশনেতাকে এতখানি বিলাসী বলে ভাবতে তার যেন রুচিতে বাধল।

তবে শুভ্র খদ্দর-মণ্ডিত সহদেববাবুর দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহের ভারী মুখখানার হাসি নীলাদ্রির ভাল লাগল। দেশনেতার যে উপযুক্ত চেহারা থাকা দরকার এ কথা সে বিশ্বাস করে। নিজের সে রকম চেহারা নেই বলে নিজের উপর সে যথেষ্ট বিরক্তি বোধ করে।

পরিচয়-লিপিখানা পড়ার পর সহদেববাবু বললেন, তুমি ফার্স্ট ক্লাস?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাংলায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শিবদাসবাবু লিখেছেন তুমি অন্য যে-কোন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা দিলে ফার্স্ট ক্লাস পেতে পারতে।

তা হয়তো পারতাম। অন্য যে-কোন বিষয় থেকে বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া বেশী কঠিন।

আমারও তাই বিশ্বাস। তা তুমি চাকরি করবে না?

না।

কেন?

যারাই ভাল ফল করে তারাই চাকরি করতে যায় বলে।

তুমি তো দেখছি দেশ-কালের খবর-টবর রাখ। একেবারে চোখ-কান বুজে থাক না তাহলে!

দেহে যখন চোখ-কান আছে তখন আর সেগুলো ব্যবহার না করি কেন?

বা বা, বেশ কথা! তুমি আমার সংগঠনে যোগ দাও না কেন?

আপনার সংগঠনের নাম কি?

শ্রমিক সভা।

নাম শুনি নি তো!

অল্পদিন হল শুরু করেছি, এখনও নামটা বিশেষ প্রচার হয় নি।

এ রকম অল্পদিনের প্রতিষ্ঠানই আমার পছন্দ। যে প্রতিষ্ঠানের অনেক বয়স হয়েছে সেটা নিজের নিয়মে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে। তাকে আর প্রয়োজনমত বদলানো যাবে না। আপনার আদর্শ কি?

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র।

আমারও তাই।

আমার আদর্শ হচ্ছে শ্রমিককে তার ন্যায্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

খুব ভাল কথা। শ্রমিকরাই সভ্যতা গড়ে। দালান ইমারত মন্দির কলকারখানা—সবই শ্রমিকদের হাতে তৈরি।

তা ছাড়া আমাদের কথা হল—লাঙল যার জমি তার। এর মধ্যে কোন রকম গোঁজামিলের চেষ্টা আমরা বরদাস্ত করব না।

আপনার সঙ্গে আমার চিন্তাধারা হুবহু মিলে যাচ্ছে।

তাহলে?

আমি আপনার সভার সভ্য হচ্ছি।

এই আলোচনার পরেই অবশ্য সহদেববাবু তাকে ছেড়ে দিলেন না। চা-জলখাবারের অর্ডার দিলেন এবং খোশ গল্প শুরু করলেন। তরুণ সম্প্রদায়ের অধোগতি সম্পর্কে নানা রকম বিরূপ মন্তব্য করলেন, বললেন, তরুণ বয়সে আমাদের সামনে একটা আদর্শ ছিল; এ যুগের ছেলেদের সামনে কোন আদর্শ নেই।

কথাটা যে নীলাদ্রি অস্বীকার করে তা নয়; কিন্তু সে প্রতিবাদ করে বলল, তা কেন? আমাকে তো দেখছেন চোখের সামনে।

তুমি ব্যতিক্রম। আর কোন ছেলে ফার্স্ট ক্লাস পেলে এতদিনে সাত শো টাকা মাইনের চাকরিতে গ্যাঁট হয়ে বসে যেত।

নীলাদ্রি খুশী হয়ে হাসল। জলখাবার এল বিবিধ উপচার নিয়ে। চানাচুর থেকে সন্দেশ পর্যন্ত। নীলাদ্রি মনে মনে খুশীই হল। তার মফস্বলীয় পাকস্থলীতে এখনও ভারী ভারী ভাল খাবার বেশ হজম হয়।

নীলাদ্রি বলল, আমি এলে এরকম ভাল জলখাবারের আয়োজন করবেন। তাতে আমি আপত্তি করব না।

দুজনের লঘু হাসির আবহাওয়ার মধ্যে নীলাদ্রি একটা সন্দেশ টপ করে মুখে পুরে দিল। কিন্তু ওমলেটটার দিকে হাত বাড়াতে যাবে এমন সময় একটি মহিলা ঘরে ঢুকলেন। কালো পাড় সাদা শাড়ি পরনে। মাথায় একটু ঘোমটা, কিন্তু কপালে সিঁদুর নেই। অপূর্ব সুন্দরী। বয়স বোধ হয় বছর পঁচিশেকের বেশী হবে না—অর্থাৎ নীলাদ্রির প্রায় সমবয়সী। তাকে দেখতে পেয়ে নীলাদ্রি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। অপরিচিত মহিলার সামনে খাওয়াটা চালিয়ে যাওয়া শহুরে রুচিতে বাধতে পারে এই আশঙ্কায় সে হাত গুটিয়ে নিল।

সহদেববাবু বললেন, এস ললিতা, বস।

মহিলাটি বলল, বসব না। ইস্কুলে যাচ্ছি। আমি বলতে এলাম যে আজকের গভর্নিং বডির মীটিঙে আপনার থাকা দরকার।

কেন?

সেই নিয়োগের ব্যাপারটা আজকে উঠবে সভায়। আমাদের ক্যাণ্ডিডেটের পালটা আর একটি ক্যাণ্ডিডেট দাঁড় করানো হয়েছে। তার আবার কোয়ালিফিকেশন বেশী।

ও! বেশ যাব। সভাটা একটু দেরি করে আরম্ভ

করো। শোন, যেয়ো না। এই ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় করে রাখ। নীলাদ্রি ব্যানার্জী, বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস, আমাদের শ্রমিক-সভার সভ্য হয়েছে। আর এ হচ্ছে ললিতা তালুকদার। হেডমিস্ট্রেস।

হাত তুলে নমস্কার জানাতে জানাতে নীলাদ্রি ভাবল, হেডমিস্ট্রেস যখন তখন নিশ্চয়ই তার বিদ্যার কথা শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে।

কিন্তু ললিতা তার সামনের ভোজ্যগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে প্রথম যে কথাটি বলল তা হল এই: এই পরিমাণ খাবার আপনি এখন খাবেন নাকি?

নীলাদ্রি একটুও অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিল, না তো বলছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো সবটাই খেয়ে ফেলব।

তিনজনেই হো হো করে হেসে উঠল। ললিতা বলল, নমস্কার আপনাকে। এই একটি জিনিস দিয়েই আমি আপনাকে চিনে রাখলুম। আর ভুল হবে না।

হাই হিলের শব্দ তুলে ললিতা দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অগত্যা নীলাদ্রি খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিল।

একটু চুপ করে থেকে সহদেববাবু বললেন, মেয়েটি বড় দুঃখী। বালবিধবা।

ওর আবার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

বলছি তো বিয়ের কথা। রাজি হচ্ছে না।

চার

পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে নীলাদ্রি শ্রমিক-সভার শুধু সভ্য নয়, তার সর্বোচ্চ সংস্থা কার্যকরী সমিতির সভ্য হয়ে গেল। খুব যে নিয়মানুবর্তী পন্থায় এ ব্যবস্থা করা গেল তা নয়। সাধারণ পরিষদের একটি সভ্যপদ খালি ছিল। বাই ইলেকশন করতে গিয়ে দেখা গেল আরও কয়েকজন প্রার্থী আছে ওই পদটির জন্য। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত নীলাদ্রি পেরে উঠবে এমন সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না। অতএব সহদেববাবুকে অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করে অপর প্রার্থীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করতে হল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নীলাদ্রি নির্বাচিত হল সহজেই।

কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচনের ব্যাপারেও একটু গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এখানে কোন সভ্যপদ খালি ছিল না। অতএব সহদেববাবুর লম্বা সুতোর টানে একজন সভ্য হঠাৎ বিনা কারণে ইস্তফা দিয়ে বসল, এবং তার জায়গায় নীলাদ্রির অন্তর্ভুক্তি নির্বিঘ্নেই সমাধা হল।

নীলাদ্রির মনটা একটু যে খুঁতখুঁত না করেছিল এমন নয়। বুঝতে পেরে সহদেববাবু তাকে বলেছিলেন, বাংলার ফার্স্ট ক্লাসের বিবেককে একটু সামলিয়ে রেখ হে নীলাদ্রি। যে কাজ করতে চায় তাকে পন্থা সম্পর্কে অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না।

সহদেববাবুর কথার মধ্যে দুটো তাৎপর্য ছিল। এক, নীলাদ্রি কাজ করতে চায় এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন। আর দুই, নীলাদ্রির কাজের যে মূল্য আছে এ ভরসা তাঁর আছে। এ দুটি তাৎপর্য চিন্তা করে নীলাদ্রির অহমিকা এতখানি তৃপ্তি লাভ করল যে সে তার আহত বিবেককে এক থাবড়া মেরে ঘুম পাড়িয়ে রাখল।

সেদিন রবিবার। বেলা তিনটের সময় শ্রমিক-সভার লোয়ার সার্কুলার রোডের অফিসে কার্যকরী সমিতির সভা বসবে। নীলাদ্রি এই প্রথম কার্যকরী সমিতির বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছে। কয়েক দিন যাবৎ কলকাতায় পুরো বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। বাইরে আকাশে ঘন মেঘের গভীর আস্তরণ; টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্রান্ত। রাস্তায় প্যাচপেচে কাদা; মাথায় ছাতা থাকলেও মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া এসে গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। গাঢ় মেঘের আড়ালে সূর্যদেব যে কোথায় লুকিয়েছেন তা বোঝার উপায় নেই।

এমন আবহাওয়ার মধ্যেও তিনটে বাজার ঠিক দশ মিনিট আগে নীলাদ্রি অফিসে এসে উপস্থিত হল। ভিজে ছাতিটা রাখল ঘরের এক কোণে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

মিনিট পাঁচ-সাতেকের মধ্যে কার্যকরী সমিতির সাতজন সভ্যের মধ্যে ছজন এসে গেলেন। নীলাদ্রি শুনেছিল এঁরা সবাই বিশিষ্ট ব্যক্তি। সভা আরম্ভ হতে মিনিট দুই বাকি ছিল বলে সেক্রেটারী নিদারুণ বসু নবাগন্তক নীলাদ্রির সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সভ্যদের পরিচয় নিম্নরূপ: (১) নিদারুণ বসু বা মিস্টার

এন. সি. বাসু, ব্যারিস্টার। নিখুঁত গ্যাবার্ডিনের স্যুট পরেছেন; চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। গায়ের ফরসা ত্বক এত কোমল আর পাতলা যে মনে হয় যেন চিমটি কাটলে উঠে আসবে। (২) নিখিল সরস্বতী। লেখক। ফরাসডাঙার পাটভাঙা ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি পরেছেন; মুখটায় ব্রণের দাগ বলে পুরু করে পাউডার ঘষেছেন মুখে। চোখে পাঁশনে। কোঁকড়ানো চুল মাথার পিছন দিকে ফুলে উঠেছে। (৩) সুরুচি সরকার। তরুণ ডাক্তার। ইনিও পরিপাটি স্যুট পরে এসেছেন। স্টেথোস্কোপটা গলায় ঝুলছে—সব সময়ই ঝোলে। ডাক্তারীতে পসার হচ্ছে না বলে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য সমিতিতে ঢুকেছেন। (৪) তরুণ তলাপাত্র। তরুণ ব্যবসায়ী। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা করেন। দারুণ বেঁটে আর মোটা নাদুসনুদুস চেহারা। (৫) ললিতা তালুকদার। ইনি আমাদের পরিচিত।

সপ্তম সভ্য স্বয়ং সহদেব বর্মন। সমিতির সভাপতি। এখনও এসে পৌছন নি।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটে বাজতেই সেক্রেটারী নিদারুণ-বাবু বললেন, সভাপতি এখনও এসে পৌছন নি, তবু আমরা এখুনি সভার কাজ শুরু করব। কারও জন্যে সভাকে বিলম্বিত করা আমাদের সমিতির নিয়ম নয়। যতক্ষণ সভাপতি না আসবেন, ততক্ষণ তাঁর চেয়ারটাই প্রতিনিধিত্ব করবে।

একটি ডিম্বাকৃতি চেয়ারের চার পাশে সাতটি চেয়ার পাতা রয়েছে। ছটি চেয়ারে ছজন সভ্য উপবিষ্ট। সভাপতির খালি চেয়ারটির সামনে সেক্রেটারী সভার কার্যক্রম লেখা একখানা খাতা বসিয়ে রাখলেন। পাশেই একটি ছোট টেবিলের সামনে একটি মধ্যবয়সী স্টেনোগ্রাফার নড়েচড়ে উৎকর্ণ হয়ে বসল। সে সভার আনুপূর্বিক বিবরণ সাংকেতিক অক্ষরে লিপিবদ্ধ করবে। তারপর তা যথারীতি টাইপ করা হবে ও সমিতির ফাইলে স্থানলাভ করবে।

সেক্রেটারী বললেন, আজকের সভার সামনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ এজেণ্ডা আছে। এক নম্বর, হনুমানজী জুট মিলের প্রস্তাবিত ধর্মঘট। দু নম্বর, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রস্তাবিত ভুখা মিছিল। আগে প্রথম কর্মসূচি নিয়ে আপনারা আলোচনা শুরু করুন।

ডাক্তার তরুণ তলাপাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি রিপোর্ট দিচ্ছি। এই মিলের ইউনিয়নটি ষোল আনা আমাদের দখলে। শ্রমিকদের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে ধর্মঘটের অনুকূলে।

লেখক নিখিল সরস্বতী প্রয়োজন না থাকলেও চশমাটা খুলে নিয়ে একবার কাপড়ে ঘষে নিয়ে মিহি গলায় বললেন, আমার মনে হয় পুজোর আগে এই সময়টা ধর্মঘট খুব কার্যকরী হবে। মালিকের কাজের তাড়া আছে, সে তাড়াতাড়ি ধর্মঘট মিটিয়ে ফেলতে চাইবে।

ব্যবসায়ী তরুণ তলাপাত্র বললেন, মিলের মালিককে আমি চিনি। খুব পাজী লোক। একটা সামান্য ব্যাপারে একবার আমাকে যা ভুগিয়েছিল! ওর বিরুদ্ধে যে-কোন অ্যাকশন আমি সমর্থন করি।

ললিতা দেবী, আপনার কী মত?—সেক্রেটারী গলার স্বরটা অতিশয় কোমল করে জিজ্ঞেস করলেন।

ললিতা একটু বিব্রত বোধ করে হেসে লাজুক লাজুক ভাব করে বলল, অধিকাংশ সভ্যের যা মত আমারও তাই মত। সংগ্রামই যদি যুক্তিসম্মত বলে বিবেচিত হয়, আমরা সংগ্রাম করব।

সকলে সমবেতভাবে টেবিল চাপড়ে 'হিয়ার হিয়ার' বলে চেঁচিয়ে উঠল। লেখক নিখিলবাবু আবেগের আতিশয্যে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর জামার বাটনহোল থেকে গোলাপ ফুলটি বার করে নিয়ে ললিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, বিংশ শতাব্দীর ঝান্সীর রাণীকে আমি এই সামান্য ফুলটি উপহার দিচ্ছি।

আর একবার টেবিল চাপড়ানোর শব্দ হল।

সেক্রেটারী এবার নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি মত মিস্টার ব্যানার্জী?

নীলাদ্রি এতক্ষণ ধরে চুপচাপ ভাবে জনসভার অগ্রগতি লক্ষ্য করছিল। সকলের উচ্ছ্বাসেও যোগ দেয় নি, টেবিলও চাপড়ায় নি। বলল, দেখুন, আজকে প্রথম দিন আমি কোন মতামত দেব না। আমি শুধু দেখব আর শুনব।

সেক্রেটারী বললেন, তার মানে আপনি নিউট্রাল। তবে তো দেখছি একজন বাদে সকলের মতই ধর্মঘটের সপক্ষে। অতএব—

এমন সময় হঠাৎ ললিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ায়

সেক্রেটারী বিস্মিত হয়ে থামলেন। ললিতা এগিয়ে এসে তাঁর কানে কানে বলল, শুনুন, মিস্টার বর্মন বলে দিয়েছেন যে তিনি না আসা পর্যন্ত যেন সভায় কোন ডিসিশন না নেওয়া হয়।

ললিতা আবার ফিরে গিয়ে তার চেয়ারে বসবার পর সেক্রেটারী তাঁর পুরনো কথার রেশ টেনে শুরু করলেন, অতএব, বন্ধুগণ, আমরা প্রস্তাবের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা শুরু করব। যেমন, শ্রমিকদের দাবিদাওয়া কী হওয়া উচিত সেটা আলোচনা করা দরকার।

সভ্যরা যার যার মত বলতে লাগলেন। দু-একজনের মাত্র বলা হয়েছে, এর মধ্যে বিরাট দীর্ঘ দেহ নিয়ে সহদেববাবু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর গলায় একরাশ ফুলের মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা। সকলে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান জানালেন।

সভাপতির জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে সহদেববাবু ফুলের মালাগুলো টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিয়ে গর্বিতভাবে হেসে একবার সকলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর নীলাদ্রির উপর চোখ রেখে বললেন, নীলাদ্রি এসেছ দেখছি। গুড। কী ভীষণ কাজের চাপ পড়েছে! তিনটে মীটিঙ সেরে তোমাদের এই চতুর্থ মীটিঙে এলাম। একটু দেরি হল কি আর সাধে? জননেতা হওয়ার অনেক ঝামেলা।

সেক্রেটারী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, সার্, সভায় এতক্ষণ ধরে কী কাজ হয়েছে তার রিপোর্ট আপনাকে দিচ্ছি। হনুমানজী জুট মিলে ধর্মঘটের সপক্ষে সবাই একমত। একমাত্র নীলাদ্রিবাবু কিছু জানেন না বলে মতদানে বিরত রয়েছেন।

সভাপতি হাত দিয়ে একটি বিরক্তিসূচক মুদ্রা করে বললেন, না না, এখন ধর্মঘট হতে পারে না। তোমাদের ওসব বাজে কথা রাখ। আমি খোদ মালিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। তাঁর হাতে এখন অনেক অর্ডার, ধর্মঘট-জাতীয় কোন ননসেন্স এখন তিনি সহ্য করতে রাজী নন।

সেক্রেটারী বললেন, কিন্তু সার্, মালিকের কথামত কি আমাদের—

সহদেববাবু রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, শাটআপ! আমার মুখের উপর তোমরা কেউ কোন কথা বলবে না। আমার কথার প্রতিবাদ আমি পছন্দ করি না।

লেখক নিখিল সরস্বতী উঠে দাঁড়িয়ে কোমলতায় প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় বললেন, সার্, শ্রমিকদের দুঃখের কি তবে কোন প্রতিকার হবে না?

সহদেববাবু আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ইডিয়ট। কান্না পায় তো কেঁদে কেঁদে কবিতা লেখ গে যাও। শ্রমিক-আন্দোলনের তুমি কী বোঝ?

এবার উঠে দাঁড়াল তরুণ তলাপাত্র: সার্, পুজোর আগে—

এ কথায় সহদেববাবুর সম্পূর্ণ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। টেবিল চাপড়ে বললেন, স্টপ্ ইট্—আই টেল্ ইউ। যত সব অপর্চুনিস্ট এসে জুটেছে! পুজোর সুযোগ নিয়ে ধর্মঘট করতে হবে—অ্যাঁ? তোমাদের সঙ্গে অত কথা কাটাকাটি করার আমার সময় নেই। লেখ সেক্রেটারী, সভার সর্বসম্মত মত এই যে এখন ধর্মঘট করা যুক্তিযুক্ত হবে না। তার বদলে খুব কড়া ভাষায় আমরা শ্রমিকদের দাবি পেশ করব মালিকের কাছে। তারপর বল—দ্বিতীয় কর্মসূচী কী আছে?

আজ্ঞে, ভুখা মিছিল।—সেক্রেটারী জানালেন।

ওটার আলোচনা এখন মুলতবী থাক। পুলিসের বড় কর্তার সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে। মিছিল করতে গিয়ে পুলিসের লাঠি খেতে পারব না বাবা। আমার নীতি হল—ডুব দিয়ে চান করব, কিন্তু যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজিবে না।

কিন্তু সার্, বত্রিশ টাকা চালের মণ। সাত টাকা সের মাছ—

ননসেন্স! তোমাদের কথা শুনে আমাকে রাজনীতি করতে হবে নাকি? যা বলেছি লিখে নাও।

নীলাদ্রি এতক্ষণ চুপ করে নিশ্চলভাবে সভার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। তার হাত-পা এতক্ষণে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আড়ষ্ট হয় নি। সে এবার সবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ঘোষণা করে এই সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। যে সভায় কারও কোন গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, একজনের মত সকলের

পর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেই সভায় আমি াকি না।

সহদেববাবু ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। তাঁর মুখে যুগপৎ বিস্ময় এবং ক্রোধ।

নীলাদ্রি, তোমার আবার কী হল?

যে সভায় মতামতের স্বাধীনতা নেই, আমি সেখানে াকি না।

স্বাধীনতা নেই?

আমি দেখলাম নেই, আপনি অস্বীকার করলেই নব?

সহদেববাবুর রক্তচক্ষু দিয়ে যেন আগুন ঝরতে লাগল। ার সেই আগুন অনায়াসে উপেক্ষা করে নীলাদ্রি চেয়ার ছেড়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল। উঠে দাঁড়ালেন হদেববাবু সভাপতির আসন ছেড়ে। মেঘের মত ম্ভীর স্বরে হাঁকলেন: নীলাদ্রি, দাঁড়াও।—তারপর গিয়ে গেলেন নীলাদ্রির দিকে—যেন কালান্তক যমের ত। সভার সমস্ত সদস্য থ হয়ে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে ইল সেই দৃশ্যের দিকে। এখুনি কি বজ্রপাত হবে! ীলাদ্রি কি পুড়ে যাবে বজ্রাঘাতে।

বজ্রপাত হল না। তার বদলে শোনা গেল বজ্রের াসি। সহদেববাবু নীলাদ্রিকে জড়িয়ে ধরে হো হো রে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, শাবাশ ইয়ং ্যান্। তোমার মত ছেলেই আমি এতদিন ধরে খুঁজছি, । জোর গলায় নিজের অধিকার দাবি করতে পারে।—ারপর অন্যান্য সদস্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ামি অটোক্র্যাট। তার কারণ আমার দলের সবাই ়ষ। এবার তুমি এসে এদের বুকে একটু জোর দাও ীলাদ্রি। ধর্মঘট সম্পর্কে তোমার কিছু বক্তব্য আছে?

না। নেই। আমি রিয়েলিস্ট। ধর্মঘট যদি না রাই সমীচীন হয় তবে তা না করাই হোক। আমি শুধু গতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলছিলাম।

সভাপতি অভয় দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক ীলাদ্রি। গণতন্ত্র আমার মূলমন্ত্র।

এই নাটকীয় ঘটনার পর সভা আার বেশীক্ষণ স্থায়ী না। সকলের আগে বিদায় নিলেন কর্মব্যস্ত সভাপতি। রপর অন্যান্য সদস্যেরা। যাওয়ার আগে সবাই নীলাদ্রির সঙ্গে করমর্দন করে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন।

নীলাদ্রি দেরি করছিল ললিতার সঙ্গে দু-একটা কথা বলার জন্য। মহিলাটির সঙ্গে সেদিন আলাপ হয়েছিল। ভাল লেগেছিল তার সহজ ব্যবহারটা। আলাপটা ঝালিয়ে রাখা ভাল।

বোধ হয় ললিতারও সেই ইচ্ছে ছিল। এগিয়ে এসে নীলাদ্রির সামনে দাঁড়িয়ে সেই-ই প্রথম কথা বলল, অ্যাংরি ইয়ং ম্যান।

অ্যাংরি! তা হবে। বোধ হয় ওইটেই ঠিক বিশেষণ।

আপনার যদি এখন কোন কাজ না থাকে তবে চলুন না আমার বাড়িতে। আপনাকে দু-একটা জিনিস দেখাব।

আপনার বাড়িতে?

শিবদাসবাবুর বাড়িতে থাকেন তো আপনি? সেখান থেকে আমার বাড়ি বেশী দূরে নয়।

নীলাদ্রি খানিকক্ষণ ভেবে একটু ইতস্ততঃ করে বলল, বেশ, চলুন।

তারা দুজন চলে যাচ্ছিল, এমন সময় পাশের ছোট্ট টেবিলের সামনে বসা স্টেনোগ্রাফারটি—যার অস্তিত্বের কথা কারও কখনও মনে থাকে না, যাকে একটা স্ট্যাচুর চেয়ে বেশী কিছু বলে কেউ কখনও কল্পনা করে না—বলল, মিস্টার ব্যানার্জি, একটু দাঁড়িয়ে যাবেন।

নীলাদ্রি দাঁড়াল: কী ব্যাপার?

আপনার একটা সই দরকার হবে। আসুন এদিকে।

লোকটির পিছনে পিছনে নীলাদ্রি লম্বা ঘরের অপর প্রান্তে একটা আলমারির কাছে উপস্থিত হল। আলমারি খুলে একটি খাতা বের করে খাতার একটা নির্দিষ্ট জায়গা মেলে ধরে লোকটি নীলাদ্রির দিকে এগিয়ে দিল। নীলাদ্রি যখন সই করছে তখন লোকটি বলল, আপনার চেহারাটি খুব সুন্দর।

একজন সামান্য কেরানীর মুখে এ ধরনের মন্তব্য শুনে নীলাদ্রির রাগ হল।

তার মানে?

আমি স্টেজের দিক থেকে বলছি। আপনার মুখখানা

এমন যে সামান্য মেক-আপ করে নিলে যে কোন চরিত্রে আপনি অভিনয় করতে পারবেন।

ধন্যবাদ। আমি অভিনয় করি না।—নীলাদ্রি খাতাখানা ফিরিয়ে দিল।

আমি একজন এক্সপার্ট মেক-আপ ম্যান। আমি মেক-আপ করে যে-কোন লোকের চেহারা পালটে দিতে পারি।

ভাল কথা। তবে এ কথা জেনে আমার কোন লাভ নেই।

মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি বোধ হয় জানেন, থিয়েটার ছাড়া সমাজ-জীবনেও মানুষের অনেক সময় মেক-আপের দরকার হয়। যদি দরকার হয় এ অভাগাকে স্মরণ করবেন।

বলে লোকটি নীলাদ্রির দিকে একখানা কার্ড বাড়িয়ে দিল।

ভদ্রতা হিসাবে নীলাদ্রি কার্ডখানা হাতে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পকেটে রেখে দিল। বলল, ধন্যবাদ। তবে আপনাকে আমার কোনদিনই দরকার হবে না।

ললিতা দরজার কাছে অপেক্ষা করছিল। নীলাদ্রি গিয়ে তার সঙ্গ নিল।

পাঁচ

ললিতা বলল, ন নম্বর বাসে চলুন। তাড়াতাড়ি হবে।

নীলাদ্রির মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। বাসের ভিড় ঠেলতে রাজী হল না। সে একটা ট্যাক্সি করল।

পথে বিশেষ কোন কথা হল না। কথা বলতে ইচ্ছে করল না নীলাদ্রির। যত সে চিন্তা করতে লাগল ততই ললিতার ওপরও তার মন বিরূপ হয়ে উঠল। ললিতা দু-একবার চেষ্টা করল আলাপ জমাতে। যখন বুঝতে পারল নীলাদ্রির আলাপের মেজাজ নেই তখন সেও চুপ করে গেল।

শ্রমিক-সভার কথা চিন্তা করতে গিয়ে নীলাদ্রির মাথা দপদপ করতে লাগল। এত আশা করে কলকাতা এসে এত খোঁজাখুঁজি করার পর সে এ রকম একটা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিল শেষটায়? এটা তো বলতে গেলে প্রকাণ্ড একটা ফানুস মাত্র। প্রকাণ্ড একটা কাগজের ফ্রেম কেরোসিনের ধোঁয়ার জোরে উড়ে চলেছে। এতগুলো শাখা-প্রশাখা যে প্রতিষ্ঠানের তার সর্বোচ্চ সংস্থার একটা ছবি আজ সে দেখতে পেয়েছে। কতকগুলো মেরুদণ্ডহীন মস্তিষ্কহীন লোক শুধু আত্মস্বার্থ সন্ধানের জন্য একটা মানুষের অঙ্গুলীহেলনে চলছে। আর সেই একমেবাদ্বিতীয়মটি কে? স্রেফ সুবিধাবাদী ক্ষমতালিপ্সু একটি লোক। আদর্শশূন্য এই মানুষটার আছে শুধু পর্বতপ্রমাণ ভান আর আশ্চর্য অভিনয়-ক্ষমতা। নীলাদ্রি বিদ্রোহকে পরাভূত করার জন্য শেষকালে যে চালটি তিনি চাললেন তা যে একটি প্রথম শ্রেণীর নিপুণ অভিনয় মাত্র তা বোঝার ক্ষমতা নীলাদ্রির আছে।

আর এই মেয়েটি, এই ললিতা—সেই মহাপুরুষটির হাতের একটি পুতুল মাত্র। মহাপুরুষের স্থাপিত ইস্কুলে সে হেডমিস্ট্রেসগিরি করে। আর যেখানে প্রয়োজন তাঁর ইচ্ছা ও হুকুম তামিল করে। কে জানে অভিভাবকহীনা এই মেয়েটির সঙ্গে মহাপুরুষটির আর কোন সম্পর্ক আছে কিনা! না থাকলে সেটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় হবে।

এই মেয়েটির সঙ্গে এক গাড়িতে বসে যেতে নীলাদ্রি ঘৃণা বোধ হচ্ছিল।

গাড়ি থেকে নেমে ললিতার সঙ্গে তার ইস্কুল-সংলগ্ন কোয়ার্টারে গিয়ে কিন্তু নীলাদ্রিকে আর একবার বিস্মিত হতে হল।

ললিতা তাকে প্রথম যে-ঘরে নিয়ে গেল সে-ঘরে দশ বারোটি দুঃস্থ উদ্বাস্তু মেয়ে চরকায় সুতো কাটছিল।

নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করল, এদের কিরকম রোজগার হয়?

যারা ভাল সুতো কাটতে শিখেছে তাদের দিনে দেড় টাকা থেকে দু টাকা পর্যন্ত রোজগার হয়। কোন ঝামেলা নেই। সমস্ত সুতো সরকার কিনে নিয়ে যান।—ললিতা জানাল।

সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে ললিতা নীলাদ্রিকে নিয়ে এল পাশের আর একটি ঘরে। সেখানে চার-পাঁচটি শিশু একজন ঝিয়ের তত্ত্বাবধানে ঘরময় দৌরাত্ম্য করে বেড়াচ্ছে।

ললিতা বলল, আজ রবিবার বলে মাত্র চার-পাঁচটি বাচ্চা দেখছেন। অন্যান্য দিন বিশ-পঁচিশটি বাচ্চা থাকে

[..]-সব বাচ্চার মায়েরা চাকরি করতে যায় তাদের জন্যে [..]ই ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের পক্ষে অভিনব এই ব্যবস্থা দেখে নীলাদ্রির [..]াখ জুড়িয়ে গেল। একটু আগে ললিতার প্রতি যে [..]রূপ মনোভাব জেগেছিল সেটা অনেকটা কেটে গেল।

বলল, বাচ্চাদের কোন অযত্ন হয় না?

না। আমি যে নিজে সব সময় দেখাশোনা করি। [..]ফিনের সময় এসে দেখে যাই। তা ছাড়া ফাঁক পেলেই [..]একবার আসি। ইস্কুল আর বাড়ি এক জায়গায় হওয়ার [..]বিধা অনেক।

একটি বাচ্চা এগিয়ে এসে নীলাদ্রির জুতোর প্রতি [..]ত্যন্ত মনোযোগী হয়ে পড়ল। নীলাদ্রি হেসে তার [..]াল টিপে দিয়ে আদর করল।

ললিতার কোয়ার্টারে তিনখানি ঘর। তৃতীয় [..]রখানিতে ললিতার গৃহস্থালীর আয়োজন। সেই ঘরে [..]ারা এসে বসল।

ললিতা হিটার জ্বালিয়ে কেটলিতে চায়ের জল বসিয়ে [..]ল। রুটি কেটে তাতে জেলি মাখিয়ে নীলাদ্রিকে [..]তে দিল।

একা থাকেন—একটি ঝি রাখেন না কেন?—নীলাদ্রি [..]জ্ঞেস করল।

তাও আছে। আজ রবিবার বলে তার ছুটি। রাত্রে [..]বশ্য ফিরে এসে আমার কাছে শোবে।

নীলাদ্রির বিস্ময় যেন বাঁধ মানতে চাইছে না। বলল, [..]ত দেখছি—মনে হচ্ছে আপনি এক আশ্চর্য।

আশ্চর্যের কিছু নেই। কাজ জুটিয়ে নিয়েছি। কাজ [..]াড়া তো মানুষ বাঁচতে পারে না। আমার তো কেউ [..]েই—জানেন বোধ হয়। দু বছরের একটি বাচ্চা [..]াছে। তাকে শান্তিনিকেতনে দিয়েছি।

নিজের কাছে রাখেন নি কেন?

এখানে যে তার কোন সঙ্গী নেই। আমি মা হলেও [..]ার আদর-যত্ন করতে পারি, খেলার সাথী তো হতে [..]ারি না।

এই মেয়েটি সহদেববাবুর আশ্রিত বটে। কিন্তু সে [..]ন্যই তাঁর সঙ্গে কোন অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত নয়। না, [..]মন কোন কুৎসিত ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না।

ললিতা চা তৈরি করে নীলাদ্রির সামনে রাখল। নিজেও এক কাপ নিল।

কী ভাবছেন?

আপনার কথা। সত্যি আপনি আশ্চর্য!

আমি অতি সাধারণ মেয়ে—বিশ্বাস করুন। আমি জানি, সহদেববাবুর অনেক দোষ আছে। তবু আমি তাঁকে ছাড়তে পারি না। তিনি যা বলেন তাই করি।

আপনার দোষ কি? আপনি তার কাছে উপকার পেয়েছেন।

ঠিক তাই। আমি কখনও জ্ঞাতসারে তার কোন ক্ষতি করব না। কিন্তু কেন জানি না, আপনাকেও আমার ভাল লেগেছে। আপনার কোন ক্ষতি হয় তাও আমি চাই না।

কোন মানুষই বোধ হয় মিছিমিছি অপরের ক্ষতি চায় না।

শুনুন, যে জন্যে আমি আপনাকে আমার বাড়িতে ডেকে এনেছি। আজকের সভায় আপনি সহদেববাবুর বিরুদ্ধে গিয়ে কাজটা ভাল করেন নি। আমি জানি তিনি সাংঘাতিক রেগেছেন।

তাতে আমার কী এসে যায়? আমি আমার আদর্শের জন্যে সংগ্রাম করে যাব।

জানি আপনি আদর্শবাদী। আপনার কাছে মানুষ হিসাবে মানুষের কোন মূল্য নেই। আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা জানি, দোষেগুণে মানুষ। আমরা দেখি সহদেববাবুর গুণের অন্ত নেই। তাঁর যোগ্যতা আছে, অর্থ আছে, ইচ্ছা আছে। তিনি শতাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। বহু লোক তাঁর কাছে উপকৃত। কিন্তু তিনি চান তাঁর কাছে যারা আসবে তারা তাঁর কথায় উঠবে বসবে। বিরুদ্ধতা তিনি সহ্য করেন না। আর শত্রু হিসাবে তিনি খুব সাংঘাতিক শত্রু।

তিনি যদি আমার শত্রু হতে চান, হবেন। আমি ভয় করি না। তাঁর ভণ্ডামির মুখোশ আমি খুলে দোব।

ক্ষণকালের জন্য ললিতার মুখখানা কালো হয়ে গেল। আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ দেখাল তাকে।

আপনি শ্রমিক-সভা ছেড়ে দিন না কেন নীলাদ্রিবাবু, আপনার যখন পছন্দ হচ্ছে না?

না। শুনুন ললিতা দেবী, আমি মন স্থির করে ফেলেছি। আমি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকব। থেকে এর গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করব।

নীলাদ্রি উঠল। ললিতা তার সঙ্গে বারান্দা পর্যন্ত এল। মুখে সে আর কিছু বলল না। কিন্তু তার যন্ত্রণা-কাতর মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে তার অন্তর অনেক কথাই বলতে চায়। কিন্তু সে জানে, কথা বলে কোন লাভ নেই। নীলাদ্রি কোন কথা শুনবে না।

ফিরতে ফিরতে নীলাদ্রি ভাবল, ললিতা মেয়েটি একটি সুন্দর ফুলের মত। তার মনের পরিমণ্ডলটি ছোট। কিন্তু নিজের পরিমণ্ডলের মধ্যে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সহদেববাবুর নির্দেশে সে অনেক কাজ করে বটে, হয়তো তাঁর অনেক অন্যায় কাজেও সে সায় দেয়, কিন্তু সে-সব কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে তার মনের বাইরের দিককার একটা অগোছাল অংশ। তার আসল মনটি খাঁটি, মালিন্যমুক্ত।

ছয়

'জন্মান্তর' নামে একটি মাসিক কাগজে নীলাদ্রি ইতিমধ্যে কিছু কিছু লিখতে শুরু করেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রকাশিত হয়েছে বলে কাগজটির নাম 'জন্মান্তর'। গুরুগম্ভীর আলোচনা-প্রধান কাগজ বলে কাগজটিকে নীলাদ্রি খুব পছন্দ করে। সম্পাদক তুলসী-বাবুর সঙ্গে সহদেববাবুই পরিচয় করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন এই কাগজে সে যেন শ্রমিক-সভার আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে লিখতে থাকে। সেটা তাদের সংগঠনের 'ইডিওলজিক্যাল' সংগ্রামের একটি অঙ্গ।

তুলসীবাবুর অফিসে নীলাদ্রি মাঝে মাঝে যাতায়াত করত—কখনও আড্ডা দিতে, কখনও লেখা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে। সেখানে ভবানী দত্ত নামে আর একটি তরুণ লেখকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। খুব যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তা নয়। ভবানীর লেখা পড়েও সে যে মুগ্ধ হওয়ার মত কিছু পেয়েছিল তাও নয়। তবু সহগামী লেখক; তার প্রতি খানিকটা প্রীতি ও সদিচ্ছা সে নিশ্চয়ই অনুভব করেছিল।

সেই ভবানী দত্তের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গে[illegible] পথে। চৌরঙ্গীর ভিড়ের মধ্যে সে একটা বৈঠক ক[illegible] ফিরছিল; ভবানী বোধ হয় ফিরছিল একটা সিনেম[illegible] দেখে। সময়টা সন্ধ্যের শোর সিনেমা ভাঙার সময়।

ভবানী তাকে ফুটপাথের একপ্রান্তে নিয়ে গেল যেখান দিয়ে সাধারণতঃ লোকজন যাতায়াত করে না বলল, আপনি বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস। তা ছাড়া আপনি লেখেনও ভাল। তাই অল্পদিনের মধ্যে সাহিত্যি[illegible] মহলে আপনার বেশ কিছু খ্যাতি ও সম্মান জুটেছে। আপনাকে একটা কথা বলব?

বলুন। আমার কোন খ্যাতি না থাকলেও বলতে বাধা ছিল না।

ভবানী হাসল: তা ঠিক। আপনার খ্যাতিটাই বড় কথা নয়। আসল কথা এই যে আপনাকে দেখে মনে হয় মানুষটা আপনি খাঁটি। তুলসীবাবুকে তো আপনি ভালই চেনেন?

'জন্মান্তরে'র সম্পাদক তো? চিনি বইকি।

তাঁর একটা পাবলিশিং কনসার্ন আছে—জানেন বোধ হয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সেই প্রকাশালয় থেকে আমার একখান বই প্রকাশিত হয়েছে। সমস্ত খরচ আমি দিয়েছি বইও প্রায় পাঁচ-ছশো বিক্রি হয়ে গিয়েছে। অথচ লাভে[illegible] অংশ দূরে থাকুক, আমি যা খরচ করেছি তার এ[illegible] পয়সাও তিনি দেন নি।

সে কি! তুলসীবাবুকে তো আমি ভাল লোক বলেই জানতাম।

এমনিতে তিনি লোক ভালই। খুবই অমায়িক কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না টাকাপয়সার সম্পর্কে আসা যায়।

আশ্চর্য তো! আচ্ছা, আমি প্রসঙ্গটা তুলব তুলসী-বাবুর কাছে।

ভবানী তাড়াতাড়ি নীলাদ্রির হাত ধরল: ওই কাজটি করবেন না। কিছু বলবেন তা তাঁকে। তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা।

নীলাদ্রি সে কথায় কান দিল না। একজন সহগামী লেখক, নিজের টাকা খরচ করে বই ছেপেছেন, তিনি

খরচের টাকাটা পর্যন্ত পাবেন না এ কেমন কথা। এরকম তো হওয়া উচিত নয়। তুলসীবাবুর টাকাপয়সার ব্যাপারে এ ধরনের শৈথিল্য থাকলে সেটা তো সংশোধন হওয়া দরকার। তাঁর পত্রিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভাবধারা নিয়ে আলোচনা থাকে। আর সামান্য অর্থের ব্যাপারে এই বদনাম! ছিঃ!

পরদিনই নীলাদ্রি তুলসীবাবুর অফিসে এসে হাজির হল।

কয়েকদিন উপর্যুপরি বৃষ্টি হওয়ার পর সেদিন আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে। সকালবেলা থেকে রোদ পেয়ে পেয়ে রাস্তাঘাট বাড়িঘর শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছে। মেঘ-ভাঙা রোদ গায়ে তীরের মত বিঁধছে; তবু মনে হচ্ছে সূর্যের চেয়ে বড় বন্ধু মানুষের আর কেউ নেই। আকাশে দু-এক টুকরো সাদা মেঘ যেন নির্ভয়ের আশ্বাস।

মনটা ভাল ছিল নীলাদ্রির। অফিসে ঢুকতেই তুলসীবাবু কলরব করে অভ্যর্থনা করলেন। মনটা আরও একটু খুশী হয়ে উঠল নীলাদ্রির।

আসুন আসুন নীলাদ্রিবাবু। আমার চিঠি পেয়ে এসেছেন বুঝি?—তুলসীবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন।

না তো। চিঠি লিখেছেন নাকি আমার কাছে?

গতকাল ডাকে দিয়েছি। আগামী কাল নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।

কী লিখেছেন চিঠিতে?

সম্পাদকেরা যা লিখে থাকেন। লেখা চাই। কঠোর সমালোচনাপূর্ণ চিন্তাশীল একটি প্রবন্ধ।

আমি তো তাই লিখে থাকি।

কাউকে রেহাই দেবেন না। যারা বড় বড় সমাজ-তন্ত্রের বুলি কপচায়, যারা গরীবের নামে মণ মণ কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন দেয়—কাউকে রেহাই দেবেন না।

সম্পাদক হিসাবে তুলসীবাবু সত্যিই খুব সাহসী। যত কড়া ভাষায়ই প্রবন্ধ লেখা যাক তুলসীবাবু ছাপতে ইতস্ততঃ করেন না। অন্যায়ের সমালোচনায় যিনি এত নির্ভীক, তিনি যে কী করে ভবানী দত্তের মত একজন তরুণ লেখকের প্রতি দিনের পর দিন অন্যায় করে চলেছেন তা বোঝা কঠিন।

ভবানী দত্তের কথাটা কি এখন নীলাদ্রি উপস্থাপিত করবে? পৃথিবীতে যত অন্যায় কাজ অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার করা নীলাদ্রির পক্ষে কি সম্ভব?

নীলাদ্রি যতক্ষণ চিন্তা করছিল, ততক্ষণের মধ্যে তুলসীবাবু একখানা চিঠি লিখে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার কিছু টাকা পাওনা আছে নীলাদ্রিবাবু। এই নিন চেক।

এত ভাল মানুষের বিরুদ্ধে নীলাদ্রির কোন অভিযোগ করা কি ঠিক হবে? কিন্তু পরমুহূর্তেই নীলাদ্রির মনে পড়ল অপরের স্বার্থ আর অধিকার রক্ষা করাই তো তার ব্রত। সে যদি নিজের স্বার্থের কথা ভেবে অপরের প্রতি কৃত অন্যায়কে সমর্থন করে, সেটা কি ভাল কাজ হবে?

চেকটা পকেটে ভরে নীলাদ্রি বলল, তুলসীবাবু, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

বলুন। আমি তো শোনবার জন্যেই বসে রয়েছি।

ভবানী দত্ত নামে একজন লেখক আপনার প্রকাশালয় থেকে নিজের খরচায় একখানা বই বের করেছে। কিছু বই নাকি বিক্রিও হয়েছে। অথচ আপনি নাকি একটি পয়সাও দেন নি তাকে?

ভবানী দত্তের বই! ও—হ্যাঁ। ভবানী দত্তের একখানা বই আমি ছেপেছি বটে। আপনি ঠিকই বলেছেন—ভবানীর টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয় নি। ওর বইয়ের অবশ্য একদম বিক্রি নেই।

তা হোক। তবু ওর খরচের টাকাটা অন্ততঃ দিয়ে দেবেন। না হলে আপনার কাগজে আমার লেখা খুবই অসুবিধেকর হয়ে উঠবে।

তুলসীবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে নীলাদ্রির হাত চেপে ধরে বললেন, আর আমাকে লজ্জা দেবেন না নীলাদ্রিবাবু। আপনার কাছে আমি কথা দিচ্ছি, ভবানীর যত অন্যায়ই হয়ে থাক, তার টাকা আমি ফিরিয়ে দেব। আপনার হাতে এখন কি সময় আছে?

আছে। কেন?

তবে চলুন বেরিয়ে পড়ি। একটা রেস্তোরাঁয় চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে।

তুলসীবাবুর এমন অমায়িক ব্যবহারের পর আর তাঁর সামান্য অনুরোধটুকু উপেক্ষা করা যায় না। নীলাদ্রি বলল, চলুন।

দুজনে ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে খানিক দূর হেঁটে গিয়ে একটা বড়সড় গোছের শৌখীন রেস্তোরাঁর ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

এ ধরনের রেস্তোরাঁয় নীলাদ্রি ইতিপূর্বে কোনদিন আসে নি। কাজেই এটা তার কাছে একটা অভিনব অভিজ্ঞতা।

রেস্তোরাঁটির অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখলেই মুগ্ধ হতে হয়। দামী কার্পেটে মোড়া মেঝে, সুদৃশ্য ওয়ালপেপারে মোড়া দেওয়াল, বিচিত্রদর্শন টেবিল-চেয়ার, উর্দিপরা বয়, রঙীন নিওন লাইট, টেবিলে টেবিলে ফুলের তোড়া-শোভিত ফুলদানি—সমস্ত মিলিয়ে এ যেন এক স্বপ্নালু অবাস্তব পরিবেশ। কিন্তু হোটেলের নিজস্ব অঙ্গসজ্জা কিছুই নয়। আসল হল আগন্তুক অভ্যাগতগণ। দামী পোশাক-পরা সুগন্ধিচর্চিত নরনারীদের ভিড়টাই এখানকার আসল আকর্ষণ। এখানে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে নীলাদ্রির ইতিপূর্বে এমন কাছে থেকে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ হয় নি। সাধারণতঃ যাদের সঙ্গে সে মেলামেশা করে এরা তাদের থেকে ভিন্ন গোত্রীয়। এরা রাজনীতি আর সমাজনীতি, আদর্শ আর ব্যভিচার নিয়ে মাথা ঘামায় না। যে রাজ্যে এদের অবাধ আনাগোনা তার নাম—এক কথায়—সুখ।

সেই চিত্র-বিচিত্র সুবেশ নরনারীর মধ্যে নিজেকে একান্ত দীন আর অপাঙ্‌ক্তেয় বলে মনে হচ্ছিল নীলাদ্রির। কখন সে সুন্দরী মেমসাহেবের নগ্ন বাহুর আর নাইলন-শোভিত অপরূপ পাঞ্জাবী মহিলার ভারী নিতম্বের ঠোক্কর খেতে খেতে তুলসীবাবুর পরিচালনায় একটা চেয়ারের নবনীকোমল গদিতে আশ্রয় নিয়েছিল তা তার খেয়ালও ছিল না। তুলসীবাবু একটি বয়কে যে কী কী খাদ্যের অর্ডার দিলেন তাও সে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে নি। কিছুক্ষণের জন্য সে যেন হারিয়ে গিয়েছে এক আশ্চর্য আলোর বন্যায়।

কিছুক্ষণ পরে বয় এসে তাদের সামনে কয়েকটি ডিসে নানারকম অপরিচিত খাদ্য দিয়ে গেল। সেই সব খাবারের দিকে ওরা সবে মনোযোগ দিয়েছে, এমন সময় বয়টি আবার ফিরে এসে ওদের দুজনের সামনে দুটো গ্লাস রাখল, আর একটি বোতল থেকে মেপে মেপে একটা সফেন রঙীন পানীয় ঢেলে দিল।

এতক্ষণ যা কথা বলার তুলসীবাবুই বলে যাচ্ছিলেন, নীলাদ্রি শুধু শুনছিল আর দেখছিল। কিন্তু এবার একটি গভীর সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি দেওয়ায় জিজ্ঞেস করল, এটা কী জিনিস?

বলুন তো কী জিনিস? আপনার তো চিনতে পারা উচিত।—তুলসীবাবু যেন এক গভীর রহস্যের অন্তস্তল থেকে বললেন।

নীলাদ্রি ভয়ে ভয়ে বলল, মদ।

সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস। স্কচ হুইস্কি।

মাপ করবেন তুলসীবাবু। আমি মদ খাই না।

এবার আর নীলাদ্রির কণ্ঠে ভয় নেই, তার নৈতিক চেতনা জাগ্রত প্রহরীর মত জেগে উঠেছে।

সত্যি?

সত্যি।

আশ্চর্য তো। আমি তো ভেবেছিলাম আপনি যখন সহদেববাবুর এত ঘনিষ্ঠ—এ সব জিনিস তো আপনাদের মত লোকের জন্যেই। ঠিক আছে, আমি নিয়ে নিচ্ছি গ্লাসটা।

তুলসীবাবু পান করতে লাগলেন, আর নীলাদ্রি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল স্বল্পবাস কটাচক্ষু হরিণ-নয়না মদালসা নারীদের বিচিত্র ব্যবহার। কেউ মাথা এলিয়ে দিয়েছে পার্শ্ববর্তী সঙ্গীটির কাঁধের উপর। কারও শাড়ির আঁচল খসে পড়েছে, আর সে অঙ্গভঙ্গী করে গান গাইছে। তার সঙ্গীর সঙ্গে মাতাল-কণ্ঠে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে। একটি শ্বেতাঙ্গিনী কোমর দুলিয়ে নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সমাজের অনুশাসন থেকে বেরিয়ে এসে এখানে যেন এই আশ্চর্য নরনারীর দল এক অনির্বচনীয় স্বাধীনতা পেয়ে গিয়েছে। অশালীনতা এখানে একটুও দোষের নয়।

খানিক পরে নীলাদ্রি তুলসীবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখল তাঁর মুখ আরক্ত, চোখ লাল, চোখের মণি ঘুরছে। হঠাৎ তুলসীবাবু এক কাণ্ড করে বসলেন। টলতে টলতে উঠে

দাঁড়িয়ে কম্পিত হাত দিয়ে নীলাদ্রির পা জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন। অসংবদ্ধ ভাষায় বলতে লাগলেন, নীলাদ্রিবাবু, আপনি মহাপুরুষ, আপনি এ যুগেও সুরাদেবীকে স্পর্শ করেন না—এ যে আমি ভাবতেও পারছি না। আপনাকে আমি চিনতে পারি নি—আমাকে মাপ করুন। আমি কথা দিচ্ছি, মেরী মায়ের নামে দিব্বি করছি, ভবানী দত্তের সমস্ত টাকা আমি শোধ করে দেব।

মাতাল হলে মানুষের দেহ-বোধ হয় আরও ভারী হয়। বহু কষ্টে নীলাদ্রি তুলসীবাবুকে টেনে তুলল।

তিন-চারদিন পরে একদিন সকালবেলা ভবানী দত্ত এল নীলাদ্রির কাছে। সে কিছুতেই ঘরে এসে বসতে রাজী নয় বলে অগত্যা নীলাদ্রি রাস্তায় বেরিয়ে এল তার সঙ্গে কথা বলতে।

আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম নীলাদ্রিবাবু।

কী খবর?

তুলসীবাবু আমাকে আমার বইয়ের দুশো আনবাইণ্ডিং কপি দিয়ে বলেছেন ওগুলো বিক্রি করে আমি যেন আমার খরচের টাকা তুলে নিই। তা ছাড়া দুর্নাম রটনা করে আমি তাঁর অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করেছি বলে তিনি আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। এমন কি কোন প্রকাশক যাতে কোনদিন আমার কোন বই না ছাপেন সেজন্য প্রকাশক-সমিতির কাছেও আবেদন জানাবেন।

নীলাদ্রি যেন পাথর হয়ে গেল। খানিক পরে কোন রকমে জিজ্ঞেস করল, ওই দুশো কপি বিক্রি করলে আপনার খরচ উঠবে?

খেপেছেন! খরচের একটা সামান্য অংশ মাত্র উঠতে পারে। তা ছাড়া আগে তো আরও খরচ করে বইগুলো বাঁধাতে হবে। আর বইগুলো বিক্রিই বা করব কী করে? আমার কি বইয়ের দোকান আছে? আমি কি বই কাঁধে করে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াব? একটা উপদেশ দিই নীলাদ্রিবাবু, আর কখনও পরের উপকার করতে চেষ্টা করবেন না।

সাত

উপদেশ শুধু ভবানী দত্তই দিয়ে গেল না। তার আগে তাকে ললিতা উপদেশ দিয়েছিল। তার পরে পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে আরও অনেকে অনেক রকমের উপদেশ তার উপর বর্ষণ করল।

এতকাল ধরে সে মফস্বলীয় নির্জনতায় নিরুপদ্রবে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। বইপত্রের শান্তিময় জ্ঞানান্বেষণের রাজ্যে ডুবে ছিল সারা মন-প্রাণ কেন্দ্রীভূত করে। তার প্রথম শ্রেণীর মেধা আর স্মৃতিশক্তির জোরে সে অনায়াসে অধীত বিদ্যা পরীক্ষার খাতায় উগরে দিয়ে একের পর এক পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে এসেছে। তার কেমন একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে জীবনটা বোধ হয় পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার মতই সহজ।

একজন খ্যাতনামা লেখকের লেখার সমালোচনা করে সে একটি প্রবন্ধ লিখেছিল 'জন্মান্তর' পত্রিকায়। নাম-করা লেখকটির এক ভক্ত একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক কাগজে অশালীন খিস্তির ভাষায় সেই প্রবন্ধের জবাব দিয়েছেন। বিতর্কের গন্ধ পেয়ে খুশী হয়ে নীলাদ্রি সেই পত্রিকাতেই উক্ত জবাবের একটি জবাব লিখে পাঠিয়ে দিল। ভদ্র ভাষায় লেখা যুক্তিনির্ভর আলোচনা। পত্রিকাটিতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হচ্ছে না দেখে একদিন সে গেল পত্রিকার অফিসে।

সম্পাদক অমায়িক হেসে তাকে উপদেশ দিলেন: দেখুন, খ্যাতনামাদের গায়ে থুথু ছিটোবেন না। সে থুথু আপনার নিজের গায়েই এসে লাগবে।

অগত্যা শ্রমিক-সভার কাজে সে সর্বপ্রযত্নে আত্ম-নিয়োগ করল। সংগঠনের বিভিন্ন ফ্রণ্টে সে চরকির মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। শ্রমিক কেরানী ছাত্র সমস্ত মহলেই সে অবাধে যাতায়াত শুরু করে দিল। ব্যক্তিগত আলোচনা, বৈঠক, জনসভা ইত্যাদি নানারকম আয়োজনের সাহায্যে সে নিজের নীতি ও কার্যপদ্ধতি প্রচার করতে লাগল। ব্যক্তিপূজার বিপদ সম্পর্কে সে সকলকে হুঁশিয়ার করে দিল। একনায়কতন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করল। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যে প্রতিমুহূর্তে সজাগ প্রহরা দরকার তা ব্যাখ্যা করল। সকলকে

অর্থনৈতিক সমানাধিকারের দাবি উপস্থিত করতে অনুরোধ জানাল।

নামটা উল্লেখ না করলেও সে আকারে ইঙ্গিতে সহদেববাবুর নীতি ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে যে স্ব-বিরোধ ও সুবিধাবাদ আছে তা প্রকাশ করে বলতে ইতস্ততঃ করল না। অথচ সহদেববাবুর প্রতি তার যে কিছুটা কৃতজ্ঞতা-বোধ ছিল না তা নয়। সহদেববাবু তো ভাল করেই জানেন যে এক হিসাবে সে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ তবু তিনি তাকে নিজের তৈরি প্রতিষ্ঠানের যত্রতত্র যাতায়াতের অবাধ সুযোগ করে দিয়েছেন। এটা কম উদারতার পরিচয় নয়।

একদিন এক বৈঠকে কার্যকরী সমিতির সদস্য তরুণ তলাপাত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তরুণবাবু সকলের সামনে নীলাদ্রির স্বার্থবোধহীন আদর্শবাদের অজস্র প্রশংসা করলেন।

নিজের বক্তব্য পেশ করার সময় তিনি বললেন, বন্ধুগণ, আমি অকপটে স্বীকার করছি যে যদিও আমরা এই সংগঠনে অনেক আগে এসেছি এবং নীলাদ্রিবাবু অনেক পরে এসেছেন, তবু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাদের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। সত্যি বলতে কি আমাদের প্রতিষ্ঠানে এখন সহদেববাবুর পরই নীলাদ্রিবাবুর স্থান।

বৈঠক শেষ হয়ে যাওয়ার পর তরুণবাবু নীলাদ্রিকে একটু নির্জনে ডেকে নিয়ে গেলেন।

কী করছেন আপনি নীলাদ্রিবাবু? সহদেববাবুর বিরুদ্ধে প্রচার করছেন?

কক্ষনো না।

না? এই বৈঠকে তো দেখলাম আপনি একবারও সহদেববাবুর নাম উল্লেখ করলেন না।

নাম উল্লেখ না করলেই কি বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়?

আমরা তাই মনে করি। এ প্রতিষ্ঠান কেন? আমরা আছি কেন? এ-সবের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সহদেববাবুকে সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। আপনি এটুকু বুঝতে পারেন না? অথচ আপনি নাকি ফার্স্ট ক্লাস?

মাপ করবেন। আমার বুদ্ধি একটু মোটা। সত্যিই বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারেন না যে সহদেববাবুকে আমরা যদি একটা হোমরাচোমরা মন্ত্রী বানিয়ে দিতে পারি তবে আমার আপনার অনেকেরই হিল্লে হয়ে যাবে?

কিন্তু আমাদের নীতি, আদর্শ?

তার জন্যে আমার আপনার ভাববার কী আছে। সে নিয়ে আমাদের নেতা ভাববেন। তিনি যা বলে দেবেন আমরা তাই তোতাপাখির মত সর্বত্র বলে বেড়াব।

রাগের তীব্রতায় নির্বাক হয়ে গেল নীলাদ্রি। কে না কে একটা মানুষ, যার মধ্যে এমন কিছু গুণ নেই যাকে শ্রদ্ধা বা ভক্তি করা যায়, সেই মানুষটাকে নেতা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাকে কাজ করতে হবে? এইজন্য সংগঠন গড়ে তোলা? রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে দেশে দেশে প্রচার করে বেড়াব? কিন্তু এ কাজ করে যে আদর্শে সে বিশ্বাস করে সে আদর্শের কতটুকু উপকার হবে?

নীলাদ্রি চুপ করে আছে দেখে কথায় কাজ হয়েছে ভেবে তরুণবাবু অতিশয় সন্তোষ লাভ করলেন। বললেন, চা খাবেন? কাছেই একটা ভাল রেস্টুরেণ্ট আছে।

না। আমার কাজ আছে।—বলে নীলাদ্রি আকস্মিকভাবে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সরে পড়ল।

দু-চারদিনের মধ্যেই নীলাদ্রি লক্ষ্য করল কোন কাজেই আর সে উৎসাহ বোধ করছে না। যে-সব দৈনন্দিন কাজের প্রোগ্রাম থাকে তার সবটা সে পূরণ করতে পারছে না। ক্লান্তি বা অনিচ্ছাবশতঃ অনেক কাজ সে এড়িয়ে যায়, অনেক কাজ নিতান্ত দায়সারাভাবে যান্ত্রিকভাবে সম্পাদন করে। যে স্বতস্ফূর্ততা ও আন্তরিক প্রেরণা নিয়ে সে কাজ শুরু করেছিল, তার বদলে এখন দেখা দিয়েছে একটি কর্মসূচির যান্ত্রিক অনুবর্তন।

নীলাদ্রি লক্ষ্য করে দেখল গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে আত্মসত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু যারাই কোন না কোন ধরনের গণতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে প্রচার করে তাদের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির সত্তাকে শক্তিশালী করা নয়, নিজেদের সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করা। তার ফলে একনায়কতন্ত্রে যেমন দেশের সমস্ত শক্তি একটি কেন্দ্র-বিন্দুতে এসে সংহতি লাভ করে, তেমনি গণতন্ত্রে সেই শক্তি দুই তিন বা চারটি কেন্দ্রবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়।

এ দুয়ের মধ্যে তফাত নিশ্চয়ই আছে, প্রথমটির মত অমনভাবে দ্বিতীয়টিতে মানুষকে পশুত্বে রূপান্তরকরণের প্রচেষ্টা সম্ভব হয় না। কিন্তু শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার অর্থই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিনাশ করা।

শক্তি সঞ্চয়ই যেখানে প্রধান লক্ষ্য সেখানে অনায়াসে আদর্শের বেচা-কেনা ঘটে। সুবিধাবাদ, মিথ্যার সঙ্গে আপস প্রতিনিয়ত চলতে থাকে বাস্তবতার নামে।

বিষয়টা নিয়ে নীলাদ্রি যত গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল তত তার মনে হতে লাগল সে এক দুরারোহ পথযাত্রার ভার নিয়েছে। এই পথযাত্রার পদে পদে বাধা। নিজের ত্যাগস্বীকার তো আছেই, কিন্তু ত্যাগ-স্বীকারের বিনিময়ে লাভ হবে অপযশ অবজ্ঞা ঘৃণা। এবং এতসব বাধা অতিক্রম করে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত কোন লক্ষ্যে পৌছনো যাবে এমন কথা মোটেই জোর করে বলা যায় না।

ভবানী দত্তের সে উপকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার প্রচেষ্টার ফলে বেচারার উপকারের বদলে বরং আরও বেশী অপকার হয়েছে। তেমনি যে আদর্শের সার্থকতা আশা করে সে কাজ করেছে, তার কাজের ফলে সেই আদর্শের আরও ক্ষতি হবে না এ কথা কি জোর করে বলা যায়?

কেন তবে এই ক্ষুরের ধারের মত বিপজ্জনক দুঃখের পথকে বরণ করে নেওয়া! তার চেয়ে তুলসীবাবু সেদিন যে পথটার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিয়েছেন সে পথটা এমন খারাপ কি? বৈজ্ঞানিক সভ্যতা কত অনায়াসে এক পার্থিব অমরাবতী তৈরি করে ফেলেছে। অজস্র অজস্র সুখ সেখানে পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায়। সে-পথটা অবশ্য অনেকের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলের পক্ষে তা অনায়ত্ত নাও হতে পারে।

সেদিন সকাল থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত নীলাদ্রি পথে পথে ঘুরে বেড়াল অস্থিরভাবে। সহদেববাবুর সঙ্গে দেখা করার জরুরী প্রয়োজন ছিল কিন্তু গেল না। তিন-চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্ত সময় নির্দিষ্ট করা ছিল, তাও সে এড়িয়ে গেল। এমন কি শম্পা বলে দিয়েছিল তার জন্ত খানকয়েক সিনেমার টিকিট কিনে আনতে, তার কথাও সে ইচ্ছে করেই ভুলে থাকল।

দু-তিনবার সে সস্তা দামের মধ্যবিত্ত রেস্টুরেন্টে ঢুকে কানাভাঙা কাপে তিন-চারবার সেদ্ধ-করা পাতার চা খেল। সেই চায়ের বিকৃত স্বাদে বমি আসছে দেখে সে দু-একখানা নোন্‌তা বিস্কুট নিল। বিস্কুটে একবার করে কামড় দেয় আর এক চুমুক করে চা গিলে ফেলে। এমনি ভাবে এত কষ্ট করে সে চা খেল শুধু স্নায়ুমণ্ডলীকে সচল রাখার জন্ত।

আহারের সময় যখন উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তখন এক পাঞ্জাবী রেস্টুরেন্টে ঢুকে রুটি মাংস চেয়ে নিল। যেমন নোংরা পরিবেশ, তেমনি নোংরা প্রকৃতির লোকেরা সেখানে খাচ্ছে বা খাদ্য পরিবেশন করছে। মাছি আর মানুষ একই পাত্র থেকে খাবার তুলে তুলে নিচ্ছে। একবার ভাবল বেরিয়ে যাবে, আবার ভাবল, মনের জোর থাকলে মানুষ সবই পারে। অতএব নিজের মনের জোরের প্রমাণ দেওয়ার জন্ত সে সেই ঘৃণ্য পরিবেশের মধ্যে বসে সেই রসুনের গন্ধযুক্ত মাংসও খেয়ে ফেলল অনেকখানি।

সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সে মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারল। তার মনের এই বর্তমানের অস্থিরতাটা ভাল নয়। এই অস্থিরতার দরুন নানা রকম বিকৃত চিন্তা তার মনে জন্মলাভ করছে। এর প্রতিকার সম্ভব যদি সে উপযুক্ত সাহচর্য এবং পরিচর্যা লাভ করে। আসল কথা এতবড় কলকাতা শহরে সে একা। সাংগঠনিক প্রয়োজনে যাদের সঙ্গে সে মেশে তাদের মধ্যে বন্ধু হওয়ার মত একজনও নেই। যে বাড়িতে আছে, তারা কেউ ওকে বুঝতে পারে না। শম্পা থাকে বটে ওর পাশের ঘরে, বয়সে সে মাত্র দু-তিন বছরের ছোট, কিন্তু মনের দিক থেকে সে অন্ততঃ বিশ-ত্রিশ বছরের ছোট।

তার একজন সঙ্গিনী দরকার এ কথা মনে হতেই একটি বিশেষ মেয়ের মুখ তার মনের আয়নায় ভেসে উঠল। সে মুখ ললিতার। ইতিমধ্যে আরও দু-চার বার ললিতার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। আলাপ করে মনে হয়েছে ললিতা তাকে নিছক অনেক মানুষের মধ্যে একটি মানুষ বলে মনে করে না। আর নিজের দিক থেকে সে বলতে পারে, কলকাতায় এসে একটি মানুষকেই সে শ্রদ্ধা করতে পেরেছে—যার নাম ললিতা।

ললিতার ইস্কুলে যখন নীলাদ্রি এসে পৌছল তখন

বেজে তিনটে। তার চুল উস্কখুস্ক, পোশাক অবিন্যস্ত। হিসাব করে দেখল ললিতার ইস্কুল ছুটি হতে এখনও অনেক দেরি। এতক্ষণ অপেক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা ললিতার কোয়ার্টারে গিয়ে যে-সব মেয়ে চরকায় সুতো কাটছিল তাদের একজনকে পাঠাল ললিতাকে ইস্কুল থেকে ডেকে আনার জন্য।

ললিতা এসে দেখল নীলাদ্রি ঝোড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে তার ঘরে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার নীলাদ্রিবাবু! এমন অসময়ে! দেখে তো মনে হচ্ছে স্নানাহার কিছু হয় নি?

নীলাদ্রি বলল, ও-সব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এখন থাক ললিতা দেবী। আমি একটা বিশেষ জরুরী কথা বলার জন্যে এসেছি আপনার কাছে। আপনি গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। আপনি জানেন বৈধব্য-প্রথা, জাতি-ভেদ, নারীর পুনর্বিবাহ-বিরোধী মনোভাব—এ-সব জিনিস-গুলো অগণতান্ত্রিক এবং অবৈজ্ঞানিক। কাজেই আপনার পক্ষে এখন বিবাহ করা একটি অত্যাবশ্যক বৈপ্লবিক কর্তব্য। আপনার এই কর্তব্যপালনে আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি। কারণ আমি আপনাকে ভালবাসি বলে আপনাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক।

ললিতা শুধু একটু হাসল। নীলাদ্রির কপালে দু-চার বিন্দু ঘাম জমেছে দেখে সে পাখাটা খুলে দিল। তারপর বলল, আমি বলি কি, এখানে বাথরুম আছে, আপনি চান করে কিছু খেয়ে নিন।

সে-সব পরে হবে। আগে আমার প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার মত বলুন।

ভাবতে সময় দেবেন না?

না। ভাবা আপনার হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু বলাটা বাকি।

ললিতা আবার হাসল। এবারের হাসিতে যেন একটু লজ্জার আভাস আছে।

আপনি ঠিকই বলেছেন নীলাদ্রিবাবু। ভাবা আমার হয়ে গিয়েছে। এ প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি না।

তার কারণ কি এই যে আপনি আমাকে ভালবাসেন না?

আপনাকে ভালবাসি কি না ঠিক জানি না তবে এটুকু জানি, যে-সব পুরুষকে আমি দেখি, তাদের মধ্যে যদি কাউকে ভালবাসা যায়, তবে সে আপনাকে।

তাহলে আপনার বিয়েতে আপত্তি কেন?

নীলাদ্রিবাবু, আমি দুর্বল। আদর্শের জন্যে সমাজের বিরূপতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আমার শক্তি নেই। আর কেউ যদি এরকম বিয়ে করে আমি তার হয়ে সমাজের বিরুদ্ধে লড়ব, কিন্তু নিজে এ রকম বিয়ে করতে পারব না।

বুঝেছি।—বলে নীলাদ্রি উঠে পড়ল।

নীলাদ্রিবাবু, অনুরোধ করছি, স্নানাহার না সেরে যাবেন না।—ললিতা বলল।

কিন্তু নীলাদ্রি ততক্ষণ দরজা পার হয়ে গিয়েছে। হনহন করে চলতে চলতে পিছন ফিরে না তাকিয়ে শুধু বলল, মাপ করবেন।

আট

সন্ধ্যা ছটার সময় ধর্মতলা স্ট্রীটের একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে লাইটপোস্টের আলোয় কার্ডের নম্বর আর বাড়ির নম্বরটা মিলিয়ে দেখল। দুটি নম্বর মিলে গেল দেখে খুশী হল। কার্ডে যে নামটা লেখা আছে সে-নামটা একবার মনে মনে উচ্চারণ করল। যাতে নামটা মনে থাকে। নামটা হল—সুধীর মুস্তফী।

বাড়ির ভিতর ঢুকে সন্ধান করতে করতে চারতলায় এসে সে একটি বন্ধ ঘরের দরজায় টোকা মারল। একটি লোক দরজা খুলে দিলে ঘরের আলোয় সে দেখতে পেল যে শ্রমিক-সভার স্টেনোগ্রাফারটি তার সামনে দাঁড়িয়ে।

লোকটির পিছনে পিছনে নীলাদ্রি ঘরে ঢুকল। সে ঘরে টেবিল চেয়ার বা অন্য কোন রকম আসবাবপত্র নেই। মেঝেতে কার্পেট পাতা, এবং তার উপর অঙ্গ-সজ্জার সহস্রবিধ উপকরণ স্তূপাকার করে ছড়ানো রয়েছে।

লোকটি বলল, বসুন।

নীলাদ্রি বসে পড়ে বলল, চিনতে পারছেন?

লোকটি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি রকম মেক-আপ দরকার ?

নীলাদ্রি একটু চিন্তা করে বলল, ধরুন, একজন ব্যবসায়ীর মত চেহারা হবে। অথচ চেহারায় এমন কিছু থাকবে যা মেয়েদের আকৃষ্ট করে। আর—

আর দরকার নেই। বাকিটা আমার ইম্যাজিনেশনের ওপর ছেড়ে দিন। মিনিট পনের আপনি নিজেকে আমার হাতে পুরোপুরি সমর্পণ করুন। তারপরে আয়না নিয়ে দেখবেন নিজেকে নিজে চিনতে পারেন কিনা।

খানিকক্ষণ পরে সাজ-সজ্জা হয়ে যাওয়ার পর নীলাদ্রি দেওয়াল-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল। আয়নায় যার চেহারা দেখা যাচ্ছে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোক। সুদৃশ্য চকচকে গ্যাবার্ডিনের স্যুট-পরা অল্প গোঁফ-শোভিত এক ধনীর দুলাল যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখের রেখায় এক ভোগী অহঙ্কারী আর আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে।

মুস্তফী জিজ্ঞেস করল, খুশী হয়েছেন ?

হ্যাঁ। কত দিতে হবে ?

এখন আর কী দেবেন ? আগে আপনাকে তৈরি করে দিই, তবে তো। বরং আপনার টাকার দরকার থাকে তো বলুন।

নীলাদ্রির তখন খেয়াল হল তার সঙ্গে যা টাকা আছে তা পর্যাপ্ত নয়।

ভাল কথা মনে করেছেন মিস্টার মুস্তফী। আমার সঙ্গে টাকা বেশী নেই।

মুস্তফী রহস্যজনকভাবে একটু হাসল। তারপর তার অজস্র জিনিসপত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে একটা ব্যাগ বার করল। ব্যাগ থেকে অনায়াস তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একশো টাকার একখানা নোট বার করে নীলাদ্রির হাতে দিল।

রসিদ দিতে হবে না ?—নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করল।

অনাবশ্যক। ভয়ের কি আছে ? আমার কাছে তো আপনাকে আবার আসতে হবে।

বোধ হয় আর আসতে হবে না। আমি শুধু এক রাত্রির জন্য একটা পরীক্ষা করছি।

মুস্তফী মৃদু একটু হাসল।

যদি তা হয় তবে সেটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় হবে।

মুস্তফীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নীলাদ্রি রাস্তা দিয়ে বুক টান করে বীরের মত হাঁটতে লাগল। তুলসীবাবুর সঙ্গে যে রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিল সেখানে এসে উপস্থিত হল। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সত্যিকারের শহুরে কাপ্তেনের মত রেস্তোরাঁয় কোলাপসিব্‌ল্ গেটের উপর হাতের ভর রাখল। একমুহূর্তের জন্য তার মনে একটু আশঙ্কার ভাব দেখা গেল। কারণ ঠিক সেই সময়ই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদেরই প্রতিষ্ঠানের একটি ছেলে। ছেলেটি তার দিকে একবার তাকিয়েও দেখল। তারপর সে যেমন যাচ্ছিল তেমনই ভাবে চলতে লাগল। তার মুখের রেখায় সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য না করতে পেরে নীলাদ্রি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, সে এখন সত্যি সত্যি আর একটি আলাদা মানুষ হয়ে গিয়েছে।

হলের ভেতর ঢুকেই দেখতে পেল তুলসীবাবু তিন-চার-জন সঙ্গী নিয়ে একটা টেবিলের চারপাশে জাঁকিয়ে বসে আছেন। তার দিকে তুলসীবাবু একবার তাকালেন বটে, কিন্তু মুখে কোন পরিচিতের হাসি ফুটে উঠল না।

ফাঁকা দেখে একটা টেবিলের সামনে সে বসল। বয় কাছে আসতেই বলল, স্কচ হুইস্কি।

অর্ডার নিয়ে বয় চলে গেল। নীলাদ্রি এবার চারদিকে তাকিয়ে সেই মর্ত্যের অমরাবতীকে নির্নিমেষনেত্রে দেখতে লাগল। টেবিলে টেবিলে শৌখীন নরনারীর দল প্রজাপতির মত রঙীন ডানা বিস্তার করে বসে রয়েছে। তাদের গা থেকে ভেসে আসছে অপূর্ব সুন্দর ফুলের মৃদু সুবাস। তাদের হালকা হাসি, পরিশীলিত বাচনবিন্যাস যেন পৃথিবীতে এক অপার্থিবের ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে।

সেদিন নীলাদ্রি তুলসীবাবুর সঙ্গে এ রাজ্যে এসেছিল এক আগন্তুক হিসাবে—অনধিকার প্রবেশকারীর মত। আজ সে এসেছে এই রাজ্যেরই একজন অধিবাসী হিসাবে—স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে।

এখানে পয়সা দিয়ে সুখ কেনা যায়। পয়সা দিয়ে সে সুখ কিনবে। মানুষের আয়ত্তের সর্বোচ্চ সুখ সে ভোগ করবে বিনা দ্বিধায়। ক্ষুরের ধারের মত কঠিন ব্রতের পথ ত্যাগ করে সে এখানে পালিয়ে এসেছে দেহের অতৃপ্ত

কামনাগুলোর সহজলভ্য পরিতৃপ্তির জন্ম। নিজেকে সে বঞ্চিত করবে না। কেন করবে?

বয় একটি আশ্চর্য রমণীয় বোতল নিয়ে এসে রঙীন পানীয় মেপে মেপে ঢেলে দিতে লাগল গ্লাসে। দু পেগ ঢালা হয়ে গেলে নীলাদ্রি তাকে থামতে বলল। তারপর ইশারায় তাকে মাথা নীচু করতে বলে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, জেনানা মিলেগা?

বয় কী বুঝল সেই-ই জানে। কেবল সে মাথা নেড়ে চলে গেল। খানিক পরে একটি ব্লাউজ আর খাটো স্কার্ট-পরা মেয়ে অর্ধ-উন্মোচিত বক্ষদেশকে প্রদর্শনী করে দেহের অতিবিস্তৃত মধ্যপ্রদেশকে এপাশে-ওপাশে দোলাতে দোলাতে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। তির্যক চোখে বারকয়েক সে নীলাদ্রির হৃৎপিণ্ডকে মদির-কটাক্ষে ভেদ করতে চেষ্টা করল। পারল না।

তারপর এল একটি শীর্ণ-দেহা গোরী পাজামা আর আঁট-সাঁট পাঞ্জাবি পরে বল্লরী দেহকে সর্পিল ভঙ্গিমায় হিল্লোলিত করে। সেও নীলাদ্রিকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার মনে কোন সাড়া জাগাতে পারল না।

এর পর একটি শাড়ি-পরা মাঝারি গড়নের মেয়ে এল। গায়ে মাটির মত মিষ্টি রঙ। সে হেঁটে এল সোজাসুজি। নীলাদ্রির দিকে সে চোরাগোপ্তা কটাক্ষ-শর নিক্ষেপ করল না। সোজাসুজি পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। নীলাদ্রি হাতের ইশারায় তাকে ডাকতেই সে একটা চেয়ার কাছাকাছি টেনে এনে নীলাদ্রির গা ঘেঁষে বসল। কোমল মাংসল হাতখানা দিয়ে সে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে বলল, ডিয়ার, আমাকে একটা পেগ খাওয়াবে না?

ডিয়ার বলবে না আমাকে।—নীলাদ্রি রুক্ষ গলায় বলল।

তবে কী বলব?

হিমানীশ। আমার নাম হিমানীশ।

আচ্ছা বেশ। হিমানীশ, আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

এত গা ঘেঁষে বসবে না। আর একটু সরে বস।

মেয়েটি নীলাদ্রির কঠিন কণ্ঠস্বরে যেন একটু শঙ্কিত হল। তাড়াতাড়ি একটু সরে বসল।

খানিক পরে তারা দুজন যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন নীলাদ্রি মেয়েটির কাঁধের উপর মাথার ভার রাখল। মেয়েটিও বেশ মাতাল হয়েছে, তারও পা কাঁপছে; কিন্তু সে যথেষ্ট অভিজ্ঞ বলে নীলাদ্রির কোমর বেষ্টন করে ধরে তার ভার বহন করে নিয়ে গেল ঘরের বাইরে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বোধ হয় মেয়েটির পা একটু ফসকে গিয়েছিল; তাড়াতাড়ি নিজেকে সে সামলে নিল। আর তাইতেই নীলাদ্রি রেগে গিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ইডিয়ট।

নীলাদ্রির অপরিচিত পাকস্থলীতে দু-তিন পেগ আসল জিনিস পড়েছিল। কাজেই নেশা হয়েছিল খুব। মনে হচ্ছিল এই কোলাহলমুখর বর্ণাঢ্য জনসমাবেশের মাঝখানে থেকেও কোন্ এক আশ্চর্য উপায়ে সে যেন অনেক দূরে চলে গিয়েছে; এবং দূরের সেই নিঃসঙ্গতার অন্তঃপুর থেকে তাকে যেন বেশ চেষ্টা করে দূরবীনের সাহায্য নিয়ে বাস্তবের উপর নজর রাখতে হচ্ছে।

মনে মনে সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে এরই নাম সুখ। এ জিনিসটা সুখ বলেই এর জন্যে লোকে এত পয়সা খরচ করে।

একটা ট্যাক্সিতে করে মেয়েটা তাকে নিজের আস্তানায় নিয়ে এল। পার্ক স্ট্রীটের একটা বেশ প্রকাণ্ড ধরনের বাড়ির দোতলায় মেয়েটির ঘর। নীলাদ্রি অনুমান করল এই গোটা বাড়িটাই হয়তো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়।

ঘরের মধ্যে একটি হাল-ফ্যাশনের খাটের উপর পুরু গদির বিছানা। এবং সেইটেই এ ঘরের প্রধান আসবাব। তা ছাড়া আছে একটি চেয়ার, এবং একটি ছোট্ট টেবিল—বোধ হয় মদ্যপানের ব্যবস্থার জন্ম।

মেয়েটি ওকে বিছানার উপর বসিয়ে দিয়ে কাত হওয়ার জন্ম একটা মোটা বালিশ এগিয়ে দিল। পরে লাইট জ্বালল, ফ্যান চালিয়ে দিল। তারপর মাথার চুলটা ঠিক করতে করতে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমার নাম মেরী। আর কিছু ড্রিংক দরকার থাকে তো বলুন।

উত্তরে নীলাদ্রি নিতান্ত আকস্মিক ভাবে মেয়েটির গালে একটা চড় কশিয়ে দিল। মেয়েটি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর বলল, কেন মারলেন? কী দোষ করেছি?

নীলাদ্রি এবার তার অপর গালে আর একটি চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, এমনি মারলাম, রাগ করে নয়। আমি তো তোমাকে পয়সা দিয়ে কিনেছি। ইচ্ছে করলে মারতে পারি। তাই মারলাম।

আসলে রাগ করেই সে মেয়েটিকে মেরেছিল। কত অল্প দামে মেয়েটি নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছে এই কথা ভেবে তার মাতাল মস্তিষ্ক হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সে আশা করেছিল মার খেয়ে মেয়েটি নিশ্চয়ই বাইরে থেকে তার অনুগত লোকজন ডেকে আনবে। তখন সে পকেটে যে কটা টাকা আছে তা তাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসবে ঘর থেকে।

কিন্তু মেয়েটি কাউকে ডাকতে গেল না ঘরের বাইরে। তার বদলে সে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। নিওন লাইটের সাদা-উজ্জ্বল আলোয় নীলাদ্রি দেখল চোখের জলের নিঃশব্দ ধারার সঙ্গে চোখের কাজল, গালের স্নো-পাউডারের পুরু আস্তরণ গলে গলে পড়ছে। তারপর যখন তার চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি, গালের স্বাভাবিক ত্বক বেরিয়ে পড়ল, তখন সে দেখতে পেল অতখানি অ্যালকহল পানের উত্তেজনাসত্ত্বেও সে দৃষ্টি কী নিষ্প্রভ, গালের ত্বক কী পাণ্ডুর! অ্যালকহলের দরুন তার ঠোঁটের কাঁচা রঙও খানিকটা উঠে গিয়েছিল। সে ঠোঁট যেন কশাইয়ের দোকানের বাসী পচা মাংসের দুটি টুকরো।

আর তখন নীলাদ্রির মনে হল একটু আগে সে ভুল ভেবেছিল। আসলে এ মেয়েটি নিজেকে বিকিয়ে দেয় নি। সকলে তাকে সস্তায় কিনতে চেয়েছিল; আর সকলকেই সে দিয়েছে বস্তুর তৈরি একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্র—যার নাম দেহ। দেহের পিছনে যে আত্মাটি থাকে, সে আত্মাকে সে দেয় নি কারও হাতে। দেহ আর আত্মার মধ্যে সে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে বলে তার আত্মা রয়েছে উপবাসী। আর তার দেহ আত্মার পরশের অভাবে হয়ে গিয়েছে প্রাণহীন—নিছক জড় পদার্থ। সে দেহে কোন কামনা নেই, কোন উত্তেজনা নেই, কোন ভাবাবেগ নেই; আছে শুধু বেঁচে থাকার এক অর্থহীন জৈবিক আকুতি।

মেয়েটি দাঁড়িয়েই রইল। কাজেই তার সঙ্গে কথা বলতে হল নীলাদ্রিকে; তাকে জমাতে হল।

নয়

সারা রাতের অনুপস্থিতির পর ভোরবেলায় বাড়ি ফিরে নীলাদ্রি শম্পাকে বলল, খুব জোর বেঁচে গিয়েছি শম্পা। একটা লোককে খুন করতে করতে খুন না করে পালিয়ে এসেছি।

শম্পা জানত ঠাট্টাকে পরাজিত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল তাকে স্বীকার না করা। কাজেই নীলাদ্রির কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে কয়েকবার টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার গা দিয়ে কেমন একটা অচেনা গন্ধ বেরুচ্ছে নীলুদা! কি খেয়েছেন বলুন তো?

নীলাদ্রি বলল, মদ।—কিন্তু এত অনায়াসে বলল যে শম্পা মনে করল ঠাট্টা।

তাড়াতাড়ি স্নান এবং প্রাতরাশ শেষ করে নীলাদ্রি বেরিয়ে পড়ল। এখন আর রাত্রি জাগরণের দরুন কোন ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না। অনেকগুলো কাজ করার আছে আজ। নীলাদ্রি সেগুলোরই হিসাবনিকাশ করছিল মনে মনে। কোন্ কাজে কতটুকু সময় দেওয়া যাবে, পথে পথে কতটা সময় নষ্ট হবে, তার একটা হিসাব কষছিল। ক্লান্তির কথা আর মনে ছিল না। আকাশ পরিষ্কার দেখে খুশী হয়ে ভাবল প্রকৃতিদেবী আজ তার কাজের ব্যাপারে অপোজিশনের ভূমিকা নাও নিতে পারে হয়তো।

আজ কাজ করতে ভারি ভাল লাগছে নীলাদ্রির। যেন নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছে সে। কাজের মধ্যে যে একঘেয়েমি, যে যান্ত্রিকতা গত কয়েকদিন ধরে তাকে পীড়া দিচ্ছিল আজ আর সে-সবের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। কাল মনে হচ্ছিল, তার কাজের কোন মানে নেই; আজ মনে হচ্ছে, তার কাজ মরা গাঙে জোয়ার আনবে।

শীগগিরই সে কাজের একটা নতুন ফরমুলা বের করে ফেলল। ফরমুলাটা অবশ্য আপসের—আদর্শের সঙ্গে বাস্তবনীতির আপস। মুখে মুখে সে এখন সহদেববাবু সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যাজস্তুতি উচ্চারণ করতে লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গে আলোচনার মধ্যে এনে সে সহদেববাবুর নীতি আর পদ্ধতির মধ্যে যে প্রতারণা রয়েছে তাই

উদ্ঘাটিত করতে লাগল। সে বলে বেড়াতে লাগল দেশের চিন্তাধারার উপর যদি শ্রমিক-সভা দারুণভাবে আঘাত করতে চায় তবে তার আমূল পরিবর্তন দরকার। গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র শুধু দুটি সুন্দর কথামাত্র নয়, সেগুলো জীবনে অভ্যাস করতে পারলে তবেই মূল্যবান।

কিন্তু কয়েকদিন কাজ করার পর নীলাদ্রির মন আবার নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। তার মনে হতে লাগল মিছিমিছি সে মিথ্যার সঙ্গে আপস করে চলেছে। আপস করতে গিয়ে আসলে সে মিথ্যাকেই প্রতিষ্ঠা-লাভে সাহায্য করছে। দৈনন্দিন রুটিন আবার মনে হতে লাগল নিছক একঘেয়ে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি।

আসলে গণতন্ত্র একটা অসম্ভব স্বপ্নমাত্র। জীবনে তাকে কখনও আয়ত্ত করা যায় না। চেষ্টা করার অর্থ হচ্ছে শুধু নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করা। আসলে আমাদের জীবনযাত্রা সেই ক্রীতদাস যুগের মডেলকেই অনুসরণ করে চলেছে। জীবনের ষোল আনা কাজে—বাড়িতে, ইস্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে, কলকারখানায়, সভা-সমিতিতে, এমন কি নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনায় আমরা নিরন্তর অপরের আদেশ মেনে চলছি, অপরের দাসত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি। ক্রীতদাসরা কি আমাদের চেয়ে বেশী দাসত্ব করত কোনদিন!

মনের পুঞ্জীভূত ক্লান্তি আর বিরক্তি নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় নীলাদ্রি আবার এল ধর্মতলা স্ট্রীটের সেই মেক-আপ ম্যান এস. মুস্তফীর ঘরে।

মিস্টার মুস্তফী, আজ আমাকে আবার একটু মেক-আপ করে দিন।

আর কোনদিন আসবেন না বলেছিলেন যে?

শুধু আজকের দিনটা। আর কোনদিন আসব না।

মুস্তফী হাসল। তারপর তাকে অবিকল আগের দিনের মত করে সাজিয়ে দিল। আজও সে কিছু টাকা ধার দিল।

সেখান থেকে বেরিয়ে নীলাদ্রি প্রথমে এল তার সেই পূর্ব-পরিচিত রেস্তোরাঁয়। সেখানে এক পেগ হুইস্কি নিয়ে মেরীর খোঁজ করল। মেরী সেদিন আসে নি শুনে সোজাসুজি তার পার্ক স্ট্রীটের আস্তানায় এল। সেখানে মেরীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মেরী সামনে এসে দাঁড়াতেই নীলাদ্রি বুঝতে পারল সে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট মদ খেয়েছে। অর্থাৎ তার ঘরে অতিথি এসেছিল। একবার ভাবল, ফিরে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল, ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। মেরীকে তার প্রয়োজন।

মেরীর কাছে সারারাত কাটিয়ে প্রায় সকালের দিকে ফিরে যেতে যেতে তার মনে হল মদ আর মেয়েমানুষে সুখ পাওয়া যায় এটা মানুষের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি অপপ্রচার মাত্র। প্রচার সব সময়ই মিথ্যা বা অর্ধসত্য মাত্র—এটা মানুষ জানে, তবু সে প্রচারে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মানুষ সুখের সন্ধানে মদ আর মেয়েমানুষ খোঁজে।

এই মিথ্যাটাকে মানুষ বিশ্বাস করে আরও এই কারণে যে মদ আর মেয়েমানুষ নিষিদ্ধ বস্তু। ভগবান নাকি মানুষের জন্মলগ্নেই বলে দিয়েছিলেন, সুখ চেয়ো না। সুখ তোমার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু। আমার আদেশ।

কিন্তু কয়েকদিন পূর্ণোদ্যমে সাংগঠনিক কাজ করার পর আবার নীলাদ্রির মন ক্লান্তি আর বিরক্তিতে ভরে উঠল। সে এক অসহ্য অনুভূতি। তখন তার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য আবার তাকে মেক-আপ নিয়ে আসতে হল মেরীর কাছে। এবার সে বুঝতে পারল তার কিছু পয়সা রোজগার করা অবশ্য দরকার যদি এই দ্বৈতজীবন তাকে চালিয়ে যেতে হয়। এ ব্যাপারে মেরী তাকে খুব সাহায্য করল। মেরীকে প্রথম দিন চড় মেরে সে বোধ হয় তার কিছু উপকার করেছিল। তাই প্রত্যুপকার হিসাবে মেরী তার সঙ্গে কয়েকজন রেসের জকী ঘোড়ার মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তাদের থেকে 'সিওর টিপস' পেয়ে সে সত্যি সত্যি দু-তিনবার রেসে গিয়ে বেশ কিছু টাকা রোজগার করে ফেলল।

অবশেষে একদিন সে মেক-আপ সমেত ধরা পড়ে গেল স্বয়ং সহদেববাবুর কাছে। মেরীর সঙ্গে সে গিয়েছিল একটা নাইট ক্লাবে। হঠাৎ সহদেববাবুকে দেখে সে যে খুব অবাক হয়েছিল তা নয়। সে তখন নেশাগ্রস্ত হলেও তার এটুকু খেয়াল ছিল যে তার মেক-আপ আছে, সহদেব-বাবু তাকে চিনতে পারবেন না। কাজেই সে তাঁকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে ভান করে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করল।

কিন্তু সহদেববাবু তার হাত ধরে দাঁড় করালেন।

আরে নীলাদ্রি যে! কী ব্যাপার?

কাকে নীলাদ্রি বলছেন? আমাকে আপনি চেনেন?

মিছিমিছি সীন কর না নীলাদ্রি। মুস্তফী তোমার মেক-আপটা ভালই দিয়েছে। কিন্তু আমার চোখ এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়।

নীলাদ্রি লজ্জায় ভয়ে ঘেমে উঠল।

অত লজ্জা পাচ্ছ কেন?—সহদেববাবু আবার বললেন, আমিও তো এসেছি; এবং মেক-আপ ছাড়া। প্রথম প্রথম আমিও অবশ্য মেক-আপ নিতাম। এখন আর দরকার হয় না।

নীলাদ্রি কৌতূহলী হয়ে উঠল: দরকার হয় না কেন?

কারণ লোকে জানে আমার কিছু বেশী শক্তি আর সামর্থ্য আছে। সেটা ব্যয় করার জন্যে কিছু ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাতে আমার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় না। লোকে আমার কাছে আসে, সৎলোকের কাছে আসে না। কারণ তারা জানে ইচ্ছে করলে আমি তাদের জন্যে কিছু করতে পারি, সৎলোকেরা পারে না।

নীলাদ্রি হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। সহদেববাবু আরও শক্ত করে ধরে বললেন, তুমি সঙ্কোচ বোধ করছ কেন নীলাদ্রি? আমরা মেটিরিয়ালিস্ট। আমরা জানি আমাদের একটাই জন্ম, এবং এই জন্মটার সদ্ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ জীবনে সুখ পেতে হবে। শারীরিক সুখ ছাড়া আর কোন অস্তিত্বহীন কাল্পনিক সুখে আমরা বিশ্বাস করি না। গণতন্ত্রের আদর্শ—গ্রেটেস্ট গুড অব দি গ্রেটেস্ট নাম্বার। এই গুড হচ্ছে সেনসুয়াল প্লেজার—ইন্দ্রিয়জ সম্ভোগ। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের মনের জোর কম বলে জেনেশুনেও কতকগুলো সস্তা নীতি আঁকড়ে ধরে থাকে। তাদের খাতিরে আমাদেরও একটু ঢেকেচুকে চলতে হয়।

আপনি তাহলে এ বিষয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন?—নীলাদ্রি কিছু বলার জন্যই জিজ্ঞেস করল।

তা করেছি। চিন্তাশীল লোকেরা চিন্তা না করে পারে না। কিন্তু ভারী আলোচনা থাক। এ মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে রাখ। এ আমাদের সভার সভ্যা। নাম লক্ষ্মী। নামেও লক্ষ্মী—কাজেও।

সহদেববাবুর পাশে যে মেয়েটি ছিল সে এগিয়ে এসে নীলাদ্রির সঙ্গে করমর্দন করে বলল, আপনার মুখে কালির দাগ লাগল কি করে? দাঁড়ান, তুলে দিই।

ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে অ্যালকহলে ভিজিয়ে নিয়ে সে হতভম্ব নীলাদ্রির মুখটা ভাল করে ঘষে তার মেক-আপটা তুলে ফেলল। তার গোঁফটা ঢিলে হয়ে গিয়ে এক কিনারায় ঝুলতে লাগল। তারপর নীলাদ্রির কোমর ধরে দাঁড়াল। অন্যদিকে মেরী বরাবরই দাঁড়িয়ে ছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নীলাদ্রির মুখের উপরে একটা ফ্লাস লাইট জ্বলে উঠল। চমকে উঠে নীলাদ্রি দেখতে পেল তার কাছ থেকে অল্প দূরে এক ভদ্রলোক তাঁর ক্যামেরা গুছিয়ে নিচ্ছেন।

এটা কি হল সহদেববাবু?—নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করল।

কিছু না, কিছু না। ভয়ের কিছু নেই। একটা ট্রাম্প কার্ড তৈরি করে রাখলাম। এই মাত্র।

দশ

শীত পড়ে গিয়েছে। চারদিকে বড় বড় মিউজিক কন্‌ফারেন্সের ভিড়। শীতের কুয়াশার মধ্যে ভাল ভাল শীতের পোশাকগুলো প্রদর্শনী করার লোভে অথবা বন্ধুমহলে সঙ্গীতানুরাগী বলে সুনাম পাওয়ার আশায় প্রচুর লোক এই সব কন্‌ফারেন্সে হোলনাইটের জন্য টিকিট কিনছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নীলাদ্রির মাথায় একটা মতলব এল। সে হিমানীশের মেক-আপ নিয়ে একটা কন্‌ফারেন্সের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সহজেই ভাব করে ফেলল। তারপর তাদের কাছ থেকে বিক্রি করার জন্য একটা টিকিটের বই নিল। যেদিনের টিকিট নিল সেদিনটা ছিল চ্যারিটি পারফরম্যান্স।

টিকিটের বইটা নিয়ে হিমানীশ-বেশী নীলাদ্রি গেল ললিতার কাছে।

দেখুন মিসেস রায়, আপনি আমাকে চেনেন না। তবে আমি আপনার খবর রাখি। আপনি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাই ভরসা করে অনুরোধ করছি একটা চ্যারিটি শোর টিকিট কিনুন। শোটাও ভাল। সেরা সেরা আর্টিস্টরা আসবেন।

ললিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হিমানীশকে দেখে নিয়ে তার হাতের কাগজপত্রগুলো হাতে নিল। সব দেখেশুনে একখানা পাঁচ টাকার টিকিট কিনল।

নির্দিষ্ট দিনে নীলাদ্রি আগে থেকেই তার সীটে বসে ছিল। যথাসময়ে ললিতা এসে খুঁজে খুঁজে তার পাশের সীটটায় বসল। এটা নীলাদ্রির কারসাজি; কিন্তু সে খুব অবাক হওয়ার ভান করে বলল, কি আশ্চর্য, আপনার আর আমার সীট দেখছি পাশাপাশি পড়েছে!

ললিতা একটু হাসল। সেই ধরনের হাসি যা বলে দেয়—ধরা পড়ে গিয়েছ, মিছিমিছি প্রতারণা আর কেন? বলল, তাই তো দেখছি।

আপনি যদি অস্বস্তি বোধ করেন তাহলে আমি না হয় সীটটা বদলে অন্য জায়গায় গিয়ে বসি?

তা কেন? আপনি আমার পাশে বসবেন ভরসাতেই তো টিকিট কেটেছিলাম।

এ কথা বলল কেন ললিতা! তবে কি সে নীলাদ্রিকে চিনতে পেরেছে! নীলাদ্রি তীক্ষ্ণ তির্যক দৃষ্টিতে ললিতাকে দেখতে লাগল। যেন সেইভাবে দেখলে ললিতার মনের কথা জানা যাবে।

আমি তো আপনার কাছে প্রায় অপরিচিত। কাজেই, হয়তো—

না না, একবারে অপরিচিতই বা হবেন কেন? আপনাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

তারপর খানিকক্ষণ ওরা প্রায় নিঃশব্দে বসে রইল। দু-একটি মাঝারি ধরনের অনুষ্ঠানের পর বিখ্যাত স্বরোদ-শিল্পীর স্বরোদ শুরু হল। পৃথিবীতে যেন বহুদূর থেকে ভেসে-আসা একটা সুর যেন একটি বিলাপ নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই সুরের সংক্রমণ যেন এসে লাগল গাছপালায়, মানুষের দেহে, জড়বস্তুতে। এবং শেষ পর্যন্ত মনে হতে লাগল পৃথিবীতে যেন একমাত্র সুরই সত্য। আর সব মিথ্যা।

নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ললিতা দেবী, এত লোক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে এসেছে কেন? এদের মধ্যে কজন আছে যারা সুর বুঝতে পারে?

তা খুব বেশী নেই। তবে আমার মনে হয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে; না বুঝলেও কিছুক্ষণ সেই আবহাওয়ার মধ্যে ডুবে থাকতে ভাল লাগে।

নীলাদ্রি প্রথমে ঠিক করেছিল বাঙালীর হুজুগপ্রিয়তার নিন্দা করবে। কিন্তু সে পথে না গিয়ে বলল, বোধ হয় আপনার কথা ঠিক। মানুষ চায় বাস্তব থেকে পালিয়ে যেতে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার জায়গা খুব কম। কাজেই যেখানে সাময়িকভাবে পালিয়ে যাওয়ারও সুযোগ মেলে তার মূল্যও কম নয়।

ললিতা কিছু না বলে হাসল। নীলাদ্রি ভয়ে ভয়ে ললিতার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল। ললিতা হাতখানা টেনে নিল না বা তার উপর একটুও ক্রুদ্ধ হল না দেখে সে পরম আশ্বাস বোধ করল।

অনুষ্ঠানের সাময়িক বিরতির সুযোগ নিয়ে সে চা খাওয়ার জন্য ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। বাইরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। দলে দলে লোক কুয়াশা-মলিন আকাশের নীচে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। চা খাওয়া শেষ করে নীলাদ্রি ললিতাকে হাত ধরে আকর্ষণ করে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় এসে দাঁড়াল।

আমাকে এখানে ডেকে আনলেন কেন?—ললিতা জিজ্ঞেস করল।

ভয় পাচ্ছেন? তাহলে চলুন ফিরে যাই।

আপনি পরিচিত লোক। আপনাকে ভয় পাব কেন?

হিমানীশকে ললিতা কতটুকু চেনে! নীলাদ্রি ভাবল।

আপনি আমাকে খুব বেশী হয়তো চিনবেন না। আমার নাম হিমানীশ।

ললিতা হাসল।

হাসিটা কি অবিশ্বাসীর হাসি? তার এ নামটা ললিতা বিশ্বাস করছে না! ললিতা বুঝি বুঝতে পারছে না নীলাদ্রির চেয়ে হিমানীশ অনেক বেশী সত্য?

কী বলবেন বলুন।—ললিতা জিজ্ঞেস করল।

শুনুন ললিতা দেবী, পৃথিবীতে একমাত্র ভোগই সত্য। আপনি যা আপনার ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতে পারেন তাই আপনার সত্যিকারের পাওয়া। সে পাওয়ার আপনি হিসাবনিকাশ রাখতে পারেন। আদর্শ বলুন, নীতি বলুন, বড় বড় তত্ত্বকথা বলুন—এ সবই আত্ম-প্রতারণা মাত্র। আত্মপ্রতারণা এবং আত্মবঞ্চনা। বুদ্ধিমান লোকেরা বোকাদের ওই সব ভাল ভাল কথা বলে ভুলিয়ে রাখে। আর তারা ওইসব মিথ্যার পেছনে ছুটে জীবনের সবকিছু ত্যাগ করে। পরিণামে তারা পায় দুঃখ লাঞ্ছনা অপমান।

এই কথা বলার জন্যে আমাকে ডেকেছেন নাকি?

বিশ্বাস করুন, শুধু এই কথাটা, জীবনের এই গু[illegible] সত্যটা বলার জন্যেই আপনাকে ডেকেছি। আপনি কি[illegible] কিছু আদর্শবাদে বিশ্বাস করেন বলে বলছি, ওই ফাঁকি[illegible] পথ আপনাকে কিছু দেবে না। কিন্তু আমি আপনাকে সুখ দিতে পারি।

তাই নাকি! কি রকম?

আসুন না ললিতা দেবী, আমরা সহজ সরল ভোগে[illegible] রাস্তায় যাত্রা করি। আমি জানি আপনি বিধব[illegible] আপনার সন্তান আছে। আপনি যদি প্রকাশ্যে বি[illegible] করেন তবে সমাজে অনেক সমালোচনা হবে। ক[illegible] দরকার অত ঝামেলার? সমাজ যদি বঞ্চনার নীতি নি[illegible] আত্মবঞ্চনার পথে যায়, যাক না। আমরা তাকে এড়ি[illegible]

গিয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে আকণ্ঠ ভোগের একটি নিভৃত কুঞ্জ রচনা করব। আনুষ্ঠানিক ভাবে না হলেও কার্যতঃ আমরা অনায়াসে স্বামী-স্ত্রীর জীবন যাপন করতে পারি।

ললিতা আবার হাসল।

হাসছেন কেন? জবাব দিন। অথবা যদি ভাববার জন্যে সময় চান তবে সময় নিন।

আমার ভাবা হয়ে গিয়েছে হিমানীশবাবু, সময়ের দরকার নেই। কি জানেন, আমি যে কাজ করি তাতেই আমি যথেষ্ট আনন্দ পাই। আদর্শবাদের জন্যে কাজ করি না; কাজটা ভাল লাগে বলে, প্রাণ চায় বলে করি। আমার মধ্যে এমন কিছু অভাববোধ নেই যার জন্যে বে-আইনী কিছু করতে হবে।

আপনিও তাহলে আত্মবঞ্চনার পথকেই আঁকড়ে থাকবেন?

আত্মবঞ্চনা নয়। আত্মবঞ্চনা বলে জানলে এ পথ আমি ছেড়ে দিতাম।

নীলাদ্রি কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল ললিতার খুশী-খুশী মুখখানার দিকে। তারপর হঠাৎ তার হাত ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হনহন করে চলতে শুরু করল।

এগারো

ইলেকশনের সময় ঠিক হল শ্রমিক-সভা থেকে আট-দশজন প্রার্থী দাঁড় করানো হবে। অনেক অনুরোধ সত্বেও সহদেববাবু নির্বাচনে দাঁড়াতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, তিনি তাঁর অ্যাসিস্টেন্টদের জনপ্রিয় নেতা হওয়ার সুযোগ দেবেন। নিজে থাকবেন সকলের পেছনে। পেছন থেকে তিনি যোগাবেন প্রেরণা।

প্রার্থীদের মধ্যে তিনি নিজেই নীলাদ্রির নাম প্রস্তাব করলেন। এটা অনেকেই আশা করেন নি, এমন কি নীলাদ্রিও আশা করে নি। অবাক হয়ে ভাবল, তবে কি সহদেববাবু জানেন না যে নীলাদ্রি প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতিকূলতাই করে থাকে? অথবা তাঁর মনে সত্যি সত্যি খানিকটা গণতন্ত্রপ্রিয়তা আছে বলে নীলাদ্রিকে বিরুদ্ধপক্ষ বলে জেনেও তার যোগ্যতা স্বীকার করেই তার নাম-প্রস্তাব করলেন?

তারপর গোটা দুটি মাস নীলাদ্রি অনাহার ভুলে গিয়ে নির্বাচন-দ্বন্দ্বের উত্তেজনায় মেতে রইল। ঝড়ের বেগে সে নিজের নির্বাচন-এলাকায় কাজ করতে লাগল। শুধু স্বার্থপরের মত নিজের এলাকা নিয়েই মেতে রইল না, তার অপরাপর সহকর্মীদের এলাকাগুলিতেও সে তার স্বভাবসুলভ বাগ্মিতা আর পটুত্ব নিয়ে ভোট-দাতাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলল।

নির্বাচনের দু-চারদিন আগে রাস্তার রিক্শাওয়ালারাও জেনে গেল নীলাদ্রিবাবুর সাফল্য কেউ রোধ করতে পারবে না। তার আকৃতি-প্রকৃতি, তার আদর্শানুরক্তি, তার নিষ্ঠা—সব কিছু মিলে জনচিত্তের উপর সন্দেহাতীত আধিপত্য বিস্তার করল।

নীলাদ্রির জয়লাভ একরকম সুনিশ্চিত বলে যখন অনুমান করা গেল তখন সহদেববাবু গোপনে প্রতিপক্ষের কাছে একখানা চিঠি লিখলেন। তিনি লিখলেন:

> আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছি সৎ অসৎ যে কোন উপায়ে আপনারা নীলাদ্রিকে পরাজিত করুন। নীলাদ্রি জনতার হৃদয় জয় করেছে। তাকে আপনারা কিছুতেই পরাজিত করতে পারবেন না। আমি আপনাদের বলছি আপনারা যে কোন রকমের কুৎসা বা নোংরামির পথ গ্রহণ করেও ব্যর্থ হবেন। আপনারা যাতে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য আমি নাইট ক্লাবে তোলা নীলাদ্রির একখানি ফটো এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আপনারা ইচ্ছে করলে এই ফটোখানার সুযোগ গ্রহণ করেও দেখতে পারেন যে নীলাদ্রির আসন দুর্ভেদ্য। তাকে সেখান থেকে নড়ানো আপনাদের সাধ্যাতীত।
>
> ইতি জনৈক নীলাদ্রির সমর্থক।

নির্বাচনের ঠিক দু দিন আগে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে নীলাদ্রির ফটোর হাজার হাজার কপি সেঁটে দেওয়া হল। নীলাদ্রিকে ঠিক ক্লাউনের মত দেখাচ্ছে। তার মুখে জায়গায় জায়গায় রঙ লেগে রয়েছে; তার ঠোঁটের উপর একটা কৃত্রিম গোঁফ একপাশ থেকে ঝুলছে। দু পাশে দুটি মেয়ে তার কোমর বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা যে কী ধরনের মেয়ে তা তাদের চেহারাতেই সুপরিস্ফুট।

ফল যা হল তা মর্মান্তিক। যেখানে নীলাদ্রির বিজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেখানে তার জমানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

নির্বাচনের খবর বেরিয়ে যাওয়ার পর শ্রমিক-সভার এক সাধারণ অনুষ্ঠানে নীলাদ্রিকে দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য সংঘ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল। সেদিন অনেক লোকের সামনে নীলাদ্রির গায়ে রাশিরাশি অপযশ অপমান আর কলঙ্কের কালিমা ঢেলে দেওয়া হল। নানা রকম অশ্লীল মন্তব্য এবং জুতো-বৃষ্টির মাঝখান দিয়ে নীলাদ্রি মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল অধিবেশন থেকে।

সহদেববাবু মুখ টিপে হেসে বললেন, যাও বাছাধন। এখন আর বছর দশেকের মধ্যে তোমাকে রাজনীতি করতে হবে না।

বারো

আদর্শবাদী নীলাদ্রির মৃত্যু হল; সেই সঙ্গে ভোগবাদী হিমানীশেরও। একটি প্রিয় আদর্শকে নিষ্ঠার

শব্দে প্রচার করার একটা তীব্র ঝোঁক মনের মধ্যে ছিল বলেই যেন তাকে ব্যালেন্স করার জন্য মাঝে মাঝে ভোগবাদী হিমানীশের ডাক পড়ত। আদর্শ প্রচারের সুযোগ যখন আর রইল না, তার একটি ক্রটির সুযোগ নিয়ে জনসাধারণ যখন তাকে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তখন আশ্চর্য হয়ে সে দেখল ত্যাগ-স্বীকারের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, ভোগের প্রতি দুর্বার আকর্ষণও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে।

মনের মধ্যে এক অপরিসীম শূন্যতা। যে শূন্যতা দেখা যায় মধ্যদিনের ক্লান্ত আকাশে। যে শূন্যতা থাকে অমাবস্যার শেয়াল-ডাকা মধ্য-রাত্রে। যে শূন্যতা অনুভব করা যায় কুয়াশা-ঘেরা কোন পার্বত্য জনপদে।

মেসোমশাই প্রকারান্তরে বলে দিয়েছেন বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। অত বড় কলঙ্ক যার মাথায় ঝুলছে তাকে তিনি কী করে জায়গা দেবেন! মাসীমা তাকে দেখলেই ভয় পেয়ে অন্যত্র চলে যান; বা তার সুযোগ না থাকলে মুখ ফিরিয়ে নেন।

তাঁদের কোন দোষ নেই। এই ব্যবহারই নীলাদ্রির স্বাভাবিক প্রাপ্য।

যেটা তার কাছে আশ্চর্য ঠেকল সেটা শম্পার মনোভাব। শম্পা তার প্রতি শুধু অধিকতর কৌতূহলী হয়ে উঠেছে তাই নয়, তার প্রতি তার সহানুভূতিও গিয়েছে বেড়ে।

আমি ভাবতাম নীলুদা, তুমি বুঝি শুধু ভাল ছেলে।—শম্পা বলল।

এখন কি ভাবছ?—নীলাদ্রি নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

ভাবছি না, দেখছি। দেখছি যে তুমি তা নও। যাই বল বাপু, শুধু বইয়ের ওপর যারা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে তাদের কেমন ভয়-ভয় করে।

আর যারা নাইট ক্লাবে যায় তাদের?

তারা খুব খারাপ লোক, কিন্তু তাদের অন্ততঃ অত ভয় করে না।

রাত্রে বাড়িতে ফিরে ক্লান্ত দেহখানিকে যখন নীলাদ্রি বিছানার উপর ঢেলে দিল তখন শম্পা তার জন্য খাবার নিয়ে এল। তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, ইলেকশনে হেরে এত মুষড়ে পড়েছ কেন নীলুদা? কত লোক তো ইলেকশনে হারে।

আর কার ভাগ্যে এত দুর্নাম জোটে বল দেখি?—নীলাদ্রি বলল।

কতদিন আর লোকে ও-সব কথা মনে করে রাখবে? একদিন দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

শিশুদের নির্বোধ কথায় লোকে যেমন করে হাসে তেমনি করে নীলাদ্রিও হাসল।

আমার কথা বিশ্বাস করলে না?—শম্পার কণ্ঠে অভিমান।

বিশ্বাস করেছি শম্পা। মুশকিল কি জান? লোকে আমার কথা ভুলে যাওয়ার আগেই লোকের কথা আমাকে ভুলে যেতে হবে।

যাও না ভুলে। কি হবে লোক দিয়ে? তারা তোমাকে খেতে-পরতে দেবে?

আমার যদি একজনও বন্ধু না থাকে আমি কি নিয়ে বাঁচব?

আমি তো আছি তোমার বন্ধু। আর অনেক বন্ধুর দরকার কি?

যেদিন নীলাদ্রি বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখল শম্পা তার পোস্টারে ছাপানো ফটোটাকে বুকের উপর চেপে ধরেছে সেদিন সে বুঝল তাকে এ বাড়ি ছাড়তেই হবে।

সুযোগ জুটে গেল শীগগিরই। এক বিশেষ পরিচিত শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসরের সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেল। নীলাদ্রি কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, স্যর্, প্রণাম করব?

করবে তো কর। তা আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?

স্যর্, যা ঘটেছে তারপর হয়তো আমার প্রণাম নাও নিতে পারেন—তাই ভয় পাচ্ছিলাম।—বলে নীলাদ্রি প্রণাম করল, আর অধ্যাপক হো-হো করে হেসে উঠলেন।

পোস্টারের কথা বলছ তো? ওসব আমি বিশ্বাস করি না। তোমার মত ছেলে অত নীচে নামতে পারবে না। আজকালকার টেকনিক্যাল উন্নতির যুগে ফটোর সঙ্গে ফটো জুড়ে দিয়ে যা খুশি তাই করা যায়।

নীলাদ্রি মাথা নীচু করে রইল।

অধ্যাপক আবার বললেন, ওসব নোংরা রাজনীতি তোমার কাজ নয় নীলাদ্রি। তুমি ভুল রাস্তা ধরেছ। তোমার লাইন হল পড়াশোনা। পড়াশোনাটা আবার শুরু করে দাও।

স্যর্, আমার একটা টিউশনি দরকার। অবিলম্বে।

অবিলম্বে? তুমি বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস। অবিলম্বেই পাবে। কাল দেখা করো আমার সঙ্গে।

টিউশনিটা যোগাড় হয়ে যেতেই নীলাদ্রি মেসো-মশাইয়ের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে একটা সস্তা দামের মেসে চলে এল।

তারপর সত্যি সত্যি পড়াশোনা আরম্ভ করে দিল নীলাদ্রি। পুরো এক বছর ধরে তার কাজ হল ঘরে বসে বই পড়া, লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়া, আর নয় তো বইয়ের সন্ধানে এ লাইব্রেরি সে লাইব্রেরি ঘুরে বেড়ানো। পড়তে পড়তে তার দেহ শীর্ণ হল, চোখ কোটরে ঢুকে গেল,

দাড়িতে সারা মুখ ছেয়ে গেল। ফ্যাকাশে মুখের উপর শুধু জেগে রইল একজোড়া উজ্জ্বল অন্তর্ভেদী চোখ।

কিন্তু আধুনিক বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডারের যেটুকু সামান্য অংশ সে আহরণ করতে পারল তা তার সংশয়-পীড়িত চিত্তকে তৃপ্তি দিতে পারল না। সে দেখল জগতে এমন কোন তত্ত্ব নেই যার বিরুদ্ধে কিছু না কিছু যুক্তি উত্থাপন করা যায় না! এমন কোন সত্য নেই যার সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয়। মানুষের এমন কোন খুব ভাল আদর্শ জানা নেই যার বিকৃতি বা ধ্বংসের বীজ তার নিজের মধ্যেই নিহিত নেই। বুদ্ধের আদর্শ আর মার্কসের আদর্শ একই অমোঘ নিয়তির শিকার।

আজকের দার্শনিক বলছেন: আমি ভাববাদের উপরে আস্থা না রাখতে পেরে জড়বাদের দিকে এগিয়ে চলেছি।

আর বৈজ্ঞানিক বলছেন: আমি আর জড়বাদের উপর আস্থা বজায় রাখতে পারছি না। আমি ক্রমশ: ভাববাদের দিকে চলেছি।

কিন্তু নীলাদ্রি বুঝতে পারল, পরস্পরের দিকে তারা চলেছে বটে, কিন্তু কোনদিন তারা এক জায়গায় মিলিত হতে পারবে না। তাদের মাঝখানে একটা খাইবার পাশের ব্যবধান থাকবেই।

সেদিন নীলাদ্রি ঠিক করল একটু ভদ্রভাবে থাকা দরকার। জ্ঞান-চর্চা একটা দীর্ঘকালীন কার্যক্রম। সে দাড়ি কামাল, নাপিত ডেকে চুল কাটল। বিছানাপত্তর পরিষ্কার করল। তারপর একখানা চিঠি লিখল ললিতার কাছে। লিখল: ললিতা দেবী, কিছুদিন যাবৎ পড়াশুনার মধ্যে আত্মনিয়োগ করেছি। এখনও মনের শূন্যতা দূর হয় নি। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি নি। বই ছাড়া আমার কোন সঙ্গী নেই, তাই বড্ড নিঃসহায় বোধ করি। মাঝে মাঝে আপনাকে যদি ইনটেলেকচুয়াল কম্প্যানিয়ন হিসাবে পাই তবে বড় ভাল হয়।

দিন দুয়েক পরে ললিতার একটা জবাব পাওয়া গেল। ললিতা লিখেছে: মাপ করবেন। আপনার বুদ্ধিকে সাহচর্য দেওয়ার পক্ষে আমার চেয়ে ইউনিভার্সিটির একটি সাধারণ ছেলেও বেশী উপযোগী হবে। নোট মুখস্থ করে কয়েকটা পরীক্ষায় পাস করেছিলাম বটে; কিন্তু সে সব বিদ্যা এখন ভুলে গিয়েছি। মেয়েদের পড়াতে যেটুকু দরকার হয় তার চেয়ে বেশী কিছু আর আমি এখন জানি না। কাজেই আপনার অনুরোধ রক্ষায় আমি অসমর্থ।

তেরো

হঠাৎ সেদিন রাত্রির রেডিও ঘোষণা করল: চীন ভারত আক্রমণ করেছে। সারা ভারত চমকে উঠল। নীলাদ্রিও। অবশেষে প্রকৃত এক শান্তিকামী দেশের উপর বর্বরের আক্রমণ! বন্ধুর পোশাক পরে এসেছে কূটবুদ্ধি দস্যুর দল। যেমন করে একদিন এসেছিল হূন, তাতার, মোগল, তেমনি ভাবে। যেমন করে আর একদিন এসেছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, তেমনি ভাবে। সেই একই রকমের পদ্ধতি এখানেও—প্রথমে বন্ধুত্বের বুলি, তারপর সীমান্তে একটুখানি মাথা গোঁজার স্থান দাবি, তারপর সেই রক্তলোলুপ হাতটাকে আরও প্রসারিত করে দেওয়া।

নীলাদ্রির প্রথমেই মনে হল প্রতিরোধ করতে হবে, স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে; ভারতের শিশু গণতন্ত্রকে চোখের মণির মত করে আগলে রাখতে হবে। তারপর হঠাৎ আত্মসচেতন হয়ে নিজের মধ্যে এখনও এতখানি দেশপ্রেম আছে দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

জড়ত্ব স্থবিরতা কর্মহীনতার ব্রতকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নীলাদ্রি উঠল। এই বিপদের দিনে কিছু তারও নিশ্চয়ই করার আছে এ কথা ভাবতে পেরে সে যেন বেঁচে গেল। পৃথিবীতে সে আর অনাবশ্যক নয়, তারও কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে দেশের কাছে।

চীন নাকি মার্কসের আদর্শকে অনুসরণ করেছে। হায় রে, মার্কস যদি আজ এ কথা জানতে পারতেন!

অনেকদিন পর নীলাদ্রি সেদিন রাস্তায় নামল। প্রথমেই গেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে। জানিয়ে দিয়ে এল যে-কোন কাজ নিয়ে—সৈনিক হিসাবে বা অন্য যে-কোন কাজের জন্য সে যুদ্ধ-সীমান্তে যেতে প্রস্তুত আছে।

তারপর সে একাই দেশাত্মবোধক প্রচারের কাজে লেগে গেল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে সে বিপদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগল। নিছক গলা-কাঁপানো বক্তৃতার বদলে সে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে

বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করল। তার আলোচনার মধ্যে মূল্য আছে বুঝতে পেরে বিভিন্ন দেশরক্ষা সংস্থা তাকে আহ্বান করল সহযোগিতার জন্য।

সেদিন সকালবেলায় কতকগুলো কাজ সেরে ফিরছিল। বেলা প্রায় এগারোটা। তাড়াতাড়ি মেসে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার বেরুবে এই তার মতলব। দেখতে পেল ফুটপাথের উপর একদল ছেলে জড়ো হয়েছে আর তাদের মাঝখানে রয়েছে একপাঁজা মার্কস্ এঙ্গেলস লেনিনের বই।

সে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এগুলো দিয়ে কী হবে?

বহ্ন্যুৎসব।—একটি ছেলে জবাব দিল।

বই পুড়িয়ে? বইগুলোর অপরাধ কি?

জানেন না, চীনারা বলে তারা মার্কসবাদী?

চীনারা তো এ-ও বলে যে ভারত-আক্রমণকারী। তাই মেনে নিতে হবে?

এ সব বই আমরা ভারতবর্ষের মাটিতে রাখব না।

নীলাদ্রি দেখল মানুষের দেশপ্রেমের আবেগ এক অন্ধ সঙ্কীর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে।

দেখুন, এ বইগুলোর কোন দোষ নেই। মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কসের অবদানের মূল্য আছে। তাঁর যা ন্যায্য দাম তা না দিয়ে যারা তাঁকে ভগবানের মুখনিঃসৃত বেদবাক্য বলে ধরে নিয়েছে, আর সেই বেদের নামের আড়ালে নিজেদের ক্ষমতার মোহকে প্রসারিত করতে চেয়েছে, দোষ তাদের। সেজন্য বইগুলোকে পোড়ানো মূর্খতা।

উত্তেজিত জনতা সে-কথা শুনল না। একজন বলল, ব্যাটা কমিউনিস্ট—

সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলাদ্রির উপর। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তার জামা ছিঁড়ল, শরীরের নানা অংশ কেটে গিয়ে রক্তপাত হল।

তখন একজন বলে বসল, লোকটা হয়তো চীনের গুপ্তচর। ওকে পুলিসে দেওয়া উচিত।

কথাটা তৎক্ষণাৎ জনতার মনে ধরে গেল। তারা নীলাদ্রিকে ধরে নিকটবর্তী থানায় দিয়ে এল।

সারাদিন গেল। সারারাত গেল। পরদিন সকালে নীলাদ্রি দেখল তার সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। হাতখানা উঁচু করতে গিয়ে দেখল হাত টনটন করছে। পায়েরও সেই অবস্থা।

দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে অনুভব করল সে একটি নিছক শারীরিক অস্তিত্ব মাত্র। আজ তার দেহ থেকে সবগুলো মেক-আপ খসে পড়ে গিয়েছে। আদর্শবাদী, ভোগবাদী, বিজ্ঞানবাদী—সবাই সরে গিয়েছে দুঃখের দিনে। তবু সে আছে—তার বিশুদ্ধ মানুষীসত্তা নিয়ে। সমস্ত অহঙ্কার যদি তার ভেঙে গিয়ে থাকে, তবু সে মানুষ।

থানার গরাদ দিয়ে প্রথম শীতের হলুদ হলুদ রোদ এসে পড়েছে ঘরে। চারদিকের আবহাওয়ায় কেমন একটা রিক্ততার ভাব। এই রিক্ততা একেবারে ঐশ্বর্যহীন নয়।

পাহারাদার এসে তাকে এক ভাঁড় চা আর একখানা রুটি দিয়ে গেল।

চোখ বুজে বুজে চিবুচ্ছিল নীলাদ্রি। হঠাৎ মনে হল কার যেন ছায়া পড়েছে ঘরে। চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

ললিতা! আপনি— তুমি?

হ্যাঁ। অবাক হলে নাকি নীলাদ্রি?

খুব—খুব অবাক হয়েছি। ললিতা, তুমি এলে! কিন্তু বড্ড দেরিতে। আমি যে উঠে বসে তোমাকে সম্বর্ধনা জানাব সে শক্তি নেই।

আজ উপযুক্ত সময় এসেছে নীলাদ্রি, তাই আমি এসেছি। ভয় নেই। তোমার কলঙ্ক মোচন করে আমি তোমাকে ছাড়িয়ে নিতে পারব।

* *
*

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগস্ পাস্ট' [এক]

"When I was very small, there was no character in the Bible whose lot seemed to me to be as wretched as Noah's because of the flood which kept him a prisoner in the ark for forty days. Later on I was often ill and for days on end I, too, had to stay in the ark. I understood then that Noah was never able to see the world so well as he did from the ark in spite of the fact that it was closed and darkness covered the earth."

Les Plaisirs et les jours

[The Novel in France : Martin Turnell]

না বলা বাণীর ঘন যামিনীর অন্ধকার অতীতকে কথা বলিয়েছেন প্রুস্ত যে গ্রন্থে, এই শতাব্দীর সেই সবচেয়ে স্মরণীয় আনন্দ-বেদনার আলেখ্যের অবিস্মরণীয় নাম : A la Recherche du temps perdu। ইংরেজীতে এর আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'The Quest for Lost Time'; ইংরেজী অনুবাদে বৃহত্তর পাঠকের কাছে এর নাম দাঁড়িয়ে গেছে যদিও Remembrance of Things Past। জনসমুদ্রের কল্লোল থেকে অনেক দূরে নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ততার রাজকীয় বিভূতিতে সহসা উন্মোচিত হয়েছে অতীত, সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় আচ্ছন্ন অনর্গলশুদ্ধ একটি ঘরে, যেখানে এই শতাব্দীর অধীশ্বর প্রুস্ত তাঁর অচিরস্থায়ী অসুস্থ শয্যায় শুয়ে চিরস্থায়ী সৃষ্টির গর্ভযন্ত্রণায় অস্থির, আনন্দে রোমাঞ্চিত, প্রত্যাশায় উদ্দীপিত, হতাশায় জর্জর, প্রত্যাশা ও হতাশার ঊর্ধ্বে নিরাসক্ত নিরূপম আত্মসমাহিত। চলমান মুহূর্তের মিছিল থেকে মুখ ফিরিয়ে বসেছেন সেই ঘরে প্রুস্ত। দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে মুখর অতীত। রূপহীন মৃত অতীতকে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজ পরিয়েছেন প্রুস্ত। আর সেই সজ্জাহীন রূপের রূপহীন সজ্জার নাম দিয়েছেন 'Remembrance of Things Past'।

কালের হৃদয় হরণ করতে চিরকালের কণ্ঠে আনন্দ-বেদনার হাসি অশ্রুর ঔজ্জ্বল্য ছায়ায় গাঁথা একটি হার পরিয়ে দিয়েছেন প্রুস্ত যাবার আগে। প্রুস্তের সেই আনন্দিত অশ্রুর, সেই বিষণ্ণ হর্ষের চিরস্থায়ী স্বাক্ষর বহন করবে Remembrance of Things Past। তাঁর যাবার অনেক পরেও, তুলনাহীন বিস্ময়ের অম্লান মহিমায় বিরাজ করবে অনেক—অনেকদিন ধরে।

'সময়ের' হৃদয় হরণ করা এই গ্রন্থের হৃদয় হচ্ছে 'সময়'। ["Proust sought, as the title suggests, to write the past—time lost and seemingly irrecoverable—into the permanence of art,... Proust is preoccupied with time."]

বিশেষ কালের কণ্ঠে উচ্চারিত এই গ্রন্থের বুকে কান পাতলে শোনা যাবে চিরকালের কণ্ঠস্বর।

স্বাস্থ্যবিড়ম্বিত শব্দপীড়িত প্রুস্ত আজীবন। ["He was allergic to noise and to light. His room was cork-lined and always in semidarkness,..."] আলোকিত কোলাহল থেকে দূরে ম্লানচ্ছায়ার নৈঃশব্দ্যে শুয়ে প্রুস্ত অতীতকে উলঙ্গ উন্মোচিত করেছেন অনবদ্য নিপুণতায়। জীবনের সন্ধ্যাবেলায় নিজের মুখ দেখেছেন সকালবেলার দর্পণে, অস্বচ্ছতাকে সরিয়ে সরিয়ে দুঃসাধ্য আত্মসমাহিতের দুর্লভ দ্যুতি ঠিকরে ঠিকরে পড়েছে

তাঁর মহাকাব্যের আত্মাকে বহন করা তাঁর মহৎ উপন্যাসের অঙ্গে অণে অণেই :

"...and he did most of his writing in bed, devoting all his energies to the long novel, the creation of which alone seemed to keep him alive. In the end Proust seemed to exist as an isolate vessel of feeling, an apparatus for his bold literary experiment, that of putting on record what has come to be regarded as one of the most truthful artistic searches ever undertaken by an individual into his sensory and imaginative experience." [The Readers Companion to World Literature]

জীবনের মাল্য থেকে খসে পড়া মুহূর্তের দলকে মেলে ধরেছেন প্রুস্ত ; বয়ে যাওয়া সময়ের স্রোত রয়ে গেছে 'Remembrance of Things Past'-এর পাতায়। স্মৃতির এই ধূসর পাণ্ডুলিপি, অন্ধকারের কালো কেশে ধরে রেখেছে নবীন উষার পুষ্পসুবাস। জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে নিশীথের গহনে হারাবার আগে রেখে গেছে সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ। প্রভাতের আশা, রাতের গান, সুখের স্মৃতি, দুঃখের প্রীতি বাণী খুঁজে পেয়েছে প্রুস্তের এই আলোকের ভাষায় প্রতিধ্বনিত অন্ধকারের ধ্যানগম্ভীর ধ্বনিতে। ম্লান দিবসের শেষের অশেষ মুহূর্তে যা কিছু পেয়েছেন জীবনভোর, ছায়ার মত তাকে দিগন্তরে মিলিয়ে যেতে দেন নি প্রুস্ত। ধুলায় অবহেলিত জীবনের দুর্লভ ধন প্রুস্তের স্পর্শে দুর্লভতর দীপ্তিতে বিচ্ছুরিত হয়েছে আদ্যন্ত।

জীবনের প্রদোষান্ধকারের হাতে পরিয়ে দেওয়া জীবনপ্রত্যুষের আলোকিত রাখী হচ্ছে প্রুস্তের 'Remembrance of Things Past'। অনেক অশ্রুতে ভেজা, অনেক আনন্দে উজ্জ্বল, ব্যর্থতায় বিষণ্ণ, সাফল্যে স্মরণীয়, আঘাতে ম্রিয়মাণ, অনুরাগে উচ্ছল, অভিমানে রুদ্ধকণ্ঠ, ঈর্ষায় কালো, চক্রান্তে কুটিল, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ অবিস্মরণীয় এই গ্রন্থে অন্তের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে আদি।

আর সেই মুহূর্তেই জন্ম নিয়েছে অনাদিকালের অন্তর থেকে অনন্তকালের ইশারা। সেই ইশারায় বারংবার স্পন্দিত 'Remembrance of Things Past'।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই মার্শাল প্রুস্তের জন্মদিন। বাবা ডক্টর প্রুস্ত নামকরা সার্জেন, মা ধনী ইহুদী-কন্যা। মাকে ভালবাসতেন প্রুস্ত সিন্ধুকে যেমন ভালবাসে বসুন্ধরা। বারবার মায়ের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছেন প্রুস্ত। জননী সিন্ধুর অতল স্পর্শ যেমন বসুন্ধরার বুকে লেগে আছে অনাদিকাল থেকে প্রুস্তের অতিস্পর্শকাতরতায় তাঁর মায়ের স্নেহকাতর স্পর্শ অতি স্পষ্ট। চোদ্দ বছর বয়সে প্রুস্তকে প্রশ্ন করা হয় : 'what is your idea of misery ?' প্রুস্ত উত্তর দেন মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করেই : 'To be seperated from mamaw.' ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান তাঁর মা। বাবা মারা যান তারও দু বছর আগে। মাকে হারাবার দুঃখই প্রুস্তের জীবনে সবচেয়ে বড় আঘাত। এই ঘা কোনও দিন শুকোয় নি। ন বছর বয়সে প্রুস্তের হাঁপানি হয় প্রথম। সারা জীবন এই হাঁপানির হাতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর সারা জীবনের সমস্ত ধরনধারণ, তাঁর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য, তাঁর বিচিত্র বিস্ময়কর জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এই ব্যাধির রহস্য :

"It enabled him in childhood to claim, from his mother especially, the extravagant affection which he demanded, and in later life it served as an excuse for fantastic habits which he doutless did not want to give up. But it was real enough nevertheless and it marked the first step in that progressive retirement from active life which was to constitute the course of his outward existence. The little Marcel—it was thus that he continued until his dying day to be known—must make a life of his own since he obviously could not share the life of his fellows." [Five Masters : Joseph Wood Kruch]

সমস্ত জীবন ধরে যে মাস্টারপীসটি লেখবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন প্রুস্ত এই অসুখের অভিশাপ সে ব্যাপারে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অসুখের কারণে অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে অভ্যস্ত হন তিনি। এবং সেই আত্মসমাহিতের গুটি থেকে যে বর্ণিল প্রজাপতির আত্মপ্রকাশ তা অসম্ভব হত এই

য়ঙ্কর একাকীত্ব ছাড়া। 'Remembrance of things ast'-এর পাণ্ডুলিপির জন্তে পাণ্ডুর অপরাহ্ণে প্রয়োজন ছল জীবন-প্রভাতের গঙ্গাযমুনায় অবগাহন করা। আর অবগাহন অসম্ভব হত যদি না এই অসুখ প্রুস্তকে াধ্য করত সকলের মধ্যে থেকেও সকলের থেকে নিজেকে রিয়ে ফেলার সাধনায় আত্মস্থ হতে :

"For it must be remembered that his olation from the world was essential for riting the sort of masterpiece that he did 1 fact write and that from a very early age e regarded himself as a dedicated man. He ›ved the social world, but once he had ollected his material he may have felt the eed to justify his retirement from it to imself."

প্রুস্তের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল এই 'Remembrance f things past,' বিশ্বসাহিত্যের সূক্ষ্মতম কারুকার্য। এ ারুকার্য তাকেই সাজে যে নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে যেতে ারে। বহির্বিশ্ব-নিরপেক্ষ নির্জনতার স্বাদ, প্রতিটি মুহূর্ত থেকে ক্ষরিত মধু আস্বাদ করার ক্ষমতা যার পর্যাপ্ত সেই কেবল পারে এই ফুল ফোটাতে, যে ফুল বাইরে থেকে বোঁটাতে আঘাত করে ফোটাতে পারে না কেউ। দিনে দিনে এই পুষ্পের পাপড়ি মেলে ধরেছে নিজেকে, সুবাসে ভরে দিয়েছে, অতীত স্মৃতির সুবাসে উন্মনা করেছে প্রুস্তের সকাল-সন্ধ্যা। কিন্তু ভুলতে দেয় নি সৃষ্টির যন্ত্রণা। চলে যাওয়া মুহূর্তের পদচিহ্নে চিহ্নিত এই গ্রন্থে সময়ের ব্যবচ্ছেদ করেছেন শল্য-চিকিৎসকের পুত্র শল্য-চিকিৎসকের চেয়েও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম টুকরোয়। চেতনার স্বপ্নজালে জড়ানো ভাবনাকে চিরে চিরে চিরজীবী মুহূর্তের মহিমা দিয়েছেন, ক্ষণকালের অভিজ্ঞতাকে করেছেন চিরকালের উপলব্ধি। এবং এরই জন্তে প্রয়োজন ছিল সুখের চেয়ে অনেক বেশি এই 'অ'-সুখের :

"I consulted Mohlen [we find him writing in one of his letters] the doctor who with Faisan is considered the best. He told me that my asthma has become a nervous habit and that the only way of curing it would be to go to an anti-asthmatic establishment in Germany where they would break the habit of my asthma—[I say would] for I shall certainly not go—as one breaks the habit of morphine in a morphine-addict."

বয়ঃসন্ধির বয়সে তবু এই মানুষটির মধ্যেই এসেছিল উচ্ছলতার জোয়ার। সিন্ধুপারের পূর্ণিমা প্রুস্তের রক্তে শুনিয়েছিল সঙ্গকামনার সঙ্গীত। সে সঙ্গীতে সাড়া দিতে ভোলেন নি প্রুস্ত :

"At fifteen [writes Leon Pierre-Quint] we find him in the salon of Mme. Straus sitting like a faithful little page at her feet on a great plush footstool. The prominent personalities of the Third Republic who came to visit the lady of the house did not fail to bestow a few minutes' attention on her youthful favourite. They compared him to the handsome Italian princes in Paul Bourget's novels. At home his mirror was framed with imitation cards; and a famous courtesan sent him a book bound in silk from one of her petticoats."

কুড়ি বছর বয়সে প্রুস্তের বর্ণনা দিয়েছে উপরে উল্লিখিত বর্ণনার রচয়িতা :

"He had large, bright black eyes with heavy lids which slanted a little to one side. His expression was one of extreme gentleness which fastened itself for long moments on any object at which he looked. His voice was still gentler, a little out of breath with a slight drawl which bordered on affectation yet managed to avoid it. He had long thin black hair which sometimes obscured his forehead and which never turned white. But it was the eyes which held one's attention—those immense eyes with mauve circles, tired, nostalgic, extremely mobile, which seemed to move and follow the secret thoughts of the speaker. On his lips was a continual smile, amused, well-coming, hesitating, then fixing itself unmoving on his lips. His complexion was matt, but at that time fresh and rosy. In

spite of his small black moustache he reminded you of a great lazy child who was too knowing for his years."

প্রুস্তের বাবা চেয়েছিলেন প্রুস্ত আইন ও কূটনীতির পাঠ নিক। প্রুস্ত পড়েওছিলেন কিছুদিন। কিন্তু রস পান নি এতটুকু। শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবা-মা পেশার জন্যে প্রস্তুত হবার হাত থেকে প্রুস্তকে রেহাই দিলেন। প্রুস্তের বাড়ির অবস্থা ভালই ছিল এবং তখনও পর্যন্ত নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ জীবনযাপনের খেপামি পেয়ে বসে নি তাঁকে। এবং তখন থেকেই :

"He had already adopted the practice of minute observation of the appearance and gestures of his friends, which was to serve him in writing his novel."

প্রুস্তের প্রথম বই 'Les Plaisirs et les jours' গল্প-কবিতা রেখাচিত্রের গুচ্ছ, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বোদলেয়ারের প্রভাব প্রোজ্জ্বল তাঁর এই বইয়ের কবিতায়। এই বইটিকে কেউ গুরুত্ব দেন নি। কেবল আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন এই বই প্রসঙ্গে :

"He displays a sureness of aim which is surprising in so young an archer. He is by no means an innocent, but he is so sincere and so true that he becomes naive and in this way he pleases us."

রাসকিনের সঙ্গে প্রুস্তের পরিচয় প্রুস্তের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মার্টিন টার্নেল বলেছেন :

"Ruskin certainly played an important part in Proust's formation, but his real influence was probably indirect. He awakened somothing that was already latent in Proust, and it was through him that Proust became aware of his true vocation."

মায়ের মৃত্যুর পর প্রুস্তের নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ জীবন আরম্ভ হয় :

"It was the end of the society man and the beginning of the recluse. The famous corklined room was constructed."

এই শতাব্দীর সবচেয়ে স্মরণীয় উপন্যাস 'Remembrance of Things Past'-এর অবিস্মরণীয় কবির অবিশ্রান্ত নির্বাসিত দিনযাত্রার শুরু হয় এখন থেকে। শব্দ থেকে, সূর্যালোক থেকে, দিনের ভিড়, কর্মব্যস্ততা থেকে দূরে আত্মসমাহিত যুবকের এই আশ্চর্য ছবি উপন্যাসের মতই অলীক শোনায়। সমস্ত দিন ধরে বিছানায় শুয়ে বালিশের ওপর ভর দিয়ে শুধু লিখে যাওয়ার, অবিরাম ফুল ফুটিয়ে যাওয়ার, বীণার তারে আনন্দ-বেদনাকে বাজিয়ে যাবার সাধনায় আত্মনিমগ্ন স্বপ্নাচ্ছন্ন প্রুস্ত চেতনার নদী পার হয়ে অবচেতনের অতল সিন্ধুতে ভেসে চলেছেন। তরঙ্গগর্জনের তীর থেকে পৌঁছতে চেয়েছেন সমুদ্র যেখানে তলহীন শব্দহীন ঢেউহীন গভীর গম্ভীর :

"In the Boulevard Haussmann the windows were kept permanently closed. The long room was lighted by a single globe and the walls retained their musty brown colour because Proust, who was completely unadapted to the needs of practical life, never managed to find a decorator to do them up in some more attractive colour. He seldom left his prison except at night." [The Novel in France]

'Remembrance of Things Past' একটি অনন্ত জীবনের অনবদ্য বিচিত্র রূপ। এই বইয়ের লেখকের জীবন এই বইয়ের মতই বিস্ময়কর বিরল। এবং তা যদি না হত তাহলে প্রুস্ত গড্ডলিকায় গা ভাসাতে পারতেন, বেস্ট সেলারের বৃদ্ধি করতে পারতেন সংখ্যা, সুখপাঠ্য কাহিনীকারের সুলভ খ্যাতির পরতে পারতেন মুকুট, সস্তা রোমাঞ্চের শিহরণ বইয়ে দিতে পারতেন, সমকালীন রুচির পায়ে দাসখত লিখে দিয়ে জনপ্রিয়তার মুখরোচক খাদ্য ও পানীয়ে দিন কাটিয়ে যেতে পারতেন পরম আনন্দে। সবই পারতেন, কেবল 'Remembrance of Things Past'-এর মত অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা উপহার দিতে পারতেন না, পরবর্তী কালের হাতে তুলে দিতে পারতেন না জীবনদেবতার সেই প্রসাদ যা কখনও উচ্ছিষ্ট হবার নয়, যদি না প্রুস্ত সেই জীবন যাপন করতেন, যে জীবন বাইরের দরজায় খিল দিয়ে খুলে দিয়েছে ভেতরের দরজা। এবং নির্বাসিত, নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ প্রুস্ত প্রবেশ করেছেন সেই সিংহদ্বার দিয়ে নিজের অন্তরের অন্তস্তলে, দুরধিগম্য যে নিভৃতি সেই প্রথম একজনের চোখে ধরা দিয়েছে ভয়ঙ্কর অপরূপ হয়ে, 'Remembrance of Things Past'-এর লেখক এখনও পর্যন্ত যার একমাত্র রূপকার।

[ক্রমশঃ]

প্রাণপাথেয়

শ্রীদেবব্রত বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

বম্বের বিখ্যাত এক নেপথ্য-গায়িকার সুপারিশে আমেদ একটা হিন্দী চিত্রে সুর যোজনার কন্‌ট্রাক্ট সই করেছে আজ সন্ধ্যায়। অ্যাড্‌ভান্স হিসেবে আজ অনেকগুলো টাকা পেয়েছে হাতে। এই টাকার একটা তাপ আছে। হাতে যেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে লাগে। হাত খালি না করা পর্যন্ত এই টাকা অস্বস্তি সৃষ্টি করে।

এই টাকায় যেন তার সত্যকারের অধিকার নেই। তা ছাড়া এই টাকা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার এতদিনের জীবন যে আদর্শের নোঙরে বাঁধা ছিল সেই নোঙর ছিঁড়ে। কী সে নোঙর? কোথায়, কোন্ অদৃশ্য বালুকার মধ্যে এই নোঙর রয়েছে ফেলা? ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে তার স্বপ্নপ্রিয়া, তার সাধনার শেষ লক্ষ্য শাহজাদীর কল্পলোকের ঘাট থেকে। মনের মধ্যে এই শাহজাদীর বিরহের সুর গুনগুনিয়ে উঠল বুঝি মনের গভীরে সঞ্চিত এই অস্বস্তিটাকে চাপা দিতে।

বয় এসে টেবিলে খাবার দিয়ে গেল—পর্সিলেন প্লেটের টুংটাং আওয়াজে সুরলোকের ইঙ্গিত দিয়ে।

একটা সুরাপাত্র শেষ করল এক চুমুকে।

প্রত্যেক বস্তুই সুরে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। ভালবেসে তার কানায় আঘাত করলেই সে সুর ফুটিয়ে তোলে। এক একটা মানুষের দেহেও এক একটা সুর সুপ্ত আছে। নেপথ্যগায়িকা সুলতা খান্দেশকারের দেহের সুরটা বুঝি আশাবরী।

আর এক পেগ শেষ হয়ে গেল।

আমেদ ভাবছে সুলতার কথা। তার চোখের চাউনিতে সুর, তার অলঙ্কারের ঝঙ্কারে সুর, ব্যাঙ্কের চেকে ধীরে ধীরে নাম সই করা, হীরের আংটি বসানো, কুসুম-কলিকার মত আঙুলগুলোতেও সুর।

এমন কি তার বেণীতে, তার শাড়ির মৃদু সৌরভে, তার মোটরের স্টীয়ারিঙে হাত রাখার ভঙ্গীতে, চলন্ত মোটরে বম্বের সমুদ্রতট দিয়ে যেতে যেতে সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ন্ত তার কপোলপাশের চূর্ণকুন্তলে সুর—স্ট্রাউসের ভাল্‌ৎস।

আমেদ আশাবরীর সুরলোক আর ভাল্‌ৎসের সুরলোককে নিজের সাধনায় সেতু দিয়ে যোগ করতে চেয়েছিল। ভেবেছিল পৃথিবীতে এক সঙ্গীত থাকবে—যার ভাষা পৃথিবীর সর্বমানুষের কাছে হবে বোধগম্য। সে তৈরি করবে ভবিষ্যৎ-পৃথিবীর সঙ্গীত। যে সঙ্গীত কলা-ইতিহাসের পরিবর্তে শুধু মানবিকতার উপর চিরকালের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর মানুষের মননের বিভিন্নতা, সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্নতা, সমস্ত বিভিন্নতা লুপ্ত হয়ে যাবে। এক পৃথিবী হবে, এক সঙ্গীত হবে।

এই এক সঙ্গীত সৃষ্টি করতে গিয়ে সে তার সঙ্গীতকে মানুষের দেহজ আর প্রবৃত্তিজ ছন্দের ওপর গড়ে চলেছে। এই দেহেতে, প্রবৃত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদ নেই। তাই এই স্থূল পথটা ধরেছে। কিন্তু চৈতন্যের যে ঊর্ধ্বস্তরে মানুষে মানুষে এক সেখানের ছন্দে তার সুরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি।

আতার কপোলের ওপর ঘোমটা ওপরের বিজলী-পাখার হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে।

অনেকক্ষণ ধরে সেই দিকে চেয়ে ছিল আমেদ। চেয়ে চেয়ে আরও কয়েক পেগ শেষ করল।

ঘোমটা কেন!—ওর মাথায় তো ঘোমটা ছিল না। ঘোমটার দিকে চেয়ে রইল আমেদ।

আভা হেসে ঘোমটা খুলে ফেলল। বলল, ভুল করে মাথায় তুলেছিলাম।

আমেদ ভাবল অবচেতন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

আভা হাসিটাকে টেনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কাউকে পেলাম না—

আভা তার সমস্ত গ্লানি সমস্ত দুঃখ অভিনয়ের ভিতর দিয়ে ভুলতে চাইছে। এমনি করতে করতে হয়তো তার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত দুঃখ একদিন অভিনয়ের মত অলীক হয়ে যাবে। জীবন যখন এত ক্লেশকর তখন অভিনয়টাই জীবন হোক। আজ সে কেন জানি না সমস্ত দেহমন-প্রাণ দিয়ে আমেদের সঙ্গে একটা রোমান্টিক অভিনয়ে নেমেছে অতীতটাকে অলীক করে দিতে।

কাউকে পেলাম না যে এই ঘোমটাটাকে মাথার উপর টেনে এই নির্লজ্জ মুখটাকে ঢেকে দেবে।—আভা কথা-গুলো হেসে বললেও এই হাসির কানা উপচে দুঃখ গড়িয়ে পড়ল। অবশিষ্ট পানীয় কয়েক চুমুকে নিঃশেষ করে আমেদ আভার মুখের দিকে মুগ্ধের মত চেয়ে রইল। শেষ চুমুকের পানীয় স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা উন্মাদ ঝঙ্কার তুলে দেহময় ছড়িয়ে গেল।

অদ্ভুত পানীয় এই সুরা। কোন কোন চিত্ত সুরায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, কোন কোন চিত্ত যায় দ্রবীভূত হয়ে। আমেদের চিত্ত গেল গলে। দ্রবীভূত চিত্তে আমেদ আভার ব্যথাতুর মুখখানার দিকে চেয়ে গুনগুন করে যে সুর গেয়ে উঠল তা ইমন্।

আভা চেয়ে দেখে আমেদের চোখে করুণার মেদুরতা নেমেছে। পথে-পথে-পরিশ্রান্ত ক্ষুব্ধ অত্যাচারিত নারী-আত্মা এই করুণার স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় চাইল। হু হু করে সংযমের বাঁধ ভেঙে অভিনয়কে মিথ্যে করে দিয়ে অশ্রুর প্লাবন নামল দু চোখে। টেবিলের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করল আভা।

একটা হাত মুড়ে তার ভাঁজে মুখ লুকিয়েছে। অন্য হাতটা শ্লথভাবে টেবিলের ওপর পড়ে আছে। পিঠের ওপর কান্নার ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে।

বয় বাইরে থেকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করে গেল আর কিছু চাই কি না। আমেদ ঘাড় ঘুরিয়ে রূঢ়স্বরে বলে, না। বয় ধমক খেয়ে অপ্রতিভ হয়ে সেই অপ্রতিভ ভাবটাকে ঢাকবার জন্যেই যেন এককলি গেয়ে ফেলল—হম্ নীচে উপরতু সিন্‌সিনাকি বুবলাবু। আমেদের এই রূঢ় স্বরেই যেন জেগে উঠে আভা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। আমেদ তখন করুণায় সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়ে গেছে, তার চোখের কোণেও অশ্রু টলমল করছে।

আভা আমেদের মুখের দিকে চেয়ে বর্ষান্তে অপস্রিয়মাণ দূর মেঘে বিজলীর চমকের মত ম্লান হাসল। অজ্ঞাতসারেই। তার অবচেতন মন বুঝল তার কান্নার জয় হয়েছে। সেই জয়ের হাসি এটা। আমেদ তার প্রভাবের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়েছে। আমেদ আর সেদিনের আমেদ নয় যেদিন সে বর্ষা-রাত্রির নিরিবিলিতে আভার সঙ্গসুখ চেয়ে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমেদ বাড়ি করেছে, আমাদের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স হয়েছে, আমেদ সমাজে মোটামুটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

আমেদের পরিচয়-চক্র পরিধিতে প্রকাণ্ড হয়েছে। কলকাতা থেকে বোম্বাই। আমেদ আজ সুপারিশ করলে আভার আবার চিত্রলোকে প্রবেশ সম্ভব হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আমেদের সঙ্গে—

চিন্তাটা সংস্কারের বাধায় স্পষ্ট হয়ে উঠতে পায় না। না, আর কান্নার দরকার নেই। তার কান্নার আঘাতে আমেদের চিত্তের কপাট খুলে গেছে। আমেদ ওর জন্যে তার মনের প্রবেশপথে করুণার লাল টকটকে মখমল বিছিয়ে দিয়েছে। এবার রহস্যের মত সেখানে প্রবেশ করলেই হল!

সহসা আভার মনে হল প্রাচীর-চিত্রের ছবিটাই তার সত্য রূপ।

আমি ছবি, আমি ঠিক মানুষ নই—আমি মানুষের ওপর; আমি যা আমি শুধু তাই নই, আমাকে চিত্র-শিল্পীতে আলোকশিল্পীতে মিলে যা তৈরি করেছে আমি তাই। আমার এই রূপটার মধ্যে অগাধ রহস্য। যে রহস্যে আমি নিজেও বিভোর।

আভা সমস্ত চেতনাকে চালনা করে সেই ছবির প্রত্যেকটা ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলল মুখে আর দেহের উপর-অর্ধাঙ্গে।

আমেদ ইতিমধ্যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। টেবিলের

ওপর থেকে আভার ডান হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে বলল, তুমি শাহজাদী, তুমি জাহানারা। এই শাহজাদী এই জাহানারা আমেদের বিশ্বপ্রিয়ার প্রতীক।

আভা এই প্রতীকের কী অর্থ তা বুঝতে পারল না। শুধু তার অত্যন্ত রহস্যের হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত করে তুলল। কাঠের কেবিনের দেওয়ালে যে আয়নাটা ছিল সেই দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে রইল আত্মসমাহিতের মত।

আমেদ নেশার ঘোরে বলে গেল :

'তুমি কি কেবল ছবি
শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা…'

বয় বিল নিয়ে ঠেলা-দরজার ওধারে অপেক্ষা করছিল। খুব নিম্নস্বরে গান ধরেছে, নীচে হম্ উপরতু—

ভিতরে মানুষ দুটোর নিশ্চয়ই কাণ্ডাকাণ্ড বোধ নেই। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কবিতা আওড়ায়? কাণ্ডজ্ঞান নেই বুঝে বয় ফিরে গেল।

আভা আমেদের মুখের দিকে সোজা চেয়ে দেখল আমেদ নিজেকে হারিয়েছে। মুখে বেদনার গাঢ় ছায়ার ঘোমটা নামিয়ে রুদ্ধস্বরে আভা বলে, ওরা আমাকে ছবি করে দিয়েছে আমেদ, আমাকে ড্রয়িং-রুমে টাঙিয়ে রাখতে চায়, প্রদর্শনীতে লোকচক্ষুর বিচারের সামনে ধরতে চায়, কিন্তু ঘরে স্থান দেয় না,অন্তরে স্থান দেয় না। এই ছবির যা ভাগ্য তা তুমি জান। ছবি পুরনো হলে ইঁদুরে কাটে, রঙ চটে গেলে লোকে ভাঙা আসবাবের সঙ্গে সিঁড়ির তলায় বা চিলেকোঠার অন্ধকারে ফেলে রেখে দেয়। মুখের ওপর তখন মাকড়সা জাল বোনে।

আমেদ আবেগের সঙ্গে বলে, না না, মাকড়সা কেন? জ্যোৎস্না জাল বুনবে তোমার চোখের ওপর!

সেই হাসিমাখানো মুখে আভা আবার বলে, ছবিটা পুরনো হলে তার ওপর পানের পিক ফেলতেও দ্বিধা করবে না কেউ। শোন নি ওরা আমার নামে কী বলে বেড়াচ্ছে?

আমেদ ব্যথিত সুরে বলল, ওরা তোমার মিথ্যে কলঙ্ক গেয়ে বেড়াচ্ছে আভা। আমি জানি তাপস পরের ধনে সমাজে পোদ্দারি করছে। এখন শীলভদ্রের পরিত্যক্ত টাকায় চড়ে বেড়াচ্ছে। আসলে ও ভেতরে বাইরে নিঃস্ব। কী দিতে পারে ও তোমাকে কলঙ্ক ছাড়া?

আমেদ ঠিক কথাই বলেছে। ভাবে আভা। তাপস নিজের ধন উড়িয়ে দিয়ে এখন শীলভদ্রের ঐশ্বর্য ওড়াচ্ছে। শীলভদ্র ভূদান যজ্ঞে বেরিয়ে যাবার পর তাপসকে তাঁর সম্পত্তি পরিচালনার এজেন্ট করে দিয়ে গেছেন।

নদীর জলে যে কাগজপত্র সহসা বৈরাগ্যের বশে ফেলে দিয়েছিলেন সেগুলো সমস্ত উদ্ধার করেছে তাপস সরকারের নানান অধিকরণ থেকে। শীলভদ্র কাকে ভোলাতে চেয়েছিলেন তা তিনি নিজেই জানেন। প্রতিটি কাগজ অমর অক্ষয় হয়ে থেকে গেছে সরকারের নানান দপ্তরখানায়।

অনুযোগের স্বরে আভা বলল, সব পুরুষই বোধ হয় ওঁরই মত।

মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে।—বলে আমেদ উত্তেজিত হয়ে ওঠে : যাঁর কিছু নেই সে কী দেবে? আমি যা দিতে পারি তাপস তা পাবে কোথায়? ঘরবাড়ি টাকাপয়সা প্রতিষ্ঠা এ সব ছাড়াও আরও কিছু দিতে পারি আমি।

কৃত্রিম সংশয়ের সুরে আভা বলল, আমাকে? আমাকে দিতে পার?

অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে আমেদ বলে বসে, হ্যাঁ, তোমাকে—তোমাকে—আমার শাহজাদীকে।

আভার মনের মধ্যে কে যেন নিষেধ করে, না, ওকে আর বেশী কিছু বলতে দিয়ো না। ও এখন অপ্রকৃতিস্থ। মনের মধ্যে আর একজন বলে, ও অপ্রকৃতিস্থ বলেই আমার সুবিধে হয়েছে। ওকে ভাগ্যে পেয়েছি আমি! এখন ছেড়ে দিয়ে যাব কোথায়? জানি, ওর এই প্রেম-নিবেদন আমার উদ্দেশে নয়, তবু আমাকে লক্ষ্য করে যাকে যা বলুক না কেন, হোক সে ওর কল্পনায় মূর্তি বা অন্য কেউ, এখন আমিই তা গ্রহণ করব। হয়তো আমার ছবিকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলছে ও। আহা, বলুক।

আভা বলে, চল, বাইরে চল।

হ্যাঁ, চল।—বলে আমেদ প্রায় টলতে টলতে উঠে পড়ে। একখানা একশো টাকার নোট কাউণ্টারে দিয়ে বাকী পাওনা না নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল। আভা

তাকে দাঁড় করিয়ে বাকী পাওনা গুনে নিল ও আমেদের মনিব্যাগটা তার পকেট থেকে বের করে ফেরত টাকা-গুলো তার মধ্যে পুরে নিল। তারপর ব্যাগটা নিজের বুকের মধ্যে রেখে দিল। বলল, যাবার সময় দিয়ে যাব। তুমি এগুলো হয়তো ফেলেই দেবে।

আমেদ নিশ্চিন্তভাবে বলে, আঃ, বাঁচলুম।

পথে বেরিয়ে এসে আভা বলল, বাঁচলুম বললে কেন?

আর একজন এবার টাকা পয়সার ভার নিয়েছে দেখে।

আভা অবাক হয়ে ভাবে, অপ্রকৃতিস্থ নয়তো! কথায় কোথাও তো অসঙ্গতি নেই! তবে!

আভা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে আকাশে ঘন কালো মেঘে রাত্রির সব তারাগুলো অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

আশঙ্কিত হয়ে আভা বলল, বৃষ্টি নামবে।

আমেদ আচ্ছন্নের মত বলে, 'ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।'

এ মাসটা যে শীর্ণ বৈশাখ সে কথাটা আভা জেনেও তাকে মনে করিয়ে দেয় না। আমেদ চলতে চলতে পাশের এই রহস্যময়ীকে বলে, যাবে আমার ঘরে? বৃষ্টি তো নামল।

আজকের জন্যে?—রহস্যের হাসি হেসে মুখে বেদনার গুণ্ঠন টেনে জিজ্ঞেস করে আভা। এই রহস্যের হাসি, এই বেদনার গুণ্ঠন আমেদের চোখে পড়ে হঠাৎ-চমকে-ওঠা বিদ্যুতের আলোয়।

না না শাহজাদী, চিরকালের জন্যে।—আমেদের কণ্ঠে আবার অপ্রকৃতিস্থ স্বর।

আভা বলে, কে তোমার শাহজাদি, তার ঠাঁই আমি নেব কেন?

আমেদ এর জবাব দেয় না। ইঙ্গিতে ট্যাক্সি ডেকে আভাকে সঙ্গে তুলে ড্রাইভারকে জড়িতকণ্ঠে রাস্তা আর ঠিকানা বলে দেয়।

তোমার বাড়িতে চললে?

হ্যাঁ।

আমাকে নিয়েই?

হ্যাঁ, তোমাকে নিয়েই।

ভেবে দেখেছ?

দেখেছি।

আমাকে পথে নামিয়ে দাও আমেদ।

আকাশ ভেঙে বর্ষণ নেমেছে। আমেদ উৎফুল্ল হয়ে চেয়ে আছে হেড-লাইটের আলোয় ঝলমল করে ওঠা বৃষ্টিধারার দিকে। মুক্তো ঝরছে অঝোরে।

আমেদের মন বলছে, দাঁড়াও, বছরের প্রথম বৃষ্টি, তোমাকে সুরে বাঁধছি আমি।

আমাকে নামিয়ে দাও আমেদ।

'ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।' তুমি সেই মন্দির ভরতে পারবে না আভা?

না না না, কী করে পারব আমি?

আমেদ ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে স্থির হয়ে চেয়ে রইল মুহূর্তকাল। আভার মুখের ওপর রাস্তার দু পাশের আলো চলচ্চিত্রের মত ছুটে চলেছে। মুহূর্তের মধ্যে আমেদের চোখের কোণে অশ্রু টলমল করে উঠল।

আভার মনে পড়ল আর এক দিনের অভিযান এমনি মোটরে তাপসের সঙ্গে। নরকের দিকে।

আমেদ বলে, তুমি তো জান আভা, কী নিঃসঙ্গ আমি, আমার চারদিকে শূন্য কালো আকাশ, কোনদিকে কোন জগৎ নেই—না পৃথিবী, না চাঁদ, না মঙ্গল, না শনি! আমি সমুদ্রের দ্বীপ, চারদিকে লোনা জল! আমার সারাজীবনের একলা কাঁদার অশ্রু!

আমেদের কণ্ঠ ছাপিয়ে এক নিমেষের জন্যে কান্না উপচে পড়ল।

কিন্তু, তোমার শাহজাদী?

আমেদ আচ্ছন্ন হয়ে বলে তুমি—তুমি—তুমি! যেদিন রাত্রে তুমি আমার সঙ্গকে পরিহার করে চলে গেলে, সেদিন থেকে আমি কেবলই তোমার সঙ্গই চেয়ে আসছি।

আকাশের মধ্যস্থল থেকে দিগন্ত পর্যন্ত ব্যবধানটা চিরে শাখাপ্রশাখা মেলে একটা বিদ্যুৎছটা নিমেষের জন্যে জ্বলে উঠে মিলিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে ঘন কালো রাত্রির ছাদের ওপর গুরু গুরু শব্দের পিণ্ডেরা দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। আমেদ সেই গুরু গুরু ধ্বনির সুরে সুর মিলিয়ে বলল—তুমি, তুমি, তুমি...

আমেদ যা বলল তা সত্যি। আবার তা মিথ্যেও।

এতক্ষণে ট্যাক্সি আমেদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে

ড়িয়ে গেছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে আমেদ হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে নামিয়ে নিল। ভাড়া গুনে দিল আভা। ট্যাক্সিটা হুস্ করে মিলিয়ে গেল। আভার মনে হল ওটেই ভাগ্য। এই ট্যাক্সিটার মতই মানুষের ভাগ্য।

আভা আমেদের দিকে চেয়ে কাঁধের কাপড়টা মাথায় তুলে দিল। চারিদিকে চেয়ে নিজের এই কাজটার কৈফিয়ত দেবার মত করে ব্যাখ্যায় বলল, যারা এখনও ঘুমোয় নি, এখনও এই পথের দিকে চেয়ে রয়েছে এটা তাদের জন্যে।

আমেদ গম্ভীর হয়ে বলল, আমি তাদের প্রতারণা করতে চাই না আভা। তুমি ওদের যা বোঝাতে চাইলে সেটাই আজ থেকে আমার কাছে সত্যি।

বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্যে যেন নির্জীব হয়ে পড়েছিল, আবার সোৎসাহে মুষলধারে পড়তে শুরু করল।

৫

ঠিক এই একই সময়ে সমীর ডাক্তার উত্তর কলকাতায় একটা ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিলেন। ঠিক বরেনের পুরনো বাড়ির জানলার নীচেই।

তাপসের চাপে শীলভদ্রের বাড়ির গ্যারেজ থেকে সমীর ডাক্তার দিনকয়েক পূর্বেই উৎখাত হয়েছেন। উৎখাত হওয়ার পরের দিন ডিসপেনসারির জিনিসপত্র কোথায় রাখবেন ঠিক করতে না পেরে সেগুলো একটা নিলামী আসবাবের দোকানে বেচে দিয়েছেন।

অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, যে ভাড়া ঘরটায় তিনি থাকতেন সে ঘরটাও তাঁকে দুদিন পরে ছেড়ে দিতে হল। ... প্রদেশ থেকে অত্যাচারের শঙ্কায় উৎখাত একটি পরিবার আসন্নপ্রসবা একটি নারী নিয়ে তাঁর কাছে এসে একটু ঠাঁই চাইল। ডাক্তার ঘর ছেড়ে দিলেন, প্রয়োজনের সময় চিকিৎসকের কাজ করলেন। কয়েক দিনের জন্যে গ্যারেজ-ডাক্তারখানায় রাত্রি যাপন করলেন। আগন্তুক পরিবার কিন্তু তাঁর ঘর ছেড়ে দিল না। পরিবারের কর্তা সহাস্যে অনুনয় জানালেন ঘরটা তাঁকে ছেড়ে দিতে। একজন নৃশংস মানুষ তাঁর ঘর কেড়ে নিয়েছে। এমন ... কি কেউ নেই যিনি নিজের ঘরখানা তাঁকে দিতে পারেন?

সমীর ডাক্তার এমনি ভাবে গৃহচ্যুত হলেন। তারপর থেকে তিনি কলকাতায় ভাড়াটে ঘর সন্ধান করেছেন, পান নি।

প্রথম প্রথম অভিজাত হোটেলে থেকেছেন। ফলে অতি দ্রুতগতিতে তাঁর হাতের সম্বল ফুরিয়ে গেল। তারপর সেই সম্বলের যেটুকু অবশিষ্ট হাতে রইল তার জোরে আরও কয়েকটা দিন কম খরচার হোটেলে কাটালেন। শেষ দিকে রেল স্টেশনের যাত্রীদের জন্যে রাত্রিবাসের যে ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থায় কয়েকটা দিন কাটল। তার পরের ব্যবস্থা হল অন্যরকম। সকালবেলায় স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে স্নান সেরে বেরিয়ে যান, সারাদিন কলকাতার এ অঞ্চল সে অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করেন। পথে দুপুরের আহারটা সেরে নেন। আবার সন্ধ্যার পর স্টেশনে ফিরে আসেন। এ ব্যবস্থাও যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। একখানা করে টিকিট কাটতে হয়। টিকিটটা অবশ্য রোজই নষ্ট হয়। ওয়েটিং-রুমের কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসা করলে বলেন ট্রেন ফেল করেছেন। সমীর ডাক্তার জীবনেই ট্রেন ফেল করেছেন।

অদ্ভুত ভাবের মানুষ সমীর ডাক্তার। অতীতের প্রতি ওঁর মোহ নেই। ভবিষ্যতের ভাবনা নেই। বর্তমানের প্রতিও ওঁর কোন নেশা নেই। শিশু বয়েস থেকে মা ছাড়া নিজেদের সংসারে কাউকে চেনেন নি। সম্পত্তি বেচে বেচে মা তাঁকে ডাক্তারী পড়িয়েছেন। প্রায় সব যখন বিক্রী হয়ে গেছে মা তখন জীবন থেকে চিরকালের জন্য ছুটি নিয়ে চলে গেলেন। সম্পত্তির মধ্যে পড়ে রইল প্রকাণ্ড একটা বাগান সম্বলিত একখানা বাড়ি। সেই বসতবাটিটায় দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়েরা এখন বসবাস করেন। সেখানে ফিরে গিয়েও নিশ্চিন্ত মনে নির্বিবাদে দিনযাপন সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্থান পরিবর্তন তাঁর নেশার মত। এক জায়গায় তাঁর মন বেশী দিন বসে না। তাপস তাঁকে উঠিয়ে দিয়েছে বলে মনে মনে মোটেই ক্ষুণ্ণ হন নি। বরং খুশীই হয়েছেন। আর কলকাতায় এত জায়গা থাকতে এই স্টেশনে রাত কাটানো কেন, এর জবাব ওঁর সদা-যাযাবর মনের প্রকৃতি থেকেই পাওয়া যাবে।

সমীর ডাক্তার মনে করেন রেল স্টেশনই হল আধুনিক সভ্যতার, এমন কি আধুনিক সভ্য মনের প্রতীক।

আমার এই মন যেমন··· এখান থেকে ভাবের মেল, এক্সপ্রেস্ প্যাসেঞ্জার এদিক-ওদিক ধেয়ে চলে, আর সারা জগৎ থেকে ডাউন সব ভাবের গাড়ি এখানে হয় জমায়েত, এখানে কেউ দাঁড়িয়ে নেই—এখানে সকলেরই এক পরিচয়, সবাই যাত্রী।

মানুষ যাত্রী এটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আর এই যে একটা অচেনা রাস্তার ফুটপাথে রাত্রি এক প্রহরের পর বৃষ্টির মুষলধারায় ভিজছিলেন পরম নিশ্চিন্তে সেও সম্ভব হয়েছে তাঁর মনের বৈশিষ্ট্যে।

আমার তো তাড়া নেই। দুনিয়ার সব লোক যেন পিছন থেকে অদৃশ্য তাড়া খেয়ে চলেছে। আমার পিছনে তাড়া নেই। জন্মেছিই যখন তখন বিশ্বের সব দিক দেখে যাব না?

বৃষ্টির ধারার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার মধ্যেও আছে বিচিত্র আনন্দ। আমার তাড়া নেই তাই এই আনন্দটা ধরা দিয়েছে আমার কাছে।

তবু প্রকৃতির বিধান দুর্লঙ্ঘ্য। হঠাৎ প্রখর তাপের পর এই শীতল ধারায় স্নান করার জন্যে গলায় সর্দি জমে গেছে এইটুকু সময়ের মধ্যেই। সমীর ডাক্তার কাশতে শুরু করেছেন।

মাথার ওপর পিছনের জানলাটা খুলে যায়। মৃণাল জানলা খুলে জিজ্ঞাসা করে, কে আপনি? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন?

সমীর মুখ ফিরিয়ে মৃণাল দেবীকে দেখলেন। জানলার আলোকিত চতুষ্কোণপটে একটা কালো মুখ। খুশী হলেন মনে মনে। যাক, একজন মানুষ পাওয়া গেল—কয়েকটা মুহূর্ত তো কথা বলা যাবে।

প্রকৃতির সঙ্গে বেশীক্ষণ প্রণয় চলে না। প্রকৃতির প্রণয়কে স্থায়ী করতে গেলে মানুষ চাই। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিকে রোপণ করে নতুন ভাব ফলাতে হয়।

কে আপনি? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন?

নমস্কার। নাম বললেই কি আর পরিচয় দেওয়া হবে?—ঈষৎ থেমে বলেন, আমার নাম সমীর রায়, এম. বি বি এস. ডাক্তার।

মৃণাল জানলা দিয়ে পথের আলোতে ডাক্তারের মুখখানা কয়েক মুহূর্ত খুঁটিয়ে দেখে বলল, বাড়ির ভিতরে আসুন, দরজা খুলে দিচ্ছি।

[ক্রমশঃ

নিকষিত হেম

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

যদি ওখানেই যবনিকাপতন হত, শেষ হত কথাটা! কি হত তাহলে? কে জানে! তুলসীর জানা যা এই যে সেই দিন বিকেলেই আরও কথা বলেছিল মনোতোষ। মায়ের সঙ্গে ছেলের কথা তুলসীর কানে এসেছিল; সেই সূত্রে আবার তার সঙ্গেও কয়েকটি কথা বলেছে মনোতোষ।

সেই জন্যেই তো আবার অত কথা মনে উঠেছিল তুলসীর।

বিকেলে নীচের ঘরে চা খেতে বসে মনোতোষ বলল, পঞ্চাশটি টাকা আমার চাই মা—আজই।

অন্নপূর্ণা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন রে?

কাল দুপুরে আমি ময়নাপুরে যাব।

ওমা—সে কি কথা! কেন?

ধান-কাটা নিয়ে ও অঞ্চলে একটা গোলমাল চলছে—জোতদার আর ভাগচাষীদের মধ্যে।

অন্নপূর্ণা অনেক খবর রাখেন; সুতরাং বিস্ময় বা কৌতূহলের চেয়ে উদ্বেগই তাঁর বেশী। মুখের কথাতেও তাই প্রকাশ হয়ে পড়ল: তাহলে তুই ওখানে যাচ্ছিস কেন? দাঙ্গা-ফ্যাসাদ যদি লাগে!

মনোতোষ হেসে উত্তর দিল, যাতে না লাগে তার জন্যেই তো আমার যাওয়া। তোমার কোন ভয় নেই—টাকাটা আমাকে দাও।

তখন ওই ঘরেই উপস্থিত ছিল তুলসী; কথাটা উঠতেই কান দুটিও তার খাড়া হয়েছিল। তারপর ওই মধ্যবিত্তের অবস্থা—ছেলের কথা শুনে মা গুম হয়ে গিয়েছেন। তুলসী তখন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা মণ্টুদা, আমাদের পদাইদার সেই ব্যাপারটা নাকি?

মনোতোষ উত্তর দিল, হুঁ।

তখন অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, পদাইদা আবার কে?

তুলসী বলল, আমার বড় ভগ্নীপতি কর্তামা—সাতগাঁয়ের নিতাইপদ হালদার।

তাহলে তুই কেন ময়নাপুরে যাবি মণ্টু?

মনোতোষের মুখের দিকে চেয়ে কথাটা বলেছিলেন অন্নপূর্ণা; শুনেও মনোতোষ জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে তিনিই আবার বললেন, ভূতিকে নিয়ে যাবার জন্যে বংশীধারীকে কলকাতায় আসতে চিঠি দিয়েছি আমি। সে দু-চার দিনের মধ্যেই আসবে নিশ্চয়ই। এলে যা করবার তাকেই বলে দিস—আমিও বলব তাকে।

উত্তরে মনোতোষ বলল, তাতে কোন লাভ হবে না।

কেন?

সেবারে ভাই-বোন দুজনকেই বলেছিলাম আমি। কিন্তু কড়ে আঙুলটি তুলতেও রাজী হয় নি কেউ। কেন তুলবে? পদাই তো ওদের ভগ্নীপতি—আত্মীয়। আমার কথায় তার বিরুদ্ধে যাবে না তুলসীরা। বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? তাহলে জিজ্ঞেস কর ওই ভূতিকেই।

কিন্তু অন্নপূর্ণা তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই ম্লান মতন একটু হেসে তুলসী বলল, আমার সে দোষটাও তুমি মনে রেখেছ মণ্টুদা?

মনোতোষ বলল, সব কথাই আমার মনে থাকে।

তুলসী উত্তর দিল: কিন্তু সব কথা তুমি বোঝ না।
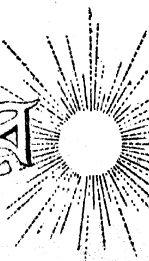
কি বললি?

বলবার সঙ্গে সঙ্গেই হেসে ফেলেছিল মনোতোষ; কিন্তু অন্নপূর্ণার কণ্ঠে বেজে উঠল নির্ভেজাল তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা: এ কি তোর কথার ছিরি রে ভূতি? নাই পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠতে চাস দেখছি। যা এখান থেকে।

প্রতিবাদ করে নি তুলসী; তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে চলেও গিয়েছিল সে। কিন্তু খাওয়া সেরে মনোতোষ উপরে তার নিজের ঘরে গিয়ে বসবার পর তুলসীও তার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

নতুন নির্মল হাফ-বার সাবানে
কাচলে আপনার কাপড়চোপড় হবে

ধবধবে ফরসা

হালকা সুগন্ধে ভরপুর

মনোতোষ বিরক্ত হয়ে বলল, আবার কি ?

কিন্তু তা গায়ে মাখল না তুলসী ; সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি সত্যিই ময়নাপুরে যাবে মণ্টুদা ?

উত্তরে মনোতোষ বলল, যাব বইকি।

কিন্তু কর্তামা যে নিষেধ করলেন।

সে নিষেধ মা তুলে নিয়েছেন, টাকাও দিয়েছেন আমাকে।

তাহলে আমি নিষেধ করছি।

কেন ?

পদাইদা গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক। ওদের ব্যাপারে কেন মাথা গলাতে যাবে তুমি ? একটা বিপদ-আপদ যদি হয়—

একটু দেরিতে উত্তর দিল মনোতোষ ; তবু তা উত্তর নয়। ভ্রূকুঞ্চিত করে তুলসীর আপাদমস্তক বার দুই নিরীক্ষণ করবার পর মনোতোষ ব্যঙ্গের সুরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, খুব যে দরদ দেখছি তোর !

তুলসী কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মণ্টুদা—

আবার ঢঙ করছিস ! যা এখান থেকে।

এবার আর ব্যঙ্গ নয়, যেন গর্জন করে উঠল মনোতোষ। আর তা শুনেই যেন কাগজের মত সাদা হয়ে গেল তুলসীর মুখ।

আর কিছু নয়—কেবল ওই ঢঙ কথাটা। সকালেও তো ওই কথাই বলেছিল মনোতোষ। কথা তো নয়, যেন একটি শেল—মর্মের মূলে গিয়ে আঘাত করে তা। আর সে আঘাতের যেন শেষ নেই। দূরে গিয়েও নিস্তার নেই তুলসীর।

ঢঙ ! ঢঙ ! ঢঙ—

যেন ওই একটি কথাই অনবরত কানে বাজছিল তুলসীর—শেলের মত আঘাত করছিল তার মর্মমূলে। বুঝি পাগলই হয়ে যাচ্ছিল সে।

নইলে কি—

সেই রাত্রে।

ঘুম ভেঙে গেল মনোতোষের, ললাটে কোমল একটি স্পর্শ অনুভব করেছে সে, নাকে এসেছে মৃদু একটু সৌরভ। তুলসী !

পাতলা অন্ধকারে খুব স্পষ্ট না হলেও দেখা যাচ্ছে মেয়েটিকে। সম্পূর্ণ চেনা মুখ।

বিদ্যুৎবেগে উঠে বসল মনোতোষ ; বলল, এ সময়ে কেন ?

একটা কথা তোমাকে শুধোতে এলাম।—ফিসফিস করে উত্তর দিল তুলসী।

মনোতোষ বলল, কি কথা ?

তুমি বল তো কি ?—বলে ফিক করে হেসে ফেলল তুলসী।

তারপর হেসেই চলেছে সে। নিঃশব্দ বলেই সেই হাসির দমকে কাঁপছে তার দেহ, কাঁপছে যেন তার চারিদিকের পাতলা অন্ধকারও। মনোতোষের বুকের ভেতরটাও কেঁপে উঠল—না ফেঁপে ফুলে দুলে উঠল তার ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত। রুদ্ধ নিশ্বাসে সে বলল, কি ব্যাপার ?

উত্তর হল : তোমারটা আগে শুনি। রাগ পড়েছে ?

ঘরের মধ্যে কম্পমান অন্ধকার ফিসফিস মধুর ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠছে এক-একবার। না স্বপ্ন দেখছে মনোতোষ !

হঠাৎ বাণী হল নিবিড় এক স্পর্শ। খাটের উপর মনোতোষের গা ঘেঁষে বসল তুলসী ; হাত রাখল তার কোলের উপর, মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে এবারও ফিসফিস করেই তুলসী বলল, এত রাগ কেন তোমার বল তো ?

মনোতোষের দেহের মধ্যে তরঙ্গায়িত রক্তস্রোতে তখন একটা যেন জ্বালা ধরেছে। কিন্তু কী মিষ্টি তা !

কোলের উপর থেকে তুলসীর হাতখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়েও আবার খপ করে সেই হাতই ধরে ফেলল মনোতোষ।

তুলসী বলল, তবু ভাল। কিন্তু তখন অত শক্ত কথাটা কেমন করে মুখে আনলে তুমি ?

কি কথা ?

আহা, কিছু জানে না আর কি !

উত্তর দিল না মনোতোষ, কিন্তু তুলসীর নিরলঙ্কার কোমল মণিবন্ধের উপর আরও জোরে চাপ দিল সে।

তুলসী বলল, উঃ, লাগছে।

আর আমার লাগে না বুঝি?

তবে ছাড়, আমি যাই।

না, আর একটু বস।

বসলে কার কি লাভ? এতেই তো কাঁপছ তুমি, লাগল বুঝি?

আমার ভয় লাগবে!

না, মস্ত বীর পুরুষ কি না তুমি!

মনোতোষ যে উত্তর দিল তা আর কথায় নয়। তুলসীর হাত তো তার নিজের হাতে ধরাই ছিল, এখন তাতে জোরে একটা টান দিল সে।

জোর না করলেও চলত—তুলসী ঢলে পড়ল মনোতোষের কোলের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই ফিসফিস করে সে বলল, তোমার সঙ্গে শিবপুরের বাগানে যাই নি বলে খুব তো রাগ করলে। কিন্তু, গেলে কি করতে তুমি?

এই—

উত্তরে মনোতোষের কথা ওই একটিই, অবশিষ্ট উত্তর অনুভব করল তুলসী তার গালে, চিবুকে, নাকের ডগায়—যেন জলন্ত অঙ্গারের স্পর্শ; পাথরের মত আর একখানি বিশাল বুকের উপর ইস্পাতের মত শক্ত দুটি বাহুর নিষ্পেষণে পাঁজরার হাড়গোড় যেন ভেঙে যাচ্ছে তুলসীর। নিঃশ্বাস ফেলবারও অবসর পাচ্ছে না সে—এমনি অবিরাম চুম্বনবৃষ্টি মনোতোষের।

তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুজনের কারও বুঝি কোন হুঁশ ছিল না। সম্ভোগের পর অবসাদ—স্বপ্ন অন্তে সুষুপ্তির মত। ঘোর যখন কাটল তখন নিজের দুটি বাহু দিয়ে লতার মত মনোতোষের গলা জড়িয়ে ধরে তারই বুকের উপর মাথা রেখে শিথিল আলস্যে পড়ে আছে তুলসী; শিথিল দেহ মনোতোষেরও—তার হাতখানি ঘিরে আছে তুলসীর কটিদেশ।

বাহুর বন্ধন আরও একটু দৃঢ় করে তুলসী বলল, এ কি হল!

তরল কণ্ঠস্বর তার। তবু যেন বিদ্যুৎস্পর্শ। যেন সেই স্পর্শেই সঞ্জীবিত হয়ে মনোতোষ বলল, তাই তো—এ কি হল!

সঙ্গে সঙ্গেই তুলসীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল মনোতোষ। উঠল তুলসীও। হাই তুলল একবার। তারপর উত্থিত বাহু দুখানি ঘাড়ের উপর দিয়ে পেছন দিকে বাড়িয়ে এলোখোঁপা বাঁধবার শিথিল প্রচেষ্টা তার। তবে সেই সঙ্গেই মুচকি হেসে সে বলল, কি—ভুল ভাঙল?

কিন্তু মনোতোষ অস্থির। সে ডাকল, তুলসী—

তুলসী বলল, কি?

এ কাজ কেন করলে তুমি?

তুমি ঢঙ বললে কেন?

মনোতোষ উত্তর দিল না। একটু পরে তুলসীই আবার বলল, তাই বলছি তোমার ভুল ভেঙেছে তো? বুঝেছ যে আমি ঢঙ করি নি? বিশ্বাস করেছ যে তোমাকে আমি সব দিতে পারি?

মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘাড় নাড়ল মনোতোষ। দেখেই উৎফুল্ল হয়ে তুলসী বলল, তাহলেই সব পেলাম আমি। এখন তবে যাই।

ধীরে ধীরে খাট থেকে নামল তুলসী, বিস্রস্ত বাস সংবরণ করল, আঁচল তুলে দিল মাথায়; তারপর অল্প একটু হেসে হাত বাড়িয়ে চরণ স্পর্শ করল মনোতোষের।

আর তাতেই বুঝি সম্বিৎ ফিরে এল পুরুষের—সঙ্কল্পও তার স্থির হয়ে গেল।

তুলসীর সেই প্রসারিত হাতখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে মনোতোষ কোমল কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল, আমিও সব পেয়েছি, আর রাখবও সবই—ফুলের সঙ্গে তার কাঁটাটিও। মন আমি ঠিক করে ফেললাম তুলসী—তোমাকে আমি বিয়ে করব।

কি বললে?

আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া। একটু আগেই তুলসীর যে মুখখানা আনন্দে ও গর্বে বিচিত্র হয়ে উঠেছিল সেই মুখই অকস্মাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল। শিউরে উঠল তুলসী। এক টানে মনোতোষের মুঠো থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করল, কি বললে তুমি?

আমি তোমাকে বিয়ে করব।

চুপ চুপ—অমন কথা মুখেও এনো না মণ্টুদা।

ব্যাকুল কণ্ঠস্বর তুলসীর; কিন্তু মনোতোষ অল্প একটু হেসে শান্ত কণ্ঠেই বলল, যা কাজে করেছি তা সমাজের পাঁচজনকেও জানাতে হবে বইকি।

না, হবে না।

কেন নয়?

বিয়ে আমাদের হতেই পারে না।

কেন পারে না?

আমি কি তোমার যোগ্য যে বিয়ে হবে আমাদের?

কথা তো নয়, একটা যেন আর্তনাদ তুলসীর। কিন্তু মনোতোষ আগের চেয়েও দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, ও কথা এখন অবান্তর। ভালবাসা যেখানে আছে সেখানে আর কিছু না থাকলেও চলে।

না।—তুলসী মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করল: তোমার চললেও কর্তাবাবুর চলবে না, কর্তামার চলবে না।

তাহলে তাঁদের অমতেই বিয়ে হবে আমাদের। বিয়ের পর আলাদাই থাকব আমরা। এমন কতই তো আজকাল হয়।

অন্যের হলেও আমাদের হবে না—আমি হতে দেব না।

সত্যের অবিসংবাদিত ঝঙ্কার তুলসীর কণ্ঠস্বরে, তবু কাঁপছে তা।

বিস্মিত, বিব্রত, বিভ্রান্ত মনতোষ; অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল, এ কি পাগলামি তোমার?

সঙ্গে সঙ্গেই হাতও বাড়িয়েছিল সে, আবার হাত ধরবে তুলসীর। কিন্তু দূরে সরে গেল তুলসী। সেখান থেকে অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, আমার মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি মণ্টুদা, ওই অলক্ষুণে কথা আর একটিবারও যদি মুখে আন তুমি তাহলে আমি গলায় দড়ি দোব।

ভয় নয়, বিভ্রান্তিতে—খাটের উপর ধুপ করে বসে পড়ল মনোতোষ। নিজেকেই নিজে যেন প্রশ্ন করল সে, তাহলে কি হবে!

আঁচলের খুঁটে তখন চোখ মুছল তুলসী। তারপর—আশ্চর্য! মুখ টিপে হাসল সে। হাসতে হাসতেই বলল, কি আবার হবে? দু-চার দিনের মধ্যেই আমি ময়নাপুরে ফিরে যাব; আর দু-চার মাসের মধ্যেই তুমি তোমার উপযুক্ত রাঙা টুকটুকে বউ একটি ঘরে আনবে।

কি?

বলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল মনোতোষ। কিন্তু তুলসী আরও দূরে সরে গেল—একেবারে দোরের কাছে। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, আহা, সবটা আগে শুনবে তো তুমি।

বাজে কথা।

বাজে নয় গো—এই রকমই তো হয়। তবে হ্যাঁ, তোমার যখন ফুটফুটে ছেলে একটি হবে তখন না হয় সেই খোকনসোনাকে লালন করবার জন্যে এই ভূতিকে ডেকো তুমি। ডাকলেই আমি সুড়সুড় করে চলে আসব।

ঘ

কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্প মনোতোষের, তুলসীকে বিয়ে সে করবেই।

অমন যে মাথার দিব্যি তুলসীর, তাও যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল মনোতোষ; সে রাত্রে তুলসীর অমন পরিহাসেও সে ভোলে নি, মঞ্জুর করে নি তুলসীর আবেদন।

তবে বুঝি অনেক উপরে আর এক দরবারে মঞ্জুর হয়েছিল তা।

কিন্তু সে আজব দরবারের আজব কাণ্ডকারখানা। সেখানে আইন আলাদা, চুলচেরা বিচার; যে ভাষায় সেখানে রায় লেখা হয় তার আবার সব কথার মানে বোঝা যায় না এই আমাদের নীচের তলায়। সুতরাং বুঝেও বোঝে নি তুলসী—কী মঞ্জুর হল আর কী হল না।

সে মঞ্জরী হবার পরেও নয়।

মনোতোষ অত করে তাকে বিয়ে করতে চাইলেও বিয়ে তাদের হয় নি; আর একটি টুকটুকে রাঙা বউও ঘরে আসে নি মনোতোষের। তবু তারই খোকনসোনা তুলসীর কোলে এসে জুড়ে বসেছে।

কেমন করে কী যে হল বোঝাই যায় না। একটা যেন ঘূর্ণাবর্ত—না ভূমিকম্প! বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ উঠে সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে গেল। খামখেয়ালীর তাণ্ডব। যা ছিল তা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেও ধ্বংসস্তূপের ফাঁকে ফাঁকে সেই ঘূর্ণিই আবার কোথা থেকে এ কী সব অমূল্য রত্ন এনে রেখে গেল। নিস্তরঙ্গ একটি ডোবার মতই জীবন ছিল তুলসীর; আকস্মিক এক ভূমিকম্পের বিপর্যয়ে তাই কি না বাঁধ ভেঙে পথ

কেটে হয়ে উঠল এক কুলুনাদিনী স্রোতস্বিনী, যা সাগর-সঙ্গমে না পৌঁছলে থামতে পারবেই না।

কাঁদতে কাঁদতে হেসেছে তুলসী, হাসতে হাসতে কেঁদেছে। মঞ্জরী হবার পর নবদ্বীপের পথে-ঘাটে সে গেয়ে বেড়িয়েছে হাসি-কান্নার গান :

একই পথে জীবন-মরণ
বিষ অমৃতের যুগল মিলন
জানে কেবল রসিক সুজন রে।

কিন্তু সেদিন হাসে নি তুলসী, কাঁদেও নি। আশ্চর্য! চোখে তার এক ফোঁটা জলও আসে নি, মনোতোষের ক্ষত-বিক্ষত সংজ্ঞাহীন দেহটাকে চোখে দেখেও নয়।

পরের দিনও কাঁদে নি তুলসী—ওঁদের কলকাতার বাড়ি থেকে তার কর্তামা যেদিন তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন।

দিন তিনেক পর কে যেন খবর নিয়ে এসেছিল। খবর তো নয়—যেন বিনামেঘে বজ্রপাত। অর্থ বোঝা যায় না তার, বোঝা গেলেও বিশ্বাস হয় না, অথচ দেহ ও মনের প্রতি অণুপরমাণুতে প্রত্যক্ষ দর্শনের তীব্র সচেতনতা।

পাগলিনীর মত আলুথালু বেশে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা ; সঙ্গে সঙ্গে তুলসীও।

জ্ঞান তো ছিলই না মনোতোষের, মিটিমিটি জ্বলছিল প্রাণের যে ক্ষীণ শিখাটি তাও সেই দিনই নিভে গেল।

তীব্র মর্মভেদী একটা আর্তনাদ করে সেই মুহূর্তেই মূর্ছিত হয়েছিলেন অন্নপূর্ণা। সে মূর্ছা ভাঙলেও জ্ঞান আর অজ্ঞানের সীমান্তেই পড়ে রইলেন তিনি। আহার নেই, নিদ্রা নেই ; চোখের তারায় দৃষ্টি নেই, আছে কেবল গতি ; আর যেন একটা জ্বালা ; মুখে দুটি কথার একটি মাত্র প্রশ্ন—কার পাপে ?

সেই তার উদ্‌ভ্রান্ত চোখে দৃষ্টি যখন ফিরে এল ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন তাঁর ওই প্রশ্নের উত্তরও পেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে পেলেন প্রচণ্ড এক সক্রিয়তা।

গোড়া থেকেই অন্নপূর্ণার সেবা করছিল তুলসী। ঠিক সেই মুহূর্তে তার কর্তামার পা টিপছিল সে দুটি চরণই নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে ; ভিজে ভিজে চোখ দুটি তার পড়ে ছিল প্রৌঢ়ার মুখের উপর ; সেই কারণেই উভয়ের চোখাচোখি।

অকস্মাৎ তুলসীর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে কর্কশ কণ্ঠে বললেন অন্নপূর্ণা, তোর—তোর—তোর।

বার বার তিনবার। পরক্ষণেই পদাঘাত করলেন অন্নপূর্ণা। উন্মাদিনীর শক্তি এসেছে তখন প্রৌঢ়ার দেহে। তার উপর আকস্মিক আঘাত। তুলসীর দেহটা খাট থেকে ছিটকে অনেক দূরে মেঝেতে গিয়ে পড়ল।

তবু সে কি গর্জন অন্নপূর্ণার : পাপিষ্ঠা, ডাইনী, রাক্ষসী—তোর পাপেই অকালে অপঘাতে মরল আমার মণ্টু। দূর হ তুই—দূর হয়ে যা।

আশ্চর্য! এক ফোঁটাও জল নেই তুলসীর চোখে। কেবল একটি বার তার কর্তামার ওই ভয়ঙ্কর রূপ সে চেয়ে দেখল ; চোখ তুলে একটি বার দেখল দেওয়ালে মনোতোষের ছবিখানাকে। তারপর ধীর মন্থর গতিতে ঘর ছেড়ে চলে গেল তুলসী।

সেই দিনই ওই বাড়ি থেকে ময়নাপুরে তার বাপের বাড়িতে।

ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এসেছে, তবু তার মায়ের মুখে হাসি নেই। তুলসীকে বলতেও বলছে না শুভঙ্করী।

তুলসীই তখন তার নত মুখ উঁচু করে উদ্ধত স্বরে বলল, একজন তো ভূত দেখেছিল। তুমি কি দেখছ—পেত্নী ?

তখন যেন সংবিৎ ফিরে এল শুভঙ্করীর ; সে বলে উঠল, ষাট ষাট—ও কি কথা তোর।

তবুও রুক্ষকণ্ঠেই তুলসী বলল, থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। বোঝাটা আবার ফিরে এল বলে রাগ যদি হয়ে থাকে তো খুলেই বল তা। আমি তাহলে এখান থেকেও চলে যাই।

শোন কথা!—বলে গালে হাত দিল শুভঙ্করী : তাই আমি বললাম নাকি, না ভাবতেও পারি ? বাড়িতে ফিরে আসবি তা তো জানাই ছিল, চিরদিন ওখানে থাকবার জন্যে তো তোকে কলকাতায় পাঠাই নি। ফিরে আসবার রকমটার জন্যেই যা দুঃখু।

কি আবার রকম দেখলে তুমি ?

দেখা তো নয়, শোনা কথা। তোকে নাকি তাড়িয়ে দিলেন কর্তামা ? কেন ?

তা আমাকে কি বলছ, শুধাও গে তোমার গুণের জামাইকে।

ওটা মোক্ষম প্রত্যুত্তর। নিতাইপদ দাঙ্গা বাধিয়েছে বলেই তো মারা পড়েছে বড় বাড়ির ছোটবাবু। দাঙ্গাকারীর শ্বশুরবাড়ির মেয়ে ভূতির উপর দিয়ে একটা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা তাদের হতে পারে বইকি।

ব্যাখ্যাটা মেনেই নিল শুভঙ্করী। তখন চোখ ফুটল তার। সে চোখ নিত্যকালের মায়ের চোখ সেই চোখ দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল শুভঙ্করী তুলসীর স্বভাব-উজ্জ্বল গৌরবর্ণের উপর কে বুঝি এক হাঁড়ি কালি ঢেলে দিয়েছে।

তখন মেয়েকে বুকে টেনে নিয়েছিল শুভঙ্করী। আর তখনই তুলসীর অতদিনের অবরুদ্ধ অশ্রু বাঁধভাঙা জল

স্রোতের মত তার দুই চোখ ফেটে বেরিয়ে এসে দুজনেরই বুক ভিজিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু মাস দুই পর একদিন অট্টহাসি হাসল তুলসী। শুভঙ্করীর চোখেই প্রথমে ধরা পড়েছিল।

বজ্রাহতের মত অবস্থা তার; শুষ্ককণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, এ দশা তোর কে করেছে?

তুলসী প্রথমে বলেছিল যে সে জানে না। কিন্তু মায়ের হাতের একটি চড় খাবার পরেই রুখে উঠল সে; বলল, কে আবার? আমার দশা আমিই করেছি।

পোড়াকপাল! মরতে পারিস নি?

কেন মরব, কোন্ দুঃখে?—বলেই উদ্ধতভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেল তুলসী এবং বাইরে গিয়েই খিলখিল করে সে কি হাসি তার! ভ্রাতৃজায়া শ্যামাসুন্দরীকে একেবারে জড়িয়ে ধরল তুলসী।

বিস্মিত হয়ে শ্যামা বলল, এ কি ঠাকুরঝি, এত হাসি কেন?

উত্তর না দিয়ে সুর করে গেয়ে উঠল তুলসী:

চান্দের গাছে চাঁন ধরেছে আমরা ভেবে করব কি,
ঝিয়ের পেটে মায়ের জনম তারে তোমরা বল কি?

মরণ!—বলে শ্যামা ঠেলে সরিয়ে দিল তাকে।

তাতেও পরোয়া নেই তুলসীর। উঠে গিয়ে শ্যামারই বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে তুলে নিল সে।

হকচকিয়ে গেল মেয়েটাও। কেবল কোলেই তুলে নেওয়া নয়, পিসীমা বুকে নিয়ে যেন পিষে ফেলছে তাকে; দুই হাতে চটকাচ্ছে, শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিচ্ছে আবার এবং ক্রমাগতই বলে চলেছে, তোর মা তো হাসতে জানে না রে! তা তুই হাস তো—সোনা আমার, ধন আমার, রতন আমার, মানিক আমার, হাস হাস—হি হি হি, হো হো হো।

শেষে সাড়া দিল বাচ্চাটাও। তারপর সে কি ছুটোছুটি লুটোপুটি দুজনের। শুভঙ্করীও যে ইতিমধ্যে আবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে খেয়ালই নেই তুলসীর।

শ্যামা তো বিহ্বল হয়েই ছিল, এখন শাশুড়ীর কাছে এগিয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে মা—ঠাকুরঝি এমন করছে কেন?

আর তো আড়াল নেই! কপালে করাঘাত করে শুভঙ্করী বলল, কী কালসাপ পেটে ধরেছিলাম বউ—কুলে কালি দিয়েছে ওই ভূতি।

বাড়ির আর দুজনেও সেই রাত্রেই শুনল খবরটা, শুভঙ্করীর মুখ থেকে রাধামোহন, শ্যামার মুখ থেকে বংশীধারী।

তখন তুলসীকে মাঝখানে নিয়ে গোল হয়ে সভা বসল। অতবড় মেয়েকে ধরে মারা যায় না, তাই যেন চোখের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা। তারপর শুরু হল প্রশ্নের বাণবর্ষণ।

গোড়াতে নতমুখে চুপ করেই ছিল তুলসী, ভাই এবং ভাজের মুখে মণ্টুবাবুর নাম শুনেও কোন উত্তর দেয় নি। কিন্তু তার বাবাও যখন তাকে ওই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল তখন চোখ তুলল সে; বাপের মুখের দিকে চেয়ে খুব শান্তকণ্ঠেই সে বলল, মরা মানুষটার নামে এই কলঙ্ক দেবে তোমরা? দিলে আমার কলঙ্ক ধুয়ে যাবে নাকি?

উত্তর দিল বংশীধারী, তা কি আর যায়—তুই তো আলকাতরা মুখে মেখেছিস।

তাহলে লাভটা কি তোমাদের?

আমরা খেসারত আদায় করব।

কিন্তু উলটো খেসারত দিতে যদি হয়?

এতক্ষণ যে সম্ভাবনার কথা কারও মনেই ওঠে নি তাই তখন বুঝিয়ে দিল তুলসী।

একে তো উকীল মানুষ বড় বাড়ির কর্তাবাবু। তাতে আবার অমন উপযুক্ত ছেলের অকালমৃত্যুতে শোকে-তাপে পাগল হয়ে আছেন। এই সময় রাধামোহন বা বংশীধারী তাঁদের সেই ছেলের নামেই অমন কলঙ্ক দিয়ে খেসারত চাইতে গেলে পাত্তা পাবে নাকি তারা? বরং উলটো সাজা পেতে হবে। কর্তাবাবুর জমিই তো ভাগে চাষ করে এতবড় সংসার পালন করা হচ্ছে, সেই জমি যদি কেড়ে নেন তিনি?

জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন। উদ্ধতভাবে কি একটা উত্তর দিতে গিয়েও হঠাৎ চুপ করে গেল বংশীধারী। রাধামোহন মুখ কালো করে বলল, তা তিনি নিতে পারেন।

কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়—স্বামীর চেয়ে স্ত্রী। শ্যামাসুন্দরী খ্যান খ্যান গলায় বলল, তাহলে ঠাকুরঝিকে নিয়ে আমাদেরই বা উপায় কি হবে!

উত্তর দিল তুলসী নিজেই: তার জন্যে তোমরা ভেবো না বউ, আমার এই কালামুখ নিয়ে তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলেই যাব আমি।

এতক্ষণ পর চোখে জল এল তুলসীর। তারপর আর বাঁধ মানে না তা।

কলঙ্কের কালিমা ধুয়ে যায় না তাতে—একটি রেখাও না। কিন্তু যে মুখখানিতে তা লেগে রয়েছে তা যে পেটের মেয়ের মুখ—বড় সুন্দর, বড় করুণও। শোকে দুঃখে, রাগে অপমানে শুভঙ্করীর যে বুক জ্বলে যাচ্ছে, তাই আবার সমবেদনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

আহা রে!—বলে তুলসীকে সে বুকে টেনে নিল।

ভাসিয়ে কি দেওয়া যায় পেটের মেয়েকে, না দেওয়া যায় ভেসে যেতে!

বড়দের মধ্যে শলাপরামর্শ চলল কয়েকদিন। তারপর একদিন আবার মেয়েকে কাছে নিয়ে বসল শুভঙ্করী। বলল, হ্যাঁ রে ভূতি, দিন তো তোর দেখছি বেশ কেটে যাচ্ছে।

মুখের হাসি মরে না তুলসীর। হেসেই সে বলল, তা কি একা আমার? দিন তো সকলেরই কাটে। মানুষ অনেক হলেও দিন তো একই।

কিন্তু আমার যে মুখে ভাত রোচে না।

তা আমি কি করব?

কাঁটাটা খসাতে হবে না?

এবার নিরুত্তর তুলসী, চোখের পাতার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানিও তার নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

মেয়ের সেই আনত মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল শুভঙ্করী, তারপর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল, কচি মেয়েটি তো তুই নস্, সময় থাকতেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো!

কি ব্যবস্থা?

নবদ্বীপ যাবি?

নবদ্বীপ!—বলে চমকে মুখ তুলল তুলসী।

শুভঙ্করী তখন মেয়ের হাতখানা নিজের কোলের উপর টেনে এনে বলল, দয়াল ঠাকুরের ধাম নবদ্বীপ। তাঁর পায়ে গিয়ে পড়লে শুনেছি পাপীতাপী সকলেরই গতি করেন তিনি। যাবি সেখানে?

অনেকক্ষণ ভাবল তুলসী। আঁচলের কোণগুলি মুড়ে মুড়ে প্রদীপের সলতে পাকাল যেন, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল, হাতের নখও কাটল কয়েকটি; তারপর কিন্তু সোজাসুজিই মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, যাব।

স্পষ্ট উচ্চারণ, শান্ত কণ্ঠস্বর। ভাসতে ভাসতে অবশেষে বুঝি একটা অবলম্বন পেয়েছে তুলসীর মন।

কাঁটা খসাবার কথাটা তার মায়ের মুখ থেকেই শুনেছিল তুলসী। কিন্তু এই নাকি সেই ব্যাপার!

পাথরের ছোট বাটিতে কালচে রঙের তরল পদার্থটুকুর দিকে চেয়ে আঁতকে উঠল তুলসী।

নামে আখড়া, দেখতেও তাই। দয়াল ঠাকুর নিতাই-গৌরের একজোড়া বিগ্রহও ঘরে আছে। সারা গায়ে তিলক ছাপ আঁকা বিভিন্ন বয়সের অনেক বোষ্টমী ও জন দুই বোষ্টম সে দেখেছিল সেই প্রথম দিন আখড়াতে ঢুকতে না ঢুকতেই। তবু ভাল লাগে নি তুলসীর। অনেক কালের পুরনো দেওয়ালঘেরা অত বড় বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি বলে মনে হয়েছিল তার।

ভাল লাগে নি ওই আখড়াবাড়িতে বেশ বেশী বয়সের, মোটা এবং কালো হরিপ্রিয়াকেও। তার গালভরা হাসি আর গায়ে ঢলে-পড়া ভাব বরং খারাপই লে[illegible] তুলসীর।

আদিখ্যেতা।

বংশীধারীর সঙ্গে দু-চারটি কথা বলবার পরেই হাসি নিয়ে তুলসীর কাছে এগিয়ে এসে সে ব[illegible] আমার নাম বাছা, হরিপ্রিয়া। তবে পাঁচজনে হ[illegible] বলেই ডাকে আমাকে। তুমিও তাই ডেকো, অথবা মাসীই।

বংশীধারীর মুখ থেকে তুলসীর নামটা শুনেই গ[illegible] হাসি কান পর্যন্ত প্রসারিত করে সে আবার ব[illegible] বা বা, এ যে দেখছি জন্ম থেকেই ঠাকুর যে[illegible] কাছে ডেকে রেখেছেন। নইলে কি আর এমন না[illegible]

শুনে কিন্তু খুশী হয় নি তুলসী, বরং তার পা[illegible] মাথা পর্যন্ত কেমন যেন সিরসির করে উঠেছিল।

তবু তার নিজের মনে এক বিস্ময়কর আবি[illegible] প্রত্যাশা ছিল বলেই ওখানেই থেকে গিয়েছিল [illegible] বংশীধারী চলে যাবার পরেও আশায় আশায় গুনে[illegible] সে এক একটি দিন নয়, যেন প্রতিটি মুহূর্তই।

অথচ এই নাকি তার ফল, এই নাকি তার [illegible] খোকনসোনাকে আবাহন করবার পদ্ধতি!

নারীর সহজ সংস্কারই বুঝিয়ে দিয়েছে তুলসীকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত মাথাটাকে সরিয়ে নিয়ে আর্তব[illegible] বলে উঠল, আমার সন্তান নষ্ট করতে চাও তুমি?

হরিমাসীও আঁতকে উঠেছিল; কিন্তু ফিসফিস[illegible] সে বলল, চুপ চুপ, এত জোরে বলতে আছে নাকি! এমন কথা!

তুলসী বলল, কথাটা আসলে কী তাই তো [illegible] চাই আমি। কি মতলব তোমাদের? আমার [illegible] মারতে চাও?

তা ছাড়া উপায় কি, ওটা পাপের ফল না?

পাপের?

তা ছাড়া আর কি! বিধবা মেয়ে নও তুমি?

শুনে হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল তুলসী। কি[illegible] কেবল একটি মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই ছিলে-[illegible] ধনুকের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে সে বল[illegible] গো, এ আমার পাপের ফল নয়। আর হলেও আমি নষ্ট করতে দেব না।

ও মা, এ মেয়ে বলে কি!

হরিমাসী বলল যেন আকাশ থেকে পড়তে পড়[illegible] ও মন না থাকলে এখানে তুমি এলে কেন?

তুলসী উত্তর দিল, না জেনে এসেছিলাম।

তা এখন তো জানলে।

কারবারও চুকে গেল। আমি এখান থেকে যাব।

ততক্ষণে হরিমাসীও নিজেকে সামলে নিয়েছে, এবার সে নিজমূর্তি ধারণ করল : বটে!

বলে উঠে দাঁড়াল হরিমাসী। গোল গোল চোখ দুটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে আবার বলল, তেজ তো দেখছি কম নয় মেয়ের। তবে আমারও নাম হরিপিয়ারী। তোমার মত অনেক দেখেছি আমি; কেমন করে ওষুধ তাদের খাওয়াতে হয় তাও আমি জানি। তোকেও খাওয়াব। খা শীগগির—খা।

বলতে বলতে হরিমাসী তার বাঁ হাত দিয়ে তুলসীকে জাপটে ডান হাতের ওষুধের বাটি তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তুলসীর দেহে তখন বুঝি সিংহীর বিক্রম এসেছে। সে তখনই চিবুকের ঠেলা দিয়ে উলটে দিল বাটিটাকে। তরল জিনিসের প্রায় সবটাই গড়িয়ে পড়ল হরিমাসীর গায়ে, বাটিটা মেঝেতে পড়ে খানখান হয়ে গেল। আর সেই সুযোগে মাসীকেও ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে নিজে সে দাওয়া থেকে ছুটে উঠোনে নেমে গেল।

তেজ কথাটা ঠিকই বলেছিল হরিমাসী। তখন রণরঙ্গিনীর মূর্তি তুলসীর। মাথার কাপড় পড়ে গিয়েছে তার, চোখ দুটি জ্বলছে, নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে আর সেই তালে তালে উঠছে আর নামছে তার বুক। উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, এ কি মগের মুলুক যে জোর করে বিষ খাওয়াবে আমাকে? খাব না আমি—চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।

প্রাচীর-ঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ি। সেকেলে ধাঁচে উঠোনের চারিদিকেই সারবন্দী সব ঘর। ঘরের দেওয়াল আর প্রাচীরের মাঝখানে যেমন, উঠোনেও তেমনি বড় বড় অনেক গাছ। একটি তো বট। দিনের বেলাতেও সারা বাড়িতেই গাছের ছায়া ঘন হয়ে জমে থাকে। তখন তো সন্ধ্যা, অথচ অতবড় বাড়িতে একটির বেশী আলো জ্বলে নি। যারা আলো জালবার আয়োজন করছিল তারাও কাণ্ড দেখে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসেছে উঠোনে। স্পষ্ট করে কিছুই আর দেখা যায় না। পাতলা অন্ধকারে ভূতুরে বাড়ির মত ওই আখড়াতে স্ত্রী-পুরুষ কয়েকজনকেও ভূত ভূত মনে হচ্ছিল।

অত যে তীক্ষ্ণ তুলসীর কণ্ঠস্বর তাও ওই থমথমে অন্ধকারকে খানখান করে কাটতে পারল না। দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে গম গম শব্দে ফিরে এল তা। তখন ধ্বনির ভারে আরও যেন ভারী অন্ধকার, আরও গাঢ়।

তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই আর একটা গলা শোনা গেল : চেঁচিয়ে কি করবে বাছা—এখানে চেঁচালে বাইরে থেকে কেউ কি তা শুনতে পায়?

মেয়েলি গলাই; একটু বুঝি সহানুভূতিও তাতে আছে। কিন্তু সান্ত্বনা যে একটুও নেই তা বুঝেই তুলসী তার স্বর একটু নীচু করেই বলল, যাক গে—আমি শোনাতেও চাই না। চলেই তো যাব আমি—এক্ষুনি যাচ্ছি।

কি?

আবার সেই হরিমাসীর কণ্ঠস্বর : আমার গায়ে হাত তুলে তারপর পালিয়ে যাবি তুই! ধর তো ওকে—রাতের মত কয়েদঘরে বন্ধ করে রাখ।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল তুলসী : ধরে রাখবে আমাকে? এস তো, কে গায়ে হাত দেবে আমার? দেখি তো কার কত সাহস?

সিংহের গর্জন আর নয়—একটা যেন কালকেউটে ফুঁসছে; দোলাচ্ছে যে ফণাটাকে তাও আবছা আবছা দেখা যায়। অতবড় আখড়ার সব কজন বোষ্টম-বোষ্টমীই দল বেঁধে ওই উঠোনে উপস্থিত থাকলেও একজনও তুলসীকে ধরতে এগিয়ে এল না। অমন যে হরিমাসী সেও অতঃপর নিশ্চল ও নির্বাক।

অন্ধকারে পথ খুঁজে পেতে একটু যা বাধা। তবে অল্প আয়াসেই তা অতিক্রম করে ছুটে বেরিয়ে গেল তুলসী।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

শীতাংশু মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

তাই এলা অতীনকে বিয়ে করে না, বলে :

'চাই, চাই, চাই, তোমার চেয়ে বেশি কিছুই চাই নে এ জগতে। যে-সময়ে দেখা হলে শুভদৃষ্টি সম্পূর্ণ হত সে-সময়ে হয় নি যে দেখা। কিন্তু তবু বলছি ভাগ্যে হয় নি।'

অতীন—'কেন? কী ক্ষতি হত তাতে?'

এলা—'আমার জীবন সার্থক হত, কতটুকুই বা তার দাম। কারও মতো নও যে তুমি; মস্ত তুমি। তফাতে আছি বলেই দেখতে পেলুম সেই তোমার অলোক-সামান্য প্রকাশ। সামান্য আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবার কথা কল্পনা করতে আমার ভয় করে। আমার ছোট সংসারে প্রতিদিনের তুচ্ছতার মানুষ হবে তুমি!...মেয়েদের সম্বল জীবনের যত সব খুঁটিনাটি, সেই বোঝা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে; তারা ট্র্যাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোখের সামনে দেখেছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিল না;... নিজেকে ভোলাতে চাই নে, অন্তু। প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন।...পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।'

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ভারতীয় ঐতিহ্যাগত আর একমাত্র প্রেমকেই বাঁচাবার, প্রিয়া হয়ে বেঁচে থাকবার লালসা প্রতীচ্যের রোমান্টিক দর্শনজাত। প্রিয়াকে বাঁচাবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ উদ্‌গ্রীব; সংসারধর্মের মূল্য, সুস্থ দাম্পত্যজীবনের মূল্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথে গৌণ। তিনি ভীত পাছে 'শুধু দিনযাপনে প্রেমকে নিষ্পিষ্ট করে। তার চেয়ে চিরবিচ্ছে কাম্য। কিন্তু বিবাহে বদ্ধ না হলে, একসঙ্গে জী না করলেই কি এই প্রেম বেঁচে থাকবে? মান কি এমনি কঠিন বৃন্ত? তার উত্তর লাবণ্য দিয়ে

'মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত-মূর্তি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হ'ক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লে

... ...

ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান;'

কিন্তু তা নয়। শুধু তারই সৃষ্টি তাকে দিলে বিয়ে ব্যথা কেন? একটু আগেই নায়িকা স্বীকার করে

'কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্ত-বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহি
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।'

এই প্রেম তাকে এমন সন্ত্রস্ত করে তুলেছে যে পত্রান্তরে সে নিজেকে তিলে তিলে দান করতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। যোগমায়াকে আপন মনের কথা বোঝাতে গিয়ে লাবণ্য স্বীকার করল যে এ প্রেম চিরন্তন না হলেও এর ক্ষণিক সৌন্দর্যই তার কাছে যথেষ্ট:

'যতদিন পারি, না হয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। না হয় সে, গুটি থেকে বের-হয়ে-আসা দু-চার-দিনের একটা রঙিন প্রজাপতিই হল, তাতে দোষ কী—জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়—না হয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিলে, আর সূর্যাস্তের আলোতে মরেই গেল তাতেই বা কী?'

তাতে আর কিছু নয়, তাতে দুঃখ, তাতে মর্মদাহ। এর ফলে 'করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান' আর একজন। তা ছাড়া আর একজনেরই বা প্রয়োজন হল কেন? এই প্রেমের স্মৃতি নিয়েই তো বেঁচে থাকা যেত। তাহলে কি প্রেম সুস্থ জীবনের পরিপন্থী; প্রেম কি সুস্থ জীবনের মৃত্যু? তাহলে কি আমাদের বোদ্‌লেয়ারের তত্ত্বেই ফিরে গিয়ে বলতে হবে যে প্রকৃতির পায়ে আত্ম-বলিই কি প্রেম? উর্বশী আর লক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় ঐতিহ্যের কেন্দ্রীয় শান্তি ও সামঞ্জস্যের তত্ত্ব থেকে কত দূরে নিয়ে এল?

এই সূত্রেই মনে আসে D. H. Lawrence-এর বহুখ্যাত উপন্যাস *Women in Love*-এর কথা। Birkin সম্পর্কে তার প্রণয়িনী Ursula-র লাবণ্যের মত দ্বিধা। আবার Lawrence সম্পর্কে বিশেষ করে মনে রাখবার কথা তাঁর জননী-প্রবণতা। তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস *Sons and Lovers*-এ নায়ক Paul-এর জীবনে প্রেমে ব্যর্থতার জন্তে দায়ী তার জননী-প্রবণতা। এই উপন্যাস-খানি আত্মকাহিনীনির্ভর। Lawrence-এর উপন্যাসে জননী-প্রিয়া দ্বন্দ্ব এক বিচিত্র রূপ নিয়েছে। কিন্তু *Women in Love*-এ সমস্যার রূপ হল প্রিয়ার জননী-ত্বা নায়কের চরিত্রে ঘর বাঁধবার মত মানসিকতার প্রাচুর্য সম্বন্ধে সন্দিহান। Birkin অমিতের মত রোমান্টিক নয়, সে Ursulaকে দেবী বানায় না, তবু তার চরিত্রে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে উৎকেন্দ্রিক, অসাধারণ, স্বমতকেন্দ্রিক হিসেবে প্রতিভাত করে। তাই Ursula-র সমস্যা। Ursula-র সঙ্গে তার বোন Gudrun-এর কথা হচ্ছে। Gudrun বলছে:

"Of course, there is a quality of life in Birkin which is quite remarkable. There is an extraordinary rich spring of life in him, really amazing, the way he can give himself to things. But there are so many things in life that he simply does n't know....In a way he is not clever enough, he is too intense in spate."

"'Yes', cried Ursula, 'too much of a preacher. He is really a priest.'"

"Exactly! He can't hear what anybody else has to say—he simply cannot hear. His own voice is too loud."...

"'You don't think one could live with him?' asked Ursula."

কিন্তু এর পরেই Ursula-র বিপরীত অনুভূতি এবং Birkin সম্পর্কে এই রকম একপেশে ধারণা করার জন্তে Gudrun-এর ওপর ঘৃণা। মানুষ কি একটা যন্ত্র নাকি যে তাকে একটা ছকে ফেলে দেবে: "She (Gudrun) finished life off so thoroughly, she made things so ugly and so final....This finality of Gudrun's, this dispatching of people and things in a sentence, was such a lie."* চূড়ান্ত করে দেখা, একেবারে হিসাব কষে ফেলাটা যে একেবারেই ভুল এইটি রোমান্টিক লাবণ্য বোঝে না। রবীন্দ্রনাথ এই ভুল এলাকে দিয়ে শোধরাবার চেষ্টা করেছেন 'চার অধ্যায়ে'র শেষ মুহূর্তে। কিন্তু সে তো আসন্ন সঙ্কটদস্থির দুঃসহ আবেগের আক্ষিপ্যে।

আট

এ আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যতিক্রম বলে মনে হবে 'নৌকাডুবি', 'গোরা' 'যোগাযোগ' এবং 'ঘরে বাইরে'। আসলে কিন্তু নৌকাডুবিতে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যা নিয়ে গল্প গড়েছেন সে সমস্যা তাঁর চেতনাতে আবির্ভূতই হত না, পাশ্চাত্ত্য প্রভাব তাঁর মনে শিকড় না গাড়লে। নৌকাডুবি উপন্যাসের 'চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।' বঙ্কিমের মনে এমন সমস্যার উদ্ভবের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। আবার যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বানাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরও তৎকালীন চেতনায়, হিন্দুর জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নিয়ে এই ভিত-নড়ানো প্রশ্ন জাগা সম্ভব ছিল না। নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং নারীর emancipation —এই দুই ব্যাপারে যে আদর্শবিপ্লব এদেশে ঘটল পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শে তারই সুস্পষ্ট কম্পনজাত এই 'নৌকাডুবি' উপন্যাস 'চোখের বালি'র পরেই লেখা। যে প্রশ্ন নৌকাডুবির মূলে আছে বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন সে প্রশ্ন কিন্তু চোখের বালিতেই উঠতে পারত, এবং উঠলে, বিনোদিনীই প্রমাণ করে দিত যে 'স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা'র সংস্কার সাধারণ মেয়ের মন থেকে অনপনেয় নয় এবং সে সংস্কার প্রথম ভালবাসার জালকে, ধিক্কার তো দূরের কথা দ্বিধার সঙ্গেও, ছিন্ন করতে পারে না। নতুন করে নৌকাডুবিতে এই প্রশ্ন তুলে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পদক্ষেপ করেছেন দ্বিধা-ব্যাহত চিত্তে, কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। কমলা আধুনিক মেয়ে নয়, তবু তার মনের স্বামী-সংস্কারকে জিইয়ে রাখতে হল প্রেমের সম্ভাবনাকে নির্মূল করেই। রমেশের সঙ্গে তার জীবন প্রথম থেকেই অস্বাভাবিক। তাই এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের যা প্রতিপাদ্য তা প্রতিপাদিত হয় নি; প্রত্যুত হেমনলিনীর ক্ষেত্রে প্রথম প্রেমের অপরাজেয়তাই প্রমাণিত। এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই তো অপেক্ষিত। প্রেমই তাঁর তাবৎ সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য—হয় নারী-প্রেম, নয় ভগবৎ-প্রেম। সে তিনি এক অন্ধ বা শাস্ত্রনির্দিষ্ট সংস্কারের চাপে করবেন এ তাঁর কাছ থেকে একেবারেই অপ্র[illegible] নৌকাডুবি উপন্যাস মূলতঃ রমেশের জীবনে যৌবনের প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার কাহিনী। [illegible] অপরিপক্ব, নমনীয় তরুণ মনের তীক্ষ্ণতায় অভি[illegible] দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত যেন Shakespeare-এর *Ro[illegible] Juliet*-এর star-crossed loverদের মত। [illegible] অনায়ত্ত কোনও শক্তির খেয়ালে রমেশের প্রথ[illegible] অকালমৃত্যু, হেমনলিনীরও তাই; নৌকাডুবি [illegible] জীবনের ভরাডুবি। ব্যর্থপ্রেম যে পুরো [illegible] ব্যর্থ করে দিল—এ চেতনা একেবারেই ভারতীয় বহির্ভূত, কেন না ভারতীয় জীবন এখনও পর্যন্ত ইহমুখী হবার, ঐহিক মানুষকে এতখানি মূল[illegible] সাহস বা সামাজিক সমর্থন লাভ করে নি। [illegible] অভিঘাতে যে চেতনার স্ফুরণ এবং প্রতিকূল [illegible] যে চেতনার নিষ্পেষণ সেই চেতনা, স্বাধীন [illegible] দলীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক একনায়কত্বে [illegible] নানা জাতীয় revivalist এবং obscurantist [illegible] আচ্ছন্ন হয়ে মরতে বসেছে। ভারতবর্ষ তার [illegible] বছরের ইতিহাসে সেই humanismকে স্বীকা[illegible] বা নিজের মধ্যে থেকে উজ্জীবিত করতে পা[illegible] রবীন্দ্রনাথ রমেশের জীবনের যে অচরিতার্থতাকে [illegible] দিকের উপন্যাসে উপস্থাপিত করলেন সেই অচরি[illegible] নানাভাবে 'চার অধ্যায়,' এমন কি 'শেষ [illegible] 'রবিবার' গল্পে পর্যন্ত স্ফুটতর হতে হতে এসেছে। [illegible] নলিনাক্ষ রবীন্দ্রোপন্যাসের বিষয়-বিন্যাসের প্রথ[illegible] থেকে বিচ্ছিন্ন।

যোগাযোগ উপন্যাসে প্রেম-চেতনার এই [illegible] আরও নিঃসংশয়িত অভিব্যক্তি। নৌকাডুবিতে [illegible] সম্পর্কিত সংস্কারের প্রথম প্রেমের আঘাত [illegible] ক্ষমতাকে যদি রবীন্দ্রনাথ পরখ করতে চেয়ে [illegible] তাহলে বলতে হবে যে, যোগাযোগে স্বাধিক[illegible] আত্মমর্যাদা-বোধ-সম্পন্ন ব্যক্তি-স্বাধীনতায় অ[illegible] রুচিশীলা কোন নারীর জীবনে স্বামী-সম্পর্কিত অর্থাৎ সতীত্বের আবহমানকালের সংস্কার

ায়ে, প্রেমের অভাবে টিকতে পারে কি না, তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নৌকাডুবিতে যেমন রবীন্দ্রনাথ ওই সংস্কারের সপক্ষে রায় দিতে পারেন নি বরং ব্যর্থপ্রেমের গ্লানি দিয়ে রমেশের জীবনে অকালরুক্ষতা এনেছেন তেমনি যোগাযোগে তিনি, প্রেমে যার ভিত্তি নেই এমন সতীত্বের জয়গান করতে পারেন নি; তাঁর সহানুভূতি সম্পূর্ণই কুমুর ওপরে। কুমুর অবস্থার বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত :

'স্বামীর সঙ্গে কুমুর অল্পকালের পরিচয় দিনে দিনে ভিতরে ভিতরে কী রকম যে বিকৃত মূর্তি ধরেছে গর্ভের আশঙ্কায় ওর মনে সেটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। মানুষে মানুষে যে-ভেদটা সবচেয়ে দুরতিক্রমণীয়, তার উপাদানগুলো অনেক সময় খুব সূক্ষ্ম। ভাষায়, ভঙ্গিতে, ব্যবহারের ছোট ছোট ইশারায়, যখন কিছুই করছে না তখনকার অনভিব্যক্ত ইঙ্গিতে, গলার সুরে, রুচিতে, রীতিতে, জীবনযাত্রার আদর্শে, ভেদের লক্ষণগুলি আভাসে ছড়িয়ে থাকে। মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহভাবেই গরিব ছিল, সেই জন্যে 'পয়সা'র মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে-মত ব্যক্ত করত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বারবার তুলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যেই। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহমনের, ওর সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীরমনকে সংকুচিত করে তুলেছে। যতই এগুলো দৃষ্টি থেকে চিন্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে, ততই এরা বিপুল আবর্জনার মত চারিদিকে জমে উঠেছে। আপন মনের ঘৃণার ভাবের সঙ্গে কুমু আপনিই প্রাণপণে লড়াই করে এসেছে। স্বামী-পূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু কত বড় হার হয়েছে তা এর আগে এমন করে বোঝে নি। মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে।'

তবু কুমুকে যেতে হল শ্বশুরবাড়ি, ভাবী সন্তানের দায়ে। সে বলে গেল, 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।' এই এমন কিছু হল কুমুর ব্যক্তিসত্তা, মানুষ হিসেবে তার স্বতন্ত্র বিশিষ্ট মূল্য, তার আত্মসম্মানবোধ। এ জিনিস পুরনো সতীত্বের ধারণায় পাওয়া যায় না। কুমু সেই সতীত্বকে কোন মূল্য দিতে রাজী না হলেও দশচক্রে ভগবান যেমন ভূত হন তেমনি কুমুকেও গিয়ে ঘোষাল-বাড়ির সতী-মা হতে হল। আত্মার সঙ্গে দেহের, মনুষ্যত্বের সঙ্গে মনুষ্যত্ব-ঘাতক আচারের দ্বন্দ্বে আচারেরই হল আপাত-জয়। বাইরের ঠাট ঠিকই বজায় রইল, দেউলে হল শুধু অন্তর। প্রেম আর বিবাহে যে দ্বন্দ্ব নৌকাডুবিতে খানিকটা কৃত্রিম, আকস্মিক বলে মনে হয়েছিল যোগাযোগে সেই দ্বন্দ্ব গভীরতর মূলের ইঙ্গিত দিল।

সে ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ধরেও টান দিয়েছেন। উপরের উদ্ধৃতিতে কুমুর চিন্তার একটা খেই হল, 'মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহভাবেই গরিব ছিল, সেইজন্যে 'পয়সা'র মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে-মত ব্যক্ত করত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বারবার তুলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যেই। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়...।' কুমুরা ছিল বনিয়াদী বড়লোক; তাই টাকার গরমের বদলে তাদের দেহেমনে লেগেছিল রূপোর স্নিগ্ধতা; টাকার ঝনঝনানির বদলে তাদের ছিল নূপুরের রিনিঝিনি। প্রথমে যে টাকা করে সে শুধু হয় ধনের ভারবাহক, যাকে বলে চিনির বলদ। পরের পুরুষেরা সেই ধনের বিচিত্র ব্যবহারে জীবনে স্থূলতা, কুশ্রীতা, কার্কশ্য, রুচিহীনতার বদলে আনে সূক্ষ্মতা; মার্জনা, শোভনতা, সৌকুমার্য। তাই মধুসূদনে যা নেই কুমুতে তাই আছে। এবং কুমুদের পরিবার এখন অর্থনৈতিক কয়িষ্ণুতায় আচ্ছন্ন বলে কুমুর এই সব গুণের ওপর একটা মধুর বিষাদের ছায়া পড়েছে। এর সঙ্গে আছে আভিজাত্যের সূক্ষ্ম ঔদাসিক্য। মধুসূদন তার বাগান

পাবে কি করে? তাকে কুমুর ইতর বলে তো মনে হবেই। দুজনের চারিত্রিক সংঘাতের মূলে তাই রয়েছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার আর উঠতি ধনিকের দ্বন্দ্ব।

এ হল গিয়ে মূল ধরে টান দেওয়া। ব্যাখ্যা একটা আছে বলে ঘটনাটা তো আর মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না। ভিত্তিতে থাকতে পারে অর্থনীতি কিন্তু উপরে আছে কামনা-ভাবনা-রাগ-দ্বেষ-সমন্বিত ব্যক্তিসত্তা। কুমুর কাছে তার এই বিবাহ নিজের ব্যক্তিসত্তার বলিদান বলে প্রতিভাত হচ্ছে; শ্বশুরঘর করা তার কাছে অপমৃত্যুর সমান; সে বলছে, 'আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে ক'রো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা-না-একটা মুশকিল বাধবে। তা হলে কেন এ বিড়ম্বনা। সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব; চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?' কথাটা তাহলে ওই বিশিষ্ট ব্যক্তি কুমুকে নিয়ে, পুরুষের ভোগ্যা নির্বিশেষ নারীকে নিয়ে নয়, আবহমান-কালের আচার-সর্বস্ব সতীকে নিয়েও নয়। সে সতীত্বকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করছেন ওই প্রতীচ্যের নূতন আদর্শের বলেই। 'ঘরে-বাইরে'র বিমলাও হিন্দু সমাজের নারীর আদর্শ নয়। আচারগত বিবাহ হবার পরেও সন্দীপের মাধ্যমে তার ব্যক্তিসত্তার দুর্বল দিক প্রকটিত যখন হল তখন পরম আত্মগ্লানির মধ্যে দিয়ে সে নিখিলেশকে ফিরে পেল, হয়তো বুঝল নিখিলেশের অ-গান্ধীবাদী রাজনৈতিক আদর্শের মহত্ত্ব ও সত্য মূল্য। সন্দীপ ও বিমলা এই উপন্যাসে শুধু নরনারী-সম্পর্কের স্থূল দিকটি প্রদর্শনের জন্যেই যে চিত্রিত তা মোটেই নয়। এরা দুজনে, বিশেষ করে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, সেই উচ্ছ্বাস অসহিষ্ণুতা এবং সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমের প্রতীক যা আধুনিক ভারতবর্ষে এবং সমস্ত [illegible] দেশে এখনও মহৎ গুণ বলে স্বীকৃত।

সন্দীপের পলিটিক্সই এখনও ভারতের পলিটিক্স নিখিলেশ যে রাষ্ট্রনীতি বোঝে সেই রাষ্ট্রনীতিই র নাথের রাষ্ট্রনীতি বলে তিনি স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিমলার চরিত্রে যে দু যে ভাঙবার উন্মাদনা তা সারা দেশেরই বিপথচ রাষ্ট্রনীতির প্রতীক। সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে যখ আত্মস্থ হল তখন নিখিলেশের মানস-সঙ্গিনী সে হল কিন্তু জীবনে এত ভুল শোধরাবার সময় তো থাকে নিখিলেশ তখন আর নেই। এখানেও তাই অসার্থক, তবে তফাত এই যে নিখিলেশ রবীন্দ্র-সা অদ্বিতীয়। বিবাহকে সার্থকতা দান করবার, অন্তরকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার এমন দীর্ঘ, ধ সহৃদয় আগ্রহ ও প্রয়াস বিশ্বের সাহিত্যে আর ে প্রদর্শিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। নিখিলেশের একাকিত্ব, তলস্তয়ের হাতে পড়লে, একটি দ্বিতীয় I of Ivan Ilych গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠত। রবী ওই চূড়ান্ত শূন্যতায় বিশ্বাস করেন না। তাই নি শুধু অপেক্ষা করল আর সন্দীপীয় পলিটিক্সের প্র জীবন দিল। এ জীবনদানেরও আধুনিক ভা প্রতীকী মূল্য আছে। নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের এই রূপায়ণ এবং বিমলার দুর্বলতাকে অমনি করে উ করে তবে তাকে আত্মস্থিত করার দুর্জয় রবীন্দ্রনাথ কখনই সনাতন, এমন কি বঙ্কিমী থেকেও লাভ করেন নি। জীবনের রাশ এমনি ছেড়ে দিয়ে তার উদ্দাম রূপটিকে বিকশিত করে তাকে কেন্দ্রস্থ সত্যে ফিরিয়ে আনার দুঃসাধ্য আমাদের ঐতিহ্যে নেই।

'ঘরে-বাইরে' ছাড়া 'গোরা' একমাত্র উপন্যাস ে রবীন্দ্রনাথ প্রেম আর বিবাহকে শুধু কেবল দুটি ব্যাপার হিসেবে দেখেন নি। বিমলাকে নিখিলে ঘরে নয়, বাইরেও পেতে চেয়েছিল; বিমলাকে দিতে চেয়েছিল যে, সে স্ত্রীলোক বলে কেবল ঘরের মধ্যেই আপন জীবনের মুষ্টিমেয় চরিতার্থতা খুঁজে না, তাকে বাইরেও নিজেকে পেতে হবে। ঘ বাহির নিয়েই ব্যক্তির সম্পূর্ণ সত্তা বিকশিত। শুধু ঘরে বন্ধ করে রাখলে তার ব্যক্তিসত্তা কে

খণ্ডিত হয় তা নয়, সেটি বিকৃত অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে এখনও দৈহিক ভাব নারীর জীবনই এই অর্থে খণ্ডিত এবং বিকৃত। বাইরে আসার বিপদ অবশ্য আছে কিন্তু সে বিপদ, যে পথ চলতে জানে না, তার পক্ষে। পথের বিপদ আছে বলে কেউ যদি পথে বেরনোই বন্ধ করেন তাহলে তাঁকে যেমন নিউরটিক বা স্নায়ুরোগগ্রস্ত বলা হবে, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকেও নারীকে সরিয়ে রাখলে তাকেও তেমনি অতিস্পর্শকাতর, স্নায়ুরোগগ্রস্ত করে রাখা হবে। বিমলাকে সহজ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বে পূর্ণ বিকশিত করতে গিয়ে কিছু বিপদ এল। অনভ্যস্ত আলোকে বিমলার পক্ষে নিজের bearings নির্ণয় করে নিতে কষ্ট হল, দুঃখ হল। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। নারীর emancipation-এর এ তত্ত্ব সম্পূর্ণতঃই প্রতীচ্যাগত। ঘরে-বাইরে পূর্ণ করে বিমলাকে পাওয়া অবশ্য নিখিলেশের হল না, কেন না বৃহত্তর জীবনের সংঘর্ষে সন্দীপেরাই প্রথম প্রথম জয়লাভ করে। নিখিলেশের গঠনমূলক জীবনাদর্শের চেয়ে সন্দীপের ভাঙার জীবনাদর্শ সাধারণ মানুষকে বেশী উত্তেজিত করে; শান্তির সক্রিয় বহু-আয়াস-লভ্য আদর্শকে সার্থক করতে যাওয়ার চেয়ে যেমন চট করে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া অনেক সহজ।

ঘরে-বাইরের অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ গোরা লিখেছিলেন। সেখানে গোরা প্রেম-ব্যাকুল রোমান্টিক নয়। স্বদেশী যুগের অন্ধ দেশপ্রীতি এবং আচার-সর্বস্ব হিন্দুত্বের মোহ থেকে গোরার মোহমুক্ত মানবপ্রীতির স্তরে পৌঁছনোর ইতিহাস হল এই সুদীর্ঘ উপন্যাস। গোরা যে কেবল nationalism থেকে internationalism-এ পৌঁছচ্ছে তাই নয়, সে নেশন-তত্ত্বেরই ঊর্ধ্বে উঠছে। সুচরিতা তার কাছে এই মোহমুক্তির সত্তপ্রাপ্ত অমৃত ফল। গোরার প্রেমের সার্থকতা তার বৃহত্তর জীবনের সার্থকতারই অংশমাত্র। কিন্তু গোরার এই বিশ্বমানবতা, বিশেষ করে সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে যাকে জাত করা যেতে পারে এমন বিশ্বমানবতা, কি Shelly তার পরে Goethe, তারপরে Whitman এবং Tom Paine, Godwin, Bentham, Mill, Comte, এমন কি Tennyson-এর 'Parliament of man'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব-প্রসূত নয়। এ ছাড়া সাম্যবাদের ইউরোপ-ব্যাপী ভাব-আন্দোলনের বীচিবিক্ষোভ রবীন্দ্রনাথের মনের তটে নিশ্চয়ই এসে লেগেছিল। ইউরোপের nationalism এখানকার জীবনে শিকড় গেড়ে বসবার আগেই তার সঙ্কীর্ণতায় বেদনার্ত মহাকবি রামমোহনের internationalism-কে আশ্রয় করে এগিয়ে গেলেন 'Parliament of man'-এর দিকে। Tennyson যে ব্যক্তিগত বিশ্বাসে monarchist ছিলেন তাতে কিছু যায় আসে না। কথা হচ্ছে তাঁর বিশুদ্ধ প্রভাবের। সবচেয়ে বলবান প্রভাব হল Whitman-এর এবং রামমোহনের মধ্য দিয়ে আসা ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রভাব।

নরনারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোরা উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য হল এই যে বাইরের সঙ্গে ঘরের বিরোধে এ সম্পর্ক আপন ঐশ্বর্যে বিকশিত হতে পারে না। সুচরিতার সঙ্গে গোরার পরিপূর্ণ আত্মিক সামঞ্জস্যের উপর তাদের মিলন প্রতিষ্ঠিত। বাইরের জীবনকে অমন করে না দেখলে গোরার পক্ষে এমন সামঞ্জস্যে পৌঁছনোর সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এ উপন্যাসের একটা দুর্বলতা হল সুচরিতার বৃহত্তর জীবনের, বাইরের জীবনের অনভিজ্ঞতা। তার গৃহগত সম্পূর্ণতা বাইরে এসে কতখানি টিকবে? এই সমস্যার অবতারণা এবং চিত্রণ ঘরে-বাইরেতে। গোরায় রবীন্দ্রনাথ সুচরিতাকে বাইরে আনেন নি। তখনও তাঁর পলিটিক্স এবং জীবন-দর্শন পুরুষ-কেন্দ্রিক ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় তাঁর দৃষ্টিকে এক অভূতপূর্ব উদারতা ও স্বচ্ছতা দিল। তারই প্রত্যক্ষ ফল 'ঘরে-বাইরে'।

[ক্রমশঃ]

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

বিক্রমাদিত্য হাজরা

আমাদের বর্তমান পর্যায়ের এই আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠক-সমাজের বিচারবুদ্ধিকে সজাগ সতর্ক ও সচেতন করে তোলা। এ কথা আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক পাঠকের মনেই প্রকৃত সাহিত্যকে উপলব্ধি করার একটা প্রায় স্বভাবজাত শক্তি আছে। কিন্তু নানা পারিপার্শ্বিক কারণে এই সাহিত্যবোধ অনেক সময় কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায়। সাহিত্য যে-যুগে অর্থকরী হয়ে ওঠে সে-যুগের বিপদ এই যে সস্তা কৌশলের সাহায্যে পাঠকচিত্তকে জয় করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অনভিজ্ঞ পাঠক খুব সহজে এইসব কৌশলের ফাঁদে নিজেকে ধরা দেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁর রুচিবিকৃতি ঘটতে শুরু করে। রুচি একবার বিকৃত হয়ে গেলে স্বাভাবিক সাহিত্যবোধ যে ক্ষুণ্ণ হবে তা তো অবধারিত পরিণতি।

প্রত্যেক মানুষের মনেই একটি শিশু বাস করে; সেই শিশুটি যা কিছু চটকদার যা কিছু উত্তেজনাকর তাকেই নির্বিচারে উপভোগ করে। আমরা নিয়মবদ্ধ জীব বলেই যে-কোন নিয়মবিরুদ্ধ জিনিস আমাদের উত্তেজিত করে; কাজেই সাহিত্যে উত্তেজনা সৃষ্টির মত সহজ কাজ আর নেই। যারা অনায়াসে পয়সা রোজগারের পন্থা হিসাবে সাহিত্যের ব্যবসা শুরু করেছে, তাদের পুঁজি পাঠক-সমাজের এই শিশু-মনটি। পাঠক চিরকাল শিশু হয়ে থাকবেন এটা খুব সুযুক্তি নয়; যে পরিণত মন সাহিত্যে জীবনের গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার রূপায়ণকে গ্রহণ করতে পারে পাঠকের কর্তব্য সেই পরিণতিতে উপনীত হওয়া।

তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে মেকী আর আসলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের শিক্ষাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় মেকী সাহিত্যের লক্ষ্য হল চমৎকৃত করা বা উত্তেজনা সৃষ্টি করা—strangeness অথবা excitement। আসল সাহিত্যের লক্ষ্য হল মানব-সত্যকে উদ্ঘাটন ব[...] হৃদয়ে গভীর দীর্ঘস্থায়ী ভাবাবেশ—ecstasy সৃষ্টি ক[...] মেকী সাহিত্য হল খেলনা; যা আমাদের মনের বা[...] জিনিস; যাকে আমরা দূর থেকে দেখে তারিফ ক[...] আসল সাহিত্য হল খেলা; যা বইয়ের পাতায় [...] সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনে মনেও খেলতে শুরু করি [...] আমাদের অন্তরের অবিচ্ছেদ্য সামগ্রীতে প[...] হয়। কোন গল্প বা উপন্যাস পড়ার সময় পাঠক [...] মনে এই প্রশ্ন করুন—গল্পোক্ত কাহিনীর সঙ্গে তাঁর [...] অন্তরের কোন অনুভূতি বা উপলব্ধির কোন যো[...] কি, যার ফলে তিনি নিজে সেই কাহিনীতে অংশ[...] করতে আগ্রহ বোধ করছেন। অথবা সেটা নিছক [...] একটা কাহিনী যা খাওয়ার সময় শুনলে হজমটা [...] হবে। তাহলেই তিনি কোন্‌টা আসল আর মে[...] মেকী তার জবাব পেয়ে যাবেন।

সস্তা উত্তেজনা সৃষ্টির উপায় হচ্ছে sensationalis[...] একের পর এক শিহরণ-সৃষ্টিকারী কাহিনী জুড়ে দে[...] সাম্প্রতিক কালে অবধূত এই sensationalism[...] সাহায্যে বাংলাদেশে sensation সৃষ্টি করেছি[...] সাধারণ পাঠকের তো কথাই নেই; কিছুদিন [...] অনেক বিদগ্ধ পাঠকের মুখেও তাঁর সম্পর্কে অদ্ভুত প্র[...] সূচক উক্তি শুনে বিস্মিত না হয়ে পারি নি। উত্তেজনা মানুষকে কতখানি আকৃষ্ট করতে পারে [...] তার প্রমাণ মেলে। মাত্র কয়েক বছর পরে অব[...] নাম আর কোথাও শোনা যাচ্ছে না; বিজ্ঞাপনের প[...] হঠাৎ তাঁর নাম দেখলে অনেক পাঠকই অবাক ভাবেন, ভদ্রলোক এখনও লিখছেন? কিন্তু এই ধরনের উত্তেজনার সাহিত্য বেশীদিন মানুষের মনের উপর [...] বজায় রাখতে পারে না—এ ঘটনার মধ্যে স[...]

দরকার আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে প্রাচীনের শুধু সেই জিনিসগুলিরই গুরুত্ব আছে যা আধুনিক কালের চিন্তা ও সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। উল্লিখিত তিনটি প্রবন্ধের নাম দেখলেই বুঝতে পারা যাবে এগুলোর প্রতি সাধারণ পাঠকের আকৃষ্ট হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বলা বাহুল্য, বিশেষজ্ঞ পাঠকেরাও এগুলোর দিকে ফিরেও তাকাবেন না, কারণ তাঁদের কাছে এ-সব নিরর্থক চর্বিতচর্বণ মাত্র। এই সংখ্যায় একটি ভ্রমণ-কাহিনী আছে, যা এত গতানুগতিক নিতান্ত কতকগুলি জানা তথ্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র যে পঞ্চাশ বছর আগে হলে হয়তো পাঠকেরা এর প্রতি কিছুটা উৎসাহ বোধ করতে পারত। এ যুগের পাঠকেরা অনেক ভাল ভাল ভ্রমণ-কাহিনী পড়তে অভ্যস্ত।

কাজেই একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে 'ভারতবর্ষে'র মুদ্রিত পৃষ্ঠাসংখ্যার অর্ধেক স্থান জুড়ে এমন সব রচনা থাকে যেগুলোর প্রতি একজন পাঠকের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় বলে অনুমান করা শক্ত। কল্পনার দৈন্য যেখানে এত স্পষ্ট, আধুনিক চিন্তাসমস্যা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্ক যেখানে এত ক্ষীণ, সেখানে মাঝে মাঝে শক্তিপদ-জাতীয় দু-একটা বেহেড লেখককে জুটিয়ে আনলেই কি ক্ষয়িষ্ণুতার অবধারিত গতিপথ থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব?

* * *

বাংলাদেশে শিশিরকুমার যে প্রেততত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন, কালক্রমে তা থিতিয়ে এসেছে। আজকাল আর প্রেততত্ত্বে উৎসাহী লোকের সাক্ষাৎ বড় একটা পাওয়া যায় না। আশ্বিন সংখ্যার 'প্রবাসী' পড়ে মনে হল এতদিন পরে বোধ হয় আর একজন প্রেততত্ত্বে উৎসাহী লোক পাওয়া গেল। 'প্রবাসী'-সম্পাদক একটি সংখ্যার মধ্যে দুটি প্রেত-ঘটিত রচনা স্থান দিয়েছেন—একটি প্রেত-ঘটিত বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ, অপরটি অবশ্য গল্প—প্রেতকর্তৃক মমিতে জীবন সঞ্চারের চমকপ্রদ কাহিনী।

যাঁদের ভূত দেখার অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সাধারণতঃ অনেকবার ভূত দেখেন, আর যাঁদের সে অভিজ্ঞতা নেই তাঁরা একবারও দেখেন না। কাজেই আশা করা যাচ্ছে যে 'প্রবাসী'-সম্পাদক যখন একবার ভূতের সন্ধান পেয়েছেন, তখন তিনি এর পর থেকে নিয়মিত ভূতের সাক্ষাৎ পেতে থাকবেন।

সেটা একরকম শুভ লক্ষণ বলে গণ্য করা যায়। ভূতে সকলে বিশ্বাসী না হতে পারেন কিন্তু ভূতের গল্পের প্রতি আগ্রহ সব মানুষেরই আছে। কাজেই 'প্রবাসী'তে অতঃপর যদি নিয়মিত ভূতের গল্প বেরয় তবে তার মধ্যে পাঠকেরা হয়তো কিছু উত্তেজনার খোরাক পেতে পারবেন। তবে 'প্রবাসী'-সম্পাদককে বলে রাখি—মমি-ভূতটুতে এ যুগে চলবে না। মমি-ভূত বড়ই স্থূল, এ যুগের ভূতদের মধ্যেও বিবর্তনের ফলে কিছু নতুনত্ব এসেছে—তাঁরা আর একটু সূক্ষ্মভাবে চলাফেরা করে থাকেন।

* * *

গল্প যদি পাঠক-মানসে একটু ভাবান্তর সৃষ্টি করতে না পারে তবে বড় অসুবিধা। গল্প পড়ার পর যদি পাঠকের মন একটুও পরিবর্তন বোধ না করে তবে গল্প পড়াটা নেহাত সময় কাটানোর জন্য শাস্তি বিশেষে পরিণত হয়। প্রবন্ধ কিছু জ্ঞান দেয়, কাজেই ধৈর্য ধরে পড়ে উঠতে পারলে পাঠক মনে করে সে কিছু লাভ করল। কিন্তু গল্প তো জ্ঞান বিতরণের হাতিয়ার নয়; তা যদি মনের উপরও কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করতে পারে তবে সে রকম নিছক কাল্পনিক জিনিস পড়ে লাভ কি? 'প্রবাসী' পত্রিকার অধিকাংশ গল্পই কিন্তু এই ধরনের —বর্ণগন্ধস্বাদ কিছুই নেই তাতে। নিছক একটি আটপৌরে কাহিনী মাত্র। তাই বলছিলাম—'প্রবাসী'-সম্পাদক ভূতের গল্পের দিকে মনোযোগ দিলে পাঠকদের (বরং পাঠিকাদের) কাছে তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন বলে মনে হয়।

অবশ্য বর্ণগন্ধহীন রচনা ছাড়া 'প্রবাসী'-সম্পাদকের পক্ষে আর কিছু সরবরাহ করা শক্ত।

'প্রবাসী' ব্রাহ্ম ঐতিহ্যসম্পন্ন পত্রিকা। ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষত্ব এই যে বিগত পঞ্চাশ (বা তারও বেশী) বছরের মধ্যে তার ধ্যানধারণা চিন্তাধারা বা জীবনযাত্রা-

প্রণালীতে কোন পরিবর্তন আসে নি। খানিকটা অভিজাত উন্নাসিকতা, নৈতিক শুচিতার প্রাবল্য, সংস্কার-মুক্তকতা (অবশ্য শুধু হিন্দুসমাজের ক্ষেত্রে, নিজেদের সমাজের ক্ষেত্রে নয়) এবং রাজনীতিতে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী—এই সব হচ্ছে অদ্যাবধি ব্রাহ্মসমাজের চরিত্রগত বিশেষত্ব। ব্রাহ্ম-প্রভাবাধীন সাহিত্য-সৃষ্টিতেও এইসব বিষয়ের দিকে কড়া নজর রাখা হয়। তার ফলে 'প্রবাসী'তে কখনও নিম্নশ্রেণীর বা বস্তিবাসীদের নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয় না। নীতি এবং অনুশাসনের বেড়ায় ঘেরা এমন একটি সমাজ তাঁরা গড়ে তুলেছেন যাতে ভারসাম্য সহজে নষ্ট হয় না। কাজেই যে-সব মনস্তাত্ত্বিক এবং আত্মিক জটিলতায় আধুনিক মানুষ বিপর্যস্ত 'প্রবাসী'র কোন রচনায় তার পরিচয় মিলবে না। রোমান্টিকতার পথেই হোক বা বাস্তবতার অন্তর্দৃষ্টির পথেই হোক, জীবনের গভীরতর আবেগ-অনুভূতির জগতে 'প্রবাসী'র গল্প-উপন্যাস প্রবেশ করে না। সমাজের আপাত-স্থিতিশীল বাহ্যরূপের আড়ালে কী আছে তা অন্বেষণ করতে 'প্রবাসী' রাজী নয়। 'প্রবাসী'র অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসই তাই নিছক বৈঠকী গল্প। সময় কাটানোর জন্য তাস নিয়ে পেসেন্স খেলার যে উপযোগিতা এসব গল্পের উপযোগিতা তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

দু-একটা উদাহরণ দিই। আশ্বিন সংখ্যায় সীতা দেবী 'কাঁকড়া বিছে' বলে একটি গল্প লিখেছেন। স্বামীকে রাত্রিবেলা কাঁকড়া বিছে কামড়ালে তার স্ত্রী কি করে সেই রাত্রে অসীম সাহসের সঙ্গে পাড়ার ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল, গল্পটিতে সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'প্রবাসী' পত্রিকার কাছে নারীর সাহসিকতার এইটিই চরম নিদর্শন।

আশাপূর্ণা দেবীর 'নিঃসঙ্গ' গল্পটিতে একটি অবিবাহিতা শিক্ষয়িত্রী কী করে সঙ্গলাভের জন্য ছাত্রীর বাড়িতে আসত এবং ছাত্রীর একটি নিষ্ঠুর কথায় সে একদিন চলে গেল তার কাহিনী বলা হয়েছে। প্রফুল্ল সরকারের 'অদৃশ্য আগুন' গল্প বাপ বড়লোক এমন স্ত্রীর গরীব স্বামী হওয়া যে কী বিড়ম্বনা তার এক বিয়োগান্ত কাহিনী ; কিন্তু ট্র্যাজেডিটি প্রায় ষোল আনাই দুর্ঘটনা-জাত, কাজেই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মানসিক জটিলতা কাহিনীতে প্রকৃতপক্ষে কোন গভীরতা লাভ করে নি।

কার্তিক সংখ্যায় অজিত চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'ফ্ল্যাগ স্টেশনের গল্পে' বর্ণিত হয়েছে কী করে এই বিজ্ঞানের যুগে এক হিন্দুস্থানী চৌকিদার তার তুকতাক মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। সুকুমার রায়ের 'শিকার' নামক একটি গল্পে কী করে একটি সাপ একটি বাচ্চা মেয়ের নাচ দেখতে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে সেই কাহিনী বলা হয়েছে।

এক কথায় 'প্রবাসী'র গল্প পড়লে মনে হবে দেশে কোন গুরুতর সমস্যা নেই, জীবনে কোন গভীর আবেগ অনুভূতি বা জটিলতা নেই, পৃথিবীতে গুরুতর অন্যায়, সাংঘাতিক দুর্নীতি কিছু ঘটে না। বলা যায়, এগুলো নিতান্তই নিরামিষ গল্প। রক্ষণশীল অভিভাবকেরা তাঁদের বাড়ির মেয়ে-বউদের হাতে এ বই অনায়াসে তুলে দিতে পারেন। 'প্রবাসী' তাঁদের দিবানিদ্রার সহায়ক। তাই বলছিলাম 'প্রবাসী'র এই পটল-মুলোর বাজারে ভূতের গল্পের আমদানি একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ।

নিন্দুকের প্রতিবেদন

নারায়ণ দাশশর্মা

॥ ভূমিকা ॥

বই পাড়ার একটি দোকানে সন্ধ্যাবেলা বসে থাকলে আপনি বাংলাদেশের অনেককটি মাঝারি সাহিত্যিককেই কখনো না কখনো উকিঝুঁকি মারতে দেখবেন; তাই দেখবার জন্যই বোধ হয় ওখানে আমি মাঝে মাঝে গিয়ে থাকি। সেখানে সাহিত্য-আলোচনা অবশ্যই হয়ে থাকে, তবে প্রকাশ্যে নয়। বাজার-দর, চৌ-এন্-লাইয়ের আসল মতলব, পেট গড়বড়ের অব্যর্থ টোটকা, হাবড়ার বাগান-বাড়িতে অমুকবাবুর লেটেস্ট কেচ্ছা, ইত্যাদি সাহিত্যের চাইতে ঢের বেশী দরকারী প্রসঙ্গের জোরালো আলোচনা চলতে চলতে, এমন কি হুমায়ুন কবির আবার কবে কলকাতায় আসছেন ইত্যাদি গ্রহসঞ্চারের গোচর-ফল বিচার করতে করতেও বা, একজন সাহিত্যিক হঠাৎ গলা নামিয়ে বলেন: ইয়ে বাবু, একটু কথা ছিল। ইয়ে বাবু এ দোকানের দরজা ডিঙিয়ে রাস্তায় নামলে তখন একজন নামকরা সাহিত্যিক; কিন্তু যতক্ষণ এ দোকানে বসে আছেন ততক্ষণ একজন ছুঁদে প্রকাশক। এ-বাবু এবং ও-বাবু তখন আধো-অন্ধকার গলিতে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথাবার্তা বলতে থাকেন; কোনদিন এ-বাবু মুখ হাঁড়ি করে ফিরে আসেন, কোনদিন ও-বাবুর মুখ আশ্চর্যবোধক চিহ্নের মত লম্বা হয়ে যায়, আবার কোনদিন বা দুজনের মুখেই সফল সমঝোতার আলো ঝিকমিক করে। বাংলাদেশের সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই ভাবে মীমাংসা হয় প্রতি সন্ধ্যাবেলা বই পাড়ার এই একটি দোকানে।

উক্ত বেসরকারী সাহিত্য-আকাদামি গৃহে সম্প্রতি একদা নয়নাভিরাম এক সুবেশ এবং তরুণ (বয়স চল্লিশ হয় নি এখনও) সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার ত্রিশ সেকেণ্ড আলাপচারি হয়েছিল। ভদ্রলোক বুদ্ধিমান অথচ তাঁর বইয়ের বিক্রী ভাল; এই কারণে তাঁর সম্পর্কে আমি কৌতূহলী ছিলাম। শুনেছি ক্যাটিপাস বলে একরকম বিচিত্র জীব অস্ট্রেলিয়াতে বাস করে—তাদের বাচ্চা ডিম ফুটে বেরোয় আবার মাতৃস্তন্যও পান করে। সেই বিচিত্র জীব সম্বন্ধে যে-কারণে আমি কৌতূহলী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অথচ সিনেমা-পত্রিকায় আসর-মাত-করা এই বাজারে পপুলার কোন সাহিত্যিক আছেন, ক্যাঙারু-অধ্যুষিত সুদূর অস্ট্রেলিয়াতে নন এই বাংলাদেশেই আছেন তেমন কোন লেখক, এ সংবাদেও আমি সেই এক কারণেই কৌতূহলী হয়ে থাকি। কেন না, অণ্ডজতা ও স্তন্যপায়িতার মতই বুদ্ধি-দীপ্তি ও পপুলারিটি একই সাহিত্যের ভাগ্যে যুগপৎ লাভ করা এযুগে প্রায় অসম্ভব বলে আমার ধারণা ছিল; শুধু এযুগে কেন, প্রমথ চৌধুরীদের পক্ষে জনপ্রিয়তার বাজারে বিকোনো সে-যুগেও সহজ ছিল না।

আমাদের কথোপকথনের হুবহু অনুলিপি এই:—

তিনি। আজকাল যত সমালোচক হয়েছেন—(এই ড্যাশ চিহ্নটি আমাদের জনপ্রিয় বুদ্ধিমান সুবেশ সাহিত্যিক একটি জুগুপ্সার হাসি দিয়ে ঠোঁটে এঁকেছিলেন।)

আমি। সমালোচক? সমালোচক বলছেন কাকে? বাংলাদেশে সমালোচক আছে নাকি কেউ আবার?

তিনি। হেঁ হেঁ। (এই শব্দ দুটি ধ্বনিতে নয়, খুশী খুশী দৃষ্টি দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন তিনি।) তা বটে।

আমি। আর কী করেই বা সমালোচক থাকবে বলুন। আগে লেখক জন্মালে তবেই না সমালোচক জন্মাবে।

তিনি। (অকস্মাৎ জরুরী প্রসঙ্গ স্মরণ করে) ইয়ে বাবু, একটু কথা ছিল যে?

অতঃপর এ-বাবু এবং ও-বাবু সাহিত্য-আলোচনার জন্য অন্ধকার গলিতে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আমার প্রতিবেদনগুলি সমালোচনা-প্রবন্ধ কিনা, এ ধরনের কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন যখনই আমাকে হতে হয়েছে, তখনই পূর্বোক্ত সংলাপটি মনে পড়ে গেছে আমার। সাহিত্য কোথায়, যে সমালোচনা প্রবন্ধ সৃষ্টি হবে?

আমি যদি সত্যই সমালোচক হতাম, তবে প্রবোধ সান্যাল, গজেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র বা অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্তর আবর্জনাস্তূপে ক্ষমতার অপব্যয় করতে গেলাম কোন্ দুঃখে? সমালোচক হলে সাময়িকতার সুলভ মুড়ি-মুড়কিতে নোংরা প্রবৃত্তির মাছি তাড়িয়ে দিন কাটাতাম না আমি; তাহলে সমালোচনা করতাম রবীন্দ্রনাথের বহুপঠিত সেই কবিতাগুলির—বহুপাঠের অভ্যস্ততায় যার বিচিত্র অপরূপ সৌন্দর্য চোখে পড়ে না আর; অর্ধবিস্মৃত সেই ছোটগল্পগুলির, কাব্যের স্বর্গ ও কাহিনীর মর্তভূমির মধ্যসীমান্ত নন্দনকাননের অধিবাসী যে ছোটগল্পের চরিত্র-বিচারে লেখক নিজেই বলেছেন, "নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা, নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ। অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ।" সমালোচনা করতাম বঙ্কিম-চন্দ্রের অভিজাত উচ্চতাকে, প্রমথ চৌধুরীর সৌখীন সাহিত্যকীর্তিকে, হয়তো বা মোহিতলালের সিনিক ব্যর্থতাকে। অখ্যাত স্বল্পায়ু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় খুঁজে পেতাম সমালোচনার যোগ্য সাহিত্য-প্রয়াস, যাতে ত্রুটি আছে অসংখ্য কিন্তু তা সাহিত্যেরই ত্রুটি; সৌরকলঙ্কের মত যা সমালোচনার দূরবীনে দৃষ্টিগোচর কিন্তু প্রতিশ্রুতির জ্যোতিতে যা চর্মচক্ষুর অন্তরালে। স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিন থেকে আবিষ্কার করতাম হয়তো এমন একটি সার্থক সাহিত্যিককে, যার প্রতিভা আবিষ্কৃত না হবার দুর্ভাগ্যেই অকালে ঝরে যাবে কিনা কে জানে?

সমালোচক হলে আমি সেই একই ভাগাড়ের দিকে নজর রাখতাম না যেদিকে সিনেমা-প্রযোজকের গৃধ্রচক্ষু নিবদ্ধ।

আমি সমালোচক নই, নিন্দুকমাত্র।

রবীন্দ্রনাথ, যাঁর গুণসিন্ধুর মধ্যে বিরূপ সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণুতা নামক একটি ডুবোপাহাড় বেখাপ্পা ছন্দপতন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে আমার স্থির বিশ্বাস, প্রশ্ন করেছেন:

> ধূলা, করো কলঙ্কিত সবার শুভ্রতা
> সেটা কি তোমারি নয় কলঙ্কের কথা?

এবং এই প্রশ্ন কার উদ্দেশে সেটি পাছে আমরা বুঝতে অক্ষম হই সেই ভয়ে শিরোনামায় স্পষ্ট লিখে দিয়েছেন—কলঙ্ক-ব্যবসায়ী। (কণিকা গ্রন্থের আশ্চর্য এপিগ্রামগুলির তুলনায় কলঙ্ক অত্যন্ত প্রোজেইক এবং অবভিয়াস এই শিরোনামাসমূহ।)

সবিনয়ে স্বীকার করি, ধূলার ভূমিকায় অভিনয়ে অবতরণ করে এই কলঙ্কের কথা আমাকে মেনে নিতেই হয়েছে। গুরুদেবের শ্রীচরণে নগণ্য এই কলঙ্কব্যবসায়ীর তথাপি এই নিবেদন যে সাহিত্যের নামে যাঁরা পাঠকের চোখে ধুলো দিতে প্রবৃত্ত, তাঁদের ফরসা ধুতি-চাদরের উপর কিঞ্চিৎ মালিন্য লেপন না করলে বেচারি ধূলা গোবেচারি পাঠককে প্রতারিত করার পাপ আর কোন প্রায়শ্চিত্তে প্রক্ষালন করবে? যাঁরা অপরের চোখে ধুলো ছুঁড়ছেন তাঁদের শুভ্রতার ছদ্মবেশ ধুলো দিয়েই ঘুচিয়ে দিতে হবে। না হলে শুভ্রতারই অপমান।

॥ এক ॥

এই ভূমিকা-রচনার সময়ে আমি যে আমার এ মাসের মানসিক করা সাহিত্যিকের কথা নিয়ত স্মরণ রেখেছি, এমন নয়। এটি সাধারণ ভূমিকা-মাত্র, প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে এর প্রত্যেকটি বাক্যের প্রাসঙ্গিকতা খোঁজা নিরর্থক।

যেমন, ওই শুভ্রতার প্রসঙ্গে। আমাদের এ মাসের মানসিক করা সাহিত্যিক মহাশয়ের রচনার সঙ্গে যে পাঠক পরিচিত, তিনি জানেন শুভ্রতা তাঁর গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি যতদূর লিখিয়ে, সাদা-মাঠায় তাঁর মন ওঠে না সাধারণতঃ। সাজ-পোশাকে তিনি যতই নিখুঁত নিভাঁজ ধবধবে ফর্সা, লেখার বেলাতে আমার ততই লালটু-মার্কা। কী রকমের লালটু মার্কা, তার একটু নমুনা এঁর লেখা সদ্যপ্রকাশিত একটি ছোট গল্প থেকে সংক্ষেপে বোঝানো যাবে:

"টপরের কাজলমাখা চোখেও দৃষ্টি অপলক। ভ্রূ ঈষৎ কোঁচকানো। পানখাওয়া ঠোঁট দুটি লাল। মুখে একটু হিমানীর প্রলেপও আছে। কপালে কুমকুমের টিপ।"

এই নায়িকা-বর্ণনায় সমবেশ বসুর সাহিত্য-চরিত্রও বর্ণিত। স্পষ্ট বোঝা যাবে এর পরের কটি লাইনে:

"...প্রশংসা করবার মত কিছু নেই। কিন্তু একটা চটক আছে। একটা ভঙ্গি, একটা ছাঁদ, সব মিলিয়ে... সেই চটকটাই শরীরের বাঁধুনিতেও বিদ্যমান।"

এর চাইতে সংক্ষেপে ও এর চাইতে খাঁটি সত্য করে সমরেশ বসুর সাহিত্যের চরিত্র বোঝানো যায় না। প্রশংসা করবার কিছু না থাক, চটক আছে। ভঙ্গি আছে, শরীরে আছে বাঁধুনি।

কিন্তু শরীরেরই মত সাহিত্যেও, শুধু চটকের মূলধন নিয়ে টাকা লুটবার চেষ্টায় মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে যা হয়, অধুনা ওঁর তাই হয়েছে। বাঁধুনি ঝুলে গেছে।

তবু যতদিন বাঁধুনি ছিল ততদিন চটক ছিল। এই নায়িকারও যেমন, তেমনই সমরেশ বসুর লেখাতেও। সেই চটকদার যুগের কথা স্মরণ করেই সমরেশ এই নায়িকার সম্পর্কে মন্তব্য বর্ষণ করাচ্ছেন গল্পের মধ্যে :

"শালার ঝিঙ্গি শোল যাবে কোথায়? এমন তাজা চকচকে আরশোলার টোপ!"

সত্যই এই তাজা চকচকে আরশোলার চারপাশে পাঠক ও প্রকাশকের ভিড় কিছু আর কম হয় নি এককালে।

সমরেশ বসুর লেখা নিয়ে আলোচনা করতে হলে সেই "তাজা চকচকে আরশোলার" মত যখন ছিল ওঁর লেখা সেই যুগেরই বই নির্বাচন করতে হয়। পরবর্তীকালে যখন বাঁধুনি গেছে ঢিলে হয়ে এবং বুদ্ধিমান সমরেশ লজ্জাবশত ছদ্মনামে উপন্যাস রচনা করেছেন (বাঁধুনি ঢিলে হবার কথা স্পষ্ট লেখা আছে সেই উপন্যাসে—যার প্রসঙ্গ উত্থাপন সঙ্গত নয়, কারণ উনি তাতে স্বনাম যুক্ত করেন নি।) সেযুগের লেখা নিয়ে আমি ওঁর উপর অবিচার করতে চাই না। 'নয়ানপুরের মাটি' এবং 'উত্তরঙ্গ' এই দুটি উপন্যাসে সমরেশের খ্যাতির সূত্রপাত। কিন্তু খ্যাতি ও পপুলারিটি দুই পর্বতের চূড়ায় দু পা রেখে 'পা ফাঁক করে সিগারেট' খাবার বাহবা-যোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন সমরেশ বসু যে গ্রন্থ মারফত তা হচ্ছে 'গঙ্গা'।

এই কারণে আমার প্রধান আলোচ্য হিসাবে নির্বাচন করেছি এই 'গঙ্গা' উপন্যাসকে, যদিও এখানি তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ নয়। ওঁর সাম্প্রতিক রচনাগুলির নিন্দা করতে হলে অবশ্য নিন্দুকের প্রয়োজন ছিল না, লেখক নিজেই মনে মনে যথেষ্ট নিন্দা করছেন তাঁর সাম্প্রতিক নিন্দনীয় রচনার—একদা-বর্জিত ছদ্মনামের বোরখায় আবার মুখ ঢাকবার এ ছাড়া আর কী কারণ হতে পারে?

গঙ্গা পতিতপাবনী, শুধু এই কারণেই সমরেশ উপন্যাসের নাম এবং অকুস্থলের জন্য গঙ্গার শরণ নিয়েছেন একথা ভাবলে ভুল হবে। গঙ্গার প্রতি সমরেশের সবিশেষ আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক : কারণ সমরেশ—বসু।

অষ্টবসুর কাহিনীটির উল্লেখ আছে উপন্যাসের মধ্যেও। [যদিও সেখানে আগাগোড়া চলিত ভাষার সংলাপের মধ্যে 'দিবে' 'দিব' একটু কানে লেগেছে আমাদের।] তার শেষে ছড়া আছে,—

> জয় জয় গঙ্গা, গাহ জয় গঙ্গার।
> বিধির বিধান এই অষ্টবসু তরাবার।

অষ্টবসুকে তরাবার জন্ত গঙ্গার যত জয়ধ্বনি, সমরেশ বসুকে তরাবার জন্ত আমরা তার দ্বিগুণ জয়ধ্বনি দিতে প্রস্তুত গঙ্গার নামে।

কিন্তু একা সমরেশ কেন, বাকি সাতজন বসুর প্রতি কবে সদয় হবেন নিষ্ঠুরা সুন্দরী দেবী?

জ্যোতি বসু (পাহাড়ের ডগায় কী হচ্ছে তা আমরা কী করে জানব?), বুদ্ধদেব বসু (পৃথিবী নামক গ্রহের ভারত নামক একটি অংশে দৈবক্রমে নিক্ষিপ্ত), মনোজ বসু (চীন দেখে এলামের পরেই চীন থেকে দলে দলে নিশিকুটুম্বের আগমন, ছিঃ!), প্রতিভা বসু (প্রতিভাবান ব্যক্তি জানেন), ত্রিদিবেশ বসু ('সাত'-তাড়াতাড়ি প্রকাশক!)—এই তো হল পাঁচজন। আর দুজন কি গৌরাঙ্গপ্রসাদ (উল্টো এবং জয় দুই রথে দুই পা রাখতে গিয়ে জয়দ্রথের হাল) ও জ্যোতিপ্রসাদ (বুক ক্লাব) এই দুই বন্ধু?

যাঁরাই হোন বাকি সাত বসু, পয়লা নম্বর বসু সমরেশের প্রতি গঙ্গা কিন্তু সত্যই অহৈতুকী কৃপার উত্তরঙ্গ। না হলে, একমাত্র অহৈতুকী কৃপার যুক্তি-অতীত কারণ ছাড়া, কি খ্যাতিতে কি পপুলারিটিতে অল্পকালের জন্যও দীপ্যিমান হবার মত কোন গুণ 'গঙ্গা' উপন্যাসের মধ্যে মিলছে না কেন?

গ্রন্থের ভূমিকায় লেখকের বক্তব্য :

"১৩৬৩ সনের শারদীয় 'জন্মভূমি' পত্রিকায় 'গঙ্গা' প্রকাশিত হয়েছিল।...শারদীয়াতে সম্পূর্ণ উপন্যাস লেখা সম্পর্কে যাঁরা বিন্দুমাত্রও খবর রাখেন, শুধু তাঁরাই জানেন, দ্রুত ব্যস্ততায় শিবের মূর্তি কী ভাবে বাঁদরের আকার নেয়। [তাই বলে যে-কোন একটা বাঁদরকে আস্তে আস্তে গড়লেই সে আর কিছু শিব হয়ে ওঠে না।]... যে ভঙ্গিতে প্রথমে লেখা হয়েছিল, সেই একই ভঙ্গি থাকল। পরিচ্ছেদে ভাগ করি নি। কেননা, মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার একটি বিশেষ মরশুমী যাওয়া-আসা (trip)-কে কেন্দ্র করেই গোটা কাহিনী গড়ে উঠেছে। আমার বিশ্বাস, এ রকম কাহিনীকে পরিচ্ছেদে ভাগ করলে এর মানুষগুলি ও তাদের কাজ এবং নদী সব টুকরো হয়ে যায়।"

পাঠক দয়া করে স্মরণ করুন পূর্বোক্ত নায়িকা-বর্ণনা : একটা ভঙ্গি, একটা ছাঁদ, সব মিলিয়ে সেই চটকটাই শরীরের বাঁধুনিতেও বর্তমান। তারপর ভূমিকার ভঙ্গিটি দেখুন, দেখুন ভণ্ডামির চটকখানি।

পরিচ্ছেদে ভাগ করলে এর মানুষগুলি ও তাদের কাজ এবং নদী সব টুকরো হয়ে যায়! তাই উনি গ্রন্থটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেন নি।

পরিচ্ছেদে ভাগ করেন নি অর্থ এক দুই তিন চার করে নম্বর বসান নি, এ কথা সত্য। কিন্তু নয় পৃষ্ঠার ছয় লাইন পর্যন্ত ছেপে বাকি পৃষ্ঠা যদি সাদা পড়ে থাকে এবং দশ পৃষ্ঠার গোড়াতে চার লাইনের জায়গা সাদা রেখে যদি ছাপা থাকে আগেকার পৃষ্ঠায় বর্ণিত ঘটনার সাত বছর আগেকার ফ্ল্যাশব্যাক, তবে এটা পরিচ্ছেদে ভাগ হল না শুধু নম্বর লাগানোর অভাবে?

তাহলে তো কবিতায় ডবল দাঁড়ি না লাগালেই অমিত্রাক্ষর হত, গরুর ছবি আঁকতে গিয়ে ভুল করে লেজ বাদ পড়লেই অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট হত, গৌরীপ্রসন্নর গানে হারমোনিয়ম না বাজালেই বলা যেত রবীন্দ্রসঙ্গীত!

আর, পরিচ্ছেদে ভাগ করলেই "মানুষগুলি ও তাদের কাজ এবং নদী সব টুকরো হয়ে যায়", এ আবার কোন্ আহ্লাদে কথা?

কথাশিল্প সিনেমা নাকি যে কাট, ডিজল্ভ, ফেড ইন, ফেড আউট হিসেব করে তার যোগান আনতে হবে? অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতে দেব-দৈত্য-মানুষ-অমানুষের যে অনাদ্যন্ত মিছিল চলেছে তার বিচিত্র ঘটনার আবর্তে ভিন্ন ভিন্ন স্বরের অলৌকিক অর্কেস্ট্রায়—তাতে কি তার চরিত্র-গুলি টুকরো হয়ে গেছে?

পরিচ্ছেদ আর অনুচ্ছেদ তো বহিরঙ্গ, তার টানা-পোড়েনে চরিত্রের সৃষ্টি কিংবা বিভাজন হতে পারে, সামগ্রিকতা বা বিখণ্ডতা উৎপন্ন হতে পারে কোন উপন্যাসে—এমন অদ্ভুত অকালপক্ব অতি-সরলীকরণের উক্তি এতাবৎকাল আমার আর চোখে পড়ে নি। এরপর সমরেশ বসু হয়তো একদিন লিখবেন, এই উপন্যাসটি মুদ্রণে আমি হোয়াইট প্রিন্ট ব্যবহার করতে দিই নি, কেননা আমার বিশ্বাস এ রকম কাহিনীকে সাদা কাগজে ছাপলে এর মানুষগুলির চারিত্রিক মালিন্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। কিংবা, এই গ্রন্থে আমি মলাট লাগাতে বারণ করেছি কারণ প্রচ্ছদপটে যে একটি সযত্নশোভিত ছদ্মবেশের প্রয়াস আছে, এর কাহিনীর সঙ্গে তা অসংলগ্ন হয়ে পড়বে!

কিন্তু ভূমিকার ওই স্টান্টটি নেহাত অকারণ চটক মাত্র নয়। বুদ্ধিমান সমরেশ বসু বিশেষ কারণবশতঃই এ স্টান্টের প্রয়োগ করেছেন।

'গঙ্গা' মূলতঃ একটি ছোট গল্পের কাহিনী। উপন্যাসের বৈচিত্র্য এতে অনুপস্থিত। সেই একটি ছোট গল্পের গায়ে কতকগুলি প্রাসঙ্গিক ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশ নিপুণভাবে গঁদের আঠা দিয়ে জুড়ে 'গঙ্গা' উপন্যাসের সৃষ্টি করেছেন সমরেশ বসু। "এর মানুষগুলি, তাদের কাজ এবং নদী" সব আসলে আলাদা-আলাদা, নিঃসম্পর্ক। নামেই নৈহাটির গঙ্গা একটি সমগ্র অভিন্ন নদী : বস্তুতঃ সেই গঙ্গায় যে-কটি নৌকোর চিত্র আঁকতে প্রয়াসী হয়েছেন সমরেশ, তার প্রত্যেক নৌকোর চতুষ্পার্শে পৃথক পৃথক নদী—তাদের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। বলাভিতা গাঁয়ের যে একখানি জেলে নৌকোর করে সমরেশের মূল ছোটগল্পকে জোর করে গঙ্গায় নিয়ে আসা হয়েছে, তার গঙ্গার সঙ্গে মেলে নি মহাজনী নৌকোর গঙ্গা, মেলে নি পূর্ব বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তু জেলেদের নৌকো-ভাসানো গঙ্গা। উদ্বাস্তু গঙ্গায় ভাসমান সমস্ত নৌকোর মধ্যে [illegible] একখানি [illegible] [illegible]

দুখানি কি তিনখানি ভিত্তির কচিৎ সম্পর্ক আড়ষ্ট অস্পষ্ট। গল্প জমাবার জন্য অবশেষে সেই 'অতিপুরাতন বিরহমিলন কথা'—যার সঙ্গে গঙ্গার সম্পর্ক নেই বললেও চলে।

'গঙ্গা'র মানুষগুলি ও তাদের কাজ এবং নদী বিখণ্ড বিচ্ছিন্ন ছাড়া-ছাড়া। এবং ভেতরের এই বিচ্ছিন্নতা ঢেকে রাখবার জন্যই ভূমিকায় উপরি-উক্ত সামগ্রিকতা-সৃষ্টির অভিনব স্টান্ট। পাছে পাঠকের মনে হয় গল্পটি কেমন ছাড়া-ছাড়া, তাই লেখক গোড়াতেই বলে রাখছেন, গল্পটি এত ঠাসবুহুনির যে পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ভাগ করতে পারছি না!

বস্তুতঃ 'গঙ্গা'র মত কপট রচনা বোধ হয় সমরেশ বসুও বেশী লেখেন নি। এবং কে জানে কাপট্যই কি সেই গূঢ় মন্ত্র নাকি যা দিয়ে সাহিত্যিক যুগপৎ খ্যাতি ও পপুলারিটি জয় করতে পারেন। দীর্ঘকালের জন্য না হোক, অন্ততঃ স্বল্পকালও।

কাপট্যের পরিচয় ভূমিকা থেকেই শুরু। যে অংশ উদ্ধৃত করেছি তার পরেও আছে :

"……এদের কাছে আমি ঋণী। এদের সঙ্গে অনেক-দিনই গঙ্গার বুকে ফিরেছি মাছ-ধরার সময়, দিনে ও রাত্রে। মাছ-ধরা সম্পর্কে বহু কথা, তথ্য, তত্ত্ব এদের কাছে জেনেছি, যা শুধু চোখে দেখলেই জানা যায় না। বাউল গায়, 'ও তোর অঠিক গুরু, বেঠিক গুরু, গুরু অগণন।' এদের বিষয়েও আমি তাই বলি।"

এই অংশেও অত্যন্ত [illegible] আত্মপ্রচারের পরাকাষ্ঠা দেখা যাচ্ছে। এটুকু পড়ে পাঠকের নিশ্চয় মনে হবে, এ-উপন্যাসের মানুষগুলি, তাদের চরিত্র চিন্তা সুখ দুঃখ সমরেশ বসুর অভিজ্ঞতায় জীবন্ত।

কিন্তু কোথায় সে জীবন্ত অভিজ্ঞতা?

কাঁড়ার, ভাংলো, ছেউটি, গলুই, ডিবড়ি, মেকো এই ধরনের পারিভাষিক শব্দ অবশ্য আছে বিস্তর। অঠিক গুরু বেঠিক গুরুর কাছ থেকে এ শব্দগুলি নিশ্চয় কষ্ট করে শিখতে হয়েছে সমরেশ বসুকে। যদিও আর একটু ভাল করে শিখলে একবার ভাংলো একবার সাংলো লিখে আমাদের [illegible] হত না ওঁকে। কিন্তু সে যা-ই হোক, এই সব পারিভাষিক শব্দের [illegible] কাজ হয়েছে। যেহেতু অনেক কথারই ঠিক অর্থ [illegible] বুঝতে পারছেন না, তাই যে-কথার অর্থ বুঝতে [illegible] আমাদের হয়ত গা ঘিনঘিন করত সেরকম কথাও পাঠক অনায়াসে অন্যমনস্কতা দিয়ে উপেক্ষা করে যাবে; ভাববে ওটা মৎস্যজীবীদের পারিভাষিক শব্দ, অঠিক গুরু বেঠিক গুরুর কৃপা না হলে মানে বোঝা যাবে না ও-কথার।

যেমন ধরুন, বইটিতে দুবার কি তিনবার '*বানরত*' বলে একটা শব্দ আছে। অন্য যে কোন লেখার মধ্যে এ-শব্দটি থাকলে আমরা হয়ত ভাবতাম, একটা অশ্লীল কথা বই কিছু নয় এটা; কিন্তু এই মাছ ধরা সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্ব কণ্টকিত উপন্যাসে টোটা এবং ট্যাটা, মুখছাট এবং সাওটা ইত্যাদি অসংখ্য দুর্বোধ শব্দের মধ্যে বানচত দেখে মনে হবে ওটা বুঝি এক রকম মাছের নাম; হয়ত খুব গভীর জলের মাছ!

এতে বাস্তবিক আপত্তি করার কিছু নেই। কথায় বলে, এক দেশের বুলি অন্য দেশের গালি। এই যে বইয়ের মধ্যে আছে রাঁড়-মেগো সেটা আমাদের কাছে গালি হলেও, মাছ-মারাদের কাছে হয়ত নেহাত বুলি। তেমনি আমাদের কাছে যে কথা অত্যন্ত নির্দোষ, মাছ-মারা হয়ত তাই শুনলেই লজ্জায়-ঘেন্নায় থুথু ফেলবে। সমরেশ বসু কথাটাই হয়ত মাছমারাদের কাছে গালাগালির সামিল হবে, কে জানে!

দুই

গঙ্গার মূল কাহিনী সেই আদি ও অকৃত্রিম কাহিনী যার গায়ে নানা রঙের ও ঢঙের পোশাক চড়িয়ে সমরেশ বসু যত ইচ্ছে রংদার গল্প লিখে যেতে পারেন।

গাঁয়ের আইবুড়ো জোয়ান পুরুষ বিলাসকে সিডিউস্ করল পাড়ার বেতো রুগী অমৃতর বউ।

দুচার দিন রুষ্টিমষ্টির পর একদিন বিলাস কাঁকড়ার দাড়ার মত তার হাত ধরে টেনে নিয়ে ফেলল গোয়ালের বিচুলি গাদার অন্ধকারে। অতঃপর অন্ধকারের ঘটনার দিব্যলিক বর্ণনা—

"বাইমজলের জোয়ার এসেছে তখন, যত হাজা-মজা কাদি-ক্যাকড়া নদীর খুঁটি নেড়ে, বুক ডুবিয়ে। ইছামতী

তার জোয়ারের ঠোঁটে নিয়ে এসেছে চৈত-টোটার বাতাসের শাসানি। নির্জন দুপুরটা বাতাসের মারে উলটি-পালটি খেতে লাগল।"

এই সব ফালি ফ্যাকড়া ব্যাপার দস্তরমত ঝুঁটি নেড়ে বুক ফুলিয়ে বলা শেষ করে সমরেশ বসু বিলাসকে নিয়ে পতিতপাবনী মা গঙ্গার দিকে রওনা হলেন। "রক্তের স্বাদ পাওয়া" সেই বউটা "সেই থেকে···একেবারে ঠাণ্ডা" এবং বিলাস হয়ে উঠল অস্থির। তার "মন কসকস করে।"

বন্ধু শুধোয়, কী হয়েছে? বলে, "ওর কাছে যেতে মন করছে আবার, না?" পরামর্শ দেয়, "মন করে তো যা। মন করে থাকলে ওইতেই সব ঠিক হয়ে যাবে'খনি।"

কিন্তু বিলাস আর সে স্ত্রীলোকটির কাছে যেতে রাজি নয়। অন্য কিছু চাই তার। এই যেমন সমরেশ বসুর গল্প পড়া আর কী। পড়ার সময় "নির্জন দুপুর বাতাসের মারে উলটি পালটি খেতে" থাকে যদিও কিন্তু পড়া হয়ে গেলেই "নিজের পরে ঘেন্নায় আর বাঁচি না", অথচ মনে হয় "শরীলের কী য্যানো গইড়ে বেড়াচ্ছে"। বিলাসের অবস্থাও তেমনি। আর আমরাও যেমন, বিলাসও তেমনি, দ্বিতীয়বার আর সেই বেলতলায় যেতে নারাজ। বেলতলায় কিংবা বিচুলি গাদার অন্ধকারে।

তবে কী চাই বিলাসের? গাঁয়ের পনেরো বছর বয়সী যে মেয়ে বিলাসের অনুরাগিণী তার কাছে যাবে? "না। বড় একফোঁটা মেয়ে।" বন্ধু মন্তব্য করে, "সে মেয়ে যদি একফোঁট্টা তবে কি এট্টা ধুমসী মাগী চাই তোর?" [রুচিবান পাঠক মার্জনা করবেন, এসব হচ্ছে বেঠিক গুরুর শেখানো কথা; অতএব মার্জনীয়।] বিলাস বলে, "বানচত [পারিভাষিক শব্দ], তোর কাছে কি বিলেস মাগী [তদেব] চেয়ে ফিরছে, অ্যা?"

এইভাবে উপন্যাসের মুখপত্তন হল। তারপর আর ভাবনা কী? 'শরীলের যে জিনিস গইড়ে বেড়াচ্ছে' তার জ্বালায় কস্তরীমৃগসম বিলাস গঙ্গায় গেল মাছ ধরতে। আর সমরেশ বসুর মত গুণী ব্যক্তি যখন দিগ্দর্শক (বেঠিক গুরু?) তখন অচিরেই খুঁজে পেল মুক্তির উপায়। মাছ নয়, হিমি।

"গায়ে জামা নেই। একখানি শাড়ি পরে এসেছে। [জামা নেই বলার পরেও শাড়ি আছে একথা বলা অন্যের ক্ষেত্রে বাহুল্য মনে হতে পারে কিন্তু সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে ওটা বলা থাকা দরকার।]···ছেলেপুলে হয় নি আজও। গড়ন-পিটনে একটু ছেউটি ছেউটি।"

এরপর বিলাস একই সঙ্গে ইলিশমাছ এবং হিমি শিকারে ব্যাপৃত হল। হিমির আবির্ভাবের আগেই অবশ্য ইলিশ মাছ শিকারে বউনি হয়েছিল; তবে সে মাছ বোধ হয় সিম্বলিক। কেন না স্পষ্ট লেখা আছে—"সুন্দর গড়নটি। আঁটোসাঁটো যুবতী মেয়েমানুষের মত।" অর্থাৎ ছেউটি ছেউটি গড়নের মাছ।

এই মাছটির গায়ে যদি একটি জামা পরিয়ে দিতেন সমরেশ বসু তবে লেখাটা আরও জমত। যুবতী মেয়েমানুষের মত ইলিশমাছ এবং মাছের মত যুবতী মেয়ে, দুই ধরে দিন কাটত সমরেশ বসুর নায়কের।

মাছ ধরা শেষ করে তবে অন্য জাল গুটোল বিলাস। "জোয়ান কোটাল উথলে উঠল কূলে কূলে। পাড় ভাসল। বিলাসের বুকের অন্ধকারে মিশিয়ে গেল হিমি। অন্ধকার, আদিগন্ত সমুদ্রের মত নীলাম্বুধি বিলাস। উজানী মাছের মত ভেসে বেড়াল হিমি সেই সমুদ্রে।"

এই যে মীনমুদ্রার সাঙ্কেতিক বর্ণনা, তার আগেই সমরেশবাবু অবশ্য আমাদের মত সাধারণ পাঠকের জন্য ব্যাপারটা প্রাকৃতভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। নায়ক জিজ্ঞেস করল নায়িকাকে, তার নাকি অসুখ করেছিল। নায়িকা চুপিচুপি বলল, "···ডাকতর আমার নাড়ি টিপে দেখলে, চোখ দেখলে, জিভ দেখলে, তা পরে বললে, ও মেয়ে, তোমার রক্ত বড়ো উতল হয়েছে মা। বে-থা হয় নি? [এ ডাক্তারটি কে মশাই? নীহার গুপ্ত, নয় তো?] কী লজ্জা, কী লজ্জা!···বললুম, না। বললে, তাই তোমার শরীর খারাপ মা। এর ওষুধ তো আমার কাছে নেই।···" তারপরেই লেখা আছে, "দু হাত দিয়ে টানল হিমি বিলাসকে।" [কাঁকড়ার দাড়ার মত?] এবং অতঃপর সেই মীনাসনের সঙ্কেত।

রসিক ডাক্তারের ডায়াগ্নেসিস: রসিক লেখকের ট্রিটমেন্ট। রুগী এবং পাঠক রসসিক্ত না হয়ে যায় কোথায়?

যা-ই হোক, এতদিনে নায়িকার রক্ত স্থির হল এবং নায়কের মন কসকস করা ও শরীলের কী য্যানো গইড়ে

বেড়ানোর উপশম হল। তখন বিলাস রওনা হল সমুদ্রে। শর্ত রইল, ঘুরে ফিরে 'জোয়ারের আগনায়' সে আসবে হিমির কাছে এবং 'চলন্তায় অকূলে' চলে যাবে। পরিচ্ছেদ ভাগ না করা অখণ্ড উপন্যাস এইখানে সমাপ্ত।

তাহলে এ উপন্যাসের বক্তব্য কী? কাহিনীর বিস্তারে জীবনের প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যদি ব্যাখ্যাত হয় তার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী রূপে কামনা ও কামনার তৃপ্তি উল্লিখিত হবে, তাতে আমি দোষ দিই না; সে-উল্লেখ সমরেশ 'গঙ্গা'য় যত অন্যত্র তার চাইতে বেশী কদর্য নিরাবরণতায় করেছেন, শুধু সে-কারণেও আমি নিন্দা করতাম না তাঁকে। কিন্তু 'গঙ্গা' জীবনের কোন অংশকে তুলে ধরেছে কাহিনীর মাধ্যমে?

এই কি নয় এ-কাহিনীর প্রতিপাদ্য যে রিরংসা মানুষের প্রবলতম সংস্কার এবং রিরংসাকে চরিতার্থ করার পরেই শুধু জীবন যাত্রা করতে পারে মহত্তর লক্ষ্য অন্বেষণে! চটকদার একটি পরস্ত্রীর সঙ্গে শৃঙ্গার সমরেশের নায়কের রিরংসাকে তীব্র করেছিল মাত্র, কেননা সেদিন তার প্রস্তুতি ছিল না দৈহিক সম্ভোগের; বিবেক তাই মলিন হয়েছিল পুরুষের; যে-নারী ছিল প্রস্তুত তার কিন্তু নিবৃত্তি ঘটেছিল অন্তর্জ্বালার। তারপর অন্য এক পরিবেশে এক বারবণিতার কন্যা নায়কের কামনাকে সংহত প্রস্তুত এবং একাগ্র করল; তার দেহ-সম্ভোগের মধ্যে নায়ক মুক্তি পেল অতৃপ্ত রিরংসার বন্ধন থেকে। অতএব, উপন্যাসের শেষ কয়েকটি ছত্রে ইঙ্গিতে মাত্র উক্ত হল, এখন সে যাত্রা করতে পারে সমুদ্রের সন্ধানে, যে-সমুদ্র জীবনের শ্রেয়সের প্রতীক।

এই যদি উপন্যাস হয়, তবে উপন্যাসের চরিত্রের জন্য মানবসন্তান অপরিহার্য নয়। এ জীবন-দর্শন তো পশুর ক্ষেত্রেও সত্য। পশুও রিরংসায় জর্জর হয়, পশুও আহারের সন্ধান করতে পারে না বিহারের ক্ষুধা চরিতার্থ না হলে, এবং পশুও অনিচ্ছুক সঙ্গমে তৃপ্তি পায় না। 'গঙ্গা' উপন্যাসে যে মূল বক্তব্য প্রতিভাত হয়েছে তা অনায়াসে বলা চলত যে কোনও ইতর প্রাণীর জীবন-কাহিনী দিয়ে।

সেই-কারণেই 'গঙ্গা' উপন্যাস হয় নি, হলেও হয় নি মানবিক উপন্যাস।

তিন

বস্তুতঃ সমুদ্র-যাত্রার যে ঈষৎ আভাস দিয়ে গ্রন্থটির সমাপ্তি, তা এই অখণ্ডতার ভণ্ডামি-ভরা উপন্যাসে একান্তই প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। এর নায়ক বিলাস, যে সমরেশ বসুর বর্ণনায় নৌকা-বিলাস নামের উপযুক্ত, তার চরিত্র দিয়ে প্রস্তুত করতে পারে নি আমাদের প্রত্যয়। আমরা তাকে সমুদ্রের জন্য ক্ষুধার্ত অভিযাত্রী হিসেবে বিশ্বাস করতে পারি নি। বিচুলি-গাদার অন্ধকারে যে-অতৃপ্তির জন্ম, সেই অতৃপ্তিই তাকে তাহলে সমুদ্রের গান শোনাত; সমুদ্রের কিংবা অন্য কোন সমুদ্র-অতিক্রান্ত শ্রেয়সের। অন্য এক স্ত্রীলোকের দেহ-সম্ভোগ না করা পর্যন্ত শ্রেয়সের ক্ষুধা তার সুপ্ত থাকত না। যদি তা থাকে, তাহলে সম্ভোগ তো নব নব সম্ভোগ-তৃষ্ণার জন্ম দিয়ে যাবে। সে তো তবে সমুদ্র খুঁজে পাবে নারীদেহের 'ছেউটি ছেউটি গড়ন-পিটনে'-ই।

মূল উপজীব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলেই সমরেশ বসুর সমস্ত বুদ্ধি দিয়েও এ অংশকে মেলানো যায় নি কাহিনীর সঙ্গে। সবচেয়ে আকস্মিক এবং খাপছাড়া হয়ে রয়েছে 'হিমি'র শেষ স্টাণ্ট। যে মেয়ে লক্ষপতি নাগরের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করল, দিদিমার সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করল, তার মনের মানুষের সঙ্গে নৌকোয় চাপল সকল বন্ধন খুলে এক স্রোতে ভাসবে বলে, সে যখন অর্ধেক পথ এসে অকস্মাৎ সিদ্ধান্ত করে ফিরে যাবে পুরনো জীবনে তখন বোঝা যায়, ভণ্ডামি খুব সহজ কর্ম নয়। তার দাগ থেকে যাবেই যাবে, গঁদের আঠার মত।

কোন ব্যাখ্যা দিয়েই হিমির এই আচরণ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় বিলাসের অতি স্বাভাবিক বলেই অস্বাভাবিক প্রতি-আচরণের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র যথার্থ ব্যাখ্যা—এ অংশ প্রিটেনশন মাত্র।

কিন্তু এই সামুদ্রিক প্রিটেনশনের চাইতেও বৃহৎ অপরাধ ঘটেছে লেখকের। মৎস্যজীবীদের চরিত্র নিয়ে এই কাহিনী রচনার দুঃসাহস হল সেই অপরাধ।

'গঙ্গা' প্রকাশিত হবার পর কেউ কেউ সন্দেহ করেছিলেন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'কে আশ্রয় করে সম্ভবতঃ সমরেশ বসুর এই অক্ষম প্রয়াস। কিন্তু ভাল করে 'গঙ্গা' পড়লে সে বিপরীত সন্দেহই হওয়া স্বাভাবিক যে সমরেশ বসু কোনদিন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাস আদৌ পড়েছেন কিনা। বস্তুতঃ সমরেশ যেমন মাণিকও তেমনই মৎস্যজীবীদের জীবনকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করতে পারেন নি: না পারায় দোষ নেই। কিন্তু জীবনে জীবন যোগ না করেও শুধু বাইরের দিকে তাকিয়ে শুধু কিছুদিন কয়েকটি মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁদের সমাজ, সংস্কৃতি, চিন্তা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যতগুলি অনুভূতি আনা সম্ভব, মাণিক তাঁর তুঙ্গশীর্ষে উঠতে পেরেছিলেন, কারণ জীবনের অন্ধকার সুড়ঙ্গগুলির প্রতি ব্যাধিত পক্ষপাত সত্ত্বেও মাণিক ছিলেন বিরল প্রতিভাধর শিল্পী; তেমন ক্ষমতাধরের পক্ষেই সাজে তেমন মানুষ ও তেমন জগতের মাধ্যমে সকল মানুষের চিরন্তন বাণী শোনাবার দুঃসাহস, যে মানুষ ও জগতের সঙ্গে লেখকের

নাড়ির যোগ নেই। ও পাড়ার জানালায় মাঝে মাঝে উঁকি মেরে সমাজের অন্ত মঞ্চে বসে ও-পাড়ার গল্প বলা যায় না, এ কথা রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতিতে সত্য হয়ে আছে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় অংশতঃ সক্ষম হয়েছিলেন সেই কঠিন কর্মে।

তার পরও, পদ্মানদীর মাঝি রচনার পর দুই যুগ অতিক্রান্ত হবার পর, যদি কেউ আবার মৎস্যজীবীর জীবনকে উপন্যাসের ফ্রেমে বাঁধতে চায় পল্লবগ্রাহী বাহ্যিক অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে তবে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে এই লেখক পদ্মানদীর মাঝি পড়ে দেখেন নি।

তাই আমি বিশ্বাস করি না যে সমরেশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুকরণ করেছেন। আসলে অনুকরণের প্রয়োজনও ছিল না। রিরংসাকে উপজীব্য করে কাহিনী রচনায় সমরেশ বসু অবশ্যই দক্ষ। এবং সেই উপজীব্যের ভিত্তিতে মৎস্যজীবী সমাজের একটি আড়ষ্ট চিত্র উপস্থাপনের জন্য সমরেশ সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ পরিশ্রমও করেছেন।

কিন্তু সে-পরিশ্রমের লক্ষ্য ছিল না মালো-সমাজের সংস্কৃতি হৃদয়ঙ্গম করা। কতকগুলি অপরিচিত শব্দ, কতকগুলি গ্রাম্য অশ্লীলতা, কতকগুলি জাল এবং মাছের নাম মুখস্থ করা পর্যন্ত ছিল সে-পরিশ্রমের উদ্দেশ্য।

সেই সব শব্দ ও বর্ণনায় গঙ্গা পরিপূর্ণ। তার গভীরে মালো-সমাজের জীবন্ত হৃৎস্পন্দন তবু সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। হৃৎস্পন্দন অনুপস্থিত বলেই শব্দের আড়ম্বর শ্রুতিকটু ভাবে অতিরিক্ত। নিষ্ঠার অভাব আয়োজনের আতিশয্য দিয়ে সযত্নে লুকায়িত।

পদ্মানদীর মাঝি রচনার পর মালো-সমাজকে আশ্রয় করে আর একখানি বাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছে। অদ্বৈত মল্লবর্মনের লেখা সেই গ্রন্থ তিতাস একটি নদীর নাম এ কারণে সার্থক নয় যে পদ্মানদীর মাঝির চাইতে এটি শিল্পগুণে মহত্তর; শিল্পগুণে নয়, নিষ্ঠায়, সারল্যে অকপট হৃদয়ানুভূতিতে সার্থক হয়েছে তিতাস একটি নদীর নাম। তার কারণ এর লেখক মালো-সমাজের একজন। তিনি সে জীবনকে রক্ত দিয়ে জানেন, বুদ্ধি দিয়ে জানতে হয় নি তাঁকে।

সেই গ্রন্থে অদ্বৈত লিখেছেন, "মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনে আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার পথ সুগম ছিল না।"

সমরেশ বসু সেইজন্যই তেমন চেষ্টাও করেন নি, মালো সংস্কৃতির ভিতরে দূরের কথা দাওয়াতে উঠে বসারও চেষ্টা না করে নৌকোর গলুই থেকে এবং বিচুলি গাদার অন্ধকার থেকে এবং বারবনিতার গৃহদ্বার থেকে সংগ্রহ করেছেন তাঁর গঙ্গামৃত্তিকা। সমরেশকে বাহবা দিতে হয়।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটি সম্প্রতি আর একবার পড়তে গিয়ে একটি তথ্য নজরে পড়ল।

"তিতাস একটি নদীর নাম প্রথমত মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইতেছিল, গ্রন্থটির কয়েকটি স্তবক মুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন সময় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি রাস্তায় হারাইয়া যায়। বলা বাহুল্য অদ্বৈতের জীবনে এই ঘটনাটি সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক।"

এই তথ্যটি জেনে আমার বড় দুঃখ হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, মোহাম্মদীতে প্রকাশিত কয়েক স্তবক মাত্র হয়ত সমরেশ বসু পড়েছিলেন; যদি রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া গোটা পাণ্ডুলিপিটি ভাগ্যক্রমে সমরেশের হাতে পড়ত তবে বাংলা সাহিত্যের কত বড় একটা উপকার হত। অদ্বৈত মল্লবর্মনের অকপট উপন্যাসের উপর সমরেশের গরম মসলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে বাংলা ভাষাতে একটি সত্যকার মহৎ (অথচ জনপ্রিয়) উপন্যাস হতে পারত এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। অন্তত এ কথা জোর করে বলতে পারি, সেই পাণ্ডুলিপিটি সমরেশ বসু সংগ্রহ করতে পারলে গঙ্গা উপন্যাস এতখানি অন্তঃসারশূন্য হত না।

তিতাস একটি নদীর নাম দ্বিতীয়বার লিখিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৬৩ সনের আশ্বিন মাসে। গঙ্গার গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঠিক এক বছর পরে, যদিও শারদীয় পত্রে [দ্রুত ব্যস্ততায় বাঁদরের আকার] প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৩ সনেই।

অদ্বৈত মল্লবর্মন তাঁর উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বৎসর আগে ইহলোক পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পরম সৌভাগ্য যে তাঁকে বেঁচে থেকে দেখে যেতে হয় নি যে-দেশে তিতাস একটি নদীর নাম আদৃত হয় না, সেই দেশেই গঙ্গা পচা মাছের মত সে সে বাবু শব্দে হু হু করে কেটে যায়।

অদ্বৈত বেঁচে থাকলে হয়ত বা সমরেশ বসুই তাঁর মৃত্যুর কারণ হতেন।

সংবাদ-সাহিত্য

আমার মধ্যে দেশপ্রেম নেই

গত ৩০শে নভেম্বর এবং ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতায় সাহিত্যিকদের উদ্যোগে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও কর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে দুইটি জনসভার আয়োজন করা হইয়াছিল তাহার জন্য উদ্যোক্তাদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনজনে মিলিলেই যেখানে চুলোচুলি সেখানে তেত্রিশ জনেরও বেশী সাহিত্যিক একস্বরে কোরাস গাহিতেছেন ইহা আমাদের গভীর বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। এইরূপ সার্থক সমাবেশ ইতিপূর্বে বিশেষ হয় নাই বলিলেই চলে। কিন্তু এই দুইটি জমায়েতে ভদ্র সজ্জনগণের মধ্যে দুই দিনই এক চতুর দেশদ্রোহীকে হাজির হইতে দেখিয়া আমরা গোড়া হইতেই সন্দেহাকুল ছিলাম—ছাপার অক্ষরে মাত্র পাঁচ লাইনের মধ্যে এই লোকটির রক্ত মাংস মজ্জা এবং অস্থি অ.প.-দেবতার কৃপায় আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কাক রাজহংস সাজিবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবি-চাদরমণ্ডিত হইয়া দশ দিনের ব্যবধানে দুইটি সভাতেই উপস্থিত হইয়াছে এবং সুবিধা পাইলে প্রতি সপ্তাহে যাইতেও রাজি আছে। ইহার দুঃসাহসী অহমিকা ও প্রচণ্ড আত্মম্ভরিতার মূল কোথায় নিহিত তাহা মিত্রা এবং লাকির অনুসন্ধানের বিষয়। বলা বাহুল্য এই ছদ্মবেশীর নাম বুদ্ধদেব বসু। পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত তস্য 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে এই উক্তি আছে :

> **আমার মধ্যে দেশপ্রেম নেই। এই পৃথিবী নামক গ্রহের কোনো একটি অংশে দৈবাৎ নিক্ষিপ্ত হয়েছি বলেই তার মধ্যে ষড়ৈশ্বর্য দেখতে পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। 'সকল দেশের সেরা (?) সে যে আমার জন্মভূমি'—এই হৃদয়াবেগে আমার মন কখনো সাড়া দেয় না।**

এই মহাবাণী ছাপার অক্ষরে বাহির হওয়ার পরেও প্রায় অর্ধযুগকাল লোকটি নিরাপদে এবং বিনা প্রতিবাদেই কাটাইয়া দিল। কিন্তু কী বিপদ! পাঁচ বৎসর পূর্বে এই স্পর্ধিত উক্তির দ্বারা যে বাহবা অর্জিত হইয়াছিল তখন ভবিষ্যতের এই সংকটময় পরিস্থিতির কথা কল্পনাতেও আসে নাই। নিজের দেশকে তাচ্ছিল্য করিয়া চ্যাংড়া ভক্তদের সেলাম পাওয়ার কী দুর্জয় লোভ! একটি সভায় এই প্রগল্ভ দম্ভীর সম্মুখেই ঘোষিত হইল : "দেশের মানুষ যাহাতে মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, দেশপ্রেমিক হয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতে শেখে সে রকম সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তাঁহাদের যত্নশীল হইতে হইবে।" আর একটি সভায় বলা হইল : "আমরা স্বদেশ-প্রেমে বিশ্বাস করি। মাতৃভূমির প্রতি প্রেমহীনতা অমানবোচিত ও অসত্য। মানুষ তার ঐতিহ্য থেকে এই প্রেম অর্জন করে, এবং এই আবেগ তাকে অনেক শুভ কাজে প্রেরণা দেয়।" দেশপ্রেমিক সাজিয়া এই দুর্বুদ্ধ নিজেও বলিল "চীনের লালসা আরও বহুদূর প্রসারিত, তার লক্ষ্য আমরা যাকে 'প্রাণতুল্য মূল্য' দিই সেই স্বাধীনতা।"

লোকটি র‍্যাবো পড়িয়াছে সুতরাং ভবিষ্যতে নরক-দর্শন করিতে হয়তো আপত্তি করিবে না। আমরা জাগতিক অন্য কি ধরনের শাস্তি ইহার উপযুক্ত হয় সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া মাটিতে পুঁতিতেও ভয় করে, কেন না গাছ হইতে পারে। মোটের উপর দেশপ্রেমিকের ভেকধারী এই লোকটিকে ভবিষ্যতে কোনও দেশপ্রেমের সভায় বক্তৃতা তো দূরের কথা, প্রবেশ করিতে দিতেও আপত্তি হওয়া উচিত। স্বদেশের প্রতি দারুণ ঘৃণা এই উন্নাসিককে বাঙালীর শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ের সর্বজনবিদিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'ধনধান্য পুষ্পভরা'কে বিকৃত রূপে (অথবা অজ্ঞতাহেতু ভ্রান্তভাবে) 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি'র বদলে 'সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি' লিখিতে বাধ্য করিয়াছে। ইহা দুস্তর অন্যায়—ইহার শাস্তি হওয়া উচিত বেত্রাঘাত।

এই ধরনের দেশদ্রোহী লোককে সকলেরই চিনিয়া রাখা প্রয়োজন। গভীর পরিতাপের বিষয়, সেই প্রাচীন কালেও যেমন বর্তমানেও তেমনি বুদ্ধের প্রচারে অশোকের সমান উৎসাহ। বলা বাহুল্য আধুনিক অশোকের প্রচার আধুনিক বুদ্ধদেবকে অমর করিয়া রাখিতে পারিবে না—পাঞ্জাবি-চাদরাবৃত ছবি যতই ছাপা হউক না কেন।

দেশাত্মবোধ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। একটি সাময়িক পত্রিকায় প্রথম সভাটির ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর মধ্যস্থলে বিকশিতদন্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে ছবিখানি ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টে আমরা অ-করায়ত্ত প্রেমেন্দ্রকে ধিক্কার দিয়া এই উপদেশটুকু স্মরণ রাখিতে বলিব যে দেশপ্রেমের সভা প্রেমের লীলাক্ষেত্র নহে এবং সে লীলায় প্রেমেন্দ্র স্বয়ং মাতিলেও তফাত অনেক থাকিয়া যায়। বিবাহবাসরে গিয়া যেমন চোখের জল ফেলিলে লোকে উন্মাদ বলিয়া থাকে সেইরূপ দেশের দুর্দিনে দেশপ্রেমিকের আয়োজিত সভায় হাস্যচ্ছটা বিকীরণ করা মূর্খতারই নামান্তর মাত্র হয়। কিন্তু কল্লোল-যুগপুরুষদের দ্বারা সবই সম্ভব হইতে পারে।

আজ একদিকে যেমন দেশব্যাপী দারুণ সঙ্কট আমাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে অন্যদিকে এইসব ছদ্মবেশী প্রতারকের দল স্বদেশীয়ানার নামাবলী গায়ে জড়াইয়া আসর মাত করিতে নামিয়াছে। স্বদেশপ্রেম বা স্বাজাত্যবোধ ইহাদের বিন্দুমাত্রও নাই, কোনকালে ছিলও না। বিভিন্ন সময়ে লিখিত রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে দেশ ও দেশপ্রেম সংক্রান্ত কিছু উদ্ধৃতি দিই, এইসব যুগপুরুষ যাহা পড়িলে কিঞ্চিৎ উপকৃত হইবেন।

"এই মধ্যাহ্নসূর্যের আলোকে ভারতবর্ষ যেন তাহার বাহু উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। তাহার আসমুদ্রবিস্তৃত নদীপর্বতলোকালয় গোরার চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল—অনন্তের দিক হইতে একটি মুক্ত নির্মল আলোক আসিয়া এই ভারতবর্ষকে সর্বত্র যেন জ্যোতির্ময় করিয়া দেখাইল। গোরার বক্ষ ভরিয়া উঠিল, তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল, তাহার মনের কোথাও লেশমাত্র নৈরাশ্য রহিল না; ভারতবর্ষের যে-কাজ অন্তহীন, যে-কাজের ফল বহুদূরে, তাহার জন্য তাহার প্রকৃতি আনন্দের সহিত প্রস্তুত হইল—" [গোরা]

"স্বদেশপ্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাঙ্গীণভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সেদিন আমারও আর রক্ষা নেই—সেদিন সে আমার ধনপ্রাণ, আমার অস্থিমজ্জারক্ত, আমার আকাশ-আলোক, আমার সমস্তই অনায়াসে আকর্ষণ করে নিতে পারবে; স্বদেশের সেই সত্যমূর্তি যে কী আশ্চর্য অপরূপ, কী সুনিশ্চিত সুগোচর, তার আনন্দ তার বেদনা যে কী প্রচণ্ড প্রবল, যা বন্যার স্রোতের মত জীবন-মৃত্যুকে এক মুহূর্তে লঙ্ঘন করে যায়, তা আজ তোমার কথা শুনে মনে মনে অল্প অল্প অনুভব করতে পারছি…" [গোরা]

"আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না—জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজি স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র

পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ-সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী—তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর আজকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিমসমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে।"

["নববর্ষ"—'ভারতবর্ষ']

ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া চিনিতে চেষ্টা করিলে এবং এখন হইতে জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিলে এক-কানকাটা বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় কান হারাইয়া ষোলআনা বেইজ্জত হওয়ার বিপদ কাটিয়া যাইতেও পারে।

সাদা চোখে

৩০শে নভেম্বর তারিখের 'টাইম' সাপ্তাহিক পত্রিকায় THE WORLD/India শীর্ষক একটি অতি যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ পাঠ করিলাম। চীনের ভারত আক্রমণ ও তাহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সকল জ্ঞাতব্য তথ্যই ওই সুবৃহৎ প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক সমগ্র প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিতে পারেন। আমরা প্রবন্ধটি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি তুলিয়া দিতেছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নিরপেক্ষতানীতি ও পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ওই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে :

"Yet in its way, non-alignment paid enormous dividends. India received massive aid from both Russia and the West. Getting on India's good side became almost the most important thing in the United Nations. At intervals, the rest of the World's Statesmen came to India to pay obeisance to Nehru as though to a Buddha. And Nehru obviously believed that whatever he did, in case of real need the U. S. would have to help India anyway. Meanwhile, as he saw it, the object of his foreign policy was to prevent the two great Asian Powers—Russia and China—from combining against India...."

কী প্রতিকূলতার মধ্যে আমাদের সেনাবাহিনীকে দুর্জয় শীতের মধ্যে নেফার দুর্গম অঞ্চলে লড়াই করিতে হইতেছে তাহার একটি অদ্ভুত চিত্র 'টাইম' দিয়াছেন :

"Time Correspondent Edward Behr made the trip over a Jeep Path that was like a roller coaster 70 miles long and nearly three miles high. He reports: "The Jeep Path begins at Tezpur, amid groves of banana and banyon trees, then climbs steeply upward through forests of oak and pine to a 10,000-ft. summit. Here the path plunges dizzily downward to the supply base of Bomdi-La on a 5,000-ft. plateau, and then zigzags skyward again to the mist-hung Se Pass at 13,556 ft. Above the hairpin turns of the road rise sheer rock walls; below lie bottomless chasms. Rain and snow come without warning, turning the path to slippery mud. Even under the best conditions, a Jeep takes 18 hours to cover the 70 miles.

"At this height, icy winds sweep down from the snow crests of the Himalayas, and if a man makes the slightest exertion, his lungs feel as if they are bursting. Newcomers suffer from the nausea and light-

headedness of mountain sickness. Every item of supply, except water, must be brought up the roller coaster from the plains. There are few bits of earth flat enough for an airstrip, and helicopters have trouble navigating in the thin air." "

চীনাদের সামরিক অভিযানের লক্ষ্য সম্পর্কে পত্রিকাটি বলিতেছেন :

"There is still considerable dispute over how little or how much the Chinese were after in their attack on India. One theory held by some leading Indian military men is that the Reds want eventually to drive as far as Calcutta, thereby outflanking all of Southeast Asia. In such a drive, the Chinese would be able to take advantage of anti-Indian feeling along *the* way, notably among the rebellious *Nagas in* East Assam, and in the border *state of Sikkim.* Reaching Calcutta, perhaps the world's most miserable city, where 125,000 homeless persons sleep on the streets each night, they would find readymade the strongest Communist organization in India. According to this theory, the Reds could set up a satellite regime in the Bay of Bengal and, without going any farther with their armies, wait for the rest of India to splinter and fall. This strategy has not necessarily been abandoned for good, but it certainly has been set aside. For one thing, the Chinese attack shattered Communism as a political force even in Calcutta."

স্থানাভাববশতঃ আরও উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হইল না।

সেয়ানে সেয়ানে

আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের ক্ষেত্রে অনেকদিন হইতেই যে প্রচ্ছন্ন একটা দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যাইতেছে তাহা যে ক্ষমতারই দ্বন্দ্ব এবং তাহা যে চীন এবং রাশিয়া এই দুইটি বৃহৎ শক্তির মধ্যেই কেন্দ্রীভূত, বিশ্বরাজনীতির এই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আজ আর কাহারও অজ্ঞাত নয়। কম্যুনিস্টজগৎ এখন দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এখনও বেশির ভাগ কম্যুনিস্ট দেশ রাশিয়ার পক্ষে থাকিলেও এশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রায় পুরাপুরিই চীনের পক্ষে চলিয়া গিয়াছে। মাও সে-তুং এখন শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা বা পার্টির প্রধান হিসাবে গণ্য হন না, চীন এবং চীনপন্থী দেশগুলির অধিবাসীরা তাঁহাকে দেবতা বা অবতার জ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকে। চীন ও রাশিয়ার মতগত ও আচারগত প্রভেদ নিত্য বর্ধিত হইয়া ক্রমাগত দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করিয়া চলিতেছে। সম্প্রতি হাঙ্গেরীর একজন জনপ্রিয় লেখক George Paloczi-Horvath রচিত MAO TSE-TUNG Emperor of Blue Ants নামক গ্রন্থটি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে মাও সে-তুং-এর পররাষ্ট্রনীতি, সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত ক্ষমতার লড়াই—এ দুয়েরই একটি চমৎকার চিত্র পাওয়া যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি :

"In August 1949, Mao determined the basic lines of Chinese foreign policy in that words:

'It is impossible to hope that imperialists and the Chinese reactionaries can be persuaded to be goodhearted and repent. The only way is to organise strength and to fight them, as for example, our people's liberation war, our agrarian revolution, our exposing of imperialism, "provoking" them, defeating them and punishing their criminal acts, and "only allowing them to behave properly and

not allowing them to talk and act wildly." Only then is there hope of dealing with foreign imperialist countries on conditions of equality and mutual benifit.'

The method of "provocation" was not a slip of the tongue. Mao's press was constantly attacking those who opposed the policy of provocation. In 1958, when Khrushchev had already embarked upon his summit diplomacy, a *People's Daily* editorial observed :

'Some soft-hearted advocates of peace even naively believe that, in order to relax tension at all costs, the enemy must not be provoked....But...the stand of these Peace advocates is useless....If we allow the people to indulge in the illusion of peace and the horrors of war, actual war will fill them with panic and confusion.'" [P. 381]

"The "monolithic unity" of the Communist movement has rarely been endangered to such an extent as during the summer and autumn of 1960. In addition to Sino-Soviet accusations and counter accusations in the well-known "some people" style, there was an exchange of far more bitterly outspoken official communications between the two parties, dealing with the disputed idiological questions. These confidential Party documents were circularised among all the leading Parties by Moscow. Mao went a step further. He sent copies of these communications not only to "leading parties" but also to many Communist Parties in Asia, Africa and Latin-America. In the wake of these communications the Sino-Soviet Party dispute created warring factions in many other parties too, notably within the Indian and the Brazilian CP. (Communist Party)" [P. 388]

গোপালদার চিঠি

"কল্যাণবরেষু,

পুরা তিন মাস কাল আমার নীরবতায় খুবই চিন্তিত হইয়াছ অনুমান করিতেছি, কিন্তু বিশ্বাস কর, পত্র লেখার মত মনের অবস্থা ছিল না। তুমিও নির্দিষ্ট ঠিকানার অভাবে আমার তল্লাস করিবার সুযোগ একেবারেই পাও

নাই। তোমার নিকট গোপন করিব না, এই তিন মাস নেফা এবং লাদাকের গহন দুর্গম অঞ্চলগুলিতে যদৃচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছি। এক তিব্বতী লামার কাছে অনেককাল আগে যোগবলে অদৃশ্য থাকিয়া সহস্র যোজন পথ আলোকের অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে অতিক্রম করিতে শিখিয়াছি, এ কথা তোমার স্মরণ আছে বোধ হয়। নেফা-লাদাকের হাল দেখিয়া প্রথমটা তো আমার চক্ষু স্থির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। একদিনের কথা বলি। নেফা অঞ্চলের সেই দুর্দান্ত শীতে দুই পক্ষের সৈন্যদল হি হি করিয়া কাঁপিতেছে, হাত-পা অসাড়, চতুর্দিকে বরফ পড়িতেছে আর আমি উহাদেরই নাকের ডগায় সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে থাকিয়া হি হি করিয়া হাসিতেছি। হাসিতেছিলাম পঞ্চশীলের কথা ভাবিয়া। কপাল আমাদের—কোনও শীলই তো বজায় রহিল না।

প্রথমটায় চৈনিক অগ্রগাততে রীতিমত ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম বটে কিন্তু তোমাদের সৈন্যবাহিনীর বলিষ্ঠ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা এবং সরকারের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি দেখিয়া মনটা অনেক আশ্বস্ত হইল। তাহার পর চীনারা আকস্মিকভাবে অগ্রাভিযান বন্ধ করিয়া ক্রমশঃ পিছু হটিতে আরম্ভ করিল তাহাও লক্ষ্য করিলাম। মনে হয় চীনাদের সামরিক দুর্বলতাই উহার একমাত্র কারণ। কিন্তু মাত্র এইটুকুতেই ষোলআনা বিশ্বাস করা যায় না ইহা তোমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। চৈনিক সৈনিক ভারতবর্ষের সীমারেখার বাহিরে চলিয়া গেলেও নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করিয়ো না। তিব্বতকে স্বাধীন করার বিষয়ে তোমাদের অগ্রণী হইতে হইবে। নেপালকেও রাহুমুক্ত করিতে হইবে। তবেই তিব্বত নেপাল সিকিম ও ভূটানের বিরাট ভূখণ্ড তোমাদের ও চীনের মধ্যে বাফার স্টেট হিসাবে একটা প্রকৃত মার্জিন সৃষ্টি করিতে পারে। তা ছাড়া ঘরের চীনপন্থীদের মারিয়া ধরিয়া যে ভাবেই হউক সুবুদ্ধি জাগ্রত করিতে হইবে। মনে রাখিয়ো, তোমাদের নিরাপত্তা তোমাদের হাতেই। বিশ্বাসঘাতককে দ্বিতীয়বার বিশ্বাস না করাই উচিত।

নিজের সংবাদ দিই নাই বটে কিন্তু তোমাদের খবরাখবর আমি ঠিক রাখিয়াছি। তোমাদের সাহিত্যিকেরা সাংবাদিকেরা মিলিয়া সভাসমিতি করিতেছে ইহা খুবই আশার কথা সন্দেহ নাই। 'চিঠি'র আশ্বিন সংখ্যায় আমার দুইটি পুরাতন কবিতার পুনর্মুদ্রণ করিয়াছ দেখিয়া সুখী হইলাম। কার্তিক সংখ্যায় 'অজ্ঞাত ব্যক্তির পত্র' হিসাবে যাহা প্রকাশ করিয়াছ পাকা-খাদ মিলাইয়া কমা-ফুলস্টপসমেত তাহা তারিফ করার মত লোক কিন্তু এখন বেশী নাই। আপাততঃ কোষবদ্ধ পুলিনবিহারী সেনের নামটিই সর্বাগ্রে মনে পড়িতেছে।

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ কর:

"ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে-গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে-গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো।"

আজ আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না। শত্রুকবলমুক্ত বমডি-লার পথে এখন যানবাহনের মিছিল চলিয়াছে, সেই দিকে খর নজর রাখা প্রয়োজন। পরবর্তী পত্র শীঘ্রই পাইবে। ইতি

গোপালদা।"

টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস

সাহিত্যিকগণের সভায় চীনা-আক্রমণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই নাড়া দিয়াছে। কিন্তু কর্তব্যনির্ধারণ এখনও ঠিকমত হয় নাই। আমরা সাহিত্যিকগণের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যগুলির একটি মূল্যবান তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, সেটি নীচে দিলাম:

১ দেশরক্ষায় সাহায্যার্থে সরকারী তহবিলের জন্য টাকা তুলিতে হইবে।

২ ব্যক্তিগত ব্যয়সংকোচ করিতে হইবে।

৩ সোনাদানা মিলাইয়া সর্বপ্রকার বিলাসবাহুল্য পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৪ চীনা হোটেলে খানা, চীনা ধোলাইখানা, চীনা জুতা কেনা বর্জন করিতে হইবে।

৫ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে মুনাফাখোর ও মজুতদারদের দমন করিতে হইবে।

৬ পাড়ায় পাড়ায় যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে ঘনঘন সভার আয়োজন করিতে হইবে।

৭ করের উপর কর দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

৮ মদ্যপান অথবা হয়রান (অস্যার্থ ঘোড়দৌড়) ত্যাগ করিতে হইবে।

৯ অশ্লীল গল্প লেখা বা ছাপানো চলিবে না, কারণ উহা পাঠককে বীর্যহীন করিয়া তুলিবে।

১০ ধর্ম ও জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত গল্প 'দেশ' পত্রিকায় ছাপাইতে হইবে।

এই দেশেতেই মরি

ছেলেটার বাবা আগেই মরিয়াছে—মা-ও মারা গেল। অসহায় কিশোর ছেলেটাকে একটা সরীসৃপের, জানোয়ারের বউ সন্তানস্নেহে আগলাইতে এবং মানুষ করিতে থাকে। বউটি স্ত্রীলোক এবং রক্তমাংসে নির্মিত। ছেলেটা মাতৃস্নেহ তো বটেই, ভিন্নতর একটা স্বাদ পায় স্ত্রীলোকটির সান্নিধ্যে। স্ত্রীলোকটিও বন্ধ্যা—সন্তানস্নেহ ছাড়াও বিচিত্র একটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে ছেলেটির সহিত। স্বামী অর্থাৎ জানোয়ারটির কোনও লজ্জা নাই, স্ত্রী-বিরহে একদিনও ধৈর্য ধরিতে পারে না। ছেলেটির বাস অন্য বাড়িতে হইলেও প্রায় সর্বদাই স্ত্রীলোকটির গায়ের সঙ্গে কোলের সঙ্গে লেপটিয়া ঘেঁষিয়া থাকে। দিন কাটে। ঘটনাচক্রে এক রাত্রে একই ঘরে তিনজনেরই শয়ন এবং সে রাত্রে নিত্যনিয়মিত হিসাবে সরীসৃপ স্ত্রীকে সাপের মত পাকে-পাকে বাঁধিয়া রাখে, ছোবল দেয়, ছাড়ে না। স্ত্রীটি স্বামীর শয্যায় পুড়িতে থাকে। ছেলেটা কিন্তু আড়চোখে সব দেখে এবং সম্ভবত বোঝে। স্ত্রীলোকটিকে প্রশ্ন করে, তুমি ওর বউ? শেষে হিংসায় আর কথা বলে না।

বাস, নির্বাক এই দুইজনের মধ্যে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের মত সরীসৃপের নাক ডাকার আওয়াজ চলিতে থাকে। ভোর হয় না কিন্তু গল্প শেষ হয়।

বিশ্বাস করুন, ইহা 'দেশে'র (১-১২-৬২) গল্প এবং এই দেশেরই গল্প। গল্পটির নাম "সুড়ঙ্গ", লেখক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। মনে হয় অক্ষম হাতে অনেক পরিশ্রম করিয়া গল্পটি লেখা হইয়াছে। মূল রচনাটি যৎপরোনাস্তি নোংরা। উদ্ধৃতাংশ প্রায় ভাষাসমেত সবটাই মূলের সংক্ষিপ্তসার। বলিবার কিছু নাই, শুধু গল্পলেখকের নামে বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমে একটা দরখাস্ত পাঠাইয়া দিয়া সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। সরকারের মুখে সাগর-বৌয়ের হাসি। সাগর-বৌয়ের মুখে বিমল হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তামাশাপূর্ণা

দেশের সঙ্কটসময়ে বাংলাদেশের লেখিকারাও দেশরক্ষার দায়িত্ব লইয়া অগ্রসর হইতেছেন, এ সংবাদ অনেকেরই হয়তো জানা নাই। আর্তের সেবায় তাঁহারা নিজেদের জীবন প্রায় উৎসর্গ করিয়া দিতে প্রস্তুত, ফার্স্ট এড এবং নার্সিং ক্লাসও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতায় এক অভিজাত মহিলার গৃহে প্রায় পঁচিশজন মহিলার এক সমাবেশ হয়। ৬ই ডিসেম্বরের আনন্দবাজার হইতে রিপোর্টের কিছু অংশ তুলিয়া দিতেছি:

"লেখিকাদের সঙ্গে এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন একজন মাত্র পুরুষ। তিনি ডাঃ নবকিশন পাল অর্থাৎ তাঁদের শিক্ষক।

ডাক্তারবাবুকে কিছু বলার জন্য লেখিকাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হল। বক্তৃতা শুরু হল শরীরবিদ্যার ওপর। শ্রোতাদের অধিকাংশই বয়স্কা, তথাপি আগ্রহ কিছু কারও কম নয়।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী বললেন—"দেখুন আমার মনে হয় শরীরবিদ্যা বুঝতে হলে একটা নরকঙ্কালের ছবি ও ব্ল্যাক বোর্ড আমাদের প্রয়োজন।" সঙ্গে সঙ্গে অপর লেখিকারাও সাড়া দিলেন তাঁর প্রস্তাবে। কেউ কেউ ত রীতিমত নোট টুকতে সুরু করলেন।

গুরুগম্ভীর গলায় যখন ইংরেজীভাষায় ডাঃ পাল তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করলেন তখন কিন্তু সকলেই একসঙ্গে আপত্তি জানালেন—ইংরেজীতে কেন, বাঙ্গলায় বলুন। অতঃপর কি করা যায়। ডাঃ পাল ইংরেজী ও বাঙ্গলার সংমিশ্রণে জড়ান গলায় সুরু করলেন তাঁর বাধাপ্রাপ্ত বক্তৃতা।

"এই ধরুন রেস্‌পিরেশনের গতি বুঝতে হলে আপনাদের"—...উহু আবার বাধা। উঠে দাঁড়ালেন প্রতিভা বসু। "রেস্‌পিরেশনের পরিবর্তে বলুন নিশ্বাস-প্রশ্বাস।"

ধরা ধরা গলায় ডাক্তারবাবু বলছিলেন—ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক হবে—

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন বাণী রায়—নাইনটি প্লাস্ এজ—তখুনি চারিদিক থেকে এক প্রশ্ন অর্থাৎ—। অর্থাৎ মনোযোগের সঙ্গে বোঝাতে সুরু করলেন ডাঃ পাল—

"বয়সানুপাতে এর স্বাভাবিক গতি হবে..."

এমনি করে চলল পুরো দুটি ঘণ্টার ক্লাশ। স্থির হল সপ্তাহে দুদিন হবে এই ক্লাশ। সবাই রাজী। দেশের এই জরুরী অবস্থায় দুদিন কেন প্রয়োজন হলে তাঁরা সপ্তাহে তিন দিনও যোগ দেবেন।...

লাল কাঁকড় বিছান পথ দিয়ে চলতে চলতে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী বললেন, মন্দিরে গেলে যেমন আপনা থেকেই—মাথা নত হয়ে যায়—তেমনি আজ এই ফার্স্ট এড ক্লাশে এসে বার বার মনে হচ্ছে—আর্তের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার মাঝে আছে পরম তৃপ্তি।"

রিপোর্টটি পড়িয়া আর্তের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এই মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আপনা হইতেই আমাদের মাথা নত হইয়া আসিতেছে, ইঁহাদের স্বামীপুত্রপরিবারের আসন্ন দুর্দশার কথা ভাবিয়া মনটা ব্যথিত হইয়াও উঠিতেছে। কিন্তু এই বহ্বারম্ভ লঘুক্রিয়ায় পরিণত হইয়া তামাশায় দাঁড়াইবে না তো? সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ, দেশসেবা না হউক, মানবদেহের হাড়গোড় শিরাউপশিরার জটিল রহস্য ইঁহাদের নিকট ফাঁস হইয়া গেলে তো সর্বনাশ! ইঁহাদের লেখনী ইদানীং ক্রমশঃই যেরূপ তীক্ষ্ণাগ্র ও শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে তাহাতে যথাস্থানে অতি সূক্ষ্ম একটি ঘা দিলেই আমাদের ভঙ্গুর হাড়গোড় তাসের ঘরের মত চুরমার হইয়া যাইতে আর কতক্ষণ লাগিবে!

—

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৫-২৮৩৮

শনিবারের চিঠি

৩৫শ বর্ষ

৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৯

সম্পাদক :

শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

মনের আয়নায় নিজের ছবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একালের আত্মসমীক্ষার আয়নায় নিজেকে দেখে নিজের ছবি, ইংরেজীতে যাকে বলে 'সেল্‌ফ্‌ পোর্ট্রেট' তা আঁকার বিপদ আছে। আমার পক্ষে তো অসম্ভব। কারণ যে যুগে মানুষের সংজ্ঞা শুধু জীব (জন্তু কথাটা খাতির করে নেই বললাম), অবশ্য বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিবাদী জীব, সে যুগে আত্মসমীক্ষার আয়নায় এই মানুষের ভিতর থেকে একটি জন্তুর চেহারা দেখা যাক বা না যাক, বের করতেই হবে। না হলে বিদগ্ধ সমাজে সেটা সত্য হবে না। এ যুগের শিক্ষিত ভারতবর্ষের মন পুরোপুরি ইউরোপের কাছে দীক্ষা নিয়েছে; তাতে বেদ মাত্র দুটি—একটি ফ্রয়েডীয় বেদ, অপরটি মার্ক্সীয় বেদ। একটির কথা হল মনের বীজ কাম, ফ্রয়েডীয় ভাষায় লিবিডো, মার্ক্সবাদের বীজ হল অর্থ বা ওয়েল্‌থ্‌। ধর্ম ছিল এদেশের মূল কথা—সেটাতে চেঁড়া দাগ দিয়ে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

[illegible] রামরাজ করতেন, তাঁর অহিংসার ও সব [illegible] ছিল ঈশ্বর। ধর্মকে ঈশ্বরের কাজ বলতে পারি; [illegible] তাঁদের মাথা আমার মত ধর্মের সকলই ঈশ্বর [illegible]। এ যুগে ঈশ্বর বাতিলের সঙ্গে মাথার [illegible] হয়েছে। ধর্মের মধ্যেই ছিল অহিংসা; [illegible] ছিল; তাও গেছে মাথার [illegible]

জন্তুর নাকে পরানো হয়েছে ভালুকের নাকে-পরানো দড়ি-বাঁধা মাকড়ীর মত। তাকে অহিংস করে বিশেষ রূপে সভ্য করবার জন্য। এই মতই বড় রাষ্ট্রনেতা থেকে ক্ষুদে ছাত্রনেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক সবাই পোষণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের শ্রেষ্ঠ অংশ ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন, তার মধ্যে সুরের তারিফে আমরা গদগদ, রচনাকৌশলে বিমুগ্ধ, শুনে বা পড়ে হায় হায় করেও আমরা ঈশ্বর ও ঈশ্বর-বিশ্বাসকে দরিয়ায় ভাসিয়ে ড্রাম বাজিয়েছি। সেও বড় সাহিত্যিক, ছোট সাহিত্যিক, শিল্পী থেকে সবাই, কে নয়? কেমন করে কোন্ চক্রান্তের ফাঁকে এর মধ্যে আমি টিকে আছি জানি নে।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ আছেন তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস নিয়ে, দেখে বুঝতে পারি—চক্রান্তের ফাঁক এটা নয়; চাকার দাঁতে ভাঙা যায় নি বলেই আছে। সেই কারণেই ভরসা করে বলতে পারছি যে, ঠিক এইভাবেই আত্মসমীক্ষার আয়নায় আমার মধ্যে সাদৃশ্যসম্পন্ন কোন একটি জন্তুকে আবিষ্কার করা আমার পক্ষে শক্ত বললে কিছুই বলা হবে না, বলতে হবে সম্ভবপরই নয়। এতে ফ্রাস্ট্রেটেড বা হতাশা-পীড়িত বললে তাই, কেউ বুর্জোয়া বললে তাই, কেউ [illegible] বললে তাই। তবে এ দিয়ে আমি [illegible] করা যাবে না। কিন্তু আমি

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলছি যে কোন সাফল্য বা সার্থকতা, যাকে সাকসেস্ বলে, তা খুব উঁচু ডালে আছে আর আমি নীচে দাঁড়িয়ে 'ঈশ্বর ওটাকে ফেলে দাও' বলে তো ডাকি নে। এবং গরীব, গৃহস্থ, ধনী, অলেখক, যে কোন লেখকের, বড় লেখকের সঙ্গে মেলামেশায় তো আমি কোন কম্যুনিস্ট লেখকের থেকে আলাদা নই। সুতরাং ও সংজ্ঞাগুলো আমাকে স্পর্শ করে না বা আমার সম্পর্কে খাটে না। আমার জন্ম ১৮৯৮ সনে, চার-পাঁচ বছর থেকেই ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস করি। নাস্তিক্যবাদ চর্চা করতে গিয়ে শান্তি পাই নি। মিথ্যা হয়ে গেছে, কারণ ঈশ্বরের মতই একটি সত্তার হাতছানিতে আবার বিশ্বাসেই ফিরে এসেছি। তাকে খুঁজেছি, ডেকেছি, আজও খুঁজি, আজও ডাকি; মনে মনে সরব না হোক, নীরব একটা ইশারা পাই। আত্মসমীক্ষা আমি প্রতি পদে করি; কিন্তু বাজারের কেনা আয়নায় আমার চেহারা ভাল নয় এটা জেনেও এবং মুখে বলে, লেখায় লিখে প্রায় ঘোষণা করেও নিজের সঙ্গে কোন জন্তু-জানোয়ারের চেহারার মিল দেখতে পাই নে।

বাইরের চেহারা আমি বাজারে আয়নায় যত ভাল করে দেখেছি—মনঃসমীক্ষার আয়নায় মনের চেহারা আমি তার চেয়ে বেশী ভাল করে দেখেছি। যদি বলি মনের চেহারাকে দেখতে দেখতে আত্মাকে দেখেছি কখনও—চকিতের মত, তবে মিথ্যা বলব না। বিশ্বাস কেউ না করেন, বলব না—অঘটন আজও ঘটে বা There are more things in heaven and earth ইত্যাদি। সে যাক।

বাইরের আয়নায় আমার শ্রী নেই দেখে একটা সুযোগে আমি নামের আগে 'শ্রী' পরিত্যাগ করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে এ নিয়ে নিজের কাজটাকে বিচারও করেছিলাম। এটা আমার স্বভাব। যে কাজই করি, করার পর ভেবে দেখি এটা কেন করলাম। ধরা যাক, হঠাৎ কোন বাল্যবন্ধুর চিঠির উত্তরে যদি কিছুটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় বা কোন বন্ধুকে হঠাৎ মনে পড়ে তাকে নিজে থেকেই পত্র লিখি—তবে হঠাৎ একসময় ভাবতে বসি কেন এটা করলাম? এর কতটা সত্য, কতটা লোক-দেখানো ব্যাপার? ওকে কি সুকৌশলে আমার বড়ত্বটা জানালাম না? কোন মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে বা পত্র লিখলে তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নিই। বেশীর ভাগই মা। কারণ আমি ঈশ্বরকে মাতৃরূপে পূজা করি। দু-চারটে ক্ষেত্রে বোন, এ সব ক্ষেত্রেও প্রশ্ন করি এটা স্বতঃস্ফূর্ত, না মনের আলোর কালি ও অগ্নি-নিবারণের জন্য এটা একটা কাঁচের ফানুস লাগালাম?

রাত্রির পর রাত্রি নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে জন্মমৃত্যু সম্পর্কে ভেবেছি—আজও ভাবি, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে গেলেই ঈশ্বর এসে পড়েন। ঈশ্বরের কথা ভাবতে গিয়ে মাতৃরূপের মধ্যে তাঁর স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করি। যখন ছেদ পড়ে তখন আবার অকস্মাৎ প্রশ্ন করি—কেন এইভাবে উত্তরহীন কেনর উত্তর খুঁজি? অবাঙ্‌মনসোগোচর ঈশ্বরকে গোচরে আনবার চেষ্টা করি কেন? কোন্ অতৃপ্তির জন্য?

এমন কি কারুর কোন ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে তারিফ করে নিজেকে প্রশ্ন করি, আমার কি লোভ হল? ওকে কি ঈর্ষা করলাম?

কোন সুন্দরী নারীর দিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে সংকোচ হলেও প্রশ্ন করি, তাকালাম কেন? সংকোচ করলাম কেন? এবং মনকে চিরে চিরে দেখি।

যেখানেই কোন সংশয় হয়েছে—সেখানেই আত্মগ্লানি হয়েছে এবং তিরস্কার করেছি নিজেকে। অনেক ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত করেছি।

দু-চারজন সমসাময়িক লেখক বা বন্ধু এর সাক্ষী আছেন। কোন কারণে যদি মনে হয়েছে আমার কোন আচরণ বা উক্তি অন্যায় হয়েছে তবে তাঁদের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করে পত্র লিখেছি।

আবার লিখেও মনে হয়েছে এর মধ্যেও সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা করলাম না তো? যখন নামের আগে শ্রী ত্যাগ করি তখনও ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলাম। সেদিন মনে হয়েছিল এটা খানিকটা সত্যও বটে। সত্যও ছিল। কিন্তু নিরন্তর চর্চায় আজ প্রতিষ্ঠার সীমানা পার হয়ে আর এক জায়গায় পৌঁছেছি। সেটা হল আত্মতুষ্টির ক্ষেত্র। আজ বলতে সংকোচও হচ্ছে না যে আত্মতৃপ্তি বা পরিতৃপ্তি যা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে পৌঁছে

ঈশ্বর-প্রসাদ পাবার একটা বীজ আমার মধ্যে ছিল, হয়তো জন্মগত ভাবেই। মনে রয়েছে এবং আমার স্মৃতিকথার মধ্যেও লিখেছি যে প্রথম বয়সে এটা উপ্ত হয়েছিল দেশপ্রেমের উত্তাপে। ফাঁসীকাঠ তখন বাংলাদেশে মহাভারতের মহাপ্রস্থানের পথ ; ওই পথে পাও দিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ে হয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। আমার স্ত্রী বলেন, আমি অতি কঠোর প্রকৃতির লোক এবং অবাধ্য স্বামী। কিন্তু আমি জানি আমি অত্যন্ত পত্নী-অনুরক্ত।

প্রথম বয়সে প্রতিষ্ঠাকামী এবং তার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে মর্যাদা-সম্পন্নতার আবরণে দাম্ভিক ছিলাম। ও দুটো প্রায় অগ্নিশিখার উত্তাপ এবং অগ্নিবর্ণের মত একটার সঙ্গে আর একটা জড়ানো। একটা থাকলেই আর একটা থাকে। তখনকার চেহারা কল্পনা করে ভাবতে চেষ্টা করছি—তার মধ্যে কোন জীবকে আবিষ্কার করা যায় কিনা। হয়তো বাঘ-ভালুক বলা যেতে পারত কিন্তু ওই আত্মদানের কামনার জন্যে মেলাতে পারা যাচ্ছে না। কারণ ওরা আর সবই হয়তো পারে ; বাচ্চা বয়সে বাঘকে শিখিয়ে সার্কাসে তাকে দিয়ে অনেক কিছু করানো যায় ; কিন্তু কোনমতেই তার মধ্যে ভাল কিছুর জন্যে, মহৎ কিছুর জন্যে প্রাণ দানের বাসনা উদ্রিক্ত করা যায় না। জন্তু বা animal সে কখনই নয়। জীবন আছে বলে জীব—এ কথা সত্য বলে মানতেই হবে। কিন্তু বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী এবং কাম (লিবিডো) ও অর্থ (মেটিরিয়েল ওয়েলথ্)-নিয়ন্ত্রিত জীব, মানুষের এ সংজ্ঞা আমার কাছে এবং আমার মত কোটি কোটি ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ভুল—এটা মানুষের অপমান। মানুষের মধ্যে এমন একটি সত্তা আছে যা কোন জীব-জন্তুর মধ্যে নেই। জীবজন্তু নড়ে, চড়ে, রাগে, কাঁদে, হাসে, ভয় পায়, ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম বোধ করে ; এ শক্তিকে বলে চেতনা। সে সচেতন। কিন্তু মানুষ শুধু সচেতন নয়, তার চৈতন্য আছে। সে একজনকে কামার্ত দেখলে কামার্ত হয়ে তাকে আক্রমণ করে বসে না, লজ্জিত হয়। নিজের ক্ষুধার খাদ্য অপরকে দিয়ে নিজের উদরপূর্তির তৃপ্তির চেয়ে বেশী তৃপ্তি অনুভব করে ; একজনের দুঃখে-শোকে সেও দুঃখ-দুঃখের বেদনা অনুভব করে। তার চোখের জলের নির্গমনপথ একটি ধারায় নয়—অজস্র ধারায়। শুধু নিজের যন্ত্রণায় বা দুঃখে নয়, পরের যন্ত্রণা এবং দুঃখেও সে কাঁদে। পর তো সংসারে কোটি কোটি। সুতরাং চোখের জল তার অজস্র ধারায় ঝরে। যে এই কান্না কাঁদে তাকে জীবজন্তু কি করে বলব ? জীবজন্তুর জীবনে এ কান্না নেই। আমি আত্মসমীক্ষার আয়নায় দেখতেও পাই, এ কান্না জীবন কাঁদে না—জীবনের মধ্যে থেকে জাগ্রত আত্মা কাঁদে।

আমি আত্মসমীক্ষার দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি এবং বিগতকালে স্মৃতির ক্যামেরায় তোলা এই দর্পণে দেখা যে ছবিগুলি জীবনের দেওয়ালে ঝুলছে তা দেখে মনে জাগছে একটি গাছের কথা। সেই মাটির তলায় উপ্ত বীজে সেই বিবর্ণ অঙ্কুর থেকে তার পুষ্পিত ও ফলবন্ত পরিণতি পর্যন্ত নানান অবস্থার ছবি দেখতে পাচ্ছি। আবার মাটির তলার পঙ্ক এবং পচনরস পানে যে মূলজাল লক্ষ মুখ হয়ে ক্রমবিস্তার লাভ করছে তাও দেখতে পাচ্ছি। তবুও পরম এবং চরম সত্য উপরে, ওইটেই তার স্বরূপ। ওখান থেকেই বীজ এবং বীজ থেকেই সৃষ্টি যতকাল ততকাল তার বংশানুক্রমিক অঙ্কুর বিস্তার। থাক, ধোঁয়া সরিয়ে দিয়ে বাস্তবে যা করি—অর্থাৎ ভাবনার যেটা রূপায়ণ তার কাঠকুটো জুগিয়ে সাদামাটা কথার ফুঁয়ে অগ্নিশিখার আলোয় পরিষ্কার করে দি। ছবির ক্ষেত্রে—ফ্লাশ-লাইটের কাজ হবে।

ভোরবেলা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ঈশ্বরের নাম এবং কল্পনার ছবি জেগে ওঠে। মুখ দিয়েও বেরিয়ে আসে। তার পরই তাগিদ আসে চায়ের। মুখ হাত ধুয়ে এক গ্লাস লেবু-চা নিয়ে বসি। পাশে থাকে সিগারেটের বাক্স আর দেশলাই। খবরের কাগজ পড়ি। ধরুন আজকের কথাই বলি। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬২র কথা। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বড়দিন উপলক্ষ্যে বলেছেন, চীনের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করছি, তা সত্ত্বেও আমরা যেন চীন দেশের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ না করি। এটা আমারও মনের কথা, প্রাণের কথা। এইখানেই আত্মসমীক্ষার আয়নায় আমার আত্মাকে দেখতে পাচ্ছি। ১৯৫৭ সনে মাদ্রাজে All India Writers Conference-এ সভাপতি হিসেবে অভিভাষণে

চীনা আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী এই দৃঢ় ধারণাবশে বলেছিলাম—"We shall resist enmity with our life, but even in a moment of greatest danger, we shall be nobodies' enemy." এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই লেবু-চায়ের পর দুধ-চায়ের জন্ত হাঁক দিচ্ছি। সিগারেট দুটোর পর তৃতীয়টা হয়ে গেল। আমি যদি গাছ হই তবে এরই মধ্যে মাটির তলার মূলের ছবি শাখাবৃন্তে ফুলের ছবি দুইই চলছে একসঙ্গে। আবার এরই মধ্যে বাড়ির সামনে এসেছে ভিক্ষার্থী এবং পাড়ার দুটি খোকা। ভিক্ষার্থী শুধু ভিক্ষাই চাইছে না, দুপুরবেলা নিমন্ত্রণ চাইছে। খাবে সে। আমার জীবনের মধ্যে ওটা বাঁধা নিয়ম। ওরা তা জানে। একজন থেকে দুজন, কোন কোন দিন তিনজনও নিমন্ত্রণ নিয়ে যায়। আমার বাড়িতে এক এক বেলায় আটত্রিশ জন লোক খানেওলা। ওর সঙ্গে আর একজন দুজন এমন কি তিনজনেও বিশেষ আসে-যায় না। ও না হলে মন খুঁতখুঁত করে আমার। কেউ যদি বলেন, এটা বুর্জোয়া মনের পরিচয়, বলুন। আমার খাইয়ে খুশী। এর পর ছেলে দুটির দাবি—গাছে অনেক বোগেনভেলিয়া ফুল ফুটেছে, দুগোছ তাদের পেড়ে দিতে হবে। দিলাম।

এর পর লিখতে বসি। ভারতীয় মতে মেঝেতে পাতা আসনে বসে, ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখি আমি। পাশে ডানদিকে আমাদের কুকুর—নাম বেটী অর্থাৎ কন্যা—সে এসে বসে। বুড়ো হয়েছে বেটী। এবার বোধ হয় যাবে। যত যাবার সময় হচ্ছে তত যেন আমাকে আঁকড়ে ধরছে। আমি যতক্ষণ বসে থাকব ততক্ষণ বসে থাকবে, উঠলেই উঠবে। মধ্যে মধ্যে আমি উঠছি সেও উঠছে, আবার আসছি বসছি সেও বসছে। আজকাল প্রায়ই বমি করে ফেলছে, ঘরের মধ্যেই। করলে সেটা আমিই সাফ করব। বাইরের আয়নায় আমার চেহারা শ্রীহীন। মনঃসমীক্ষণের আয়নায় আমার এই বমি সাফ করার চেহারাটা কেমন লাগে অর্থাৎ হরিজনের মত লাগে কিনা ঠিক বলতে পারব না। পৃথিবীতে একটা কথা আছে, নিজেকে আয়নায় কেউ অসুন্দর দেখে না। আমি অবশ্য বাইরের আয়নায় নিজেকে শ্রীমন্ত দেখি না কিন্তু মনের আয়নায় আমাকে অসুন্দর দেখালেও ঠিক ধরতে পারছি না।

বলতে ভুলেছি। লেখার শুরু করি ভগবানের নাম লিখে। একখানি খাতা, একখানা ডায়েরীবই বইয়ে দিন দিন ইষ্টনাম লিখি। বছরে এক লক্ষ লেখার সংকল্প থাকে। এ বছরের আগে পর্যন্তও খুচরো কাগজে লিখতাম। খুচরো বলতে অবশ্য খোলা কাগজ বলছি। যেমন-তেমন কাগজে লিখতে আমার মন সরে না। যাই হোক, দামী হলেও খোলা কাগজ দিনের পর দিন জমানো সহজ নয়। এবার থেকে তাই খাতা করেছি। ইষ্টনাম লেখা শেষ করে লিখতে বসি। নিত্য লেখা অভ্যাস। এ লেখনকর্মকে আমি ধর্ম বলে মেনে নিয়েছি। যা হোক কিছু লিখি, সে দু-দশ পৃষ্ঠাই হোক আর দু-দশ ছত্রই হোক। এবং লেখবার শুরুতেই লেখার হরফ এবং লাইন যদি পরিষ্কার এবং সোজা না হয় তবে সে কাগজখানাই বাতিল করে দিই। কোন কোন দিন তিন-চারখানা কাগজ বাতিল হয়। কোনদিন বেশী। কমপক্ষে দুখানা। আবার পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা কি দশ পৃষ্ঠা লিখেও বাতিল করে দিই। একখানা বই লিখতে বোধ হয় আর একখানা বইয়ের মত লেখা বাতিল হয়ে যায়। শুধু এইই সব নয়—বন্ধুজনে বিস্ময় প্রকাশ করেন, আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি তার জন্যে। গোটা বই লিখে কাগজে ছাপা হবার পর বাতিল করে আবার নতুন করে লিখি। সংস্করণে সংস্করণে মার্জনা তো নিয়ম। বন্ধুরা বলেন বড় অসন্তুষ্ট লেখক আমি। একসময় ভেবেছি বাইরে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অসন্তোষটা মেজে-ঘষে সংশোধনের উপায় নেই বলেই, লেখাগুলিকে মেজে-ঘষে অপরূপ করে তোলার এক বিচিত্র অভিপ্রায় এটা। ফ্রয়েডীয় মতে তাই হয়তো বটে, মার্ক্সীয় মতে বুর্জোয়া লক্ষণও হয়তো হতে পারে। কিন্তু আমি বেশ ভাল করে জানি আমার জীবনে একটি আত্মশুদ্ধির নিরন্তর চেষ্টা আছে, মার্জনায় লেখাকে শুদ্ধ এবং নিখুঁত করাটাও সেই চেষ্টার পরোক্ষ প্রকাশ। বইয়ের শ্রীহীনতা সম্পর্কে খেদ নেই বলব না—কিছুটা আছে, কিন্তু সেটা খুব একটা গুরুতর কিছু নয়। বইলে যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভেও নিত্য বাকি কাবাই বি কেন? এখন কাবাই

সে এই বছর দুই হল। সেও যাম বলে একজন সেবক এসে ধরেবেঁধে আমাকে অভ্যেস করিয়েছে।

তবে তখনও এবং এখনও বাড়িতে আধময়লা কাপড়, আধময়লা জামা পরে থাকি। চোখের চশমাটা গোল বাধায়—নইলে অনেক অপরিচিত জন এসে আমাকে মাটিমাখা হাতে দেখে প্রশ্ন করে, বাবু বাড়ি আছেন? বলা ভাল, বাগানে আমার শখ আছে, সে সেই ছেলেবেলা থেকে, আট-দশ বছর থেকে গ্রামের বাড়িতে বাগান ছিল এখনও আছে, কলকাতাতেও আছে। লিখতে লিখতে ক্লান্তি এলেই উঠে গিয়ে মাটি খুঁড়ি। এ অভ্যাসের মধ্যেও টেনেবুনে রূপের অভাবের পরিপূরণের ইচ্ছে বা বুর্জোয়া মনের পরিচয় বের করা যায়; তা মেনেও নিতাম যদি অভ্যেসটা আট-দশ বছর বয়স থেকেই না থাকত। তখনও কম্‌প্লেক্সটা গজাবার সময়ই হয় নি। এবং আমার মা বলেন, ছেলেবেলায় আমি কালো ছিলাম না, এবং শ্রী নাকি যথেষ্ট ছিল। আমার ছেলেরা কথাটা মানে না—ওরা শুনে হাসে। তবে আমার মনে আছে যৌবনের ছবি—তাতে সত্যিই শ্রীর এই অভাব ছিল না। সে কালের যে সব ফোটোগ্রাফ আছে তাকে রাজপুত্রের ছবি বলে চালানো না যাক তার বন্ধুবান্ধবদের কেউ বললে আপত্তি হত না। এই শ্রীর অভাবটা ঘটল ১৯৩১ সনে—জেলখানায় রোগাক্রান্ত হয়ে। সে রোগ আজও ভাল হয় নি। শ্রীও ফেরে নি। এই আজই একজন মহিলা লেখিকা বললেন, আপনার ডিসেন্ট্রি আজও ভাল হয় নি? আমি বললাম, না, রোগটি আমার মধ্যে বেশ সম্ভ্রমভাবেই ভাল আছেন। থাক। ওতে আমি সুখী। ও রোগে আমার মৃত্যু হবে না। তবে ও রোগটা ভাল হলে আমি বাঁচব না।

যাক।; ফুলের গোড়া আজ খুঁড়ছিলাম। খেতে ডাকলে। মনটা অপ্রসন্ন হল, মুখে কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। খাবার প্রতি আমার ভালবাসা নেই। সে অসুখের জন্য নয়; ছেলেবেলা থেকেই। খেতে বসলেই মেজাজ খারাপ হয়।

খাই অভ্যাস কম। চা খেতে ভালবাসি। আর সিগারেট। চা আগে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কাপ খেয়েছি এখন আট-দশ কাপ; সিগারেট এখন তিরিশ থেকে কুড়িশে উঠেছে। বাগান খোঁড়া ছেড়ে উঠতে হল। হাত ধুয়ে খেতে বসলাম। একটু ছানা আর একটা কলা। আগে টোস্ট ডিম ভাল লাগত, এখন ওসব ভাল লাগে না। খেয়ে হাত ধুয়ে আবার লিখতে বসলাম। একটি কবিতা লিখছি। ছেলেবেলায় কবিতা লিখতাম। তারপর কবিতা একেবারেই ছেড়েছিলাম। তবে গান লিখি মধ্যে মধ্যে। বিশেষ করে পল্লীগীতি ভাল হয়। অনেকে ভ্রম করেন এগুলিকে প্রাচীনগীতি বলে। "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে"—এর তারিফ সবাই করেছেন। "মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে; কোন মহাজন পারে বলিতে?" এ গান বেরুনোর পর দু-একজন প্রশ্ন করেছিলেন, কোন্ প্রাচীন গীতিকারের রচনা এটি? কিন্তু কবিতা কালেকস্মিনে লিখলেও তাকে লেখা বলা যায় না। দেশের এই দুর্যোগে—সেই ছেলেবেলার দেশপ্রেমে জোয়ার ধরে বইতে চাচ্ছে। কবিতার ছন্দের দুই কিনারা না পেলে ঠিক আবেগের বেগ প্রকাশ পাবার সুযোগ পাচ্ছে না বলে কবিতা লিখছি। হাতে একটা সিগারেট ধরা আছে—পুড়ছে পাশ থেকে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে। একটা গোটা সিগারেট ধরিয়ে রেখেছিলাম আসনের পাশে, সেটা পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে, বেঁকে যাওয়া একটা ছাইয়ের সিগারেটে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সিগারেটের শেষের ধোঁয়াটা পীড়াদায়ক। নিবুতে হল। নিবুতে গিয়ে নজরে পড়ল অন্ততঃ দশটা পোড়া সিগারেট-প্রান্ত আর ছাইয়ে নোংরা হয়ে গেছে জায়গাটা। তা যাক। ও আমার অঙ্গভূষণ না হোক অঙ্গের সয়ে-যাওয়া গ্লানির মত। তাকিয়ে থেকে আবার চোখ ফিরিয়ে লিখতে লাগলাম। এর মধ্যে ডাক এল। দেখে ঠেলে রাখলাম। চিঠি অনেক আসে। লোকে ভালবেসেই লেখে। অনেক ভাল কথা—মন্দ কথাও লেখে। ভালবাসার জন্যও মন্দ কথা লেখে। সেটা বেশী হয় গল্প-উপন্যাসের চিত্ররূপের জন্য। ফিল্ম-ডিরেক্টররা বিয়োগান্তকে মিলনান্ত করে দেয়। বইয়ের মুগ্ধ পাঠক ছবি দেখে এসে কঠিন কথা লেখে। সবই ফেলে দিই। মন্দ বলেই যে ফেলি তা নয়। আমার জীবনে কোথায় একটা ইস্ক্রুপ ঢিলে আছে। সেটাকে আমি বলি বৈরাগ্য। নইলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিককালের তরুণতম লেখকের

পত্রের অধিকাংশই হারিয়ে যেত না। শুধু চিঠি নয়, ঘড়ি, বোতাম, টাকা, ব্যাগ কতবার যে হারিয়েছে তার সঠিক হিসাব নেই।

পাশে টালা ওয়াটার ওয়ার্কসে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে। কবিতাটা শেষ হল। কাউকে শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছে। না শোনালে তৃপ্তি পাই নে। স্ত্রী দেশে রয়েছেন। ছেলেকে ডেকে শোনাই। এ সময়ে বাইরে কে এসেছে। দেখা করতে হবে। আগে মনে মনে বিরক্ত হতাম। এখন আর হই নে। হতে পারি নে। দেখা করে ফিরে এলাম। দাড়ি কামাবার জায়গা ঠিক করে দিয়েছে এর মধ্যে। কামাবার সরঞ্জাম আমার ভাল। ওতে শখ আছে। কামিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে একবার পায়চারি করব। কিন্তু চটিটা কোথায় গেল? মনে পড়ল বাগানে ফেলে এসেছি। নিয়ে এসে স্নান সেরে উপরে পুজোর ঘরে গেলাম। পুজোতে এক ঘণ্টা লাগে। লাগলও তাই। পুজো সেরে, রেশমী কাপড় ছেড়ে সুতী কাপড় পরে খেতে বসলাম। দিনে খাওয়া হবিষ্যান্ন। আতপের মুঠি-দুই ভাত, মুগ-কলাই সেদ্ধ, খানিকটা ঘি, দু-চারটে ভাজা এই। এর পর একটু ঘুম। ঘণ্টাখানেক। তারপর বিকেলে ইউনিভারসিটিতে দারভাঙ্গা হলে একটা মীটিং আছে। চীনা আক্রমণ নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মীটিং। মীটিংয়ে একসময় খুব শখ ছিল। সভাপতিত্বে লোভ ছিল। বক্তৃতা করবার একটা আগ্রহ ছিল। আজকাল ভাল লাগে না।

আমার থেকে অন্যে ভাল বলবে এই আশঙ্কায় ভাল লাগে না কিনা মনকে যাচাই করেছি। কিন্তু তা নয়। এখনও ভাল বলতে পারি আমি, বাদপ্রতিবাদে তো খুব ভাল বলি, তবুও ভাল লাগে না। একসময় সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত পালন করতাম, গান্ধীজীর দৃষ্টান্তে। বাকসংযমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হত বা হয়েছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাতে বক্তৃতা করবার আগ্রহ কমে নি; আগ্রহ এবং শক্তি দুই বেড়েছিল। এখন শক্তি কমে নি; হয়তো আজও বাড়ছে কিন্তু আগ্রহ কমছে।

টেলিফোন বাজছে, ওরাই ফোন করছে।

টেলিফোনটা আমার লেখার জায়গার পাশেই থাকে, ওইটে যত আবশ্যকীয় যন্ত্র তত পীড়াদায়ক। লিখছি, টেলিফোন এল।

হ্যালো!

আমি একটু তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে কথা বলব।

বলুন, আমি বলছি।

জানেন, আপনার লেখা এত ভাল লাগে—

বলা বাহুল্য, ওপারে যিনি তিনি আমার নাতনী শকুন্তলার বয়সী একটি মেয়ে। নয়তো হ্যালো। কাকে চাই? ওটা কি তারাশঙ্করবাবুর বাড়ি? হ্যাঁ। তিনি কি আছেন?

না বলতে পারি নে। কারণ ব্রতপালনের মতই আমি সত্য কথা বলি। কেবল একটি মিথ্যা কথাই বহুজনকে বলি। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, অর্ধ মিথ্যা—আমার শরীর খারাপ, মীটিংয়ের কথাতে বলি। অর্ধ মিথ্যা এই কারণে বলছি যে শরীরে রোগ আমার আছেই; তাকে অনুভব চব্বিশ ঘণ্টাই করি, কাছে সারিডন থাকে। দিনে একটা দুটো খেতেই হয়। টেলিফোনের যন্ত্রণার কথা শেষ করি। একটা দিক বলেছি। আর একটা দিক—কোনদিন কোন কারণে টেলিফোন না এলেও যন্ত্রণার সামিল একটা আশ্চর্য অস্বস্তি অনুভব করি।

যাক, মীটিংয়ে যাচ্ছি, এ সময়টা নাতিনাতনীদের নিয়ে বসে বেশী আনন্দ পাই, চোদ্দটি নাতিনাতনী আমার। কিন্তু কি করব? যেতে হল। মীটিং কেমন খারাপ লাগে, সবাই মুখোশ পরে বসে থাকে। যত হোমরাচোমরা তত মুখোশগুলো ভারি, আমারও হয়তো আছে। কিন্তু যাচাই করে বলছি আজ অন্ততঃ ছিল না। আজকাল থাকে না আমার। মুখোশ তো মুখোশ—এই তো সামনে বাঁধানো দাঁতের পাটি দুটো পড়ে আছে, ও দুটোই পরি নে আমি, কেবল কথা ফসকে যাবে বলে মীটিংে যাবার আগে পরতে হয়, তাও অনবরত দাঁতে দাঁতে ঘষে, এবং বাড়ি ফিরেই খুলে ফেলি, খাবার সময়েও পরি নে তো মুখোশ। না, মুখোশ থাকে না আমার। আজকাল মধ্যে মধ্যে ছোট নাতনী লালী এবং নাতি গোরাকে দেখিয়ে দাঁত পরি আর খুলি; বলি, কই, তোরা তোদের দাঁত খোল্ তো দেখি।

মুখোশ নেই, তবে স্বীকার করব, পোশাক আছে

স্বর্গীয় অধ্যাপক কালীকিঙ্কর সরকার

বনফুল

অধ্যাপক কালীকিঙ্কর সরকার মুঙ্গের কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে মারা গেছেন তিনি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর মেধা, তাঁর সাহিত্য-বৈদগ্ধ্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। সেক্সপীয়র, মিলটন, শেলী, কীটস্‌, বায়রন এবং আরও অনেক বিদেশী কবির কবিতা কণ্ঠস্থ ছিল তাঁর। মঙ্গলকাব্য থেকে পাতার পর পাতা মুখস্থ বলতে পারতেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে তিনি অবলীলাক্রমে মূর্ত করতে পারতেন যে কোনও মুহূর্তে আবৃত্তি করে। শুধু কবিতা নয়, পাতার পর পাতা গদ্যও কণ্ঠস্থ ছিল তাঁর। আধুনিক অনেক লেখকের লেখাও আবৃত্তি করতে শুনেছি তাঁকে, শুধু কবিতা নয়, গদ্যও। এ রকম স্মৃতিশক্তি আজকাল দুর্লভ। তাঁর ছাত্রদের মুখে শুনেছি অধ্যাপক হিসাবেও অতুলনীয় ছিলেন তিনি। অকৃতদার সৌম্যদর্শন এই ভদ্রলোক সারাজীবন ছাত্রদের নিয়েই কাটিয়ে গেছেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়েই দিনরাত মেতে থাকতেন। পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে হঠাৎ মৃত্যু হয় তাঁর। বহু ছাত্রকে কোনও পয়সা না নিয়ে বাড়িতে পড়াতেন, বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁর কাছে অর্থ-সাহায্য পেত। এই রসিক, বিদগ্ধ, ছাত্র-বন্ধু অধ্যাপক গুণীর সমাদর করতেন, কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কর্তৃপক্ষের খোশামোদ করতে পারেন নি কখনও। তাই সম্ভবত চাকরিতে তাঁর তেমন উন্নতি হয় নি।

আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ আমার 'মৃগয়া' বইটি লেখবার প্রেরণা আমি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তাঁর স্মৃতিকে স্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে মুঙ্গেরে কালীকিঙ্কর স্মৃতি-পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। সেই পাঠাগারের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬২ তারিখে আমি এই কবিতাটিতে তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধন্য হয়েছি।

মীটিংয়ে, স্যুট-টুট নয়, জামাকাপড় পরিচ্ছন্ন পরিপাটি পরি আমি বাইরে যাবার সময়, স্বীকার করে ভাবছি তবে কি ওখানেই ওই ফ্রয়েডীয় এবং মার্কসীয় ব্যাখ্যা সত্য!

না, বাইরে এবং ঘরে এখনও এক হতে পারি নি এ সত্য—তাতে কমপ্লেক্স বা বুর্জোয়াত্ব সত্য নয়। বাইরেকে এখনও সম্মান করতে হবে বইকি! এখনও যে গৃহী আমি—ঘরের পালা শেষ করে বাইরে বের যেদিন হতে পারব, সেদিন পোশাক হবে কৌপীন কি কন্থা, সেদিনের জন্যই তৈরি হচ্ছি আমি। পারব কিনা জানি না তবে যে অহং বা ব্যক্তিত্বকে তৈরি করলাম, তাকে মাটির প্রতিমার মত বিসর্জন দিতে পারব যেদিন সেদিনই হবে আমার মানবজীবনের সিদ্ধি।

মনঃসমীক্ষার দর্পণে যা দেখছি তার একটা ছবি যেন আমার সামনে রয়েছে। আমারই হাতের, গাছের শিকড় কেটে তৈরি একটা মূর্তি, একজন শ্রমিক একটা বোঝা ঘাড়ে করে উপরে চড়াই ভাঙছে। যেন ওটা আমিই চলেছি—জীবনের বোঝা নিয়ে ওই শিখরে গিয়ে নামিয়ে সকল কাজের পালা শেষ করতে।

রাত্রি অনেক হয়েছে—নিশীথ পূজার সময় হল।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর একান্ত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর স্বামী। তাঁর বিশেষ স্নেহভাজনের ওপর এই মাত্রাতিরেকী আক্রমণে তিনি শনিবারের চিঠির ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। শনিবারের চিঠির 'কম্‌প্লিমেণ্টারি কপি' তাঁকে পাঠানো হত। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। স্বহস্তে 'রিফিউজড' লিখে চিঠি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। শনিবারের চিঠির প্রমথনীতি সম্পর্কে নিজের নৈতিক অসমর্থন এর চেয়ে সংযতভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতে পারতেন না। সজনীকান্ত মনে মনে প্রমাদ গণলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু বাইরে ভ্রূক্ষেপহীনতার ছদ্ম-গাম্ভীর্য দেখিয়ে প্রমথ চৌধুরীর ওপর আরও নির্মম হয়ে উঠলেন।

ছয়

১৩৩৫ সালের শ্রাবণ মাসের বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ একান্ত-সচিব অমিয় চক্রবর্তী শনিবারের চিঠির ওপর তীব্র আঘাত হানলেন 'সাহিত্যব্যবসায়' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটিতে 'দেশমান্য সাহিত্যস্রষ্টা' প্রমথ চৌধুরীর ওপর চিঠির "ইতর" আক্রমণের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হল। চিঠির পক্ষের অনেকে মনে করলেন প্রবন্ধটি দক্ষতর হস্তের বেনামী লেখা। ফলে চিঠির দলের তপ্ত মগজ তপ্ততর হয়ে উঠল। 'সাহিত্যব্যবসায়' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের লেখা—এই জনরব রবীন্দ্রনাথের নিকটেও পৌঁছল। কবি জানালেন, এই জনরব মিথ্যা। মোহিতলাল "অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী বনাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রবন্ধে লিখলেন, "স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জানিয়েছেন যে, জনরব মিথ্যা, ও-লেখা তাঁর নয়, এবং ও-লেখার সঙ্গে তাঁর সহানুভূতিও নেই। জানি, জনরবটা বাইয়ের, আর রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ব্যক্তিগত, অর্থাৎ ভেতরের। এতে করে জনরবকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।" তবু চিঠির দল নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে, লেখাটি রবীন্দ্রনাথের নয়, তাঁর "খাস কলমচী" অমিয় চক্রবর্তীরই। চক্রবর্তী মহাশয় যে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার মত তাঁর ভাষাও নকল করতে পারতেন এ কথা বিশ্বাস করে চিঠির দল কবিগুরুকে আপাততঃ নিষ্কৃতি দিলেন।

শুধু নিষ্কৃতিই নয়, সে সময়কার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনায় শনিবারের চিঠি অপ্রত্যাশিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের মতকেই সমর্থন জানাল। ঘটনাটি ঘটেছিল সিটি কলেজের ছাত্রাবাস রামমোহন হস্টেলে সরস্বতী পুজোকে উপলক্ষ করে। ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ চেয়েছিলেন ছাত্রাবাসেই তাঁরা প্রতিমা বসিয়ে পুজো করবেন। কর্তৃপক্ষ তাতে আপত্তি জানালেন। এই নিয়ে হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম শুরু হল। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা ছাত্রদের দাবি সমর্থন করলেন। সত্যাগ্রহ শুরু হল। সিটি কলেজে ছাত্র ভরতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলল। সিটি-কলেজ উঠে যাবে উঠে যাবে এমনও অবস্থা হল।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্দিনে, ব্রাহ্ম বলে নয়, উদার অসাম্প্রদায়িক মানবতার পূজারী বলেই, রবীন্দ্রনাথ কলেজ-কর্তৃপক্ষের সমর্থনে তাঁর লেখনী ধারণ করলেন। 'মডার্ন রিভিয়ু'তে একখানি চিঠি এবং 'প্রবাসী'তে "সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখলেন [প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫]। সেদিনকার রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্যে স্থানকালনিরপেক্ষ একটা ধর্মাদর্শের বাণী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সাকার ও নিরাকার পূজার প্রসঙ্গে হিন্দু-ব্রাহ্ম-কোন্দলে শনিবারের চিঠির সমর্থন কোন্‌দিকে যাবে তা অনুমান করা অসম্ভব ছিল না। সাপ্তাহিক চিঠির প্রতিষ্ঠাতৃত্রয় তিনজনেই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। কিন্তু এই ব্যাপারে উৎসাহ দেখালেন সবচেয়ে বেশী সজনীকান্ত। তাঁর কালাপাহাড়ী স্যাটায়ার "হিন্দু রিলিজিয়ন ইন্‌সালটেড" 'মধু ও হুল' গ্রন্থে তারই সাক্ষীরূপে বিরাজমান। সজনীকান্ত তখন 'প্রবাসী'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তা ছাড়া তাঁর অন্তরঙ্গজনের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তারই প্রভাব তাঁর অন্তরে অত্যুৎসাহী উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল কিনা বলা শক্ত। অথবা মানুষের মনের গতি

স্বভাবকুটিল না হলেও রহস্যময়। রবীন্দ্রনাথের মতের সমর্থনের দ্বারা তাঁর বিরূপ-চিত্তকে অনুকূলে আনয়ন করার গোপন বাসনা ওর মধ্যে নিহিত ছিল কিনা তাও বলা শক্ত।

১৩৩৫ সালের ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিদেশ-ভ্রমণে বেরলেন। ক্যানাডা, জাপান পরিভ্রমণ করে দেশে ফিরলেন চার মাস আট দিন পরে ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে [ভ্রমণকাল ২৬শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ই জুলাই ১৯২৯]। প্রবাস-গমনের জন্যে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে বিচ্ছেদ রচিত হল তার ফলে সজনীকান্ত আত্মপরীক্ষার সুযোগ পেলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই আষাঢ়ের শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হল তাঁর "শ্রীচরণেষু" কবিতাটি। গুরুর উদ্দেশে লেখা শিষ্যের এই পত্রকবিতাটি সজনীকান্তের মনের নিগূঢ় দিকটিকে নির্ধারিত করেছে। তাই কবিতাটি সমগ্রভাবেই এখানে উদ্ধারযোগ্য। সজনীকান্ত লিখছেন:

'অপরাধ করিতেছি,' কহিতেছে জনে জনে,
'হ'ব গুরুহত্যা-পাপভাগী'—
হে গুরু, আমরা জানি, তুমি জানো মনে মনে,
কেবা কত গুরু-অনুরাগী!
তুমি জানো, কেন এই গুরুনিন্দা নিষ্ঠুর বিলাস,
তোমার যা স্বপ্ন তারে কেন হেন ক্রূর উপহাস,
তোমারে তোমার অস্ত্র হানিবার কেন অভিলাষ,
হে দেবতা, হে ভূমা-বৈরাগী.
তুমি শুধু বুঝিয়াছ, এ নহে নিতান্ত আত্মনাশ,
মিথ্যা নিন্দা, নহি পাপভাগী।

অর্ধেক শতাব্দীব্যাপী করালে অমৃত পান,
সে অমৃতে বাধানি' গরল,
সত্য বটে! নহে গুরু, সে তোমার অপমান,
মোরা ক্লীব, মোরা হীনবল,
দেবভোগ্য সে অমৃতে পারি না করিতে আত্মসাৎ;
স্বর্গের অমৃতধারা বিষ হ'য়ে ওঠে অকস্মাৎ।
ধরার অক্ষম জীব, ধরায় করি না পদপাত
শূন্যে ছুঁড়ি চরণ চঞ্চল!
জানিতে পার না তুমি, ধ্যানাসনে বসি দিনরাত,
সুধা কবে হয়েছে গরল।

আপনার কল্পনায় আপনি বিভোর রহি—
মহাবিশ্বে করিছ ভ্রমণ—
পিছু ফিরে দেখ নাই, সঙ্গী তব কেহ নহি,
তুমি একা, পথ সুবিজন!
অনন্ত যাত্রার মন্ত্র মহোল্লাসে আপনি উচ্চারি'
ভাবিছ তোমার পিছে মোরাও দিতেছি বুঝি পাড়ি'—
যদি কভু মোহ টুটে দেখিবে দু'নয়ন বিস্ফারি'
নিজেরই ছায়ার সঞ্চরণ,
দূরে কাছে কেহ নাই, দীর্ঘ পথ দিগন্ত-প্রসারী—
তুমি একা করিছ ভ্রমণ।

আপনি দেখিছ স্বপ্ন, ভাবে স্বপ্নাচ্ছন্ন মন,
স্বপ্নে স্বপ্নে চলিছে ধরণী!
জ্ঞানে কর্মে ব্যর্থ মোরা, রিক্ত মোরা, অকিঞ্চন,
ঘাটে বাঁধা মোদের তরণী।
তুমি ভাব সে তরণী পাড়ি দেয় বিশ্ব পারাবার—
শোন নাই কোলাহল, শোন না ক্রন্দন হাহাকার,
কুটীর-প্রাঙ্গণে মোরা দ্বন্দ্ব করি আজো ক্ষুদ্রতার;
বহুদূরে স্বপন-সরণি?
তুমি একা যাত্রী সেথা, শিরে স্বপ্ন-কল্পনার ভার—
ধূলিপঙ্কে মলিন ধরণী।

বহু দুঃখে কহি, তুমি আমাদের নহ কভু,
সে নহে তোমার অপরাধ!
সঙ্গে নিতে চাহিও না আমরা অক্ষম, প্রভু,
দূর হ'তে কর আশীর্বাদ।
তুমি যে তুমিই আছ, সে তুমি সুবিরাট মহান্—
আমরা মাটির জীব, ধূলিপঙ্কে নিয়ত শয়ান—

বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, কাছে গেলে করি অপমান,
না জানিয়া কত সাধি বাদ!
মত্ত স্বপ্ন-রসাবেশে তুমি চাহ করিবারে ত্রাণ,
সে নহে তোমার অপরাধ।

তোমারে পাড়িয়া গালি, নিজে হই সাবধানী,
তুমি ডাক, 'এসো দ্বন্দ্ব ভুলে।'
নাহি জান কত দূরে পারি যেতে, ক্ষুদ্র প্রাণী!
কাঁদি ব'সে সাগরের কূলে।
তোমার নিন্দার ছলে স্বর্গের অমৃতে নিন্দা করি—
মৃত্তিকার স্থূল-রসে পূজা করি দিবস-শর্বরী
ভয় হয়, দীপ্তি হানে তোমার প্রতিভা ভয়ঙ্করী—
প্রহরী আপনি পড়ে ঢুলে,
কাছে আসিও না গুরু, কর দয়া, দূরে যাও সরি—
ডাকিও না 'এসো দ্বন্দ্ব ভুলে।'

তুমি নামিও না নীচে, ক'রো না মাটির স্তুতি,
সে তোমার মহা মিথ্যাচার!
আসিয়াছ এ ধরায় ললাটে স্বর্গের দ্যুতি
তুমি কেহ নহ মৃত্তিকার!
উর্ধ্ব হ'তে উর্ধ্বলোকে আপনার সঙ্গীতে বিহ্বল—
একেলা ছুটিয়া চল, ধূলি-পঙ্ক-ম্লান ধরাতল!
ঝরিয়া পড়ুক নিত্য সুধা তব সঙ্গীত তরল—
দীপ্ত হোক মৃত্তিকা-আধার—
কবি নহে মন্ত্রদাতা, ওষধি নহেক শতদল—
দূর কর এই মিথ্যাচার।

সাত

সজনীকান্ত লিখছেন, তাঁর এই 'প্রণতি-বান' গুরুর চরণ পর্যন্ত পৌঁছল না। তাঁর 'পুনর্মিলন-ব্যাকুলতা' ব্যর্থ হল। শুধু ব্যর্থই যে হল এমন নয়, এবার গুরুর নিকট থেকেই এল চরম আঘাত। সজনীকান্ত তখন 'প্রবাসী'র মুদ্রাকর। 'শনিবারের চিঠি'ও 'প্রবাসী' প্রেস থেকেই ছাপা হত। হঠাৎ 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় সজনীকান্তকে জরুরী তলব দিয়ে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। সেদিন ২২শে আষাঢ়, ইংরেজী ৬ই জুলাই ১৯৩৬। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন কথা না বলে একখানি পত্র সজনীকান্তের হাতে তুলে দিলেন। পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের লেখা। 'প্রবাসী'-সম্পাদককে তিনি জানিয়েছেন, 'প্রবাসী' প্রেসে 'শনিবারের চিঠি' ছাপা হলে তিনি আর কোনপ্রকারে 'প্রবাসী'র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

সজনীকান্তের মাথায় বজ্র ভেঙে পড়ল। শনিবারের চিঠি বাস্তুহারা হল। সে আঘাতও না হয় সহ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর পুনর্মিলনের ব্যাকুলতা, তাঁর প্রণতি-বান? এই কি তার প্রতিদান? তরুণ শিষ্য অভিমানে কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জিত হলেন। প্রচণ্ড অভিমান এবং প্রচণ্ডতর নৈরাশ্যে তিনি লিখলেন 'হেঁয়ালি' কবিতা। 'শ্রীচরণেষু' বেরিয়েছিল আষাঢ়ে, 'হেঁয়ালি' বেরল শ্রাবণে। সজনীকান্ত লিখছেন—

ঘুমে মগন সোনার পুরী কে রয় জাগি দুয়ারে,
মুক্তা পথে গড়িয়ে যায় শুঁকিয়া যায় শুয়ারে!
বন্ধু, তোমার মিথ্যা আশা,
কাগে মাথায় বাঁধল বাসা,
কোকিল তবু ডিম পাড়ে না;
ইংরাজে আর বুয়ারে
লাগল কোথায় লাঠালাঠি, জাগ্‌ল হুক্কা হুয়ারে!

তোষাখানার রক্ষী হ'ল পোষা কুকুর শেয়ালে,
ঘুণ ধরিল পাকা বাঁশে, ফাট্‌ল পাষাণ দেয়াল-এ।
কাব্য হঠাৎ গেল উবে,
পছিম কাঁধে চাপ্‌ল পুবে,
পুবের ঋষি 'হলিউডে'
মাতেন মনের খেয়ালে,
নয়া-বাহন নাড়ুগোপাল ভূমানন্দে নেহালে।

বিশ্বপ্রেমিক গোরাচাঁদের নিত্যানন্দ মঞ্জরী,
নোংরা শিখ কি ক্যানেডিয়ান তাহার হ'ল জহুরী!
লক্ষ্মীরে যে পেঁচী বানায়,

হাঁকিয়ে মোটর, যায় না থানায়—
নোংরা সে কয়? মিস্ মেয়ো হায়,
চাপ্‌ল কাঁধে বহুরই?
চুনো-গলির ফিরিঙ্গিনী বেহেস্ত-খসা raw-হুরী!

সাইগনে হায়, বাপের বাড়ীর 'বাইগনে' কে ভুলিয়া,
নকল বাপের স্কন্ধে চেপে নাক আসিল তুলিয়া!
হিন্দুয়ানীর গন্ধে কেঁপে,
কষ্টে বমি রাখল চেপে,
Star-এর-আঁখি ঠারের লোভে
'মুখোস' গেল খুলিয়া!
ঠাকুর-ঘরের ধূপের ঘ্রাণে নাক ঢাকিল ফুলিয়া।

তিন ঠ্যাঙেতে বেরালছানা দাঁড়িয়ে আছে শিয়রে,
কুকুরছানা চরণ চাটে তক্তপোষের নিয়ড়ে।
মেনি বাঁদর চাপল কাঁধে,
ভেঙায় শ্রী-মুখ নিখুঁত ছাঁদে,
ঘুরঘুরে আর আরসোলারা
বাবরী চুলে বিহরে,
মহাকালের ডাক শুনিয়া শিব যে ভয়ে শিহরে!

* * *

স্বপ্নভাঙা নির্ঝর তোমার এই কি ছিল ললাটে,
মনের লেখা পড়লে নাক দেখলে শুধু মলাটে!
দেখলে তবক চক্‌মকানি,
পোষা টিয়ার বক্‌বকানি
শুনলে শুধু, সন্ধ্যা-ছায়ায়
চক্ষু তোমার ঘোলাটে!
খাইনি ব'লে তুমিও খাও ঠাকুর ঘরের কলাটে!

ছন্দ-পতন হয় কি না হয় বন্ধ করে লেখনী,
স্তাল-কুকুরের ডাক ভুলিয়া, হিসাব ক'রে দেখনি!
কান কি তোমার সে কান আছে?
বেসুর স্তুতি কানের কাছে
অহরহ শুন্‌ছ প্রভু,
সাচ্চা ঝুটা শেখনি!
সন্দেহ হয়, মন্দ আরো তোমার ললাট-লেখনই!

পরের মুখে ঝাল খেয়েছ, পরের কথা শুনিয়া,
স্তাবক-তুষ্ট হে মহারাজ, হঠাৎ হ'লে খুনিয়া!
লেলিয়ে পুলিস পালিয়ে গেলে,
কেউটে কভু হয় না হেলে!
ভাবের বিশ্ব উঠ্‌ল ভ'রে,
নিঃস্ব মাটির দুনিয়া,
ধনুক-ছিলা ছিঁড়ল হঠাৎ স্বপন-তুলা ধুনিয়া!

স্বদেশ তোমায় চিনলে নাক এইটে হ'ল হেঁয়ালি,
ভাবছ বুঝি, বিদেশ করে তোমার যশের দেয়ালী!
সে ভুলও শিব, ভাঙবে তোমার,
সেক্সপীয়ার ও গ্যেটে হোমার,
রবেই বেঁচে, বল্‌বে তখন
এরাও কুকুর-শেয়ালই!
স্বদেশ স্মরি কাঁদবে তখন থাক্‌বে না আর খেয়ালী!

* * *

শ্মশান-শিবে ধবুল ছেঁকে পোষা শেয়াল কুকুরে,
শিব দেখিছে আপন ছায়া তাদের চোখের মুকুরে!
তারাই শুধু বুঝ্‌ল হা রে,
তাঁর প্রতিভা তপস্যারে,
কুকুর নিয়েই মত্ত মহেশ
প্রভাত-সন্ধ্যা-দুকুরে,
সাগর-সেঁচা সূর্য—সে কি অস্ত যাবে পুকুরে?

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন, "এমন বর্বর কবিতা আমিও খুব বেশী লিখি নাই।" বলাই বাহুল্য, এই "বর্বরতা" রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর কবিচিত্তে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। অধ্যাপক সুনীতিকুমার ছিলেন কবির বিশেষ স্নেহের পাত্র। কবিগুরুর প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল অপরিসীম। শনিবারের চিঠিকেও তিনি কম ভালবাসতেন না। তিনি চিঠির হয়ে ওকালতি

করার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন কবিগুরুর কাছে। কিন্তু তাতে কোনও ফলোদয় হল না। বরং কবি তাঁর ওপরেও অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। সে-সময় সুনীতিকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠির প্রতি তাঁর বিরূপতা কোথায় পৌঁছেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। সুনীতিকুমারকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মনে করেছিলুম তোমার খাতা থেকে আমার ছবিটাকে নির্বাসিত করব। তুমি রক্ষা করতে অনুরোধ করচ, রইল ওটা।

সেদিন তোমার সঙ্গে যে কথার আলোচনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা এইখানে বলে রাখি। তুমি বলেছিলে শনিবারের চিঠিতে যাঁরা আমার অবমাননা করেচেন তাঁরা আমার ভক্ত, কেবল বিশেষ কোনো ব্যক্তিগত কারণেই তাঁরা আমাকে আক্রমণ করে ক্ষোভ নিবৃত্তি করেচেন। কিছুকাল থেকেই এটা দেখেছি ব্যক্তিগত কারণ ঘটবার বহুকাল পূর্ব হতেই তাঁরা আমার নিন্দায় আনন্দ ভোগ করে এসেচেন। এটা দেখেছি যাঁরা কোনো দিন আমার লেখার কোনো গুণ ব্যাখ্যা করবার জন্যে একছত্রও লেখেন নি তাঁরাই নিন্দা করবার বেলাতেই অজস্র ভাবে বহু পল্লবিত করে লিখেচেন। সকল লেখকের রচনাতেই ভালোমন্দ দুইই থাকে কিন্তু ভালোটার সম্বন্ধে নীরব থেকে মন্দটাকেই দীর্ঘস্বরে ঘোষণা করার উৎসাহ শ্রদ্ধার লক্ষণ নয়। মোটের উপর যাকে আমরা নিন্দার্হই বলে জানি তার সম্বন্ধেই এরকম আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু তবু এরকম ব্যবহারকে নিন্দা করা যায় না। কেন না সকলেই আমার রচনা বা চরিত্রকে প্রশংসনীয় বলে মনে করবে এরকম প্রত্যাশা করাও লজ্জার কথা। বাংলা দেশে আমার সম্বন্ধে এমন প্রত্যাশা করার হেতুই ঘটে নি। এঁরাই কথায় কথায় খোঁটা দিয়ে থাকেন যে স্তাবকবৃন্দ আমাকে বেষ্টন করে সর্বদা যে স্তব-কোলাহল করে থাকেন তার দ্বারাই নিজের ত্রুটিবিচারে আমি অক্ষম। এঁরা নিজে আমাকে পরিবেষ্টন করে থাকেন না, যাঁরা থাকেন তাঁরা কী করেন সে সম্বন্ধে এঁদের অনভিজ্ঞ কল্পনা আমার প্রতি প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় দেয়। কিছুকাল ধরে তুমি নিরন্তর আমার কাছে ছিলে, নিজের স্তব শোনবার আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাস তোমার দ্বারা পরিতৃপ্ত করবার কোনো চেষ্টা করেচি কিনা তার সাক্ষ্য তুমিই দিতে পারো। আমার যতদূর মনে পড়ে যেখানে তোমার কোনো গুণ দেখেচি সেখানে তোমার গোচরে ও অগোচরে তোমার স্তব আমিই করেচি। আমার বক্তব্য এই যে অসঙ্কোচে যাঁরা আমার নিন্দা করতে আনন্দ পান তাঁদের সংখ্যা অনেক এবং আমি তাঁদের দোষ দেব না, কিন্তু তাঁরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান একথা বলা চলবে না।

সময় এসেচে যখন এসব ব্যাপারকে শান্তভাবে আমাকে গ্রহণ করতে হবে। দেশের লোকের কাছ থেকে আমি যা পাই তা আমার প্রাপ্য নয় এবং যা না পাই তাই আমার প্রাপ্য এই বলে হিসেবনিকেশের নালিশ তুলে কিছু লাভও হয় না। মানরক্ষাও হয় না। কিন্তু অনাত্মভাবে সত্যটাকে জেনে রাখা দরকার। চিত্তরঞ্জন কিংবা মহাত্মাজিকে দেশের লোকে কদাচিৎ প্রতিবাদ করেচে, এমন কি নিন্দাও করেচে কিন্তু অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েও গর্হিত ভাষায় কুৎসিত ভাবে তাঁদের প্রতি অসম্মান করেন নি, করতে পারলে আনন্দ পেতেন না তাও নয় কিন্তু সাহস করেন নি—কারণ তাঁরা জানেন দেশের লোক তা সহ্য করবে না। আমার সম্বন্ধে সে রকম সঙ্কোচের লেশমাত্র কারণ নেই—অনেকেই আমার নিন্দায় প্রীত হন এবং বাকি অধিকাংশই সম্পূর্ণ উদাসীন। আমার প্রকাশ্য অপমানে দেশের লোকের চিত্তে বেদনা লাগে না, সুতরাং আমার প্রতি যাঁরা কুৎসা প্রয়োগ করেন তাঁদের ক্ষতি বিপদ বা তিরস্কারের আশঙ্কা নেই।

এক হিসাবে তাঁরা সমস্ত দেশের প্রতিনিধি-স্বরূপেই এ কাজ করে থাকেন। সুতরাং তাঁরা উপলক্ষ্য মাত্র। যাঁরা আমার অন্ধ স্তাবক বলে কল্পিত, যাঁরা আমার সুহৃদ বলে গণ্য তাঁরা আমার এই অবমাননার কোনো প্রকাশ্য প্রতিকার করে থাকেন তারও কোনো প্রমাণ নেই। বুঝতে পারি প্রকাশ্যে অপমান করতে অপর পক্ষের যত সাহস ও নৈপুণ্য এ পক্ষের তা নেই, তার প্রধান কারণ তাঁরা মনে মনে জানেন দেশের লোকের সহযোগিতার বল তাঁদের দিকে নয়। দেশের লোকের কাছে যে কোনো কারণে যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন তাঁদের ভাগ্যে এ রকম গ্লানি কোনো দেশে কখনোই ঘটে না—রাস্তার চৌমাথার মধ্যে এমন নির্যাতন নিঃসহায়ভাবে তাঁদের কখনোই ভোগ করতে হয় না। তাই বলচি এই ব্যাপারের মূল সত্যটাকে আমার জেনে নেওয়া এবং মেনে নেওয়া দরকার—আর তার পরে চিত্তকে অবিচলিত রাখা আরো দরকার। সত্তরের কাছে এসে পৌচেছি—আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেচে, এখন মনের সমস্ত শক্তি নিয়ে এই কামনা করচি যে এই হতভাগ্য আমি নামক বাহিরের পদার্থটার সমস্ত বোঝা এবং লাঞ্ছনা থেকে ভিতরের আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেন ইহলোক থেকে বিদায় নিতে পারে।

এই উপলক্ষ্যে সংক্ষেপে আর একটা কথা বলে রাখি। প্রকাশ করাই আমার স্বধর্ম—প্রকাশের প্রেরণাকে অবরুদ্ধ করা আমার পক্ষে ধর্মবিরুদ্ধ। আমার প্রকৃতিতে এই প্রকাশের নানা ধারার উৎস আছে—তাদের যেটাকেই আমি অগ্রাহ্য করব সেটাতেই আমার খর্বতা ঘটবে। প্রকাশ আর ভোগ এক জিনিস নয়—প্রকাশের অভিমুখিতা বাইরের দিকে, বস্তুত সেটাতেই অন্তঃপ্রকৃতির মুক্তি, ভোগের অভিমুখিতা ভিতরের দিকে, সেইটেতে তার অবরোধ। আমার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে তোমার মনে আপত্তি উঠেচে। কিন্তু নাটক রচনার মধ্যে যে প্রকাশ-চেষ্টা, অভিনয়ের মধ্যেও তাই। রচনার মধ্যেই যদি কলুষ থাকে সেটা নিন্দনীয়, অভিনয়ের মধ্যে যদি থাকে সেও নিন্দনীয়—কিন্তু অভিনয় ব্যাপারের মধ্যেই আত্মশ্লাঘবতা আছে এ কথা আমি মানি নে। আমার মধ্যে সৃষ্টিমুখী যতগুলো উদ্যম আছে তার প্রত্যেকটাকেই স্বীকার করতে আমি বাধ্য। তোমাদের অভ্যাস ও সংস্কারের বাধায় তোমরা যে দোষ কল্পনা করচ তার দ্বারা আমার চেষ্টাকে প্রতিরুদ্ধ করলে নিজের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হবে। ইতি ১১ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল [২৬ ডিসেম্বর, ১৯২৯]

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুনীতিকুমারকে এই চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হলেন না। তিনি চিঠির একটা নকল সজনীকান্তের নিকটেও পাঠিয়ে দিলেন। এই চিঠি সজনীকান্তকে মর্মান্তিক আঘাত হানল। শনিবারের চিঠির দশাও তখন মুমূর্ষু। ১৩৩৬-এর কার্তিক সংখ্যা ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়ে চিঠি কিছুদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল। কার্তিকের চিঠিতে সজনীকান্ত লিখলেন সুদীর্ঘ কবিতা—'ভ্রান্তি'। সুনীতিকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে এই 'ভ্রান্তি'। সজনীকান্ত লেখেন :

> জলিতেছে তবু ধাতব স্বর্ধ দুঃখ এই।
> মিথ্যা এ কথা—তাঁর প্রতি দেশে শ্রদ্ধা নেই।
> আপন করিতে জানে যেই জনা
> তারি পায়ে সবে বিকায় আপনা;
> "হব না আপন" যাঁহার সাধনা, শুধু তাঁরেই
> আপন করিতে পারে নাই কেহ—সত্য এই।...

শ্রীচরণেষু, হেঁয়ালি ও ভ্রান্তি—১৩৩৬-এর আষাঢ়, শ্রাবণ ও কার্তিকে প্রকাশিত এই তিনটি কবিতা সজনীকান্তের মনের নিগূঢ় জটিলতাকেই শুধু প্রকাশ করছে না, কবিগুরু সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপটিকেও উদ্‌ঘাটিত করছে।

[ক্রমশঃ]

শিল্পসাহিত্যের আকার

শ্রীদেবব্রত রেজ

১

সাহিত্য-সমালোচনার উচ্চকণ্ঠ বাদানুবাদে একটা সূত্র লক্ষ লক্ষ বার উচ্চারিত হয়েছে : সাহিত্য জীবন, জীবনের ছবি, জীবনের কেন্দ্রস্থ সার। নানা ভাবে, নানা ভাষা-বৈচিত্র্যে বারংবার এই তত্ত্ব আমাদের সম্মুখে এসেছে : জীবনের আকার সাহিত্য।

কিন্তু এই "জীবনে"র কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেখি নি সাহিত্য-বিচারে। 'জীবন' এমন একটা কথা যা বিনা সংজ্ঞায় আমাদের গ্রহণ করতে হয়। সাহিত্য-সমালোচনায় এই 'জীবন' কথাটার সংজ্ঞা কিন্তু অপরিহার্য। কেন না, এই 'জীবন' কথাটাকেই ঘিরে সাহিত্য-বিচারের দ্বন্দ্ব। কারও কাছে এই "জীবন" সামাজিক জীবন—দেশে কালে বিস্তৃত। কারও কাছে এই "জীবন" চেতনার অবস্থা। কারও কাছে অবচেতন মন থেকে উৎসারিত প্রেরণা। কারও ধারণায় "জীবন" অর্থবান কারও কাছে অর্থলেশ-হীন কারও কাছে সত্য, কারও কাছে মুহূর্তে মুহূর্তে বিনাশের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। কারও কাছে আশা, কারও কাছে অন্তহীন নিরাশা। কারও কাছে অন্তহীন অস্তিত্বের ব্যঞ্জনা, কারও কাছে ব্যঞ্জনাহীন নিতান্ত আপাত-মুহূর্তের নিরর্থক বিশৃঙ্খল শৃঙ্খল।

কিন্তু এ জীবন সে জীবন নয় যা কায়মনপ্রাণের দুর্বোধ্য বিস্ময়। অপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের প্রতি নিমেষের সংগ্রাম, ক্ষুরস্যধারার মত সদা বিপন্নতার উপর প্রাণের যাত্রা, দেহের কোষে কোষে প্রাণের আগুনে সেই যজ্ঞ নয় যার হবি জড়পদার্থ, যার সম্মুখে মানুষের পদার্থজয়ী ধী এখনও মূঢ় হতবাক।

যে যজ্ঞের অগ্নি সৃষ্টির আদিতে নীহারিকাপুঞ্জ থেকে ধরিত্রীর রসে সঞ্চারিত হয়ে যুগযুগান্তর প্রস্তুত ইতিহাসের পথ বেয়ে ধেয়ে চলেছে সেই ভয়ঙ্কর, সেই ভীষণ, শিল্পে সাহিত্যে রূপায়িত "জীবন" নয়।

সাহিত্য-শিল্পাশ্রিত জীবন মানুষের মনে, একান্তভাবে মানুষের মনে প্রতিফলিত জীবন। মানুষের চেতনার আকার। এ এক ধরনের জীবন যা আমাদের নিজেদের সৃষ্টি। এই সৃষ্টির আকারে আমরা প্রকৃতিকে অতিক্রম করি। নিজেরা নিজেদের দেখি, নিজেদের চেতনার প্রসারের পথ বেছে নিই। আমাদের অভিব্যক্তির একটা পথ। আমাদের স্বাধীন অভিব্যক্তি। আমরা এইভাবে স্বভাবসিদ্ধ জীবনের মধ্যে এমন সব প্রবণতা আরোপ করি যা প্রকৃতির অলিখিত নিয়মেরও বাইরে। কাল থেকে কালান্তরে নিজেরা নিজেদের অতিক্রম করে চলি শিল্পের সেতু ধরে। চেতনাকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করি। আমাদের চেতনার নবীকরণের এই একমাত্র পথ।

সাহিত্যের জীবন ভাষার আশ্রয়ে আকারিত মানুষের চেতনা। সর্বপ্রকার চেতনা নয়—এক বিশেষ প্রকারের চেতনা। চেতনার এই বিশিষ্টতা ও তার আকার যে ভাষা তার বিশিষ্টতা, এই দুই বিশিষ্টতা দিয়েই সাহিত্যের মূল্য ও অর্থ নির্ধারিত।

চেতনার এই বিশিষ্টতার জন্য সাহিত্য চিত্রকল্প, নির্মাণকর্ম ও সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত। একই প্রকার সার-বস্তুর সঙ্গে যুক্ত সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও ভাস্কর্য।

যেহেতু সাহিত্যের আশ্রয় ভাষা, কথা, সেই হেতু সাহিত্য চিত্রকলা, সঙ্গীত ও ভাস্কর্য থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সাহিত্য একদিকে অন্যান্য কলার সঙ্গে যুক্ত, অপরদিকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পৃথক।

অন্যান্য কলার সঙ্গে তার মিল content-এর মিল—বিষয়ের মিল, সারের মিল। অন্য কলার সঙ্গে তার যে পার্থক্য তা ভাষাশ্রিত বলে তার মধ্যে মানুষের ভাষার মৌলিক বৈশিষ্ট্যও আরোপিত। এই বৈশিষ্ট্যও content-এর বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু আকারের দিক থেকে অন্যান্য কলার সঙ্গে তার অবিসংবাদী সাদৃশ্য। চিত্রকলার ক্ষেত্রে রঙরেখা, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ভার ও সীমা, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বর এবং কাব্যের ক্ষেত্রে কথা, একই নিয়মে সুস্পষ্ট সুসংবদ্ধ স্থায়ী আকারে আকারিত হয়ে ওঠে। এই নিয়ম রঙরেখা, ভার, সীমা,

স্বর, কথা—সকল শিল্পের সকল উপাদানের মৌলিক অংশগুলিকে স্থায়ী সার্থক আকারে আকারিত করে। এই নিয়ম মানুষের চেতনার ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেবল শুধু যে সাহিত্যের বিষয় অন্যান্য শিল্পের বিষয়ের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তায় সম্পর্কিত তাই নয় সাহিত্যের যা ফর্ম্ বা আকার, এমন কি উপন্যাসের বিন্যাস, আখ্যায়িকার রচনা, কবিতার রূপ, তাও অন্যান্য শিল্পের আকারের সঙ্গে জাতিগতভাবে পৃথক হলেও মূলতঃ এক।

২

মানুষের মধ্যে যা চৈতন্য তা আকারহীন, প্রকারহীন। চৈতন্যের প্রসার হয় তখন যখন তা আকার গ্রহণ করে। চৈতন্য আকারিত হলে তা স্থায়ী ভাবরূপে রূপ গ্রহণ করে। তখন তাকে এক চিত্ত থেকে অন্য চিত্তে সংপ্রসারিত করা যায়। একের মধ্যে, ব্যষ্টির মধ্যে চেতনা যখন একটা বিশেষ আকারে আকারিত হয় তখনই চেতনার সামাজীকরণ হয়। একের গণ্ডী পেরিয়ে তা বহুক্ষেত্রে অভিব্যক্তির সহায় হয়।

চেতনার এই সামাজীকরণ (Collectivization) শিল্পসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। এই সামাজীকরণ দু দিক দিয়ে সাধিত হয়। সাহিত্যের যা 'ব্যঙ্গ্য' (Content) তার চরিত্রে নিহিত আছে এই সামাজীকরণ। সাহিত্যের যা আকার বা ফর্ম্ তার মধ্যেও আছে সামাজীকরণের প্রেরণা।

সাহিত্যের 'ব্যঙ্গ্যে'র মধ্যে যে সর্বজনীনতা তার মূল উৎস অনেক মনস্তাত্ত্বিক নির্ধারণ করেছেন মানুষের তথাকথিত সমষ্টিচেতনায় (Collective unconscious)। কিন্তু এ তত্ত্বেও ভ্রান্তির অবকাশ আছে। মনীষী সি. জি. য়ুং (C. G. Jung) প্রচলিত Collective unconscious-এর ধারণার সূত্র ধরে বর্তমানে বহু শিল্পসমালোচক শিল্পের উৎস সন্ধান করেছেন। Collective unconscious মানুষের মনের গভীরে একটা নিরাকার প্রেরণার স্তর। যে নিরাকার স্তরে মানুষের সমস্ত অতীত বিবর্তনের সর্বপ্রেরণা একটা বিপুল স্মৃতিভাণ্ডার রূপে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। চেতনার বিবর্তনের আদিমতম স্তর। যে স্তরে মানুষের পাশববিবর্তনের সমস্ত "স্মৃতি" চেতনার গণ্ডীর বাইরে, মহাসমুদ্রের গভীর ও অন্তর্নিহিত আবেগ নিয়ে সঞ্চিত ও সক্রিয়। য়ুং এই গভীরতম সমষ্টি অবচেতনের মধ্যেও চেতনার ক্ষীণ আভাস দেখেছেন, অব্যক্ত সাংগঠনিক প্রবৃত্তি দেখেছেন।

এই আদিম স্তর থেকে প্রবৃত্তির জন্ম। যাকে আমরা হেরিডিটি (মনোজ) বলি তাও এই আদিম স্তর থেকে উদ্ভূত বলা যেতে পারে। মহাকবি গ্যেটে (Goethe) এই সমষ্টি অবচেতনের একটা অদ্ভুত বাক্‌প্রতিমা রচনা করেছেন। 'ফাউস্ট' মহাকাব্যের দ্বিতীয় পর্বের "finstere galerie" "অন্ধকার গ্যালারী" অংশে মেফিস্টোফিলিস (Mephistopheles) ও ফাউস্টের (Faust) কথোপকথনের মধ্যে চেতনার এই আদিম স্তরের একটা উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন :

"মেফিস্টো : শোন তবে, নিতান্ত অনিচ্ছাতে
আজ তোমার কাছে সেই নির্বর্ণন রহস্যের বর্ণনা
করতে হলো।
সে এক অবর্ণনীয় নির্জনতা, সেখানে রয়েছে শক্তিরা,
এই নির্জনতা স্থানে নয় কালে নয়, স্থানকালাতীত
এ নির্জনতা। এরা মাতৃশক্তি।

ফাউস্ট : (শঙ্কিত) মাতৃশক্তি?

মেফিস্টো : শঙ্কায় শিউরে উঠলে বুঝি?

ফাউস্ট : মাতৃমূর্তি…মাতৃমূর্তি!—সঙ্গীতের মূর্ছনা রয়েছে এই নামে।

মেফিস্টো : হ্যাঁ তাই। মরণশীল মানুষের অজ্ঞাত শক্তিরা। যে শক্তির সান্নিধ্যে আমি শয়তান হয়েও এই ঘেঁষি না ভুলে। অতলের পথ বেয়ে নেমে যেতে হয় তাঁদের আবাসে। তাঁদের সহায়তা আজ চাইতে হচ্ছে তোমারই দোষে।

ফাউস্ট : কোথা পথ?

মেফিস্টো : পথ? জানা পথ নেই। আছে পথ, কিন্তু চিরঅক্ষুণ্ণ পথ, পদচিহ্নহীন, ভয়ঙ্কর পথ। প্রস্তুত আছ তো যেতে?

* * *

মেফিস্টো : শেষে দেখবে, তুমি গভীরতম তলে দাঁড়িয়ে আছ। শক্তিদের দেখবে তাদেরই জ্যোতিতে। কেউ আছেন উপবিষ্ট, কেউ আছেন দাঁড়িয়ে, কেউ চলেছেন ইতস্ততঃ। যখন যেমন খুশি।

ক্ষণে ক্ষণে রূপের পরিবর্তন, এইক্ষণে এমন, অপরক্ষণে অন্যরূপ—অব্যয় যে চেতনা তার চিরন্তন প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে। নিখিল প্রাণীর মূর্তিরা তাঁদের ঘিরে ঘিরে ভাসমান। ওঁরা তোমায় দেখবেন না, তাঁরা শুধু দেখেন সৃষ্টির ছক।"...

C. G. Jung এই Collective unconscious-এর মধ্যেও বিশেষ পরিণতি-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করেছেন। দেখেছেন যে এই সমষ্টি নির্জ্ঞান মন একান্তভাবে আকারপ্রকারহীন, নিয়মবন্ধনহীন নয়। এও যেন একটা অস্পষ্ট বিধিশৃঙ্খলে চালিত। এই নির্জ্ঞান থেকে symbol বা অব্যক্তের প্রতিমার জন্ম। এই symbolও নিতান্ত আপাতিক নয়। এই symbolকে আশ্রয় করে মানবমনের অভিব্যক্তির তত্ত্ব প্রকাশ পায়। য়ুং কিন্তু স্পষ্ট করে কোথাও বলেন নি যে এই নির্জ্ঞান মন যেমন অতীতের দিকে তেমনি ভবিষ্যতের দিকেও প্রসারিত।

আমার ধারণা এই নির্জ্ঞান মন, শিল্প-সাহিত্যের মানসযজ্ঞশালার দুই দ্বার—একটা অতীতের দিকে আর একটা ভবিষ্যতের দিকে। আসলে, নির্জ্ঞান হলেও তা চেতনার (consciousness) মতই অতীত ভবিষ্যৎকে একত্র ধারণ করে রয়েছে। চেতনা বা consciousness অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় কালে একই সময়ে প্রকাশমান। চেতনার আকারের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য। তাই সাহিত্যের যা 'ব্যঙ্গ্য' (content) তার মূল প্রেরণা সামাজীকরণের প্রেরণা। তা নিঃসংশয়ে, নিশ্চিতভাবে সামাজিক বা collective.

অথচ শিল্প-সাহিত্যের স্রষ্টার অনুভূতি একান্ত ব্যক্তিগত (subjective) অনুভূতি বলেই সর্বদা প্রতীয়মান। ফলে, আধুনিক শিল্পসাহিত্যদর্শনে এই ব্যক্তিমানসের স্বাধীনতার তত্ত্বটাই প্রকাণ্ড হয়ে গেছে। শিল্পের জন্ম ব্যক্তিমানসে বলে, ব্যক্তিমানসের যে কোন প্রকাশকে শিল্প বলে স্বীকারের ঝোঁক দেখা গিয়েছে। এখানেই বর্তমান যুগের শিল্পের ও সাহিত্যের সঙ্কট। ব্যক্তি যখন ব্যক্তির ঊর্ধ্বে সমষ্টির অভিব্যক্তির ধারা থেকে বিচ্যুত তখন তার আর্তি—তা যতই তীব্র হোক, তা শিল্পের আকার গ্রহণ করে না। যার জন্যে বিকৃত যৌনচেতনার তীব্রতম উচ্চারণ সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয়। সাহিত্যে যৌনতার আকারে যদি যৌন অনুভবের নতুন কালোত্তরণ ঘটে, যদি তা ব্যষ্টি-চেতনার রূপান্তরণের নব অভিব্যক্তির পরিচয় গ্রহণ করে, যদি তা নতুন চেতনা সংগঠনের, চেতনার নতুন পরিসজ্জার (pattern) রূপ গ্রহণ করে তবেই তা শিল্পের ক্ষেত্রে সার্থক হয়। যৌনচেতনারও বিবর্তন ঘটেছে কাল থেকে কালান্তরে। এও চেতনার আকার গ্রহণ। পাশব-যৌনচেতনা আকারপ্রকারহীন অতীত আদিমতার লক্ষণ। আসলে যৌনচেতনাও আমাদের নিরবয়ব চেতনার একটা সুস্পষ্ট আকার। মানসিক আকার মাত্রই অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় কালেই আশ্রিত।

যে আকারের মধ্যে ভবিষ্যৎ নেই তা আকার নয়, তার স্থায়িত্ব নেই। চেতনার ধর্মই হল তা কালকে উত্তীর্ণ হতে চায় এমন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যে যা প্রায় অব্যয়ের রূপ গ্রহণ করে।

৩

এই অব্যয় রূপের প্রবণতা চেতনার স্বাভাবিক প্রবণতা। আর এই অব্যয় রূপের আশ্রয়ে শিল্পের আকারের সামাজীকরণ। সামাজীকরণ এই অর্থে যে তা ব্যক্তিত্ব থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ অবয়ব ধারণ করে। মানুষের নিজস্ব চেতনার মৌলিক ধর্মে শিল্প বস্তুরূপ গ্রহণ করে বলে তাকে 'সৃষ্টি' বলে মনে হয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। সার্থক শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে মানুষের চেতনা নতুন আশ্রয় গ্রহণ করে। আসলে শিল্পই হোক, কাব্যই হোক, বিজ্ঞানই হোক তা মানুষের চেতনার আকারিত প্রকাশ, চেতনার বিবর্তনের নিয়মে গ্রথিত ও আশ্রিত।

চেতনার স্বভাবধর্ম অনুসারে চেতনা সর্বদাই সম্পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এই যে সম্পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের দিকে গতি তা যে শুধু চেতনার ধর্ম তাই নয়, অবচেতন বস্তুপুঞ্জেরও ধর্ম। চেতন হোক, অবচেতন হোক, নিখিলের সমস্ত অ-পদার্থ ও পদার্থপুঞ্জ এমন আকার ধারণ করতে চাইছে যা কালে প্রকট হলেও কালকে উত্তীর্ণ হতে চাইছে, অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্য (asymmety) দূরীভূত করে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ আকার গ্রহণ করার দিকে সর্বদা প্রেরিত হচ্ছে। সৃষ্টির, তা সে জড় সৃষ্টিই হোক আর অজড় হোক,—সৃষ্টির

প্রেরণা dynamic organisation, নিরবচ্ছিন্ন গতি এবং এই গতির ফলে রূপায়ণ থেকে নবরূপায়ণ।

আমাদের এই সৌরজগৎ যে Galaxy-র অন্তর্ভুক্ত সেই Galaxy থেকে বহু দূরে মহাশূন্যের গভীর গভীরতায় বিশাল ভুবনক্ষেত্রে গড়িয়ে ছড়িয়ে রয়েছে গ্যাস, সৃষ্টির আদি "মেঘ"। (জলের মেঘ নয়, সৃষ্টির মেঘ; বৈদ্যুতিক অণু-পরমাণুর মেঘ)

এই বিশাল ক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পাড়ি দিতে দ্রুততম যে দূত আলো তারই সময় লাগে অর্বুদ অর্বুদ বৎসর। এমনি ক্ষেত্র রয়েছে অসংখ্য, শূন্যের দিকে দিকে। এই বিরাট বিরাট আদি বস্তুপুঞ্জের মর্মে মর্মে সংগঠনের ক্রিয়া চলেছে প্রতিনিয়ত, আর সেই সংগঠনের সন্দেশ বহন করছে রেডিও কসমিক ওয়েভ্‌স্‌। এই বস্তুপুঞ্জ থেকে জন্ম নিচ্ছে সূর্যপর্যায়ের বহু নক্ষত্র। তাই না বলেছে 'জগৎ'! এই জগতে কোথাও কিছু স্থির নেই, সব চঞ্চল, চলমান; নিরাকার থেকে আকার গ্রহণের লীলা এর মর্মে।

মন যদি তার স্বভাবধর্মে চলে বা চালিত হয় তাহলে তা আকার থেকে আকারে উত্তীর্ণ হবেই। মনের স্বভাবধর্মের মূলে আছে স্মৃতিসঞ্চিত pattern, ছক বা ছাঁদ। আগেই বলেছি অবচেতনেরও ছাঁদ আছে—যেমন আছে চেতনার আলোকে আলোকিত মনাংশে। সমীক্ষাগারের অভিজ্ঞতা থেকেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে মন সব সময় ইন্দ্রিয়সৃষ্ট আকারগুলিকে সুসম্পূর্ণ করে চলে নিজের ছাঁদে। আসলে শিল্প হোক, কাব্য হোক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হোক, সব আমাদের চেতনার ছাঁদে আকারিত। সব মানুষী। মানুষের এই ছাঁদের বাইরে কি আছে আমরা জানি না, জানতে পারি না। এই ভুবন মানুষের কাছে মানুষী ভুবন। স্থানের বোধ, কালের বোধ, সবই মানুষী বোধ।

মনের ধর্মই হল organisation, সংগঠন। আমাদের বোধের (consciousness) মধ্যে যে pattern নিহিত সেই pattern-এর বশে আমাদের যা কিছু সৃষ্টি। মনের ধর্ম অনুযায়ী যে স্থায়ী আকার ইন্দ্রিয় অনুভব দিয়ে গড়ে ওঠে, তা কালের পরিবর্তনকে প্রতিহত করে এবং উদ্দীপক অবস্থার, stimulus situation-এর পরিবর্তন সত্ত্বেও স্থায়ী থেকে যায়।

এর একটা উদাহরণ সঙ্গীতের একটা রাগ। গায়কীর পরিবর্তন, বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তন, ইত্যাদি সত্ত্বেও এই রাগ একটা স্থায়ী রূপ। একটা আকার যত বেশী সুগঠিত তার অংশগুলির মধ্যে তত বেশী পরস্পর আকর্ষণ। অন্তর্নিহিত এই আকর্ষণের ফলে এই আকার কালকে প্রতিহত করে টিকে থাকতে চায়। যা কালের গর্ভে জন্মে তাই আবার কালকে প্রতিহত করতে চায়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সঙ্গীত মূলতঃ কালাশ্রিত। কাল দিয়েই সঙ্গীতের অবয়ব তৈরী। তবু আশ্চর্য, আকারকে আশ্রয় করে এই কালনির্মিত সৃষ্টি কালকে উত্তীর্ণ হয়। এই আকারও মানুষের চেতনার আকার, তার বোধের আকার। চেতনার স্বভাবধর্মে নিহিত যে সংগঠন, যে structure, সেই সংগঠনের সঙ্গে তার যত বেশী সাযুজ্য তত বেশী তার স্থায়িত্ব। তত বেশী তা 'সুন্দর'। মনের ক্ষেত্রে এই আকারসজ্জা organisation যত উন্নততর তা তত স্থায়ী। এই আকারসজ্জার মধ্যে যদি কোথাও ত্রুটি থাকে সেই ত্রুটি আমাদের মনে যাক্কার জন্ম দেয়। সুগঠিত আকারের যাক্কা। যার ফলে অনুভব উৎসারিত হয়ে ওঠে। চিন্তার ধারার মধ্যে যতক্ষণ বিচ্ছিন্নতা থাকে মন ততক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকে। আর এই বিচ্ছিন্নতা বিলুপ্ত হলে মনের এই উদ্বেগ ঘুচে যায়। মন অনুভবের চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দে উপনীত হয়।

৪

এই আকার গ্রহণের প্রবৃত্তির মধ্যেও একটা বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে। অনেক সময় বলা হয় যে একটা রেখা বা একটা বিশেষ গতি একটা বিশেষ দিকে সম্প্রসারণের বেগ বহন করে। অর্থাৎ সংগঠন যেন সমতলিক বা সমরৈখিক। কিন্তু তা সত্য নয়। চেতনার বা বোধের একটা ধর্ম organisation, সংগঠন, আর একটা ধর্ম তার continunity, তার বহমানতা, নিরবচ্ছিন্নতা। এ এক বিশেষ ধরনের নিরবচ্ছিন্নতা। এই নিরবচ্ছিন্নতা একটা বিশেষ ধরনের সামগ্রিকতা। চেতনার আকারসজ্জা সরলরৈখিক সজ্জা নয়।

এই আকারসজ্জা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ক্ষণ-

পরম্পরায় বহমান সূত্র নয়। কারণ পরিণাম,—পরিণাম কারণ, এই রকম সূত্র।দয়ে চেতনাসৃষ্ট আকার—তা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই হোক, শিল্পের গঠন হোক—চেতনাসৃষ্ট কোন আকার সজ্জিত নয়। এই পারম্পর্য কালপারম্পর্য হলেও এরই মধ্যেই মুক্তি আছে। নতুনের আবির্ভাব আছে পদে পদে। সুন্দরের জন্ম আছে। ইউরোপীয় দর্শনের ভাষায়, এই কালানুক্রম Being নয় Becoming। আধুনিকতম পদার্থবিজ্ঞান তত্ত্বেও এই Becoming-ই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এই তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার কণার গতি সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি শিল্পের রূপায়ণের মধ্যেও পরিস্ফুট।

উদাহরণস্বরূপ সঙ্গীতের স্বরবিন্যাসকে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিংবা ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্বর-বিন্যাস মিলিয়ে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বরসংগঠন, এক melodyর সঙ্গে অপরাপর melody মিলিয়ে যে সঙ্গীত, তার মধ্যে এই পারম্পর্য স্পষ্ট।

একটা স্বরবিন্যাস (melody) বা অনেক স্বরবিন্যাসের মিলিত (polyphony) সঙ্গীত মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে প্রবাহিত হয়ে চলে। যতক্ষণ এই ছক, melody চলে ততক্ষণ তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা। প্রত্যেক মুহূর্তে একটা নতুন স্বর পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক মুহূর্তে একটা নতুন quality যুক্ত হয়। স্বরের সংখ্যা শুধু বেড়ে চলে না, মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের গুণগত, qualitative পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই যে যোগ, স্বরের সঙ্গে স্বরের যোগ, এ এক বিশেষ ধরনের যোগ। পাটিগণিতের যোগ নয়। পাটিগণিতের যোগে প্রত্যেক খণ্ডাংশ প্রকৃতির দিক দিয়ে একজাতীয়। একে অন্যের বাইরে। একটার সঙ্গে অন্যটার যোগ করলে যোজ্যের কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটে না। পাটিগণিতের যোগে প্রত্যেক অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ব বা পরের যোজ্যের মত স্বাধীন, অন্যনিরপেক্ষ। এদের একত্র অধিষ্ঠান, juxta-position শুধু সন্নিবেশমাত্র, একত্রাধিষ্ঠান। কিন্তু নানা স্বরের মিলিত যে সুর, melody বা নানা সুরের একত্র সংযোগ যে polyphony (ইউরোপীয় সঙ্গীতে) তার গঠন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। প্রত্যেক স্বর নিজের বিশিষ্টতা বজায় রাখলেও তার becoming, তার প্রকৃতি, পূর্ববর্তী স্বরসন্নিবেশ দিয়ে যেমন নির্ধারিত তেমনি সে তার পরবর্তী, তন্মুহূর্তে অনুপস্থিত যে ভাবী অভিনব সুরের বৈশিষ্ট্য (quality), তার দ্বারাও নির্ধারিত। সঙ্গীত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পরিপূর্ণ রূপ অনুভবগোচর হয় না। অর্থাৎ, বর্তমান স্বর বা সুর তার অতীত এবং ভবিষ্যতের context প্রসঙ্গ নিয়েই বিশিষ্ট। এই যে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের একত্র মিলন এটাই শিল্পের রূপ। এটাই তার অখণ্ডতা।

উপন্যাসের narration বা বিবরণে এক এক খণ্ডাংশের নিজস্বতা আছে সত্য, কিন্তু তাই তার পরিপূর্ণ নিজস্বতা নয়। উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত একটা বিবরণ শুধু যে অতীতের প্রসঙ্গে নিহিত, অতীত বিবরণের সঙ্গে কার্য-কারণ সম্পর্কে যুক্ত তাই নয়, ভবিষ্যতের প্রসঙ্গের মধ্যেও তার অস্তিত্ব আছে। এর অর্থ এই নয় যে অতীত বিবরণ থেকে ভবিষ্যৎ বিবরণের জন্ম। এই রকম পাটিগণিতের কালপারম্পর্যকে আশ্রয় করে কাব্য রচনা হয় না। পরবর্তী ঘটনার দ্বারা পূর্ববর্তী ঘটনার প্রকৃতিগত, গুণাগত পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তীকে প্রভাবিত করে। সব মিলিয়ে রচিত হয় অখণ্ড। এমনি, কাব্য মাত্রই অখণ্ড।

মানুষের চৈতন্যের লক্ষণ এবং ধর্ম এই অখণ্ডতায় প্রকাশ। এইভাবে তা কালোত্তীর্ণ হয়। শিল্পের এবং, আরও সাধারণভাবে বলতে হয়, চেতনার এই যে অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে প্রবৃত্তি এটা প্রকৃতির জড়পদার্থেরও অবস্থান্তরের প্রবাহ। Quantum Physics-এর একটা তত্ত্ব উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে : "Quantum processes are incompatible with the deterministic description of classical physics. The concept "transition" implies that the initial and final states (past and future together) control the occurrence of an event and the sequence of steady states allows frequently of competing choices." (A. R. von. Hippel—in "molecular Engineering" in the "Foundation of future Electronics, Mc. Graw Hill, 1961)

"Classical Physics (ধ্রুবপদী পদার্থবিদ্যার) deterministic বিবরণের সঙ্গে Quantum process-এর সামঞ্জস্য নেই। Transition অর্থাৎ 'অবস্থান্তর' বলতে এই বোঝায় যে 'ঘটনা' তার প্রারম্ভিক এবং অন্ত্য দুটো অবস্থা দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। স্থায়ী অবস্থার একটাই মাত্র ক্রম নেই, একাধিক ক্রম আছে, যাদের মধ্যে থেকে বিশেষ একটা ক্রমকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।"

এই যে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা, এটা শুধু Quantum Physics-এ বর্ণিত ঘটনাপরম্পরার ক্রম সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাই নয়। এই স্বাধীনতা আছে শিল্পে, মানুষের চেতনায়। এটাই মানুষের স্বাধীনতা। এটাই তার অনন্ত সম্ভাব্যতা। অভিব্যক্তির রাজপথ। নব নব রূপায়ণের দিক্‌চিহ্নহীন আনন্দময় বিস্তার।

—

মা

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যাবেলা থেকে এক ঘুমের পর রাত সাড়ে নটা নাগাদ বুড়ী বিছানার উপর উঠে বসল চুপ করে। ওটা বুড়ীর সন্ধ্যাবেলার আফিং-ঘুম। বিছানায় বসে, মশারির ভিতর থেকে স্তিমিত চোখের দৃষ্টি ভটা চলে যতভটা দিয়ে পিটপিট করে কিছুক্ষণ ঘর বারান্দা দেখল; অর্ধ-বধির কান পেতে কথা শোনবার চেষ্টা করল; তারপর ডাকতে আরম্ভ করল, পিন্টু, ওরে ও পিন্টু, শুনছিস!

বাঞ্ছিত কণ্ঠের স্বর সে তখনও শুনতে পায় নি।

অনেকক্ষণ ডাকের পর নাতি পিন্ট এসে দাঁড়াল: ডাকছ ঠাকুমা?

বদমেজাজী বুড়ী খেঁকিয়ে ভেঙিয়ে উঠল: ডাকছ ঠাকুমা! ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল।

শুনতে পাই নি। বাবা এখনও আসে নি। আজ আসতে দেরি হবে বলে গিয়েছে তো। মাস-কাবারী বাজার করে আসবে।

দেরি হবে বলে এত দেরি হয় নাকি?

জানি না। আমি পড়তে চললাম।—বলে পিন্টু চলে গেল।

ওরে মুখপোড়া শুনে যা, শোন্।—বলে ডাকতে ডাকতে বুড়ী মশারি সরিয়ে, বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় এসে বসল।

লণ্ঠনটি কমিয়ে পাশে রেখে বুড়ী বসল বারান্দায় পা ঝুলিয়ে। মধ্যে মধ্যে চড়চাপড় মেরে মশাও তাড়াল, পুত্রবধূর মনোযোগ আকর্ষণেরও চেষ্টা করা হল।

পুত্রবধূ রান্নাঘরে ব্যস্ত রান্না নিয়ে। পাশের ঘরে নাতি-নাতনী তিনজন ব্যস্ত পড়াশুনো নিয়ে। পড়াশুনোর নামে বড় দুই ভাই-বোন মারামারি ঝগড়া করছে। ওই তাদের কাজ।

কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে বুড়ী আবার ডাকতে আরম্ভ করল, পিন্টু, ওরে ও পিন্টু!

কিন্তু কে জবাব দেবে! কিছুক্ষণ পর রান্নাঘর থেকে শুনতে পেয়ে তেড়ে উঠল পুত্রবধূ: হ্যাঁ রে, তোরা শুনতে পাচ্ছিস না? আমি এখানে এই আগুন-তাতে রান্না করতে করতেও শুনতে পাচ্ছি! যাব গিয়ে দোব এই পোড়া খুন্তির বাড়ি। ঠাকুমা ডাকছে, কি বলছে শোন্।

বড় মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কৈফিয়তের সুরে বলল, এই দেখ মা, পিন্টু কি রকম মারামারি করছে। শুনতে পাব কি করে? আর ঠাকুমার কাছে এলেই তো এখুনি বলবে, বাবার খোঁজ করে আয়। তা আমি এখন এই সন্ধ্যেবেলায় কোথায় খোঁজ করতে যাব? আর বাবা তো বলেই গিয়েছে আজ বাজার করে আসতে দেরি হবে।

সবই শুনতে পেল বুড়ী। শুনেও নিরুত্তর, নির্বাক হয়ে রইল। তারপর পাশে রাখা লণ্ঠনটি বাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বারান্দা থেকে নেমে বিড়বিড় করে বলতে বলতে এগুতে লাগল দরজা দিয়ে: তোদের কটা বাবা আমি জানি না বাপু, তবে আমার তো ওই এক ছেলে। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হল ওর, এই পঁয়তাল্লিশ বছর একদিনও কাছছাড়া করি নি। আমি না ভেবে পারি! তোদের ভাবনা হয় না, আমার হয়। আমি দেখি, তোদের কাউকে যেতে হবে না।

পুত্রবধূ রান্না ছেড়ে হাঁ হাঁ করে এসে পথ আগলে দাঁড়াল: আপনি আর দুপুর রাত্তে আদিখ্যেতা করবেন না মা। আপনি বসুন চুপ করে। আমি পিন্টুকে পাঠাচ্ছি দেখতে। কী দেখবে, কোথা খুঁজবে, আপনি ওকে বলে দিন।

বুড়ী থামল। খুঁট নিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আদিখ্যেতা করছি? আমি এই আদিখ্যেতা না করলে স্বামী পেতে কোথা? আমি বুক দিয়ে আগলে না রাখলে স্বামী নিয়ে সোহাগ করা, সংসার করা বেরিয়ে যেত!

পুত্রবধূটি ঠাণ্ডা মানুষ। সে ইচ্ছে করেই শব্দটি প্রয়োগ করেছিল। সে জানত শুনেই তার ঝগড়াটে শাশুড়ী লাফিয়ে উঠে ঝগড়া আরম্ভ করে দেবে। বাঞ্ছিত

ফল ফলতেই সে রান্নাঘরে ফিরে গেল। কড়ায় খুন্তি চালাতে চালাতে সে আপন মনেই বলল বিরস মুখে, কী আমার সোহাগ, কী আমার সংসার!

বুড়ী ফিরে এসে বারান্দায় বসেছে আবার। বসে গাল পাড়ছে পুত্রবধূকে: একেই বলে ইঁদুরে গর্ত করে আর সাপে ভোগ করে। আমি বুকে করে কত কষ্টে মানুষ করে তুলে দিয়েছি তোর হাতে, আর আমার সেই আদরের 'দবি'কে অচ্ছেদ্দা? যে মুখে বললি সেই জিভ খসে যাবে—এ আমি বলে দিলাম। আমার ওই এক ছেলে। আমার বুকের ব্যথা সে বুঝবে! তোরা পর, তোরা কি বুঝবি ও আমার কী?

বুড়ী বকেই চলল।

* * *

সত্যি কথা।

ছেলে, একমাত্র সন্তান সুবোধ যে বুড়ী সৌদামিনীর কাছে কী জিনিস তা বোঝবার ক্ষমতা সুবোধের স্ত্রীর নেই। সে আজ বিশ বছরের ওপর এ বাড়িতে ঘর করছে। দিনে দিনে সৌদামিনীর অসংখ্য আস্ফালন ও কটুকাটব্যের মধ্য দিয়ে স্বামীর ও শাশুড়ীর জীবনের খুঁটিনাটি সব জেনেছে। তার নিজেরও সন্তান আছে, সে নিজে মা হয়েছে। তবু সৌদামিনীর সন্তান-স্নেহকে সঠিক বুঝতে পারা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে তো বিগত কালের সৌদামিনীকে দেখে নি! দেখলেও কি তাকে, তার মনকে বুঝতে পারত!

সে তো আজ পঞ্চাশ বছরেরও বেশীদিন পূর্বের কথা। তখনকার দিনের তুলনায় একটু বেশী বয়সেই বিয়ে হয়েছিল সৌদামিনীর। সৌদামিনী নিজে যেমন বলিয়ে-কইয়ে, মুখরা মেয়ে ছিল, তার স্বামী তিনকড়ি ছিল তেমনি ঠাণ্ডা গোবেচারা গোছের মানুষ। সমস্ত জীবনটা তাকে চালিয়েছে অপরে। সে চলেছেও অন্যের কথায় একান্ত হাসিমুখে। জীবনের প্রথম দিকে চলেছে বাপ আর দাদার কথায়। তারপর বাবা মারা গেলে চলেছে স্ত্রীর কথায়।

বিয়ে হয়ে আসার কিছুদিনের মধ্যেই সৌদামিনীর মুখরা স্বভাবটি প্রকাশ পেয়েছিল তার শ্বশুরবাড়ির সংসারে। সেই কারণে শ্বশুরবাড়িতে কেউ প্রসন্ন ছিল না তার ওপর।

বছর দুয়েক যেতে না যেতেই সেই চাপা অপ্রসন্নতার সঙ্গে যুক্ত হল আর এক প্রত্যক্ষ অভিযোগ।

জীবনের প্রথম দিকে পাথরের মত স্বাস্থ্য ছিল সৌদামিনীর। যৌবনোদ্ধত দেহ নিয়ে পায়ের শব্দ তুলে চলত সে। অমনি দেহ ও স্বাস্থ্য ছিল বলেই বোধ হয় সেই দেহের মধ্যে উদ্ধত এক মন বাস করত। শ্বশুর বা বড় ভাসুর মুখে কিছু বলতেন না। কিন্তু তাঁদের অপ্রসন্নতাটা বোঝা যেত কচিৎ মন্তব্যের মধ্যে। শ্বশুর একবার শাশুড়ীকে বলেছিলেন, ছোট বউমাকে অমন দুম দুম করে পায়ের শব্দ তুলে হাঁটতে বারণ করো। শাশুড়ী শ্বশুরের জবানি পুত্রবধূকে বললে সৌদামিনী পরিষ্কার বলেছিল—আমি মিনমিন করে হাঁটতে পারি না। তা সে যে যাই বলুন। শাশুড়ী তার কথা শুনে হতবাক হয়েছিলেন।

বড় পুত্রবধূর স্বাস্থ্য তরুণ বয়সেই জীর্ণ। তিনটি সন্তানের জননী হয়ে সে অস্থিচর্মসার। তার দৃষ্টি জায়ের এই নবীন প্রবল স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে বারবার ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠত। সে শাশুড়ীকে আড়ালে বলেছিল—ওর বড় মুখ মা। আপনি ছোট্ ঠাকুরপোকে বলুন। সে বউকে শাসন করুক।

কথাটা শুনেছিল সৌদামিনী। শুনে সে মুখ মচকে বিদ্রূপ করে হেসেছিল আপন মনে। বেশী হেসেছিল সে শাশুড়ীর রাগের কথা শুনে। তিনি বড় পুত্রবধূর কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—ওই দজ্জাল বউকে শাসন করবে তিনু? সে তো একটা ভেড়া! তার ওপর ওই ধুমসী বউয়ের গতর দেখেই তো মজেছে। মজে ভেড়া হয়েছে গাড়োল ভেড়া। ওর সাধ্যি কী? ওই বউ তো ওকে তিন তুড়িতে উড়িয়ে দেবে। ওকে বলে কী হবে মা?

কিন্তু এই উদ্ধত বধূকে শাসন করার সুযোগ এল। সঙ্গত সুযোগ।

বিয়ের পর তিনটে বছর পার হয়ে গেল। তার মধ্যে বড় পুত্রবধূ অস্থিচর্মসার হয়েও দু বছরে আরও দুটি সন্তানের জন্ম দিল। কিন্তু ওই আশ্চর্য স্বাস্থ্য নিয়েও সৌদামিনী একটিও সন্তান নিজের কুক্ষিতে আবাহন করে আনতে পারল না। তাই ফলে প্রথমে পাড়া-ঘরে,

তারপর পাড়া-ঘর থেকে তাদের ঘরে এসে একটা কথা ধাক্কা দিয়ে ফিরতে লাগল পাক খেয়ে। বধূ বন্ধ্যা, তার সন্তান হবে না।

গুঞ্জনটা শেষ পর্যন্ত পৌঁছল কোলাহলের সীমায়। তার ফলে সৌদামিনী ভয় পেল না, কাঁদল না, রাগে আগুন হয়ে উঠল। শান্ত স্বামীর সঙ্গে প্রতি রাত্রিতে ঝগড়া করে শ্বশুরবাড়ির সকলকে বাধ্য করল তাকে বাপের বাড়িতে রেখে আসতে।

বাপের বাড়ি যাবার সময় শ্বশুরবাড়ির সকলকে সে শাপ-শাপান্ত করে গেল। শেষে বলে গেল, ছেলের আবার একটা বিয়ে দাও, দিয়ে একপাল বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘর কর তোমরা।

বাপের বাড়ি গিয়ে আর এল না সৌদামিনী। এক বছরের মাথায় চিঠি লিখে লিখে হদ্দ হয়ে গিয়ে গোবেচারী স্বামী নিজেই উপযাচক হয়ে হাজির হল সৌদামিনীকে আনতে। সৌদামিনী শ্বশুরবাড়ি আসা দূরের কথা, গালাগালি করে স্বামীকে তাড়িয়ে দিল। সোজা বলে দিল তোমাদের ভাত আর খাব না।

বাড়ির সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠল তার কথায়। তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলল—আমি যদি তোমাদের ভার হয়ে থাকি তবে বল। আমি আমার নিজের পথ করে নেব। আমার পেট চালাবার ব্যবস্থা আমি করতে পারব ধান ভেনে, গোবর কুড়িয়ে—যেমন করে পারি। সবাই আমার গতর দেখেছে। সেই গতরই খেতে দেবে আমাকে।

অপমানিত হয়ে ম্লান মুখে ফিরে যেতে হল তিনকড়িকে।

বাপের বাড়িতে বসেই, তার কিছুদিন পর, ভাতের থালা সামনে নিয়ে খেতে গিয়ে সৌদামিনী শুনতে পেল তিনকড়ি আবার বিয়ে করেছে।

তাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। ভাতের থালা পরিষ্কার করে, একপেট জল খেয়ে হেসে থালা ছেড়ে উঠে গেল। ওঠবার সময় ভাজেদের বলে গেল—দেখলে, খবরটা শুনেও কেমন থালা চেঁছেপুঁছে ভাত খেলাম। কচু হবে, কাঁচকলা হবে আমার।

বলে বুড়ো-আঙুল দেখিয়ে সে হাসতে লাগল।

আশ্চর্য, এর পর দু বছর যেতে না যেতেই আবার তিনকড়িকে এসে দাঁড়াতে হল সৌদামিনীর কাছে। তার সতীন মারা গিয়েছে। সৌদামিনীকে ফিরে যেতে হবে তার সংসারে।

আনন্দে, তৃপ্তিতে, রাগে গরম তেলের ওপর বেগুনের মত নাচতে লাগল সৌদামিনী। নাচতে নাচতে, গাল দিতে দিতে স্বামীকে আবার একটা বিয়ে করবার পরামর্শ দিয়ে চলে যেতে বলল।

কিন্তু সব শুনেও মাথা হেঁট করে ম্লান মুখে স্ত্রীর সব অপমান সহ্য করল তিনকড়ি।

তারই ফলে বোধ হয় কয়েকদিনের মধ্যেই বিজয়িনীর মত শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেল সৌদামিনী।

আরও আশ্চর্য, এর কিছুদিনের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ির সকলের ভারী মুখের ভার সরিয়ে সকলকে হাসতে বাধ্য করল সৌদামিনী। সে সন্তানবতী হয়েছে।

সেই সন্তান, তার জীবনের সেই একমাত্র সন্তান সুবোধ।

যে আসন সে নিজের জোরে শ্বশুরবাড়িতে জবর-দখল করে বসেছিল সেই আসনে তার সত্যকারের অধিকার এনেছিল সুবোধ নিজের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে।

সুবোধকে কোলে নিয়ে সে আনন্দে দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়িতে সবাই গোপনে বলল—ছেলে যেন এর আগে আর কারও হয় নি!

কথাটা তার কানে ঠিকই এসেছিল। সে জবাব না দিয়ে আপন মনে হেসেছিল পরিতৃপ্তা সাম্রাজ্ঞীর মত।

তারই উত্তর দিত সে ছেলেকে তেল মাখাবার সময়, দুধ খাওয়াবার সময়, অকারণ আদর করার সময়। সেবা করত, আদর করত আর বলত—এমন ছেলে কি এর আগে কারও হয়েছে সংসারে? খুঁজে দেখতে পারে লোকে, হয় নি। আমি সেই ছেলে বুকে নিয়ে আদর করব না, আনন্দে ডগমগ হব না তো হব কী নিয়ে? ভগবানকে পেলেও কি এর বদল হয়? হয় না, হয় না, হয় না।

আনন্দের অতি রূঢ় প্রকাশে সংসারটিকে সচকিত করে দিল সৌদামিনী।

সত্যি কথা। সৌদামিনীর স্ববোধের জন্তে মরেও সুখ ছিল না। স্ববোধই তার জীবনের ধ্যান জ্ঞান। ধ্যান জ্ঞান বললেও কম বলা হল। পৃথক সংসারে এসে শুধু স্বামী আর পুত্রকে নিয়ে সংসার করতে বসে সেই সংসারের মধ্যেও সে এক জায়গায় গণ্ডি টানল। একদিকে সে আর তার দুলাল স্ববোধ, অন্যদিকে স্বামী তিনকড়ি। তার অভিযোগ স্বামী তার একমাত্র ছেলেকে ভালবাসে না, ছেলের সুখদুঃখের দিকে তার চোখ নেই।

তার কথা শুনে প্রথম প্রথম হাসত তিনকড়ি। অকপট প্রসন্ন হৃদ্য হাসি। তাতে আরও বেশী করে জলে উঠত সৌদামিনী। হাসতে হাসতে তিনকড়ি তাকে বোঝাতে চাইত—স্ববোধ যেমন সদুর ছেলে তেমনি তারও তো ছেলে। শুধু ছেলে নয়, একমাত্র ছেলে। সৌদামিনী তাকে যতখানি ভালবাসে সেও কি স্ববোধকে ততখানি ভালবাসে না? ভালবাসে।

কিন্তু কাকে বলবে সে কথা?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই খেপে উঠত সৌদামিনী।

তারই ফলে তিনকড়ির মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। সে নীরবে স্বীকার করে নিল সে ছেলেকে সৌদামিনীর মত ভালবাসে না। ছেলের জন্তে তার মায়া-মমতা অনেক কম।

সেই ছুতো নিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনকড়িকে আক্রমণের নতুন পথ আবিষ্কার করল সৌদামিনী। সে বলতে লাগল, তুমি ভালবাস না ছেলেকে। কেন ভালবাস না? ভালবাসতে হবে তোমাকে। ভালবাসতে তুমি বাধ্য।

শুনে তিনকড়ি চুপ করে থাকত।

সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার নতুন প্রমাণ পাবার জন্তে, নতুন প্রমাণ আদায় করবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠত সৌদামিনী। সেটা আসত কত বিচিত্র, অচিন্তনীয় পথ দিয়ে।

সামান্য চাকরি করত তিনকড়ি। মাসে সাত টাকা মাইনের গোমস্তা। তার উপর সৎ চরিত্রের মানুষ সে। যতখানি শান্ত-প্রকৃতির মানুষ সে ততখানি সৎ। জমিদারের বাড়িতে কাজ করার জন্তে সাত টাকা মাইনেতেই বেশ চলে যেত ছোট্ট সংসারটি। ঐশ্বর্য ছিল না কিন্তু সচ্ছলতা ছিল। সচ্ছলতার সবটুকুই একান্ত সহজভাবে আত্মসাৎ ও ভোগ করে সৌদামিনী স্বামীকে বোঝাতে লাগল ঐশ্বর্যের অভাবের জন্তে।

সেটা প্রকাশ পেত বিচিত্র পথে।

তিনকড়ির বয়স তখন বেশী হয় নি। ছেলের প্রতি ভালবাসা কম না হলেও, তরুণী স্ত্রীর প্রতি আনুগত্যও কম নয়। বেশী রাত্রে বাড়ি ফিরে সৌদামিনীর জন্তে আনা উপহারটি সৌদামিনীর হাতে হাসিমুখে তুলে দিলে সৌদামিনী সেটি হাতে নিয়ে বেশ খুঁটিয়ে দু বার দেখে নিত ঠিক। সে দিকে তার ভুল হত না। তারপর প্রশ্ন করত—আর কই?

বিস্মিত তিনকড়ি প্রশ্ন করত—আর? কি আর?

তার চেয়েও বিস্ময়ের সঙ্গে ক্রুদ্ধ বিদ্রূপের বিষ মিশিয়ে সৌদামিনী পালটা প্রশ্ন করে জবাব দিত—কি আর? বুঝতে পারলে না? তা পারবে কেন? ছেলেকে কি ভালবাস? ছেলে বলে কি মনে থাকে?

হতবাক তিনকড়ি বলে—আরে যাঃ, ছেলেকে মনে না রাখার কি হল এর মধ্যে?

কি হল এর মধ্যে? স্বার্থপর লম্পট কোথাকার!

এর পর তিনকড়ির রাগে নিজের মাথার চুল ছেঁড়বার অথবা ঠুকে নিজের মাথা ফাটাবার কথা। কিন্তু দুটোর একটাও সে করল না। করে কি হবে? সে যা করবে তার চেয়েও অধিকতর, কঠিনতর কিছু করার শক্তি রাখে সৌদামিনী। সে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে গেল।

সৌদামিনী বুঝিয়ে দিল তার অনুপম ক্রুদ্ধ ভাষায় যে সে শুধু স্ত্রীর জন্তেই এনেছে, কিন্তু ছেলের জন্তে অনুরূপ কিছু না আনায় এ উপহার সে ছেলের মা হয়ে নিতে পারে না, নেবে না।

তিনকড়িকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল—পরদিনই ছেলের জন্তে সে উপহার এনে দেবে।

সেই উপহার এনে দিতে হল আর তারই রাস্তা ধরে একটা মারাত্মক পথে পা দিতে হল তিনকড়িকে।

সামান্য অবস্থার মানুষ তিনকড়ি। কিন্তু স্ববোধকে সুন্দর দামী জামা পরিয়ে তিনকড়ির কোলে যখন সৌদামিনী ছেলেকে তুলে দিত তখন খুশী হত তিনকড়ি। ছেলেকে বুকে চেপে ধরে আদর করে বলত—এ একেবারে বাবুদের ছেলে বলে মনে হচ্ছে। রাস্তা-ঘাটে দেখলে কে বলবে এ তিনকড়ি গোমস্তার ছেলে।

সৌদামিনীর অন্তর গভীর, অতি গভীর তৃপ্তিতে ভরে উঠত। সে হাসত স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে। বলত—তা কেউ বলবে না। বললে অমুক বাবুর ছেলে, তোমার নাম করেই বলবে।

তিনকড়ি হাসত, সঙ্গে সঙ্গে বলত—এমন করে ছেলেকে বাবু করে তুলো না সদু। বিপদে পড়বে।

সৌদামিনীর মুখের হাসি এক মুহূর্তে উবে গিয়ে মুখখানায় কঠিন বিরাগ ফুটে উঠত। বলত—বিপদের কথা তুমি ভেব। আমার ছেলে অন্যের ছেলের চেয়ে কম কিসে? আর পাঁচজন যেমন ভাল জামা-কাপড় পরে, আমার ছেলেও তাই পরবে। তুমি দিতে না পার আমাকে বল। আমি তার ব্যবস্থা করব।

এই অবুঝ, সন্তান-সর্বস্ব স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখের হাসি হাসত তিনকড়ি। কথা বলত না। তার দুঃখ, তার কথা কে বুঝবে?

দামী দামী জামা-কাপড় পরানোটা একটা নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড় করিয়ে দিল সৌদামিনী। গ্রামের দোকান থেকে মাথায় ঘোমটা টেনে, ছেলেকে কোলে নিয়ে দুপুরের দিকে জামা-কাপড় পছন্দ করে ধারে কিনে নিয়ে আসত সৌদামিনী। সেই ধার শোধ করতে হত তিনকড়িকে। দোকানদার তাগাদা দিয়ে দিয়ে অস্থির করত তাকে। সে শোধ দিত এক টাকা দু টাকা করে। বড় কষ্টেই শোধ দিত। কখনও কখনও অন্যের কাছে ধার করে জামা-কাপড়ের ধার শোধ করতে হত তাকে।

একদিন ঘটনাটা চরমে উঠেছিল। সেই দিন একটা আশ্চর্য আঘাত খেয়েছিল সৌদামিনী।

সেদিন বিকেলবেলা কাজ থেকে ফিরে তামাক সাজতে সাজতে ছেলেকে ডাকল তিনকড়ি—কই রে, আমার সুবোধ কই?

ওই ভাবেই তিনকড়ি ডাকে প্রতিদিন। চার-পাঁচ বছরের ছেলে এসে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে। সেদিনও দাঁড়াল।

ছেলেকে কোলে নিয়ে তিনকড়ি সবিস্ময়ে বলল—এ কি রে, আজ এমন ছেঁড়া জামা পড়ে আছিস কেন? আর জামা নেই তোর?

ছেলে মুখ ভার করে বলল—জামা নেই। এটা ছেঁড়া, ছাই জামা।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের পিছনে এসে দাঁড়াল সৌদামিনী। তার মুখ আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে। সে বলল—যেমন কপাল করে এসেছিস তেমনি তো হবে! ছেঁড়া পুরনো জামা পরার কপাল! তাই গায়ে দে, দিয়ে ভাগ্যি মান।

তিনকড়ি বিস্মিত হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি, হল কি?

মুখ ভার করে স্ত্রী বলল—হবে আবার কি? দোকানে আজ আমাকে বলে দিয়েছে, আর ধারে দিতে পারবে না জামা। বাকি পড়েছে ষাট টাকা!

তিনকড়ির বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। ষাট টাকা বাকি পড়েছে দোকানে! এ যে পাহাড়-প্রমাণ ধার! তবু মুখে হাসি টেনে বলল—শোধ দিয়ে দোব অল্প অল্প করে। বলে দোব দোকানে। নিয়ে এস তুমি তোমার ছেলের জন্যে যা দরকার।

স্বভাবতঃই খুশী হল সৌদামিনী। কিন্তু মুখে সে খুশী প্রকাশ করার মানুষ নয় সে। বলল—দোকানী আজ কি বলছিল জান?

কি?—এক হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে তামাক টানতে টানতে মুখ তুলে তিনকড়ি বলল—কি বলছিল?

বলছিল অমুক বাবুর আবার টাকার ভাবনা! এই সামান্য কটা টাকা তো ওঁর কাছে হাতের ময়লা। উনি ইচ্ছে করলে এক মিনিটে সব শোধ করে চুকিয়ে দিতে পারেন।

কথাগুলোর পিছনে যেন বাক্যের অতিরিক্ত কোন অর্থ লুকিয়ে আছে যা তিনকড়ি বুঝতে পেরেও পারছে না। সে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল স্ত্রীর মুখের দিকে।

সৌদামিনী বলল—বলছিল, উনি যদি ইচ্ছে করেন ওঁরও ধার শোধ হয়, আমারও উপকার হয়। জমিদারী সেরেস্তায় আমার জমির পাশে যে খাস পতিত জমি আছে বাবুদের, সেটা যদি আমাকে দেবার ব্যবস্থা করে দেন সেরেস্তায় আমার নাম পত্তন করে দিয়ে তা হলে আমি শুধু ধারটাই শোধ করে দেব না, মিষ্টি খেতেও দেব কিছু।

বিচিত্র দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তিনকড়ি চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ছেলেকে কোল থেকে ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

একটু পরে চাপা ভয়াল গলায় বলল—সেই বেটা বজ্জাতের মুখটা আমি ভেঙে দিয়ে আসব। সে ভেবেছে কি?

সৌদামিনী প্রতিবাদ করে কী বলতে যাচ্ছিল।

তাকে সজোরে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল তিনকড়ি: থাম। তুমি আমার জীবনটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিলে। কিন্তু তোমার এত সাহস তুমি আমাকে চুরি করতে বল? আমি তোমাদের জন্য চুরি করব? আমি গরীব বলে আমার ধর্মও নেই?

সৌদামিনী স্বামীর ক্রোধের সামনে নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলতে গেল—ওরে আমার ধর্মিষ্ঠি রে!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ডতর ধমক খেয়ে থেমে যেতে হল তাকে। কারণ, পরক্ষণেই হাতের হুঁকোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শান-বাঁধানো দাওয়ায় জ্ঞানহীনের মত মাথা ঠুকতে লাগল তিনকড়ি—এই নে, এই নে, এই নে। আমার টাকা নেই—নে, আমার রক্ত নে।

পালিয়ে বাঁচল সৌদামিনী।

এর পর আর বেশীদিন বাঁচে নি তিনকড়ি। ধারটা সে শোধ করেছিল আধ বিঘে জমি বিক্রি করে।

তাতেও হুঁশ হয় নি সৌদামিনীর। সে সমানে ছেলেকে সাধ মিটিয়ে খাইয়েছে, পরিয়েছে। পরাজিত তিনকড়ি শুধু দূর থেকে দেখেছে আর বিষণ্ণ হাসি হেসে নিঃশ্বাস ফেলেছে। তেমনি ভাবেই ভাঙা মন নিয়ে দরিদ্র সৎ মানুষটি এই কর্কশ-কলরবমুখর সংসার থেকে একদিন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

সৌদামিনী কাঁদল বুক চাপড়ে। আসল মানুষটার জন্যে বোধ হয় কাঁদে নি সে। কেঁদেছিল বোধ হয় সুবোধের বাবা এবং অভিভাবকের জন্যে।

* * *

সেই কথা আজও বলে সৌদামিনী।

সেদিনও বলছিল। বলছিল বড় নাতনীকে। বলেছিল, তোর দাদু মানুষটা ভাল-ছিল জানিস! সাধুলোক ছিল, তেমন মানুষ আজকাল বড় চোখে পড়ে না।

বড় নাতনী প্রগল্‌ভ হাসি দিয়ে তার কথা থামিয়ে দিল।

বড় নাতনী বেশ বড় হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে মুখরাও হয়ে উঠছে পিতামহীর মত। অন্য সময় মায়ের ভয়ে কথা বলতে পারে না মায়ের সামনে। মা না থাকলে সে কথা বলে খাসা। তার প্রগল্‌ভ হাসিতে সৌদামিনী চটে উঠল। বিরক্ত হয়ে বলল, আ মরণ, অমন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছিস কেন?

বয়স্কা মেয়েদের মত অকুণ্ঠভাবে চতুর হাসি হেসে সে বলল, হাসব না? হাসছি তোমার কথা শুনে। নিজের স্বামীর সম্বন্ধে সবাই অমনি একচোখো হয় ঠাকুমা। নিজের স্বামীকে অন্য মানুষ থেকে সব মেয়েই আলাদা করে দেখে। তুমিও তেমনি দেখেছ।

সৌদামিনীর মুখে অকস্মাৎ একটা বিষণ্ণ ছায়া ভেসে গেল। এ বিষণ্ণতা ওকে মানায় না। এ ধরনের বিষণ্ণতা ওর মধ্যে নেইও। কখনও-সখনও এমনি ধারার জিনিস দেখা দেয়, এমনি একটি আতুর মন বুকের মধ্যে সবকিছুকে আড়াল করে বসে কদাচিৎ সুবোধের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, কিংবা নিজের শিরাবহুল জীর্ণ হাতখানা তার গায়ে বুলোতে বুলোতে। তখন ওর মুখখানা কেমন হয়ে যায়, বুকের মধ্যে কত দুঃখ থৈথৈ করে, অকারণে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, কখনও কখনও চোখ দুটোতেও অকারণ জলের ছোঁয়া লাগে। নাতনীর কথা শুনে আজও তার তেমনি হল যেন। সে নিজের একখানা অপটু, অসহায় হাত নাতনীর পিঠের উপর রেখে বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, না রে, সত্যি কথাই বলছি। বড় ভাল মানুষ ছিল তোর দাদু। সাধুলোক ছিল। পরের হাজার সোনার 'দবি্য' নিয়ে আজীবন নাড়াচাড়া করেছে। কিন্তু নিজের জন্যে কখনও এতটুকু ছোঁয় নি। কত গালমন্দ করেছি, কখনও সে সব বাক্যি শুনে মুখ ভার করে নি। তোর বাবার জন্যে কি কম জ্বালাতন করেছি মানুষটাকে! কিন্তু কখনও আমাকে একটা খারাপ কথা বলে নি। সব করেছি তোর বাবার জন্যে।

বলতে বলতে আবার বরাবরের চেনা সৌদামিনী আত্মপ্রকাশ করল। অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, বলি, বাবা পেলি কোথায় লো? আজ তো বাবা বাবা করে চোখে

অন্ধকার দেখিস, আকুলি-বিকুলি করিস, আদর কাড়াতে যাস। তা বাবা পেলি কি করে? এই সদুঠাকরুণ না থাকলে বাবা পেতিস! আমি বুক দিয়ে আগলে না রাখলে কবে নটেগাছটি মুড়িয়ে যেত!

নাতনী মেয়েটা যেন কেমন! সদুঠাকরুণের কথাগুলো শুনে সে আবার হাসতে লাগল।

সদুঠাকরুণ চটে উঠে বলল, আবার হাসছিস? অত হাসির কি হল লো?

মেয়েটি মুখে হাত দিয়ে কৌতুক করে বলল, কি হল? হ্যাঁ ঠাকুমা, তোমার ছেলেকে তুমি বুকে করে মানুষ যে করেছিলে—সে করেছিলে কি আমার বাবা বলে, না তোমার ছেলে বলে?

সদুঠাকরুণ বিরক্তির সঙ্গে বলল, তোর বাবা বলে ভাবতে আমার দায় পড়েছিল। আর তুই তখন কোথা? আমি মানুষ করেছি আমার ছেলেকে।

নাতনী এবার চটে উঠল, বলল, তাই তো বলছি গো। যা করেছ—করেছ নিজের ছেলেকে। তাতে আমার কি বল তো? চল, এইবার সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়াই। ট্রেনের সিগনাল দিয়েছে।

সদু ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। বলল, সিগনাল দিয়েছে? কই, আমি দেখতে পাচ্ছি না! চোখেও আর ভাল দেখতে পাই না।

তা বাবাকে বল না কেন, কলকাতায় হাসপাতালে চোখের ডাক্তারকে দেখিয়ে আনবে একদিন।

বলতে মায়া লাগে রে! সারাদিন খেটেখুটে মুখ চুন করে বাড়ি আসে। তখন বলতে মায়া লাগে। তা অত যদি ঠাকুমার জন্যে দরদ, তা তুই তো বলতে পারিস তোর বাপকে।

তাই বলব। এখন চল তো।

নাতনীর হাত ধরে নামতে লাগল বুড়ী ওভারব্রীজ থেকে।

ওই হল প্রতিদিন বিকেলবেলায় বুড়ীর বসার জায়গা।

বেলা পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সৌদামিনী বেরুবার জন্যে ছটফট করতে আরম্ভ করে। ডাকের পর ডাক দেয় নাতনীকে। নাতনী ব্যস্ত থাকে জামা-কাপড় বদলাতে, নয়তো চুল বাঁধতে। বেশী দেরি করলে বুড়ী নিজে থেকে এসে ওর চুলে হাত দেয়, সমাদর করে বলে, ফেশান নিয়েই তোরা মলি, বুঝলি! আয়, আমি চুল বেঁধে দিই তাড়াতাড়ি। ভয় নেই, হাল-ফেশান করেই বেঁধে দেব চুল। ভাবিস নি।

তারপর নাতনীর সঙ্গে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওভারব্রীজের উপর গিয়ে বসে।

বসে থাকে ছেলের প্রত্যাশায়।

নাতনী বলে, কত আগে এলে বল তো ঠাকুমা! এই মোটে সওয়া পাঁচটা বাজছে। ট্রেন আসবে সেই পাঁচটা উনপঞ্চাশে। তার মানে এখনও আধঘণ্টার ওপর দেরি।

বুড়ী আপ্যায়ন করে বলে, আয় না, আয় না, বস্ এখানে। কেমন খাসা বাতাস এই উঁচুতে। আয়, বস্ এসে আমার পাশে।

নাতনী আপত্তি করলে বুদ্ধি খাটিয়ে বুড়ী ধমক দেয়, তুই এদিক ওদিক চললি কোথায় খুকী? সোমথ মেয়ে, এদিক ওদিক যাস নি, বস্ এসে আমার কাছে।

এ তিরস্কারের পর খুকীকে বসতে হয় এসে ঠাকুমার কাছে।

কাছে বসলেই তার পিঠে হাত দিয়ে সমাদর করে বুড়ী বলে, হ্যাঁ, চুপ করে বস্। বড় হয়েছিস, এখন কি আর ছটফট করে বেড়ায়? এইবার সুবোধকে বলব তোর জন্যে পাত্র খুঁজতে।

খুকী আপত্তি করে বলে—ধ্যেৎ!

ধ্যেৎ কি? ধ্যেৎ বললে হয়?

অকস্মাৎ আত্মগত হয়ে বিগত স্মৃতির মধ্যে ডুবে যায় বুড়ী। অন্যমনস্ক হয়ে বলে, আজ হোক, কাল হোক তোর বিয়ে তো দিতে হবে। বিয়ে হবে তোর, আমার সুবোধের জামাই আসবে।

একটু চুপ করে থেকে স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যেই বুড়ী বলে, ভাবতেই কেমন হাসি পায় আমার। আমার সেই কচি ছেলেটা—তার জামাই আসবে!

স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল যেন সৌদামিনী। সেই স্বপ্নের ঘোরের মধ্য থেকেই যেন সেই পুরনো কথাগুলো এক এক করে বেরিয়ে আসতে লাগল মনের ভিতর কোন চাপা কবর খুলে, মুখের দরজা দিয়ে।

সে সব কথা, সে সব স্মৃতি সুখের নয়। একান্ত দুঃখের, একান্ত ক্লেশের ও কৃচ্ছ্রতার। তার মধ্যে সুখের ও স্বস্তির নাম-গন্ধ নেই কোথাও। তবু সেই স্মৃতিই যেন সেই ওভারব্রীজের ওপর একঝাঁক ছায়ার পাখির মত সুখ-স্বপ্ন রচনা করল।

তিনকড়ি মারা যাবার পর কম যন্ত্রণা পেয়েছে সৌদামিনী! যদি সে একা হত তাহলে বিশেষ কষ্ট, বিশেষ দুঃখ পেত না সৌদামিনী। সব দুঃখ তো সুবোধকে নিয়েই। আবার সুবোধ না থাকলে কোন্ সুখটা থাকত তার জীবনে?

সুবোধকে ভরতি করে দিল বড় ইস্কুলে। তিনকড়ি মারা যেতে যেতে সুবোধের পাঠশালায় পড়া শেষ হয়ে এসেছিল। অল্পবয়সী বিধবা। কিন্তু সে নিজের অল্প বয়স, যৌবন—কোনটার জন্যেই লজ্জা অনুভব করে নি, করার মত সৌভাগ্য হয় নি তার। সেই অল্প বয়সেই নিজের সামান্য সম্পত্তি নিজে তদ্বির-তদারক করেছে, তার থেকে নিজের আর নিজের সন্তানের অন্নসংস্থান করেছে। লজ্জার মাথা খেয়ে, মর্যাদার মাথা খেয়ে, অল্প ঘোমটা টেনে ভিক্ষার্থীর দীনতা নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে ইস্কুলের মাস্টারদের অন্দরমহলে, ইস্কুলের সেক্রেটারি মহোদয়ের খাস-কামরায়। প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে ছেলের জন্যে। যে সৌদামিনীর কোপন কণ্ঠস্বরে পাড়ায় কাক-চিল বসায় সাহস পায় নি, সেই কণ্ঠস্বরকে কাতর কোমল করে, চোখের আগুন জলের ধারায় নিভিয়ে, হাত জোড় করে দিনের পর দিন প্রার্থনা জানিয়ে দাতাকে বিরক্ত করে দান আদায় করেছে।

কিন্তু তাতেও সুবোধের লেখাপড়া হল না। তার কাছে সুবোধের জন্যে কোন প্রার্থনাই কোনকালে অযৌক্তিক ছিল না। এই অযৌক্তিক অনুরোধের পথ বেয়েই সুবোধ লেখাপড়ার নামে বখামি করেও ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত উঠে গেল, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাও দিল। সেখানে পরীক্ষার আসনে যথোচিত চুরি করেও পাস করতে পারল না।

পাস না করতে পারলে কি হয়, পরীক্ষা তো দিয়েছিল সে। আর যার অমন মা আছে তার আবার ভাবনা কিসের? সেই মায়ের জোরেই চাকরিও হয়ে গেল সুবোধের। গ্রামেরই এক ভদ্রলোক কলকাতায় এক সওদাগরী অফিসে বড় চাকরি করতেন। তাঁর স্ত্রীর মনোরঞ্জন করে চোখের জলে তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে, তাঁকে মিনতি করে, বিরক্ত বিপর্যস্ত করে ছেলের জন্যে ঠিক চাকরি যোগাড় করে ফেলল সৌদামিনী। সেই চাকরিই আজও করছে সুবোধ। মন দিয়েই করছে, করে উন্নতিও করেছে খানিকটা।

গ্রামের সম্পত্তি বিক্রি করে মায়ের উদ্যোগেই কলকাতা থেকে কিছুদূরে বাড়ি হয়েছে তার। ছোট্ট বাড়ি।

এই এক গল্প নিত্যই করে সৌদামিনী নিজের নাতি-নাতনীদের কাছে। গল্প বলতে বলতে ট্রেনের সময় হয়ে যায়। আজও হল। নাতনী বলল, ঠাকুমা, ওঠ, গাড়ি আসছে।

বুড়ী হন্তদন্ত হয়ে ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়াল। নাতনীর হাত ধরে বলল, চল্, নামি।

আজ নাতনী বলল, নেমে কি করবে? এই ব্রীজের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকি না। বাবা তো এইদিকেই আসবে।

তাকে ভেঙিয়ে বুড়ী বলল, এইদিকেই আসবে! বিব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি না! থাকতে হয় তুই থাক, আমি নেমে চললাম। বিব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি না! এই ভালবাসা! এই ভালবাসা হলে অবলা অল্পবয়সী মেয়েমানুষ হয়ে ছেলে মানুষ করতে পারতাম না লো।

দুজনে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গিয়ে দাঁড়াল সিঁড়ির মুখে।

ট্রেনটা বিপুল শব্দ করে ঢুকল প্ল্যাটফর্মে। স্টীমের শব্দ, ভিড়, কোলাহল। তারই মধ্যে থলি হাতে আসছে সুবোধ।

বুড়ী এখনও ছেলেকে দেখতে পায় নি। ইতস্ততঃ চকিত তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। নাতনী তার হাতে চাপ দিয়ে বলল, ওই আসছে বাবা!

হাসিমুখে বুড়ী বলল, কই রে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। এবার চোখ দেখিয়ে চশমা নিতে হবে দেখছি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সুবোধ এসে কাছে দাঁড়াল। অন্যদিন মাকে আর মেয়েকে দেখে সে খুশী হয়। এইভাবে আসার জন্যে মৃদু অনুযোগ করলেও মুখে হাসি থাকে। আজ বিরক্ত হয়েই বলল, রোজ রোজ কেন এমন করে স্টেশনে আস বল তো? কোন্দিন রাস্তায় পড়েটড়ে গিয়ে একটা বিপদ বাধাবে। তখন ঠিক হবে। আমাকে ভালবাসার ফল দেবে হাতে হাতে। আর যদি আসই তো ওই ব্রীজের মাথাতেই তো দাঁড়িয়ে থাকলে পার। চল।

বলে থলিটা মেয়ের হাতে দিয়ে মায়ের বাহুমূল ধরে সে বলল, চল।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ডাকল, মা!

কি রে? বলছিস কি?

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, তোমার তো বেশ জ্বর হয়েছে মা!

বুড়ী অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, জ্বর? জ্বর হতে যাবে কোন্ দুঃখে? শত্রুর জ্বর হোক।

সুবোধ ধমক দিয়ে উঠল, জ্বরে তোমার গা গসগস করছে। কাল রাত থেকেই জ্বর হয়েছে তোমার।

কাল রাত্রে তোমার গায়ে হাত দিয়ে ঠিক বুঝেছিলাম আমি।

না রে, না। ও কিছু নয়।

নাতনী আগে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে বলল, তাই ঠাকুমা আজ দুপুরে ভাত মুখে দিতে পারে নি।

ও কিছু নয়, বাড় চল্।

বিরসমুখে সুবোধ বলল, বাড়ি না গিয়ে আর যাব কোন্ চুলোয়? তবে বাড়ি না গেলেই ভাল হত। মলেই বাঁচি, হাড় জুড়োয়।

ষাট ষাট, ওসব বলিস নি। বলতে নেই। কি হল কি? তোর মন-মেজাজ আজ বেজায় খারাপ দেখছি! কি হয়েছে! আমাকে বল্।

ছেলে ফেটে পড়ল এবার। বলল, কি হল কি! তোমার কথায় পড়ে বাড়ি করলাম নিজের সাধ্যির অতিরিক্ত খরচ করে। এখন ঠেলা লেগেছে।

কি, লাগল কি? বল্ না বাবা আমাকে।

অফিস থেকে ধার করেই তো সবটা হল না। বাইরেও যে পাঁচশো টাকা ধার করেছিলাম। তাকে তো এক পয়সাও দিতে পারি নি। সেই লোক আজ অফিসে এসে শাসিয়ে গেল নালিশ করবে বলে। নালিশ করার আগে সায়েবকে বলে দেবে।

বুড়ী ফিরে দাঁড়াল। বলল, সায়েব? সায়েবের নাম-ঠিকানা দে আমাকে।

তুমি করবে কি? সায়েবের বাড়ি যাবে নাকি?

হ্যাঁ, যাব তো। দেখি সায়েবকে বলে। কে তোর কি করতে পারে দেখি।

ধমক দিয়ে উঠল সুবোধ, থাক, খুব হয়েছে। তোমাকে আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না।

সারাটা পথ আর কোন কথা বলল না সুবোধ। কেবল একবার বলল, তুমি দয়া করে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়। আমার আর যন্ত্রণা বাড়িয়ো না।

বাড়ি এসে মাকে শুতে বাধ্য করল সুবোধ। বিছানায় চুপ করে শুয়ে বুড়ী চোখ মেলে দেখতে লাগল ছেলেকে। সকাতর, জ্বরোত্তপ্ত দৃষ্টি দিয়ে সমস্তক্ষণ ছেলেকে অনুসরণ করে ফিরল। হাত-পা ধুয়ে বারান্দায় এসে চুপ করে বসেছে সুবোধ মাথা হেঁট করে।

সে আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে উঠে ছেলের কাছে গিয়ে বসে পিছন থেকে তার পিঠে হাত রাখল।

সুবোধের বিষণ্ণতা একমুহূর্তে ক্রোধে রূপান্তরিত হল। ধমক দিয়ে কর্কশ স্বরে সে বলল, আবার বিছানা থেকে উঠে এলে তুমি?

তার পিঠে হাত রেখে বুড়ী মৃদুস্বরে বলল, তোকে একটা কথা বলতে উঠে এলাম।

সুবোধ চাইল মায়ের মুখের দিকে। বুড়ী দেখল তার দুই চোখে জল চিকচিক করছে।

এক কাজ কর্ না বাবা! আমার যে পাটি হার আছে, সেও তো তোর পাঁচ-ছ ভরি হবে, সেইটে বিক্রি করে ধারটা শোধ করে দে।

সুবোধ যেন এই সাধারণ কথাটা প্রত্যাশা করে নি মায়ের কাছ থেকে। সে যেন আরও অনেক বেশী কিছু আশাব্যঞ্জক শোনবার প্রত্যাশা করেছিল। সে প্রায় ভেঙিয়ে বলল, খুব বললে যা হোক। থাকবার মধ্যে তো আছে ভরি দশেক সোনা। তা তো রেখেছি খুকীর বিয়ের জন্যে। হারটা গেলে আমি বিয়ে দোব কি করে?

বুড়ীকে চুপ করতে হল। মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে রইল সে নিরুত্তর হয়ে।

ছেলেও বসে রইল মাথা হেঁট করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লণ্ঠনের ম্লান আলোয় ঝাপসা জ্বরোত্তপ্ত দৃষ্টিতেও বুড়ী দেখতে পেল লণ্ঠনের আলোক-বৃত্তের মাঝখানে খানিকটা জায়গা ছেলের চোখের জলে ভিজে উঠল।

সে আকুল হয়ে ছেলের পিঠে হাত দিয়ে বলল, কত টাকা লাগবে বল্ তো?

জলে ভেজা মুখ তুলে আরক্ত চোখে ছেলে বলল, বললাম তো পাঁচশো টাকা।

কবে চাই?

বিচিত্র দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকাল সুবোধ। শুধু তাকিয়েই রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, দিন দশেক সময় চেয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে দিলেই হবে।

শুনে ছেলের পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ধরা গলায় বুড়ী বলল, তুই কিচ্ছু ভাবিস নি। আমি টাকা দোব তোকে। পাঁচশো টাকাই দোব। আমার জ্বরটা ছেড়ে যাক।

সুবোধের আশাহত, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মুখে একটি বিচিত্র দীপ্তি ফুটে উঠল। সে আবেগের বশে মাকে প্রণাম করে ফেলল। চোখ দিয়ে তার আবার জল গড়িয়ে পড়ল।

বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল কাঁপতে কাঁপতে। বলল, ওলো ও খুকী, একটা কাঁথা দে দেখি। জ্বরটা বুঝি চেপেই এল।

বিছানায় গিয়ে সৌদামিনী সেই যে শুল একেবারে অচেতন হয়ে গেল জ্বরে। জ্বরের ঘোরে সে আবোল-তাবোল প্রলাপ বকল। তার অধিকাংশ পুত্রবধূ বা নাতি-নাতনীরা ধরতেও পারল না। মাঝে মাঝে তারা শুনল, ছেলের নাম করে ডাকছে বুড়ী অচেতন অবস্থার মধ্যেও। আর শুনল, বুড়ী বলছে, ভাবিস নি বাবা,

ভাবিস নি। আমি ব্যবস্থা করে দেব। ভাবনা কি? সামান্য কটা টাকা, ওর জন্যে নাকি আবার ভাবতে হয়? কিচ্ছু ভাবিস নি।

বলতে বলতে আবার অর্ধস্ফুট উদ্‌ভ্রান্ত চেতনা চৈতন্য-হীনতার মধ্যে হারিয়ে গেল।

তিন দিনের দিন জরটা কমে এল তার। চেতনাও আবার প্রকাশ পেল দুর্বলভাবে। বিকেলের দিকে জরটা আরও একটু কমতেই বুড়ী অনেকটা সহজ হয়ে এল। চোখ মেলে চারিদিকে চেয়ে সে খুঁজতে লাগল সুবোধকে।

নাতনী তার চোখের দৃষ্টির অর্থ বুঝে ঠাকুমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, বাবাকে খুঁজছ ঠাকুমা? বাবা আজ দুদিন পর অফিস গিয়েছে।

বুড়ী একবার চোখ বন্ধ করে আবার চোখ খুলে বলল, কটা বাজল রে খুকী?

পাঁচটা এই বাজল। এইবার বাবা আসবে।

বুড়ী ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানার ওপর। নাতনীকে বলল, আমাকে একটু ধরে জানলার ধারে বসিয়ে দিবি?

জানলার ধারে বসে কি করবে? বাবা তো আসবে এখুনি। তুমি শোও।

খ্যাঁক করে উঠল বুড়ী, তোকে যা বলছি করবি তুই?

বুড়ীর রাগের জ্বালায় তাকে জানলায় বসিয়ে দিতে হল। জানলায় বসে সিক ধরে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। একসময় হাসিমুখে বলল, ওই আসছে আমার সুবোধ।

ঘরে ঢুকে মাকে চেতন অবস্থায় সহজ মানুষের মত জানলায় বসে থাকতে দেখে হাস্য-বিকশিত মুখে সুবোধ বলল, তুমি উঠে বসে আছ এখানে? আর এদিকে আমি অফিসে সারাক্ষণ ভেবে মরছি।

সন্ধ্যের সময় মায়ের কাছে বসে একবার সুবোধ সেই টাকার কথা তুলল।

সৌদামিনী হাসিমুখে বলল, তুই ভাবছিস কেন অমন করে? বলেছি তো জরটা ছাড়ুক, তোকে দোব আমি। সে টাকা আমার আছে একজনের কাছে।

তার নাম বল। আমি গিয়ে নিয়ে আসি।

একগাল হেসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বুড়ী বলল, তার নাম শুনে তার কাছে গেলেও সে তোকে টাকা দেবে না। আমি ছাড়া আর কাউকে দেবে না সে।

একটু চুপ করে থেকে হেসে সে আবার বলল, আমি ভাল হয়ে উঠি, তারপর তোকে পাঁচশো টাকা এনে দোব—দোব—দোব।

তিন সত্যির প্রতিশ্রুতি আর তার পালন করা হল না।

পরদিন রাত্রি প্রহর খানেকের সময় মারা গেল সৌদামিনী।

মারা যাবার আগে সজল চোখে মায়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে তার প্রায়-বধির কানের কাছে সুবোধ জোরে জোরে বলল, মা, ভগবানের নাম কর।

বলছি, বলছি। তার আগে তুই শোন, কাছে আয়।

উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির, দীপ্তিহীন দুই চোখের দৃষ্টিকে যথাসাধ্য উজ্জ্বল করে তুলে ছেলের মুখের উপর নিবদ্ধ রেখে তার মুখখানি দু হাতে ধরে সে দুর্বল অস্পষ্ট স্বরে বলল, দেখি, তোকে দেখি একবার! সেই টাকাটার কথা ভাবছিস তো? বাড়ির পিছনে কাঁঠাল গাছের পাশে যে আনারস গাছ আছে তার গোড়ায় পোঁতা আছে টাকাটা। নিস।

আর কথা বলতে পারল না। নিষ্প্রভ দুই চোখের দু পাশ দিয়ে দুটি জলের ধারা গড়িয়ে এল, হাত দুখানি তার পৃথিবীর একমাত্র বাঞ্ছিতের দেহ থেকে স্খলিত হয়ে গেল।

পরদিনই স্বামী-স্ত্রীতে মিলে একসময় আনারস গাছের গোড়া থেকে ঘটিটা খুঁড়ে তুলল। সাগ্রহে ঘটির ঢাকা খুলে তার মধ্যে পেল বিরাশিটি রুপোর টাকা আর দুটো পাতলা আংটি।

হতাশ হয়ে তার স্ত্রী বলল, কই পাঁচশো টাকা? মোটে এই!

হতাশার ছাপ পড়ল সুবোধের মুখে। সে মৃদু স্বরে বলল, মা মিথ্যে বলেছিল তাহলে!

দুজনেই হতাশ হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বুঝতে পারল না বুড়ীর জীবনের ওইটুকুই সর্বস্ব ছিল। সেই সর্বস্ব দিয়েও ছেলের প্রয়োজন মিটবে না বলেই সে ছেলের মুখে হাসি ফোটাতে মিথ্যে বলেছিল। সব দিয়েও যে তার প্রয়োজন মেটাতে পারবে না এ কথা তো সে জানত ভাল করেই।

*

কৃতঘ্ন

রামপ্রসাদ সেন

চোখ-ধাঁধানো আলোগুলো হঠাৎ গেল নিবে। অন্ধকার ঘুটঘুটে হয়ে গেল সব। চেনা রাস্তা। তবু হোঁচট লাগল পায়ে। ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ল অর্ঘ্য-নৈবেদ্যের থালি। আর্তনাদ করে ছুটতে আরম্ভ করল মতি ভট্‌চাজ্জি। কে যেন তাকে তাড়া করেছে পিছন থেকে। এ কি, তার নামাবলী! তার গীতা! থমকে দাঁড়াতেই পুরোহিতের পট্টবস্ত্র কে নিল ছিনিয়ে, পৈতে দিল ছিঁড়ে। ত্রস্ত, বিবস্ত্র মতিলাল দু হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে পড়ল বসে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার। ভয়ে দেবতার নাম পর্যন্ত গেছে ভুলে। থপথপ করে কে যেন এগিয়ে এল তার দিকে। এক হেঁচকায় মুখ থেকে হাত দুটো দিল নামিয়ে। অন্ধকারে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মতিলাল। মনে হল প্রাগৈতিহাসিক যুগের বীভৎস একটা জন্তুর কবলে পড়েছে যে। প্রকাণ্ড থাবার মত একটা হাত স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে আসছে তার গলার দিকে। মোটা মোটা বোঁটার মত সব আঙুল। পাঞ্জা থেকে সবে যেন গজাতে শুরু করেছে। কিংবা কুষ্ঠরোগীর আঙুলের মত গলতে গলতে এমন খাটো হয়ে গেছে। অদ্ভুত জীব! আঙুলের গোড়ায় রয়েছে তার একটা চোখ। টকটক করছে লাল। না না, মস্ত একটা চুনীর আংটি বুঝি! আশ্চর্য! কবজিতে আবার ঝকমক করছে আধুনিক কালের একটা ঘড়ি! থাবার মত হাতটা বাগিয়ে ধরল তার গলা। বার দুই ঝাঁকানি দিয়ে মোচড় দিতে শুরু করল। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল তার। বুঝল দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। নইলে প্রাগৈতিহাসিক আর পারমাণবিক যুগের পার্থক্য ঘুচল কেমন করে!

থাবার অধিকারী গর্জে উঠল: আমার টাকা? আমার টাকা চাই। এক্ষুনি চাই আমার টাকা। আমার টাকা মেরে ভাবছ গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে? জাহান্নাম থেকেও টেনে নিয়ে আসব না! আনলাম তো আজ ধরে! বার কর আমার টাকা। আশকারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছ! আজ গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেব তোমার। এইখানে পুঁতে ফেলব মাটিতে। জগৎ থেকে মতি-ঠাকুরের নাম চিরদিনের জন্যে দেব ঘুচিয়ে। অংবং আউড়ে তাক লাগাবার দিন চলে গেছে। বার কর আমার টাকা।

আর কোনও সন্দেহ রইল না মতিলালের মনে। এ স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। নইলে টাকা দাবি করে চোখ রাঙাতে হুণ্ডি হাতে মারোয়াড়ী বা ডাণ্ডা হাতে কাবুলীও কোনদিন সাহস করে নি তাকে। কারণ প্রাণের ভয় আর মানের ভয় দুটোকেই চিরদিন সে ছুঁড়ে মেরেছে পাওনাদারদের মুখের ওপর। আজ স্বপ্ন বলেই না সে এমনি জবুথবু হয়ে গেছে! পুরোহিত বংশে জন্মগ্রহণ করলেও বাস্তবক্ষেত্রে সে চিরদিন বিচরণ করে এসেছে পরশুরামের মত। দেখেছে, ধনপতি কুবেরও ক্ষত্রিয় শৌর্যকে খাতির করে চলেন। আজ সে ধরা পড়েছে স্বপ্নকুহকের মাঝে অর্ঘ্যের ডালি হাতে। বর্ম-কুঠার বর্জন করে সে চলেছিল কুলধর্ম পালন করতে। সাত্ত্বিক ভাবাচ্ছন্ন ছিল তার মন। ভাগবত পাঠ করতে যাচ্ছিল সে। মাঝপথে হঠাৎ দুঃস্বপ্ন উঠল ঘুলিয়ে। বিবেকে কোথায় ছিল বুঝি একটু ফাঁক। তাই আতঙ্ক আজ স্বপ্নের সুযোগ নিয়ে ভীষণ মূর্তি ধরে তাকে ভয় দেখাতে এসেছে। জেগে উঠতে হবে তাকে। কাটিয়ে উঠতে হবে এই ভয়। মাটি থেকে ওঠবার উপক্রম করতেই অকস্মাৎ চুনীর আংটি-পরা থাবার একটি থাপ্পড়ে আতঙ্করাজ্যে পুনরায় ধপ করে বসে পড়ল মতিলাল। ভাবল, তবে দেখাই যাক স্বপ্নটা। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত পর্বগুলোই সঞ্জয়ের মত প্রত্যক্ষ করবে সে। দুঃস্বপ্নে পারম্পর্য না হয় নাইবা রইল।

অনুভব করল হাতটার মুষ্টি শিথিল হয়েছে তার কণ্ঠ থেকে। এতক্ষণে নিশ্বাস টানবার অবকাশ পেল মতিলাল। একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগল তার। শহরের আবর্জনা থেকে কুড়নো ন্যাকড়ার গন্ধ। বুঝল, এককড়ি পোদ্দার আর নোয়াদাস নন্দীর ন্যাকড়ার গুদাম এটা। বাগবাজারের গলিতে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা নবাবী আমলের ভুতুড়ে বাড়ি। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চোখ এড়িয়ে বিংশ শতাব্দীতেও টিকে আছে। সারি সারি ঘুপসি ঘর। অন্ধ-অন্ধকার করা টিনের শেড। সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাটিতে সিদ্ধ হচ্ছে রাশিরাশি মলিন ন্যাকড়া। বিরল-বাস ভীমাকৃতি ধাঙড় কুলীরা ইন্ধন যোগাচ্ছে সেই নরকাগ্নিতে। কথা কইছে ফিসফিসিয়ে। আনাচে-কানাচে ঘাপটি মেরে বসে আছে অন্ধকারে। যেন রসাতলে মহীরাবণের পুরী। নরবলি হবে বুঝি আজ। কেবল অফিস-ঘরটায় আছে ইলেকট্রিকের আলো। সারাদিনই জ্বলে। কিন্তু তাতে অন্ধকার ঘোচে না। বাড়িওলা এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী। বোধ হয় মান্ধাতার আত্মীয়। ঠাটঠমক তাঁর ছিল কি না তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তবে উপস্থিত একটি টেলিফোন ছিল তাঁর। কিন্তু সামর্থ্য ছিল না তার মাশুল যোগানোর। কয়েকদিন হল সেটা স্থানান্তরিত হয়েছে এককড়ির অফিসে। দুখানা টেবিলে মুখোমুখি বসে আছে এককড়ি আর নোয়াদাস। এককড়ির বয়স হয়েছে। নোয়াদাস যুবক। লোকসমক্ষে এককড়ি তাকে তার পার্টনার বলে পরিচয় দিলেও আসলে ফরসা জামাকাপড়-পরা কুলী ছাড়া আর সে কিছুই নয়। বুঝি তারও অধম। একবার পুলিসের হাত থেকে এককড়ি তাকে বাঁচায়। সেই থেকে সে তার অনুগত। নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে আর কিছু রাখে নি। কৃতজ্ঞতার প্রতিমূর্তি সে। মনে তার দ্বন্দ্ব নেই, বিদ্রোহ নেই। এককড়ি তার চোখে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তার ইশারায় সে ওঠে, বসে, মিয়া যায়। এককড়ির জীবনে তার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হল এই নোয়াদাস নন্দী।

অদ্ভুত এই ন্যাকড়ার কারবার। তার চেয়ে অদ্ভুত এই কারবারীরা। এরা পাঁচ টাকার মাল ধোলাই-মলাই করে বিক্রি করে পঞ্চাশ টাকায়। আবার দালালেরা যখন টাকা মেরে পালায়, তখন লোকসানও দেয় প্রচুর। তবে পুষিয়ে যায়। এই কুড়নো ন্যাকড়া থেকে তৈরি হয় সস্তা দরের নানা রকম কাগজ। কুৎসিত রোগগ্রস্ত, সমাজ-পরিত্যক্ত, গৃহহীন একাচারীরাই সাধারণতঃ পথে পথে এই ন্যাকড়া কুড়িয়ে বেড়ায়। আবার দলবদ্ধ পরিবারও আছে যারা এই কাজ করে—তারাও পথবাসী। ভারতের প্রতি শহরে আছে এই লাইনের ছোট ছোট আড়তদার। তারা সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে কেনে দেড় টাকা দু টাকা মণ। দালালেরা দর-কষাকষি করে সেগুলো নিয়ে যায় সাড়ে তিন চার টাকায়। বড় ব্যাপারীরা কেনে এই মাল। বাছাই, ধোলাই, সাফাই করে বেল বেঁধে সাপ্লাই দেয় পেপার মিলে। দশগুণ করে লাভ। এক-আধজন ভিন্ন প্রকৃতির দালাল মাঝে মাঝে টাকা মেরে পালায়। এককড়ি ও নোয়াদাসেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে এই ন্যাকড়ার মত দালালগুলোকেও ধোলাই-মলাই বেলবন্দী করতে পারলে তাদের লোকসান যাবে পুষিয়ে। ধাঙড় অনুচরেরা তাদের এই কাজে সহায়তা করে। টাকা-মেরে-পালানো দালালকে মুখে কাপড় বেঁধে যেদিন তারা তুলে নিয়ে আসে এই প্রেত-পুরীতে সেদিন পৈশাচিক উল্লাসে নেচে ওঠে দুই অংশীদারের বুক। হাত গুটিয়ে উঠোনে বেরিয়ে আসে তারা। জলন্ত ভাটির লালচে আভায় ধকধকিয়ে ওঠে তাদের চোখ। দাঙ্গা-রায়টের পাগলামি টগবগিয়ে ফুটে ওঠে তাদের শিরায় শিরায়। ভুলেই যায় তারা মানুষ!

দয়া ধর্ম মনুষ্যত্বের খোলসগুলো খুলে একে একে বিসর্জন দেয় ন্যাকড়ার ফুটন্ত ভাটির মধ্যে। তর্জন-গর্জন-আস্ফালনের পর শুরু হয় নিগ্রহ-নির্যাতন। প্রহার-জর্জরিত, মৃত্যুভীত খাতককে দিয়ে ঋণের অঙ্কের চতুর্গুণ টাকা নেওয়া হয় লিখিয়ে। এককড়ি বলে, নোয়াদাস, বড্ড গীগগির হাঁপিয়ে পড়ি আজকাল। ঘেমে গেছি। অফিসে একটা ফ্যান লাগালে কেমন হয়? বাড়িওয়ালা বুড়োর খাটের তলায় একটা টেবিল-ফ্যান দেখেছিলাম সেদিন। মুক্তেশ্বরকে বল্ না সেটা তুলে নিয়ে আসবে।

নোয়াদাস একটা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকে। বলে, দাদা, ধোলাই দেবার কাজটা এবার থেকে আমার ওপরই ছেড়ে দিন।

এককড়ি বলে, হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেও কুঞ্জ দালাল উঠোনে ঠিক চরকির মত পাক খাচ্ছিল। পেটে একটা লাথি মারতেই একবার কঁক্ করে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ওরে বিদেশী, ছুটো কোকোকোলা নিয়ে আয় তো! শোন নোয়াদাস, এমন কায়দায় ধোলাই দেবে যে এক ফোঁটা রক্ত পড়বে না। অথচ বিছানায় শুয়ে থাকবে লোকটা তিন মাস।

আরও নানা বিষয়ে উপদেশ দেয় এককাড়। নোয়াদাস তার মানসপুত্র।

এমনি করেই চলে তাদের কারবার। আজ সন্ধ্যে ছটা নাগাদ দিনের কাজ শেষ করে কুলীরা যখন হাত-পা ধুচ্ছিল, অকস্মাৎ এককড়ি আর নোয়াদাস দুই বাহু ধরে শীর্ণকায় এক বৃদ্ধকে টানতে টানতে নিয়ে এল তাদের গুদামে। উঠোনে কলের কাছে কুলীরা জিজ্ঞাসা করল, কে ধরা পড়েছে? কে?

এই গুদামে দালাল নিগ্রহ এক আমোদের ব্যাপার। বিদেশী, মঙ্গলু, বাবুয়া, নাগিনা, বাহ্বাস্ফোট করে বীরদাপে বলল, করদেঙ্গে মরাম্মৎ। লাও পাকড়কে।—সর্দার কুলী মুঙ্গেশ্বর চুপিচুপি বলল, আরে না না, এ মোতিঠাকুরকে এনেছে। আজ এক মাস হল, একশো টাকা মাল কিনবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল সে। তার পর থেকে আর আসে নি এখানে।—কুলীরা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, তা ওকে অমনভাবে টেনে আনল কেন? ও তো পণ্ডিত আদমি।—মুঙ্গেশ্বর বলল, তাইতো আমাদের কাউকে পাঠায় নি। মালিকরা নিজেরাই গিয়ে ধরে এনেছে। অফিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে খুব মারছে। ধুতি-আস্তি সব কেড়ে নিয়েছে।—কুলীরা বলল, আরে রাম রাম!—মুঙ্গেশ্বর বলল, দুজনে মিলে পিটছে ওই বুড়ো মানুষটাকে। আমি তো পালিয়ে এলাম।—নাগিনা ছিল অল্পবয়সী। বলল, ভারী মরদের কাজ করেছ। এককৌড়ির ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিতে পারলে না। আর এই নুয়াদাস— চল্ সব আপিসমে। চান্দা উঠাকে দেদেঙ্গে শ রূপেয়া।

কুলীরা খুব ভালবাসত মোতিঠাকুরকে। মোতিঠাকুর হাত দেখে তাদের ভাগ্য গণনা করে দিয়েছে, 'নৌশাদর' চুনা মিশিয়ে সর্দির দাওয়াই বানিয়ে দিয়েছে। তাদের মত মূর্খ ধাঙড়ের পাশে বসে রাম-চরিত শুনিয়েছে ছুটির দিনে। একশো টাকার জন্যে এককৌড়ি আর নুয়াদাস তাকে অপমান করবে! এক এক করে তারা অফিসের বাইরে দালানে এসে দাঁড়াল। মুঙ্গেশ্বরকে বলল, বাবুদের বল, আমরা দিয়ে দেব মোতিঠাকুরের টাকা।

মুঙ্গেশ্বর সবচাইতে পুরনো। বলল, শান্তি রাখো। দেখা যাক না কী হয়। এখন তো আর মারধোর করছে না। ধুতি ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি জল খাইয়েছি এক লোটা। এখন ওরা কি নিয়ে তর্ক করছে। কি সোনেকী দেওতা আছে মোতিঠাকুরের কাছে, সেইটে লিখে দিতে বলছে। তোমরা চুপচাপ থাক।

কুলীর দল বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। বেরিয়ে এসে নোয়াদাস একবার দেখে গেল তাদের। আনুগত্য ও তটস্থতার অভাব অনুভব করল তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে। অথচ পলাতক দালাল ধরে আনলে এদের উৎসাহের অন্ত থাকে না। দাস্য-ভাবাপন্ন নোয়াদাস এদের মন বুঝতে না পেরে বিজয়গর্বে বলল, এনেছি ধরে। হাতের সুখ করবি নাকি তোরা?

অবজ্ঞায় মাথা নেড়ে নাগিনা বলল, বড়ি বাহাদুরি কিয়া, বুড্ঢা পণ্ডিতকো পাকাড়কে লায়া—

কেমন যেন হকচকিয়ে গেল নোয়াদাস। এককড়ির কাছে শুনেছে, জগতে সবচাইতে কঠিন কাজ হল মতি-ঠাকুরকে ধরা। অথচ এই ছোকরা কুলীটা বলে কি! আর সত্যি তো, এখানে আসতে মতিঠাকুর তো কোন আপত্তি করে নি। এককড়ি নিজেই লম্ফঝম্প করছিল খালি। মতিঠাকুর তো ঋণ স্বীকার করেছে। বলছে, পাঁচ-দশ টাকা করে মাসে মাসে সে দেবে। কিন্তু এককড়ি তাকে সামনে রেখে কেবল বলছে—আমার পার্টনার টাকা চায় এক্ষুনি। কাগজে-কলমের হিসেবে সে ভাল করেই জানে, মতিঠাকুরকে যা টাকা দেওয়া হয়েছে তার বদলে পুরো মাল তারা পেয়েছে। এটা তো দালালদের হাতে রাখবার জন্যে বলা যে টাকা এখনও বাকি আছে। শুনেছে, এরা দুজন নাকি ছিল ছেলেবেলার বন্ধু। দেখেছে এককড়িকে অজস্র টাকা খরচ করতে মতিঠাকুরের জন্যে। তবে আজ এমন উলটো হাওয়া বইল কেন! নোয়াদাস রুক্ষীণ মনে আজ প্রথম

প্রশ্নের অঙ্কুর জাগল। সত্যিই তো, একশো টাকার জন্যে মতিঠাকুরকে এভাবে ধরে এনে অপমান করার কোন মানে সে খুঁজে পেল না। বুড়ো মানুষের গায়ে সেইবা কেন হাত দিতে গেল! ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত লোক। তবে শুনেছে, লোকটা মাতাল, চরিত্রহীন। অথচ নামকরা কথক। কী করে এমন হয়? মাতাল অথচ পণ্ডিত! নাঃ, তার বুদ্ধিতে এসব কুলোয় না। এককড়ি যা করছে ঠিকই করছে। চিন্তিতমুখে অফিস-ঘরে ফিরে গেল নোয়াদাস নন্দী।

মতিলাল বলল, আমি তো ঋণ স্বীকার করে তোমাদের চিঠি দিয়েছিলাম। পাও নি সে চিঠি?

গর্জে উঠে এককড়ি বলল, ওসব চিঠিফিটি বুঝি না, আমার পার্টনার টাকা চায়। ও তোমার নামে ডাইরী করে এসেছে। এখনি থানায় নিয়ে গিয়ে 'কাচুয়া ধোলাই' দেওয়াবে। ওকে তো চেন? ও আমার খাতির রাখে না।

নোয়াদাসের ভাই গদাইও সেখানে কাজ করে। এককড়ি হুকুম দিল, এই গদা, মতির চিঠিটা বার কর্। আর একখানা রেভিনিউ স্ট্যাম্প।—তারপর মাতলালের দিকে চেয়ে বলল, এদিকে এস। লেখ, চারশো টাকা আমাদের কাছ থেকে মাল কেনবার জন্যে নিয়েছ। সই কর। আজ থেকে এক মাস আগের তারিখ দাও।

বাগবাজারের গুদামে, দালাল-নিগ্রহ নাটকের সাধারণতঃ এইটেই হল শেষ দৃশ্য। থানা-পুলিস এরা এড়িয়েই চলে। উপসংহারে নোয়াদাস ডাকে, দাদা, একবার শুনুন।

দুজনে বেরিয়ে যায় বাইরের দালানে। ফিরে এসে দালালকে বলে, যদি মাল সাপ্লাই দাও ঠিকভাবে, আমরা এবারের মত ছেড়ে দেব তোমাকে। এই রইল তোমার সই-করা রসিদ আমাদের ফাইলে। সাত দিনের ভেতর মাল চাই। নইলে গুদামের মাটির নীচে ওই অন্ধকার ঘরখানা দেখেছ তো? ওইখানে জমা হবে তোমার মত চিটিংবাজের হাড্ডি।

মানুষের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করে এরা আত্মতৃপ্তি লাভ করে। তারপর কোকোকোলা খাওয়ার পালা।

যথারীতি আজও নোয়াদাস ডাকল, দাদা, শুনুন।

দুজনে বেরিয়ে এল অফিসের বাইরে। দেখল কুলীরা জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে দালানে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন পার হয়ে তারা প্রাচীরের ধারে এসে দাঁড়াল।

সিগারেট ধরিয়ে এককড়ি জিজ্ঞাসা করল, কী বলছ?—অন্যমনস্ক তার ভাব।

নোয়াদাস বলল, কিছুই না। আপনার বাঁধা নিয়ম পালন করছি। প্রহার, সই-দস্তখত সবই তো হল। এবার ছেড়ে দিন বুড়োকে। কুলীরা সব কানাকানি করছে।

রুক্ষকণ্ঠে এককড়ি বলল, কুলীদের ভয়ে গুদামের নিয়ম পালটাতে হবে নাকি? কে? কী বলছে? তার নাম বল। জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব না তার।

নোয়াদাস বলল, আপনার হেড কুলী—

গর্জন করে এককড়ি বলল, কে—মুঙ্গেশ্বর?

নোয়াদাস বলল, না। নোয়াদাস নন্দী।

চরম বিস্ময়ে তোতলা হয়ে উঠল এককড়ি, বলল, ব-ব-ব-ব-বব বল কী নোয়াদাস! তুমি?

নোয়াদাস বলল, হ্যাঁ। আচ্ছা দাদা, পারতাম কি আমরা পাঁচ বছর আগের মতিঠাকুরকে গুদামে ধরে এনে এইভাবে অপমান করতে? আপনাকে, আমাকে আর এই বারোজন ধাঙড়কে ও কি ফালি ফালি করে ছিঁড়ে ফেলে দিত না এই ন্যাকড়াগুলোর মত? আজ তো আমরা একটা মরা মানুষের ওপর তম্বি করছি দাদা।

এককড়ির মনে হল মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে বুঝি সমস্ত পৃথিবী। নইলে তার কেনা গোলাম মুখের ওপর চোপরা করে! গর্জে উঠল এককড়ি: নোয়াদাস, যেদিন জেল থেকে বাঁচিয়ে ছিলাম, সেদিনের কথা মনে আছে কি?

ধীর কণ্ঠে নোয়াদাস বলল, আছে দাদা! আমি নেমকহারাম নই।

এককড়ি বলল, তবে ওরকম উলটো-পালটা কথা বলছ কেন? গুদামসুদ্ধ লোকের আজ যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে! দয়া হচ্ছে বুঝি মতিলালকে দেখে? জান কি, কতবড় ভয়ঙ্কর লোক ও! কত ক্ষতি করেছে আমার! নোয়াদাস, ওর সঙ্গে আমার অনেক কালের

হিসেব-নিকেশ বাকি আছে। ওর দেমাকের হিসেব, ওর—

কথা খুঁজে পেল না এককড়ি। খানিক থেমে বলল, ওর আস্পর্ধার হিসেব। কালকেউটের বাচ্চা ও। পণ্ডিতের ছেলে। তোমরা জান না, আমি দেখেছি ওর চক্কর-তোলা ফণা! ওর গর্জন! ওর ফোঁস-ফোঁসানি! আজ বিষদাঁত ভাঙা অবস্থায় হাতে পেয়েছি। তুমি কি মনে কর ছেড়ে দেব ওকে?

নোয়াদাস বলল, পুরনো হিসেবের কথা ঠিক ধরতে পারলাম না দাদা। আপনার বাল্যবন্ধুর হিসেবে আমাকে আর জড়াবেন না।

হেসে এককড়ি বলল, তোমায় আর কিছু করতে হবে না। শুধু চুপচাপ বসে দেখবে, মতিলাল কেমন করে আমার পা জড়িয়ে ধরে। তুমি এক কাজ কর, গলির মোড় থেকে প্রাণকেষ্ট উকিলকে একবার চট করে ডেকে নিয়ে এস। এতে তো কোন আপত্তি নেই? আমি এখানে অপেক্ষা করছি। উকিল এলে একসঙ্গে সকলে অফিস-ঘরে যাব। মতিলালকে চেন না বলেই ওকে দেখে তোমার আজ দয়া হচ্ছে। আমার মত ছেলেবেলা থেকে যদি ওকে জানতে, তাহলে বোকার মত আমার মুখের ওপর অমন করে কথা বলতে না। না জেনে তুমি যা বলেছ, তার জন্যে আমি রাগ করি নি তোমার ওপর। যাও।

দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে লাগল এককড়ি। অতীতের কয়েকটা ঘটনা ঝিলিক মেরে গেল তার মনে।

এক পাড়াতেই ছিল তাদের বাস। কিছুদিন এক স্কুলেও পড়েছিল দুজনে। এগোয় নি তার পড়া। কারবারে নামতে হয়েছিল। মতি পড়েছিল কলেজ পর্যন্ত। ঘোষেদের বাড়ির প্রতিমাকে ভাল লেগেছিল এককড়ির। উপহার দিত তাকে লুকিয়ে। তা সত্ত্বেও একদিন তার মুখে শুনল—কী ব্যাঙের মত থপথপ করে হাঁটো! মতিদার মত স্মার্টলী চলাফেরা করতে পার না! মতিদা কী সুন্দর গান গায় বল তো! ওর কথকতা শুনলে চোখে জল রাখা যায় না।

আরও কী সব বলেছিল। কৈশোর থেকে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত মতিলাল বারে বারে অপদস্থ করেছে তাকে। উৎসবে, ব্যসনে, রাজদ্বারে, শ্মশানে এককড়ির ব্যক্তিত্বকে ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছে চিরদিন। দুটো গান গেয়ে, হাত গুনে, কথকতা শুনিয়ে নিজেকে মস্ত গুণী বলে জাহির করত সে। বেকার আর সমাজের ফালতু লোকগুলোর কাছে পেত সম্মান। একদিন তার স্ত্রী বলল, ওগো, মস্ত গণৎকার আমাদের এই মতিঠাকুর। বিয়ের সময় আমার হাত দেখে যা-যা বলেছিলেন, সমস্ত মিলে গেছে। উনি তোমার ছেলেবেলার বন্ধু না? নিয়ে এস না একদিন বাড়িতে—ভাগবত পাঠ করবেন।

বড় ছেলে বাদল বলল, বাবা, মতিকাকার ছবি বেরিয়েছে 'যুগলিপি' কাগজে—বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কথক বলে।

পুতুল খেলতে খেলতে ছোট মেয়ে মলিনা বলল, তোমার ছবি কেন বেরোয় না বাবা?

দুষ্টগ্রহের মত মতিলাল আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার জীবন। ভেবেছিল, 'যুগলিপি' অফিসে লিখে পাঠাবে যে, যার ছবি আপনারা ছেপেছেন, সে একজন মাতাল, বদমাশ, জোচ্চোর। অথচ কী টাকাটাই না সে খরচ করেছে এই মতিলালের জন্যে। আজকের ভসর-নামাবলী পর্যন্ত তারই টাকায় কেনা। তবু এতটুকু কৃতজ্ঞতার নামগন্ধ নেই তার মধ্যে। আধখানা সিগারেট মাটিতে ফেলে, জুতো দিয়ে পিষে, আবার একটা ধরাল এককড়ি। সার্কাসের খেলোয়াড়ের মত সারাজীবন কী কেরামতিটাই না দেখালে এই মতিলাল! আজ বুড়ো বয়সে ক্লাউনের সাজে ফসকেছে তার হাত!

এককড়ির চোখের সামনে সার্কাসের দৃশ্য উঠল ভেসে:

কালো পোশাকপরা ম্যানেজার এসে বলল, দুঃখিত। খেলোয়াড় নেই, ট্রাপিজের খেলা আজ বন্ধ। মদের বোতল বগলে টলতে টলতে এল ক্লাউন। তীক্ষ্ণ, অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, আমি দেখাব খেলা। অমনি বন্ধ হল ব্যাণ্ডের উল্লাস বাদ্য। নিষ্প্রভ হল প্রকাণ্ড তাঁবুর আলোকসজ্জা। কেবল ঢাকটা বাজতে লাগল—গুরু-গুরু-গুরু-গুরু। বাঁ হাত ঘুরিয়ে নিজের পিঠ নিজে চাপড়ে, পা উপরে মাথা নীচু করে দড়ি ধরে ট্রাপিজে উঠল ক্লাউন। ঘাড় উঁচু করল দর্শকেরা। দোল খেতে লাগল

আর খেতে লাগল মদ। তার অঙ্গভঙ্গী দেখে উচ্চহাস্য করে উঠল সকলে। নকল গলায় ক্লাউন বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও, এখনও তো খেলা শুরুই করি নি। নীচের মেট-কুলীদের ইঙ্গিতে বলল, দূরের খালি ট্র্যাপিজটায় কপিকল টেনে দোল দিতে। তারা টানল বটে দড়ি, কিন্তু ট্র্যাপিজে লোক না থাকায় এলোমেলো ভাবে পাক খেয়ে দুলতে লাগল সেটা। সেই দোদুল্যমান অনিশ্চিত আশ্রয় লক্ষ্য করে, এক হাতে মদের বোতল বাগিয়ে অন্য হাতটা বাড়িয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিল ক্লাউন। নীচে জাল ছিল না পাতা। গেল গেল রব উঠল চতুর্দিকে। চোখ বুজল দর্শকেরা। কেবল বক্সের সীটে বসে কটমট করে চেয়ে রইল এককড়ি। সে দেখতে চায় এই উদ্ধত ক্লাউনটার পতন। দ্বিতীয় ট্র্যাপিজটা ঝুলছে তারই মাথার ওপর—ক্লাউন পারবে না এটা ধরতে। 'এরিনা'র রেলিঙে পড়ে হাড়গোড় যাবে ওর ভেঙে। হবে সকল দম্ভের অবসান। কী রোগা টিংটিঙে লোকটার দেহ! এককড়ি বলশালী। দাঁড়িয়ে উঠে সহজেই লুফে নিতে পারে লোকটাকে। তার নিজের হয়তো একটু আঘাত লাগতে পারে। কিন্তু হাত-ফসকানো হতভাগা একটা খেলোয়াড়ের প্রাণ রক্ষার জন্যে তার নাম কি ছড়িয়ে পড়বে না চতুর্দিকে! চেয়ার ছেড়ে উঠবে কি না এই দ্বিধায় বুঝি এক পলক সময় লেগেছে তার। হঠাৎ দ্রুততালে বেজে উঠল ব্যাণ্ডের বাজনা। তাঁবুর সমস্ত আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল জলে। দর্শকের হর্ষধ্বনিতে চমক ভাঙল এককড়ির। ঘাড় উঁচু করল সে। দেখল, অন্য ট্র্যাপিজের ওপর নিশ্চিন্ত মনে বসে দোল খাচ্ছে ক্লাউন। হঠাৎ তার হাত ফসকে প্লাস্টিকের হালকা মদের বোতলটা পড়ল এসে এককড়ির কপালে। চোট সামান্যই তবু রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে ফেলল এককড়ি। হেসে উঠল হাজার হাজার দর্শক।

দালান থেকে চেঁচিয়ে নোয়াদাস বলল, দাদা, প্রাণকেষ্টবাবু এসেছেন।

আঘাতের জায়গাটায় একবার হাত বুলিয়ে, আসর পার হয়ে অফিসে এল এককড়ি। প্ল্যান তার আগে থেকেই তৈরি ছিল। উকিলকে বলল, মতিঠাকুর আমাদের একটা দানপত্র লিখে দেবেন, তাই আপনাকে ডেকেছি। উনি ওঁর সোনার বিগ্রহ আমাদের দান করতে চান।

প্রাণকেষ্ট বলল, এ তো অতি উত্তম কথা। আমি এক্ষুনি 'ডিড' তৈরি করে দিচ্ছি।

নির্যাতন-নিপীড়নের গ্লানি ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠেছিল মতিলাল। ভেবেছিল, ন্যাকড়ার কারবারী এককড়ি পোদ্দারের শক্তির বুঝি এইখানেই শেষ। বিগ্রহের উল্লেখে বুঝল, এককড়ি এবার দশমুণ্ড রাবণ সেজে শক্তিশেল হানতে চায় তার বুকে। পুরুষানুক্রমে এই বিগ্রহ পূজিত হয়েছে তার গৃহে। কেবল তার আমলেই ঘটেছে ব্যতিক্রম। পিতা শশীকান্তর মৃত্যুর পর সে বুঝেছিল যে এই সোনার মূর্তি নিজের কাছে রাখা আর নিরাপদ নয়। মদ্য ও ব্যসনে তার আসক্তি। কুলধর্ম পালন একরকম ছেড়েই দিয়েছে। এককড়ির সঙ্গে ন্যাকড়ার কারবারে লেগে গিয়েছিল সে। তাই একদিন ভোরে উঠে সিংহাসনসুদ্ধ স্বর্ণমূর্তি তার পিতার যজমান, বাংলার ধনিকশ্রেষ্ঠ রণজিৎ চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে রেখে এসেছিল। তিনি বলেছিলেন, সুবুদ্ধি জাগলে আবার নিয়ে যেয়ো। পুত্র অভিজিৎকে ডেকে বললেন, ভট্‌চাজ্জি মশায়ের কুলদেবতা আমার কাছে রেখে যাচ্ছেন তাঁর ছেলে। যেদিন চাইতে আসবেন ফিরিয়ে দিয়ো এঁকে। অভিজিৎ পছন্দ করত না মতিলালকে। অযোগ্যের প্রতি পিতার উদার ব্যবহার মনঃপূত হত না তার। জিজ্ঞাসা করেছিল—মাতাল অবস্থায় যদি কোনও দিন এসে ইনি বিগ্রহ ফেরত চান? রণজিৎ চৌধুরী বলেছিলেন—দেবে না তাহলে। তারপর বহুদিন হল মারা গেছেন রণজিৎ চৌধুরী।

নিরস গলায় এককড়ি বলল, ডিডটা সই করার পর তোমায় একটা চিঠি লিখতে হবে অভিজিৎ চৌধুরীর কাছে। লিখবে যে তুমি অসুস্থ, শয্যাশায়ী; এককড়ি পোদ্দারকে পাঠাচ্ছ—তার হাতে তিনি যেন তোমার সোনার বিগ্রহ সমর্পণ করেন। আমি গিয়ে নিয়ে আসব সেই বিগ্রহ। নোয়াদাস বলছে, [illegible] তুমি এখানে বদ্ধ থাকবে। ভয় নেই। [illegible] তার লেখা [illegible] তোমাকে আলগা দেব। [illegible]

টাকা। সে টাকায় তুমি মদই খাও আর কারবারই কর, আমরা কিছু বলতে যাব না। তা ছাড়া পণ্ডিত মানুষ তুমি, যাকে বলে লারনেড ম্যান। আমাদের মত মুখ্যুসুখ্যু লোকের কাছে ঋণী হয়েই বা থাকবে কেন?

নোয়াদাস একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল মতিঠাকুরকে। দেখল, ঠোঁট কাঁপছে তার। ঘোর আতঙ্কে সে চেয়ে আছে এককড়ির মুখের দিকে। প্রহারের সময়ও এতখানি বেসামাল সে হয় নি। খুব আস্তে বলল, এককড়ি, আমায় একবার টেলিফোন করতে দেবে অভিজিৎ চৌধুরীকে? দেখি স্বর্ণবিগ্রহ যদি এক্ষুনি আনিয়ে নিতে পারি।

এক পলকের জন্যে একটু দ্বিধা, একটু সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল এককড়ির মনে। ধূর্ত ব্রাহ্মণ কোনও ফন্দি আঁটছে না তো তার ফাঁদ কেটে পালাবার! কিন্তু মতিলালের কণ্ঠস্বর যে কান্নার চেয়ে করুণ! একটু থেমে বলল, বেশ। টেলিফোন কর। দরকার হলে আমিও কথা বলব।

ডায়েল ঘুরিয়ে নম্বর মিলিয়ে সুস্পষ্ট কণ্ঠে মতিলাল বলল: অভিজিৎ বাবু? আমি মতিলাল ভট্টাচার্য কথা বলছি, বাগবাজারের ন্যাকড়ার গুদাম থেকে। আজ চরম সংকট উপস্থিত হয়েছে আমার জীবনে। কুড়নো ন্যাকড়ার কারবারী শ্রীএককড়ি পোদ্দারের কাছ থেকে একশো টাকা নিয়েছিলাম তাঁকে ন্যাকড়া কিনে দেব বলে। মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছি সে টাকা। তারপর লুকিয়ে ছিলাম ভয়ে। আজ এঁরা আমায় ধরে এনেছেন গুদামে। আমার পূর্বপুরুষ-পূজিত স্বর্ণবিগ্রহের কথা ইনি জানেন। এও জানেন, সেটা আপনার কাছে গচ্ছিত আছে। ঋণ শোধ হিসাবে সেই দেবমূর্তি দাবি করছেন এককড়ি পোদ্দার। উকিল মজুত, ডিড তৈরি। সই করবার আগে এঁরা অনুমতি দিয়েছেন আপনার সঙ্গে একবার কথা বলার। আতঙ্ক আমায় গ্রাস করেছে। মুক্তির কোন উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি না।

সহানুভূতি-ভরা কোমল কণ্ঠস্বর কানে এল মতিলালের। ভটচাজ্জি মশাই, আপনার এককড়িবাবুকে একবার টেলিফোনে ডাকুন।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা। এতগুলো লোক থাকা সত্ত্বেও নিস্তব্ধতায় যেন নিশ্বাস বন্ধ করে আছে সমস্ত গুদামটা। *অভিজিৎ চৌধুরীর জলদগম্ভীর কণ্ঠ টেলিফোন-যন্ত্র বিধ্বনিত করে সকলের কানেই পৌঁছল: মতিলাল* ভট্টাচার্য চৌধুরী বাড়ির কুলপুরোহিতের পুত্র। তা ছাড়া উনি গুণী লোক। আমি পরিশোধ করব ওঁর ঋণ। ওঁকে এখনি ছেড়ে দিন। ওঁকে আটকে রেখে ভাল কাজ করেন নি আপনারা। ওঁর অপরাধের চেয়ে আপনাদের অপরাধের গুরুত্ব আইনের চোখে ঢের বেশী। টাকা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ছেড়ে দিন ওঁকে। এক্ষুনি।

বন্ধ হল টেলিফোন।

কারও দিকে না তাকিয়ে, মুখ নীচু করে আস্তে আস্তে এককড়ি বলল, অভিজিৎ চৌধুরী মতিলালের টাকা মিটিয়ে দেবেন বললেন। ওকে ছেড়ে দাও নোয়াদাস।

উঠে দাঁড়িয়ে, বুড়ো বঙ্কু দালালের দাড়ি ধরে আদর করে মতিলাল বলল, বঙ্কুবাবু, শেষ পর্যন্ত আমার যজমানই আমার মর্যাদা রক্ষা করল।—নোয়াদাসকে বলল, উন্নতি হোক তোমাদের কারবারের। আমি যাচ্ছি। নমস্কার।

এককড়ির দিকে আর তাকাল না ফিরে মতিলাল।

মতিলাল চলে যাওয়ার পর কোন আলোচনাই হল না তাদের মধ্যে। অস্বস্তিকর হয়ে উঠল নীরবতা। প্রাণকেষ্ট আর বঙ্কু বিদায় নিয়ে চলে গেল। কুলীরা গেল নিজের নিজের কোটরে। বসে রইল এককড়ি আর নোয়াদাস।

নোয়াদাস বলল, সাড়ে নটা বাজে, এবার উঠুন দাদা। মহাষ্টমী আজ, একবার ঠাকুর দেখতে বেরুবেন না?

চমকে উঠে এককড়ি বলল, কোন্ ঠাকুর? মতিঠাকুর! অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম লোকটা। একশো টাকা কি আমি ওকে ছেড়ে দিতাম না আজ? দিই নি কি আমি ওকে টাকা? মর্যাদা দিই নি আমি ওকে? আমার মত সম্মান পৃথিবীতে আর কে ওকে দিয়েছে? কোত্থেকে গজিয়ে উঠল এই অভিজিৎ চৌধুরী?

কণ্ঠস্বর বিকৃত হল তার। ঢোক গিলে থেমে গেল এককড়ি। টেবিলের কাগজগুলো গুছিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে চোখ মুছে বলল, চল নোয়াদাস, রাত হয়েছে

দেহের ভাষা যখন গান হয়ে ওঠে

জগদীশ ভট্টাচার্য

দেহের ভাষা যখন গান হয়ে ওঠে,
তোমার জীবনের সেই অপূর্ব লগ্নে
আমি ছিলুম তোমার স্বপ্নকামনার সাথী।
তোমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলুম সোনার রাখী,
রচনা করেছিলুম
বাসনা-সুবাসিত সুখের নীড়॥

কবির কণ্ঠ মিলেছিল আমাদের কণ্ঠে ;
বলেছিলুম :
যুগলের জীবনযজ্ঞে প্রিয়মিত্র তুমি,
একব্রতা,
প্রাণের চেয়েও আপন ;
জননী-জায়া-ভগিনী-কন্যা
একাধারে তুমিই সব ;
তোমাকে চেয়ে আর কিছু নেই চাওয়ার ;
জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন তুমি ;
তুমিই জীবন॥

তারপর দুজনে পেরিয়ে এলুম দীর্ঘপথ
দুর্জয় আনন্দে,
দুঃসহ বেদনায়।
সখ্যে, বাৎসল্যে, মধুরে
তোমার জীবনের গান
বেজেছে নানা ভাষায়
নানা রাগিণীতে।
কখনো তুমি শিবানী :
প্রিয়প্রীতিকামনায় নিঃশেষে আত্মনিবেদিতা।
কখনো তুমি রুদ্রাণী :
দাক্ষিণ্যহীনা ভয়ংকরী মহাশক্তি॥

কখনো যুগলের সুখের নীড়ে
এসেছে জড়দানবের প্রলয়-ঝড়,—
ভেঙে দিয়েছে তিলে-তিলে গড়া প্রাণের আশ্রয়।
কখনো অমিতাচারী কামনাবন্যায়
ভেসে গিয়েছে হৃদয়ের মূলধন।
আবার যখন
ঝড় গিয়েছে শূন্যে মিলিয়ে,
বন্যাস্রোত গিয়েছে থেমে ;
তখন নূতন হয়ে দেখা দিয়েছে
আমাদের ছোট্ট নীড়টুকু—
শিশুর কাকলিতে কলধ্বনিময় ;
প্রকৃতি-পুরুষের মিলিত সাধনায়
সর্ববিঘ্নসহা, সর্বদুঃখহরা॥

আজ আমরা এসেছি জীবনের প্রৌঢ় প্রহরে।
তরুণ প্রাণের পূর্বরাগ
বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগের
বিচিত্র পথ পেরিয়ে
আজ হৃদয়ের গভীরে
স্তিমিত, প্রশান্ত।
আশ্লেষ-অবকাশে
বিশ্লেষ-ধিয়ার্তি নিয়েছে নূতন রূপ।
উৎকর্ণ শ্রুতিমূলে ঘনঘন বাজছে
মহাকালের অমোঘ আহ্বান—
'হে মর্তের জীব,
মৃত্যুর হাতে সমর্পণ কর
জীবনের শেষ সম্বল।
প্রিয়হাতে খুলে দাও প্রেমের রাখী।'
মর্ত থেকে বিদায় নেবার লগ্ন কি আসন্ন হল?
হৃদয়ের বিলাপচারী আর্তনাদ
শুনতে পাই মর্মন্তুদ বেদনায়:
'যাব না,
কিছুতেই যাব না।'
হায়!
তবু যেতে হবে।
তবু যেতে দিতে হবে॥

আমার ডাক যদি আসে তোমার আগে।
নিষ্ঠুর সেই শেষ-বিদায়ের লগ্নে
তুমি বলবে,...
কী বলবে তুমিই জানো।
তোমার ভাষা
চিরদিনই আমার ভাষার অগম পারে,
অজানা ব্যঞ্জনায় নিয়ত স্পন্দমান॥

তোমার ডাক যদি আসে আমার আগে।
অশ্রুক্ষরা সেই বিচ্ছেদকে
ভরিয়ে তুলব পুনর্মিলনের প্রত্যাশায়।
তোমার গলায় পরিয়ে দেব নবমিলনের মালা।
বলব:
মর্তসীমানার অতীতে
আবার হবে দেখা।
মহাকালের নাগালের বাইরে
আবার মিলিত হব আমরা॥

সেদিন গ্রহান্তরের কবোষ্ণ নীড়ে
তোমার দেহের ভাষা নূতন গান হয়ে উঠবে॥

১৯ ডিসেম্বর
১৯৬২

মহা-ভারত

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

হানো অস্ত্র, আনো শক্তি হৃদয়ে দুর্বার
প্রতিষ্ঠিত কর পুনঃ নিজ অধিকার।
স্বাধীনতা লভ্য নহে সঙ্কীর্ণ প্রাণের—
শ্রম দাও, অর্থ দাও, ধারা শোণিতের।

সীমান্তে বাজিল ডঙ্কা, রণের হুঙ্কার—
হিমালয় গিরিশ্রেণী করে অধিকার
উদ্ধত চৈনিক সেনা, করাল নিষ্ঠুর,
বিশ্বাসঘাতক সে যে সর্পসম ক্রূর—
ছলনার থাবা পাতি কুটিল ড্রাগন
সার্বভৌম ভারতেরে করে আক্রমণ!

বিশ্বপ্রেমে স্থিতি যার—শান্তির আলয়
গণতন্ত্রে রূপায়িত ভারতের জয়
গাহে যবে বিশ্ববাসী, সহে না যে প্রাণে—
দুষ্ট প্রতিবেশী চিত্ত কিছু নাহি মানে।
'ভাই' বলে কোল দেয় ভারত নবীন—
প্রতিদানে অস্ত্র হানে দস্যু লাল-চীন।
প্রচারের চক্রজালে কূট ছল পাতি
শিয়রে আঘাত হানে নৃশংস অরাতি।

ছিন্ন কর যত তার যুক্তির কুয়াশা—
চূর্ণ কর স্পর্ধিতের অন্তিম দুরাশা;
দ্বাদশ সূর্যের মত জলে ওঠ আজ,—
দেবতাত্মা হিমালয়—নগ-অধিরাজ
যুগ হতে যুগান্তরে ডাক দিয়ে কয়,
এস বীর, এস পুত্র, হোক তব জয়।
চিরস্থির ধ্রুব আমি অতন্দ্র প্রহরী
চিরকাল ভারতেরে আছি বুকে ধরি।

শত্রুরে শমনালয়ে পাঠাও জোয়ান,
দানবের উৎসাদনে হও আগুয়ান।
কাপুরুষ নও তুমি, জানে তা জগৎ,
তোমার জীবনবেদ অনেক মহৎ।
অপরাধী জনে ক্ষমা সে নহে বিচার—
'শঠে শাঠ্য' নীতি-কথা করিতে প্রচার
তত্ত্বকথা দূরে রাখি অস্ত্র হাতে নাও,
ভারত-গৌরব যদি রাখিবারে চাও।

আবার উদিত হবে মারাঠী শিবাজী,
প্রতাপসিংহ রাণা জাগিবেরে আজি;
বীরেন্দ্র শশাঙ্ক আর পঞ্জাবকেশরী
রণজিৎসিংহ আদি নব রূপ ধরি।
আবার উঠিবে জেগে রাণী লক্ষ্মীবাঈ,
ভগিনী জননী জায়া জাগিবে সবাই;
ঝঙ্কিত অসিমুখে জ্বলিবে অনল—
প্রাণযজ্ঞে প্রস্ফুটিবে রক্ত-শতদল।

রবে না ভারতভূমি শত্রুর কবলে—
নও জওয়ানেরা তাই আসে দলে দলে।
শুনিয়াছে অন্তরের অলঙ্ঘ্য আদেশ,
শেষবিন্দু রক্ত দিয়ে রক্ষিবে স্বদেশ।
শান্তি ও যুদ্ধের মাঝে দ্বন্দ্বের ছায়ায়
নিখিল জগৎ আজি আছে প্রতীক্ষায়।

ধর্ম যেথা জয় সেথা—সেই সত্য হয়,
ছলনা, হিংসার পথে নিত্য পরাজয়।
শক্তির সাধক সেই ধর্মের ভারত
অচিরে রচিবে নব সে মহা-ভারত!

—

আমাদের সঙ্কল্প

"সংগ্রাম যত কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন আক্রমণকারীদের ভারতের পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত করা সম্পর্কে ভারতীয় জনগণের দৃঢ় সংকল্প, এই সংসদ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পূর্ণ সমর্থন করছে।"

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে
সংসদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব থেকে

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ্‌স্ পাস্ট [দুই]

"I wrote once that I would sooner be bored by Proust than amused by any other writer; but I am prepared now to admit that its various parts are of unequal merit."

—সমারসেট মম্।

অযুতবিযুত বৎসরের সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে কর্তব্যে অনলস অবিরত বঞ্চনায় বিক্ষুব্ধ, আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত, লুব্ধক্ষুব্ধ মাংসগন্ধে মুগ্ধ মানুষের পায়ের তলায় দলিত দুঃসহ যন্ত্রণায় বারবার বিস্ফারিত হৃদয়, আবার প্রেমে পুনর্জীবিত এই পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশ্ববিহীন বিজনে বসে অন্ধকারের জপের মালায় জীবনের প্রভাত-কৈশোর-যৌবনের ফেলে-আসা দিনের ধ্যান করেছেন প্রুস্ত নিরন্তর। 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ্ স্ পাস্ট' অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত ঐশ্বর্যের অঙ্গে অনুভূতির অপরূপ রূপরাগ। সব মহৎ উপন্যাসই আসলে কনফেশান ছাড়া কিছু নয়। প্রুস্তের নিজের আনন্দবেদনা জিজ্ঞাসার জবাব তাঁর দীর্ঘ, দীপ্ত, গভীর, গহন, দুস্তর, দুঃসাধ্য, দুর্বোধ্য, উচ্ছল, উজ্জ্বল, কুটিল, কুশ্রী, দুর্নিবার, শ্লথ, উত্তেজক, উদ্দীপক, শিথিল, অসমঞ্জস, বিচিত্র, বিরল ব্যঞ্জনা এই জীবনের ত্রিভুবন,—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পরিক্রমা,—'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ স্ পাস্ট'।

বহুদূর সমুদ্রের বিষণ্ণ নাবিকের কণ্ঠস্বরে করুণ বিকেলের আলোয় অর্ধ-উদ্ভাসিত অর্ধাচ্ছন্ন জীবনের ঝরণাতলার নির্জনে নিরুপম নম্র নিঃসঙ্গ মানুষের সকাল-বেলার গান, 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ স্ পাস্ট', এক অবিস্মরণীয় আত্মরমণে অবিরাম রুধিরাক্ত।

সমারসেট মম্ তাঁর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের চূড়ান্ত তালিকা থেকে শেষ পর্যন্ত প্রুস্তের, 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ স্ পাস্ট' বইখানাকে বাদ দিয়েছেন :

"One change had to be made in my original list. I had ended it with Marcel Prousts Remembrance of Things Past, but for several reasons this was not included in the proposed series. I do not regret this. Proust's novel, the greatest novel of this century, is of immense length, and it would have been impossible even with drastic cutting, to reduce it to a reasonable size."

একটি গ্রন্থ বিপুলাঙ্গ বলে সে বই এই শতাব্দীর সেরা উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও বাদ যাবে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের চূড়ান্ত তালিকা থেকে, এর চেয়ে অশ্রদ্ধেয় বিচার আর কি হতে পারে আমি জানি না। অথবা আর যে একটিই হতে পারে তা হচ্ছে, 'আমাদের কালে রচিত কালোত্তীর্ণ ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী বইটিকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা থেকে বঞ্চিত কর', যেহেতু তার দেহ অত্যন্ত কৃশ। আয়তনের বিপুলতা অথবা খর্বতা দিয়ে কথা কিংবা কোনও সাহিত্যের বিচারই কোনও কালে গ্রাহ্য নয়। অসীম সমুদ্র আর ধানের শীষের ওপর একবিন্দু শিশির, আকাশ-উদ্ধত পাহাড়ের চূড়া আর পথ চলতে ঘাসের ফুল, এর মধ্যে কে বেশী সুন্দর—সে-কথা কে বলবে?

এবং সমারসেট মম্ নিজেও তার অসারতা উপলব্ধি করেছেন। না হলে এর পরেও এত কথা বলবেন কেন:

"Its success has been prodigious, but it is too soon to assess the value posterity will place on it....I have a notion that the future will cease to be interested in those long sections of Proust's book which he wrote under the influence of the psychological and philosophical thought current in his day. Some of this has already been recognized to be *erroneous*. I think then it will be even more evident than it is now that he was a *great humorist* and that his power to create *characters, original*, various and lifelike puts *him* on an *equality* with Balzac, Dickens and Tolstoy. It may be that then an abridged version of his immense work will be issued from which will be omitted those parts which *time* has stripped of their value and only those parts retained which, because they are of the essence of a novel, remain of enduring interest. Remembrance of Things Past will still be a very long novel, but it will be a superb one." [Great Novelists And their Novels]

অর্থাৎ, সমুদ্র যেখানে গভীর অতল কেবল সেইখানটা বজায় থাক, বাকীটুকু যাক বুজে; কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় যেখানে রবির সঙ্গে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালীর সন্ধিতে, শুধু সেই চূড়াটুকুকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখ কাঞ্চনজঙ্ঘার আর সবটুকু ধূসর শরীরকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে। এবং গ্রন্থের মহাকাব্যায়তন উপন্যাসের অঙ্গকর্তন অবশ্যম্ভাবী; কেন? না, তাহলে অবশিষ্ট অংশটুকু পাঠকের কাছে অতি অবশ্যই হয়ে উঠবে, মমের ভাষায়, of enduring interest; অর্থাৎ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াটুকুকে রেখে বাকী হাজার হাজার ফিট ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়ো করে দাও; কেন? না, ক্যামেরায় ওই চূড়োটুকুরই কেবল চমৎকার ছবি ওঠে।

কোকিলকে দেখতে খারাপ তাই তার গলা টিপে মেরে দাও; শুধু মারবার আগে টেপরেকর্ড করে রাখ কুহু স্বরের।

বোঝা যায় মম 'ইণ্টারেস্টিঙনেসে'র ওপরই উপন্যাসের চিরজীব্যতা নির্ভর করে এই মতে অবিচল আস্থা রাখেন। কোনান্ ডয়েলের 'হাউণ্ড অভ বাস্কারভেল্‌স্' তাহলে মহত্তম উপন্যাস হত; 'ইক উইণ্টার কাম্‌স' হত দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একটি। মহৎ উপন্যাসেরও সুখপাঠ্য হতে বাধা নেই জানি। কিন্তু মহৎ উপন্যাসের অনেক অংশ অ-সুখপাঠ্য বলে তা নির্দ্বিধায় বাদ দেওয়া যায়, এ বিচার সাহিত্যের নয়—শল্য চিকিৎসকের। হিউমার এবং চরিত্রসৃষ্টি, এ দুটিও মহৎ রচনার দুটি উল্লেখযোগ্য অলঙ্কার নিঃসংশয়ে। কে বলছে, নয়? .কিন্তু চরিত্র তো শার্লক হোম্‌স্‌ও। এত জীবন্ত চরিত্র শার্লক হোম্‌স্ যে কোনান্ ডয়েলের মানসপুত্র মাত্র, তা বিশ্বাস করা ওই বই পড়তে পড়তে শক্ত হয়। মনে হয়, রক্ত-মাংসের গোটা মানুষ বেরিয়ে এসেছে গোয়েন্দা বইয়ের শুকনো পাতা থেকে। কিন্তু তাই বলে ম্যাক্‌বেথের সঙ্গে শার্লক হোম্‌সের নাম একসঙ্গে করা যাবে কি? যাবে না। যাবে না তার কারণ হোম্‌স্ সন্দেহজনক মৃত্যুরহস্যের ওপর অনুসন্ধানী বৃত্তির বুদ্ধিদীপ্ত আলোকপাত করেই ক্ষান্ত; ম্যাকবেথ জীবন-রহস্যের অতল থেকে তুলে এনেছেন নূতন ঐশ্বর্য; টুমরো অ্যাণ্ড টুমরো ··

আসল কথা হচ্ছে এই, মম্ বুঝতে চেয়েছেন মহৎ উপন্যাসের কার্যকারণকে; উপন্যাসের মহত্ত্ব তাঁর বুকে বাজে নি। অথচ আমরা জানি, সৃষ্টির রহস্য বোঝবার নয়, বাজবার। গাছ কেমন করে ফুল ফোটায় এ নিয়ে যার মাথাব্যথা, সে বোটানিস্ট। আর, দুটি পয়সা পেলে যে একটি পয়সা ব্যয় করে ফুল কিনবে সে রসিক। বোটানিস্ট আঘাত করতে পারে বোঁটাতে; ফুল ফোটাতে পারে কেবল সেই-ই যার 'বক্ষে বেদনা অপার'।

লৌকিক বেদনা থেকে যিনি জন্ম দেন অলৌকিক আনন্দের তিনিই শিল্পী; এই আনন্দকে আস্বাদন করে যিনি বিহ্বল তিনি সহৃদয়হৃদয়সংবাদী! আনন্দবিহ্বল তাঁর সকৃতজ্ঞ স্বীকারোক্তি কেবল এই: বুঝেছি কি বুঝি নাই বা সে তর্কে কাজ নাই, ভাল লেগেছিল মনে রইল এই কথাই!

যেমন ভাল লেগেছিল চায়ের সঙ্গে কেক একদিন প্রুস্তের। সঙ্গে সঙ্গে এই ভাল লাগা কেন তার উত্তর অন্বেষণে অস্থির প্রুস্ত বলছেন:

"It is plain that the object of my quest, the truth, lies not in the cup but in myself. ...I put down my cup and examine my own mind....I retrace my thoughts to the moment at which I drank the first spoonful of tea.... Ten times over I must essay the task...and each time the natural laziness which deters us from every difficult enterprise, every work of importance, has urged me to leave the thing alone, to drink my tea and to think merely of the worries of today and of my hopes for tomorrow, which let themselves be pondered over without effort or distress of mind. And suddenly the memory returns. The taste was that of the little crumb of madeleine which on Sunday mornings at Combray...when I went to say good day to her in her bedroom, my aunt Leonie used to give me, dipping it first in her cup of real or of limeflower tea...." [Remembrance of Things Past (Random House, 1934), I, 34-36]

এই হচ্ছেন আদি ও অকৃত্রিম প্রুস্ত ; অনবদ্য, অদ্বিতীয় 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ্‌স্ পাস্টে'র অবিস্মরণীয় লেখক। একটা অনুভূতিকে আশ্রয় করে সময়ের সিন্ধু ধরে পিছিয়ে যাওয়া, পৌছতে চাওয়া তার উৎসে :

"And so, this memory recaptured, the whole past begins to flood in upon the narrator, 'the old grey house upon the street, where her room was, rose up like the scenery of a theatre to attach itself to the little pavilion, opening on to the garden...and with the house of the town, from morning to night and in all weathers,' and Proust is launched on the story of Combray and the seemingly lost childhood that never was lost—since the mind retains all memories but forgets many of them only to exhume them at the trigger touch of the taste of a damp piece of cake, or a stray word or a glimpse of something that calls up one after another of the events of the buried past." [The Reader's Companion to World Literature]

এই ইডিওসিনক্রেসি-ই প্রুস্তের নিজস্ব এবং এইজেই তিনি অনন্য। এবং মম্ তাঁর বিশ্বের সেরা দশটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনার উপসংহারে বলেছেন :

"What is it that must be combined with the creative instinct to enable a writer to produce work of value? Well, I suppose it is personality. It is an idiosyncrasy he possesses that enables him to see in a manner peculiar to himself."

নির্বিশেষকে বিশেষ করে তোলা একান্তভাবে নিজের ব্যক্তিত্বের জারকরসে জারিত করে,—প্রতিভার বিশেষত্বই বোধ হয় এই।

প্রুস্ত এই বিশেষত্বের, বিচিত্র বিরল বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন বলেই 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগস্ পাস্ট' আর কারুর লেখা অসম্ভব ছিল। এ বিশেষত্ব পাঠক-মাত্রেরই বিশেষ প্রিয় হবারও প্রয়োজন নেই :

"It may be a pleasant or an unpleasant personality. That doesn't matter. Nor does it matter if he sees in a way that common opinion regards as neither just nor true."

তাহলে কি 'ম্যাটার' করে? না,—

"The only thing that matters is that he sees with his own eyes, and that his eyes should show him a world peculiar to himself." [The World's Ten Greatest Novels]

প্রুস্তের পিকিউলারিটির মূলসূত্র পাওয়া যাবে, চায়ে কেক ডুবিয়ে খাবার আনন্দকর অভিজ্ঞতা থেকে অবিশ্রান্ত আত্মরমণের প্রায় পৈশাচিক আত্মতৃপ্তির মধ্যে। এই বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া ছাড়া প্রুস্তের বিশেষ দৃষ্টিকোণ তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল না।

"Proust's approach differs from all these writers or rather he combines a number of different approaches and produces a new standpoint and a new method. The classical novelists were convinced that inspite of his changing moods, man was essentially one. Proust was equally convinced that he was many. His characters are composed in layers or, if one prefers, they are all to some degree multiple personalities. The only way

of bringing out this complexity and of dealing with the very real problem of our knowledge of other people was to apply the method of the memoir-writer to his characters....This enables Proust to present them from a large number of different angles and to show that the same person may appear completely different to different people."

একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে এর :

"'I saw that what had appeared to me be not worth twenty francs in the house of ill fame, where it was then for me simply a woman desirous of earning twenty francs, might be worth more than a million, more than ones family, more than all the most covered positions in life if one had begun by imagining her to embody a strange creature, interesting to know, difficult to seize and to hold. No doubt it was the same thin and narrow face that we saw, Robert and I. But we had arrived at it by two opposite ways, between which there was no communication, and we should never both see it from the same side.'" [The Novel in France : Martin Turnell]

প্রুস্ত তাঁর একটি চিঠিতে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর টীকা করতে গিয়ে একে তুলনা করেছেন ট্রেন থেকে শহর দেখার সঙ্গে :

"While the train follows its winding track, the town, sometimes appears on our right and sometimes on our left. In the same way, he says, the different aspects of the same character will appear like a succession of different people. Such characters, he adds, will later reveal that they are very different from the people for whom we took them, as often happens in life for that matter." [Lettres de Marcel Prousta Bibesco.]

প্রুস্তের এই দৃষ্টিভঙ্গী আপনাকে আচ্ছন্ন অথবা আহত করে, তার ওপর 'The Remembrance of Things Past'-এর মূল্য কিংবা মূল্যহীনতা নির্ভর করে না মোটেই। তাঁর অবিরত আত্মরমণকে কেউ নন্দিত করেছেন :

"In the process of searching for the lost time—his own—and remembering it, Proust also created a highly original and moral work that gives us a brilliant picture of a decadent society. Through the multiple channels and digressions of memory of his fictitious hero swann, the life of the small town, the hypochondriacal aunt, the boys attachment to his mother, the story of swann's marriage, his life in Paris, take their place in the flowing narrative. We see people in their youth and then catch them grow old—past and present so juxtaposed as to make us aware of the passage of time. Proust by exhibiting them, shows us that the values of this high society are a fraud, and as he strips the mask of glitter from it he makes us aware of certain general principles." [The Readers Companion to Wold Literature.]

আবার কেউ প্রুস্তের চরিত্রচিত্রণের দৃষ্টিভঙ্গীকে নিন্দাও করেছেন :

"...Critics who have claimed that Proust's presentation of character was inconsistent and unconvincing."

কিন্তু এই অভিনন্দিত ও নিন্দিত দৃষ্টিভঙ্গীই প্রুস্তকে প্রুস্ত করেছে। এই ইডিওসিনক্রেসি, এই পিকিউলারিটি নিন্দা ও প্রশংসার উর্ধ্বে উঠিয়েছে 'Remembrance of Things Past'-কে। মমের দৃষ্টি এড়ায় নি তা ; কারণ অভিনন্দন ও নিন্দা কোনটায় আপনার মনের কথা ব্যক্ত হবে, "That depends on your temperament. It has nothing to do with the value of his work."

এ কথা বলবার পরেও মম্ যখন প্রুস্তের মহাজীবন-কাব্য, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেন, যেহেতু এ বই দীর্ঘকায় এবং "its various parts are of unequal merit" এই কারণে তখন মনে না করেই পারি না, সে প্রতিভা ছাড়া যেমন প্রুস্ত হওয়া যায় না, তেমনই প্রজ্ঞার আলো ছাড়া প্রুস্তের 'Rememberance of Things Past'-এর আলোচনাও পণ্ডশ্রম মাত্র। এবং বুদ্ধির প্রত্যন্ত প্রদেশ অতিক্রম করবার পর তবেই যার অভিসার আরম্ভ তারই নাম প্রজ্ঞা।

[ক্রমশঃ]

নিকষিত হেম

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঘোর ঘোর অন্ধকার থেকে আলো-ঝলমল রাজপথে, ভূতুড়ে ছায়ার মত ভ্যাবাচ্যাকা মুখের গুটিকয়েক মাত্র নরনারীর সান্নিধ্য থেকে একেবারে খরস্রোতা জনতরঙ্গিনীর বুকের মধ্যে গিয়ে পড়ল তুলসী।

কিন্তু তা পৈশাচিক একটা আক্রমণ থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে কঠিন উপেক্ষার পাথরের দেওয়ালে ঠোক্কর খাওয়ার মত।

কুৎসিত, এমন কি ভয়ঙ্কর হলেও ওখানে সবকটি মুখই চেনা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই রাজপথে সবাই তার অপরিচিত। ওখানে বেঁধে রাখবার জন্য হলেও আমন্ত্রণ ছিল, এখানে কেবলই নির্মম উপেক্ষা। অন্ধকার থেকে আলোয় এসে পড়াতেই চোখ ঝলসে গিয়েছিল তুলসীর; এখন সে বিহ্বল হয়ে পড়ল।

তার যে প্রতিবাদ ওখানে ছিল অত সার্থক আত্মপ্রকাশ, এখানে তা সম্পূর্ণ নিরর্থক; ওখানে থাকতে বুকের ভেতর থেকে ফুলে-ওঠা যে কান্নাটা ছিল তার নির্ভর, এখানে তা কাঁদাই যায় না। ওখানে আতঙ্ক ছিল বলেই আত্মরক্ষার জন্য অত জোরও পেয়েছিল সে, এখানে কিন্তু লজ্জায় সে অবশ।

দিশাহারা হয়ে পড়েছিল তুলসী, কিন্তু তখনই তার চোখে পড়ল।

কুঞ্জের মতই ছোট বাড়ি একখানা। প্রাঙ্গণে নানা রকমের ফুলের গাছ। পথে দাঁড়িয়েই সদর-দেউড়ির উন্মুক্ত দ্বারপথে একখানি মাত্র পাকা দালানের সম্পূর্ণ বারান্দা তো বটেই, ভেতরে যুগল বিগ্রহও আবছায়া রকমে দেখা যায়। বারান্দায় হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বলছে একটা। সেই আলোতেই দূর থেকে সবই দেখতে পেল তুলসী—ভিতরে বিগ্রহ, বারান্দায় ক্ষুদ্র একটি ভক্তমণ্ডলী এবং মণ্ডলেশ্বরকেও।

নিরাবরণ দেহ, মুণ্ডিতমস্তক সৌম্যদর্শন এক বৈষ্ণব বিপরীত দিকে বসে হাসি-হাসি মুখে নিশ্চয়ই হরিকথা শোনাচ্ছেন ভক্তবৃন্দকে।

সমবেত কণ্ঠের হরি হরি ধ্বনি কানে এসেছিল বলেই পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল তুলসী; তারপর ওই দৃশ্য দেখল সে।

আশায় দুলে উঠল তার মন—এই বুঝি তাহলে নদীয়ার সেই দয়াল ঠাকুরের আশ্রম—তার আশ্রয়!

উন্মুক্ত দ্বারপথে তীরের মত ছুটে গিয়ে সেই সৌম্যদর্শন বৈষ্ণবের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল তুলসী।

কিন্তু—

মথুরার রাজপ্রাসাদ নয়, দেউড়িতে দ্বারী নেই, তবু সে বড় কঠিন ঠাঁই।

তুলসী ওখানে যেতে না যেতেই একটা যেন বিপর্যয় ঘটল।

ছিটকে দূরে সরে গেলেন মণ্ডলেশ্বর; ভক্তেরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হায় হায় রব উঠল একটা, সেই সঙ্গে প্রায় যেন একটা আর্তনাদ—সর্বনাশ, এ যে প্রকৃতি!

কিছুই বুঝতে পারে না তুলসী, ধ্বনিটা আর্তনাদের হলেও তা যেন চাবুক মেরেছে তাকে। উঠে বসল সে হাঁটুতে ভর দিয়ে, মুখ তুলে তাকাল—একবার এদিকে, একবার ওদিকে। দুই চোখে তার বিহ্বল দৃষ্টি—জল আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গিয়েছে।

কে যেন একজন বলে উঠল, ভুজঙ্গিনী!

পরের মুহূর্তেই কঠিন পরুষ কণ্ঠের আদেশ কানে এল তুলসীর: মুখ ঢাক; আগে ঘোমটা দাও মাথায়, তুমি যে প্রকৃতি। কৃষ্ণদাসবাবাজী প্রকৃতি দর্শন করেন না তা জান না তুমি?

জানে না তুলসী, জানবার পরেও বুঝতে পারে না। ও বাড়িতে তার উপর যে অমানুষিক আক্রমণ হয়েছিল

তা সে বুঝতে পেরেছিল; কিন্তু এখানে এই সাত্ত্বিক আক্রমণ তার দুর্বোধ্য। ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢাকবার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার পরেও দিশাহারা ভাব তুলসীর।

তবু চারদিক থেকে প্রশ্নের বাণ তার উপর বর্ষিত হচ্ছে—উত্তর না দিয়ে উপায় নেই।

কি চাও তুমি এখানে?

আশ্রয় চাই বাবা।

কোথা থেকে আসছ?

পালিয়ে এসেছি বাবা।

কোথা থেকে?

এই কাছেরই একটা বাড়ি থেকে। ওই যে ওখানে আখড়াটা—

আখড়া নয়, ওটা ব্যভিচারীর আস্তানা।

হ্যাঁ বাবা, ঠিক তাই। ওরা আমার সন্তানকে মেরে ফেলতে চায়।

রাধামাধব—রাধামাধব!

আবার সমবেত কণ্ঠের একটা যেন আর্তনাদ। ফুঁপিয়ে উঠল তুলসীও।

কিন্তু তার জন্য বিন্দুমাত্রও অনুকম্পা নেই। আর্তনাদ ছিল আতঙ্কের। তার পর্যবসান ধিক্কারে। যে কণ্ঠ তারায় উঠে এতক্ষণ ধরে জেরা করেছে তুলসীকে তাই এখন উদারাতে নেমে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তুমি বাছা ওখানে গিয়েছিলে কেন? তুমিও কি ব্যাভিচারিণী?

আবার সেই প্রশ্ন যার উত্তর জানে না তুলসী। শুনে আগেও যে অবস্থা হয়েছে তার এখনও সেই অবস্থা হল, হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল সে; থেমে গেল তার কণ্ঠের সেই চাপা কান্নাটাও।

তবু আবার প্রশ্ন হল: কথা বলছ না যে? তুমি কি বিধবা?

কথা বলা দূরে থাক, ঘাড়ও নাড়তে পারছিল না তুলসী। তাই তার চোখেও পড়ে নি—কেবল কথাটাই কানে এল।

থাক, আমি বুঝেছি।

চমকে উঠল তুলসী, ঠিক তাই—সেই যাকে তার মনে হয়েছিল মণ্ডলেশ্বর তিনিই এবার কথা বলেছেন। শুধু কথা বলা নয়, প্রকৃতির দিকে চোখও ফিরিয়েছেন তিনি এবং সে চোখের দৃষ্টিতে আগুন নেই।

পরের মুহূর্তে প্রকৃতিসম্ভাষণও করলেন তিনি। বললেন, আমি সব বুঝেছি মা—মুখ ফুটে তোমাকে কিছুই বলতে হবে না।

এতক্ষণ পর—যেন কত যুগ পরে আলো দেখল তুলসী।

সে সম্ভাষণ যেন সঞ্জীবন স্পর্শ। তুলসীর বুকের মধ্যে একটা যেন দোলা লাগল, বিপুল একটা আবেগ ফেনিয়ে উঠল তার কণ্ঠ পর্যন্ত; সঙ্গে সঙ্গেই আবার সে কৃষ্ণদাস-বাবাজীর পায়ের কাছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, আমায় আশ্রয় দিন বাবা।

কিন্তু আলেয়ার আলো দেখেছিল তুলসী, তখনই নিভে গেল তা।

তার অমন সকাতর অনুনয়ের উত্তরে কৃষ্ণদাসবাবাজী শান্ত কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললেন, ঠাকুরের আদেশে অনেকদিন থেকেই বিরক্ত সন্ন্যাসী আমি। তোমাকে আশ্রয় দেবার সাধ্য আমার নেই।

তাহলে গতি কি হবে আমার?

যিনি অগতির গতি, তিনি তোমারও গতি করবেন। তুমি এখন যাও।—বলে ধীর পদবিক্ষেপে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সশব্দে দ্বার বন্ধ করে দিলেন কৃষ্ণদাসবাবাজী।

তখন সেই পরুষ-কণ্ঠ আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, শুনলে না বাবাজীমশায়ের কথা? যা করবার তা তো তুমি করেইছ। এখন যাও, নইলে—

নইলে কি যে হবে তা শোনবার জন্য তুলসী ওখানে আর অপেক্ষা করে নি। আবার আগের মতই ছুটেছিল সে; কিন্তু দেউড়ি পার হবার আগেই বাধা পড়ল।

কানে এল তুলসীর, জয় গৌর, একটু দাঁড়াও তো বাছা।

কেবল মুখের ডাকই নয়, কাঁধের উপর একটি হাতের স্পর্শও—স্পর্শের চেয়ে বেশী। পেছন থেকে একটা টানই লেগেছে যেন। মোলায়েম জোরটাই বড়। মোটা কর্কশ কণ্ঠস্বর, কাঠি-কাঠি আঙুলের কঠিন স্পর্শ। [illegible]

ফিরে তাকিয়েছিল তুলসী। কিন্তু এ যে মূর্তিমান আশ্বাস!

নিঃসংশয়ে শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। কাঠের মত দুখানি পা, পাকানো দড়ির মত হাত, কোটরগত চোখ দুটিতে মণি আছে কি না তা বোঝাই যায় না; হাসবার ভঙ্গিতে হাঁ করেছে যে মুখখানা তাতে একটিও দাঁত নেই। তবু মনে হয় যেন দেবদূত।

বাউলের রূপ, বাউলের সাজ। মাথায় শনের নুড়ির মত সাদা পাতলা চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, তেমনি সাদা ও লম্বা দাড়ি তার মুখে। পরিধানে হাতকাটা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা গেরুয়া রঙের একটি ঢোলা আলখাল্লা। সবই বাতাসে উড়ছে। তাই বুঝি আরও ভাল লাগে তাঁকে দেখতে।

তুলসী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি?

উত্তর হল: একটি কৃষ্ণের জীব। তা ছাড়া আর কি পরিচয় থাকবে খ্যাপা বাউলের!

কি চাও তুমি?

তোমার মুখখানা একবার দেখতে চাই।

কি!

চোখে তো ভাল দেখতে পাই না মা—ওখানে ঝাপসা ঝাপসা দেখেছি; তাই কাছ থেকে ভাল করে দেখতে এলাম।

আশ্চর্য, খারাপ তো লাগছে না তুলসীর! অথচ বলতে বলতে সত্যিই নিজের দুই হাতে তুলসীর মুখখানা ধরে নিজের মুখের কাছে টেনে নিলেন সেই বাউল এবং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তা দেখতে দেখতে নিজের মনেই বলে চললেন, তাজ্জব ব্যাপার তো—একেই ওরা বলে ভুজঙ্গিনী! আমি তো দেখছি কমলিনী। আহা-হা, আমার রাধামাধবের পূজায় লাগবার মতই বটে!

বন্যার বেগে তুলসীর দুই চোখে জল ছাপিয়ে উঠল। সে অশ্রু দুঃখের নয়, যেন বড় সুখেই এখন আবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে তুলসীর, ইচ্ছে হচ্ছে মুখখানার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ মাথাটিকেও ওই লোকটির বুকের উপর এলিয়ে ছেড়ে দিতে।

কিন্তু তার সুযোগ হল না, বাউল তুলসীর মুখখানাকে তখনই ছেড়ে দিলেন।

তখন গাঢ়স্বরে তুলসী বলল, তুমি কে বাবা?

উত্তর হল: বললাম যে, খ্যাপা বাউল—লোকে ডাকে কানাবাবাজী।

কোথা থেকে এলে তুমি?

ওই তো ওই বারান্দা থেকে।

কেন গো?

শুনলে না মা—কৃষ্ণদাসবাবাজী তোমাকে অগতির গতির কথা বললেন। সেই তিনিই তোমার কাছে ঠেলে পাঠালেন আমাকে।

তুলসী বিহ্বল।

একটু পরে কানাবাবাজীই আবার বললেন, এই অচেনা জায়গা, ভিন-দেশী মেয়েছেলে তুমি, তাতে আবার এই রাতের বেলা। একা একা যাবে কোথায় তুমি?

ওই কথা শুনেই স্বপ্ন থেকে বাস্তবলোকে নেমে এল তুলসী। চোখে আবার জল এল তার; গাঢ়স্বরে সে বলল, ভেবে তো কূলকিনারা পাচ্ছি না বাবাজী।

তা পাবেও না, সারারাত ঘুরে বেড়ালেও না। তাই মা একটা কথা তোমাকে বলতে চাই।

কি কথা বাবা?

অন্ততঃ আজকের এই রাতটুকুর জন্যে আমার আখড়াতে যাবে তুমি?

আখড়া!
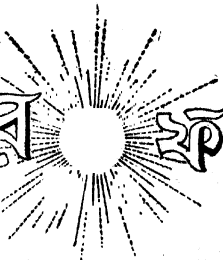
হ্যাঁ আখড়া। তবে যেখান থেকে তুমি পালিয়ে এসেছ আর যেখান থেকে এইমাত্র ওঁরা তোমায় দূর করে দিলেন তাদের কোনটির মতই নয়। একটি পর্ণকুটিরে আমার রাধামাধবকে নিয়ে একা থাকি আমি। সেখানে এই বুড়ো মানুষটির সঙ্গে অন্ততঃ একটা রাত তুমি কাটাতে পারবে না মা?

ও জায়গাটা কৃষ্ণদাসবাবাজীর আশ্রমের সীমানার মধ্যেই। একটু আড়াল আছে, আব্রু আছে। পথের লোকের চোখ পড়ে না ওখানে। কিন্তু ওখান থেকে সদর-রাস্তা বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। নগরপালিকার আলো, দোকানের আলোতে তখন উজ্জ্বল সে পথ, চলমান জনতার কোলাহলে মুখর। তবু সেই দিকে চেয়ে তুলসীর মনে হল যে তা পথ নয়, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য।

মুখ ফিরিয়ে কানাবাবাজীর মুখের দিকে চেয়ে সে

নতুন নির্মল হাফ-বার সাবানে
কাচলে আপনার কাপড়চোপড় হবে
ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর
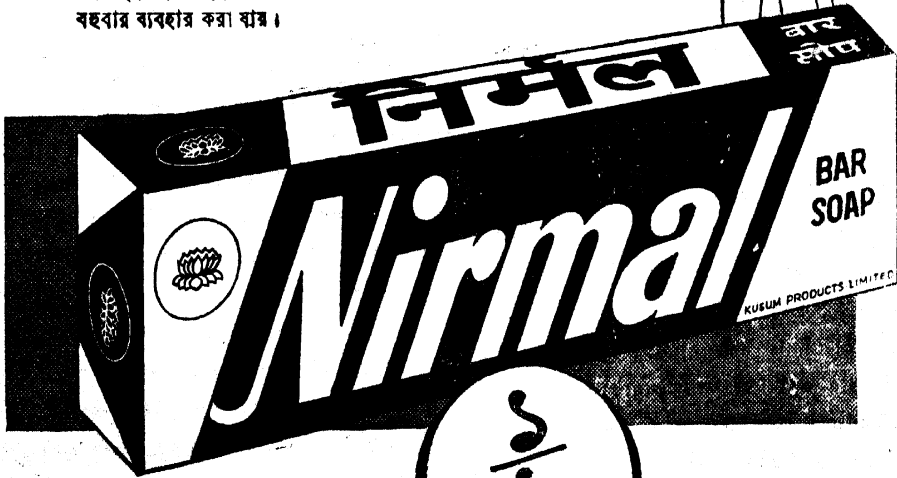
বলল, আমি খুব পারব বাবা। কিন্তু তুমি আমাকে রাখতে পারবে তো?

কানাবাবাজী বিস্মিত হয়ে বললেন, আমিই তো ডাকলাম তোমাকে। তবে আবার ও কথা কেন বলছ মা?

আমি যে কলঙ্কিনী।

ও, সেই কথা!

বলতে বলতে কানাবাবাজীর ফোকলা মুখ বিচিত্র হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল: তা মা, আমার রাধারানীকেও তো কত লোকেই কলঙ্কিনী বলেছে!

আর দ্বিধা নেই তুলসীর; চোখ মুছে সে বলল, চল বাবা।

কিন্তু তখনই কানাবাবাজী হাত বাড়িয়ে হাত ধরলেন তুলসীর, কবজিসুদ্ধ নিজের শীর্ণ বাঁ হাতখানি হাতড়ে হাতড়ে তুলসীর মুঠোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর বললেন, পথ নিজে আমি চোখে না দেখলেও এই আমার লাঠিখানা ঠিক চিনতে পারে। তবু এই যে তোমাকে বলছি আমায় পথ দেখাতে তার একটা তাৎপর্য আছে মা। আমি চাই যে লোকে দেখুক—এই কানাবাবাজী তার শেষ বয়সে তাকে পথ দেখাবার জন্য একটি শক্ত-সমর্থ কন্যা পেয়েছে।

অতীতের অন্ধকারে স্মৃতির সন্ধানী আলো ফেলে একটি একটি রত্ন উদ্ধার করছিল নবদ্বীপের মঞ্জরী বৈষ্ণবী আর তা দেখাচ্ছিল ডাক্তার অনুপম বোসকে।

ওটি তার শেষ রত্ন।

তা ছোটগোঁসাই, মস্ত সাধুপুরুষ তো কৃষ্ণদাস-বাবাজী— তাঁর আশীর্বাদেই আশ্রয় পেলাম আমি, তিনিই তো জুটিয়ে দিলেন এই আমার নতুন বাবাকে।

বলতে বলতে চোখ মুছল মঞ্জরী।

অনুপমের আবেগ নেই কিন্তু কৌতূহল তখনও উদগ্র হয়ে রয়েছে। সে রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল, তা বউদি, সেই রাত্রে ওই যে কানাবাবাজীর হাত ধরে বড় সড়ক দিয়ে মালঞ্চ পাড়ার আখড়াতে আপনি গেলেন তখন লোকের চোখ পড়ে নি?

খুব পড়েছিল।—মঞ্জরী উত্তর দিল: ভাগাড়ে শকুনীর যে চোখ পড়ে তাও পড়েছিল ছোটগোঁসাই। কত জনে তখন চেয়ে চেয়ে দেখল; টিপ্পনী কাটল এক-একজন। জল-বিছুটির মত গায়ে লাগে এমনও এক-একটি কথা। কিন্তু বাবা আমার হেসে হেসেই কৈফিয়ত দিয়েছিলেন।

কি কৈফিয়ত?

ওই যে বললাম, মেয়ে কুড়িয়ে পেয়েছেন তিনি—ওঁরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, ইনি কুড়িয়ে নিয়েছেন।

ওই তার মুমূর্ষু অবস্থাতেও সে রাত্রির ঘটনা স্মরণ করে আনন্দে ও গর্বে উৎফুল্ল মঞ্জরী।

তারপর হঠাৎ যেন নতুন জোয়ার এল তার মনে।

মঞ্জরী বলল, দেখুন ছোটগোঁসাই, আমার ঠাকুরের কি লীলা।

অনুপম বিস্মিত হয়ে বলল, কি বলছেন বউদি?

মঞ্জরী উত্তরে বলল, সে রাত্রে বাবা আমার গান গাইতে গাইতে আমাকে তাঁর আখড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক এই গানটাই—

বলতে বলতে বাইরের দিকে চোখের ইশারা করল মঞ্জরী।

আর তখনই স্পষ্ট শুনতে পেল অনুপম—তার সবটা মনোযোগই মঞ্জরীর বক্তব্যের উপর নিবদ্ধ ছিল বলে এতক্ষণ যা তার কানে পৌঁছয় নি।

ঘরে নয়, কিন্তু খুব কাছেই কোথায় যেন বসে নিজের একতারাটি বাজিয়ে কানাবাবাজী ভাঙা ভাঙা গলায় প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে গেয়ে চলেছেন:

আমার শ্রীকৃষ্ণধন নন্দের কানাই
সে লইরাছে রাধার পায়
ওরে সাক্ষী আছে জয়দেব গোঁসাই
পদ্মা মাইয়ার আইটা (এঁটো) খায়।

বুঝি মঞ্জরীরই বন্দনাগান ওটি, আর তাই তখন অত জল তার চোখে।

তিন

আষাঢ়ের আকাশভরা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। যেমন ঘন তেমনি কালো। কত নীচে নেমে এসেছে ওরা, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। আকাশকে আকাশ বলে চেনাই যায় না।

নীচে কূলে কূলে পরিপূর্ণ ভাগীরথী। প্রায় জল ঘেঁষে চিতা জ্বলছে।

যে কোন মুহূর্তেই বৃষ্টি নামতে পারে। যদি নামে তো আকাশ ভেঙে নামবে। সকলের মনেই সেই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, জল হল না। ভাগীরথীর রাঙা জলে কালো ছায়া ফেলল জলদ, বহুবাঞ্ছিত সজল কোমল ছায়া দিল মুষ্টিমেয় শ্মশান-যাত্রী কজনকে। অসাধারণ আজ মেঘের দাক্ষিণ্য।

দাউ দাউ চিতার আগুনে একটুও যে বিভীষিকা নেই তা তো জলধরের ওই দাক্ষিণ্যের জন্যই।

উপরে কালো মেঘ; ভাগীরথীর বুকে দুলে দুলে ভেসে বেড়াচ্ছে তারই কালো ছায়া, ঘন হয়ে চেপে বসেছে তীরে অগুনতি গাছপালার মাথায় মাথায়। সজল জলদের ওই গাঢ় শ্যামলিমা তার পটভূমি বলেই না চিতার আগুন অত উজ্জ্বল অথচ যেন স্নিগ্ধ।

লেলিহান অগ্নিশিখা বলে মনেই হয় না; মনে হয় যেন গভীর পরিতৃপ্তিতে স্নিগ্ধ সহাস্য সুন্দর একখানি মুখ।

আশ্চর্য সাদৃশ্য। তাই ভাবছিল অনুপম।

মঞ্জরীর মুখখানি সেদিন দেখতে দেখতে কি কুৎসিতই না হয়ে গিয়েছিল। উত্তেজনায় যত, অবসাদে তার চেয়ে আরও বেশী। এক যেন উন্মাদিনী চারিদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে একসঙ্গে লড়ছে দশ-বিশটি শত্রুর সঙ্গে। কিন্তু অসম সংগ্রামে পরাজিত, আহত, ক্ষত-বিক্ষত মরণোন্মুখ সেই মঞ্জরীই অনুপমের মুখ থেকে মনোতোষের শেষ কথাটা শোনা মাত্রই অপরিসীম তৃপ্তি, আনন্দ ও গর্বে অপরূপ হয়ে উঠল।

ভাঙা ভাঙা কথা, থেমে থেমে বলা,—চোখের জল আর দীর্ঘনিশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে নিরাভরণ, নিরাবরণ, সদ্যোজাত শিশুর মতই নারী-জীবনের চরম কলঙ্কের নিষ্কলঙ্ক স্বীকৃতি তার। তবুও যে প্রশ্ন দিয়ে কাহিনী সে শুরু করেছিল শেষ করবার পর আবার অনুপমকে সেই প্রশ্নই করেছিল মঞ্জরী—আমি কী পাপ করেছি ছোটগোসাই?

[illegible] বিব্রত হয়ে বলল, পাপ-পুণ্যের বিচার করতে তো আমি শিখি নি বউদি। আর শিখে থাকলেও আমি বিচার করবার কে?

মঞ্জরীর চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। তাই দেখে আরও একটু হেসে অনুপম আবার বলল, সে অধিকার যার ছিল তার বিচারে তো আপনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন। নইলে কি মনোতোষ আপনাকে বিয়ে করত?

বিয়ে!

তা বইকি! নাই বা হল আচার-অনুষ্ঠান। তা তো বাইরের জিনিস—সত্যের চেয়েও বড় বলব নাকি তাকে? যা সত্য তার ছাপও তো রয়েছে এই আপনার নিমাইয়ের মুখে। অকালে মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে গেল বলেই মনোতোষ সে সত্য দশজনকে জানিয়ে যেতে পারে নি। কিন্তু আমাকে সে বলে গিয়েছে।

কি?

বিহ্বলা মঞ্জরী হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে দুই চোখ বড় করে গলা চড়িয়ে বলল, হেঁয়ালি নয় ছোটগোসাই—এই আমার গা ছুঁয়ে বলুন তো—কি বলেছিল মণ্ট দা?

তখন খুলেই বলেছিল অনুপম। আহত, মৃত্যুপথযাত্রী মনোতোষের সঙ্গে রেলগাড়িতে তার শেষ কথাবার্তা যা হয়েছিল তার প্রত্যেকটি কথাই মঞ্জরীকে শুনিয়েছিল সে।

কথিত বাণী, কার্যকারণসঙ্গত ব্যাখ্যা, নিজের মায়ের কাছে মনোতোষ সেনের সেই শেষ আবেদন—সবই।

প্রথমে যেন বিশ্বাস করে নি মঞ্জরী, তারপর করল। তখন সে কী রোমাঞ্চ তার দেহে! গর্ব ও আনন্দের সে কী পরিপূর্ণ স্ফূর্তি! একটি কোমল কোরক এক নিমেষেই যেন এক সহস্র দল তার দিকে দিকে প্রসারিত করে বিকশিত হয়ে উঠল। শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে প্রাণ পেয়ে উঠে বসল যেন অহল্যা পাষাণী। তখন আনন্দে উৎফুল্ল তার মুখ, পরিতৃপ্তিতে স্নিগ্ধ।

আষাঢ়ের সেই প্রভাতবেলায় ভাগীরথীর কূলে কূলে নেমে-আসা পুঞ্জ পুঞ্জ নিবিড় সজল মেঘের ছায়ায় চিতার আগুনের শিখায় শিখায় মঞ্জরীর সেদিনকার সেই অপার্থিব মুখখানিই আবার যেন দেখছিল অনুপম।

তাই চিতা নিভে আসতেই স্বপ্নও ভেঙে গেল তার।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল অনুপম। কখন যেন জল এসেছিল তার চোখে, লজ্জিত হয়ে তা মুছে ফেলল সে। তখন স্পষ্টই চোখে পড়ল তার।

নিমাইয়ের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন অন্নপূর্ণা; হাত

ধরেই তিনি তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গেলেন; মাটির ছোট একটি ঘট হাতে তুলে দিলেন তার, কচি দুটি হাতে পেছন থেকে পাকা দুখানি অভিজ্ঞ হাতের শক্তিসঞ্চার করে জলে ডুবিয়ে পূর্ণ করলেন সে ঘট, ঘটের জল নিমাইয়ের হাত দিয়েই ঢেলে দিলেন নিভন্ত চিতার উপর।

চিতাগ্নি নির্বাপণের শাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠান তা, অবোধ বালকেরও অবশ্যকর্তব্য।

বার বার সাতবার। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর নিমাইকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন অন্নপূর্ণা।

কিন্তু তাতেই পরম তৃপ্তি অনুপমের, অনেকখানি আত্মপ্রসাদও। পাথরের বুক থেকে শত ধারায় এই যে ভোগবতীর অমৃত প্রবাহ কলকলনাদে বেরিয়ে আসছে তার জন্য অন্ততঃ খানিকটা কৃতিত্ব নিজে সে দাবি করতে পারে বইকি!

প্রথমে আগুন হয়ে জলে উঠেছিলেন অন্নপূর্ণা।

ওই পাপিষ্ঠার হয়ে আমার কাছে তুমি ওকালতি করতে এসেছ অনুপম? যাও—চলে যাও এখান থেকে।

তারপর সে কী কান্না বৃদ্ধার: দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম আমি—সে আমার শিরে দংশন করেছে। হাবভাব, ছলাকলা দিয়ে এই ডাইনীই তো দিনে দিনে ভুলিয়েছিল আমার মণ্টুকে, নেশা ধরিয়ে পাপের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তার পাপেই তো সোনার সংসার আমার জলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। ওর কথা আমার সামনে আর একটি বারও মুখে আনবে না তুমি।

ভয়ে তখন মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল অনুপমের, কিন্তু হাল ছাড়ে নি সে।

পরদিন আবার ওকালতি করেছিল অনুপম। বলেছিল, আমার কথা নয় জ্যাঠাইমা, তৃপ্তি-বউদির কথাও আপনাকে আমি শোনাতে চাই না। আমি বলতে এসেছি মণ্টুর কথা, আপনারই ছেলে আপনাকে কাছে না পেয়ে আপনাকেই বলবার জন্যে শেষ কথা যা আমাকে বলে গিয়েছিল, শুধু সেই কথাটা।

তা তখন বল নি কেন?

জ্যাঠামশায় যে বারণ করলেন—

কর্তাকে বলেছিলে তুমি?

হ্যাঁ জ্যাঠাইমা।

একটা যেন ধাক্কা খেলেন অন্নপূর্ণা—কি একটা কথা বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না তা। সেই সুযোগে অনুপমই আবার বলল, মণ্টু যে অনেক যন্ত্রণা পেয়ে মরেছে জ্যাঠাইমা। কিন্তু অনেকখানি আশাও করেছিল সে।

অনুমানে ঢোঁপ ফেলা, কিন্তু তাতেই ফল পাওয়া গেল। ছেলের যন্ত্রণা, ছেলের আশার কথা কানে যেতেই চোখ তুললেন অন্নপূর্ণা; অনুপম তখনই আবার বলল, হ্যাঁ জ্যাঠাইমা—আমি যে চোখে দেখেছি, কানে শুনেছি সব। আপনার অবাধ্য হয়েছিল বলে সে কী যন্ত্রণা তার! কিন্তু জীবনে ওই একটি বার ছাড়া আর কখনও তো আপনার অবাধ্য হয় নি সে। তাই সে আশাও করেছিল যে আপনি তাকে মার্জনা করবেন।

অন্নপূর্ণা উত্তর দিলেন না, তবু তাঁর মুখ দেখে অনুপমের মন আশা ও উৎসাহে নেচে উঠল যেন—পাথর বুঝি গলতে আরম্ভ করেছে।

উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছিল যে মুখখানি তাতেই এখন দেখা যাচ্ছে বেদনার নীলাভা, চোখ দুটিতে যেন কুয়াশার আভাস; ঠোঁট দুখানিও ঈষৎ যেন কেঁপে উঠল। অস্ফুটস্বরে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলেছিল মণ্টু?

তখন খুলে বলল অনুপম—যেমন সে বলেছিল মঞ্জরীকে।

শুনতে শুনতে অন্নপূর্ণার চোখে জল এসেছিল, অনুপমের কথা শেষ হলে চোখ মুছলেন তিনি।

অনুপম উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ভয়ে ভয়ে আবার বলল, বিশ্বাস হয় না জ্যাঠাইমা—নিজের ছেলের কথা অবিশ্বাস করবেন আপনি?

কিন্তু ফল হল বিপরীত। অন্নপূর্ণা বিরক্ত হয়ে বললেন, কথা তো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নয়। আমি যখন মনে মনে তখনই জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু মানতে পারছি কোথায়? এ কি বিয়ে?

ভয়ে বুক কাঁপছিল অনুপমের; তবুও [illegible]

বল সংহত করে সে বলল, নয় কেন জ্যাঠাইমা? ওদের দেহে-মনে কোথাও তো কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। যা সত্য তা পুরোপুরি জানতে পেরেও কোন্ বিচারে আপনি অস্বীকার করবেন?

কিন্তু স্বীকারই বা করি কেমন করে?

স্বীকার না করেই বা উপায় কি জ্যাঠাইমা? ওদের বিয়ে তো ফুলে-ফলে সার্থক হয়েছে।

কিন্তু এ যে মহাপাপ।

আবার একটু দেরিতে উত্তর দিল অনুপম। কিন্তু দৃঢ়স্বরেই সে বলল, পাপ হলেও তার শাস্তিও তো ওঁরা পেয়েছেন—একজন আগেই মরেছে, আর একজন এখন মৃত্যুপথযাত্রী। মড়ার উপরে আবার খাঁড়ার ঘা দেওয়া কেন জ্যাঠাইমা?

এমনি করেই অন্নপূর্ণার হৃদয়ের দুয়ারে বারবার আঘাত করেছিল অনুপম। একটু একটু খুলতে খুলতে শেষে সম্পূর্ণ খুলে গেল তা।

অন্নপূর্ণা অবসন্নের মত জিজ্ঞাসা করলেন, তা আমায় তুমি কি করতে বলছ?

একবার ঢোক গিলে তবে উত্তর দিল অনুপম, করবার আর কিছুই নেই জ্যাঠাইমা—এখন হাজার চেষ্টা করলেও বউদিকে ধরে রাখা যাবে না। তবে রোগের জ্বালার চেয়ে মনের জ্বালায় তিনি বেশী জ্বলছেন দেখে বারবার আপনার কাছে ছুটে আসছি আমি।

অন্নপূর্ণা বললেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আসল কথাটা বল—আমাকে কি করতে বলছ তুমি?

বউদিকে ক্ষমা করুন। এখনও যদি আপনার ক্ষমা উনি পান, আপনার আশীর্বাদ, তাহলে হয়তো মঞ্জরী বউদি শান্তিতে চোখ বুজতে পারবেন।

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারেন নি অন্নপূর্ণা, মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছিলেন সিংহাসনের উপরে তাঁর ঠাকুরের দিকে। অনুপমের তখন মনে হয়েছিল যে চিররাত্রির নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতার মধ্যে অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষা করছে সে। কিন্তু অমন প্রতীক্ষারও অবসান হল। অন্নপূর্ণা অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল, যাই।

ওই যে মোড় ফিরল তারপর একেবারে তরতর গতি। ভয়ে ভয়ে অনুপম বেশ একটু দূরেই আসন পেতে দিয়েছিল। ডাক্তারের কর্তব্যও করেছিল সে—রোগিণীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তবে তার সঙ্গে কথা বলতে অন্নপূর্ণাকে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তিনি মানলেন না; বসলেন গিয়ে একেবারে তক্তপোশের উপরেই; মঞ্জরীর মুখের উপর ঝুঁকে তার কপালে ডান হাতখানি রেখে মৃদুস্বরে ডাকলেন, ভূতি, ও ভূতি!

দীপ তখন নিবো নিবো। রোগটা যক্ষ্মা বলেই তখনও জ্ঞান হারায় নি মঞ্জরী। আর অনেক কৃচ্ছ্রসাধনায় অভ্যস্ত বলেই সে দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণার কাতরুক্তি-গুলিকেও গলার নীচে চেপে রাখতে পারছিল। কিন্তু এইবার তার অত কঠিন সংযমের বাঁধও ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

চমকে চোখ মেলেছিল মঞ্জরী। চিনতে দেরি হয় নি, কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে! তাই অবিশ্বাস করবার কোন উপায় যখন আর রইল না তখন সে আর্তনাদ করে উঠল: কর্তামা—তুমি! তুমি আমাকে দেখতে এসেছ!

সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসবারও উপক্রম করেছিল সে, কিন্তু অন্নপূর্ণাই বাধা দিলেন তাকে; নিজেই যত্ন করে আবার তাকে শুইয়ে দিয়ে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, না এসে থাকতে পারলাম না যে—কে যেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে এল। কিন্তু এ কি হাল হয়েছে তোর! এই তো সেদিন দেখলাম—

কথা বুঝি কানেও গেল না মঞ্জরীর। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বিকৃতকণ্ঠে সে বলল, আমি আর বাঁচব না কর্তামা।

ষাট্!—বলে তুলসীর মুখ চেপে ধরলেন অন্নপূর্ণা: ও কথা কি মুখে আনতে আছে!

এবার যেন আরও বেশী কোমল অন্নপূর্ণার কণ্ঠস্বর; বলতে বলতে নিজের আঁচল দিয়ে মঞ্জরীর চোখও মুছিয়ে দিলেন তিনি।

দূর থেকে দেখে অনুপমের বিস্ময়ের সীমা নেই, ঘণ্টাখানেক আগেও যে অন্নপূর্ণার সঙ্গে সে কথা বলেছিল, ইনি যেন তিনি নন। তপস্বিনীর রুক্ষ মুখখানি এখন সমবেদনায় করুণ, মমতায় স্নিগ্ধ।

বুঝি সেইজন্যই সাহসও পেয়েছিল মঞ্জরী; অকস্মাৎ অন্নপূর্ণার একখানি হাত নিজের বুকের উপর টেনে এনে গাঢ়স্বরে সে বলল, মরতে আমার একটুও দুঃখ নেই কর্তামা। কিন্তু ওকে আমি কার কাছে রেখে যাব!

মঞ্জরীর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করেই অন্নপূর্ণাও দেখলেন।

এও যেন অচেনা আর একজন। নিমাইয়ের মুখে তার স্বাভাবসিদ্ধ হাসির লেশমাত্রও এখন নেই, বড় বড় চোখ দুটির দৃষ্টি বুঝি সন্ত্রস্ত। অন্নপূর্ণাকে এই ঘরের দিকে আসতে দেখেই সেই যে সে তার মায়ের পায়ের কাছ থেকে উঠে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এখনও জড়সড় হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে সে।

চোখে পড়তেই চমকে উঠলেন অন্নপূর্ণা; বললেন, নিমাইয়ের কথা বলছিস তুই?

হ্যাঁ কর্তামা।

অন্নপূর্ণা তখন খাট থেকে নামলেন, এগিয়ে গেলেন নিমাইয়ের দিকে; তার হাত ধরে বললেন, এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? আমার কাছে আসিস নি কেন?

তুমি সেদিন আমাকে চড় মেরেছিলে কেন?—নিমাই ঠোঁট ফুলিয়ে বলল।

প্রথমে অনুপমের বিশ্বাসই হয় নি, পরক্ষণেই কিন্তু তার মনের দোলক একেবারে বিপরীত প্রান্তে চলে গেল, এই তো স্বাভাবিক ঘটনা—ঘটবে যে তা তো জানাই ছিল তার।

বৃদ্ধা তাঁর দুই হাত বাড়িয়ে ওই অতবড় মোটাসোটা ছেলেকেও তার বুকে তুলে নিলেন। মুখেও বললেন, আর মারব না।

আবার যখন তিনি মঞ্জরীর মাথার কাছে গিয়ে বসলেন তখনও নিমাই তাঁর কোলে। বালকের মুখে তখন হাসি ফুটেছে—সেই দুষ্টু দুষ্টু মন-ভোলানো হাসি।

মুখখানা ঘুরিয়ে অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চোখ তুলে সেই তার কচিকচি দাঁতকটি বের করে নিমাই বলল, সেদিন অত রাগ করে আজ আবার ভাব জমাতে চাও কেন তুমি?

না করে উপায় আছে আমার!

নিমাইয়ের কথা শুনেই অনুপম হেসে ফেলেছিল। সেই হাসি অন্নপূর্ণার চোখে পড়েছে; তখন অনুপমের মুখের দিকে চেয়েই তিনি বললেন, সাধে কি আর প্রথম বার ওকে দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠেছিল! উড়ে এসে জুড়ে বসল যখন তখনই বুঝেছিলাম যে আমার গোপালকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তাঁর সিংহাসন এই ছোঁড়াই একদিন দখল করবে! হলও তাই।

ধরা পড়বার লজ্জা গোপন করতে বৃথা চেষ্টা অন্নপূর্ণার। উত্তাপের চেয়ে উল্লাসই বেশী তাঁর কণ্ঠস্বরে, অভিযোগের ভাষা আবাহনের রসে সঞ্জীবিত হয়ে নতুন অর্থ বহন করছে। কেবল অনুপম নয়, মঞ্জরীও বুঝতে পারল তা। আবার চোখে জল এল তার; গাঢ়স্বরে সে বলল, সত্যি কর্তামা—আমার নিমাইয়ের ভার তুমি নেবে?

চোখে পলক পড়ে না মঞ্জরীর, তার নিশ্বাসও বুঝি বন্ধ হয়ে গেল; সমস্ত ঘরখানাই বুঝি রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। একটি মুহূর্তও মনে হয় যেন এক যুগ।

কিন্তু বাঁশী বাজল।

অন্নপূর্ণা বললেন, আমার বংশধর—আমার নাত্তির ভার আমি নেব না তো কে নেবে বউমা!

ভেঙ্গা ভেঙ্গা কথা, কিন্তু বেশ স্পষ্ট। শেষ পর্যন্ত শোনবার আগেই চোখ বুজল মঞ্জরী।

তখন আবার দেখেছিল অনুপম। এক নিমেষেই সে কী বিস্ময়কর পরিবর্তন! মঞ্জরীর শীর্ণ মুখের উপর অত যে ঘন হয়ে করাল মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছিল, অকস্মাৎ কোথায় গেল তা! সে মুখই বা কোথায়! আকারকে আড়াল করেছে রূপ, বর্ণের নীচে রেখা অদৃশ্য হয়েছে। কেবল আলো আর আলো। যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ।

আনন্দ, গর্ব ও লজ্জার অনির্বচনীয় সুষমামণ্ডিত নববধূর একখানা মুখ যেন। মঞ্জরীর তখনকার সে মুখ দেখে হঠাৎ চোখে জল এসেছিল অনুপমের। তবে আনন্দের অশ্রু তা। সে আনন্দ আত্মপ্রসাদ, মৃত্যুকে ঠেকাতে না পারলেও শেষমুহূর্তে তার মঞ্জরী বউদিকে সে অমৃত পরিবেশন করতে পেয়েছে।

কান্নায় কান্নায় পরিপূর্ণ অন্নপূর্ণার বুকের মধ্যে

সুধাভাণ্ডটি ঢাললেও ফুরিয়ে যায় না তা। আর শুরু করবার পর ক্রমাগত ঢেলেই যাচ্ছিলেন তিনি।

মঞ্জরীর মৃত্যুর পর তার সৎকার সম্বন্ধে কথা উঠেছিল। কে যেন বলেছিল যে বৈষ্ণব সমাজের রীতি অনুসারে মঞ্জরী বৈষ্ণবীর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করতে হবে।

শুনে কিন্তু সিংহীর মত গর্জন করে উঠলেন অন্নপূর্ণা: বলেন কি বাবাজী—ময়নাপুরের রাজবাড়ির বউ, আমার পুত্রবধূর হবে সমাধি? আমি তো এখনও মরে যাই নি!

কানাবাবাজী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বললেন, আমার গৌরসুন্দরেরও সেই ইচ্ছাই ছিল রানীমা। তাই তো দিই দিই করেও মেয়েকে আমার ভেক দেওয়া হয় নি।

দেওয়া হয়ে থাকলেও সৎকারই করতাম আমি।—অন্নপূর্ণা দৃঢ়স্বরে বললেন, আমার বউমার শেষকৃত্য সম্বন্ধে কেউ আপনারা কথা বলবেন না।

হলও তাই। অন্নপূর্ণাই সব ব্যবস্থা করেছিলেন। অনুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও থাকতে দেন নি তিনি।

সব শেষ হবার পর নিমাইকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করলেন অন্নপূর্ণা, তারপর নিজের হাতে তার গলায় কাচা পরিয়ে দিলেন।

অবোধ বালক নিমাই। কিছুই বুঝতে পারে নি সে, ফ্যালফ্যাল করে একবার এর একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। অন্নপূর্ণার নির্দেশগুলি সে পালন করেছিল যন্ত্রের মত। কিন্তু শেষ অঙ্কে সে বিদ্রোহ করল।

অন্নপূর্ণা তার হাত ধরে রিক্সাখানির দিকে তাকে নিয়ে যাবার উপক্রম করতেই নিমাই এক হ্যাঁচকা টানে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল, তারপর ছুটে গিয়ে কানাবাবাজীর গলা জড়িয়ে ধরল সে।

অন্নপূর্ণা বিস্মিত হয়ে বললেন, ওকি রে!

নিমাই আরও জোরে বৃদ্ধের গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর দাড়ির মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলল, আমি যাব না দাদু।

কানাবাবাজীও প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলেন, এখন হু-হু করে কেঁদে ফেললেন তিনি, পাকানো দড়ির মত হাত দুখানা দিয়ে নিমাইকে চেপে ধরলেন বুকে।

কিন্তু তারপর তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, অমন কথা কি বলতে আছে দাদু! গৌর আমার, সোনা আমার—যাও, তোমার ঠাকমার সঙ্গে যাও।

কিন্তু নিমাই অবাধ্য; সে বলল, না, যাব না। আমি তোমার কাছে থাকব।

তা কি হয় দাদু?

কেন হয় না?

আমি যে বাউল। গুরু আমার পায়ের শিকল কেটে দিয়েছেন, এখন তো উড়ে উড়ে বেড়াব আমি।

ধেৎ, তোমার বুঝি পাখা আছে!

বলতে বলতেই বৃদ্ধের দাড়ির ভিতর থেকে তার কচি মুখখানা বের করে নিয়েছিল নিমাই, এখন তার গলাও ছেড়ে দিল সে। কচি হাত দুখানি বৃদ্ধের কঙ্কালসার দুই কাঁধের উপর রেখে নিজের মাথাটা পেছনে হেলিয়ে কানাবাবাজীর মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ পর এই প্রথম আবার সে হাসল।

ভেজা ভেজা ঝাঁকড়া চুলগুলি অর্ধেক মুখ তার ঢেকে দিয়েছে। তবু বেশ দেখা যায় তার সেই দাঁত-বের-করা হাসি, বড় বড় চোখ দুটিতে বিস্ময়ের সঙ্গে পরিহাসের কোলাকুলি নৃত্য।

দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল অনুপম। কিন্তু অন্নপূর্ণা পায়ে পায়ে ওদের কাছে এগিয়ে গেলেন; বললেন, আপনাকে আমি উড়তে দেব না বাবাজীমশায়। আজ থেকে আপনিও আমার বাড়িতেই থাকবেন—আমার গোপালকে, আমাকে রোজ কীর্তন শোনাবেন আপনি। এখন উঠুন, জল আসবে মনে হচ্ছে।

জল তখন অন্নপূর্ণার চোখে, কানাবাবাজীরও।

খ

দিন সাতেক পরের কথা।

অন্নপূর্ণার বাড়ির সদর মহলটা একেবারে ফাঁকা, সরকারমশায়ের ঘরে তালা ঝুলছিল, দরোয়ানের ঘরটাও খালি।

কিন্তু সেজন্য থমকে দাঁড়ায় নি অনুপম, এ বাড়িতে সোজাসুজি অন্নপূর্ণার শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকবার জন্য কারও অনুমতি তাকে গ্রহণ করতে হয় না। তবুও

যে থমকে দাঁড়াল সে তার কারণ চলতে চলতে তার নিজের পা দুখানিই হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল।

দেউড়ি পার হতেই একতারার সুর কানে গিয়েছিল তার। সেই সঙ্গে কানাবাবাজীর চেনা গলায় ভজন গানের একটি কলিও :

পৌর্ণমাসী, কুন্দলতা জয় সখীবৃন্দ—

তার পরেই কোমল মধুর কণ্ঠে পাদপূরণ হল :

কৃপা করি দাও হে যুগল চরণারবিন্দ ॥

চমকে উঠল অনুপম, এ যে মঞ্জরীর কণ্ঠস্বর!

পরক্ষণেই সরু ও মোটা সম্মিলিত কণ্ঠে দ্বৈত সঙ্গীত :

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ গো—বিন্দ শ্রীরাধাগোবিন্দ
শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র ॥

অনেকবার শুনেছে অনুপম—কানাবাবাজী ও মঞ্জরীর সম্মিলিত কণ্ঠে বৈষ্ণবের পরম প্রিয় ওই মঙ্গলাচরণ সঙ্গীত। সেই পদ, সেই সুর, সেই কণ্ঠস্বরই তো!

গায়ে কাঁটা দিয়েছিল অনুপমের। কিন্তু পরের মুহূর্তেই ভ্রান্তি কেটে গেল।

মঞ্জরী তার স্বর ও সুর আত্মজ নিমাইয়ের কণ্ঠে রেখে গিয়েছে।

লজ্জা পেয়ে হাসল অনুপম। নিতান্তই ছেলেমানুষি একটা ভুল করেছিল বলে লজ্জা। কিন্তু কী মধুর ওই ভ্রান্তি!

একটু এগিয়ে গিয়েই আরও মধুর এক দৃশ্য তার চোখে পড়ল।

পা টিপে টিপেই এগিয়ে গিয়েছিল অনুপম। কিন্তু অন্নপূর্ণার ঠাকুরঘর—শোবার ঘরের দোরগোড়ায় আবার থমকে দাঁড়াল সে।

উন্মুক্ত দ্বারপথে স্পষ্ট দেখা যায়। ঠাকুরের দিকে মুখ, দোরের দিকে পেছন ফিরে পাশাপাশি বসে ভজন-গান গাইছেন কানাবাবাজী আর নিমাই। বাবাজীর হাতে তার সেই একতারা; ছোট দুই হাতে করতালি দিয়ে নিমাই তাল রাখছে। একটু দূরে চোখ বুজে জোড়াসনে বসে আছেন অন্নপূর্ণা—টাটকা চোখের জল তার গালে।

তিনজনেই তন্ময়—অনুপমকে কেউ দেখতে পায় নি।

মুগ্ধ হয়ে মিনিটখানেক ওই দোরগোড়াতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনুপম। তারপর পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেল—প্রাঙ্গণ পার হয়ে একেবারে পথে।

সেখানেই রতনের সঙ্গে দেখা অনুপমের।

রতন বলল, আপনাকেই খুঁজতে এসেছি বাবু।

কেন রে?

কলকাতা থেকে বড়বাবু ও মা এসেছেন।

বাবা ও মা! বোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুপমের মুখখানি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। আর সারা গায়ে সে কী রোমাঞ্চ!

ওঁরা যে অরুন্ধতীকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন।

[সমাপ্ত]

প্রাণপাখেয়

শ্রীদেবব্রত রেজ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাক্তার দেখলেন পথের ওপরেই যে জানলা, তার দু পাশে দুখানা আর্মচেয়ার। একখানা আর্মচেয়ার নীল রঙের চাদরে ঢাকা। ওটা কি ব্যবহার করা হয় না? ঘরের মাঝখানে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। আর তার দু দিকে দুখানা চেয়ার। টেবিলটাকে কোনও মহাপুরুষের ব্যবহৃত স্মৃতিচিহ্নের মত সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নিশ্চয়ই এর ব্যবহার নেই। প্রবেশ-দরজার বাঁদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা পালঙ্ক। ওপরের শয্যা সাদা বর্ডার দেওয়া ঘন নীল রঙের চাদরে মোড়া। এটাও কি অব্যবহৃত থাকে? শয্যার পাশে দেওয়ালে যে আলমারি তাতে বই ঠাসা। সব আসবাবপত্র দেখে সমীর ডাক্তারের মনে হল এর কোনটারই কোনও ব্যবহার নেই। কারও স্মৃতিকে ধারণ করে আছে এরা, আর সেই স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই এই আসবাবপত্রের কোথাও ব্যবহারের ক্ষুণ্ণতা নেই।

এই রকম একখানা ঘর বুঝি সমীর ডাক্তার স্বপ্নে দেখেছিলেন। তবে, সেই স্বপ্নের বাড়িটার প্রবেশপথ অন্যরকম। নীচু লোহার গেট পেরিয়ে লাল কাঁকড় বিছানো পথ। দু ধারে শৌখীন পামগাছ। পথটার শেষে গ্রীক ভাস্কর্যের অনুকরণে তৈরি কয়েকটা স্তম্ভ। সেই স্তম্ভের ওপর অলিন্দ। বাড়িটার ভ্রূকুটির মত।

অলিন্দের নীচে ছায়া।

এই ছায়াটা পেরিয়ে প্রবেশ-দরজা, কালো মেহগনিতে তৈরি, গায়ে অজস্র সোনার পেরেকের গোল গোল মাথা।

একদিন স্বপ্নে এই বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। ভিতরে ঠিক এমনি একখানা ঘর। আর সেই ঘরের মধ্যে এক নারী। চেহারাটা মনে পড়ে না। কখনও মনে হয় সে গাউন পরেছিল, কখনও মনে হয় ডুরে শাড়ি।

এই বাড়িটা তিনি স্বপ্নে বহুবার দেখেছেন। ঈথেল মানিনের একখানা বইয়ে পড়েছিলেন। তিনিও এই রকম একটা স্বপ্নে-দেখা বাড়ি পৃথিবীর বহু রাজপথে, বহু অলিগলিতে সন্ধান করেছেন।

সমীর ঈথেল মানিনের স্বপ্নে দেখা বাড়িটার বর্ণনার সঙ্গে নিজের স্বপ্নে-দেখা বাড়িটার ছবি মনে মনে মিলিয়ে দেখেছিলেন—কোথাও কোথাও মিলে গিয়েছিল এই দুটো অবচেতনসম্ভূত বাড়ি। তখন তাঁর প্রথম যৌবন। ঈথেল মানিনকে তিনি ভালবেসেছিলেন। তারপর একদিন একটা দেশী বা বিদেশী পত্রিকার পাতায় ঈথেল মানিনের আলোকচিত্র দেখে তাঁর উদ্দেশে সেদিনকার মত—সেই বয়ঃযুগটার মত—নিজের চিত্তটা বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সে আজ প্রায় পনেরো ষোল বছর আগের কথা। বয়স তখন সতেরো আঠারো।

এমন ভালবাসার কথা, এমন প্রেমের কাহিনী শুনেছে কি কেউ কখনও? এতদিন পরেও সেই বাল্য-প্রেমের কাহিনীটা মনে বেদনা সঞ্চার করে। এই বয়সের পরিণতবুদ্ধি এই প্রেমের কারণ বিশ্লেষণ করে একটা মনগড়া যুক্তি খাড়া করেছে। যুক্তিটা এই। বাংলাদেশের সতেরো বছরের এক ছেলে সমীর ও সাতাশ বছরের ঈথেল মানিন স্বপ্নে প্রেমের একই সঙ্কেত (symbol) দেখেছিলেন। এই প্রেমের কথা মনে পড়তে আপন মনে হেসে ওঠেন সমীর ডাক্তার।

নিজের হাসিতে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে ভিতরের দরজার দিকে চেয়ে দেখলেন, মৃণাল ধুতি পাঞ্জাবি হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কৌতূহল হল স্বপ্নে দেখা

নারীর সঙ্গে, ঈথেল মানিনের সঙ্গে এঁকে মিলিয়ে দেখার। কোথায় যেন মিলল। বহুদিনের পুরনো স্মৃতির মত আধো-চেনা আধো-অচেনা।

হাসছেন যে?

আমার স্বভাব।

নিন, কাপড় ছেড়ে নিন। আসুন, বাথরুম দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু হাসলেন কেন?

চিনতে পেরেছেন কি!—মনে মনে ভাবলেন মৃণাল।

স্বপ্ন দেখছিলাম।—হেসে উত্তর দেন সমীর ডাক্তার।

স্বপ্ন? জেগে জেগে?

হ্যাঁ।

মৃণাল হেসে ফেলেন: অদ্ভুত লোক তো আপনি? নিজের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আপনি কি মোটেই সচেতন নন?

নিশ্চয়ই, আমি খুব ভিজেছি। ভিজতে খুব আরাম লেগেছে কিন্তু। আর এমনভাবে না ভিজলে তো আপনার এই ঘরটায় আমি কোনদিনই প্রবেশের অধিকার পেতাম না। আমার সৌভাগ্য যে আজ এই বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রাত্রি দুপুরে ভিজেছি।

মৃণালের মনে হল সেদিন হাসপাতালের বেডে উনি যখন রোগী হয়ে শুয়ে অর্ধঅচেতন তখন যে হাতখানা তাঁর দিকে এগিয়ে এসেছিল সেই রকম মনোময় একটা হাত বুঝি এগিয়ে এসেছে আবার।

মৃণাল হেসে বললেন, আচ্ছা, কাপড় ছেড়ে আসুন। তারপর আপনার লজিকে ভুল দেখিয়ে দেব।

ভিতরে যেতে যেতে সমীর বললেন, আপনি বুঝি দর্শনের ছাত্রী?

না। চিনতে পারেন নি!

বুকের ভিতর থেকে পিণ্ডের মত কী একটা কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলে উঠে এল। অভিমান—মানুষের উপর অভিমান, জগতের ওপর অভিমান।

না, আমি নার্স।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে, বাইরের ঘরে ফিরে এসে সমীর দেখলেন, মৃণাল দেবী (ডাক্তার তখনও তাঁর নাম জানতে পারেন নি) টেবিলে খাবার আর কফির সরঞ্জাম সাজিয়ে টেবিলের কানায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সমীর সহজভাবে মৃণালের পাশে চেয়ারটায় বসে আপ্যায়নের সরঞ্জামের দিকে চেয়ে বললেন, এ কিন্তু স্বপ্নের বাইরে। স্বপ্নে এটা দেখি নি।

তারপর সমীর নিজের স্বপ্নে দেখা বাড়িটার কাহিনী বলে গেলেন। কাহিনী বলা শেষ হলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

মৃণাল হঠাৎ বলে বসেন, দেখলেন ভুল? আপনার পরিচয় নিলাম কিন্তু নিজের পরিচয়টা আপনাকে দেওয়া হয় নি।

অন্তরে ভাবলেন, ওঁর স্মৃতির মধ্যে আমার এই চিহ্নটুকু, এই তিন-অক্ষরের শব্দটুকু, নিহিত হয়ে যাক।

সমীর বলেন, নামধামের পরিচয়টাকে আমি বিশেষ আমল দিই না। আপনার যা পরিচয় পেলাম তার চেয়ে বড় পরিচয় কি আপনি নামধাম জানিয়েও দিতে পারতেন?

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন মৃণাল, কী পরিচয় পেলেন এর মধ্যে?

আমার মন আপনার সংজ্ঞাটা পেয়ে গেল আপনা থেকেই।

কিসের সংজ্ঞা? আমার সংজ্ঞা আমি নার্স।

এর পর হল খুঁটিনাটি পরিচয় বিনিময়।

পরিচয়শেষে মৃণাল বললেন, আপনি আমার এখানে কিছুদিন থাকতে পারেন।

পারি তো। কিন্তু থাকব না। স্বপ্নকে বাস্তবে টেনে আনলে বাস্তবটা স্বপ্ন তো হয়ই না, বরং স্বপ্নটার সমাধি ঘটে। তার চেয়ে এই পর্যন্তই ভাল। সকাল হলে যখন চলে যাব তখন আতরের গন্ধের মত মনের ওপর এই চেনার স্মৃতিটুকু লেগে থাকবে।

মৃণাল স্নিগ্ধ চোখে মানুষটার দিকে চেয়ে রইলেন। এঁর এই নিরাশ্রয়তার মধ্যেও এমন আহ্বান—নিঃসঙ্গা এক যুবতীর এমন আহ্বান কেমন সহজে এড়িয়ে গেলেন। ভারী নিস্পৃহ মানুষটা। মৃণাল প্রকাশ্যে বললেন, আপনি কি সত্যিই এতটা নিস্পৃহ?

নিস্পৃহ? কে বললে আমি নিস্পৃহ? আমার স্পৃহা গরুড়ের স্পৃহার মত—

কী করে?

আপনি হয়তো ভাবছেন এই অযাচিত আশ্রয়দানের আহ্বান আমি এত সহজে প্রত্যাখ্যান করলাম কী করে?

আকাশের মধ্যস্থল থেকে দিগন্ত পর্যন্ত ব্যবধানটাকে চিরে, শাখা-প্রশাখা মেলে একটা বিদ্যুচ্ছটা নিমেষের জন্যে জ্বলে উঠে মিলিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে, ঘন কালো রাত্রির ছাদের ওপর গুরু গুরু শব্দের পিণ্ডরা দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। ঘরের মধ্যে তাঁর কাঁপন লাগল। কাঁপন লাগল মৃণালের হৃদয়ে।

সমীর ধীরে ধীরে বললেন, অদ্ভুত লজিক এই প্রকৃতির। আমার আসল কথাটা প্রকাশ করার মুখেই গুরু গুরু ধ্বনি করে আমাকে শাসিয়ে গেল পাছে আমার স্বধর্মটা আমি ভুলে যাই। আসল কথা, আমি নিজেকে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী প্রাকৃতিক প্রকাশ বলে মনে করি। আমার তিরিশ বছরেরও বেশী কাল এই ভাবেরই আশ্রয়ে গেছে কেটে।

বাকী তিরিশটাও এমনি করে এই ভাবেরই মধ্যে কেটে যাবে। আমি তাই জীবনের কানায় কানায় ঘুরে বেড়াই। প্রবৃত্তি বলুন, বাসনা বলুন, কোনও কিছুর উগ্রতার ভিতরে আমি যাই না। যেতে ভয় পাই। ভয় হয়, কোনও কিছু একটা ভেঙে ফেলব। সংসারের কোনও সাজানো ব্যবস্থা হয়তো তছনছ করে দেব। তাই আমি এড়িয়ে চলি।

তা ছাড়া— একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বলে চলেন সমীর: তা ছাড়া, এই পাশেপাশে ঘুরতে আমার ভালই লাগে। ভাবি, আর কটা বছর পরেই তো আমার এই অপূর্ব রূপ-দেখা চোখ দুটো মুদে যাবে, আমার এই রেডিয়ো ভালবের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ ধরে নেওয়া মনটা উবে যাবে, কী হবে জীবনে গোলযোগ বাধিয়ে? কী হবে টানাহ্যাঁচড়া করে?

একমুহূর্ত থেমে বললেন, কিন্তু তাই বলে নিস্পৃহ নই আমি—

মৃণাল মনে মনে বলেন, তা আমি জেনেছি। বন্ধু, তুমি যে তোমার দক্ষিণ হাতখানা আমার দিকে একদিন বাড়িয়ে দিয়েছিলে!

আপনার বেগেই উৎসারিত হয় সমীরের কথা।

এক এক সময় আমার মন এমন তীব্র অনুভবলোকে হারিয়ে যায় যে আমি তার নাগাল পাই না। সে যেন আপন খেয়ালে উড়ে চলে, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা রাখে না। দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে, উর্ধ্বে উঠে, জগৎটাকে পাখীর চোখ দিয়ে দেখে। তাই ছোট কোনও কোণে সে বাসা বাঁধতে চায় না।

মাঝে মাঝে আমি বুঝতে পারি আমি একসঙ্গে অনেক মানুষ—যেন একাধারে রাফায়েল, আভিসেনা, পুশকিন, বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন! অনেক সময় এদের সকলকে আমি, এই চোখের সম্মুখে, দেখতে পাই— যেমন দেখছি আপনাকে।

মৃণালের মনে পড়ল এই সব হ্যালুসিনেশনের কথা লেখা আছে এপিলেপ্সির প্যাথলজিতে।

সমীর ডাক্তার দীর্ঘ শ্বাস টেনে আচ্ছন্নের মত বলে চলেন, আমি যদি নতুন দাভিঞ্চি হতাম, আজ থেকে হাজার বছর পরের জ্ঞানবিজ্ঞান সঙ্গীত শিল্পকলার সত্য যদি আমার মধ্যে আবির্ভূত হত, প্রকৃতি আমার মধ্যে ভবিষ্যৎ মানুষের মুখপাত্রকে খুঁজে পেত যদি, আমি যদি সর্বমানুষের একটা সকলন, একটা অ্যানথোলজি হতাম, তাহলে—তাহলে সার্থক হত জীবনটা।

শ্বাসকষ্ট হচ্ছে নাকি?

বইয়ে পড়েছে মৃণাল এও নাকি এপিলেপ্সির একটা সিম্পটম।

মৃণাল সমগ্র মনকে দুই চোখে সংহত করে চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। না, সহজ হয়ে এসেছে শ্বাস। ওই তো কী মিষ্টি হেসে ফেললেন। কী অপূর্ব মুখখানা— যেন শীলেরের মুখ, কিংবা শেলীর মুখ!

সমীর হেসে বললেন, কী হবে এইটুকু নিয়ে? এইটুকু বুদ্ধি নিয়ে? কী হবে এইটুকু জীবন নিয়ে? কী হবে এইটুকু জ্ঞান নিয়ে? কী হবে একটুখানি প্রেম নিয়ে? কী হবে একটুখানি ব্যথা নিয়ে, কী হবে সামান্য বেদনায়? আমি তাই শূন্যমনে হালকা মেঘের মত ভেসে বেড়াচ্ছি। সাধারণ দুঃখ আমাকে ছোঁয় না, সাধারণ লোভ আমাকে আকৃষ্ট করে না, ছোটখাটো সীমিত বিষয়ে স্পেশালাইজড্ জ্ঞান আমাকে তৃপ্তি দেয় না।

মৃণালের মনে সহসা কী একটা অচেনা অনুভবের

দোলা লাগে। মুগ্ধ হয়ে আপন মনে বলে ওঠেন: আপনি ?...

মনের প্রশ্নটা কথা পায় না। এই প্রশ্নটাই প্রশ্ন আর উত্তর একসঙ্গেই।

সমীর হেসে বলেন, ক্ষমা করবেন—মধ্যরাত্রি কিনা, তাই স্বপ্ন দেখছিলাম।

আপনি ?

মৃণালের মন আবার আচ্ছন্ন হয়ে আসে প্রশ্নে। আবার সেই প্রশ্ন উত্তরের সঙ্গে মিলে যায়।

জানি আমি স্বাভাবিক নই। আমি স্বভাবের অতিরিক্ত, না স্বভাবের বিকৃতি, তা বুঝে উঠতে পারি না। প্রকৃতি হয়তো আমার মনে, আর আমার মনের মত অসংখ্য মনে বিচিত্র ধারার গোলযোগ সৃষ্টি করে সেই মনগুলোকে অসংখ্য আবর্তে ঘুলিয়ে দিয়ে, একটা নতুন ধারা খুঁজছে।

দীর্ঘ শ্বাস টেনে নিমেষের জন্য থেমে বললেন, আপনারা একে বলবেন রোগ। প্যাথোলজিস্ট বলবেন এই অস্বাভাবিকত্ব একটা রোগ, একটা omnibus নাম দেবেন এপিলেপ্সি।

বাইরে আবার একটা শাখা-প্রশাখাযুক্ত বিদ্যুৎ আকাশ মধ্য থেকে দিগন্তচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যবধানকে চিরে খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে, তীব্র আলোকধারায় ছড়িয়ে পড়ল। সেই আলোকে সুপ্ত নগরীর প্রাসাদগুলো স্বপ্নমূর্তি হয়ে দেখা দিল। একটা ভৌতিক দীপ্তি যেন মুহূর্তের জন্য এই একান্ত বিনশ্বরকে স্বপ্নরূপে অবিনশ্বর করে দিল। দুজনের স্মৃতির মধ্যে অবিনশ্বর। যা ছিল চিত্তের বাইরে তা চিত্তের অংশ হয়ে গেল স্মৃতির আকারে আকারিত হয়ে।

সমীর বললেন, একে আমি রোগ বলে মানতে পারি না। একদিকে এটা ডিসইন্‌টিগ্রেশন আর একদিকে এটা যেন মালটিপ্লিকেশন—একদিকে ভাঙন আর একদিকে বহুধা হয়ে যাওয়া। আমি বুঝেছি আমি ভেঙে ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু অবাক হয়ে দেখছি আমার এক এক টুকরোতে এক একটা মানুষ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে—সব মিলিয়ে হয়তো একটা এমন মানবসত্তা যার সঙ্গে যোগ-সাধনের জন্যে আমার মন নিয়ত সচেষ্ট। আপনারা বলবেন রোগ! আমার মনে হয়, এই রোগটা বুঝি আমার নতুন জীবনের দিশারী—এই রোগের মধ্য দিয়ে আমি একটা বিরাটকে স্পর্শ করতে পারি। বিরাটের স্পর্শে আমার আমি শতধা হয়ে চূর্ণ হয়ে যায়!

এতক্ষণ কথা বলার পর গভীর শ্রান্তি নেমে এল সমীরের চোখে। চোখ মুদে এল। মৃণাল অভিভূতের মত চেয়ে রইলেন মুদ্রিতনয়ন এই বিচিত্র আবির্ভাবের সম্মুখে। মৃণাল ভাবলেন, সমীর ঘুমিয়ে পড়েছেন। মৃণালের মনে কিন্তু স্বস্তি নেই। তাঁর সারা মনে একটা আশঙ্কা ছড়িয়ে গেল। ভাবলেন, ফিট হতে পারে তো! কিন্তু, কী করবেন? আত্মা যদি শকুন্ত হত তাহলে মেলে দেওয়া যেত তার ডানা ওর চারদিকে!...

কয়েক মুহূর্তের জন্য দুজনেই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ সমীর চোখ মেললেন। দেখলেন মৃণাল বাম হাতের মুষ্টিতে চিবুকের ভার রেখে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সমীর ভাবলেন, যাই, এবার সন্তর্পণে চলে যাই। মিছিমিছি ওর ঘুমটা আমি নষ্ট করলাম। চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন যাবার জন্যে। বাইরে চেয়ে দেখলেন আকাশে মেঘ নেই। ক্ষীণ চাঁদ নেমেছে পশ্চিমের কোলে।

চেয়ার থেকে উঠে কয়েক পা বাড়াতেই মৃণালের ঘুম ভেঙে গেল। যেন সমীরের ক্ষীণ পদশব্দ তাঁর মনের একটা অদৃশ্য অ্যাম্‌প্লিফায়ারে গম্ভীর হয়ে বেজে উঠল। মৃণাল চোখ মেলতেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সমীর।

খুব অস্বস্তি হচ্ছে ভেবে মৃণাল দেবী, আমি আপনার ঘুমের সময়টা প্রলাপ দিয়ে ভরিয়ে দিলাম। আমি এবার চলি।

মৃণাল দুই চোখ পরিপূর্ণ মেলে সমীরের চোখের দিকে চেয়ে রইলেন।

সমীর বলে চলেন, আমি চলে গেলে ভাববেন, আপনি আমাকে স্বপ্নে দেখেছেন, আমার কথাগুলো স্বপ্নে শুনেছেন। আমিও আপনার সম্বন্ধে এই কথাই ভাবব। আমাদের এই দেখা, কথা বলা—এ তো স্বপ্নই। বাস্তব জীবনে এ ভাবে দেখাও হয় না, এ রকম পাগল অতিথি রাত্রি দ্বিপ্রহরে কোন তরুণীর ঘরে ঢুকে প্রলাপও বকে না—বাস্তব জীবনে আমার মত উদ্ভট কথাও কেউ বলে

না—লোকে শুনলে বলবে আমরা দুজনেই কবি-কল্পিত চরিত্র!

যেন মৃণালকে আশ্বস্ত করার জন্ম কিংবা নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্ম আবার বললেন, ভাবুক গে, আমরা তো রয়েছি—ওদের চোখ যেমন সম্মুখের আর পিছনের জিনিস একসঙ্গে দেখতে পায় না, তেমনই ওদের মনও একদিকে বইলে তার বিপরীত দিকে বয় না। ওরা রোগ দেখে তো রোগের ভিতর নতুন জীবন দেখে না। যাক গে, ওরা যা ভাবে ভাবুক, আজকের মত মাঝরাত হয়তো ওদের অনেকের জীবনেই আসবে, কিন্তু আজ আমি যে চোখে আপনাকে দেখে গেলাম এমন দেখায় হয়তো কেউ কাউকে দেখবে না কোনদিন।

মৃণালের মন অভিভূত হয়ে বারবার উচ্চারণ করল, ও আমাকে চিনেছে, চিনেছে, চিনেছে! বাইরে জিজ্ঞাসা করলেন, কী চোখে?

যাযাবর যে চোখে দূর মরুপ্রান্ত থেকে মরূদ্যানের গাছের চূড়ো দেখে সেই চোখে।

এবার পা বাড়িয়ে দিলেন সমীর যাবার জন্যে।

আমি যাই এবার?

আপনি সত্যি সত্যিই চলে যাবেন?

সত্যি নয়তো কি?

কোথায় যাবেন?

ঘর খুঁজতে।

কী করবেন, ঘর খুঁজে না পেলে?

ভাবি নি এখনও।

এখানে আসবেন। আপনার ছাড়া কাপড়চোপড় রইল আমার কাছে। ফিরে এসে নেবেন। আমার কাছে আসতে কোন সঙ্কোচ করবেন না।

সমীর কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করলেন কিছু একটা বলবেন বলে।

কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরল না। ধীর পদে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মৃণাল গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। দরজা খুলে সমীর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চৌকাঠের বাইরে।

আকাশে আর মেঘ নেই। ক্ষীণ চাঁদ উঠেছে পশ্চিমের কোলে। কয়েক পা এগিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, দেখেছেন প্রকৃতির লজিক, ঠিক তালে চাঁদও উঠেছে।

যাকে উদ্দেশ করে বললেন তাঁর উপস্থিতিটা অনুভব করলেন নিজের পাশেই।

আবার কোথায় দেখা হবে?—ব্যথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন মৃণাল।

প্রকৃতির লজিকের ওপর আমাদের হাত নেই কোন, কী করে বলি বলুন? এরপর যেদিন দেখা হবে সেদিন হয়তো দেখবেন আমি খানখান হয়ে ভেঙেচুরে ছড়িয়ে পড়েছি—কিছুটা পাখির মধ্যে, কিছুটা পশুর মধ্যে, কিছুটা ধাতুতে ধুলোয়, আর বাকীটা আপনার পায়ের তলায় ছায়ার মত!

ক্ষীণ চাঁদের আলো মেঘের ফাঁক দিয়ে বর্ষার মত ঝকমক করে বেরিয়ে এসেছে। জল-দাঁড়ানো পথের ওপর একফালি চাঁদের রশ্মি, হাওয়ায় উড়ে যাওয়া রজত-কেশদামের মত, ছড়িয়ে পড়েছে। তার মধ্য দিয়ে সমীর ডাক্তার চলে গেলেন ঈষৎ টলতে টলতে।

মৃণালের দু চোখ ভরে কান্না উছলে উঠল। আর কিছুই দেখতে পেলেন না।

ষষ্ঠ পর্ব

সমুদ্রের স্বাদ

আজবনগরের আকাশের ওপরেও এই মৌসুমী চালিত মেঘ ফণা উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার পর থেকেই তারাখচিত আকাশটাকে যেন ঘন কালো পুরু মখমলে ঢেকে রয়েছে। কোনও কোনও স্থানে এই কালো মখমলে নিঃশব্দ বিদ্যুতের ছটা স্বর্গবিহঙ্গের পুচ্ছের মত নিজেকে মুহূর্তের জন্য বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ল্যাবরেটরির বেষ্টনী পেরিয়ে ধর্মঘট ইস্পাত-নগরী আজবনগরে বিস্তার লাভ করেছে। বরেনের গবেষণাগার বন্ধ হয়ে গেছে।

ধর্মঘটীদের সংগ্রাম-পরিষদে কর্নেল নির্বাচিত হয়েছে নেতা হিসেবে। তারই নির্বন্ধাতিশয্যে বরেন ধর্মঘটীদের নেতৃত্বের উপদেষ্টারূপে কাজ করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

বরেন স্বভাবতঃই একাকী। কিন্তু নিজের এই একাকীত্বকে তাঁর অহঙ্কার বলে মনে হয়েছে। তা ছাড়া এই একাকীত্ব আজ তাঁর কাছে বেদনা হয়ে দেখা দিয়েছে। থিসিস হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে কেমন একটি নিরবলম্ব ভাব জেগেছে মনের। তার ওপর আছে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের মৃত্যু। কোলাপোভা তাঁর কাছেই রয়েছেন, কিন্তু দুজনের মাঝখানে একটা পার্টিশন রয়ে গেছে। ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের ছায়া দিয়েই যে এই পার্টিশানটা তৈরি তা নয়, এই পার্টিশানটা অংশতঃ তাঁর নিজেরই তৈরি। নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকে তফাতে রেখেছেন কোলাপোভার কাছ থেকে। কোলাপোভার সঙ্গে প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারের স্মৃতি কথায় মিষ্ট রসে মনকে এখনও ভিজিয়ে রেখেছে।

প্রেম সে মনসিজ ও দেহজ একসঙ্গেই। দেহ থেকে বহু দূরে শুধু মনের অন্তঃপুরে প্রেম যে তার আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না তা নয়। কিন্তু এমনিই ভাগ্য মানুষের যে দেহের থেকে যত দূরত্ব বাড়ে প্রেম তত নিঃসঙ্গ হয়ে

পড়ে, বেদনার ভারে তত পীড়িত হয়ে পড়ে। দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকার অর্থ ভ্রান্তি অজ্ঞানতা, কিন্তু দেহের থেকে দূরে যাওয়ার অর্থ দেহজ্ঞানহীন শূন্যতার কাছাকাছি যাওয়া।

মন যতক্ষণ দেহের অভিকর্ষ বা গ্রাভিটেশনের ভেতর থাকে ততক্ষণ তা দেহের চারদিকে ঘোরে উপগ্রহের মত, কিন্তু এই অভিকর্ষ ক্ষেত্রের বাইরে গেলেও তার অস্বাচ্ছন্দ্যের সীমা নেই—এ যেন গহন শূন্যে পাড়ি, একাকীত্বে আত্মবিলোপ।

তা ছাড়া মানুষের মন যখন তার তপস্যার যা ধারা সেই ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তা দেহের দিকে পড়তে আরম্ভ করে। যেমন উপযুক্ত বেগ হারিয়ে ফেললে উপগ্রহ অভিকর্ষের টানে গ্রহের উপর পড়ে ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায়।

বরেনের তপস্যায় পড়েছে বাধা। কোলাপোভার দিকে তাঁর সমস্ত ভারটা পড়ে আসছে। এটাকে প্রতিরোধ করার জন্যেই যেন বরেন কর্ণেলের অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। ধর্মঘটীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন।

আশ্চর্য, ডেপুটি ডিরেক্টর তাঁর চলাফেরায় কোনও বাধা সৃষ্টি করলেন না। তিনি ঘর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে ঘরে আসা-যাওয়া করেন, আর তাঁর বাড়ির বাইরে পুলিস শুধু প্রহরা দিয়েই যায়। কাকে প্রহরা দিচ্ছে, কেন প্রহরা দিচ্ছে বোঝা যায় না। বরেন এদের উপস্থিতিটাও ধীরে ধীরে ভুলে গেলেন। বরেনের সমস্ত দৃষ্টি পড়েছে এই ধর্মঘটের দিকে।

মাঝে মাঝে সৈন্যেরা পিচ-ঢালা রাস্তার ওপর রুটমার্চ করে যায়। বরেনের মনে হয় পিকাশোর ছবি থেকে বেরিয়ে এসে ওরা পথে পায়চারি করছে। কেমন অলীক মনে হয়।

কোথাও দেখেন একদল শ্রমিক আর একদল সৈন্য মুখোমুখি দুটো অপরিচিত মানবগোষ্ঠীর মত পরস্পরের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে দুই বিপরীত দিকে চলে গেল। কোথাও একজন সৈনিক এক ধর্মঘটীর গা ঘেঁষে একই দোকানে পান-সিগারেট কিনছে। ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে দুজনেই পাশের মানুষটার সম্পর্কে একেবারেই অচেতন।

ধর্মঘটীদের মেয়েরা কোন কলে জল ধরছে, গোটা-কয়েক সৈন্য বা পুলিস কাছের দোকানে আড্ডা করার ছলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে দেখছে। মেয়েরাও ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁট দুমড়ে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে তাদের দিকে।

এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে বরেনের বারংবার মনে হয়েছে মানুষের জাত এই যে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এই বিভাগটি একেবারে কাল্পনিক, সম্পূর্ণ অলীক। দুটো দলই এই অলীকত্ব বুঝছে অথচ পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। মাঝখানে একটা তৃতীয় শক্তি স্বচ্ছ কাচের আধারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সৈন্যরা শ্রমিকদেরই আপনজন, তবু অলীক একটা ডিউটির ধারণা ওদের ব্যবহারকে এমন হাস্যাস্পদ করে তুলেছে। এরা দু দল মিলে এক হয়ে যেতে পারে যদি কতকগুলো ধারণার মাকড়সার জাল দু দলের মাঝখান থেকে ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া যায়।

আশ্চর্য, মানুষ এমন অলীক একটা দেওয়ালের এপারে ওপারে পৃথক পৃথক জাতে ভেঙে গেছে! এই অলীকটা শুধু মাত্র কয়েকটা ধারণা দিয়ে তৈরি।

এই দু দলের পিছনে আজবনগরের বিরাটকায় কারখানাটা গগনস্পর্শী চোঙ তুলে, ইস্পাতবর্মে ঢাকা বিরাট শিবলিঙ্গের মত ব্লাস্ট ফার্নেসের চুল্লীগুলো নিয়ে, আকাশের গায়ে ইস্পাতের নানান কাঠামো ছড়িয়ে দিয়ে, মূক ভাগ্যের মত কঠিন রূপে দাঁড়িয়ে আছে গায়ে বিজলীর চাদর জড়িয়ে। সন্ধ্যায় সভায় বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে মায়ামুগ্ধের মত বরেন চেয়ে দেখলেন কারখানার দিকে।

আজকের এই মেঘে কালো-করা আকাশের নীচে এই বিদ্যুৎ-দীপগুলোকে সহস্র সহস্র খদ্যোতিকার মত মনে হচ্ছে। সাদা অ্যালুমিনিয়ম রঙে পেন্ট করা বিরাট গ্যাসের আধারটা একটা চাঁদের মত ঝুলছে আকাশে।

সভায় দাঁড়িয়ে বরেনের মনে হল এই বিরাট যন্ত্র সমাবেশটা ইতিহাসের একটা কঠিন সত্য। এটাকে মঞ্চসজ্জা মনে করে এর পটভূমিকায় দু দল অভিনেতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অর্থের একটা প্রহসনে অভিনয় করছে।

বললেন, এই যে কঠিন সত্য তোমাদের আমাদের—সৈন্যদের শ্রমিকদের পিছনে স্ফিংক্সের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে এর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ও চিরটাকাল এমনি চুপ করে থাকবে না।

এর পর একটা গ্রীকপুরাণের গল্প বললেন।

[ক্রমশঃ]

স্বাধীনতা দিবসের অনুচিন্তা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে বর্তমানের পশ্চিম পাকিস্তান, কিন্তু তদানীন্তন ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তের রাবী-তটে ভারতের ইতিহাস একটি নতুন মোড় নিয়েছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লাহোর কংগ্রেসে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস নয়, পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য রূপে নির্ধারিত হয়েছিল। বহুদিনের পরাধীনতার ফলে আচ্ছন্ন গণমানসকে এই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য ওই লাহোরে এও স্থির করা হয়েছিল যে পরবর্তী ২৬শে জানুয়ারি দেশের প্রতিটি জনপদে জনসভার আয়োজন করে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হবে স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য।

সেই সঙ্কল্পবাক্যের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হল: "আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভের জন্য অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ন্যায় ভারতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় শ্রমার্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবনধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোন গভর্নমেন্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নির্যাতন করে তবে সেই গভর্নমেন্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করিবার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারত-গভর্নমেন্ট ভারতবাসীকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মসমুন্নতির সর্বনাশ করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।"

স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্পবাক্যে এর পর পরাধীন ভারতের শিল্প বাণিজ্য ও শুল্কনীতির শোষণাকারী স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বিদেশী শাসকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা-বিরোধী কার্যকলাপ সম্বন্ধে জাতিকে সচেতন করা হল। তারপর বলা হল, "সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়া বৈদেশিক শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদিগকে আমাদের বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ফলে যে শৃঙ্খল আমাদিগকে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলকেই আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি।" এই সব কারণে সর্বশেষে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হল যে "মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ"-স্বরূপ এই পরশাসনবন্ধন ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসী কংগ্রেসের নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

কংগ্রেস তখন আজকের মত একটি রাজনৈতিক দল নয়—সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক কংগ্রেস। তাই কংগ্রেসের ডাকে জাতি উদ্দাম উত্তাল হয়ে উঠল। পরবর্তী সতেরটি বছর "হিন্দুস্তান উথল পড়েগা"—এই আর্যবাক্যের বাস্তব রূপায়ণের ইতিহাস।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দুঃখ ও বেদনা ভুলে ভারতীয় জননায়কেরা স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প-বাক্যের মারফত জাতিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার রূপায়ণের জন্য এ দেশে এক গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজনে লেগে পড়লেন। ভারতীয় গণপরিষদ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতবর্ষের সংবিধান গ্রহণ করলেন এবং তদনুযায়ী আজ থেকে তের বৎসর পূর্বে এমনি এক ২৬শে জানুয়ারিতে ভারতবর্ষ এক গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হল।

সাধারণতন্ত্রী ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও ওই একই মূলনীতি উচ্চারিত হল। আরও একটু স্পষ্ট ভাবে জাতি ঘোষণা করল:

আমরা, ভারতবর্ষের জনসাধারণ শুদ্ধচিত্তে স্থির

করেছি যে ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হবে এবং এর প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক স্থায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার থাকবে। ভারতীয় জনসাধারণের চিন্তা, মত-প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্মমত ও উপাসনার স্বাধীনতা থাকবে। এ দেশে পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে থাকবে সাম্য এবং জাতীয় সংহতি ও ব্যক্তির মর্যাদার নিশ্চয়তা দিয়ে জনসাধারণের ভিতর সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

নিঃসন্দেহেই ভারতবর্ষের সনাতন মূল্যবোধ এবং আধুনিক পৃথিবীর অন্ততম ভাবাদর্শের আদর্শ সমন্বয় ঘটল ভারতীয় সংবিধানের ওই মূল নীতিতে।

দুই

রাবী-তটে সঙ্কল্প গৃহীত হবার চৌত্রিশ বৎসর এবং এ দেশে এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেবার তের বৎসর পর আমাদের রাষ্ট্রিক ধ্যানধারণার ওই মূল নীতিকে সাকার করার পথে কতটা এগোতে পেরেছি—এ চিন্তা আজকের দিনে ওঠা স্বাভাবিক। সুতরাং বিগত দিনের লাভ-লোকসানের একটি খতিয়ান করার চেষ্টা করা অনুচিত হবে না।

এসিয়া ও আফ্রিকার নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনেকগুলি দেশেই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সমাধি রচিত হলেও ভারতবর্ষে আমরা একে বজায় রাখতে পেরেছি বলে কৃতিত্ব ও গৌরব দাবি করতে পারি। কারণ গণতন্ত্র কেবল একটি শাসন-ব্যবস্থা নয়, এ একটি জীবনপদ্ধতিও বটে। গণতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত বিবিধ প্রকারের মৌলিক স্বাধীনতা প্রগতিশীল মানবসংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। সৈনিক শাসনের তথাকথিত "এফিসিয়ান্সি" অথবা সর্বহারার একনায়কত্বের আওতায় প্রলেটারিয়েটদের জন্ম দুধ ঘিয়ের বন্যা বইয়ে দেবার মধুর দিবাস্বপ্ন এক শ্রেণীর অপরিণত-বুদ্ধির মানুষের কাছে যতই আকর্ষক বোধ হোক না কেন, এর কোনটিই মানবীয় মূল্যবোধের পরিপোষকতার দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রের তুলনায় অধিকতর কাম্য হতে পারে না। সুতরাং পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের কার্যকলাপ পরিচালন করার জন্ম অবশ্যই এ দেশবাসী প্রশংসার্হ। বিশেষ করে আমরা যদি এই কথা স্মরণ রাখি যে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বুদ্ধিতে অপেক্ষাকৃত অপ্রবীণ এবং শিক্ষায় অনগ্রসর প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীকে ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

ভৌতিক ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের প্রগতি একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পার সার্থক রূপায়ণের পর আমরা জাতির আর্থিক উন্নতির জন্ম তৃতীয় পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার চেষ্টা করছি। দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাথাপিছু গড় আয়ও বেড়েছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং সমাজকল্যাণমূলক অপরবিধ কাজের ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতি অনুরূপ অবস্থায় উন্নয়নকার্যপ্রারম্ভকারী যে কোন রাষ্ট্রের চেয়ে ভাল।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের মূল্যায়ন এখানেই শেষ করতে পারলে যথেষ্ট আত্মতুষ্টি লাভ করা যেত, কিন্তু সত্যের মর্যাদা তাতে রক্ষিত হত না। সুতরাং আলোর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের কথাও বলতে হবে।

জাতীয় আয় ও মাথাপিছু গড় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও দেশের দরিদ্রতম অংশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। জাতীয় আয়ের বর্ধিত অংশ কোথায় যাচ্ছে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার জন্ম ভারত-সরকার অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটির যে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে পরিকল্পনাসমূহের রূপায়ণের ফলে দেশের দীনতম ব্যক্তিটির অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নি—এর লাভ পেয়েছেন অবস্থাপন্ন সম্প্রদায়। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদনের কথাও উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় লোকসভায় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বরে পূর্বোক্ত কমিটির যে প্রতিবেদন পেশ করা হয়, তাতে দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলের কৃষি-শ্রমিকেরা (এঁদের সংখ্যা সাত কোটি কুড়ি লক্ষ) ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় আরও দরিদ্র এবং আরও ঋণগ্রস্ত হয়েছেন।

বেকার সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা নেই। একটি হিসাবে প্রকাশ যে মোট ১১৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৃতীয় পরিকল্পনাকে রূপায়িত করলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার

শেষের নব্বই লক্ষ বেকার তো থেকেই যাবে, এ ছাড়া ওই বেকার-বাহিনীতে ত্রিশ লক্ষ নূতন কর্মপ্রার্থী যোগ দেবে। অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট বেকারের সংখ্যা হবে এক কোটি কুড়ি লক্ষ।

শাসন-বিভাগে দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অস্তিত্ব আছে এবং তার কারণে জনসাধারণ নিগৃহীত বোধ করছে।

প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ বৃত্তির অস্তিত্ব আমাদের জাতীয় সংহতির বনিয়াদে ফাটল ধরাচ্ছে। চীনা আক্রমণের ফলে যে আপাত-ঐক্য দেখা দিয়েছে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দিগন্ত থেকে তার অমঙ্গলজনক ছায়া অপসারিত হবার পর এই ঐক্যের কতটুকু বজায় থাকবে, সে সম্বন্ধে সংশয় জাগা অমূলক নয়।

আর্থিক অসাম্য, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদির কারণে সমগ্র ভারতবর্ষই যেন একটি বিরাট জ্বালামুখীর উপর বসে অগ্ন্যুৎপাতের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। অনতিবিলম্বে এসব সমস্যার সমাধানের উপায় দেখা না দিলে এ দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী এবং তার ফলে আমাদের একান্ত প্রেয় বহুবিধ শ্রেয় মূল্যবোধের অবলুপ্তি অবধারিত।

তিন

কিন্তু এহো বাহ্য। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের অবক্ষয়ের প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী। সমস্যা কেবল ভৌতিক ক্ষেত্রেরই নয়, এর মূল আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকেও স্পর্শ করেছে এবং এইটাই হল সবচেয়ে বিপজ্জনক কথা। ভারতবর্ষের ভিতর অন্ধ ভোগাসক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে বলে প্রারম্ভেই নিবেদন করে রাখি যে আমরা দেশবাসীকে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনামূলক জীবনযাপনে বাধ্য করার নীতি প্রচার করছি না। আমরা জানি যে দেহধারণ করার জন্য মানুষের কিছু কিছু ন্যূনতম চাহিদা আছে এবং কালের প্রভাবে সেই ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার মান আজ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোগোপকরণের চাহিদার দিক থেকে বিচার করলে বৈদিক বা অপর কোন প্রাচীন যুগের মানসিকতায় প্রত্যাবর্তন করা আজ সম্ভব বা কাম্য নয়। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে বহু-কথিত এক প্রাচীন সত্যের পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন—উপকরণ-বাহুল্য মানুষকে সুখ বা শান্তি কোনটারই খোঁজ দিতে পারে না। ঘৃতাহুতি দিয়ে যেমন অগ্নির ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায় না তেমনি উপকরণপ্রাচুর্যে চাহিদার নিবৃত্তি আসে না।

এ প্রসঙ্গে ইতিহাস থেকেও শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। রোমান সভ্যতার পতনের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে গীবন (The Decline and fall of the Roman Empire) প্রমাণ করেছেন যে প্রায় বর্বর হূনদের কাছে রোমের আত্মসমর্পণের অন্যতম কারণ হল অত্যধিক ভোগাসক্তি। আমাদের দেশেও প্রবলপ্রতাপ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম মূল কারণ বিলাস ও ব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া—এ কথা আমরা জানি। কেবল অতীত ইতিহাস নয়, আধুনিক ইতিহাসও এর সাক্ষ্য বহন করে। শিক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী-জনতার প্রতিরোধ জার্মান আক্রমণের সম্মুখে তাসের কেল্লার মত ভেঙে পড়ল। এর কারণ আবিষ্কার প্রসঙ্গে আধুনিক মনীষীরা ফরাসীদেশের ভোগবাদী জীবনযাত্রাকে দায়ী করেছেন।

দেশমাতৃকার বন্ধনমোচন করার সংগ্রাম পরিচালনার যুগে যাঁরা নিজেদের জীবনকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ নিরিখ রূপে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, স্বাধীনতার পর তাঁরা ভোগবিলাসে গা ভাসালেন। রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রী এবং সংসদ ও পরিষদ সদস্যরা তো বটেই, এমন কি যাঁদের এইসব সুবিধা দেওয়া আর সম্ভব হল না নানারকম কমিটি ও কর্পোরেশনের আওতায় অথবা বিদেশের দূতাবাসে পাঠিয়ে তাঁদের জন্য গাড়ি বাড়ি ও মোটা মাসহারার বন্দোবস্ত করা হল। এর ফলে দেশের জনসাধারণও ঐহিক ভোগকেই পরমার্থ জ্ঞান করা আরম্ভ করল। জওহরলালজীর ভাষায় রাষ্ট্রের "ডিগনিটি" অর্থাৎ মর্যাদার জন্য দরিদ্র দেশের অর্থ এই ভাবে ব্যয় করা হতে লাগল। শাসকদলের নেতৃবৃন্দ ভুলে গেলেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এবং আজও এদেশের মর্যাদার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক মহাত্মা গান্ধী অথবা রবীন্দ্রনাথের জীবনে ভোগবাদের তিলমাত্র স্পর্শ ছিল না। এমন কি বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যেও এর

ছোঁয়া লাগল। এ কথা আজ আর গোপন নেই যে বিরোধী দলসমূহের মধ্যেও আজকাল পূর্বোক্ত সুবিধা-ভোগী পদ পাবার জন্য তীব্রভাবে রশি টানাটানি চলে।

অথচ কোন জীবিত ও বর্ধিষ্ণু জাতিই এ ভাবে ভোগবাদকে আদর্শ জ্ঞান করতে পারে না। জড়বাদের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া ও চীন প্রমুখ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ এ-জাতীয় কুদৃষ্টান্ত তাঁদের দেশবাসীর সম্মুখে পেশ করেন নি। ভিয়েৎনামের কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ হো-চি-মিন দিল্লী পরিদর্শনের সময় যে রকম ভদ্র অথচ দৃঢ় ভাবে ভারত কর্তৃক প্রদত্ত রাজকীয় সম্বর্ধনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাতে বুদ্ধ চৈতন্য গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের দেশ ভারতবর্ষের চোখ খোলা উচিত ছিল। কেবল কমিউনিস্ট দেশই নয়, ইংলণ্ড আমেরিকার মত গণতান্ত্রিক দেশেও ভোগবাদকে জীবনের আদর্শ করা হয় নি। প্রতিবাদের আশঙ্কা আছে জেনেও এ কথা বলা হচ্ছে। পশ্চিমী দেশসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সে দেশের পরিমাপ করি কয়েকটি সিনেমা ও যৌনবাদী সাহিত্য থ্রিলার ও হরর কমিক্‌সের মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক দেশগুলির জীবনীশক্তির উৎস আবিষ্কারের ওই ভ্রান্ত পন্থার মোহমুক্ত হয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে ওইসব জাতির মানসলোকের পরিচয় পাবার চেষ্টা করলে আমাদের বিশ্লেষণের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। পশ্চিমী দেশগুলি ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী উপকরণ ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু সেটা ওইসব দেশের বিশেষ আর্থিক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণের জন্য। এর সঙ্গে তাদের অ্যাটিচুড বা প্রবণতার সম্পর্ক নেই বলে প্রয়োজন হলে মুহূর্তের মধ্যে এসব ছেড়ে কৃচ্ছ্রতার জীবন গ্রহণ করতে পারে। আর ঘটনাচক্রে আমরা স্বল্প উপকরণ ব্যবহার করলেও আমাদের মনে কিন্তু ভোগের তীব্র বাসনা। তাই জাতির প্রয়োজনে কিছু ছাড়তে বাধ্য হলেই আমাদের মধ্যে আর্তনাদ ওঠে।

ভোগাসক্তি কেবল যে আমাদের জনজীবনকেই দূষিত করেছে, তাই নয়। সাহিত্যে যৌনবাদ প্রচার, যুবক-যুবতীদের পোশাকে প্রদর্শনবাদ ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্ত শৃঙ্গারচর্চা এই ভোগাসক্তির পরিণাম। এই ভোগাসক্তির আর এক রূপ অভিব্যক্ত হয় ধনিক সমাজ কর্তৃক অর্থ-লোলুপতার জন্য দরিদ্র শোষণে, পয়সার লোভে খাদ্যে ওষুধে ভেজাল দেওয়ায়, অধ্যাপক ও শিক্ষকদের অধ্যাপনায় অবহেলা, চিকিৎসকদের রোগীর প্রতি উপেক্ষা—এ সবও ভোগবাদের উপাসনার ফল। নিজের ঐহিক ভোগবিলাস যখন একমাত্র লক্ষ্য হয় তখন তার জন্য মানুষ যেনতেনপ্রকারেণ অর্থোপার্জনকেই একমাত্র মোক্ষ জ্ঞান করে।

চার

কেবল ভোগবাদের প্রাবল্যই নয়, আরও কয়েকটি দুরন্ত ব্যাধি ভারতবর্ষের জনজীবনকে আক্রমণ করেছে। এর মধ্যে প্রমুখ হল দেশের সম্মুখে বিধায়ক (positive) বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও কোন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করার স্বভাবের (seriousness) অভাব। কোন মহৎ মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আমাদের নেই। আমরা স্বয়ং ক্ষীণ দুর্বল এবং নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ বলে এ কথা বিশ্বাস করতেই চাই না যে পৃথিবীতে এমন কিছু লোক থাকতে পারেন যাঁরা জগদ্ধিতায় জীবনধারণ ও কাজ করে থাকেন। এর ফলে পরম শ্রদ্ধেয়জনের প্রতিও অশ্রদ্ধেয় উক্তি করতে আমাদের বাধে না। সকল খদ্দরধারীই চোর, গৈরিকবস্ত্র পরিধানকারী প্রতিটি মানুষ ঠগ—এই হচ্ছে পূর্বোক্ত মনোভাবের ফলিত রূপ। লঘুতাপিয়াসী মনোবৃত্তির আধুনিকতম নিদর্শন হল চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আচরণ। বেশ এক শ্রেণীর ভারতবাসীর হাব-ভাব ও চালচলন দেখে এ কথা মনেই হয় না যে আমাদের দেশ চীনের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে এক জীবন-মরণ যুদ্ধে নিরত। এখনও সিনেমা-থিয়েটারে হাউস ফুল, কফি-হাউস ও রেস্তোরাঁতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেশের যুবশক্তির সময়ের অপচয়, সাজপোশাক ও গয়নার ঘটা, সেই পিকনিক ও খাওয়া-দাওয়ার ধুম। অর্ডিনান্স না করলে গহনা তৈরির জন্য বাইশ ক্যারেট সোনার ব্যবহার বন্ধ করা যায় না।

আমাদের দেশাত্মবোধের পরিমাণ কোন আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন স্বাধীন জাতির উপযুক্ত নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের

দীর্ঘ আত্মনিগ্রহের ইতিহাস, দেশবিভাগজনিত রক্ত-মোক্ষণ এবং বিদেশী শাসনের কারণে দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদির পীড়ন সত্ত্বেও এ কথা প্রত্যক্ষ সত্য যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য আমরা যথেষ্ট মূল্য দিই নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট চারিত্রধর্ম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে আমরা বড় সহজে স্বাধীনতা পেয়েছি। তাই স্বাধীনতার মূল্য আমরা এখনও সম্যক্ ভাবে বুঝতে শিখি নি এবং স্বাধীনতা হারানো যে প্রাণবায়ুর জীবনস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়া—এ বোধও উদগ্র ভাবে আমাদের ভিতর জাগরূক হয় নি। এরই কারণ আমাদের আচার-ব্যবহারে সাধারণ সভ্য নাগরিক বিধানের অভাব। চীনা আক্রমণের ফলে ব্যহ্যতঃ দেশপ্রেম দৃষ্টিগোচর হলেও এর কতটা ক্রোধ ও অহংমণ্ডিত হিস্টিরিয়া এবং কতটা যথার্থ দেশাত্মবোধ—এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। যথার্থ দেশপ্রেম মানুষকে ধীর ভাবে দেশের জন্য চরম আত্মনিগ্রহ বরণে অনুপ্রেরিত করে। পক্ষান্তরে ক্রোধ ও অহংভিত্তিক হিস্টিরিয়া আপাতদৃষ্টিতে প্রবল শক্তি বলে প্রতীয়মান হলেও ধোপে টেকে না।

অপর একটি ব্যাধির নাম জড়তা। অতীতে মানুষ সকল প্রকার দুঃখদুর্দশা ও সমস্যার জন্য ললাটের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করত। বিধিলিপির কারণে যে দুর্ভোগ, তা মানুষে দূর করবে কী করে? আজ বিধাতা ও বিধিলিপির স্থান গ্রহণ করেছে রাষ্ট্র। কোন সমস্যার সম্মুখীন হলেই আমরা উচ্চৈঃস্বরে রাষ্ট্রকে গালাগালি দিই। স্কুল কলেজ হাসপাতাল খুলবে রাষ্ট্র, চাকরি দেবে রাষ্ট্র, কৃষিক্ষেত্র ও কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র এবং এমন কি সাহিত্য চিত্রকলা ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষকতাও রাষ্ট্রকে করতে হবে। অবশ্য এ সমস্যা কেবল ভারতবর্ষের নয়, এ এক বিশ্বজনীন সমস্যা। যাই হোক, আমরা এ প্রসঙ্গে একটি কথা ভুলে যাই এবং তা হচ্ছে এই যে অধিকাধিক মাত্রায় রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হওয়ার অর্থ স্বৈরতন্ত্রকে আমন্ত্রণ জানানো। কারণ রাষ্ট্রকে সবকিছুর ব্যবস্থা করতে হলে রাষ্ট্রকে দেশের তাবৎ সম্পদ (এর মধ্যে জনসম্পদও পড়ে) নিজের আয়ত্তে আনতে হবে। আর প্রয়োজন পড়লে শাসনকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উপায় না থাকার নামই তো স্বৈরতন্ত্র। আরও অধিক যুক্তিজাল বিস্তার না করে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র আমেরিকার একটি তথ্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক। আজও সে দেশের শিক্ষাব্যয়ের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রত্যক্ষ দানে চলে। এর ফলে সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপরাপর অনেক দেশের তুলনায় কম। সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের সচেতন অতিক্রম (initiative) হবে অগ্রণী এবং প্রয়োজন হলে সরকারী সাহায্য নেওয়া হবে—এই হচ্ছে স্বাধীন সমাজের নিয়ম।

স্বাধীনতার পর আমাদের স্বদেশাভিমান দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এক মেকী আন্তর্জাতিকতার প্রভাবে আমরা বিদেশী সংস্কৃতির দাসবৎ অনুকরণ করছি। পাছে ভুল বোঝা হয় তাই প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে আমরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছুতমার্গে বিশ্বাসী নই। এ ক্ষেত্রে "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে"—এই হচ্ছে আদর্শ পন্থা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে নিজের ভাঁষা পোশাক ধর্ম আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ সব-কিছুকে বর্জন করে বিদেশের কুকুরকে স্বদেশের ঠাকুরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া। আমরা চাই সংস্কৃতির সমন্বয়, আপন সংস্কৃতির নির্বিচার আত্মসমর্পণ নয়। অথচ দেশের একাংশে, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর এই উর্ধ্বোমূলোঽধঃশাখ স্থিতি। দেশের শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদিও এই ঝুটা আন্তর্জাতিকতার আক্রমণে পর্যুদস্ত। অথচ শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ ছাড়া যথার্থ আন্তর্জাতিকতার বনিয়াদ রচিত হতে পারে না। ভারতবাসী খাঁটি ভারতীয় হলেই কেবল আদর্শ বিশ্ব-নাগরিক হতে পারে।

পাঁচ

তবে কি চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে রাবী-তটে গৃহীত সেই সঙ্কল্প এবং তের বৎসর পূর্বেকার শপথ কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় থেকে যাবার জিনিস? স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প-বাক্যের মর্মবাণী এবং সাধারণতন্ত্রী ভারতবর্ষের সংবিধানের লক্ষ্য বাস্তবে রূপায়িত হবার কোন আশাই কি নেই? না, এতটা নৈরাশ্যবাদের কোন হেতু নেই। কারণ

আমরা মনে করি যে পূর্বোক্ত বিবিধ প্রকারের ব্যাধি কেবল ভারতবর্ষের বহিরঙ্গকেই স্পর্শ করেছে, ভারতের অন্তরাত্মা এখনও স্বীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল। এ বিশ্বাস অহৈতুকী আত্মপ্রসাদ অথবা অলীক স্বাজাত্যভিমান-প্রসূত নয়।

আজকের ভারতবর্ষে পূর্বোক্ত বক্তব্যের সবচেয়ে বড় নজির হল আচার্য বিনোবা ভাবের সাধনা। এক শ্রেণীর সাংবাদিকদের পল্লবগ্রাহী বুদ্ধিসঞ্জাত "মূঢ় বিজ্ঞজন"সুলভ বিনোবাজীর বিদ্রূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এ কথা ঘোষণা করতে আমাদের তিলমাত্র কুণ্ঠা নেই যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ভারতাত্মার মর্মবাণী সার্থক ভাবে রূপ পেয়েছে। তিনি এবং তাঁর ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন না থাকলে স্বাধীন ভারতবর্ষে ব্যাপক ভাবে নিষ্কাম লোকসেবার ধারা অব্যাহত থাকত না। আর সকলে যখন জনসেবার বিনিময়ে পদ ও বৈভবের মত্ত উপাসনা আরম্ভ করায় জনজীবনে গ্লানির সঞ্চারের কারণ হলেন, গান্ধীজীর সাধনার সার্থক অনুগামী বিনোবা ভাবে তখন একাদিক্রমে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পদব্রজে পরিভ্রমণ করে লোকজীবনকে শুদ্ধ করার প্রয়াসে ব্রতী।

কেবল বিনোবা ভাবেই নন, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী জমির মত দেহের রক্ত-মাংসের সমপর্যায়ভুক্ত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বেচ্ছায় নিজের নিরন্ন ভাইকে সমর্পণ করে, তাদের ভিতর নিঃসন্দেহে মহত্ত্বের মানবীয় মূল্যবোধের বীজ বিদ্যমান এবং উপযুক্ত বারি-সিঞ্চনে সেই বীজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হবে। যে হাজার হাজার গ্রামের অধিবাসী "সমাজায় ইদম্ ন মম" মন্ত্র গ্রহণ করে গ্রামদান করেছেন, তাঁদের সমাজচেতনা বিশ্বের যে কোন দেশের পক্ষে শ্লাঘার বস্তু।

বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলনে সাংগঠনিক দুর্বলতা অবশ্যই আছে এবং সে দুর্বলতা দূর না হলে এ আন্দোলন বাঞ্ছিত ফল প্রসব করতে পারবে না। তবে সেই কারণে দূর থেকে কেবল ওই আন্দোলনের সমালোচনা করলে দেশ তার কর্তব্যে পতিত হবে। কারণ ভূদান আন্দোলন ব্যর্থ হলে সে ব্যর্থতা কেবল বিনোবাজী অথবা তাঁর স্বল্প-সংখ্যক অনুগামীর নয়—সে ব্যর্থতা সমগ্র ভারতবর্ষের। ভবিষ্যৎ ইতিহাস এই বলে আমাদের যুগকে ধিক্কার দেবে যে ভারতবর্ষের মর্মবাণীর শ্রেষ্ঠতম গুণাবলী যখন যুগোপযোগী সমস্যাকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করছিল, ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তখন নির্লিপ্ত ভাবে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে কেবল তার সমালোচনা করেছেন, তার সঙ্গে একমত হয়ে তাকে সার্থক করার প্রয়াস করেন নি।

কিন্তু বিনোবাজীর প্রসঙ্গ আপাততঃ মুলতুবী থাক। কংগ্রেস প্রজাসমাজবাদী ইত্যাদি রাজনৈতিক দলে এবং তাদের সমর্থকদের ভিতরও বহু ভাল লোক আছেন। যাঁরা একেবারে গোঁড়া কমিউনিস্ট, অর্থাৎ পার্টির অন্ধ ভক্ত তাঁদের কথা বাদ দিলে ওই পার্টির সমর্থক সহস্র সহস্র জনসাধারণের ভিতর অধিকাংশই কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন এবং দীনতম ব্যক্তিটির অনুকূলে পরিবর্তন কামনা করেন বলেই ওই পার্টির অনুগামী। গোঁড়া কমিউনিস্টদের অভারতীয় নীতি ও কার্যকলাপের সঙ্গে এইসব পার্টির অগণিত সমর্থকের সম্বন্ধ নেই। তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস মিথ্যা ভগবানের উপর ন্যস্ত করে থাকতে পারেন; কিন্তু তাঁদের নূতন মূল্যবোধ কায়েম করার ইচ্ছাতে কোন খাদ নেই। এ ছাড়া দেশের প্রায় প্রতিটি জনপদে সাহিত্য অভিনয় পুস্তকাগার ও সমাজসেবা ইত্যাদি ক্ষুদ্র অহংয়ের ঊর্ধ্বে ওঠার যে কোন একটি কার্যক্রমকে অবলম্বন করে বহু ক্লাব ও সমিতি আছে। এইসব সমিতি ও ক্লাবে যেসব ছেলেমেয়েরা "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়", তারাও জাতির অমূল্য সম্পদ। এদের দৃষ্টি ও আদর্শকে আরও একটু ব্যাপক করতে সাহায্য করলে এরাই নূতন সমাজ গড়ার অগ্রদূত হবে। ভারতবর্ষের এই জনসাধারণদের মাধ্যমেই গান্ধীজীর মহৎ জাদু বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছিল। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে এরা নূতন করে নিজেদের শক্তি সপ্রমাণ করতে পারে।

কিন্তু কে দেবে সেই নেতৃত্ব? কোন্ দল অথবা কোন্ নেতা? না, গণতন্ত্রের যুগে নেতৃত্বও হবে গণতান্ত্রিক। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষকে নূতন যুগের নেতা হতে হবে। অর্থাৎ আপনি আমি—আমরা সবাই একক ও যৌথ ভাবে ভারতবর্ষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠব। আমাদের কথা, আচার-ব্যবহার—সমগ্র জীবনচর্যাই হবে নূতন ভারতবর্ষের মূল্যবোধের অনুকূল। এর কমে রাবী-তটের সঙ্কল্প ও সংবিধানের শপথ সাকার করা সম্ভব হবে না।

ছাব্বিশে জানুয়ারি বিষয়মুখ (objective) হয়ে আত্মবিশ্লেষণ করার দিন। ছাব্বিশে জানুয়ারি অন্তঃকরণে কর্তব্যকর্মে আত্মনিয়োগ করার শপথ নেবার দিন।

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

বিক্রমাদিত্য হাজরা

এ যুগটা হচ্ছে অসাহিত্যিকদের যুগ। কথাটা হয়তো অনেকের কানে বেসুরো লাগতে পারে, কিন্তু কথাটা একটি মর্মান্তিক সত্য। কিছু ঘটনা আর কিছু কল্পনা মিশিয়ে একজাতের মনোরঞ্জক পাঁচন তৈরির যে ফরমুলাটা যাযাবর, রঞ্জন, মুজতবা আলী অ্যাণ্ড কোম্পানি আবিষ্কার করেছিলেন কালক্রমে তার বাড়বাড়ন্ত দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারছি না। এঁরা প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে প্রকৃত সাহিত্য রচনার জন্য যে-ধরনের সাধনা দরকার, যে বিশেষ ধরনের মানসিক প্রস্তুতি দরকার, এ যুগে আর সে-সবের কোন আবশ্যকতা নেই। আবশ্যকতা নেই শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট নয়, বরং বলা চলে খ্যাতি অর্জনের পথে সে-সব আজ বিষম বাধা। ইচ্ছেমত চড়া রঙের ইঁট সাজিয়ে যাও, রঙের বাহার দেখে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, সমগ্র ইমারতটা যে একটি পুলিস-ব্যারাক ছাড়া আর কিছু হল না তা কারও নজরে পড়বে না। অংশ যেখানে সমগ্রের অধীন, যেখানে সমগ্র অংশকে ছাড়িয়ে গিয়ে একটি নিটোল সৌন্দর্য-মূর্তি গড়ে তোলে, সেখানে হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা যায় কমে। সে জিনিস এ যুগে চলবে না।

Fact আর fiction মেলানোর যে ফরমুলা, ড্রাগনের মাথার সঙ্গে উচ্চিংড়ের ধড় যোজনা করার যে অপূর্ব কলা, তার কথা যত ভাবছি তত মুগ্ধ হচ্ছি। তথ্য বলে কিছু জিনিস দিচ্ছি বটে, কিন্তু তার সত্যতার দায়িত্ব নিচ্ছি না; কারণ কোথায় যে তথ্য শেষ হয়ে কল্পনা শুরু হচ্ছে তা তো আর দাগ টেনে দেখিয়ে দিতে হচ্ছে না। প্রচুর পরিমাণে চটকদার কাল্পনিকতার ভেজাল দিচ্ছি বটে, কিন্তু তার মধ্যে সর্বাঙ্গীণ ঐক্যসৃষ্টির কোন দায় নেই। এ রকম দায়িত্বহীন কাজ আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। এই কিম্ভূত আর্টের সঙ্গে সার্কাসের ক্লাউনের আর্টের বিলক্ষণ মিল আছে। যে-কোন রকমভাবে উদ্ভট কিছু করতে পারলেই ক্লাউনের দায়িত্ব শেষ। তেমনি যে-কোন উপায়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই রম্য-রচনার দায়িত্ব শেষ।

প্রকৃত উপন্যাসে চরম নাটকীয় দৃশ্যের সংখ্যা খুব বেশী থাকে না। একটি নাটকীয় দৃশ্য অবতারণার জন্য প্রচুর প্রস্তুতি দরকার হয় সেখানে। কারণটা খুব স্বাভাবিক। নাটকীয়তা সৃষ্টিই প্রকৃত উপন্যাসের লক্ষ্য নয়। দৃশ্যকে অতিক্রম করে দৃশ্যাতীত কিছুর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করাই আসল সাহিত্যের লক্ষ্য। কিন্তু ক্লাউন-সাহিত্যে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনার কোন প্রশ্নই ওঠে না; একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে অল্প দামের অথচ কড়া জাতের মদ দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠককে নেশাগ্রস্ত করে ফেলা। লেখকের সব সময় আতঙ্ক পাছে প্রথম পৃষ্ঠা শেষ হতে হতেও পাঠক নেশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। তা-হলে বিষম বিপদ; পাঠক হয়তো আর দ্বিতীয় পৃষ্ঠা খোলার তাগিদ বোধ করবে না।

প্রতি পৃষ্ঠায় একটি করে ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টিই হচ্ছে এ যুগের আলাদীনের প্রদীপ। কিছুদিন আগে এই প্রদীপটি অবধূতের হাতে পড়েছিল। দু-তিন বছরের মধ্যে তিনি যে কী অসাধ্যসাধন করেছিলেন তা যাঁদের স্মৃতিশক্তি বেশী তাঁরা হয়তো এখনও স্মরণে আনতে পারবেন। সেই সময় এই ভদ্রলোকটির বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে আমি অনেক দস্তুরমত সাহিত্য-চর্চা করেন এমন লোকের কাছেও ধমক খেয়েছি। আজ তাঁদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দিলে যে তাঁরা লজ্জিত হবেন তা নয়। কারণ এককালে যে তাঁরা অবধূতের সমর্থক ছিলেন আজ সে-কথা তাঁরা ভুলে গিয়েছেন।

'দেশ' পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় (বিখ্যাত

করবেন কিনা জানি না ; কিন্তু কোন পত্রিকা হাতে পেলে আগে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলো পড়ি, ভিতরে যা জিনিস থাকে তার থেকে বিজ্ঞাপনগুলো পড়তে বেশী ভাল লাগে বলে) পড়ছিলাম শ্রীশঙ্করের একখানা বই নাকি এক মাসের মধ্যে চারবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ভেবে দেখুন, বাংলাদেশের মত জায়গায়—যেখানে পাঠক-সংখ্যা খুবই কম, পাঠকদের বই কেনার অভ্যাস আরও কম, সেখানে এক মাসে চার সংস্করণ!!!! রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি ছিল, তাই সময় থাকতে পালিয়ে বেঁচেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁকে পথ চলতে চলতে শুনতে হত কোন তরুণ পাঠক 'শেষের কবিতা' বা 'যোগাযোগে'র সঙ্গে 'চৌরঙ্গী'র তুলনা করছে!

'দেশ' পত্রিকাকে সেলামালেকুম। এই সব যুগন্ধর লেখকদের সঙ্গে এঁরা পাঠক-সমাজের মোলাকাত করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি করজোড়ে 'দেশে'র বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র অভিযোগ উত্থাপন করতে চাইছি। আজকাল 'দেশ' পত্রিকা তার পাঠকদের রুচি শিক্ষা দিচ্ছে ; সাহিত্যে সৌন্দর্যের মাপকাঠি কী তা শিক্ষা দিচ্ছে। সেই 'দেশ' পত্রিকা তারই আবিষ্কৃত আশ্চর্য আশ্চর্য লেখকদের সম্পর্কে কেন এদের নোবেল প্রাইজ দেওয়া হবে না—এই প্রশ্ন পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছে না! আমার তো মনে হয় এ প্রশ্ন না তুলে 'দেশ' নিজের ঘোষিত সাহিত্য-নীতির প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

শঙ্করের পরে যিনি 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য-ঐতিহ্য বহন করছেন তাঁর নাম বিকর্ণ। ইতিপূর্বে আমি এই মহাপুরুষ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি। পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় অন্ততঃ একটি করে চরম নাটকীয় সিচুয়েশন অবতারণা করার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। সে-সব সিচুয়েশন মোটেই আভাস-ইঙ্গিতের ব্যাপার নয়, পুরোদস্তুর প্রাক্‌টিক্যাল,—তাতে রক্তের গন্ধও আছে মাংসের গন্ধও আছে। সম্প্রতি 'দেশে'র ৮ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় তাঁর রচনার পরিসমাপ্তি ঘোষিত হওয়ায় একটা আরামসূচক 'আঃ' মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতেই চেপে গেলাম। একটি জঞ্জাল ঘাঁটার দায় থেকে অব্যাহতি পেলাম বলে তো স্বস্তিবোধ করার সত্যিই কোন কারণ নেই। এ তো জানা কথাই যে অলিম্পিকের প্রদীপ কখনও নির্বাপিত হয় না। কেউ না কেউ সেই অনির্বাণ শিখাকে ধারণ করতে এগিয়ে আসবেই পরবর্তী সংখ্যায়। কাজেই ভয়েরও কিছু নেই, ভরসারও কিছু নেই।

ভদ্রলোক তাঁর 'দণ্ডক-শবরী'তে শেষ ভেল্‌কিটা দিয়েছেন খুব জুতসই ভাবে। আগের সংখ্যায়—অর্থাৎ ১লা অগ্রহায়ণের সংখ্যায় লেখক নায়ক-নায়িকার বিয়ের অষ্টাদশ পর্বের বর্ণনা দিয়েছেন। দেখলাম লেখক জানেন যে বাংলাদেশের কোন বাড়িতে এমন গিন্নী নেই যিনি বিয়ের সালঙ্কার বর্ণনা ভালবাসেন না। পরের সংখ্যাতেই লেখক বিবৃত করেছেন নায়কের যুদ্ধযাত্রা এবং মৃত্যু। এর নাম হল নাটক—এবং সাহিত্যের মোদ্দা ব্যাপারটা হল নাটক। আপনি একটুকরো মাখন মুখে দিলেন। দাঁতের মাঝখানে গিয়ে হঠাৎ সেটা লোহা হয়ে গেল এবং আপনার বত্রিশখানা দাঁত ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল। এর নাম হল নাটক। এ রকম যদি লিখতে পারেন তবে আপনার লেখা লোকে পড়বে, না হলে পড়বে না।

শুধু এই নাটকটুকুর ব্যাপার হলে ভদ্রলোকের কথা এবার আর উত্থাপন করতাম না ; কারণ ইতিপূর্বে একবার তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গটা আবার না তুলে পারলাম না এইজন্য যে ১লা অগ্রহায়ণের সংখ্যায় লেখককে তাঁর কোন কাল্পনিক সঙ্গী সাহিত্যিক বলে উল্লেখ করেছে। তার মানে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে লেখক নিজেকে সাহিত্যিক বলে মনে করেন। কথাটা ভাবতেই আমার এমন হাসি পেয়েছিল যে সে হাসির ভাগ আর পাঁচজনকে না দিয়ে পারছি না। বিকর্ণ না জানুন, কিন্তু অনেকেই জানেন যে লেখক আর সাহিত্যিক—এ দুটো কথার মধ্যে অর্থগত কিছু তফাত আছে। ব্যবসাগত প্রয়োজনে 'দেশ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ 'দণ্ডক-শবরী' ছাপলেও তাঁরা বিকর্ণকে সাহিত্যিক বলে মনে করেন না ; 'দেশ' পত্রিকার কয়েক হাজার পাঠক আমোদ পাওয়ার জন্য 'দণ্ডক-শবরী' গোগ্রাসে গিললেও বিকর্ণকে সাহিত্যিক বলে মনে করেন না ; কিন্তু বিকর্ণ নিজে মনে করেন যে তিনি সাহিত্যিক।

আমার তো মনে হয় 'দণ্ডক-শবরী' নামক মহানাটকের সবচেয়ে বড় নাটক হল এইটে।

• • •

আগেই বলেছি যাঁরা অসাহিত্যিক এ যুগটা তাঁদের পক্ষে উৎকৃষ্ট। যাঁরা আধা-সাহিত্যিক বা হলেও-হতে-পারতেন সাহিত্যিক, তাঁদের পক্ষেও এ যুগটা মোটামুটি মন্দ নয়। অনেক পাঠকের বোধ হয় মনে আছে যে রামরাম বসুর জীবনী-উপন্যাস লেখার ছল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মশাই রেশমী নামে একটি কাল্পনিক মেয়ের রোমান্স ও অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণ লিখেছিলেন 'কেরী সাহেবের মুন্সী' নামক বইয়ে। বইখানার মধ্যে কিছু কিছু ভাল জিনিস থাকলেও বইখানি উপন্যাস হয়ে ওঠে নি unity-র অভাবে। এবং বইখানায় যে unity ব্যাহত হয়েছে, তার কারণ লেখকের পাঠককে সস্তায় খুশী করবার সুবিধাবাদী মনোভাব।

সম্প্রতি বিশীমশাই 'লালকেল্লা' নামক আর একখানি উপন্যাস শুরু করেছেন 'দেশে'র পৃষ্ঠায়—সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকার উপর। এই উপন্যাসটির ৮ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় যে অধ্যায়টি সংযোজিত হয়েছে তার শিরোনামা এইরূপ—'সরণী না স্বৈরিণী না কুহকিনী'। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে যে জাতীয় ঔপন্যাসিক রোমান্স লেখা হত তাতে এ-ধরনের শিরোনামা আমরা অনেক দেখেছি। এ শিরোনামা দেখলেই বুঝতে পারা যায় লেখক কী সৃষ্টি করতে চাইছেন। তিনি চাইছেন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে, ঐতিহাসিক কালের কুহেলীর সুযোগ নিয়ে তিনি চাইছেন এমন কিছু সৃষ্টি করতে যা অত্যন্ত দ্যুতিময়, অত্যন্ত দূরবর্তী, অত্যন্ত মহার্ঘ্য, এবং একান্তই অসম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভাব্য করে তোলার যে ক্ষমতা, যা রোমান্টিসিজমের একটা বিশেষত্ব, তা বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ লেখকের মধ্যে দেখা যায়। যে-কোন যুগের যে-কোন লেখক যদি মনে করেন যে তিনি বঙ্কিমের চঞ্চলকুমারী বা উদিপুরী বেগমের মত চরিত্র আঁকতে পারবেন তবে তা বড় বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বঙ্কিমের মত লেখক যখন একের পর এক আশ্চর্য ঘটনার মালা গাঁথেন, তখন সে মালার পিছনে থাকে জীবন ও মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর অন্তর্জ্ঞান। বিশীমশাই যখন আশ্চর্য ঘটনার মালা গাঁথেন, তখন তার উপরকার অগভীর sentimentality বা ছিঁচকাঁদুনে ভাববিলাসটুকু ছেঁকে বাদ দিলে যা বাকি থাকে তা এক আধা-ঐতিহাসিক কঙ্কাল মাত্র। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা চরিত্রের সঙ্গতি ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বিশীমশাই অক্ষম। রামরাম বসুর চরিত্র-আলেখ্য রচনা করতে গিয়ে বিশীমশাই বইয়ের প্রথমাংশে এই তীক্ষ্ণধী-সম্পন্ন নৈতিক ভাববিলাসবর্জিত বাস্তববাদী মানুষটিকে ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক বাস্তববাদী ঢঙে অঙ্কিত করেছেন। আর বইয়ের শেষাংশে সেই মানুষটিকেই সস্তা ভাবালুতার ফেনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। বসু-চরিত্রের এই রূপান্তর শুধু সঙ্গতিবিহীন ও অনৈতিহাসিকই নয়, তা যে-কোন রসিক-চিত্তের কাছে তালভঙ্গের বিরক্তি উৎপাদন করেছে।

বিশীমশাইয়ের বিশিষ্ট শিল্প-প্রকৃতি বিদ্রূপাত্মক বাস্তববাদী রচনাতেই সার্থকতা লাভ করতে পারে। কিন্তু 'কেরী সাহেবের মুন্সী'র বিক্রয়সাফল্য লক্ষ্য করে তিনি বুঝে নিয়েছেন যে আশ্চর্য ঘটনার মালা এবং ভাবালুতা পাঠকচিত্তকে জয় করতে অধিকতর উপযোগী। কাজেই তাঁর নিজের চরিত্রে রোমান্টিসিজমের বাষ্পগন্ধ না থাকলেও তিনি 'লালকেল্লা' উপন্যাসটিকে শুরু থেকেই পুরোদস্তুর ঐতিহাসিক রোমান্স হিসাবে গড়ে তুলতে যত্নবান হয়েছেন। অদৃষ্টবাদ, কুসংস্কার এবং অজস্র অজস্র আকস্মিক ঘটনা প্রভৃতি যে-সব জিনিস তৃতীয় শ্রেণীর রোমান্স-লেখকদের অবলম্বন সে-সবের তিনি বিপুল আয়োজন করেছেন এই বইয়ে। সস্তা অনুকরণ ও নকল-নবিসীর এই বারবনিতাবৃত্তি তাঁর বইয়ের বিক্রয়সাফল্য আনবে, এ-বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ নেই; জীবনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত বলে তাঁর কিছু তৈরি করা স্তাবক আছে; তারা যে তাঁকে প্রচুর বাহবা দেবে তাও আমি জানি; কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এই নকল রোমান্স কোন স্থায়ী আসন লাভ করতে পারবে না এটুকু আশ্বাস আমি তাঁকে দিতে পারি।

'লালকেল্লা'র গল্পে রোমান্স সৃষ্টির গরজে কী পরিমাণ আকস্মিক ঘটনা আর কষ্টকল্পনার সমাবেশ করা হয়েছে তার কিছু কিছু নমুনা দিই। গল্পের নায়ক জীবন ভাগ্যান্বেষণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক সিপাহী অধিকৃত

জনপদে এসে উপস্থিত হয়েছে। রাস্তায় গোলমাল দেখে সে প্রথম যে বাড়িতে এসে আশ্রয় নিল সে বাড়িটি এক অসাধারণ নারীর। সে পরমা সুন্দরী ; তার ক্ষুরধার স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন কথা শুনলে হঠাৎ মনে হয় সে বুঝি-বা বার্নাড শ'র পৃষ্ঠা থেকে উঠে বিশী-কল্পিত ভারতবর্ষের মধ্যযুগে আশ্রয় নিয়েছে ; তার বুদ্ধির প্রকাশ শুধু কথাতেই প্রকাশমান নয়, বাস্তব কর্মেও তার দূরদর্শিতা এবং সংস্কারহীনতা লক্ষ্যণীয়। কিন্তু মূর্তিমান anti-climax-এর মতই পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে এই বুদ্ধিমতী নারী কুসংস্কারের একটি ডিপো। সে তাদের সম্প্রদায়ের নারীদের বিধিলিপি সম্পর্কে জানাচ্ছে: "প্রচলিত আছে যে, এক সময়ে হরপার্বতী নির্জন বনের মধ্যে বিহার করছিলেন। আমাদের সম্প্রদায়ের একটি মেয়ে কাঠ কুড়োতে গিয়ে দেখে ফেলে। মহাদেবী রেগে উঠে অভিশাপ দিলেন আজ থেকে তোর সম্প্রদায়ের মেয়েদের বারাঙ্গনা বৃত্তি উপজীব্য হবে। মেয়েটি মহাদেবীর পা জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল, পায়ের উপরে মাথা কুটতে লাগলো, তাহলে যে বংশ লোপ পাবে মা। তখন মহাদেবী কতকটা শান্ত হয়ে বললেন, আমার কথা ফিরবার নয়, তবে বংশ লোপ হবে না, অন্য সম্প্রদায় থেকে মেয়ে এনে ছেলেদের বিয়ে দেওয়া চলবে কিন্তু মেয়েদের এ ছাড়া গতি নেই।...." সমস্ত মেয়ে বারাঙ্গনা বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, এমন কোন সম্প্রদায় আছে বা ছিল বলে জানি না ; তবে এটুকু জানি কোন সম্প্রদায়ের জীবনের সঙ্গে জড়িত এ-জাতের কাহিনীর প্রতি বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কিছু রুচি আছে। এবং বিশীমশাই পাঠকের রুচিকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিতান্ত অপ্রয়োজনে সেই টেকনিকের সস্তা ও ব্যর্থ অনুকরণ করতে ইতস্ততঃ করেন নি।

এই অধ্যায়ে শুধু এইটুকুই বিস্ময় নয়। নারীটির জীবনেতিহাস থেকে জানতে পারি যে তার জন্মের পর তার মায়ের আর একটি মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু বাবা অত্যন্ত মেয়ে-বিদ্বেষী ছিলেন বলে মাকে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মামা এক দুঃস্থা নারীর ছেলের সঙ্গে তাকে বদলি করেন। দু বছর বয়সের সময় ছেলেটিকে নেকড়েয় নিয়ে যায়, আর মেয়েটিও একসময় নিরুদ্দিষ্ট হয়। তবে ভরসা করা যায়, কাহিনীতে আবার এরা ফিরে আসবে। না হলে মিছিমিছি বিশীমশাই এদের কাহিনীতে অবতারণা করবেন কেন? এরা যদি ফিরে না আসে তবে আর কল্পনার বাহাদুরি কী!

শুধু মেয়েটির জীবনেই নয়, নায়ক 'জীবনে'র জীবনেও "অদৃষ্টের মোচড়" আছে। তার গলায় সোনার পাতের তৈরি একটা কিছু আছে যা নির্দিষ্ট তারিখের আগে খোলায় নিষেধ আছে। কাজেই ভাগ্যের পুতুল এই দুটি নর-নারী যে ভাগ্যের অদৃশ্য নির্দেশেই এক জায়গায় মিলিত হয়েছে এবং Love-at-first-sight-এর কবলস্থ হয়েছে তাতে আর এমন কি অস্বাভাবিকতা আছে! মনে হচ্ছে আকস্মিক ঘটনারা যেন দল বেঁধে এসে বিশী-মশাইয়ের রবীন্দ্রনাথ-পড়া বিদগ্ধ মস্তিষ্ককে একেবারে প্লাবিত করে দিয়েছে।

আমার ভরসা হচ্ছে, বিশীমশাইয়ের অনেকদিনের সাধ এবার পূর্ণ হবে: 'লালকেল্লা' বইখানা অবশ্যই আকাদমী পুরস্কার লাভ করবে। তার প্রথম কারণ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দ্বিতীয় কারণ, সরকার এবং রাজনৈতিক মহলের কাছে তিনি সুপরিচিত। তৃতীয় কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর আঙ্গিক এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা এবং বিংশ শতাব্দীর ভাষা এবং সংলাপে গ্রথিত (আশা করছি, ফ্রয়েড না পড়া থাকলেও বিশীমশাই এ বইতেও দু-একটা ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ ঢোকাতে পারবেন) এ বইতে বিতর্কমূলক কোন ভাব বা ভাবনা স্থান পাবে না। চতুর্থ কারণ বইটির সমর্থনে শোরগোল করার লোকের অভাব হবে না।

আধা-সাহিত্যিকদের অনেক সুবিধার মধ্যে একটি সুবিধা এই যে বিষয়-বৈচিত্র্যে তাঁরা অনায়াসে রবীন্দ্র-নাথকেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের সার্থকতম রচনার সঙ্গে তাঁর ব্যর্থতম রচনার তুলনা করলে দেখা যাবে উভয়ের মধ্যেই একটা রবীন্দ্র-রবীন্দ্র গন্ধ আছে, যা নিছক স্টাইলের সাদৃশ্য-মাত্র নয়। পক্ষান্তরে প্রমথ বিশীর 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকের সঙ্গে তাঁর 'লালকেল্লা' উপন্যাসটির সামান্য সাযুজ্য বা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করাও শক্ত। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের, অথচ প্রকৃত সাহিত্যিকের সঙ্গেও একজন আধা-সাহিত্যিকের

এই পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন নরেশ সেনগুপ্ত, অনুরূপা দেবী প্রভৃতি অনেক সাহিত্যিকের নাম করা যায় যাঁরা নিশ্চয়ই লোকোত্তর প্রতিভা ছিলেন না; কিন্তু তাঁদের সীমার মধ্যে তাঁরা এক ধরনের শৈল্পিক সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাঁদের যে-কোন রচনার মধ্যে তাঁদের ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে আধা-সাহিত্যিকেরা ঋতুভেদে রঙ বদলাতে সক্ষম। আগে তাঁরা বাতাসের ঘ্রাণ নেন তবে তাঁরা কলমে হাত দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিত্বে রূপান্তর ঘটে। যখন যে-ধরনের সাহিত্যের চাহিদা বাড়ে, তখন তাঁরা ঠিক সেই ধরনের জিনিস সরবরাহ করেন, এবং সেজন্য তাঁদের মনোজগতে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় না। ঐতিহাসিক উপন্যাস বাজারে ভাল কাটছে অতএব বিশীমশাইয়ের মগজে ইতিহাসের পাতাগুলো পত্‌পত্‌ শব্দে নড়ে উঠল। তাঁদের মানিয়ে নেওয়ার এই আশ্চর্য ক্ষমতার কারণ তাঁদের আসলে অখণ্ড শিল্পী-মানস বলে কোন জিনিস গড়ে ওঠে না উপযুক্ত নিষ্ঠার অভাবে।

এ যুগটা সবচেয়ে বেশী অসুবিধাকর তাঁদের পক্ষে যাঁরা প্রকৃত সাহিত্যিক, যাঁদের একটা নিজস্ব শিল্প-জগৎ আছে। তাঁরা না পারেন পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী লিখতে, না পারেন পত্রিকা-সম্পাদক বা প্রকাশকের ফরমায়েশ মত লিখতে। অনেক সময় তাঁরা এ রকম লিখতে বাধ্য হন, কিন্তু বহু কষ্টে। যে জিনিস তাঁদের আবেগের কাছে ধরা দেয় না, সে জিনিস নিয়ে তাঁরা লিখতে পারেন না।

আমার মনে হয় মন্মথ রায়ের একটি প্রকৃত স্পর্শকাতর শিল্পী-হৃদয় আছে। তাই এ যুগে তাঁর অসুবিধা অনেক। সাম্প্রতিককালের রীতি দাঁড়িয়েছে যে পত্রিকায় এক বা একাধিক সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশ করতে হবে। সাধারণতঃ একটি সম্পূর্ণ উপন্যাসের জন্য তিরিশ কি চল্লিশ পৃষ্ঠা ধার্য করা হয়। একটি বড় জাতের গল্প লিখতেও এই কটা পৃষ্ঠা দরকার হয়। এমন অনেক উপন্যাস আছে যার একটা অধ্যায়ের জন্য এই পরিমাণ স্থানের প্রয়োজন হয়। কাজেই ফরমাশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা-সংখ্যার মধ্যে সম্পূর্ণ উপন্যাস তাঁরাই সবচেয়ে অনায়াসে লিখতে পারেন যাঁরা অসাহিত্যিক বা আধা-সাহিত্যিক। প্রকৃত সাহিত্যিক জানেন যে তাঁর অন্তরে যে-সব কাহিনী দানা বেঁধে ওঠে তাদের স্বচ্ছন্দ প্রকাশের জন্য যথাযোগ্য পরিসর দরকার। পরিসরকে ইচ্ছামত কমানো বা বাড়ানো যায় না।

'বসুধারা'র কার্তিক সংখ্যায় শ্রীমন্মথ রায় 'পূর্বসীমান্ত' নামে একটি উপন্যাস লিখতে গিয়ে খুব সম্ভব যথেষ্ট মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। উপন্যাসটির জন্য যে পরিসর তাঁকে দেওয়া হয়েছে, এর অন্ততঃ তিনগুণ পরিসরের দরকার ছিল। আমি অনুমান করতে পারছি যে পাছে রচনা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা-সংখ্যা অতিক্রম করে যায়, লেখককে প্রতিমুহূর্তে এই আতঙ্কের মধ্যে লিখতে হয়েছে। কাহিনীকে জোর করে হ্রস্ব করতে হয়েছে বলে তার সামগ্রিক ঐক্য ব্যাহত হয়েছে, আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি; পরিসমাপ্তিটা হঠাৎ জোর করে দাঁড়ি টেনে দেওয়া বলে মনে হয়।

মন্মথ রায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি এই কারণে যে এই চৈনিক আক্রমণের আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি একটি যুদ্ধ-বিরোধী উপন্যাস লিখতে সাহসী হয়েছেন। আসলে এর মধ্যে বৈসাদৃশ্য কিছু নেই। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি বলে নীতিগত ভাবে আমরা যুদ্ধের সমর্থক হয়ে যাচ্ছি না।

উপন্যাসের মধ্যে তিনটি পর্যায়। প্রথম পর্যায় শিক্ষাকাল; দ্বিতীয় পর্যায় অভ্যন্তরস্থ কোন সেনানিবাস; তৃতীয় পর্যায়ে যুদ্ধের আরও নিকটবর্তী কোন সেনা-হাসপাতাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারত যেটুকু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল তারই পটভূমিকায় উপন্যাসটি লেখা। নায়ক একজন সামরিক ডাক্তার।

শিক্ষাকালীন সামরিক জীবনের যে চিত্র লেখক দিয়েছেন তা থেকে দেশের বর্তমান জাতীয় সরকারেরও অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার উপাদান আছে। লেখক দেখিয়েছেন যে সামরিক ব্যুরোক্রেসী হল মানুষকে পশুত্বে পরিণত করার একটি কারখানা মাত্র। লেখক এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন: "উৎপীড়ন যে ফৌজী-শৃঙ্খলা বিধানের অঙ্গ এখানকার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরও তাতে

অবিশ্বাস নেই।" যে সব সত্যভিত্তিক ঘটনার ভিতর দিয়ে লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তাতে এর যৌক্তিকতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। এই নির্যাতনের ফলে কিছু মানুষ সত্যিই পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যায়; আর যারা মানুষের কতকগুলি মূল্যবোধকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না, তারা যন্ত্রণায় কাতরায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে নায়কের একটি স্বল্পকালস্থায়ী বিষাদাত্মক প্রেমের কাহিনী। এ কাহিনীটির আরও বিস্তার প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় পর্যায়ে যুদ্ধ কী করে মানুষের জীবন ও মানুষের প্রিয় জিনিসগুলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে লেখক তাই দেখিয়েছেন। কোন অতিরঞ্জন বা কষ্টকল্পনা নেই, কোথাও সস্তা ভাবালুতা নেই। অথচ লেখকের সহজ আন্তরিকতায় কাহিনীটি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। কাহিনীটির মধ্যে লেখকের একটি প্রশ্ন প্রধান হয়ে উঠেছে: যুদ্ধ কি মানুষের প্রিয় মূল্য-বোধগুলিকে ধ্বংস করে দেয় না?

উপন্যাসটি চীনা ভাষায় অনুবাদ করে চীনদেশে পাঠিয়ে দিতে পারলে ভাল হত।

যদিও বিজন ভট্টাচার্য একটিও পুরোপুরি সার্থক রচনা লিখেছেন কিনা সন্দেহ, তবুও আমার বিশ্বাস তাঁর একটি প্রকৃত শিল্পী-হৃদয় আছে। তাই প্রচার-ধর্মী নাটক হওয়া সত্ত্বেও 'নবান্ন' সহজ হৃদয়জ আবেদনের জন্য জনপ্রিয় হতে পেরেছিল।

'পরিচয়ে'র কার্তিক সংখ্যায় তাঁর 'জতুগৃহ' নামক নাটকের খানিকটা অংশ পড়লাম। যেটুকু পড়েছি তার থেকে সম্পূর্ণ নাটক সম্পর্কে আমার মনে কোন স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয় নি। আমার মনে হচ্ছে লেখক অনেকগুলি চরিত্র একত্রিত করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু কিছু সমস্যা আছে। মনে হয় এই সব বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে কিছু একটা ঐক্যসূত্র আছে। তবুও আমার ধারণা সিরিয়স নাটকের মধ্যে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সমস্যা বা দ্বন্দ্ব থাকলেই নাটক সার্থক হয়।

নাটকটির উদ্দেশ্য এ যুগের ব্যবসা-জগতের একটি বাস্তব চিত্র উপস্থিত করা। এ ধরনের বহির্ঘটনাশ্রয়ী নাটক বাংলায় কিছু কিছু লেখা হয়েছে। কিন্তু নাটক বা যে-কোন শিল্পকর্মই অন্তরাশ্রয়ী না হওয়া পর্যন্ত তা উচ্চস্তরের শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। কথাটা বিজনবাবুকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

কার্তিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে 'পাঠক পাঠিকার চিঠি' এই শিরোনামায় নীচের চিঠিখানি প্রকাশিত হয়েছে:

"মহাশয়,—আমি আজ পাঁচ বছর বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহিকা, বসুমতী আমার খুবই প্রিয় পত্রিকা।...আমি অনুরোধ করছি আগামী সংখ্যা থেকে রমাপদ চৌধুরী অথবা আশাপূর্ণা দেবী এবং আপনার লেখা দিতে। যে-কোন একজনের লেখা পেতে চাই; এবং নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'তালপাতার পুঁথি' আরও একটু বেশী করে দেবেন। ইতি—শ্রীমতী দীপালী ব্রহ্ম।"

মোটমাট তিনটি চিঠি ছাপানো হয়েছে। তার মধ্যে উল্লিখিত চিঠিখানা ছাড়া আরও একখানি চিঠি প্রশস্তি-মূলক। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে তাবিজ-কবচ-মাদুলি অথবা ভাগ্য গণনার বিজ্ঞাপনে প্রচুর সংখ্যক প্রশংসাপত্র ছাপানো হয় এবং তার পাশে উল্লেখ করে দেওয়া হয় যে প্রশংসাপত্রগুলো বলে-কয়ে সংগ্রহ করা নয়, অযাচিতভাবে প্রেরিত। 'বসুমতী'-সম্পাদক মশাইয়েরও উচিত তাঁর চিঠিপত্রের স্তম্ভের উপর 'অযাচিতভাবে প্রেরিত' কথাটা লিখে দেওয়া। তাতে এই ধরনের বিজ্ঞাপনের উপযোগিতা আরও বাড়বে।

পঞ্জিকা-পঞ্জিকা চেহারার পত্রিকাটি একবার পাতাগুলো উলটে দেখেই রেখে দেব বলে ভেবেছিলাম। এর আগেও দু-চারবার এই ব্যাপার ঘটেছে। পড়ব বলে ভেবেছি; কিন্তু কয়েক পাতা দেখার পর আর এই শহুরে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে প্রবেশের ইচ্ছা জাগে নি। কিন্তু আশ্চর্য শক্তি প্রশংসা-পত্রের। মহিলার কলম-নিঃসৃত এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা দেখে এবার ঠিক করে ফেললাম 'বসুমতী' পড়বই।

আরও একটু সুবিধা হল; ভালমন্দ নির্বাচন করার একটি 'ক্লু'ও পেয়ে গেলাম চিঠিটাতে। চিঠির নির্দেশ অনুসারে প্রথমেই খুঁজে বার করলাম সম্পাদক মশাইয়ের লেখা গল্প। নাম—"শেষ অভিসার"। গল্পের নায়কই

গল্পের বক্তা। অমন আদর্শবাদী নায়ক সচরাচর দেখা যায় না। তার অফিস-ঘরে এসে নায়িকা লক্ষ্মী ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। তাতে সে প্রেমানন্দে বিভোর না হয়ে লোকনিন্দার ভয়ে অস্বস্তি বোধ করে। মেয়েটি কে, কি কাজ করে, কোথায় থাকে, কি করে নায়কের প্রতি তার প্রেম জন্মাল—এ সব খবর লেখক আমাদের জানান নি। শুধু এইটুকু জানিয়েছেন নায়িকা অভিসার করে আসে নায়কের কাজের জায়গায়, বহুলোকের চোখের সামনে। লেখক আরও জানিয়েছেন যে মেয়েটি খুব অভাবগ্রস্ত; কিন্তু এতখানি অকুণ্ঠ সপ্রতিভ লেখা-পড়া-জানা মেয়ে কাজের চেষ্টায় না ঘুরে নায়কের চাকরিটি বিপন্ন করার জন্য তার অফিসে এসে বসে থাকে! এর নাম হল প্রেমে একনিষ্ঠা।

কিন্তু নায়কের মন গলে না। কারণ, "আমি গান্ধীজীর ভক্ত আজন্ম। ন্যায়, সত্যনিষ্ঠা, সততার প্রতি আসক্তি আমার। জীবনে কখনও একটি মিথ্যা কথা বলিনি। অন্যায় পাপের পথ এড়িয়ে চলতে চাই।" জীবনে একটিও মিথ্যাকথা বলে নি এমন লোক হিমালয়ে-টিমালয়ে থাকলে না হয় বিশ্বাস করতাম; কারণ যাকে একটিও কথা বলতে হয় না একমাত্র তার পক্ষেই সত্যবাদী হওয়া সম্ভব। তবু তাও না হয় মেনে নিলাম—বাংলা-দেশের সবচেয়ে পেটমোটা কাগজের সম্পাদক যখন বলছেন—কিন্তু এতবড় আদর্শবাদীর নিজের মুখে এমন আত্মপ্রচার বড় বেসুরো লাগছে। সম্পাদকমশাই কি এখানেও দু-একটা অযাচিত প্রশংসাপত্র ঢুকিয়ে দিতে পারতেন না?

আমি হলফ করে বলতে পারি সম্পাদকমশাই নিশ্চয় লুকিয়ে-চুরিয়ে বাংলা ছবি দেখেন। বাংলা ছবিতে নায়কের মহানুভবতা প্রমাণ করার জন্য দেখাতে হয় যে সে রাস্তার ভিখিরীকে সোনার গয়না বা এক বাণ্ডিল করকরে নোট দিয়ে দিচ্ছে। ঘটক মশাইয়ের নায়কও তেমনি খাম-ভর্তি ঘুষের টাকা প্রত্যাখ্যান করে। এ ছাড়া আর কী করে তার সততা প্রমাণ করতে পারতেন লেখক?

একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবে হলেও গল্পের মধ্যে একটি কুষ্ঠাশ্রমের বিবরণও লেখক দিয়েছেন। বুঝলাম, তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী'তে কুষ্ঠাশ্রমের কাহিনী প্রকাশিত হওয়ার পর ওটা এখন জনপ্রিয় গল্পের একটি আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গল্পটা শেষ কি করে হল? খুব সহজে। নায়ক সন্ধ্যেবেলা কুষ্ঠাশ্রম থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখল নায়িকা তার ঘরে মরে পড়ে রয়েছে। ডাক্তার বললেন, "ডেথ্ ডিউ টু ষ্টার্ভেশন।" কিছু মনে করবেন না; আমি কিন্তু লেখকের বিরুদ্ধে নারী-হত্যার অভিযোগ না এনে ছাড়ছি না। অনাহারী নায়িকা রুজিরোজগারের চেষ্টা না করে সহানুভূতিহীন নায়কের পিছনে পিছনে রোজ দুবেলা হাঁটিহাঁটি করছে প্রেমভিক্ষা পাওয়ার জন্য এও না হয় আমি তর্কের ভয়ে মেনে নিলাম। কিন্তু অনাহারে মৃত্যু তো করোনারি থ্রম্বসিসের মত "পতন ও মৃত্যু" হয় না; এমন রোগী মৃত্যুর অনেক আগে চলচ্ছক্তি-রহিত হয়ে পড়ে। কিন্তু নায়িকা মৃত্যুর দিনও দু-দুবার দীর্ঘ পথ হেঁটে নায়কের ঘরে গেল কী করে? আমার বিশ্বাস লেখক নিশ্চয়ই নায়িকাকে কোন উত্তেজক বটিকা খাইয়ে দিয়েছিলেন আর তারই ফলে সে অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটি করতে পেরেছিল এবং সেই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে বেচারাকে নির্ধারিত সময়ের আগেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এ যদি নরহত্যা না হয় তবে আর নরহত্যা কিসে হবে? লেখক এত হৃদয়হীন যে "শেষ অভিসার" নামটার মাহাত্ম্য বজায় রাখার জন্য মুমূর্ষু রোগিণীকে বটিকা খাইয়ে নায়কের ঘরে টেনে এনে তবে ছেড়েছেন! সে নিজের ঘরে বা পথে-ঘাটে মরতে পারত। কিন্তু তা হবে না। নায়কের ঘরে না এসে সে মরতেও পারবে না! এ কী জুলুম! 'বসুমতী'-সম্পাদকের বিরুদ্ধে নারী-হত্যার চার্জ আনার জন্য আমি চাঁদা তুলছি।

*

নিন্দুকের প্রতিবেদন

নারায়ণ দাশশর্মা

দীর্ঘকাল আগে একজন সাক্ষুভ্যালি উইট্-এর মুখে একটি রসিকতা শুনেছিলাম—"জ্ঞান থাকলে ভাবা যায় না, ভাবতে গেলে জ্ঞান থাকে না!" এই উক্তিতে নিহিত প্যারাডক্সের সঙ্গে আমার সাম্প্রতিক অবস্থা বহুলাংশে তুলনীয়।

নিয়মিত প্রতিবেদন রচনা করতে বসে নিন্দুককে যে মারাত্মক উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয় তা হচ্ছে এই: সাহিত্যবিষয়ক প্রতিবেদন লেখবার আগে তাকে একটি কিংবা কয়েকটি (তথাকথিত) সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ করতে হবে এবং নার্ভকে সুস্থির ও চিন্তাশক্তির সমগুণ বজায় রেখে বিচারক্ষমতার প্রয়োগ করতেও হবে। এই দুই কর্তব্য যুগপৎ সম্পন্ন করা যে কতদূর কঠিন তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না। যে কটি পুস্তক আজ পর্যন্ত আমরা এই বিভাগে উল্লেখ ও আলোচনা করেছি তার মধ্যে একটি দুটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় সবকটিরই সামান্য লক্ষণ এই যে তা পড়তে গেলে মাথা ঠিক থাকে না এবং মাথা ঠিক থাকলে পড়া যায় না। পাঠক যদি সহানুভূতিবশতঃ নিন্দুকের দুরবস্থা উপলব্ধি করতে আগ্রহী হন তবে তাঁকে আমি অনুরোধ করব, একসঙ্গে হাই তোলা ও হাঁচি দেওয়ার চেষ্টা করে দেখুন। বস্তুতঃ নিন্দুক যে দুটি কর্ম যুগপৎ করে আসছে—সাহিত্যের জঞ্জালে মনোনিবেশ এবং সাহিত্যবিষয়ক চিন্তা—তার চাইতে হাই এবং হাঁচি, দেশপ্রেম এবং চীনপ্রেম, সুরুচি এবং সিনেমা-পত্রিকা, টিকি এবং টাক ইত্যাদি আপাতবিরোধী বিষয় যুগপৎ আয়ত্তে আনা স্বল্পায়াসসাধ্য।

উপরি-উক্ত কঠিন সমস্যায় প্রত্যেকবারের মত যখন আমি এবারেও জর্জর তখন সম্পাদক মহাশয় আমাকে আশার আলো দেখালেন। বললেন, বই না পড়ে সমালোচনা লিখতে পারেন না একবার? আমি বললাম, সমালোচনা লিখতে হলে তো অবশ্যই বই না পড়ে লিখতাম; বরঞ্চ বই পড়ে সমালোচনা করাই এখন রীতিবিরুদ্ধ (যে কোন সাময়িকপত্রের পুস্তক সমালোচনা বিভাগ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আমি যা লিখি তা তো সমালোচনা নয়, নিন্দা। না পড়ে প্রশংসা সবাই করে থাকে, কিন্তু নিন্দা করতে পারে কেমন করে? সম্পাদক মশাই বললেন, তাহলে বই না পড়ে লিখতে পারবেন না একবারও?

ওঁর এই শেষ বাক্যটি আমার আত্মাভিমানের সামনে ঠিক চ্যালেঞ্জের মত শোনাল। বাক্যকালে সেই যে পড়েছিলাম 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর', তখন থেকেই চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আমার স্পর্শকাতরতা প্রবল। আমি অধৈর্য হয়ে পড়লাম; বললাম, নিশ্চয়ই পারব। একমাত্র অযোগ্যকে প্রশংসা করা ভিন্ন আর কোন কাজে আমি অক্ষমতা স্বীকার করতে অক্ষম। আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।

চাল কতদূর সিদ্ধ হয়েছে তা দেখবার জন্য হাঁড়ির প্রত্যেকটি ভাত টিপে দেখতে যায় না কেউ। একটি কণা ধরলেই হাঁড়ির খবর জানতে পারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বাংলা সাহিত্যের হাঁড়ির খবর জানবার জন্যও তেমনি প্রত্যেকটি বাংলা বই আদ্যোপান্ত পাঠ করার প্রয়োজন হয় না বুদ্ধিমান পাঠকের।

নিন্দুক এতদিন পর্যন্ত যে বইগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে, যার থেকে পৃষ্ঠাঙ্ক-উল্লেখে উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে আপনাদের রুচিবোধের কাছে অপরাধী হয়েছে, যার

অন্তঃসারশূন্য ভঙ্গিসর্বস্ব ভণ্ডামি বিশ্লেষণ করে পণ্ডশ্রমে ক্লান্ত হয়েছে, সেগুলিই বাংলা-সাহিত্যের সাম্প্রতিক পর্যায়ের মোটামুটি নমুনা। সেই কটি নমুনা টিপে দেখবার পর সমগ্র হাঁড়িটি সম্বন্ধে ধারণা জন্মাতে দেরি হবার কারণ নেই। এতদিন পর্যন্ত এক একটি গ্রন্থ ও এক একটি গ্রন্থকার—অর্থাৎ এক একটি ভাত—টিপে টিপে আমরা যা বুঝেছি, এবারে আসুন গোটা হাঁড়িটি ঢেলে সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি।

এই উদ্দেশ্যে আমি কোন বিশেষ পুস্তক সামনে নিয়ে বসি নি; একটি সাপ্তাহিক পত্রের একটি সংখ্যায় প্রকাশিত পুস্তকের বিজ্ঞাপনগুলিকে মাত্র সামনে রেখে আমার আলোচনা—অর্থাৎ নিন্দাবাদ চলবে।

বিজ্ঞাপনকে আলোচনার উপজীব্য করে আমি যে অতীব সঙ্গত কর্ম করেছি, এ বিষয়ে আশা করি কোনরূপ মতদ্বৈধের কারণ ঘটবে না। বাংলা ভাষায় পুস্তক রচনা অপেক্ষা পুস্তকের বিজ্ঞাপন রচনায় যে শ্রেয়তর কুশলতা প্রযুক্ত হয় এটি একটি অনস্বীকার্য তথ্য। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন, বহুক্ষেত্রেই পুস্তকের বিজ্ঞাপনটি গ্রন্থকর্তা স্বয়ং রচনা করেন; এবং পুস্তকের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর চাইতে যেহেতু বিজ্ঞাপনের রচনা-কৌশল বিক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গীতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সেই কারণে কখনও কখনও গ্রন্থকার পুস্তক রচনা অপেক্ষা বিজ্ঞাপন রচনায় সময় বুদ্ধি ও পরিশ্রম অধিক মাত্রায় ব্যয় করে থাকেন। বিজ্ঞাপন এ যুগে আর বিজ্ঞাপন মাত্র নয়, তার অপর নাম ফলিত সাহিত্য; এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের তুলনায় ফলিত বিজ্ঞানের সমাদরে যে যুগে সরকার থেকে আরম্ভ করে পি. সি. সরকার পর্যন্ত সকলেই উচ্চকণ্ঠ, সে যুগে ফলিত সাহিত্যের শ্রেয়তায় সন্দেহ প্রকাশ করার মত দুর্বুদ্ধি আমার নেই।

এই উক্তি পরিহাস মাত্র নয়। বিজ্ঞাপন-রচনায় বিবিধ আশ্চর্য কৌশল সম্প্রতি প্রায় আর্টের স্তরে পৌঁছেছে, এ কথা বাংলা ভাষার সীমিত ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট। একটি প্রসিদ্ধ জুতা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান জুতা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে স্লোগানের যে ঋতুসম্ভার বছরের পর বছর নব নব উন্মেষশালিনী ক্ষমতায় উপহার দিয়ে চলেছেন, আমাদের বহুতর বহুবিক্রীত সাহিত্যিকের পুস্তকে তার ভগ্নাংশ খুঁজে পেলে আমরা আশ্চর্য হতাম। মনে হয়, সাহিত্য থেকে বিজ্ঞাপনের প্রেরণা-সংগ্রহের যুগ নিতান্ত বিগত; বিজ্ঞাপন থেকে সাহিত্যের প্রেরণা অন্বেষণের দিন আগত ঐ।

সকল বিজ্ঞাপন অবশ্য একই রকম উন্নত পর্যায়ের হয়ে থাকে বলা চলে না। পুস্তকের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেই কতকগুলি উদাহরণ আমরা যথেষ্ট নিকৃষ্ট শ্রেণীর দেখতে পাই। সম্ভবত গুণগত নিকৃষ্টতার লজ্জাতেই বিজ্ঞাপন-লেখকেরা এগুলিকে ঠিক বিজ্ঞাপন-আকারে প্রকাশ করেন না। বর্ণচোরা এই বিজ্ঞাপনগুলিকে বলা হয়ে থাকে "পুস্তক সমালোচনা" বা "পুস্তক পরিচয়।"

জনৈক স্বল্পপরিচিত সাহিত্যিকের একখানি উপন্যাসের বিজ্ঞাপন-স্বরূপ আমার সামনে একটি পুস্তক পরিচয় এই মুহূর্তে খোলা আছে, দৈর্ঘ্যে সেটি পুরো এক কলম। তার শুরুতে আছে—

"বাংলাসাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত···এর অবাধ প্রবেশাধিকার যেমন সহজ, তেমনি সর্বজনস্বীকৃত। তবু একথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, তাঁর মানসিক-প্রবণতা মূলত কাব্যিক হওয়ায় তিনি আবেগপ্রধান হৃদয় দিয়েই বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, অনুশাসনে ও সংযমে ট্রাজেডির গভীরতায় নিয়ে গিয়ে ভাস্বর করে তোলেন।"

এখানে সন্দেহ থাকে না যে এই সমালোচনা-বিজ্ঞাপনের রচয়িতা যিনিই হোন লেখক স্বয়ং অবশ্যই নন। কেন না, সেই সাহিত্যিককে আমি যতটুকু জানি তাতে তাঁর পক্ষে উদ্ধৃত বাক্য দুটির প্রথম বাক্যের মত দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। বাংলা সাহিত্য যত বড় হতভাগ্য ও অনাথ হোক না কেন, তার "সর্বক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার সহজ ও সর্বজনস্বীকৃত" বোধ করি রবীন্দ্রনাথের মত ইতিহাসের ব্যতিক্রম প্রতিভার পক্ষেও দীর্ঘকাল সম্ভব হয় নি। সে-অধিকারের জন্য সুশীল ও সচ্চরিত্র হওয়াই যথেষ্ট নয়,

তার জন্ম দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী হতে হয়। অধ্যবসায়ে মাকড়সা দেয়াল বেয়ে উঠতে পারে, লেখক ডক্টরেট হতে পারেন, কিন্তু মাঝারি সাহিত্যিক পারেন না "প্রতিভা" হতে।

একদা পত্রিকার পৃষ্ঠায় বহুল প্রচারিত চার টাকায় ৪০৬২ দফা উপহারের বিজ্ঞাপনের তুল্য হাস্যকর এই পুস্তকপরিচয় পাঠ করলে যে-কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যিকের ন্যূনতম কর্তব্য—একটি কঠোর প্রতিবাদ-লিপি প্রেরণ করা।

দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ বুঝতে হলে সম্ভবত 'আবেগ-প্রধান হৃদয়' প্রয়োজন। সাদা বুদ্ধিতে বাক্যটি কতকগুলি নিরর্থক শব্দসমষ্টি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু এর পরেই যে তৃতীয় বাক্যটি বিজ্ঞাপন-লেখক এখানে বসিয়ে রেখেছেন, তার অর্থবোধ আবেগ দিয়ে করতে হলেও আপনাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। বাক্যটি এই "...উপন্যাসটি গতানুগতিক নয়, আদর্শ ও অনাদর্শের Collision-এর সাঙ্ঘাতিক।" সমালোচনা-বিজ্ঞাপনটিও এখানে নিঃসন্দেহে গতানুগতিক নয়, ভাষা ভাব ও ব্যাকরণের কলিউশনে ভয়ঙ্কর রকম সাঙ্ঘাতিক।

এরকম উদাহরণ এই এক কলমের প্রত্যেকটি বাক্যে। উপন্যাসটি "যেমন অনন্য তেমনি অসাধারণ ও অসামান্য"; এর "বাণী বলিষ্ঠ, ভাষা-ও স্রুটিষ্ট" ইত্যাদি চমকপ্রদ সংবাদ [অনন্য উপন্যাস যে সাধারণ ও সামান্য হতে পারে এবং অসাধারণ ও অসামান্য দুটি বিশেষণই যে এক বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজন হয়ে থাকে—এগুলো সংবাদ বইকি!]; এটি যে "চলচ্চিত্র-কেন্দ্রিক" এই লোভনীয় ইঙ্গিত; "সাংসারিক দৈব-দুরবস্থা", "ব্যর্থ জীবনের হাহাকার-মান্থর", "পৌরুষ প্রয়োগে অক্ষমতা" ইত্যাদি শূন্যকুম্ভ ধ্বনির অনুকূলে নিরর্থ এবং আরও অসংখ্য কিম্ভূত-কিমাকার বস্তুতে বিজ্ঞাপনটি পরিপূর্ণ।

বলা প্রয়োজন, আলোচিত উপন্যাসটির যৎসামান্য অংশই আমি পড়েছি। সেই কারণে উপন্যাসটির নিন্দাবাদ করতে আমি প্রবৃত্ত হই নি এবং পাছে বিজ্ঞাপন-লেখকের প্রতি নিন্দাবাদ গ্রন্থকার সম্পর্কে প্রযোজ্য হয় সেই আশঙ্কায় উপন্যাসটি ও ঔপন্যাসিকের নাম প্রকাশেও বিরত থেকেছি। আমার আলোচ্য সমালোচনার ছদ্মবেশে বর্ণচোরা বিজ্ঞাপন এবং তারই একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ।

কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের ট্রাজেডি এই যে এতদূর কদর্য ও তৈলক্লিন্ন তথাকথিত সমালোচনা পড়েও সাহিত্যিক ও তাঁর ভক্তকুল স্বেদ-হর্ষ-পুলক-রোমাঞ্চে গদ্‌গদ হন। যদিও মস্তিষ্কে কিয়ৎপরিমাণ ধূসর বস্তু এবং চরিত্রে কিয়ৎ-পরিমাণ আত্মমর্যাদা থাকলে এ-জাতীয় অক্ষমের ঢক্কানিনাদে প্রশংসিত ব্যক্তির উচিত ছিল লজ্জায় অধোবদন হওয়া।

এই বিষয়ের উপর আরও আলোচনার অবকাশ আছে। সাময়িকপত্রে তথাকথিত পুস্তক-সমালোচনায় মূঢ়মতি প্রশংসা ও ঈর্ষাপরায়ণ নিন্দা দুই-ই কতখানি অক্ষম পণ্ডিতম্মন্যতার অপরাধে অপরাধী সে কথা বিস্তৃত বিশ্লেষণে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু তা করতে হলে সমালোচনা এবং সমালোচিত পুস্তক উভয় উৎস থেকে প্রভূত উদাহরণের উদ্ধৃতি দিতে হয়; তাতে করে আমার বর্তমান প্রতি-বেদনের মূল আলোচ্য—অর্থাৎ সাহিত্যের বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন-সাহিত্য—ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে বলে আমি সম্প্রতি উক্ত প্রয়াস ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখছি।

সাময়িকপত্রের যে-সংখ্যাখানি আমি বিজ্ঞাপনের আদর্শ হিসাবে খুলে বসেছি, তার মলাট খুলেই প্রথম পৃষ্ঠায় বৃহৎ গ্রন্থের বৃহৎ বিজ্ঞাপন: 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড আমার প্রতিবেদনে ইতঃপূর্বেই আলোচিত, দ্বিতীয় খণ্ড আমার অপঠিত। কিন্তু অপঠিত দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে বিজ্ঞাপনের ঘোষণা—দ্বিতীয় মুদ্রণ, যদিও প্রথম খণ্ডের চতুর্থ মুদ্রণ, পড়ে মনে হল শুধু আমারই নয় প্রথম খণ্ডের মোট পাঠক-সংখ্যার অর্ধাংশের মনে প্রথম খণ্ডের পর আর দ্বিতীয় খণ্ড পড়বার আগ্রহ অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু এ আমার অনুমান মাত্র;

অর্ধেক পাঠক এখন পর্যন্ত প্রথম খণ্ড পড়ে শেষ করে উঠতে পারেন নি এমন হওয়াও অসম্ভব নয়।

বিজ্ঞাপনে খুব মোটা অক্ষরে যে মোটাবুদ্ধির পরিচয় পুনঃপ্রকাশিত তা হল এটি বিমল মিত্রের ক্লাসিক উপন্যাস। এই বিশেষণ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশের সময় প্রকাশক বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেছিলেন, তারপর বহু বিরূপ সমালোচনায় [আমার বন্ধু দীপ্তেন্দ্রকুমার পত্রান্তরে লিখেছিলেন, "ক্লাসিক গাধা!"] এই ক্লাসিক বিশেষণটি ত্যক্ত হয়েছিল। এখন দেখছি পুনরায় বিমল মিত্র বিজ্ঞাপনে ক্লাসিক হয়েছেন।

'ক্লাসিক' শব্দটির সুষ্ঠু বাংলা প্রতিশব্দ নেই। কেউ লেখেন 'কালোত্তীর্ণ', কেউ লেখেন 'ধ্রুপদী', কেউ বা অন্য কোন শব্দ সৃষ্টি করে ক্লাসিক কথাটি বোঝাতে চান। কিন্তু প্রতিশব্দ যাই হোক, এর মোটামুটি ভাবার্থ সকলেই বুঝে থাকেন; অন্ততঃ এটুকু বোঝেন যে উপন্যাস ক্লাসিক হয় সময়ের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হয়ে। যাঁরা দ্রুত-বিক্রীত সংস্করণের উল্লাসে সদ্য-প্রকাশিত স্ফীতোদর উপন্যাসকে ক্লাসিক আখ্যা দেওয়ার মত ক্লাসিক মূঢ়তা দেখাতে পারেন, তাঁরা বোধ হয় ভুল করে ভেবে থাকবেন ক্লাসিক কথাটার নিষ্পত্তিতে ক্লাস এবং সিক্স শব্দ দুটি বর্তমান; ষষ্ঠ শ্রেণীর বালকের উপযোগী উপন্যাস অথবা ষষ্ঠ শ্রেণীর (তৃতীয় শ্রেণীর চাইতে দ্বিগুণ নিকৃষ্ট) উপন্যাসকে ক্লাসিক উপন্যাস বলা যায়, এই ধারণা ছাড়া ও বিজ্ঞাপনের আর কী অর্থ হতে পারে আমি তো ভেবে পাই না।

একই প্রকাশকের (মিত্র ও ঘোষ) আর একখানি প্রায় পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন রয়েছে অন্যত্র। "কাল, তুমি আলেয়া" নামধেয় সেই গ্রন্থের বিশেষণ হল— "নবকালের বিচিত্রবার্তাবহ ক্রান্তিকারী উপন্যাস"। ক্রান্তিকারী শব্দের অর্থ বিপ্লব আনয়নকারী। এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে প্রায় কয়েক মাস তো অবশ্যই হয়ে গেল; এর মধ্যে কোন সমাজ-বিপ্লবের কথা যেহেতু শুনি নি (মিত্র ও ঘোষের হাতে দৈনিক সংবাদপত্র থাকলে তা-ও শুনতে হত কিনা কে জানে!), অতএব মনে করা যেতে পারে এখানে উপন্যাসটির দাবি সমাজ-বিপ্লব নয়, সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লব। কাজী নজরুল বহুদিন আগে লিখেছিলেন, "মশা মেরে ঐ গরজে কামান বিপ্লব মারিয়াছি। আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি!" বাস্তবিক, এ-দেশে বিপ্লবের মত সস্তা জিনিস আর কিছু নেই—ইন্‌কিলাবের স্লোগানে স্লোগানে রাস্তা এবং সাহিত্য সমান ভর্তি।

বলা বাহুল্য 'কাল, তুমি আলেয়া' আমি পড়ি নি (পড়লে হয়তো এ প্রতিবেদন অন্য আকার ধারণ করত)। কিন্তু বিজ্ঞাপনে নামটির যে ব্যাখ্যা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা আছে তা পড়েছি। পড়েছি কিন্তু বুঝতে পারি নি—

"কথা সাজাচ্ছি, ব্যথা নিঙড়ে তুলছি, হাসির বুদ্‌বুদ্ ফোটাচ্ছি, কান্নার আবর্তে ডুব দিচ্ছি। ভাবছি এরই নাম বুঝি সার্থকতা—...হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় বুঝি। কিন্তু যায় না। ওটা আলেয়া।...এই কালটাই তো অন্ধকার, গোলক-ধাঁধার মধ্যে পড়ে আলেয়ার হাতছানি সম্বল করে পথ খুঁজে মরছে।...কাল যদি আলেয়া..."

কথাগুলি বই থেকে উদ্ধৃতিও হতে পারে, আবার বিজ্ঞাপনের জন্য বিশেষভাবে লেখাও হতে পারে। কিন্তু যা-ই হোক, এর মধ্যেকার যুক্তিশৈলী লক্ষ্য করুন। যাকে সার্থকতা মনে করা গেল সেই কথা-ব্যথা-হাসি-কান্নাকে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায় না; ওটা, অর্থাৎ এই সার্থকতা নামধেয় বস্তু-আভাস, আলেয়ার সঙ্গে উপমিত হল। অতঃপর এই কাল, অর্থাৎ সাম্প্রতিক 'যুগ' ('এই কাল' বলতে নিশ্চয়ই অনাদ্যন্ত 'সময়'কে বোঝাবে না) যে অন্ধকার এবং তার মধ্যে পথ খোঁজা যে আলেয়ার অনুসরণমাত্র, এই চিত্র উপস্থাপনের সময়ও কাল এবং আলেয়া স্পষ্টই পৃথক দুটি সত্তা: সাম্প্রতিক আলো-হীনতার যুগ এবং যে তথাকথিত সার্থকতার অন্বেষণে মানুষের হোঁচট খেয়ে পথ-চলা, সে সার্থকতা আলেয়ার মত প্রতারক ও অবাস্তব, এই চিত্রই এখানে অঙ্কিত। তারপরেই এক লাফে কী করে "কাল যদি আলেয়া" এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করে বসলেন পুস্তক এবং/অথবা বিজ্ঞাপনের লেখক তা আমার মাথায় ঢুকল না। বিজ্ঞাপন যেহেতু সর্বদা পুস্তকের চাইতে সুলিখিত হয়ে

াকে, সেই কারণে এ বিজ্ঞাপনে এ রকম চিন্তার নফিউশন দেখে বইটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আন্দাজ পাওয়া ায় না কি ?

বস্তুতঃ এই সব ফাঁকা ও ফাঁপা কথার ফুলঝুরি দিয়ে র্থহীন নীহারিকা সৃষ্টি এ যুগের জনপ্রিয় কয়েকজন াহিত্যিকের একমাত্র রচনাকৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইয়াতের ফিজ্‌জেরাল্ড অনুবাদে পাওয়া অন্ধকার ও অন্ধবিশ্বাসের মিথ্যা আলো [..."What Lamp had Destiny to guide/Her little Children stumbling in the Dark ?" / And—"A blind understanding !" Heav'n replied.] থেকে এখানে উদ্ধৃত "গোলক-ধাঁধার মধ্যে পড়ে আলেয়ার হাতছানি সম্বল করে পথ খুঁজে মরছে" বাক্যটি স্পষ্টই সংগৃহীত; আর "কাল, তুমি আলেয়া" এই নামকরণ সম্ভবত অপর একটি ইংরেজী কবিতা (কার লেখা নিশ্চিত হতে পারছি না) Time, You Old Gypsy Man-এর শিরোনামা থেকে 'না বলিয়া লওয়া'।

কিন্তু এ বই নিয়ে এত কথা লেখবার কোন দরকারই ছিল না; মাত্র এই বললেই যথেষ্ট ছিল যে 'কাল, তুমি আলেয়া' উপন্যাস পড়বার পর পাঠক বইটির নাম ভুলে গিয়ে হয়তো ভাববেন—ও-বইয়ের নাম: (পাঠক) "আজ তুমি হালুয়া"!

মিত্র ও ঘোষের প্রকাশিত যে দুটি মহার্ঘ ও স্ফীতোদর পুস্তকের অনুরূপ মহার্ঘ ও স্ফীতোদর বিজ্ঞাপন এখানে উল্লিখিত হল, তার মধ্যে কতকগুলি সামান্য লক্ষণ আছে। একটি পুস্তক "ক্লাসিক" অপরটি "ক্রান্তিকারী"। দুটি বিশেষণই কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে জন্মের সঙ্গে দাবি করা বাতুলতা মাত্র। দুটির নামকরণেই একটি করে পূর্ণ বাক্য ব্যবহৃত; এ জাতীয় পূর্ণবাক্য পুস্তকের নামে ব্যবহার হত ইংরেজী ভাষায় সস্তা পেনি নভেলেটের বেলায়; বাংলায় প্রথম চলেছিল জনপ্রিয় সিনেমার নামকরণে। মিত্র ও ঘোষের প্রেস্টিজ পাবলিকেশনের বহিরঙ্গে অন্ততঃ কাউণ্টার রেভলিউশনের চিহ্ন সুস্পষ্ট; অন্তরঙ্গে কি আছে সে কথা আজ বলব না।

পূর্বোক্ত প্রকাশক-সংস্থার অংশীদার দুজনই সাহিত্য-সেবী। এবার অপর একটি সংস্থার বিজ্ঞাপন দেখা যাক, যার কোনও অংশী সাহিত্যিক নন—যদিও সাহিত্যিকের অতি আপনার জন। গ্রন্থপ্রকাশ নামক এই সংস্থার বিজ্ঞাপনে অনেকগুলি পুস্তকের নাম, লেখক এবং মূল্য উল্লিখিত দেখছি। গ্রন্থগুলি শ্রেণী-শিরোনামায় গ্রথিত; যেমন 'উপন্যাস' শিরোনামায় তারাশঙ্কর থেকে নীহার গুপ্ত ও অবধূত পর্যন্ত (প্রথম ব্যক্তির একখানি ও শেষ ব্যক্তির দুখানি উপন্যাস) আছে। তারপরেই শ্রেণী-বিভাগের শিরোনামা—'রম্যরচনা, সাহিত্য'। এর মধ্যে ডক্টর সুকুমার সেনের 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' এবং প্রমথনাথ বিশীর 'কমলাকান্তের জল্পনা' একশ্রেণীভুক্ত গ্রন্থ হিসাবে উপস্থাপিত দেখলাম। এ বিষয়ে আমি অতীব কঠোর মন্তব্য করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলাম তার নীচেই আর একটি শ্রেণীতে সমাজতত্ত্ব ও যৌনসমস্যা একীভূত হয়ে আছে এবং বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়, সেই যৌনসমস্যাকণ্টকিত সমাজতত্ত্বের মধ্যে ঢুকে আছে একখানি গ্রন্থ—"মনোজ বসুর কৌতুকনাট্য ডমরু ডাক্তার।" মনোজবাবুকেই যখন 'গ্রন্থপ্রকাশ' যৌনসমস্যার মধ্যে স্থাপন করেছেন, তখন কমলাকান্তকে সুকুমার সেনের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজনে বসিয়ে এমন কিছু অপরাধ করেন নি।

দেব সাহিত্য কুটীরের বিজ্ঞাপনটি অত্যন্ত তাৎপর্যময়। এঁরা সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাঁচখানি (প্রত্যেকখানির নামই খুব রোমান্টিক; যেমন, তোমায় আমি ভালবাসি, ওগো বর ওগো বধূ, ইত্যাদি), প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর আটখানি এবং পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, চরণদাস ঘোষ ও বুদ্ধদেব বসু এবং প্রতিভা বসুর একখানি করে উপন্যাস ঘোষণা করেছেন। শেষোক্ত যুগ্ম-ঔপন্যাসিকের গ্রন্থটিরও খুবই রোম্যান্টিক নাম—বসন্তজাগ্রত দ্বারে। একবার ভেবেছিলাম এই বইখানির সঙ্গে চরণদাস ঘোষের বইখানিকে তুলনা করে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা যাক; কিন্তু চরণদাসের বইটি "শ্রেষ্ঠ উপন্যাস" বলে বিঘোষিত, ওর সঙ্গে বসু-দম্পতির উপন্যাসটি তুলনা করা

তাঁদের প্রতি অবিচার করার সামিল হবে। পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসখানিও পড়বার বাসনা হয়েছিল কিন্তু বিজ্ঞাপনে দেখছি এটি নাকি "অপ্রকাশিত উপন্যাস"—তা হলে তো পড়া শক্ত।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড তুকতাকে বিশ্বাসী প্রকাশক। এঁরা প্রতি মাসের ৭ তারিখে বই প্রকাশ করেন। প্রকাশকের মতে তাঁদের যে-গ্রন্থগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপনটিতে তার এক তালিকা আছে ; তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি 'আপনার অর্থ ভাগ্য' 'আপনার বিবাহযোগ' ইত্যাদি মূল্যবান সাহিত্যকর্ম। এঁরা অবশ্য এ কথা জেনে গর্বিত হতে পারেন যে এঁদের একটি উত্তরসূরী জন্মেছে ; শরৎ সাহিত্য ভবন নামে বটতলা এলাকার এক প্রকাশক ঘোষণা করেছেন, প্রতি মাসের ১০ তারিখে তাঁদের একখানি করে বই প্রকাশিত হয়। পৌষ মাসের বই হিসাবে তিনখানি নাম বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত, তার শেষখানি ডনকুইক্সোট। কিন্তু গুরুদেব ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেডের জন্য ডন কুইক্সোট রেখে এঁরা সাঙ্কো পাঞ্জা হলেই কি সুষ্ঠু হত না ?

ত্রিবেণী প্রকাশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। এঁদের স্লোগান হল "বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থ সম্ভার" (যথা, অবধূতের 'কলিতীর্থ কালিঘাট', 'শ্রীপান্থের কলকাতা' ইত্যাদি)। এবারে এঁদের প্রকাশিত একটি বই নরসিংহদাস পুরস্কার পেয়েছে ; সেটি আমার বন্ধু ইন্দ্রমিত্র রচিত সাজঘর। এই উপলক্ষে এঁরা যে বিশেষ বিজ্ঞাপন ছেপেছেন তাতে বইটিকে "বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যশিল্পীদের সম্পর্কে একমাত্র প্রামাণ্য গবেষণাগ্রন্থ" বলা হয়েছে ; গবেষণাকে আমার বড় ভয়, সেই ভয়েই এ বিজ্ঞাপনের প্রথম বাক্যটির অর্থ সম্বন্ধে গবেষণা করতে পারছি না। "বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার নাট্যমঞ্চ অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত—একটি প্রবল, মূল্যবান ও অবিস্মরণীয় অঙ্গ।"—এই বাক্যের অর্থ বুঝতে তিনবার পড়া দরকার হয়।

ক্লাসিক প্রেস আর একটি বিজ্ঞাপন-সচেতন প্রকাশক। কিন্তু ক্লাসিক প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ এবং ক্লাসিক প্রেসের চাইতে ঢের বেশী ক্লাসিক বিজ্ঞাপন অন্যত্র আছে ; "বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে রচিত ক্লাসিক পর্যায়ের রহস্যঘন উপন্যাস—বেদুইনের 'পুলিসের ডায়েরী থেকে'।" বিমল মিত্রের ক্লাসিকে যার শুরু পুলিসের ডায়েরীতেই তার শেষ ভাবলে ভুল হবে ; অচিরেই ক্লাসিক শ্রেণীর দিনপঞ্জিকা এবং ক্লাসিক শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্র দেখতে পাবার আশা রয়েছে আমাদের।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী এবং চীনের ভারত আক্রমণ যেহেতু টপিক্যাল ঘটনা, সেই কারণে বিবেকানন্দ ও চীন সম্পর্কে অসংখ্য পুস্তকের প্রকাশ সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ব্যবসায়-বুদ্ধির আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু সকল বিজ্ঞাপনের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ দেখতে পেলাম এইটি :

"রোমথা [বোধ হয় বইয়ের নাম, বিরাট হরফে ছাপা কিনা] লাউল ঠাকুর, লাউল ঠাকুর, আমার জীবনে কি তুমি উঠবে না ? তুমি কি এতই নিষ্ঠুর ? আপন মনে শুধায় চন্দ্রকলা। জীবন-দেবতা খলখলিয়ে হাসেন আর হাসেন। সুন্দর প্রকাশন" [বিনামূল্যে আমরা পুরো বিজ্ঞাপনটি ছেপে দিলুম, এমনই সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বস্তু এটি]।

বস্তুত: হালফিল যত বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে তার সঙ্গে ওই লাউল ঠাকুর মার্কা হ-য-ব-র-ল'র পার্থক্য গুণগত নয়, পরিমাণগত মাত্র ; এ কথা বললে একটি দুটির বেশী ব্যতিক্রম দেখিয়ে আমাকে আপনারা বিব্রত করতে পারবেন না।

আর একটি মাত্র বিজ্ঞাপন উল্লেখ করে আমি বিজ্ঞাপন পরিক্রমা সমাপ্ত করব। একটি সিনেমার কাগজের বিজ্ঞাপনে বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে অনেক রকম লে-আউট করে ছাপা আছে—

"সুদীর্ঘ উপন্যাস / লিখেছেন / উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর [চমকাবেন না, পড়ে যান আরও] অভিনীত / 'শেষ অঙ্ক' ছবির কাহিনীকার / রাজকুমার মৈত্র"।

আমার মনে হল, এটি একটি ফিউচারিস্টিক বিজ্ঞাপন। বাংলা ভাষায় যাঁরা সাহিত্যকর্ম করতে চান তাঁদের প্রতি এই বিজ্ঞাপন একটি সময়োচিত হুঁশিয়ারি। আপনার

হিমাচলম্

জগদীশ ভট্টাচার্য

ভ্রমণকাহিনী মুখ্যতঃ দু-জাতের। প্রথম জাতের লক্ষ্য দেশদর্শন, দ্বিতীয় জাতের উদ্দেশ্য দেবদর্শন। ওরই মধ্যে শাখাপ্রশাখা ও ভেজাল অনেক আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতিগোত্র মিলিয়ে নেওয়া বিশেষ আয়াসসাধ্য নয়।

রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সদ্যপ্রকাশিত 'হিমাচলম্' পড়তে পড়তে এই কথাটা মনে হচ্ছিল। 'হিমাচলম্' দেবদর্শনের উদ্দেশ্যে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ ভ্রমণের সরস ও প্রাণবন্ত কাহিনী। ধীরেন্দ্রনারায়ণ একাধারে ভক্ত ও কবি। ভক্তিমার্গে তাঁর পিতামহ মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণের কাছেই তিনি শৈশবে দীক্ষা পেয়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁর বাল্যকৈশোরের দশটি বছর কেটেছে মাতামহ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। উপরন্তু আছে ধীরেন্দ্রনারায়ণের নিজের প্রাক্তন সংস্কার। স্বভাবতঃই তাঁর তীর্থভ্রমণকাহিনী একদিকে যেমন দেবতাত্মা নগাধিরাজের পরম রহস্যময় মহিমাকে প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে তেমনি প্রকাশ করেছে তীর্থদেবতার প্রতি পরিব্রাজকের অহৈতুকী ভক্তি।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ কবি। সুতরাং মানবিক রসের অভাব গ্রন্থমধ্যে কোথাও হয় নি। মহাযাত্রীরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন না, তাঁদের রেখাচিত্র অঙ্কনে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া না হলেও সংক্ষিপ্ত প্রাজ্ঞোক্তির মধ্য দিয়ে কিংবা হাস্য-বক্রোক্তির লঘু পরিহাসে তীর্থপথ পরিক্রমায় তাঁদের উষ্ণ উপস্থিতির উত্তাপ গ্রন্থের পাঠক অনুভব করতে পারেন। অনুভব করতে পারেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিনম্র ব্যক্তিত্ব। ক্ষমতার মদিরা পান করে যে তিনি বিচলিত হন নি, আসনের উত্তাপকে অতিক্রম করে তিনি আর-দশজন তীর্থযাত্রীর মতই যে চলে-ফিরে বেড়াতে পারেন, এই সত্য সাহিত্যশিল্পী

উপন্যাস যদি ছায়াচিত্রের কাহিনী না হয় এবং সে ছায়াচিত্রে যদি চকচকে অভিনেতা-অভিনেত্রীযুগল অবতীর্ণ না হন তবে আবার আপনি কোন্ দেশী ঔপন্যাসিক?

এবং এই নিরিখে উতরে গেছেন যাঁরা তাঁদেরই ভবিষ্যৎ আছে ভবিষ্যতে। শুধু সাহিত্যের জন্য সাহিত্য এ যুগে অচল। কেন না, সাহিত্য এখন প্রকাশকদের দালালী ছাড়া জনসমক্ষে পৌছয় না; প্রকাশকদের এমন রুচি কিংবা ক্ষমতা নেই যে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত গুণ দিয়ে প্রকাশযোগ্য গ্রন্থ নির্বাচন করবেন; তাঁরা নাম বোঝেন, বোঝেন কোন্ গ্রন্থকারের নাম ব্যবহার করলে কম বিজ্ঞাপনে বেশী বিক্রয় সম্ভব; এবং তেমনতর "নাম" অর্জন করার পথ মাত্র দুটি: হয় আপনাকে ছায়াচিত্রের কাহিনীকার হতে হবে, অথবা বাজারে সাময়িকপত্রে নিয়মিত ধারাবাহিক রচনা লিখতে হবে। প্রথমটির জন্য আপনি যথেষ্ট পরিমাণে স্থূলরুচি হলেই যথেষ্ট হল, দ্বিতীয়টির জন্য আপনাকে আনন্দবাজার বা অমৃতবাজারের বেতনভোগী সাংবাদিক কিংবা তাঁদের প্রসাদ-ভোগী মোসাহেব হতে হবে। নান্যপন্থা বিদ্যতে।

যে-কোন একটি সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার বিজ্ঞাপন পড়ে যান। গ্রন্থকারের তালিকায় যে কটি নামের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখবেন তাঁরা এই দুটি নিরিখের একটি বা দুটিতেই সসম্মানে উত্তীর্ণ।

সংবাদপত্র অথবা চলচ্চিত্র—এই দুটি বারবনিতার যে-কোন একটির অন্ততঃ প্রসাদধন্য না হতে পারলে বাংলা সাহিত্যের আসরে কলম ধরা আপনার পণ্ডশ্রম। কবি-শ্রেষ্ঠ কালিদাসের মৃত্যু হয়েছিল বেশ্যালয়ে; এ যুগে বাংলা-সাহিত্যের জন্ম হচ্ছে যে আলয়ে তার সঙ্গে কালিদাসের মৃত্যুস্থলের আশ্চর্য মিল গভীর তাৎপর্যের ব্যঞ্জনায় ধন্য।

তাঁদের প্রতি অবিচার করার সামিল হবে। পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসখানিও পড়বার বাসনা হয়েছিল কিন্তু বিজ্ঞাপনে দেখছি এটি নাকি "অপ্রকাশিত উপন্যাস" —তা হলে তো পড়া শক্ত।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড তুকতাকে বিশ্বাসী প্রকাশক। এঁরা প্রতি মাসের ৭ তারিখে বই প্রকাশ করেন। প্রকাশকের মতে তাঁদের যে-গ্রন্থগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপনটিতে তার এক তালিকা আছে; তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি 'আপনার অর্থ ভাগ্য' 'আপনার বিবাহযোগ' ইত্যাদি মূল্যবান সাহিত্যকর্ম। এঁরা অবশ্য এ কথা জেনে গর্বিত হতে পারেন যে এঁদের একটি উত্তরসূরী জন্মেছে; শরৎ সাহিত্য ভবন নামে বটতলা এলাকার এক প্রকাশক ঘোষণা করেছেন, প্রতি মাসের ১০ তারিখে তাঁদের একখানি করে বই প্রকাশিত হয়। পৌষ মাসের বই হিসাবে তিনখানি নাম বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত, তার শেষখানি ডনকুইক্সোট। কিন্তু গুরুদেব ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেডের জন্য ডন কুইক্সোট রেখে এঁরা সাঙ্কো পাঞ্জা হলেই কি সুষ্ঠু হত না?

ত্রিবেণী প্রকাশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। এঁদের স্লোগান হল "বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থ সম্ভার" (যথা, অবধূতের 'কলিতীর্থ কালিঘাট', 'শ্রীপান্থের কলকাতা' ইত্যাদি)। এবারে এঁদের প্রকাশিত একটি বই নরসিংহদাস পুরস্কার পেয়েছে; সেটি আমার বন্ধু ইন্দ্রমিত্র রচিত সাজঘর। এই উপলক্ষে এঁরা যে বিশেষ বিজ্ঞাপন ছেপেছেন তাতে বইটিকে "বাংলার রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যশিল্পীদের সম্পর্কে একমাত্র প্রামাণ্য গবেষণাগ্রন্থ" বলা হয়েছে; গবেষণাকে আমার বড় ভয়, সেই ভয়েই এ বিজ্ঞাপনের প্রথম বাক্যটির অর্থ সম্বন্ধে গবেষণা করতে পারছি না। "বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার নাট্যমঞ্চ অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত—একটি প্রবল, মূল্যবান ও অবিস্মরণীয় অঙ্গ।"—এই বাক্যের অর্থ বুঝতে তিনবার পড়া দরকার হয়।

ক্লাসিক প্রেস আর একটি বিজ্ঞাপন-সচেতন প্রকাশক। কিন্তু ক্লাসিক প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ এবং ক্লাসিক প্রেসের চাইতে ঢের বেশী ক্লাসিক বিজ্ঞাপন অন্যত্র আছে; "বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে রচিত ক্লাসিক পর্যায়ের রহস্যঘন উপন্যাস—বেদুইনের 'পুলিসের ডায়েরী থেকে'।" বিমল মিত্রের ক্লাসিকে যার শুরু পুলিসের ডায়েরীতেই তার শেষ ভাবলে ভুল হবে; অচিরেই ক্লাসিক শ্রেণীর দিনপঞ্জিকা এবং ক্লাসিক শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্র দেখতে পাবার আশা রয়েছে আমাদের।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী এবং চীনের ভারত আক্রমণ যেহেতু টপিক্যাল ঘটনা, সেই কারণে বিবেকানন্দ ও চীন সম্পর্কে অসংখ্য পুস্তকের প্রকাশ সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ব্যবসায়-বুদ্ধির আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু সকল বিজ্ঞাপনের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ দেখতে পেলাম এইটি :

"রোমথা [বোধ হয় বইয়ের নাম, বিরাট হরফে ছাপা কিনা] লাউল ঠাকুর, লাউল ঠাকুর, আমার জীবনে কি তুমি উঠবে না? তুমি কি এতই নিষ্ঠুর? আপন মনে শুধায় চন্দ্রকলা। জীবন-দেবতা খলখলিয়ে হাসেন আর হাসেন। সুন্দর প্রকাশন" [বিনামূল্যে আমরা পুরো বিজ্ঞাপনটি ছেপে দিলুম, এমনই সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বস্তু এটি]।

বস্তুতঃ হালফিল যত বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে তার সঙ্গে ওই লাউল ঠাকুর মার্কা হ-য-ব-র-ল'র পার্থক্য গুণগত নয়, পরিমাণগত মাত্র; এ কথা বললে একটি দুটির বেশী ব্যতিক্রম দেখিয়ে আমাকে আপনারা বিব্রত করতে পারবেন না।

আর একটি মাত্র বিজ্ঞাপন উল্লেখ করে আমি বিজ্ঞাপন পরিক্রমা সমাপ্ত করব। একটি সিনেমার কাগজের বিজ্ঞাপনে বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে অনেক রকম লে-আউট করে ছাপা আছে—

"সুদীর্ঘ উপন্যাস / লিখেছেন / উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর [চমকাবেন না, পড়ে যান আরও] অভিনীত / 'শেষ অঙ্ক' ছবির কাহিনীকার / রাজকুমার মৈত্র"।

আমার মনে হল, এটি একটি ফিউচারিস্টিক বিজ্ঞাপন। বাংলা ভাষায় যাঁরা সাহিত্যকর্ম করতে চান তাঁদের প্রতি এই বিজ্ঞাপন একটি সময়োচিত হুঁশিয়ারি। আপনার

হিমাচলম্

জগদীশ ভট্টাচার্য

ভ্রমণকাহিনী মুখ্যতঃ দু-জাতের। প্রথম জাতের লক্ষ্য দেশদর্শন, দ্বিতীয় জাতের উদ্দেশ্য দেবদর্শন। ওরই মধ্যে শাখাপ্রশাখা ও ভেজাল অনেক আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতিগোত্র মিলিয়ে নেওয়া বিশেষ আয়াসসাধ্য নয়।

রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সদ্যপ্রকাশিত 'হিমাচলম্' পড়তে পড়তে এই কথাটা মনে হচ্ছিল। 'হিমাচলম্' দেবদর্শনের উদ্দেশ্যে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ ভ্রমণের সরস ও প্রাণবন্ত কাহিনী। ধীরেন্দ্রনারায়ণ একাধারে ভক্ত ও কবি। ভক্তিমার্গে তাঁর পিতামহ মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণের কাছেই তিনি শৈশবে দীক্ষা পেয়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁর বাল্যকৈশোরের দশটি বছর কেটেছে মাতামহ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। উপরন্তু আছে ধীরেন্দ্রনারায়ণের নিজের প্রাক্তন সংস্কার। স্বভাবতঃই তাঁর তীর্থভ্রমণকাহিনী একদিকে যেমন দেবতাত্মা নগাধিরাজের পরম রহস্যময় মহিমাকে প্রকাশ করেছে, অন্য দিকে তেমনি প্রকাশ করেছে তীর্থদেবতার প্রতি পরিব্রাজকের অহৈতুকী ভক্তি।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ কবি। সুতরাং মানবিক রসের অভাব গ্রন্থমধ্যে কোথাও হয় নি। মহাযাত্রীরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন না, তাঁদের রেখাচিত্র অঙ্কনে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া না হলেও সংক্ষিপ্ত প্রাঞ্জোক্তির মধ্য দিয়ে কিংবা হাস্য-বক্রোক্তির লঘু পরিহাসে তীর্থপথ পরিক্রমায় তাঁদের উষ্ণ উপস্থিতির উত্তাপ গ্রন্থের পাঠক অনুভব করতে পারেন। অনুভব করতে পারেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিনম্র ব্যক্তিত্ব। ক্ষমতার মদিরা পান করে যে তিনি বিচলিত হন নি, আসনের উত্তাপকে অতিক্রম করে তিনি আর-দশজন তীর্থযাত্রীর মতই যে চলে-ফিরে বেড়াতে পারেন, এই সত্য সাহিত্যশিল্পী

উপন্যাস যদি ছায়াচিত্রের কাহিনী না হয় এবং সে ছায়াচিত্রে যদি চকচকে অভিনেতা-অভিনেত্রীযুগল অবতীর্ণ না হন তবে আবার আপনি কোন্ দেশী ঔপন্যাসিক?

এবং এই নিরিখে উতরে গেছেন যাঁরা তাঁদেরই ভবিষ্যৎ আছে ভবিষ্যতে। শুধু সাহিত্যের জন্য সাহিত্য এ যুগে অচল। কেন না, সাহিত্য এখন প্রকাশকদের দালালী ছাড়া জনসমক্ষে পৌঁছয় না; প্রকাশকদের এমন রুচি কিংবা ক্ষমতা নেই যে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত গুণ দিয়ে প্রকাশযোগ্য গ্রন্থ নির্বাচন করবেন; তাঁরা নাম বোঝেন, বোঝেন কোন্ গ্রন্থকারের নাম ব্যবহার করলে কম বিজ্ঞাপনে বেশী বিক্রয় সম্ভব; এবং তেমনতর "নাম" অর্জন করার পথ মাত্র দুটি: হয় আপনাকে ছায়াচিত্রের কাহিনীকার হতে হবে, অথবা বাজারে সাময়িকপত্রে নিয়মিত ধারাবাহিক রচনা লিখতে হবে। প্রথমটির জন্য আপনি যথেষ্ট পরিমাণে স্থূলরুচি হলেই যথেষ্ট হল, দ্বিতীয়টির জন্য আপনাকে আনন্দবাজার বা অমৃতবাজারের বেতনভোগী সাংবাদিক কিংবা তাঁদের প্রসাদ-ভোগী মোসাহেব হতে হবে। নান্যপন্থা বিদ্যতে।

যে-কোন একটি সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার বিজ্ঞাপন পড়ে যান। গ্রন্থকারের তালিকায় যে কটি নামের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখবেন তাঁরা এই দুটি নিরিখের একটি বা দুটিতেই সসম্মানে উত্তীর্ণ।

সংবাদপত্র অথবা চলচ্চিত্র—এই দুটি বারবনিতার যে-কোন একটির অন্ততঃ প্রসাদধন্য না হতে পারলে বাংলা সাহিত্যের আসরে কলম ধরা আপনার পণ্ডশ্রম। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের মৃত্যু হয়েছিল বেশ্যালয়ে; এ যুগে বাংলা-সাহিত্যের জন্ম হচ্ছে যে আলয়ে তার সঙ্গে কালিদাসের মৃত্যুস্থলের আশ্চর্য মিল গভীর তাৎপর্যের ব্যঞ্জনায় ধন্য।

ধীরেন্দ্রনারায়ণের চোখে ধরা পড়েছে। মানবলোকে লেখকের মাধুকরী-বৃত্তির ঝুলিতে স্থান পেয়েছেন মাথায় রঙ-বেরঙের পাগড়ি, গায়ে গলাবন্ধ কোট, দুজন বাহকবাহিত বিপুলায়তন শেঠজী, আর মস্ত গাঁঠরিতে মাথায় সমস্ত সংসারটাই গুটিয়ে নিয়ে-চলা পশ্চিমী দম্পতি—হরিদ্বার থেকেই যারা পায়ে হেঁটে চলেছে বদরীনারায়ণ দর্শনে। এসেছেন গাড়োয়ালী কবি ভগবতীচরণ নির্মোহী, আর টেম্পল কমিটির প্রেসিডেণ্ট আচার্য ব্রজবিহারী মিশ্র। কিন্তু ওদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জল হয়ে উঠেছে শ্রীনগরের একটি নগণ্য দোকানের মালিক পিতাপুত্র। নগদ পঁচিশ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল ভরতি হারানো ক্যাশবাক্স যারা দিন দশ-বারো পরে ফিরে-আসা মালিককে অনায়াসে ফিরিয়ে দেয়, অথচ বাপে-ব্যাটায় দিনরাত পরিশ্রম করেও তিন বৎসরের চেষ্টায় যাদের ছোট্ট দোতলা বাড়িটুকু অসমাপ্তই থেকে যায়।

এরা তো তবু সাধারণ মানুষ। তীর্থে দেবদর্শনের আনুষঙ্গিক পুণ্যফল হল দেবতাত্মা মানুষের দর্শন। ধীরেন্দ্রনারায়ণের শ্রদ্ধানত দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছেন কত বিচিত্র ধরনের সাধু-সন্ন্যাসী। কেদারের ফলাহারী বাবা, বদরীনারায়ণের মৌনীবাবা, যোশীমঠের বর্তমান শঙ্করাচার্য, প্রবীণ বাঙালী সাধু, এবং সেই সেতারী সাধুটি যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁর সমগ্র সাধনাকে তারের ওপর ঢেলে দিয়ে কণ্ঠে অতীন্দ্রিয় আবেগের অপূর্ব আবেদন সৃষ্টি করেন। ওরই পাশে দেখা দিয়েছেন সর্বভুক অঘোরপন্থী সাধু, যাঁর আশ্রম তামাম দুনিয়া,—যিনি কুকুরের বিষ্ঠা কুড়িয়ে নিয়ে তার সঙ্গে নিজের মূত্র মিশিয়ে ভোজ্যদ্রব্য বিকারহীনভাবে গলাধঃকরণ করে চলেছেন। নানা পথ নানা মত। কখনও মধুর, কখনও বীভৎস। সন্ন্যাস-মার্গের এই বিচিত্র রূপ দেখে ধীরেন্দ্রনারায়ণ শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেছেন।

অলৌকিক ঘটনাও তাঁর চেতনায় ধরা দিয়েছে। উত্তরকাশী পেরিয়ে নূতন পথযাত্রার আরম্ভেই তাঁর কানে ভেসে এল, "আজ মৎ যাও, লৌট আও।" হিমালয়ের নির্জনতায় এই দৈববাণী শুনে তাঁর মনে হয়েছে, "এ কী কোনো মহাপুরুষ পর্বতকন্দরে বসে এই মঙ্গল-কামনা করলেন, অথবা সে কী কোনো অশরীরী ভাবধারা যা এই তীর্থপথে আমাদের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে? তারই কোনো সূক্ষ্ম আলো-তরঙ্গ শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের নির্দেশ দিয়েছিল—আমাদের পরিচালিত করেছিল?" শুধু দৈববাণীই নয়, তীর্থপথে হিমালয়ের অপার্থিব সংগীতও তাঁর শ্রুতিমূলে প্রবেশ করেছে।

বিংশ শতাব্দীর জড়বাদের চরম দৌরাত্ম্যের দিনে কবি-ভক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণের চিত্তের এই উপলব্ধিগুলি আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করেছে। বদরীনারায়ণের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর অন্তিম প্রার্থনার কথা কানে বাজতে থাকে। "জৈব জগতে তোমার দরবারে এই প্রথম, এই শেষ। আর হয়তো এখানে আসা হবে না। আমার দৈনন্দিন জীবনে যে সব কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলেছি—যে সব আবর্তের ঘূর্ণিপাকে পড়ে আমি বিভ্রান্ত হয়েছি, জ্ঞানে-অজ্ঞানে তোমার আইন মেনে না চলার অপরাধ যদি হয়ে থাকে, তুমি ক্ষমা কর। যেখানেই থাকি না কেন, সবই যেন আমার কাছে তোমার মন্দির হয়ে ওঠে।"

ভক্তচিত্তের এই অকৃত্রিম প্রার্থনা পাঠকমনেও সঞ্চারিত হয়। ভ্রমণকাহিনী হিসাবে হিমাচলমের সার্থকতা এখানেই। উত্তুঙ্গ দুর্গম হিমাচলের তীর্থে তীর্থে দেবদর্শন আর দেবতাত্মা মানুষ-দর্শনের পুণ্যফল এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় পরিদৃশ্যমান। ধীরেন্দ্রনারায়ণের কবিচেতনার সঙ্গে অধ্যাত্মচেতনার মণিকাঞ্চনযোগে এই হিমালয়-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'।*

---

* হিমাচলম্: শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

*

সংবাদ-সাহিত্য

বিবেকানন্দ

আজ ১৭ই জানুয়ারি ১৯৬৩; ইংরেজী পঞ্জিকামতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মতিথি। উনবিংশ শতকের এই সর্বত্যাগী মহান চিন্তানায়ক বাক্য ও কর্মের দ্বারা আচারভ্রষ্ট ভারতবাসীকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন আজ আদর্শচ্যুত পথহারা উন্মার্গগামী জাতির চক্ষে সেই সাধনার কাহিনী সন্ন্যাসীর অলৌকিকত্ব অথবা মহাপুরুষের দিব্যপ্রভাব রূপে স্বীকৃত হইয়া ইতিহাসকে ক্রূর ব্যঙ্গ করিতেছে। মৃতপ্রায় ধ্বংসোন্মুখ জাতির জীবনে আশা ও আনন্দের বিবেকবাণী সিঞ্চন করিয়া তৎকালে বিবেকানন্দ যে তেজ ও প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিলেন অন্যান্য কীর্তির কথা বাদ দিলেও শুধু এইটুকুর জন্যই জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার নাম লিখিত থাকিবে। ভারতীয় ধর্ম ও কর্মের আদর্শ সুপ্রচারিত করিয়া বিশ্বের মনীষীদের মধ্যে তিনি যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন আজ তাহা লইয়া আমাদের গর্বের সীমা নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুই দেশেই ভারতের দুই সমসাময়িক মহান্ প্রতিভা—রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, সাহিত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রে নিজ দেশের মর্যাদা চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আজ তাহা বাঙালীমাত্রেরই মনে শিহরণের সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু এই দোদুল-লবঙ্গলতা-বিগলিত-লালিমাদের দেশে পৌরুষ ও মহত্ত্বের মহিমা অভিনয়শেষে মেক-আপ তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে উবিয়া যায় তাহাও আমরা জানি। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে নাচগান বাজনা বক্তৃতার কত তুবড়ি ছুটিল। কলমচি এবং তবলচির দল গলাখাঁকারি দিয়া এবং তাল ঠুকিয়া কত আসর মাত করিল তাহার হিসাব কে রাখে। তারপর আবার খেলাশেষে রবীন্দ্রনাথকে ঝাড়িয়া মুছিয়া সযত্নে তাকে তুলিয়া রাখা হইল তাহাও দেখিলাম। বিবেকানন্দের বেলায় নাচগান অবশ্য অত হইবে না কিন্তু গুরুভাইয়ের প্রচারে অচিন্ত্য-আনন্দের দল কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। মওকা আসিয়াছে—যাহা পার করিয়া লও।

এই সব অমানুষিক মাতামাতি ও দাপাদাপির যথার্থ প্রয়োজন কতটুকু অন্ততঃ কর্মযোগী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকীতে তাহা ভাবিয়া দেখা আমাদের নিতান্ত উচিত বলিয়া মনে করিতেছি।

বিবেকানন্দের জীবনকে নিজের আদর্শরূপে খাড়া করিয়া তাহার অনুসরণ কিংবা তাঁহার বাণী ও উপদেশ মত চলার চেষ্টা করিতে গেলে এই যুগে যে অত্যন্ত বিসদৃশ ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বক্তৃতার দ্বারা ঘরে ঘরে বিবেকানন্দ সৃষ্টি করার চেষ্টা বাতুলতামাত্র। সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া বিবেকানন্দের তেজ, নির্ভীকতা, জাতীয়তাবোধ, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অটল বিশ্বাস, আর্তের প্রতি মমত্ববোধ এবং পৌরুষকে আদর্শ হিসাবে ধরিয়া দেশের যুবকেরা যদি চলিতে পারেন তো বাঙালীর দুর্দিন অনেকখানি কাটিয়া যাইতে পারে। মস্তক ও মেরুদণ্ড (যে দুইটির উপর বিবেকানন্দের কড়া নজর ছিল) উন্নত করিয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতা সে ফিরিয়া পাইবে। বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করিতে বসিয়া অধ্যাত্মবাদের বুজরুকিতে আমরা যেন না ডুবিয়া যাই—সোজাসুজি বীর বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই যথেষ্ট।

আজ শততম জন্মতিথিতে এই বীর বঙ্গসন্তানের পুনরাবির্ভাব আমাদের একমাত্র কাম্য হউক।

•

রাষ্ট্র ও সাহিত্যিক

গোপালদার একটি পুরাতন পত্র হইতে যুগোপযোগী কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি :

"ভায়া হে, যদি সাহিত্যিক হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে চাও, দোহাই তোমাদের, রাজা, রাষ্ট্র ও রাজনীতির আশ্রয় কদাপি লইও না। ক্ষমতাশালীর জাতে জাত দিয়া আজ পর্যন্ত বহু হিন্দু মরিয়াছে, সাহিত্যিকেরা যেন সাধ করিয়া এই আত্মবিলুপ্তি না ঘটায়। আমার দ্বারা যদি দেশের কোনও কল্যাণ হইয়া থাকে দেশের শাসনকর্তার অবশ্য কর্তব্য আমি অক্ষম হইলে বৃত্তি দিয়া আমাকে পালন করা। কিন্তু সাহিত্যিকের আরামের জন্য রাজনীতিকেরা আখড়া করিয়া দিবে, সেখানে আশ্রয় লইবার পূর্বে সাহিত্যিকের যেন মৃত্যু হয়।

ভায়া হে, আজ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পরে সাহিত্যদৈত্য মহামতি টলস্টয়ের কথা স্মরণ হইতেছে। রাজা তাঁহাকে সম্মান করেন নাই, রাজনীতিকেরা তাঁহাকে ভয়ে ও ঘৃণাভরে বর্জন করিয়াছিলেন, অথচ কী সম্মান, কী শ্রদ্ধা তিনি শুধু স্বদেশবাসীর কাছে নয়, সমগ্র পৃথিবীর কাছে পাইয়াছিলেন! তাঁহার কথা মনে হইলেই আমাদের রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। এই জগৎব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাই সত্যকার সাহিত্যিকের কাম্য এবং যে সাহিত্যিক নিজের সৃষ্টির দ্বারা অধিকার অর্জন করেন তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার সাধ্য আলেকজাণ্ডারের ছিল না, সিজারের ছিল না, চেঙ্গীস খান, তৈমুরলঙ্গের ছিল না, হিটলারের ছিল না এবং আজিকার ক্রুশ্চেভেরও নাই। বার্টন ('অ্যানাটমি অব মেলাঙ্কলি'), মেলভিল ('মবি ডিক') এবং এমিয়েল-('জার্নাল')এর মত কাহারও কাহারও ভাগ্যে সম্মান বিলম্বে আসিয়াছে কিন্তু তবু আসিয়াছে। এমন কি জেরার্ড ম্যানলে হপকিন্সও কালপ্রবাহে হারাইয়া যান নাই। যাহা হউক, টলস্টয়ের কথা বলিতেছিলাম। রাশিয়ার জার তাঁহাকে কী সমৃদ্ধি দিতে পারিতেন! কিন্তু তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যিকেরা তাঁহাকে কী চোখে দেখিতেন তাহার একটি ছবি আইভান বুনিন তাঁহার 'স্মৃতি ও আলেখ্যে' দিয়াছেন। ১৮৯৩ সন, বুনিন তখন মাত্র তেইশ বৎসরের যুবক, তিনি থাকিতেন পোলটাভায়। তখন পর্যন্ত লিও টলস্টয়কে দেখার সুযোগ তাঁহার হয় নাই কিন্তু দেখিবার জন্য ছটফট করিতেছেন :—

'অনেক বছর হ'ল আমি সত্যিই তাঁর প্রেমে পড়েছিলাম। তার মানে, আমার মনের মন্দিরে তাঁর যে মূর্তি আমি গড়েছিলাম তাকে ভালবেসেছিলাম এবং রক্ত-মাংসের মানুষটিকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলাম। এই ব্যাকুলতা আমার নিত্য সঙ্গী ছিল। কিন্তু কি করব বুঝে উঠতে পারতাম না। ইয়াসনায়া পলিয়ানায় [টলস্টয়ের শেষ আশ্রম] যাব? কিন্তু কোন্ অজুহাতে যাব? সেখানে না হয় গেলাম, কিন্তু কি বলব তাঁকে? শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলাম না, গ্রীষ্মের এক উজ্জ্বল দিনে হঠাৎ আমার কিরঘীজ ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলাম।'

কিন্তু মাত্র আশি মাইল ব্যবধানের প্রায় সবটাই অতিক্রম করিয়া বুনিন সাহস হারাইলেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ১৮৯৩ সনে তিনি সংবাদ পাইলেন টলস্টয় মস্কো আসিয়াছেন। তিনি বহুকষ্টে রেলপথের নিদারুণ ধকল সহ্য করিয়া মস্কো ছুটিলেন এবং শেষ পর্যন্ত টলস্টয়ের আবাস-স্থলের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন।

'তারপর কি ঘটল আমি কেমন করে বর্ণনা করব? জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি কিন্তু তুষারে যেন জমে গেছে। আমি সমস্ত পথটা ছুটে গিয়েছি। যখন পৌঁছেছি তখন আমার দম ফুরিয়ে এসেছে। চারিদিক নির্জন, নিঝুম— জ্যোৎস্নাস্নাত ছোট রাস্তাটি জনশূন্য, সামনের দরজায় কেউ নেই। গেট খোলা, জনমানবহীন। তুষারাচ্ছন্ন উঠোনও খালি। উঠোন ছাড়িয়ে বাঁদিকে একটা কাঠের বাড়ি, তার দু-চারটা জানলা থেকে লাল আলো আসছে। আরও বাঁয়ে সেই কাঠের বাড়ির পেছনে একটি বাগান। বাগানে পৌঁছে মাথা তুলে একবার চাইলাম, শীতের আকাশে তারাগুলি মিটমিট করে জ্বলছে—যেন পরীর দল। সবকিছু মিলে সত্যিই যেন একটা রূপকথার রাজ্য। বাগানখানা আশ্চর্য, বাড়িটা অদ্ভুত; আর ওই আলোকিত

জানলাগুলোর আড়ালে কী ইঙ্গিতময় রহস্য; রহস্য—কারণ তাদের আড়ালে যে তিনি ছিলেন! আমার আশপাশে এমনই নিযুতি যে আমি আমার হৃদ্‌স্পন্দন পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলাম। সে স্পন্দন আনন্দের, আবার ভয়েরও।'

ভক্তে ও দেবতায় শেষ পর্যন্ত দেখা হইল। টলস্টয় প্রশ্ন করিলেন, 'বুনিন? তুমি কি মস্কোতে অনেক দিন এসেছ? কেন? আমাকে দেখতে? কি বললে? তুমি একজন তরুণ লেখক? খুব ভাল। নিশ্চয়ই লিখবে, লেখার নেশা যতদিন থাকবে লিখে যাও। কিন্তু মনে রেখো, লেখাটাই জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।'

বিদায় দেওয়ার সময় হইলে টলস্টয় বুনিনকে শেষ কথা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই তোমাকে এবং ওই সঙ্গে বাংলাদেশের ··· সকল সাহিত্যিককে শুনাইবার জন্যই আমার এই প্রসঙ্গের অবতারণা। টলস্টয় বলিলেন, 'হ্যাঁ, বিদায়, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তিনি আমার হাত চেপে ধরে আর একবার বললেন, মস্কো এলে আমার সঙ্গে দেখা করো। আর দেখ, জীবনের কাছ থেকে খুব বেশী কিছু প্রত্যাশা করো না, এখন যেমন আছ এর চেয়ে ভাল সময় জীবনে কখনো আসবে না। মানবজীবন অবিচ্ছিন্ন সুখের জীবন নয়, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত সুখের উদয় হয় মাত্র। সেইটুকুর মর্যাদা দিতে শেখ এবং সেই সুখের স্মৃতিতে বেঁচে থাক।'

টলস্টয়ের স্মৃতিতে আমার চিত্ত ভারাক্রান্ত, এখন আর কিছু বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। তোমরা সাহিত্যিক, শুধু সাহিত্যেই প্রতিষ্ঠিত হও, ভগবান বুদ্ধের কাছে নিরন্তর সেই প্রার্থনাই করিতেছি।—ইতি গোপালদা।"

সাম্যবাদের লালবাতি

লাল চীনের পররাজ্য গ্রাসের উদগ্র লোভ ও লোলুপতা যে তথাকথিত ফ্যাসিস্ট বা সাম্রাজ্যবাদীগণের তুলনায়ও অনেক বেশী প্রবল তাহা এখন অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মিথ্যা, শঠতা, জালিয়াতি এবং ধাপ্পাবাজিতে তাহারা হিটলারকেও হার মানাইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাল চীনের হাতেই সাম্যবাদের লালবাতি জ্বলিল।

চীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী নহে। তামাম দুনিয়ায় সাম্যবাদ ছড়াইতে হইলে শান্তিকে সরাইয়া রাখিয়া যুদ্ধের সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি ও বিপক্ষকে আঘাত করাই যে একমাত্র উপায় তাহা সে ভাল করিয়াই জানে। ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রে বিশেষ পার্থক্য সাম্যবাদী চীনের চোখে নাই। সকলেই নির্বিচারে সাম্যবাদের শত্রু। শত্রুকে নিপাত করিতে হইলে বুলেটের প্রয়োজন। চীন বুলেটের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছে। ইহারা জড়বাদের উপাসক—ধর্মে বা অধ্যাত্মজীবনে ইহাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। ধর্ম ইহাদের কোনও দিনই ছিল না, এখন দেখিতেছি ইহাদের কাছে নীতি বলিয়াও কিছু নাই। বন্ধুর পিঠে ইহারা অকুণ্ঠচিত্তে ছোরা বসাইয়া দিতে পারে।

বর্তমানে পৃথিবীতে সাম্যবাদী জগতের প্রধান দুইটি দল—রাশিয়া ও চীন পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া পড়িবে এইরূপ আশঙ্কা অনেকেই করিতেছেন। সাম্যবাদের সমর্থকেরাও এখন দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। কেহ রাশিয়ার, কেহ চীনের দলে। রাশিয়ার সমর্থকেরা কেহ কেহ বলিতেছে, রাশিয়ার দিকে তাকাও। ক্রুশ্চেভের নীতিতে আস্থা স্থাপন কর। কিন্তু ক্রুশ্চেভ একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন চীন-রাশিয়ার মতভেদ সাম্যবাদী শিবিরের পারিবারিক ব্যাপার।

সাম্যবাদী শিবিরের নেতৃত্ব কাহার হাতে থাকিবে—রাশিয়া না চীন, এই প্রশ্নটা স্বতঃই থাকিয়া যায়। এই লইয়াই ইহাদের কলহ। কিন্তু এই কলহ যে নিতান্তই বাহ্যিক তাহা বোঝা গেল ভারত-চীন বিরোধে রাশিয়ার মনোভাব দেখিয়া। বিশ্বাসঘাতক চীনকে চিনিতে পারিয়া সুস্থ ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ইহার পর কম্যুনিজমের প্রতি কোনও কারণেই আস্থা রাখিতে পারেন না। অর্থনৈতিক প্রতিষেধক হিসাবে মার্কসবাদের আদর্শ অনেকের নিকটেই লোভনীয় ছিল। কিন্তু

সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়া গত পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরিয়া রাশিয়া যে নরঘাতী নিপুণতার পরিচয় দিয়াছে এবং সম্প্রতি চীন যে পৈশাচিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে মার্কসবাদের মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁহারা মার্কসবাদী আদর্শের মোহে একদা বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা আজ ইহার সর্বনাশা বাস্তব রূপ দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছেন। সাম্যবাদের এই মুখোশ খসাইয়া দিয়া লাল চীন পৃথিবীর মহা উপকার করিয়াছে। সাম্যবাদের যাঁহারা নৈতিক সমর্থক ছিলেন তাঁহারা একে একে মোহমুক্ত হইয়া ইহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেছেন। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পরে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের এক অংশ বিপরীত বুলি আওড়াইতেছেন। ইহাদের মুখের বুলি যে সর্বক্ষেত্রে আন্তরিক তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। প্রয়োজনমত বোল ও ভোল পালটাইতে ইহাদের অনেকেই ওস্তাদ। কিন্তু প্রকৃতই বিবেকের দংশনে কম্যুনিজমকে সম্পূর্ণ বর্জন করার সংকল্পও কেহ কেহ ঘোষণা করিতেছেন। 'দেশ' পত্রিকার ৫ই জানুয়ারি সংখ্যায় "শিল্পীর স্বাধীনতা" শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য কোনও দিনই পার্টি-সদস্য ছিলেন না। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার উপরেই কম্যুনিস্ট দলের সর্বাধিক ভরসা ছিল। আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রগতিপন্থীদের মধ্যে বিবেকবান শিল্পী বলিয়াই জানি। চীনের ভারত আক্রমণের পটভূমিতে কম্যুনিজম সম্পর্কে তাঁহার সত্যসত্যই মোহভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁহার বক্তব্যের শেষে ঘোষণা করিয়াছেন :

"আজ দেখছি, কমিউনিজম চৈনিক পররাজ্যলোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বীজে পরিণত হয়েছে। এই কমিউনিজম আমার শত্রু, আমার দেশের শত্রু, সমস্ত মানবতার শত্রু। আমার লেখায় তার বিরুদ্ধে ধিক্কার সহস্র কণ্ঠে ফেটে পড়ুক।"

কমিউনিজম যে আজ কতটা দেউলে হইয়াছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নির্মোহ ঘোষণাই তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন।

অথ সিংহচর্মাবৃত গর্দভকথা

সংস্কৃত কথাসাহিত্যের সিংহচর্মাবৃত গর্দভের কাহিনী সকলেরই জানা আছে। সেই গর্দভ শেষ পর্যন্ত তাহার আওয়াজেই ধরা পড়িয়াছিল। মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৪৩৯-৪৪৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ একটি সিংহকে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহার আসল পরিচয় জানিতে স্বভাবতঃই আমাদের দারুণ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হইতে দেখিয়া হতাশ হইলাম।

প্রবাসীর উক্ত সংখ্যায় অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য রচিত 'কবিমানসী' গ্রন্থের প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী অতিশয় নোংরা ঈর্ষ্যা-অসূয়া-প্রণোদিত এক আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনা করিয়াছেন কশ্চিৎ সিংহ। কিন্তু সিংহনিনাদ অপেক্ষা গর্দভরাগিণীই এই উচ্চরবমুখরিত কুৎসাপূর্ণ রচনাটিতে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের গ্রন্থখানি প্লেটোনিক প্রেমের দৃষ্টিতে লেখা। কিন্তু উক্ত সমালোচক তাহাতে দেখিয়াছেন "ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে ব্যবচ্ছেদ।" আমাদের জিজ্ঞাস্য প্লেটো ও ফ্রয়েডের প্রভেদজ্ঞান যাহার জন্মে নাই সে যদি সিংহ তবে গর্দভ কে? কিন্তু গর্দভেরও দুই জাতি আছে। বনের গাধা আর ধোবার গাধা। প্রবাসীর এই জীবটি দ্বিতীয় পর্যায়ের। অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁহার গ্রন্থে কবিজায়া মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রের [দ্রষ্টব্য : চিঠিপত্র-১, পৃঃ ১৭] অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "রসিকতাটি উপাদেয় সন্দেহ নেই; কিন্তু সমস্ত গোয়ালার ঘর মন্থন ক'রে উৎকৃষ্ট মাখনমারা ঘের্তে পত্নীর 'সেবার জন্যে' কবি নিয়মিত পাঠাচ্ছেন—এ দৃশ্যটি যেমন হৃদ্য তেমনি উপভোগ্য।" এই মন্তব্যের উপর

কটাক্ষ করিয়া সিংহচর্মধারী গর্দভটি লিখিতেছেন, "ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে রবীন্দ্রনাথের কোনও ধোপার খাতা এই সব গবেষকের হাতে পড়ে নি, তাহলে হয়ত তার থেকেও কত কিছু তত্ত্ব এঁরা খুঁজে বার করতেন।" এই মন্তব্য পাঠের পর আমাদের আর সংশয়মাত্র নাই যে, গুপ্ত গাধাটি ধোবার গাধা। এইজন্যই তিনি গ্রন্থমধ্যে "শৃঙ্খলাহীন চিন্তা ও লেখনীর অক্ষম প্রগলভতা"ই শুধু লক্ষ্য করিয়াছেন। অথচ বাংলার বিদগ্ধ সমালোচকগণ সকল বিষয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হইলেও তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যের জন্য বিশেষভাবে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। বর্তমান বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিমানসী পাঠান্তে লিখিয়াছেন: "তুমি এ বিষয়ে যে নূতন আলোকপাত করিয়াছ তাহার সহায়তায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাগুলি আবার সযত্নে পড়িয়া তোমার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অনুমান-সিদ্ধান্তের ক্রমটি অনুসরণ করিতে হইবে।...তোমার পরিশ্রম, মনীষা ও সিদ্ধান্ত-স্থাপনায় নিপুণতার প্রতি আমি সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাইতেছি।"

রসগ্রাহী সমালোচকের এই মন্তব্যে এবং 'প্রবাসী'র সিংহচর্মাবৃত গর্দভের বক্তব্যে তফাত কতখানি তাহা বুদ্ধিমান পাঠকের চোখে সহজেই ধরা পড়িবে। এই সিংহনিনাদ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হওয়ায় বিচক্ষণ পাঠকের নজরে না আসারই কথা। কিন্তু এই ছদ্মবেশী সিংহের চামড়া এখনই ছাড়াইয়া লওয়া প্রয়োজন।

যে বোঝে সেই-ই বোঝে

কয়েকদিন আগে ডাকযোগে একটি রচনা আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রচনাটি মৌলিক অথবা অনুবাদ, সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ তাহা সঠিক বুঝিবার উপায় নাই যদিও পাত্র-পাত্রীর নাম বিদেশী ধরনের। লেখক নিজের পরিচয় গোপন করিয়াছেন এবং কোন্ কৌতুকবশে ইহা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন তাহা বলিতে পারিব না। তবে এক্ষেত্রে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হওয়াই উচিত ভাবিয়া আমরা রচনাটি হুবহু ছাপিয়া দিলাম। আশা করিতেছি রচনাটি নানাজনের কৌতূহল জাগ্রত করিবে এবং লেখকও পরবর্তী অংশ (যদি থাকে) পাঠাইতে সাহসী হইবেন। আমরা সাহিত্যের সেবক—সুতরাং মাত্র ছাপিয়াই খালাস। অন্য কোনও দোষ আমাদের উপর বর্তাইবে না তাহা আগেই কবুল করিয়া রাখিতেছি।

এক

মার্থা আমাকে আজও চিনতে পারল না।

অথচ প্রায় চার বছর হল আমাদের পরিচয় ঘটেছে।

চার বছর আগে অচেনা মার্থার যে চেহারা দেখেছিলাম, অপরিচিতা মার্থার যে কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম দিনে দিনে তার আকর্ষণ আমার কাছে বহুগুণ বেড়েছে। মার্থার বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে আট-দশ মাইল দূরে—আমাদেরই পাশের গ্রামে। অত দূরে থাকলেও আমি কিন্তু তাকে প্রায়ই আমার কাছে পাই। মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হওয়া ছাড়াও স্বপ্নের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে সে এসে ধরা দেয় আমার কাছে, জাগরণের মধ্যেও চকিতে তার অবয়ব আমার মনের মধ্যে কখনও কখনও ভেসে ওঠে।

মার্থা আমার জীবনে ক্রমশঃ প্রেরণার উৎস হয়ে উঠল। তার কথা যখনই মনে পড়ে তখনই একটা অজানা উৎসাহে ভরে ওঠে আমার সারা মন। কার প্রেরণা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে কে জানে!

মাঝে মাঝে হৃদয় জুড়ে যখন একটা শূন্যতার প্রচণ্ড হাহাকার জেগে ওঠে তখন আমার মন দূরকে নিকট করার জন্যে অত্যন্ত আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু মনের ইচ্ছায় দেহের ব্যবধান তো কমে না। বরং হৃদয়ের মধ্যে জ্বালার তীব্রতা ক্রমশঃই তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। মার্থার একটুখানি পরশ পেলে সে জ্বালা নিশ্চয়ই কমে। আমি তাই প্রতিদিন চেষ্টা করি কি করে দূরকে কাছে আনতে পারি।

মার্থাকে হয়তো আমিও ঠিক চিনতে পারি নি।

কেমন একটা দুর্ভেদ্য রহস্যের কঠিন আবরণে সে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। আমি সে আবরণ উন্মোচন

করতে পারছি না কিছুতেই। অথচ আমার কাছে তার হাসির বিরাম নেই, তার চোখের তারায় সহস্রবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে কথা বলার অবকাশে, তা আমার দৃষ্টি এড়ায় না।

পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় মানুষের মন—মনের গভীর গহনে জটিলতা আরও বেশী। সেই দুরধিগম্য মানুষের মনোজগতে প্রবেশ করাটাও রীতিমত একটা আর্ট, অক্ষমতার দোহাই পেড়ে সেই রাজ্যের প্রবেশপথের সিংহদরজায় মাথা কুটে হাহাকার করে মরব তেমন শক্তিহীন আমি নই। আমি তাকে প্রবল করাঘাতে বিপুল শক্তির বলে ভেঙে ফেলতে চাই। ললিত রূপের সাধনায় নয়, মত্ত পৌরুষের দৃপ্ত প্রকাশেই আমার আগ্রহ বেশী। তাই তো দেখি জীবনের অগ্নিকুণ্ডকে বেষ্টন করে সবাই যখন পতঙ্গের মত ঘুরছে, আমি চলেছি জীবনের রাজপথে ঐরাবতের মত গর্বিত পদক্ষেপে।

মার্থার সঙ্গে পরিচয় দিনে দিনে যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছে আমি যেন ততই সম্মোহিত হয়ে পড়ছি। হাসি-পরিহাসে সম্পর্কটা আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে এসেছে।

পাহাড় ফেটে যখন ঝরনা বেরোয় তখন তাকে আর পথ দেখাতে হয় না। আপন আবেগেই সেই জলধারা নিজের পথ করে নেয়। আমার ভিতরে যে নির্ঝর এতকাল নিদ্রায় মগ্ন হয়ে ছিল হৃদয়ের এই আকুল অবস্থার মধ্যে একদিন জাদুমন্ত্র বলে তা যেন জেগে উঠল। সেই নির্ঝরের সঞ্চিত জলরাশি যেন সহস্রধারায় ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কোন্ পথে যাবে সে। সে কি চাইছে সাগরের দিকে ছুটে যেতে!

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল।

আমার গ্রামের সীমানায় যে মস্তবড় দীঘিটা বহুবার আমাকে আকর্ষণ করেছে, কারণে অকারণে যার ধারটিতে গিয়ে চুপ করে বসে আমার অনেক সময় কেটেছে পাখীর ডাক শুনে, সেদিন শীতের সেই প্রখর মধ্যাহ্নে তার পাড়ে গিয়ে একলাটি বসে ছিলাম। সে সময় পাখি ডাকছিল না একটিও, চারিদিক নিস্তব্ধ। অন্যমনস্কভাবে দীঘির টলটলে স্বচ্ছ জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা দেখি আমার নিজের একটা প্রতিচ্ছবি সেই জলের ওপর ফুটে উঠেছে। আমারই ছবি—বিচিত্র বিমুগ্ধ ভঙ্গিতে আমারই দিকে চেয়ে আছে। কতক্ষণ ওই রকম মগ্ন অবস্থায় ছিলাম মনে নেই, চেতনা ফিরে আসতে চেয়ে দেখি মাথার সূর্য কখন এরই মধ্যে পশ্চিমে ঈষৎ হেলে পড়েছে। সহসা আমার মনে হল আমার যৌবনের মধ্যাহ্নও তো পেরিয়ে গেছে; এতদিন তো খেয়াল করি নি। ঊষার আলো-আঁধারিতে পাখির কাকলি শুনে সেই কবে যাত্রা শুরু করেছিলাম, তারপর চলার পথেই দেখেছি প্রভাত-সূর্য অরুণ আলোয় দিগন্তকে রাঙিয়ে দিয়ে তৃণতরুলতা-মণ্ডিত প্রকৃতিকে সতেজ ও প্রাণবান করে তুলেছে। আমার পায়ের তলায় ঝরা পাতার রাশি দলিত হয়ে গেছে, রাত্রির শিশিরে নরম মাটির ওপর আমার পায়ের চিহ্ন রেখে এসেছি, তাও হয়তো মুছে গেছে। ঊষার আলো-অন্ধকার নির্জনতা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। অতীতের সবকিছুই তো এইভাবে লুপ্ত হয়ে যায়।

আমি একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চেয়ে ছিলাম শান্ত জলের দিকে, যেখানে আমার সর্ব শরীরের একটা ছায়া সুন্দরভাবে ফুটে রয়েছে। এর আগে তো এত ভাল করে নিজেকে কোনদিন দেখি নি! সম্পূর্ণ তন্ময় হয়ে অপলকনেত্রে চেয়েই ছিলাম। এমন সময় দীঘির পাড়ে গাছের সারিতে সহসা বাতাসের একটা হিল্লোল বয়ে গেল। সেই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গাছের পাতায় পাতায় যে শব্দ উঠল আমার মনে হল তা যেন মার্থার কণ্ঠস্বর। সেই বহু পরিচিত কণ্ঠ যেন চুপিচুপি মৃদুস্বরে আমার কানের কাছে বলছে, ভাবছ কী? আমি তো রয়েছি। দিনের অবসান হয়ে আসে আসুক, অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ছায়ায় আমরা দুজন এইখানে এই দীঘির পাড়ে বসব পাশাপাশি। জলের ওপর ঢেউ খেলে যাবে আর আমরা কত রাত্রি পর্যন্ত বসে বসে চাঁদের আলোয় সেই ঢেউ গুনব।

মনে হল আমার সমস্ত হৃদয় যেন এই কথাটি শোনার জন্য এতদিন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে ছিল। মার্থার সেই কণ্ঠস্বর শুনে আমার শরীরে মনে একটা আনন্দের ঢেউ জেগে উঠল। একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল আমার চোখের সামনে। সমস্ত পরিবেশটার একটা আশ্চর্য রূপান্তর হয়ে গেল। শীতের এই অলস মধ্যদিনে

অনন্বিতা। রবীন্দ্র-জীবনী প্রথম সংস্করণ প্রথম খণ্ডে প্রভাতকুমার বলেছেন, "তাঁহার সংসারে যে মৃত্যু আসিতেছে, এ যেন তিনি অনুভব করিতেছিলেন; তাই কি তিনি লিখিয়াছিলেন—

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরণ?"

ঐকই সঙ্গে প্রভাতকুমার আরও বলেছেন, "'মাভৈঃ' প্রবন্ধেও তাঁহার সমস্ত উপমাদি মৃত্যুকে লইয়া। প্রবন্ধের প্রারম্ভে লিখিলেন—'মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মত। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।'...এই সব দেখিয়া মনে হয় তিনি যেন বিরাট বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।" [রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম সং, প্রথম খণ্ড, পৃ° ৩১৪]

রবীন্দ্র-জীবনীর পরবর্তী সংস্করণে প্রভাতকুমার তাঁর এই বক্তব্যের কিছু অদল-বদল করেছেন। মৃত্যু প্রসঙ্গ থেকে তিনি "মাভৈঃ" প্রবন্ধকে বাদ দিয়েছেন। কেন না পরে তিনি "মাভৈঃ" প্রবন্ধে 'দেশসমস্যার উদ্বোধন' লক্ষ্য করেছেন। তিনি তৃতীয় সংস্করণে বলছেন, "দেশের সমস্যা বাস্তবমূর্তিতে দেখা দিলে, জীবনে অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত উপস্থিত হইলে দেশসেবক যেন বিচলিত না হন, এই কথাটি দিয়া কবি দেশসমস্যার উদ্বোধন করিলেন 'মাভৈঃ' প্রবন্ধে।" [রবীন্দ্রজীবনী-২, পৃ° ৫৩]

প্রথম সংস্করণে প্রভাতকুমারের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে, "মাভৈঃ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'সমস্ত উপমাদি মৃত্যুকে লইয়া।' পরবর্তী সংস্করণে তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ল যে, কবি এই প্রবন্ধ দিয়ে দেশসমস্যার উদ্বোধন করলেন।... এ সম্পর্কে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। "মরণ-মিলন" কবিতাটি সম্পর্কে অবশ্য প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ অদল-বদল হয় নি। বর্তমান সংস্করণে তিনি লিখেছেন, "স্ত্রীর মরণ-নিশ্চয় পীড়ার সময়ে কবির লেখনী স্তব্ধ হয় নাই। যে দুঃখ আসিতেছে তাহার জন্য মন কি পূর্বেই আভাস পাইয়াছিল। শোকের কল্পিত হৃদয়োচ্ছ্বাসকে কি ভাষা দান করিলেন 'মরণ' কবিতায়?" [তদেব, পৃ° ৫২]

প্রভাতকুমারের এই পরিশোধিত মন্তব্যটি মারাত্মক। তাঁর মন্তব্যের ভাষাটি লক্ষ্য করবার মত। 'শোকের কল্পিত হৃদয়োচ্ছ্বাসকে' রবীন্দ্রনাথ ভাষা দিয়েছেন "মরণ" কবিতায়। অর্থাৎ পত্নীর মৃত্যু হওয়ার পূর্বেই কবি তাঁর মৃত্যু কল্পনা করে শোকগাথা রচনা করেছেন। রবীন্দ্রজীবনীকারের পক্ষে এই অসতর্ক উক্তি শুধু হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক নয়, তা মনুষ্যধর্মবিরোধীও বটে।

পত্নীর অসুস্থ শয্যার পাশে বসে যে সেবারত স্বামী প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছেন তিনি পত্নীর মৃত্যুকে কল্পনা করে "মরণ-মিলনে"র মত কবিতা রচনা করবেন, এ অনুমান নিতান্তই অ-মানবিক।

আসলে প্রভাতকুমার মরণ-মিলনের অর্থ ও তাৎপর্য গভীর ভাবে বিচার করে দেখেন নি। এর জন্যে অবশ্য জীবনীকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কবির জীবন-চরিত-রচয়িতা একাধারে সত্যান্বেষী ঐতিহাসিক এবং পরিশীলিত কাব্যরসিক হবেন এমন মণিকাঞ্চনযোগ পৃথিবীতেও দুর্লভ। এ সম্পর্কে কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচকগণের দায়িত্বও কম নয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা সম্পর্কে এলোমেলো অনেক আলোচনা হয়েছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রচিত্তে মৃত্যুচেতনার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন কোন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবিষয়ক কবিতাবলীর মধ্যে "মরণ-মিলন" কবিতাটি সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রকাব্যের কোন সমালোচকই এই কবিতাটির আদ্যোপান্ত অর্থ বিশ্লেষণ বা পূর্ণ ভাবব্যাখ্যা করেন নি। মোহিতলালের মত সমালোচকও "মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু সেই প্রবন্ধে তিনি এই কবিতাটির উল্লেখমাত্র করেন নি। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রকাব্যলোকে "মরণ-মিলন" কবিতাটি বিদগ্ধ সমালোচকগণ কর্তৃক আজও অনাদৃত।

আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা প্রথমে কবিতাটির মর্মলোকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করব। তারপর এর উৎস-সন্ধানে প্রবৃত্ত হব। কবিতাটিকে এককথায় বলা যেতে পারে শোকাভিহত চিত্তের মৃত্যু-সম্ভাষণ।

গানটি অপূর্ব স্তবকবন্ধে কবি রূপহীন মরণকে মরণহীন রূপসরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। তিনটি স্পষ্ট ভাগে কবিতাটি বিভক্ত। প্রথম তিন স্তবকে শোকাভিভূত চিত্তে মৃত্যুর আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে। সায়ং-সন্ধ্যার গোধূলিলগ্নে মৃত্যুর আগমন। শোকার্ত চিত্তের কণ্ঠে ভাষা দিয়ে কবি বলছেন, এই কি গোধূলিমিলনের রূপ? সন্ধ্যা অর্থ মিলন। সম্+ধৈ+অঙ্+স্ত্রিয়াং টাপ্। আলোর সঙ্গে আঁধারের মিলন। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'Kali the Mother' গ্রন্থে লিখেছেন, "In the North we speak of a certain hour as 'twilight', implying a space of time between the day and night. In India, the same moments receive the name of 'time of union', since there is no period of half-light,—the hours of sun and darkness seeming to touch each other in a point.

The illustration can be carried further. In the word *gloaming* lies for us a wealth of associations,—the throbbing of the falling dusk, the tenderness of home-coming, the last sleepy laughter of children. The same emotional note is struck in Indian languages by the expression *at the hour of cowdust.*"

রবীন্দ্রনাথও সন্ধ্যামিলন অর্থাৎ আলোর সঙ্গে আঁধারের, জীবনের সঙ্গে মরণের মিলনকে কয়েকটি প্রতীকের দ্যোতনায় প্রকাশ করেছেন:

যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,

এই অপূর্ব-সুন্দর গোধূলি-বর্ণনাটি স্বভাবোক্তি অলংকারের সার্থক নিদর্শন। কিন্তু এই গোধূলি-বর্ণনাটির তাৎপর্য আরও অনেক গভীর। এই কবিতায় কবি যে মৃত্যুর কথা বলেছেন তার আবির্ভাব ঘটেছে গোধূলিলগ্নে। যে-মৃত্যু এই গোধূলি-মিলন রচনা করেছে তাকে সম্বোধন করে শোকার্ত চিত্তের কণ্ঠে ভাষা দিয়ে কবি বলছেন, এই কি গোধূলি-মিলনের রূপ?

তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ।
আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

কিন্তু, ওগো হৃদয়হরণ, তুমি কি এমনি করেই আমাকে কেবল বিবশ করে রাখবে?—

হায় এমনি করে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ।
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণি-রণরণিতে?
শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ?
আমি বুঝি না যে কেন আস-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

বক্ষশোণিতকে অবশ-করা মৃত্যুর এই আবির্ভাবের মধ্যে একটি চিরন্তন স্বাভাবিকতা আছে। প্রিয়জনের মৃত্যু চিরদিন মানুষের কাছে এমনি করেই আসে। কিন্তু কবিতার পরবর্তী স্তরেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ মৃত্যু সামান্য মানুষের মৃত্যু নয়। যে চিত্তকে সে অভিভূত করেছে তাও অসামান্য। তাই শোকার্ত চিত্ত বলছে, যে-দুঃখ পরম বেদনার রূপ নিয়ে এসেছে তা শুধু কোমল অশ্রুবাষ্পেই আচ্ছন্ন থাকবে কেন, তা আমাকে রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত করে তুলুক। কেন না অমৃত যাঁর ছায়া মৃত্যুও তাঁরই ছায়া, তাঁকে ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করব। 'যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।' হে অমৃত, তুমি মৃত্যুর রূপ নিয়ে এসেছ বলে তোমাকে ভয় করব কেন? অন্যত্র কবি বলেছেন, "হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা; হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি, হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি

না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি ;—সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়—যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।" ["দুঃখ", 'ধর্ম', রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৩, পৃ. ৪০৪]

অতএব, বিরহ-কাতর চিত্ত বলছে, ওগো মরণ, তুমি চোরের মত এসে আমার রক্তশোণিতকে অবশ করে দিও না। শুধু অশ্রুনির্ঝর ঝরিয়ে যেন নীরবে মিশিভোর না হয়। আমি তোমাকে সমারোহের সঙ্গে জীবনে বরণ করব, সাজ করব মঙ্গলাচরণ। হে প্রিয়, তোমার রুদ্ররূপ দেখে আমি ভয় পাব না।

এখানেই কবিতাটির দ্বিতীয় ভাগের আরম্ভ। দুটি স্তবকে এই অংশ সম্পূর্ণ। উমার সঙ্গে শিবের মিলন এই ভাগের উপজীব্য। কুমারসম্ভবের কবি এখানে রবীন্দ্র-চিত্তকে স্পর্শ করেছেন। 'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন' :

তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্‌বম্‌ বাজে গাল,
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

কিন্তু মহেশ্বরের এই মহারুদ্ররূপ দেখে তো উমা ভীত হন নি—

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।

উমার এই পূর্বরাগ যে রুদ্রমিলনের ভূমিকা রচনা করেছে তাই হয়েছে কবিতাটির পশ্চাৎপট। কবিতাটির তৃতীয় ভাগে রুদ্ররূপী সেই মৃত্যুকে সম্বোধন করে বিরহকাতুর চিত্ত বলছে :

তুমি উৎসব করো সারারাত
তব বিজয়-শঙ্খ বাজায়ে।
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত,
আমি নিজে লব তব শরণ,
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

আমার মন যদি তোমার শঙ্খের আহ্বানে সাড়া না দেয়, যদি সে গৃহমাঝে মগ্ন থাকে, তাহলে তুমি তার সব লজ্জা অপহরণ করে নিয়ো, যদি সে স্বপ্নাবেশে সুখশয়নে তন্দ্রানিমগ্ন হয়, যদি সে হৃদয়ে অবসাদ জড়ায়ে আধ-জাগরূক নয়নে মোহাবিষ্ট হয়ে থাকে

তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

মৃত্যুরূপী হৃদয়েশ্বরের কাছে এই রুদ্রমন্ত্রে দীক্ষার সঙ্কল্প দিয়েই কবিতাটির উপসংহার রচিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এটি মৃত্যুর পূর্বাভাস নয়, মৃত্যু এখানে সমাগত। কবিচিত্তের মর্মমূলে বাসা-বাঁধা কোন প্রিয়জন-বিয়োগের স্মৃতি থেকেও এ কবিতার জন্ম হয় নি। মানসী-সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালিতে আমরা প্রিয়জনের মৃত্যুস্মৃতিকে অবলম্বন করে লেখা অনেক কবিতা পেয়েছি। তাদের রূপ ও রীতি, সুর ও স্বাদ আলাদা। 'সোনার তরী'র "প্রতীক্ষা" কিংবা 'গীতাঞ্জলি'র "ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা"র সঙ্গেও এ কবিতার মিল নেই। "প্রতীক্ষা" বা "শেষ পরিপূর্ণতা" কবিতায় মৃত্যুতত্ত্বই কাব্যরূপ পেয়েছে। জীবনবধূর সঙ্গে মৃত্যুবরের মিলনই সে তত্ত্বের কেন্দ্রগত ভাবসত্য। এখানেও আছে মিলন। কিন্তু এ মিলন শোকার্তচিত্ত-রূপী উমার সঙ্গে মৃত্যুরূপে আগত রুদ্রের শিবের মিলন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বরবধূর মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন। কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মিল-

উমার মিলনের কথা সর্বপ্রথম "মরণ-মিলন" কবিতাতেই বললেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর সুচিন্তিত ও সুলিখিত 'ত্রয়ী' গ্রন্থে 'সোনার তরী'র "প্রতীক্ষা" কবিতায় 'কুমারসম্ভবে'র শিব-পার্বতীর মিলন-কল্পনার প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। এমন কি তিনি কবির জীবনদেবতাকেও বলেছেন 'নটরাজ শিব'। ['ত্রয়ী', দ্বিতীয় সং, পৃ° ২০৫]। অধ্যাপক দাশগুপ্তের "কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক অধ্যায়ের আলোচনাটি অতীব মনোজ্ঞ। কিন্তু এই বিশেষ অংশে তাঁর আলোচনায় কালাতিক্রমভঙ্গ দোষ দেখা দিয়েছে। তিনি পরবর্তী মরণ-মিলনের আলোকে পুরোবর্তী প্রতীক্ষা ও জীবন-দেবতার প্রতীক বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের মনে হয় জীবনদেবতাকে নটরাজ শিব বলা কোনও দিক দিয়েই সমীচীন নয়। বস্তুতঃ মরণের মধ্য দিয়ে শিবের সঙ্গে উমার মিলনের প্রতীকটি রবীন্দ্রকাব্যে "মরণ-মিলন" কবিতাতেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকের সঠিক ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার উপর কবিতার অর্থ অনেকখানি নির্ভরশীল। "মরণ-মিলনে" ব্যবহৃত শিব-উমার বিশেষ প্রতীকটি বিশেষ মৃত্যুরই ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। একটি বিশেষ মৃত্যুই এ কবিতার উদ্দীপন; এবং একটি বিশেষ নারীচিত্তই তার আলম্বন। তা ছাড়া এ মৃত্যু সদ্য-সদ্য ঘটেছে। কেন না বক্ষশোণিত অবশ করে দেওয়া আর নিশিভোর নীরবে অশ্রু ঝরানোর দশা এ শোক এখনও উত্তীর্ণ হয় নি। অথচ রবীন্দ্রনাথের জীবনে ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসের অনতিকাল পূর্বে কোন ব্যক্তিগত শোকের কারণ ঘটে নি। কাজেই স্বীকার করতে হবে "মরণ-মিলনে"র শোকাভিভূত চিত্তটি কবির নিজের চিত্ত নয়। পরবর্তী অগ্রহায়ণে প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুতে কবির লেখনীমুখে যে ৩৮টি শোকের কবিতা উচ্ছ্বসিত হয়েছে সুরে স্বাদে সেগুলি "মরণ-মিলন" থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ কবির ব্যক্তিগত শোককে অবলম্বন করে যে কবিতার জন্ম হয় তাতে তটস্থ দৃষ্টিতে মৃত্যুদর্শন সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। 'The Master as I saw him' গ্রন্থে "About Death" অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, "Death, however, is pre-eminently a matter which is best envisaged from without. Not even under personal bereavement can we see so clearly into the great truths of eternal destiny, as when depth of friendship and affection leads us to dramatize our sympathy for the sorrow of another." (পৃ° ৩৬২)। "মরণ-মিলন" কবিতা রচনার সময় রবীন্দ্রকবিমানসেরও অনুরূপ অবস্থা হয়েছিল। ইংরেজি পরিভাষায় কবিতাটিকে বলা যেতে পারে Dramatic Monologue বা নাট্যিক স্বগত-ভাষণ। রুদ্ররূপী প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশায় শোককাতর চিত্তের মৃত্যুসম্ভাষণই কবিতাটির উপজীব্য। স্বভাবতঃই আমাদের জিজ্ঞাসা, কোন্ বন্ধুচিত্তের দুঃখের প্রতি কবির সমবেদনা এখানে নাট্যরূপ লাভ করেছে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যাবশ্যক। পূর্বেই বলা হয়েছে, "মরণ-মিলন" কবিতাটি 'মরণ'-শিরোনামায় ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মাত্র মাস-দুই পূর্বে, আষাঢ় মাসে, স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটে। আমাদের প্রতিপাদ্য হল, রবীন্দ্রনাথের "মরণ-মিলন" কবিতাটি বিবেকানন্দের মহা-প্রয়াণ উপলক্ষে রচিত। ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন রবীন্দ্র-নাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিশ্ববাসী যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনেছে বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, বিশ্বকবিও তেমনি বিবেকানন্দকে চিনেছেন নিবেদিতার দৃষ্টিতে। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার মৃত্যুত্তীর্ণ দিব্য-সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ শিব উমার প্রতীকে উপস্থাপিত করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার আত্মিক সম্পর্কের যে রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার প্রতীক হল তপস্বিনী উমা আর বীরেশ্বর শিবের দিব্যমিলন। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে নিবেদিতার চিত্তে যে দুঃসহ শোকের উদয় হয়েছিল তাই হল "মরণ-মিলন" কবিতার বিষয়ালম্বন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শিবের সঙ্গে উমার মিলনের তাৎপর্য এই সম্পর্ককল্পনার মধ্যেই বিধৃত রয়েছে। 'মিলন' শব্দটির একটু ব্যাখ্যা এখানে প্রয়োজন। মিলন কোন ক্রিয়াবাচক শব্দরূপে এখানে ব্যবহৃত হয় নি। তা একটি গুণগত ধর্ম। সুরে-বাঁধা বাদ্যযন্ত্রের দুটি তারের মধ্যে ধ্বনিতরঙ্গের কম্পনে-

অনুকম্পনে যে সুরসঙ্গতি ঘটে তারই নাম মিলন। ভগিনী নিবেদিতার অননুকরণীয় ভাষায় "And union is not an act. It is a quality, inherent in the natures that have been attuned." ['Meditations of Triumphant Union']

কবিতাটি যে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে বিরচিত এ কথা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কোথাও বলেন নি। কবির এই নীরবতার কারণ কি তা অবশ্যই জিজ্ঞাস্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে শুধু এই বিশেষ কবিতার উৎস সম্পর্কেই নীরব তা নয়। তিনি তাঁর রচনা সম্পর্কে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নীরবতা অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর মনে করতেন। তার ফলে তাঁর বহু কবিতার উৎসসন্ধানে বিমূঢ় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। কবিজায়ার মৃত্যুর পরে তাঁর প্রথম কবিতা হল "মুক্ত পাখীর প্রতি"। [আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে ওগো···]। কিছুদিন পরেই মোহিত সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল। তাতে কবিতাটি 'মরণ' পর্যায়ে সংকলিত না হয়ে 'রূপক' পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে। এই সংকলনে কবি স্বয়ং সহযোগিতা করেছিলেন। কবিতাটি 'রূপক' পর্যায়ে সংকলিত হওয়ার ফলে এর অর্থ-ব্যাখ্যায় হাস্যকর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। মোহিতলালের মত বিদগ্ধ সমালোচক কবিতাটিকে স্বদেশ-প্রেমের কবিতা রূপে বিচার করেছেন। তাঁর মতে "'খাঁচার পাখি' অর্থে কারারুদ্ধ মানুষ বা পরাধীন জাতি বুঝিতে হইবে।" এই ধরনের বহু অদ্ভুত ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়ও তাঁর বহু কবিতার হয়েছে। কিন্তু তিনি স্রষ্টার নীরবতাই চিরদিন অবলম্বনীয় বলে সাধারণতঃ মনে করতেন।

"মরণ-মিলন" কবিতাটির প্রেরণার উৎস সম্পর্কে কবি নীরব থাকলেও যে-কটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আমাদের সিদ্ধান্তের সহায়ক তার অন্যতম হল গোধূলি-লগ্নের ইঙ্গিতটি। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে গোধূলি-লগ্নে। অবশ্য এ সম্পর্কে সঠিক সময়-নিরূপণে পরবর্তী কালে কিছু কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ৪ঠা জুলাই স্বামীজির মহাপ্রয়াণের দিন সূর্যাস্ত হয়েছে প্রায় সাড়ে ছটায়। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি অন্তিম সমাধিতে সমাধিস্থ হন। এই মহাসমাধিতে কখন তাঁর আত্মা পরমাত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যায় তা নিরূপণ করা সহজ-সাধ্য ছিল না। তৎকালীন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় স্বামীজির মহাপ্রয়াণ সম্পর্কে বলা হয়: "We deeply regret to announce that Swami Vivekananda is dead. The report is that he came from a walk, lay down on a charpoy to rest, and died, no doubt from heart disease. He had also been suffering from Diabetes." [অমৃতবাজার পত্রিকা, ৭ জুলাই, ১৯০২, পৃ° ৫] বলাই বাহুল্য, এই বর্ণনায় শ্রদ্ধার লেশমাত্র পরিচয় নেই। সে সময়কার বৈষ্ণবভাবাপন্ন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' স্বামীজির প্রতি বিশেষ অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন না।

ভগিনী নিবেদিতা 'The Master as I saw him' গ্রন্থে "স্বামীজির তিরোভাব" অধ্যায়ে মৃত্যুর লগ্ন দিয়েছেন উত্তীর্ণ-গোধূলির আধঘণ্টা পরে। তিনি লিখছেন: "On his return from this walk, the bell was ringing for evensong, and he went to his own room, and sat down, facing towards the Ganges, to meditate. It was the last time. The moment was come that had been foretold by his Master from the beginning. Half an hour went by, and then, on the wings of that meditation, his spirit soared whence there could be no return, and the body was left, like a folded vesture, on the earth." [পৃ° ৩৯২-৯৩]

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র নিবেদিতা বলেছেন, গোধূলি-লগ্নেই স্বামীজির মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল। "...that last serene moment, when at the hour of cow-dust, he passed out of the village of the world, leaving the body behind him, like a folded garment,..." [পৃ° ৩৭]

রবীন্দ্রনাথ স্বামীজির মহাপ্রয়াণের তথ্যগুলি স্বভাবতঃই পেয়ে থাকবেন মুখ্যতঃ নিবেদিতার কাছ থেকেই। তাই তিনিও গোধূলি-লগ্নকেই মৃত্যুর আবির্ভাব-লগ্ন রূপে বর্ণনা

করেছেন। কবিতাটি যে স্বামীজির মহাপ্রয়াণেই বিরচিত তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এই গোধূলি-লগ্নের প্রস্তাবনা। গোধূলি-লগ্নে দেহবন্ধনমুক্ত শিবের আবির্ভাব মৃত্যুরূপে। তপস্বিনী উমার সঙ্গে ঘটল তাঁর মর্ত্যবন্ধনমুক্ত দেহাতীত আত্মিকমিলন। এই হল "মরণ-মিলন" নামকরণের তাৎপর্য।

এক

গুরুশিষ্যার এই সম্পর্ক-কল্পনা রবীন্দ্র-চিন্তায় অন্যত্র কী রূপ পরিগ্রহ করেছে তা অনুধাবনযোগ্য। আমরা অন্যত্র বলেছি যে, বিবেকানন্দ-নিবেদিতার যুগ্মসত্তায় রবীন্দ্রনাথ যে মহাজীবনের ধ্যান করেছিলেন তারই প্রেরণাসঞ্জাত সৃষ্টি হল 'গোরা'। বলেছি, গোরা রবীন্দ্রনাথের নবপুরুষসূক্ত। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার দিব্যজীবনের মানবিক মহাভাষ্য। কিন্তু আমাদের এ বক্তব্য প্রমাণসাপেক্ষ, এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই। নিবেদিতার তিরোধানের পরে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'তে দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন। বাংলা প্রবন্ধটি 'পরিচয়' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। নিবেদিতার প্রতি কবির কৃতজ্ঞচিত্তের শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল তার পরিচয় প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার জীবনকে সতীর তপস্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভারতের মূর্খ ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে বহুরূপে প্রকট শিবের সেবায় আত্মনিবেদিতা সতীর তপস্যা। অর্থাৎ নিবেদিতা সম্পর্কে তপস্বিনী মূর্তিটিই কবিচিত্তে নিত্যজাগ্রৎ ছিল। সতীর বদলে উমা শব্দটিই এখানে সুপ্রযোজ্য হবে। কালিদাসের ভাষায় 'উ-মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম'। [কুমার ১।২৬]। রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

"নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৮, পৃ. ৪৮৮]

• • •

"মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।" [ঐ, পৃ. ৪৮৯]

• • •

"শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল— তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন— ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?

"একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণা সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বী, তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মতো রূপসীর এত কৃচ্ছ্র সাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে; তথাপি তাঁহারই মধ্যে আমার সমস্ত মন 'ভাবৈকরস' হইয়া স্থির রহিয়াছে।

"শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে

তুলি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্তদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল।" [তদেব, পৃ° ৪৯৫-৯৬]

রবীন্দ্রনাথের এই চরিত্রচিত্রণে নিবেদিতার চরিত্রের দুটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন।" অর্থাৎ নিবেদিতার জীবনে ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগের গঙ্গাযমুনা-সংগম ঘটেছিল। ভক্তিযোগে তাঁর বিবেকানন্দ-চেতনা বীরেশ্বর শিব-চেতনায় একীভূত হয়ে গেছে। আর কর্মযোগে নিবেদিতার দৃষ্টিতে বিবেকানন্দই ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষই বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দকে ভালবেসেই তিনি ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন। অমরনাথে বিবেকানন্দ শিবের কাছে তাঁর শিষ্যাকে নিবেদন করার সংকল্প করেছিলেন। কৃষ্ণকেও বিবেকানন্দ ভালবাসতেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ প্রেমকল্পনার চেয়ে তাঁর কাছে শিব-উমার প্রেমকল্পনা অনেক বড় ছিল। কেন না কর্মের প্রেরণাদাতা হলেন শিব। নিবেদিতা লিখছেন: "...He did not talk of Radha and Krishna, where he looked for deeds. It was Siva who made stern and earnest workers, and to Him the labourer must be dedicated." [Notes of Some Wanderings, পৃ° ৮৩]

রবীন্দ্রজীবনের শেষ বর্ষে, তাঁর মৃত্যুর মাত্র দেড়মাস পূর্বে, অসুস্থ শয্যায়ও তিনি নিবেদিতার কথা পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করে বলছেন: "মেয়েদের একটা জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে তাদের ভিতরকার জিনিস।—emotion। এ যখন একটা character-এর সঙ্গে মিলে রূপ নেয়, তা অতি আশ্চর্য। এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন নিবেদিতা। তিনি সত্যিকারের পুজো করতেন বিবেকানন্দকে। তাই তিনি অনায়াসে গ্রহণ করলেন তাঁর ধর্মকে। নিজের দেশ, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে এলেন এই দেশে। এই দেশকে, এই দেশের লোককে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর এই ভালোবাসা যে কত সত্যিকারের তা বলবার নয়। সব কিছু ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর এই আইডল এই আত্মত্যাগ অবাক করে দিয়েছিল আমাকে। আমি নিবেদিতার কাছে প্রায়ই যেতুম।" ['আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', পৃ° ১০৮]

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইমোশন যখন একটা ক্যারেক্টারের সঙ্গে মিলে রূপ নেয়, তা অতি আশ্চর্য। রবীন্দ্রনাথ এর দৃষ্টান্ত দেখেছিলেন নিবেদিতার মধ্যে। শিবের মধ্যেই সতীর মন যে ভাবের রস পেয়েছিল নিবেদিতার মন সেই অনন্তদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসেই চিরদিন পূর্ণ ছিল। তাঁর অসামান্য চরিত্রশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে তা অফুরন্ত কর্মশক্তির নিত্যপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল।

দুই

বিবেকানন্দ-নিবেদিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি সত্যদৃষ্টি কিনা তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। নিবেদিতা বিবেকানন্দের মানসকন্যা বলে এদেশে পরিচিতা। সম্প্রতি প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে যে প্রামাণিক জীবনচরিত রচনা করেছেন তাতে তিনি নিবেদিতাকে বলেছেন বিবেকানন্দের কন্যা ও শিষ্যা। নিবেদিতাকে লেখা কোন-কোন পত্রে স্বামীজি 'পিতা বিবেকানন্দ' বলে নাম স্বাক্ষর করেছেন। কোন কোন পত্রে বলা ঠিক হল না, বিবেকানন্দের আট খণ্ড ইংরেজি রচনাবলীতে নিবেদিতাকে লেখা সবশুদ্ধ ত্রিশখানি চিঠি সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে লস এঞ্জেলস্ থেকে ১৮৯৯ সনের ৬ই ডিসেম্বর লেখা চিঠিতে স্বামীজি 'পিতা বিবেকানন্দ' বলে নাম স্বাক্ষর করেছেন। ওই পত্রখানির মধ্যে স্বামীজির বিচিত্র চিত্তের এক আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে। পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি লিখছেন: "Come ye that are heavily laden and lay all your burden on me, and then do whatever you like and be happy and forget that I ever existed. Ever with love, your father, Vivekanada. "[Works, Vol-7, pp. 508]

নিবেদিতা নিজেও একাধিক ক্ষেত্রে কন্যা-সম্পর্কের উল্লেখ করেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। বিবেকানন্দ প্রথমে তাঁকে 'মিস নোব্‌ল' বলে সম্বোধন করতেন, পরে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁকে আদর করে মার্গারেটের স্নেহ-সংক্ষিপ্ত

রূপ 'মার্গট' বলে ডাকতেন। পরে অবশ্য 'নিবেদিতা' সম্বোধনও দেখা যায়। ১৯০০ সনের ১৩ই জানুয়ারি নিবেদিতা স্বামীজিকে যে পত্র লেখেন তার শেষে আছে "Yours, daughter, Margot."

বলাই বাহুল্য, এই পিতা-কন্যার সম্বোধন উভয়ের দিক থেকেই লৌকিক ব্যক্তিসীমার ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক স্তরে সম্পর্কের উদ্‌গমনের একটি বিশেষ পর্যায়েরই সূচনা করে। প্রশ্নটি নিবেদিতার মনেও উদিত হয়েছিল। 'The Master as I saw him' গ্রন্থে "Monasticism and Marriage" অধ্যায়ে তিনি লিখছেন: "All the disciples of Ramkrishna believe that marriage is finally perfected by the man's acceptance of his wife as the mother; and this means, by their mutual adoption of the monastic life. It is a moment of the mergence of the human in the divine, by which all life stands thenceforward changed." [পৃ° ৩২৭-২৮]

এ অবশ্য অধ্যাত্মমার্গের কথা। লৌকিক স্তরেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে সমস্ত সম্পর্কের সমাহার এ সত্য রসিক-জন কর্তৃক স্বীকৃত। ভবভূতি 'মালতীমাধবে' কামন্দকীর কণ্ঠে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বলেছেন, "বন্ধুতা বা সমগ্রা"। অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ভর্তা একাধারে তাঁর পিতা ভ্রাতা ও পুত্র এবং পুরুষের ধর্মপত্নী তাঁর জননী ভগিনী ও কন্যা। কিন্তু পৃথক পৃথক করে নয়। একই পাত্রে সব হৃদয়-সম্পর্কের সুসঙ্গত সমাবেশ। আমাদের বৈষ্ণব প্রেম-ভক্তিতেও বলা হয়েছে দয়িতদয়িতাভাব অর্থাৎ মধুর রসের উপাসনায় শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্যের সমস্ত গুণই আছে। অধিকন্তু আছে নিঃশেষ আত্ম-নিবেদন। স্বামী বিবেকানন্দও স্বীকার করেছেন যে, ভক্তিমার্গের উপাসনায় মধুরা রতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'Notes on Some Wanderings' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন:

"Again his subject was marriage, as the type of the soul's relation to God—"This is why", he exclaimed, "though the love of a mother is in some ways greater, yet the whole world takes the love of man and woman as the type. *No other has such tremendous idealising power.* The beloved actually becomes what he is imagined to be. This love transforms its object." [পৃ° ৫৯]

নিবেদিতা ভগবানকে প্রিয়তম পতিরূপেই উপাসনা করেছেন। আর বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর পরানুরক্তিই অবশেষে ঈশ্বরভক্তিতে বিলীন হয়ে গেছে। তাঁর অন্তিম চেতনায় বীরেশ্বর বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন।

গুরু-শিষ্যার সম্পর্কের লৌকিক থেকে আধ্যাত্মিক স্তরে ক্রমবিবর্তনের রূপটির আশ্চর্য বিশ্লেষণ করেছেন নিবেদিতা স্বয়ং তাঁর 'The Master as I saw him' গ্রন্থের "The awakener of souls" অধ্যায়ে। এই অধ্যায়টি নিবেদিতার অন্তরঙ্গ আত্মকথা। লণ্ডনে স্বামীজির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের সময় তাঁর গোপন হৃদয়াবেগের স্বীকৃতি জানিয়ে তিনি বলছেন:

"Undoubtedly, in the circle that gathers round a distinguished thinker, there are hidden emotional relationships which form the channels, as it were, along which his ideas circulate and are received. * * * One holds himself as servant; another as brother, friend or comrade; a third may even regard the master-personality as that of a beloved child." [পৃ° ১০০]

তিনি বলছেন, স্বামীজির প্রতি তাঁর গোপন হৃদয়ানুরাগ শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াল পিতা-কন্যার সম্পর্কে। এবং এই সম্পর্কেই তিনি ভারতের সর্বত্র পরিচিত ও সম্মানিত হয়েছেন।

"In my own case the position ultimately taken proved that most happy one of a spiritual daughter, and as such I was regarded by all the Indian people and communities, whom I met during my Master's life."

কিন্তু এই আধ্যাত্মিক পিতা-কন্যা সম্পর্কে পৌঁছতে নিবেদিতাকে কম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নি। প্রথম দর্শনে তিনি স্বামীজিকে দয়িতরূপেই কল্পনা করেছিলেন। ভারতে আসার প্রথম দিকে সম্পর্কটি ছিল অন্তহীন বিরোধ ও সংঘাতের। স্বামীজির ভর্ৎসনা ও নির্মমতা একসময় এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল যে স্বামীজির অন্যান্য শিষ্যাদেরও

আশঙ্কা হয়েছিল এতটা আঘাত নিবেদিতারও সহ্যশক্তির পক্ষে দুঃসহ ও দুর্বহ হবে। [such intensity of pain inflicted might easily go too far.] যত দিন যাচ্ছিল ততই নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন এ সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তিগত মাধুর্যের কোন স্থান নেই। কিন্তু অবশেষে একদিন সব যন্ত্রণার অবসান হল। সেদিন আকাশে ছিল শুক্লপক্ষের প্রতিপদের শশিকলা। স্বামীজি বললেন, এই নূতন চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নূতন জীবন শুরু হোক। এই বলে তিনি তাঁর সম্মুখে নতজানু শিষ্যার মস্তক স্পর্শ করে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। মহাযোগীর সেই দিব্যস্পর্শে একমুহূর্তে বিদ্রোহিনী শিষ্যার সব যন্ত্রণা সব বিক্ষোভের অবসান ঘটল। সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে অধ্যায়টি শেষ করে নিবেদিতা লিখছেন :

"And I understood for the first time that the greatest teachers may destroy in us a personal relation only in order to bestow the Impersonal Vision in its place." [পৃ° ১০৬]

ব্যক্তিসম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তিচেতনামুক্ত এই ভাবদৃষ্টি অধ্যাত্মচেতনারই দ্যোতক। সে স্তরে সমস্ত লৌকিক সম্পর্কই অসম্পূর্ণ ও অর্থহীন বলে দেখা দেয়। সে সম্পর্ককে কোন লৌকিক নামেই সার্থকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এক অতীন্দ্রিয় দিব্য করুণা ও মমতায় তা পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই স্তরে বীতরাগ বিবিক্ত সন্ন্যাসীর কাছে তাঁর প্রিয়শিষ্যা সর্বমমতার আধারভূতা কন্যা-মূর্তিতেই সমুদ্ভাসিতা। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, এই পরিচিতিও লৌকিক পরিমিতির মধ্যেই পরিসীমিত। নিবেদিতার অন্তর্গূঢ় অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই।

তিন

বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য অনুরাগি-সমাজ বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্ককে পবিত্র-সুন্দর আত্মিক অনুরাগের সম্পর্ক বলেই গ্রহণ করেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীকার মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন :

"The future will always unite her name of initiation, Sister Nivedita, to that of her beloved Master...as St. Clara to that of St. Francis..." [The life of Vivekananda. পৃ° ৬২]

রোমান-ক্যাথলিক ধর্মের ইতিহাসে আসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিস ও সেণ্ট ক্ল্যারার বন্ধুত্ব অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সেণ্ট ফ্রান্সিস [১১৮২-১২২৬] ছিলেন ফ্রান্সিস্কান ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতা ছিলেন সমৃদ্ধ বণিক। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে ধর্মের জন্যে কঠোরতম দারিদ্র্য বরণ করে নেন এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দরিদ্র ও পীড়িতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সেণ্ট ক্ল্যারা [কেউ কেউ তাঁর নাম Clareও বলেন] ছিলেন অভিজাতবংশীয়া কুমারী। আঠারো বৎসর বয়সে তিনি ফ্রান্সিসের এক ভাষণ শুনে তাঁর কর্ম ও ধর্মব্রতে দীক্ষা নিতে কৃতসংকল্প হন। ফ্রান্সিস তাঁর আন্তরিকতা পরীক্ষার জন্যে তাঁকে জীর্ণচীর পরিধান করে আসিসির পথে পথে দরিদ্রদের জন্যে ভিক্ষা করতে বলেন। ক্ল্যারা সানন্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ফ্রান্সিস তাঁকে নববধূর ছদ্মবেশে গৃহ থেকে পালিয়ে আসতে বলেন। ক্ল্যারা তাই করেন এবং ফ্রান্সিস্কান ধর্মযাজিকা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী হন। বয়সে ক্ল্যারা ফ্রান্সিসের বারো বছরের ছোট ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের সময় ক্ল্যারা অষ্টাদশী আর ফ্রান্সিস ত্রিশের কোঠায়। ফ্রান্সিস ও ক্ল্যারার বন্ধুত্ব নিয়ে গত সাত-আটশো বছর ধরে কম বাগ্‌বিতণ্ডা হয় নি। এ সম্পর্কে জি. কে. চেস্টারটনের মন্তব্যটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলছেন স্বর্গীয় প্রেমও যে লৌকিক প্রেমের মতই বাস্তব হতে পারে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করতে পারেন না বলেই যত গণ্ডগোল। "I mean that what is the matter with these critics is that they will not believe that a heavenly love can be as real as an earthly love." [পৃ° ১৩১]। চেস্টারটন বলছেন :

"Indeed the scene had many of the elements of a regular romantic elopement ; for she escaped through a hole in the wall, fled through a wood and was received at midnight by the light of torches." [St. Francis of Assisi, পৃ° ১৩২]

চেস্টারটন ফ্রান্সিস ও ক্ল্যারার দিব্যপ্রেমের বর্ণনায় সশ্রদ্ধ অনুরাগের ভাষায় বলছেন :

"I have often remarked that the mysteries of this story are best expressed symbolically in certain silent attitudes and actions. And I know

no better symbol than that found by the felicity of popular legend, which says that one night the people of Assisi thought that the trees and the holy house were on fire, and rushed up to extinguish the conflagration. But they found all quiet within, where St. Francis broke bread with St. Clare at one of their rare meetings, and talked of the love of God. It would be hard to find a more imaginative image, for some sort of utterly pure and disembodied passion, than that red halo round the unconscious figures on the hill; a flame feeding on nothing and setting the very air on fire." [তদেব, পৃ° ১৩৪]

ফ্রান্সিস ও ক্ল্যারার কাহিনীর সঙ্গে বিবেকানন্দ-নিবেদিতার কাহিনীর কিছু কিছু সাদৃশ্য অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে কোনও দুটি হৃদয়সম্পর্কই স্বরূপতঃ এক নয়। গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক যে কত গভীর মধুর অথচ কত পবিত্র হতে পারে প্রাচ্য দিগন্তে বিবেকানন্দ-নিবেদিতার কাহিনী তার চূড়ান্ত উদাহরণ। ব্রহ্মচর্যের কঠোরতম অনুশাসনে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে গড়ে তুলেছিলেন। উমার দুঃসাধ্য তপস্যাই তিনি প্রিয়শিষ্যার কাছে সর্বদা প্রত্যাশা করতেন। বিবেকানন্দ বলতেন তুমি হবে ভারত-কন্যা, স্বদেশের কথা ভুলে গিয়ে তোমাকে নবজন্ম গ্রহণ করতে হবে ভারতভূমিতে। ১৮৯৮ সনে বিবেকানন্দ কয়েকজন গুরুভাই ও মার্কিন শিষ্যাদের নিয়ে ঐতিহাসিক ভারত আবিষ্কারে উত্তর-ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতাও ছিলেন। বিবেকানন্দ নিবেদিতার কাছে যে কঠোর নৈতিক সংযম দাবি করতেন তার উল্লেখ করে সেই ভ্রমণের অন্যতমা সঙ্গিনী কুমারী ম্যাকলয়েড বা জয়া তাঁর কড়চায় লিখছেন :

"...he constantly humiliated her proud and logical English Character. Perhaps in this way he wished to defend himself and her against the passionate adoration she had for him; although Nivedita's feelings for him were always absolutely pure, he perhaps saw their danger. He snubbed her mercilessly and found fault with all she did. He hurt her. She came back to her companions overwhelmed with tears." [রোলাঁর The Life of Vivekananda গ্রন্থের পাদটীকায় উদ্ধৃত, পৃ° ১৩৮]

জয়া নিবেদিতার যে অনুরাগকে বলছেন, 'passionate adoration' সে স্তরে শিষ্যা গুরুর কাছে চিরদিনই নির্মমতা কুড়িয়েছেন। কিন্তু আত্মিক স্তরে উন্নীত হয়ে নিবেদিতার অনুরাগ গুরুর কাছে সমুজ্জ্বল প্রতিদানও পেয়েছে। সেই দিব্যানুরাগের স্বরূপ-বর্ণনায় নিবেদিতা লিখছেন :

> Love all transcendent,
> Tenderness unspeakable,
> Purity most awful,
> Freedom absolute,
> Light that lightest every man,
> Sweetest of the sweet, and
> Most terrible of the terrible,
> ["A litany of love", An Indian study of Love and death, পৃ° ৫৭।]

চার

কি করে মিস মার্গারেট নোব্‌ল ভগিনী নিবেদিতা হলেন, কি করে একটি বিদেশিনী কুমারীর অন্তরে তপস্বিনী উমার জন্ম হল, কি করে মর্ত্যপ্রেম রূপান্তরিত হয়ে দিব্য-প্রেমে পরিণত হল, সে ইতিহাসও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

ভগিনী নিবেদিতা [১৮৬৭-১৯১১] ছিলেন আইরিশ-দুহিতা। জন্মসূত্রে বিপ্লবিনী। তাঁর পিতৃপুরুষেরা আইরিশ বিদ্রোহের সঙ্গে ছিলেন ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। নিবেদিতার পিতা ও পিতামহ ছিলেন ধর্মযাজক। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই তাঁর বাল্যকৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হবার পর তিনি শিক্ষাদান-ব্রতকেই গ্রহণ করেছিলেন জীবিকা হিসাবে। তখন পেস্তালজি ও ফ্রোয়েবেলের শিক্ষানীতি শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন আদর্শের পথ দেখাচ্ছে। নিবেদিতা সেই আদর্শে অনুপ্রাণিতা। বিপ্লবাত্মক স্বদেশপ্রেম, ধর্মের দ্বারা অনুশাসিত জীবন এবং আদর্শ শিক্ষাদানব্রত—নিবেদিতার কর্মজীবন ছিল এই পবিত্র ত্রিবেণীধারায় প্রবহমান।

বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ১৮৯৫ সনে। তখন তিনি একটি কঠিন মানসসংকটে বিক্ষতমনা। একুশ বৎসর বয়সে নিবেদিতা ভালবেসেছিলেন তাঁর চেয়ে দু বছরের বড় একটি আইরিশ যুবককে। মৃত্যুর দ্বারা সে পূর্বরাগ খণ্ডিত হল। সাড়ে ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর অন্তরে

জেগেছিল নূতন অনুরাগ। দেড় বৎসর ধরে আলাপ-পরিচয়ের ফলে পূর্বরাগ যখন প্রৌঢ় হয়ে এসেছে, এবং বিবাহের-প্রস্তাব আসন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে এল এক নারী। সে জয় করে নিল যুবককে। ব্যর্থতার হতাশায় যখন হৃদয় মুহ্যমান তখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। প্রথম সাক্ষাতের সময় নিবেদিতার বয়স আটাশ, বিবেকানন্দ বত্রিশ।

শিকাগোর ধর্মক্ষেত্রে বিশ্ববিজয় করে বিবেকানন্দ এসেছেন ইংলণ্ডে। বিজয়গৌরব জ্যোতির্মণ্ডলের মত তাঁর প্রদীপ্ত যৌবনকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। নিবেদিতা স্বামীজির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও পরবর্তী জীবনের কাহিনী 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। এই 'হিন্দু যোগী'র বক্তৃতা ও কথাবার্তা তাঁকে উদ্দীপ্ত করত, অথচ তাঁর সংশয়ী মন নির্বিচারে সবকিছু গ্রহণও করতে পারত না। অসামান্য ব্যক্তিত্বশালিনী নিবেদিতা ছিলেন সর্বজয়া; তবু তিনি বলছেন:

"...it had never before fallen to my lot to meet with a thinker who in one short hour had been able to express all that I had hitherto regarded as highest and best." [পৃ° ৯]

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্বামীজির ব্রতে ও সেবায় আত্মদানের জন্যে কৃতসংকল্পা হলেন। তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করলেন।

"I had recognized the heroic fibre of the man and desired to make myself the servant of his love for his own people." [পৃ° ১১]

কিন্তু তার পথ কি? বয়সে চার বছরের বড় এই তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে নিবেদিতার চিত্তে যুগপৎ উদিত হল শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। কিছুদিন লণ্ডনে থেকে স্বামীজি নভেম্বরে চলে গেলেন আমেরিকায়। ফিরে এলেন '৯৬ সনের এপ্রিলে। ততদিন নিবেদিতার চলেছে নিরলস আত্মপরীক্ষা। নিবেদিতা তাঁর জীবনকে স্বামীজির জীবনের সঙ্গে এক করে দেবার স্বপ্ন দেখলেন। স্বামীজিকে স্বামীরূপে পাবার একটি সুকুমার বাসনা তাঁর চিত্তে মুকুলিত হয়ে উঠল। তাহলেই তো তিনি হতে পারবেন স্বামীজির ডান হাত। একদিন সরবে সন্ত্রমে নিবেদিতা তাঁর বাসনাকে ভাষা দিলেন বিবেকানন্দের কাছে। লিজেল রেমঁর জীবনী থেকে উদ্ধার করছি:

"তাই যদি ভগবানের ইচ্ছা, আমি আসব আপনার পাশে...আপনার কাজে যোগ দেব...আমরা একসঙ্গে খাটব একই উদ্দেশ্য নিয়ে।...' এ প্রস্তাবের পিছনে কতখানি আত্মত্যাগ রয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ তা বুঝলেন। এমন কথা এক মার্গারেটই বলতে পারে। * * * তিনি ওর কথা শুনে নতমস্তকে রইলেন বহুক্ষণ। তারপর বললেন, 'আমি সন্ন্যাসী'।" [নিবেদিতা, নারায়ণী দেবীর অনুবাদ, পৃ° ৭৫]

লিজেল রেমঁ ফরাসী রমণী। তাঁর নিবেদিতায় জীবনীতে রোমাঁ-রীতির প্রভাব পড়েছে। আলোচ্য বর্ণনায় তাঁর দৃষ্টি রোমান্সরাগে অনুরঞ্জিত। কিন্তু তাঁর কল্পনা সারস্বত বিশ্বাসসম্মত।

সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করল কুমারীর অনুরাগ। কিন্তু তিনি তাকে পরিত্যাগ করলেন না; তার চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে তাকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করলেন। তাকে করলেন আজীবন-ব্রহ্মচারিণী। শিবের কাছে সর্বস্বনিবেদিতা তপস্বিনী উমা।

স্বামীজির ব্রতে আত্মনিবেদন করে নিবেদিতা ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন ১৮৯৮ সনের আটাশে জানুয়ারি। ততদিন স্বামীজি তাঁকে নিঃশেষ আত্মপরীক্ষার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু কোনদিনই তাঁকে নিরুৎসাহ করেন নি। ৭. ৬. ১৮৯৬ তারিখের চিঠিতে তাঁকে লিখছেন:

"Religions of the world have become lifeless mockeries. What the world wants is character. The world is in need of those whose life is one burning love, selfless. That love will make every word tell like thunderbolt.

It is no superstition with you, I am sure, you have the making in you of a world-mover, and others will also come. * * * Awake, awake, great ones! The world is burning with misery. Can you sleep?"

[Works, vol. vii, পৃ° ৪৮৯]

পরবর্তী বৎসরের যে মাসে বিবেকানন্দ আবার লিখছেন:

"Your very very kind, loving and encouraging letter gave me more strength than you think of.

* * *

Now about you personally. Such love and

faith and devotion and appreciation like yours, dear Miss Noble, repays a hundred times over any amount of labour one undergoes in his life. May all blessings be yours. My whole life is at your service, as we may say in our mother tongue." [Works, vol. vii, পৃ° ৩৯৯-৪০০]

মাস দেড়েক পরে, ২০শে জুন পুনরায় লিখছেন :

"Every word you write I value, and every letter is welcome a hundred times. Write whenever you have a mind, and opportunity, and whatever you like, knowing that nothing will be misinterpreted, nothing unappreciated."

[তদেব, পৃ° ৪০৫-৪০৬]

অনেক চিন্তা, অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের পর নিবেদিতা যখন স্থির করলেন তিনি স্বামীজির কাজে ভারতবর্ষে আসবেনই তখন ২৯শে জুলাই ১৮৯৭ তারিখে বিবেকানন্দ লিখলেন :

"You must think well before you plunge in and after work, if you fail in this or get disgusted, on my part I promise you *I will stand by you unto death* whether you work for India or not, whether you give up Vedanta or remain in it." [তদেব, পৃ° ৪৯৯]

এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। বিবেকানন্দ জানতেন নিবেদিতা তাঁর সম্পর্কে প্রতিবদ্ধচিত্তা। সে কথা জেনেও তিনি তাঁকে এভাবে চিঠিপত্র লিখলেন কেন? ব্যক্তিগত ভাবে বর্তমান প্রবন্ধকারের মনে বিবেকানন্দের কথা মনে হলেই কালিদাসের অমর তুলিতে অঙ্কিত শিবের ছবিটি ভেসে ওঠে :

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥

[কুমারসম্ভব, ৩।৪৮॥]

কুমারসম্ভবেই আছে শিব যখন হিমালয়ে তপস্যানিরত তখন নগাধিরাজ তাঁর কন্যা উমা ও তার দুটি সখীকে তপোনিরত সন্ন্যাসীর সেবার জন্যে প্রেরণ করলেন। কামিনী-কাঞ্চন সমাধির ঘোর পরিপন্থী জেনেও জিতেন্দ্রিয় শঙ্কর আতিথ্যকারিণী পার্বতীকে সেবা করার অনুমতি দিলেন। কেন না, বিকারের, অর্থাৎ চিত্তবৈকল্যের কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যাঁদের হৃদয় বিকৃত না হয় তাঁরাই প্রকৃত ধীর অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ।

প্রত্যর্থিভূতামপি তাং সমাধেঃ শুশ্রূষমাণাং গিরিশো
অনুমেনে।
বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব
ধীরাঃ॥

[১।৫৯॥]

বিবেকানন্দের চিত্ত ছিল নিত্যশুদ্ধ। তাতে কোন প্রকার বিকারের কল্পনা অসম্ভব।

১৮৯৮ সনের ২৮শে জানুয়ারি ভারতকন্যা নিবেদিতা ভারতে এলেন। পরদিন থেকেই তাঁর শিক্ষা শুরু হল। বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন। দু মাস পরে পঁচিশে মার্চ স্বামীজি তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দিলেন। ওই দিনটি ছিল The day of Annunciation. প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, "মঠে ঠাকুরঘরে পূজার আয়োজন ছিল। স্বামীজি প্রথমে মার্গারেটকে দিয়া সংক্ষেপে শিবপূজা করাইয়া পরে তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। * * * সম্ভবতঃ এই দিনটিকে বিশেষরূপে স্মরণীয় করিবার জন্যই স্বামীজি যোগী শিবের বেশ ধারণ করিলেন। জটা, বিভূতি ও হাড়ের কুণ্ডল ধারণে তাঁহাকে মহাযোগী শিবের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।"

[ভগিনী নিবেদিতা, পৃ° ৭৫-৭৬]

১৮৯৮ সনের জানুয়ারি থেকে ১৯০২ সনের ৪ঠা জুলাই তারিখে স্বামীজির মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত সাড়ে চার বৎসরের ইতিহাস বিচিত্র। নিবেদিতার হৃদয়কন্দরে সংগুপ্ত বাসনার সঙ্গে নবব্রত ব্রহ্মচারিণী জীবনের দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ চিত্তের উদ্গমন, বাসনাময় অনুরাগের বাসনামুক্ত দিব্যপ্রেমে পরিণমন সে ইতিহাসকে অমর মহিমায় মণ্ডিত করেছে। সে ইতিহাসের মধ্যে দুটি কাহিনী বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। একটি ১৮৯৮ সনের ১২ই মে থেকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কয়েকজন গুরুভাই ও শিষ্যাপরিবৃত হয়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে উত্তর-ভারত ও হিমালয় ভ্রমণ। আর দ্বিতীয়টি হল ১৮৯৯ সনে স্বামীজির সঙ্গে একই স্টীমারে করে লণ্ডন যাত্রা—২০শে জুন থেকে একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত। সঙ্গে ছিলেন স্বামী

তুরীয়ানন্দ। কয়েক সপ্তাহ পরে স্বামীজি ইংলণ্ড থেকে গেলেন আমেরিকায়। নিবেদিতাও সেপ্টেম্বরের শেষভাগে তাঁর সঙ্গে সেখানে মিলিত হলেন। সেখানে পাঁচ-ছ সপ্তাহ বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা একই বাড়িতে অতিথিরূপে ছিলেন। তারপর ১৯০০ সনে আর একবার একপক্ষকাল তিনি স্বামীজির অখণ্ড সঙ্গ ও সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। ওই বৎসরের শেষের দিকে স্বামীজি ভারতে ফিরে এলেন। নিবেদিতা রয়ে গেলেন পশ্চিমে। ভারতে ফিরলেন ১৯০২ সনের প্রথম দিকে।

উত্তর-ভারত ও হিমালয় ভ্রমণের চমকপ্রদ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে 'Notes on Some Wanderings' গ্রন্থে। স্বামীজি প্রায়ই গল্পচ্ছলে তাঁর পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদের ভারত-কথা শোনাতেন, ভারতীয় জীবনের আদর্শ ও ঐতিহ্যের কথা। তিনি প্রায়ই শিবপ্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। শিব আর উমার প্রসঙ্গ। একদিন গৌরীশঙ্করের অর্ধনারীশ্বর রূপের বর্ণনা দিলেন তাঁদের। আর-একদিন পারস্যের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। স্বামীজি আবৃত্তি করে শোনালেন হাফিজের একটি গজল :

আগর্ উন্ তুর্ক্-ই-শিরাজী বদস্ত্ আরদ দিল্-ই মারা।
বখালে হিন্দুঅশ্ বখ্শম্ সমরকন্দ ও বুখারারা॥

অর্থাৎ, যদি আমার সেই শিরাজের প্রিয়া আমার হারানো মনটি নিয়ে হাজির হয় তবে তার গালের কালো তিলের জন্যেই আমি সমরকন্দ ও বোখারা দান করে দেব। এই গজলটি গানের সুরে আবৃত্তি করতে করতে হঠাৎ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে স্বামীজি বললেন, যে-মানুষ প্রেমসংগীত আস্বাদনে অসমর্থ আমি তাকে কানাকড়ি দিতেও প্রস্তুত নই। [দ্রষ্টব্য, Wanderings, পৃ° ৭]

স্বামীজির শিবপ্রীতি তাঁর আলোচনায় ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। শিব সম্পর্কে তিনি বলতেন, "He is the great God, calm, beautiful, and silent! and I am His great worshipper." [তদেব, পৃ° ৩]

বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার যখন প্রথম লণ্ডনে দেখা হয় তখনই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন স্বামীজি বারবার অদ্ভুত কণ্ঠে 'শিব শিব' উচ্চারণ করেন। স্বামীজির সঙ্গে থাকতে থাকতে তাঁর চেতনাও শিবময় হয়ে উঠেছিল। 'Kali the Mother' গ্রন্থে তিনি বলেছেন "Such is Siva—ideal of Manhood, embodiment of God-head." [পৃ° ৩২] তাঁর দৃষ্টিতে মনে হত হিমালয়ের অরণ্য-মর্মরেও যেন 'মহাদেব মহাদেব' ধ্বনিই নির্গত হচ্ছে। [তদেব, পৃ° ৩] হিমালয়-ভ্রমণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল স্বামীজি কর্তৃক অমরনাথের তুষারলিঙ্গ শিবমূর্তি দর্শন এবং নিবেদিতাকে শিবের নিকট নিবেদনের সংকল্প। সেই দুর্গম হিমালয়ের তুষার-পথে অন্যান্য শিষ্যাদের পেছনে রেখে পদব্রজে স্বামীজি নিবেদিতাকে নিয়ে চলেছেন অমরনাথ-গুহাতীর্থে। সে অভিজ্ঞতা নিবেদিতার জীবনে চেতনার নূতন স্তর রচনা করেছে। ধীরে ধীরে তাঁর বিবেকানন্দ-চেতনাও শিব-চেতনায় উন্নীত হয়েছে। এই ভ্রমণের অন্তিম পর্যায়ে একদিন স্বামীজি বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে বললেন, "তুমি আর আমি, আমরা একই ছন্দের অংশ,—যদিও সে বিরাট ছন্দের সবখানি আমরা জানি না। আমরা যেখানকার উপযুক্ত, ভগবান সেখানকার করেই গড়েছেন আমাদের।" [লিজেল রেমঁ, পৃ° ২০৬]

জাহাজে করে ১৮৯৯ সনের জুন-জুলাইয়ের ছ' সপ্তাহ বিলাতযাত্রার পথেও নিবেদিতা স্বামীজীকে পেয়েছিলেন অনুক্ষণ অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে। এ সম্পর্কে তিনি 'The Master as I saw him' গ্রন্থে লিখেছেন, "To this voyage of six weeks I look back as the greatest occasion of my life." [পৃ. ১৬৯] অন্যত্র বলছেন, "Even a journey round the world becomes a pilgrimage, if one makes it with the Guru." [পৃ. ১৯০]

সমুদ্রপথে একদিন স্বামীজি কথায় কথায় প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। স্বামীজি বললেন, সত্যকার প্রেমের পথ অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্রের পথ। [All human love must wade through oceans of tears.] তিনি আরও বললেন, বেদনার অশ্রুতেই অধ্যাত্মদৃষ্টি খোলে, আনন্দের অশ্রুতে নয়। [The tears of sorrow alone bring spiritual vision, never tears of joy.] (দ্রষ্টব্য, Reminiscences of Vivekananda, পৃ. ২৭৭)

ওইদিনের কথায় [২৮ জুন, ১৮৯৯] নিবেদিতা লিখছেন, স্বামীজি তাঁকে বললেন :

"It is when half a dozen people learn to love like this that a new religion begins. Not till then. I always remember the woman who went to the sepulchre early in the morning, and as she stood there she heard a voice and she thought it was the gardener, and then Jesus touched her, and she turned round, and all she said was 'My Lord and my God!' That was all, 'My Lord and my God.' The person had gone. Love begins by being brutal, the faith, the body. Then it becomes intellectual, and last of all it reaches the spiritual. Only at the last, 'My Lord and my God'." [তদেব পৃ° ২৭৮]

নিবেদিতার প্রেমচেতনাও প্রথমে দৈহিক, তারপর আত্মিক, তারপর ঐশ্বরিক। প্রথমে বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, তারপর বীরেশ্বর শিব, তারপর প্রেমস্বরূপ ভগবান। প্রেমচেতনার এই অন্তিম পর্যায়ের কথা অনবদ্য ভাষায় নিবেদিতা প্রকাশ করেছেন 'The beloved' নামক একটি ছোট্ট রচনায়। রচনাটি এখানে সমস্তটাই উদ্ধারযোগ্য :

"Let me ever remember that the thirst for God is the whole meaning of life. My beloved is the Beloved, only looking through this window, only knocking at this door. The beloved has no wants, yet he clothes Himself in human need, that I may serve him. He has no hunger, yet He comes asking, that I may give. He calls upon me, that I may open and give Him shelter. He knows weariness, only that I may afford rest. He comes in the fashion of a beggar, that I may bestow. Beloved, O Beloved, all mine is thine. Yea, I am all thine. Destroy thou me utterly, and stand thou in my stead."

•

মর্ত্যলোকে গুরুশিষ্যার শেষ সাক্ষাৎ মর্মস্পর্শী। ১৯০২ সনের ২রা জুলাই। নিবেদিতা থাকেন বাগবাজারে। বেলুড়ে স্বামীজি শেষশয্যায়। এই শেষ সাক্ষাতের বর্ণনায় মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, "সেদিন একাদশী। স্বামিজী নিজে উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু নিবেদিতার আহারের ব্যবস্থা করিলেন এবং স্বহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহারের মধ্যে কাঁঠালের বিচি সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ, ভাত এবং বরফ দিয়া ঠাণ্ডা-করা দুধ। প্রত্যেকটি জিনিস পরিবেশন করিবার সময় সেগুলি সম্বন্ধে স্বামিজী হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। আহারান্তে হাত ধুইবার জন্য তিনি নিজেই নিবেদিতার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং তোয়ালে দিয়া তাঁহার হাত মুছাইয়া দিলেন।

"স্বভাবতঃই নিবেদিতা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'স্বামিজী, এ সব আমারই আপনার জন্য করা উচিত, আপনার আমার জন্য নয়।'

"অপ্রত্যাশিত গাম্ভীর্যপূর্ণ উত্তর আসিল, 'ঈশা তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।'

"নিবেদিতা চমকিত হইলেন, তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, 'সে তো শেষ সময়ে!' কিন্তু কথাগুলি যেন কিরূপে বাধিয়া গিয়া অনুচ্চারিত রহিয়া গেল। ভালই হইয়াছিল। কারণ এখানেও শেষ সময় আসিয়া গিয়াছিল।"

[ভগিনী নিবেদিতা, পৃ° ২৩৪]

স্বামীজি মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার পূর্বে তাঁর প্রিয়তমা শিষ্যাকে শেষবারের মত মাথায় হাত রেখে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। পরবর্তী বর্ণনা লিজেল রেম'র ভাষায় অনবদ্য :

"নিবেদিতা বাড়ি ফেরেন। বুকের মধ্যে কৃপণের ধনের মত বয়ে নিয়ে যান অতুল শান্তির সঞ্চয়। কত যে তার দাম, এখনও তার যাচাই হয় নি। পরদিন সকাল পর্যন্ত এমনিভাবেই কাটে। সকালে একজন সাধু একখানা টাটকা পাঁউরুটি নিয়ে এলেন, নিবেদিতার জন্য স্বামিজী নিজে তৈরী করেছেন। এদেশে পাঁউরুটি? রুটিটা নিতে গিয়ে সাধুটির ধরণ-ধারণ কেমন যেন নতুন ঠেকে নিবেদিতার। পুরোহিত যেমন প্রসাদ বিতরণ করেন তেমনিভাবে সাধু রুটিখানা তুলে ধরেছেন তাঁর সামনে। তখন নিবেদিতার নজরে পড়ে, রুটিখানি কাটা। এ যে প্রসাদ! গুরু তাঁকে ভাগ দিচ্ছেন ঠাকুর-ভোগের।

রুটিখানা কপালে ছোঁয়ান নিবেদিতা। • • •

সারাটা দিন গুরুর সান্নিধ্য স্পষ্ট অনুভব করেন নিবেদিতা। বিকালবেলা বুকের বোঝা নামানোর একটা

দুর্দম ইচ্ছা জাগে। ছাদে চলে যান। একটু আড়াল খুঁজে ঈশান কোণের দিকে মুখ করে ধ্যানে বসেন। আঁধার নিবিড় হয়ে আসে, তার মোহিনী মায়া কাটানো অসম্ভব। আকাশে চাঁদ নেই, কালোয়-কালো মহাকালীর পূজার লগ্ন বুঝি। * * *

ধ্যানে বসে স্বামিজীকে চোখাচোখি দেখতে চান, * * * অধীর হয়ে ওঠেন নিবেদিতা। হঠাৎ সব ভাবনা দমকা হাওয়ায় উড়ে গেল, উড়ে গেল জগদ্গুরু শঙ্করের পায়ে। তারপর সব শূন্য। নিবেদিতা যেন এককালে একটা স্বচ্ছ আভা, শব্দ, স্পর্শ, প্রাণ সব···তারপর সবই যেন ফিকে হয়ে গেল। নিঃশব্দে প্রহর গড়িয়ে যায়। এক আত্মহারা আনন্দে ডুবে থাকেন নিবেদিতা। বুঝতে পারেন, যে-শক্তি পথ দেখিয়ে নিচ্ছে তাঁকে, সে তাঁর নিজের নয়। যখন সম্বিৎ ফিরে পান, দেখেন চোখের জলে মুখ ভেসে গেছে। * * *

পরদিন তখনও ভোর হয় নি। একটা চিঠি হাতে কে যেন তাঁর দুয়ারে ঘা দিল।

চিঠি খুলে পড়লেন, 'নিবেদিতা, সব শেষ। কাল রাত ন'টায় স্বামিজী ঘুমিয়ে পড়েছেন চিরতরে।'

চিঠিতে স্বাক্ষর 'সারদানন্দ'। ৪ঠা জুলাই ১৯০২। স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ তিথি।

চোখের সামনে অক্ষরগুলো নাচতে থাকে। কাল রাত্রে দুর্জয়প্রাণ ধূর্জটী কি এই মরণের আশীর্বাদ দিয়ে গেলেন? * * *

চিঠি নিয়ে এসেছে যে, নিবেদিতা তারই সঙ্গে বেলুড়ে চললেন।

মঠে ঢুকেই চলে যান স্বামিজীর ঘরে। জানালার পাল্লাগুলো বন্ধ, ঘরটা খুব অন্ধকার। গুরুর গেরুয়াপরা দেহখানি মেঝেতে মাদুরে শোয়ানো, হলদে ফুলে ঢাকা।

নিবেদিতা বসে পড়েন সেখানে। নিজের গেরুয়া পাগড়ি বাঁধা মাথায়, মাথাটি তুলে নেন কোলে। তারপর একখানা তালপাতার পাখা কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর বড় আদরের ধন সেই মুখে বাতাস করতে থাকেন।

* * *

যখন চিতায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, মৃত্যুর সর্বনাশা অনুভূতি আচ্ছন্ন করে নিবেদিতাকে, কাপড়ে মুখ ঢাকেন তিনি।

'ঠাকুর, এ-জীবনের সব কাজ নিয়ত যেন তোমারই অন্তরের কামনাকে রূপ দিতে পারে, আমার নয়। হর! হর! শিব! শিব! * * *

ধীরে-ধীরে চিতা নিবে আসে। হঠাৎ দূরের বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যায় নিবেদিতার— * * *

অনুগত বন্ধু সদানন্দ তাঁর কাছে এসেছেন। কতক্ষণ উনি বসে রয়েছেন? তিনি পাশে আছেন জেনে নিবেদিতার ভালো লাগল। নিজেকে শক্ত করে বাঁধেন।

'তাঁর কর্মগৌরবের প্রমাণ দেওয়ার জন্য একজন কারও বেঁচে থাকা দরকার। তাঁর বোঝা তাঁরই হয়ে বইতে চাই আমি, আর-কিছু চাই না। যদি নিয়তির বিপাকে পথভ্রষ্টও হই, তুমি তো জান, আমি তোমারই থাকতে চেয়েছি চিরকাল···" (২০শে মে, ১৯০৩-এর চিঠি)

এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি "মরণ-মিলন" কবিতাটির উৎস-বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে নিবেদিতার একটি বাক্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অত্যাবশ্যক: "কাল রাত্রে দুর্জয়প্রাণ ধূর্জটী কি এই মরণের আশীর্বাদ দিয়ে গেলেন।" রবীন্দ্র-কবিকল্পনায় নিবেদিতার এই চেতনাই মৃত্যুরূপী শিবের সঙ্গে তপস্বিনী উমার মিলনের রূপকল্প রচনা করেছে।

পাঁচ

বিবেকানন্দ-নিবেদিতার এই দিব্যজীবনের কাহিনী রবীন্দ্রনাথের অপরিজ্ঞাত ছিল না। ১৮৯৮ সনে নিবেদিতার ভারত-আগমনের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে সে পরিচয় অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যে পরিণত হয়েছিল। ১৯১১ সনে নিবেদিতার মৃত্যু পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ও অটুট ছিল। রবীন্দ্রনাথ আজীবন নিবেদিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অন্তরে বহন করে চলেছেন। অনাত্মীয়া অন্য কোন নারীর সঙ্গে এত দীর্ঘদিন ধরে এমন অন্তরঙ্গ হৃদয়-সম্পর্ক তাঁর আর কখনও হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নানা দিক দিয়ে নিবেদিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। নিবেদিতার মৃত্যুর পর সে কথা স্মরণ করে তিনি অকুণ্ঠে বলেছেন, "তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি

এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৮, পৃ° ৪৮৮]

নিবেদিতা ছিলেন পুরুষের মূর্তিমতী প্রেরণা। তাঁর সম্পর্কে র‍্যাটক্লিফ লিখেছেন, "Those to whom she gave the ennobling gift her friendship hold the memory of that gift as the worlds highest benediction." [দ্রষ্টব্য: পেট্রিক গেডিসের আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনী, পৃ° ২২২]। শিল্পে ও সাহিত্যে, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে, সমাজচিন্তা ও মানবসেবায়, রাজনীতি ক্ষেত্রে ও বিপ্লবাত্মক স্বদেশপ্রেমে তিনি অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু মনীষীকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। বস্তুতঃ ব্যক্তিত্বে তিনি ছিলেন সর্বচিত্তহারিণী সর্বজয়া। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তো তাঁর সৌন্দর্যের বিমুগ্ধ পূজারী ছিলেন। তিনি বলছেন, "গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। * * * আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।" [জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃ° ১১৪]

স্বভাবতঃই অতি-সূক্ষ্মচেতনাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে এমন নারীর সংস্পর্শে এসে অনুপ্রাণিত না হওয়াই অস্বাভাবিক। নিবেদিতারও প্রথম দর্শনেই রবীন্দ্রনাথকে ভাল লেগেছিল। এ সম্পর্কে মুক্তিপ্রাণা লিখছেন:

"জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সহিত, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। প্রথম দর্শনেই রবীন্দ্রনাথের আকৃতি ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে তিনি ডায়েরীতে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন।"

* * *

"তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রবীন্দ্রনাথ যখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তাঁহাকে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের অনুরোধ জানান, তাহাতে নিবেদিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু কতকগুলি কারণে উহা কার্যে পরিণত হয় নাই…"

* * *

"রবীন্দ্রনাথ ১৭নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার গৃহে বহুবার আসিয়াছেন। তাঁহারা একসঙ্গে বুদ্ধগয়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিষ্টাচার ও সৌজন্য নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নিবেদিতা বাংলাভাষা ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথের কবিতার মর্মার্থ তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং তাঁহার বিখ্যাত ছোটগল্প 'কাবুলীওয়ালা'র অনুবাদ করিয়াছিলেন। নিবেদিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এতদূর আস্থা ছিল যে, তাঁহার অনুরোধে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে স্বামী সদানন্দের সহিত কেদার-বদরী পাঠাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন অধিকাংশ সময় শিলাইদহে অবস্থান করিতেন। নিবেদিতা কয়েকবার সেখানে গিয়াছিলেন।"
[পৃ° ৩৩৫-৩৭]

* * *

নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে লিজেল রেম'র বর্ণনায় পাই: "আমেরিকান বান্ধবী দুটি কলকাতা ছেড়ে যাবার আগেই নিবেদিতা ঠাকুরবাড়ির একজন মান্য অতিথি হয়ে উঠলেন। তিনি গেলেই ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় প্রেম আর সৌন্দর্যের জগৎ খুলে যায় চোখের সামনে। অপরূপ সুরেলা কণ্ঠে কিছু আবৃত্তি করেন তিনি,—অপার মাধুরীতে মন ভরে ওঠে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর আনন্দে কাটে। কখনও-বা রবীন্দ্রনাথ বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে আসেন। নিবেদিতা তাঁর নিঃসজ্জ বৈঠকখানায় কবিকে সমাদর করে বসান। তারপর গানের আলোয় আর আনন্দের হাওয়ায় সে-ঘর যেন প্রাসাদের মত গমগমে হয়ে ওঠে।" [পৃ° ২৬৩]

বস্তুতঃ, ভারতে পদার্পণ করার দেড় বৎসরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার প্রীতির সম্পর্ক যে সুগভীর হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৮৯৯ সনের

১৬ জুন রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার একখানি পত্রে। নিবেদিতা স্বামীজির সঙ্গে বিলেত যাত্রার পূর্বমুহূর্তে কবিকে লিখছেন :

My dear Mr. Tagore,

You have heard long ago, I fancy, that I must go to England this summer & that therefore I shall not be able to accept that fascinating invitation to your river-house, towards which I had been steadily pressing for so long! I was within a day or two of writing to you that, if you wd. allow me, I wd. come to Mrs. Tagore & yourself as soon as the Swami had started. Little did I think that before I shd. have written, my own fate wd. have been reversed!

I am really not at all happy to be going away from india—even for a little while—and long talks with yourself on all sorts of delightful things are amongst the many disappointments of the change of plan. Besides, I really wanted to add a new friend to those with which India has already blessed me, and you are so dear to my friend Dr Bose, that I cd. not help hoping you sd be *my* friend too!

But I hope that the greatest ends may be better served by my going than by my staying & if that is so I know that you will feel with me that personal considerations simply do not count.

My Au Revoir includes a great many wishes for your good health & happiness until we meet again. Please give my kind regards and respects to Mrs Tagore & my love to your charming children. And believe me dear Mr Tagore

Sincerely Yours
Nivedita

স্বভাবতঃই এ কথা অনুমান করা কঠিন নয় যে, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কটি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপেই জানতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার জীবনাদর্শ যে রবীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, তাঁর মহত্তম উপন্যাস 'গোরা' রচনার প্রেরণামূলে যে ক্রিয়াশীল হয়েছিল, এ কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। রবীন্দ্র-জীবনীকারই প্রথম এই কথা বলেছেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে নিবেদিতার উপলব্ধিটি রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রেরণার বিষয়ীভূত হবে, এ চিন্তা সারস্বত বিশ্বাসের দ্বারা সমর্থিতব্য। বস্তুতঃ, স্বামীজির তিরোধানে নিবেদিতার শোকার্ত চিত্তের মর্মান্তিক বেদনা রবীন্দ্রনাথের কবিমানসকে অভিভূত করেছিল। প্রিয়বান্ধবীর দুঃখের প্রতি সুগভীর সমবেদনায় তাঁর লেখনীমুখে উৎসারিত হয়েছে "মরণ-মিলন" কবিতাটি। স্বামীজির তিরোধানের পর জুলাই মাসেই নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সাউথ সুবার্বান স্কুলের প্রাক্তন বিদ্যার্থিবৃন্দ আয়োজিত স্বামীজির শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি আর ভগিনী নিবেদিতা প্রধান-অতিথি। সে সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কথাশিল্পী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সবাইকে বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবা এবং দরিদ্রনারায়ণ-ব্রতে দীক্ষা নিতে আহ্বান করে বলেন স্বামীজির আদর্শ গ্রহণ করলেই তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন সার্থক হবে।

ছয়

"মরণ-মিলন" কবিতায় যে নিবেদিতারই শোকার্ত চিত্তের ভাষা মুক্তি পেয়েছে তার আর একটি সহায়ক ও সমর্থক প্রমাণ রয়েছে নিবেদিতারই রচনায়। ১৯০৮ সনে লংম্যানস, গ্রীন এণ্ড কোম্পানি লণ্ডন থেকে নিবেদিতার লেখা 'An Indian Study of Love and Death' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির রচনাকাল অবশ্য আর তিন বৎসর পূর্বে ১৯০৫ সনে—অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের তিন বৎসর পরে। গ্রন্থখানি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রন্থে স্বামীজির মহাপ্রয়াণে নিবেদিতার হৃদয়বেদনাই অভিব্যক্ত হয়েছে। গ্রন্থখানির উৎসর্গে নিবেদিতা লিখেছেন : 'Because of sorrow.' এই গ্রন্থের Meditations of the Soul, of love, of the inner perception, of peace, of triumphant union ; The communion of the soul with the Beloved ; এবং A Litany of Love-এর অন্তর্গত গীতিকবিতাগুলি নিবেদিতারই

আত্মকথা। এই গ্রন্থে নিবেদিতার মর্মলোক নিঃশেষে নির্বারিত। নিবেদিতাও যে অন্তরে অন্তরে কত বড় কবি ছিলেন এই গ্রন্থে গদ্যে ও পদ্যে তার অভ্রান্ত প্রমাণ বিদ্যমান। গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য এবং অধুনা অপ্রচলিত বলে এর থেকে বহুল উদ্ধৃতিই পাঠকগণ প্রত্যাশা করবেন।

Meditations of the Soul নিবন্ধে নিবেদিতা প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে বলছেন :

In life, what was it that you loved? Was it his form, his bodily presence, the sight, the sound, the touch of the house wherein he dwelt? Or was it he, the dweller within the house, whom you rather loved? Was it his mind, his spirit, his purpose, in which you were at one? What presence was to you his presence? Was it this? Or was it merely the presence of the body....

উত্তর : The love that endures is the love of the mind, of the Soul.

প্রশ্ন : Was there union in life?

উত্তর : Then, two souls were set to a single melody. And they are so set still. In this setting of the Soul is faithfulness.

মৃত্যুর পরে উভয়ের সম্পর্ক কী রূপ পরিগ্রহ করল সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে :

All that was purely of the spirit, we share still. Grief is nothing but a clouded communion. His soul progresses still towards its own beatitude. Thine still serves that beatitude in him, and on earth carries out the purpose of his life.

Meditations of love রচনাটি সমগ্রভাবেই উদ্ধারযোগ্য। নিবেদিতা বলছেন :

Let me commune with my own heart, and bid it tell to me again what were the tokens by which, here on earth, I knew him whom my soul should love!

Were they not secret tokens, passed by, by others unnoticed, but to me full of significance, by reason of their response to something in myself?

Outwardly, our lives had been different. But inwardly, we saw them for the same. One had led to just that need which only the other could understand. One had led to just that will, in which the other could perfectly accord. That aim which I could worship, embodied itself in him...I had dreamt great dreams, but did he not fulfil them at their hardest?

Were there not moments in which I seemed to look through the windows of the body, and see the soul within, striving and aspiring upwards like white flame? Then knew I the Beloved, because he sought loss, not gain; to give and not to take; to conquer, not to enjoy. And I took him as my leader, and vowed myself to his quest, and knew that while I would lose myself to him, I would yield him up in turn for the weal of all the disinherited and the oppressed.

Such were the tokens, by which I recognised my Beloved, of old, and long before, the companion of my soul.

Nor is he different, now that he is withdrawn from sight. His life was as a single word, uttered to reveal the Soul. The soul that was revealed, remains the same.

Much was there that the strife with earth made difficult to tell, and this has grown in him, not lessened.

That reply that my mind made to his, the reply that was the soul of love, remains eternally apt, eternally true.

Then can I not watch and pray beside him while he sleeps, or wait to join him in that self same silence?

Meditations of Peace-এ বলা হয়েছে : Lose ego in love. Lose love in sacrifice for others. So the Beloved becomes the Divine, and the lover forgets self.

Meditations of Triumphant Union-এ দিব্য-প্রেমের চূড়ান্ত উপলব্ধির কথাই যেন বলা হয়েছে :

Either, without the other, is incomplete. For had presence been prolonged, we should have thought that presence, that companionship was the end. But they who think thus are deluded. Union is the end.

And union is not an act. It is a quality, inherent in the natures that have been attuned.

And that infinite music, whereby our spirits are smitten as they were harpstrings, into endless accord of sweetness and sacrifice, that music is what some know as God.

Only through God can human beings reach each other, and be at one.

বস্তুতঃ, 'An Indian study of Love and Death' গ্রন্থখানি নিবেদিতার অন্তর্জীবনের অমূল্য দলিল। দিব্য-প্রেমের এমন অপূর্ব কাব্যরূপ পৃথিবীর সাহিত্যেও দুর্লভ। বলাই বাহুল্য, এই গ্রন্থখানিই নিবেদিতার শ্রেষ্ঠ সারস্বত কীর্তি। নিবেদিতার এই আত্মকথার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে "মরণ-মিলন" কবিতাটিরও নূতন তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

সাত

নিবেদিতার Meditationsগুলি, বিশেষ করে "Meditations of the Soul" রচনাটি 'মরণ-মিলনে'র সঙ্গে একই সুরে গাঁথা। কবিতাটির অন্তিম স্তবকের দিকে এবার শেষবারের মত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। নিবেদিতা লিখেছেন, "His soul progresses still towards its own beatitude. Mine still serves that beatitude in him, and on earth carries out the purpose of his life."

"মরণ-মিলনে"র অন্তিম অনুচ্ছেদে শোকার্ত চিত্ত বলছে :

আমি যাব যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূরে ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণি জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়—
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

এই স্তবকটি প্রথমেই একটি গানের কথা মনে করিয়ে দেয় : 'অব শির পার কর মেরে নাইয়া।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ১৯০০ সনের ১৮ এপ্রিল তারিখে জয়া-[মিস ম্যাকলয়েড]-কে লেখা স্বামীজির পত্রের কথা। "The battles are lost and won. I have bundled my things and are waiting for the great deliverer. Shiva, O Shiva, carry my boat to the other shore." [Works, vol. vi. পৃ° ৪৩১]

চিত্ররূপের দিক দিয়ে শেষ বাক্যের ছবিটির ব্যঞ্জনাও অনেকখানি। 'আমি করিব নীরবে তরণ সেই মহাবরষার রাঙা জল।' সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাগবাজার থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত ভরা-বর্ষায় স্ফীত গঙ্গার গৈরিক জলরাশি।

কিন্তু ভবনদী পার হবার জন্যে তরণীর কর্ণধারের কাছে আকুল প্রার্থনা এখানে উচ্চারিত হয় নি। যেখানে আঁধারের অনুসরণ করে অকূল থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় সেখানেই শোকার্ত চিত্ত যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। যদি ঈশান কোণে ঘনঘোর মেঘোদয় দেখা যায় তাহলেও সে মিথ্যে ভয় করবে না। মহাবরষার রাঙাজলের উচ্ছ্বাসকে উপেক্ষা করে সে তরণীতে নীরবে অবতরণ করবে। স্বভাবতঃই এখানে নিবেদিতার সে-সময়কার অসহায় অবস্থাটির কথা মনে পড়ে যায়। যাঁর ভরসায় নিবেদিতা স্বজন ও স্বদেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। তিনি বলেছিলেন "I will stand by you unto death," সে কণ্ঠ নীরব হয়েছে। তিনি রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসি-সঙ্ঘে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা আজ আশ্রয়চ্যুতা। স্বামীজির শেষকৃত্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যতঃ তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের জন্যে নিবেদিতার সঙ্গে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ছিন্ন হল। ১৯শে জুলাইয়ের "অমৃতবাজার পত্রিকা'য় সে সংবাদ প্রকাশিত হল। তাতে বলা হয়েছে :

"We have been requested to inform the public that at the conclusions of the days of mourning for the Swami Vivekananda it has been decided between the members of the Order of Belur Math and Sister Nivedita that her work shall henceforth be regarded as free and entirely independent of their sanction of authority."

স্বভাবতঃই নিবেদিতা অনির্দেশ অনিশ্চয়তার অকূলে ভাসলেন। প্রিয়বান্ধবীর এই মর্মান্তিক শোকের উপর ব্যবহারিক জীবনের বিপদ রবীন্দ্রনাথের দরদী কবিচিত্তকে বিচলিত করেছে। করুণ-রসে তাঁর চিত্ত আপ্লুত হয়েছে। শিষ্যা অবশ্য গুরুর প্রতি বিশ্বাস হারান নি। তাই সমস্ত আশ্রয়চ্যুত হয়ে তিনি গুরুর কাছেই পথনির্দেশ চাইছেন। নৈরাশ্যের অন্ধকার দিগ্‌বলয় থেকে যতই প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হোক, ঈশান কোণে আসন্ন দুর্যোগ যতই ঘনঘটাচ্ছন্ন হোক, তিনি তাঁর জীবনের কর্ণধারের নির্দেশ অবশ্যই পালন করে চলবেন। গুরুর প্রতি, প্রিয়তমের প্রতি এই আত্মনিবেদিত শরণাগতির মনোভাব দিয়েই মরণ-মিলনের সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

কবিতার এই অন্তিম স্তবকটিও তাই এর প্রেরণার উৎসমূলের দিকে অসংশয় নির্দেশে পাঠকচিত্তকে এগিয়ে দেয়। বস্তুতঃ, অমর প্রেমের আলোকে সমুদ্ভাসিত' একটি অবিনশ্বর মৃত্যুর মর্মবেদনা মহাকবির দিব্য কল্পনার বিষয়ীভূত হয়ে অনিন্দ্যসুন্দর কাব্যরূপ লাভ করেছে। "মরণ-মিলন" কবিতায় বিবেকানন্দ-নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ একসূত্রে বাঁধা পড়েছেন।*

* লেখকের আশুপ্রকাশিতব্য 'বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের একটি অধ্যায়।

বিবেকানন্দ ও আমি

মৈত্রেয়ী দেবী

সত্যসন্ধ হে মহামানব
তোমারে আপন বলি এ স্পর্ধা
হল না অসম্ভব।
আজ সেই অকুণ্ঠ ঘোষণা
অনায়াসে সহ্য হল,
কান পেতে রোজ গেল শোনা।
তুমি নেতা ছিলে,
আর আমিও নায়ক
তোমার অমিত তেজে
জলেছিল ত্যাগের পাবক,
সেখানে নিঃশেষে হল ছাই
কত স্বার্থ কত লোভ কত ক্ষুদ্রতাই,
কম্বুকণ্ঠে উদ্ঘোষিত পরম আহ্বান
পতিতের দুঃখিতের চিরজয়গান
পঙ্কশয্যা হতে ওঠে প্রাণস্পন্দ্য বেগে—
তোমার পবিত্র স্পর্শে মৃত্যু হতে জেগে—
নর যারা হল নরোত্তম।
এ সত্য পরম
আমিও তো জানি
বইয়ে বাঁধা তোমার যে বাণী
সে আমার মুখে মুখে গীত।
অসংখ্য মানুষ শুনে হয়েছে স্তম্ভিত।
তুমি গুরু ছিলে আর আমিও তো নেতা
শত বক্র পাক দেওয়া কত ভোটে জেতা।
তোমার সেবার মন্ত্র
আমিও তো করিব সেবাই।
তাহারি উদগ্রলোভে
মাঝে মাঝে শত্রুকে নেভাই।
নিন্দা আর কলঙ্কের গ্লানি দিয়ে তাকে
দূঢ় করি সেবা-অভীপ্সাকে।

আমারও প্রতিজ্ঞা রবে স্থির অচঞ্চল
স্বার্থে স্বার্থে গিঁঠ দিয়ে
বাঁধি তাই মানুষের দল।
টানে তারা মধ্য আকর্ষণে—
মন্থিত গরল ঢাকা স্তব-আবরণে।
তোমার বীর্যের বাণী
আমারেও করে তোলে বলী
গেঁথে আনি পূজার অঞ্জলি।
মর্মর মন্দির ছায়া, সাজানো সভায়
পরি বসে সুরভি চন্দন,
তোমার বন্দনে মেশে আমার বন্দন।
সম্মুখে প্রণত দেখি মনের সাগরে
আমার অগণ্য ভক্ত বন্দরে নগরে—
তোমারেও ভালবাসে,
আমারও তো একান্ত স্বকীয়
তোমারি বাণীর মন্ত্রে,
ইহাদের করেছি আত্মীয়।
দিয়েছে আমারে শ্রদ্ধা,
অমেয় বিশ্বাস
এদেরই বাহুর বলে শক্তিভরা আমার নিশ্বাস।
দারিদ্র্য যে নারায়ণ
সে মন্ত্রের জোরে
অন্নহীনে বস্ত্রহীনে রাখি শান্ত করে।
বঞ্চিতের উষ্ণশ্বাস, প্রতপ্ত বিলাপ
ওঠে না সে উচ্চ হর্ম্যে
নিয়ন্ত্রিত যেথা শীততাপ!

হে বীর হে বীর্যবান
হে আদর্শ নর,
তোমারেই করেছি তো একান্ত নির্ভর।

তবু মাঝে মাঝে মোর সঙ্গীহারা রাতে
কখনো প্রদোষে আর আসন্ন প্রভাতে
কি অজ্ঞাত ত্রুটি
তোমার ললাটে যেন এনেছে ভ্রূকুটি—
ভীত পরাজিত মনে ঘনায় সন্তাপ
পাবকে স্পর্শিত হয় পাপ।
তারই দিব্য ব্যোম স্পর্শ দাহ
গলানো আগ্নেয়গিরি
মৃত্যুর প্রবাহ
চমকিত দামিনীর বহ্নির মতন
জ্বলে তব তৃতীয় নয়ন।
ক্ষণে ক্ষণে জানি
তোমার শরিক নয়,
আমি শুধু প্রাণী।
আমি শুধু অকিঞ্চন নর
নরোত্তম হতে সাধ
ভিক্ষা চেয়ে ফিরেছি সে বর।

—

একদিন

কুমারেশ ঘোষ

নাকেমুখে কোনরকমে ছুটো গুঁজে—তাও আধসেদ্ধ—রোজ হরিশবাবুকে ছুটতে হয় অফিসে। একটু আগে-আগেই বেরুতে হয়। কারণ কলিমদ্দী লেনের ভাঙা বাড়িটা থেকে ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিসে যেতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। সবটা পথ হেঁটে যেতে হয় বলেই সময় লাগে বেশি।

ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশেই হরিশবাবু আগে যেতেন বটে, তবে তাতে যে পয়সাটা খরচ হত, তাতে দেখা গেল ছোট ছেলেটার স্কুলের টিফিনের খরচাটা চলে যায়। কাজেই হরিশবাবু ইদানীং হেঁটেই অফিসে যাতায়াত করেন। তা ছাড়া কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে এমন কি কষ্ট! লোকের ভিড়ে পায়ে পা লেগে হুমড়ি খেয়ে না পড়লে দিব্যি পথের দুধারের দোকান-পাট, নানা রকম সাজসজ্জা, এটা-ওটা দেখতে দেখতে দিব্যি পথ শেষ হয়ে যায়।

তবে রাস্তায় বাস-ট্রামের ভিড়ে অ্যাক্সিডেন্টের ভয় পদে পদে। প্রাণ হাতে করে নিয়ে চলা। একটু হিসেবে ভুল হলেই তো একেবারে গাড়ির চাকার তলায়। দু-একবার তো 'গেল-গেল' হয়েও শুধু ড্রাইভারী গালাগাল খেয়েই সে যাত্রায় বেঁচে গেছেন হরিশবাবু। তাই হরিশবাবুকে বেশ একটু দেখেশুনেই পথ চলতে হয়।

তা ছাড়া বড় বড় মোড়ে লাল নীল আলোরও তো চোখ-রাঙানি আর চোখ-ইশারা আছে। কলকাতার পথ চলতে সেগুলোকেও মানতে হয়; মানে, রাস্তা পার হতে গিয়ে ঠেক খেতে হয় প্রায়ই। উপরন্তু আছে পুলিসের হাত! কনেস্টবল তো নয়,—সরকারের কনিষ্ঠ বল সে। সেই বা একহাত দেখাতে ছাড়বে কেন? অর্থাৎ অফিসের শুভযাত্রা-পথে অনেক রকম বাধা, অনেক জ্বালা।

অতএব হরিশবাবুকে বেশ একটু আগে আগেই বেরুতে হয়।

হরিশবাবু সেদিনও বেরুলেন।

তবে সেদিন রাস্তা পার হবার সময়, আশ্চর্য, পুলিস হাত দেখিয়ে ট্রাফিক থামিয়ে দিল। পথের দুধারের অগুনতি মোটর বাস গেল থেমে। হরিশবাবু নির্বিবাদে রাস্তা পার হয়ে গেলেন।

তার কারণ ছিল।

সেদিন হরিশবাবু হেঁটে যান নি। কয়েকজন লোকের কাঁধে চড়ে যাচ্ছিলেন!

আর যাচ্ছিলেন ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিসে নয়—নিমতলার দিকে।

*

অন্ধকারের পর

প্রকাশ গুপ্ত

কত দূর পথ চুপিচুপি নিঃশব্দে পেরিয়ে এসে আজ তোমার কাছে ধরা পড়ে গেছি রজত—এ লজ্জা আমি কোথায় লুকিয়ে রাখি বল। জীবনটা তার মাপা দিনের হিসাব নিয়ে বাঁধা কক্ষপথে ঘুরেই চলেছে। তুমি ঘুরছ, আমি ঘুরছি। কিন্তু আমরা মুখোমুখি হলাম কেন! সমাজ যে নীতির একটা অদৃশ্য গণ্ডি আমাদের চারপাশে টেনে রেখেছে তার বাইরে তুমি পুরুষমানুষ, হয়তো যেতে পার, কিন্তু আমি মিসেস অলকা মিত্র—আমার যাওয়ার তো কোনও উপায় নেই। দেহ এবং মনের দোটানায় যতই পড়ি না কেন আমাদের অবিচল থাকতেই হয়। এই তো পৃথিবীর রঙ এরই মধ্যে অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। আর কদিন পরে অনেক কিছুই সহজ দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না। কিন্তু আমার মনের বন্ধ দরজাটা হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল যে! এখন যদি দক্ষিণের মাতাল হাওয়া সেই পথে ঢুকে হঠাৎ সবকিছুকে এলোমেলো করে দেয় তার জন্যে দায়ী আমি নই। তুমিই সেই ঝড়ের হাওয়া রজত। একটা প্রশ্ন আজ বারবার মনে জাগছে, আমাদের ভবিষ্যৎ কী? তুমি তো একা নও! সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়েছ তো অনেক দিন। তবে! তবে আর কি, আমাকে ক্ষমা করো রজত। জীবনে দায়িত্ব তোমার চেয়ে আমার অনেক বেশী। তাই বোধ হয় দুঃখও পেতে হবে সেই মত। আমি কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম রজত। সেইভাবে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম—অনেকগুলো রঙীন বছর রঙীন ফানুসের মতই চোখের সামনে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। এবার আর…

শেষ রাতের কিছু আগে ঘুমটা ভেঙে গেল অলকার। ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট যে কল্পনাটা স্বপ্ন হয়ে এতক্ষণ সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তারই বাস্তব রূপ যেন অপেক্ষা করে রয়েছে কাছাকাছি কোথাও।

অলকা উঠে পড়ল। অতি সন্তর্পণে মশারিটা সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ঘরের মধ্যে আরও কটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে—শোনা গেল না অলকার পায়ের কিংবা দরজা খোলার আওয়াজ।

লঘু পদে বারান্দাটা অতিক্রম করে বসবার ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে আবার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল অলকা। ঘরের মধ্যে এক ঝলক স্নিগ্ধ শুভ্র আলো উঁকি দিয়ে চকিতে মিলিয়ে গেল।

বাইরে পূর্ণিমা রাত্রিশেষের উচ্ছল জ্যোৎস্না যেন গলে গলে পড়ছে। বারান্দায় টাঙানো বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে চারটে বাজল।

অলকা দরজার দিকে পেছন করে একটি সোফায় বসল অতি ধীরে। ঘরের মধ্যে জমাট অন্ধকার। জানলাগুলোও খড়খড়িশুদ্ধ বন্ধ রয়েছে। থাক, অলকার মনে হল আলোর দরকার নেই।

কাল সন্ধ্যায় ওই সামনের সোফাটিতেই রজত বসেছিল। ডানহাতের কনুইয়ের ওপরে শরীরটাকে ঈষৎ

ভর দিয়ে ঘাড়খানা একটু বেঁকিয়ে তার দিকেই প্রায় সর্বক্ষণ চেয়ে বসে কথার মালা সাজিয়ে গেছে। ঘণ্টা-খানেকের বেশী এখানে ছিল না সে কিন্তু অলকা জলেপুড়ে গেছে তাতেই। রাগে নয়, কারণ এই বয়সেও অলকা রাগতে জানে না।

বাছাই করা এক প্লেট খাবারের সবটুকু খেয়ে রজত যখন চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিল অলকা তখন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার ভাবলেশহীন মুখের দিকে। নির্বিকার ভাবে সন্দেশগুলো শেষ করে বাঁ হাতে পেয়ালাটা ধরে কি একটা বিষয় চিন্তা করতে করতে রজত চা খাচ্ছিল। অল্প কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়েছিল সে আর অলকা মাত্র সেই সময়টুকুর জন্যে পরম আগ্রহ ভরে তাকে দেখেছে। বাকি সময়টা রজতেরই চোখ নিবদ্ধ ছিল তার দিকে আর অলকা তার সামনে বসে ছিল মুখটি নত করে।

ভারি সুন্দর কথা বলতে পারে রজত আর অলকার ভাল লাগে তার কথা শুনতে। বয়সে প্রায় সমান হলেও রজতকে দেখায় অলকার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় বলে। দুজনের পরিচয়ও তো কম দিনের কথা নয়। তা প্রায় বছর পাঁচেক হবে। এর মধ্যে কতবার এখানে এসেছে সে, কিন্তু কাল সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ নতুন চেহারা নিয়ে অলকার সামনে এসেছিল রজত।

কাল অলকার কেমন উদ্‌ভ্রান্ত ভাব এসেছিল মনে। সেই সঙ্গে একটু অস্বস্তি। অথচ কই, এর আগে কোন দিন তো এমনটি হয় নি!

এখন অলকার মনে হচ্ছে কাল সন্ধ্যায় সে রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠেছিল। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে অসংলগ্নতাও প্রকাশ পেয়েছিল তার। পিসতুতো দিদি অপর্ণা সে সময় হঠাৎ এসে হাজির না হলে অলকা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত।

নীচে থেকেই অপর্ণার হাঁক শোনা গেল: অলি আছিস বাড়িতে?

জাঁদরেল মহিলা অপর্ণা। যাদবপুর অঞ্চলে একটা গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস।

রজত তখন সবে তৃতীয় সিগারেটটি ধরিয়ে জটিল প্রেমতত্ত্বের স্বরচিত একটা ব্যাখ্যা শুরু করেছে, অলকা মাথা দুলিয়ে প্রাণপণে সায় দেবার চেষ্টা করছে। অপর্ণার কণ্ঠস্বর তাতে ছেদ টানল। অলকা বেশ খুশী হয়েই নীচে নেমে গেল: ওমা, অপর্ণাদি! এস এস।

অপর্ণাকে সম্বর্ধনা করে ওপরে শোবার ঘরে বসিয়ে রেখে কয়েক মিনিটের মধ্যে রজতের কাছে ফিরে এল অলকা হাসিমুখে।

কথার মাঝখানে বাধা পেয়ে রজত মনে মনে বিরক্ত হলেও প্রশ্ন করল, কে এসেছেন? গলার স্বরে খুব আপনার লোক এবং ভারিক্কী কেউ বলে মনে হল যেন!

হাসি হাসি মুখে অলকা বলল, আমার পিসতুতো দিদি অপর্ণা। ভারিক্কীই বটে। অনেক দিন পরে এলেন।

রজত উঠে পড়ল। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ অলকার মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমি এখন চললাম তাহলে। মিস্টার মিত্রকে আমার নমস্কার জানাবেন। দেখা হল না।

সিঁড়ির মুখে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল রজত। বলল, কাল একবার টেলিফোন করব। আজ আপনি তো ভাল করে কথাই বললেন না। কি হয়েছে আপনার বলুন তো?

অলকা পাশ কাটাবার চেষ্টা করল: কই, কিছু হয় নি তো! এমনিই। আর অপর্ণাদি এসেছেন কি না—

রজত হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, তবু ভাল। টেলিফোনে তো মুখে খই ফোটে দেখি। বাপ রে, সে কি প্রতাপ! প্রতি কথায় একটা করে খোঁচা তো দেওয়া চাই-ই।

অলকা মরিয়া হয়ে একটা রসিকতার চেষ্টা করল: মধুর লোভ করলে হুলের খোঁচাও যে সহ্য করতে হবে রজতবাবু।

রজত আর একবার তাকাল অলকার মুখের দিকে। স্মিতমুখে বলল, তা করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠকে না যাই। এখন চলি।

মিসেস অলকা মিত্র যেন এতক্ষণে নিশ্বাস নিতে পারল ভাল করে।

নিদ্রাজড়িত আলস্যে সোফার ওপর সম্পূর্ণ গা এলিয়ে দিয়েছিল অলকা। একটু তন্দ্রাও এসে গিয়েছিল। শেষ রাত্রে এই অন্ধকার নির্জনতার মধ্যে স্মৃতিরোমন্থনটুকু বেশ ভাল লাগছিল তার। ঘরের ঘন অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি একেবারে চলে না। সামনের সোফাগুলোও ভাল করে চেনা যাচ্ছে না। অর্ধস্তিমিত নেত্রে অলকা সেইদিকেই চেয়ে চেয়ে নানা কথা ভাবছিল। সহসা তার মনে হল সামনের ওই সোফাটার ওপরে কে যেন বসে আছে। কে! কে বসে ওখানে! চিনতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। রজত নয়। তবে কে? হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝলক আলো যেন সোফাটার ওপরে ছড়িয়ে পড়ে পরক্ষণেই আবার মিলিয়ে গেল। অলকা একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠল। কাকে দেখল সে! অচিন্ত্য হালদার নয়? হ্যাঁ ঠিকই, অচিন্ত্য হালদারই তার চোখের সামনে আবির্ভূত হয়েছে। এখন অন্ধকারের মধ্যে আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অলকা এক পলকেই তাকে চিনেছে। অচিন্ত্য হালদারকে এতদিন পরেও চিনতে ভুল হবে না। অধরপ্রান্তে একটা মৃদু হাস্যরেখা ফুটে উঠল অলকার; অচিন্ত্য নয়, এখন রজতের কথা ভাবতে হবে। রজত তার অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। সাবধান হতে হবে এখনই, দু হাতে রাশ টেনে ধরতে হবে।

অলকা আবার তন্দ্রায় মগ্ন হল। বাইরে কখন ভোরের পাখীর গান থেমে গেছে। প্রভাতসূর্যের আলো সহস্র কণায় ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে।

এবারে আশ্চর্য হবার পালা রজতের। টেলিফোনে অলকার এমন অস্বাভাবিক কণ্ঠ সে এর আগে শোনে নি। অতিপরিচিত সেই মধুর কণ্ঠের কলধ্বনি নয়, অলকার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার আজ মনে হল কোনও এক প্রৌঢ়া অভিনেত্রীর ভাঙা গলার মাধুর্যহীন ডায়ালগ শুনছে সে।

প্রথমে লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্যে দিয়ে কথাবার্তা শুরু করার চেষ্টা করল রজত। কিন্তু গোড়া থেকেই কেমন যেন বেসুরো ঠেকছিল তার। খানিকটা এলোমেলো চেষ্টা করার পর নিরুপায় রজতকে বলতেই হল, মনে হচ্ছে কোনও একটা ব্যাপারে আপনি খুবই সীরিয়স হয়ে উঠেছেন অলকা দেবী। বোধ হয় টেলিফোনে কথা বলতে চাইছেনও না। যাই হোক, আমি সন্ধ্যে নাগাদ যাচ্ছি আপনার কাছে। থাকছেন তো?

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে সমর্থন পাওয়া গেল।

রজত অলকার বাড়িতে পৌঁছল সন্ধ্যার কিছু আগেই। অন্ধকার হয়ে আসছে তবু বাড়ির কোনও আলো তখনও জ্বালা হয় নি। বোধ হয় অলকার মনের অন্ধকার সারা বাড়িটাতে ছড়িয়ে পড়েছে।

ড্রয়িংরুমের আলো জ্বেলে রজতকে বসাল অলকা। রজত সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, অলকার বেশভূষায় কোনও পারিপাট্য নেই, মুখেও দারুণ চিন্তা ও কালিমার একটা ছাপ পড়েছে এক রাত্রির মধ্যেই।

অলকা দেবী, কী হয়েছে বলুন তো?—রজত প্রশ্ন করল।

অলকা আবার মুখোমুখি সেই সোফাটিতে বসল। বলল, কিছু হয় নি তো। কেবল একটু ভূতের ভয় পেয়েছি।

ভূতের ভয়!

হ্যাঁ, ভূতের ভয়। মানুষ মরে গেলে যে ভূত হয় সে ভূত নয়, জীবন্ত মানুষের মধ্যেও আবার ভূত লুকিয়ে থাকে জানেন কী? আমার সেই ভূতের ভয় করছে।

রজত অবাক হল: তার মানে? হেঁয়ালী ছেড়ে সোজা কথাই বলুন না।

অলকা সোজা হয়ে বসল। রজতের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়েই বলল, রজতবাবু, আপনার আমার সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে কাল থেকে সারাক্ষণ চিন্তা করছি।

আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি অতি ধীর সতর্ক-ভাবে ক্রমশঃই এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। নিজের ইচ্ছায় না হলেও বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এ হতেই হবে। কিন্তু রজতবাবু, আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক বন্ধনের কথাটাও তো স্মরণ রাখা দরকার। একটা কথা আপনি নিশ্চয়ই মনে রাখবেন, কথাবার্তা হাসি-পরিহাসে আমরা যতদূর নিঃসংকোচ হতে পারি হয়েছি। বন্ধুত্বের আকর্ষণ হয়তো আরও নিবিড় হয়েও উঠতে পারে কিন্তু একটা সীমানার বাইরে যাওয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাহলে আঘাত পেতেই হবে।

রজত বাধা দিল : সে সীমানা অতিক্রম করতে চাইছি এমন কোনও ইঙ্গিত আপনি পেয়েছেন কী ?

উত্তেজনার মধ্যেও অলকা লজ্জিত হল : না না, ঠিক সে কথা আমি বলি নি। আজ ভোর রাত্রে অচিন্ত্য হালদারের কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। অচিন্ত্যও শক্ত পুরুষ ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেও আমাকে প্রেম নিবেদন করছে, এমন কি আমার দৈহিক সাহচর্যও কামনা করছে একান্তভাবে। আপনি এখন যেখানে বসে আছেন আজ থেকে আট বছর আগে অচিন্ত্য শেষবারের মত ঠিক ওইখানটিতেই বসেছিল।

আমার ক্ষেত্রে আপনি ওই দুশ্চিন্তা থেকে নিশ্চয়ই মুক্ত থাকতে পারেন অলকা দেবী। বুদ্ধি এবং যুক্তি যাতে সায় দেয় না তেমন হঠকারিতা এ পর্যন্ত কখনও করেছি বলে তো মনে পড়ে না। কিন্তু অচিন্ত্য হালদারটি কে বলুন তো ?—রজত সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

অলকা একবার রজতের দিকে চাইল। একটা বাঁকা হাসি চকিতে খেলে গেল তার মুখে। বলল, শুনুন তাহলে সেই পুরনো কাহিনী।

অচিন্ত্য হালদার আমার মেজ দেওরের সহপাঠী ও আমাদের পরিবারের একজন বিশেষ বন্ধু ছিল। অল্প বয়সেই মস্তবড় চাকরি করত একটা সাহেবী অফিসে—বিয়ে-থা করে নি, তা ছাড়া বাড়ি গাড়ি টাকা চেহারা কোন কিছুরই অভাব ছিল না তার। দোষের মধ্যে এক—অচিন্ত্য আমাকে ভালবেসেছিল। শুধু ভালবাসাটাই অপরাধ বলে গণ্য হওয়ার কথা নয়, অচিন্ত্য কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল অনেকদূর। চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী অচিন্ত্যর এ বাড়িতে একদিন চা খেতে আসা ক্রমশঃ ছুটিছাটায় আড্ডা দিতে আসায় পর্যবসিত হল এবং তা-ও অবশেষে ছুটির দিনের বন্ধন মানতে অস্বীকার করল। লক্ষ্য আমিই, কারণ অচিন্ত্য প্রায়ই এমন সময় আসত যখন বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে কিংবা চুপ করে আমার সামনে বসে থেকেও আশ মিটত না তার। আমি গোড়া থেকে শক্ত হলে হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত। কিন্তু কিছুটা দুর্বলতা আমারও ছিল। আমার মধ্যে কী অসাধারণত্ব অচিন্ত্য দেখেছিল জানি না, আমার মনে হচ্ছে রজতবাবু, আপনিও সেই একই মরীচিকার পেছনে ছুটছেন। যাই হোক, অচিন্ত্যর আসা-যাওয়াটা ক্রমে গা-সওয়া হয়ে গেল। আমার স্বামী কাজ-পাগলা গম্ভীর মানুষ, এ বিষয়ে কোনদিনই মুখ ফুটে কিছু বলেন না, বরং খুশীই মনে হত তাঁকে। একটু-আধটু গল্পগুজব করে আমি প্রফুল্ল থাকলে তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। যদি কোনদিন দৈবাৎ আমাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবেন স্থির করেছেন তো অমনি অচিন্ত্যকে খবর দেওয়া চাই। স্বামীর এই উদারতা আমার ভাল লাগত।

বছর চারেক অচিন্ত্যর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একদিন অচিন্ত্য প্রস্তাব করল তার সঙ্গে সিনেমায় যেতে হবে। আমি বললাম, তা হয় না অচিন্ত্যবাবু। জিনিসটা যত সহজ মনে করছেন আসলে এটা ততটাই শক্ত। আমি আপনার সঙ্গে সিনেমায় যেতে পারব না।

অচিন্ত্য অনেক সাধাসাধি করল। ব্যাপারটা এমন কিছু অশাস্ত্রীয় নয়। অচিন্ত্যর পীড়াপীড়িতে আমাকে সেদিন যেতে হল। কিন্তু সেই-ই হল কাল। এর পর থেকে অচিন্ত্য প্রায়ই এটা-ওটা সিনেমা-থিয়েটারের টিকিট

কেটে নিয়ে আসে। যেতে না চাইলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। আমারও হল মুশকিল। জাত দিয়েছি একবার সুতরাং ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে না। এবং বলা বাহুল্য অচিন্ত্যর আচরণেও কোন দোষ আমি দেখতে পাই নি। তবু যেদিনই যাই কোথাও, ফিরে এসে ভাবি আর কাল থেকে নয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

আমার স্বামীকে কিছু কিছু বলতাম। তিনি মুখে কোনদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। বরং উৎসাহই দিয়েছেন : ভালই তো, একটু-আধটু রিক্রিয়েশন, আউটিং জীবনে তো এ সবের দরকার আছেই। আমার নিজের যখন একেবারেই সময় হয় না তখন নির্ভরযোগ্য বন্ধুর ওপর সে দায়িত্ব দেওয়া যায় বইকি।

অচিন্ত্য তার সাধনায় অটল রইল। তাকে কত বোঝাতাম, অফিস থেকে আপনার চাকরি যাবে যে, দিনরাত এখানে আমার আঁচলের আড়ালে বসে থাকাটা তো আপনার ডিউটি নয়।

সে মুচকি হেসে বলত, চাকরি যাক না, আমি নিজেই একটা অফিস খুলব।

মেঘে রোদে আলোয় ছায়ায় প্রায় চারটি বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে আমার দ্বিতীয় সন্তান খুকু কোলে এসেছে। সরকারী চাকরিতে আমার স্বামী তরতর করে উঠে যাচ্ছেন উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে। বড় ছেলে খোকার বয়স প্রায় দশ হয়ে এল। আমারও ত্রিশের কোঠায় ঢুকতে আর একটা কি দুটো বছর বাকি। খোকার আবদার, খুকুর বায়না, স্বামীর নিরাসক্তি এবং অচিন্ত্যর উৎপাত সহ্য করে একভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। একদিন অচিন্ত্য দুপুরে এসে হাজির—হাতে দুখানা সিনেমার টিকিট।

যথাসাধ্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললাম, যাব না।

অচিন্ত্য কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, ইংরেজী একটা অদ্ভুত ভাল ফিল্‌ম মাত্র কদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছে, এটা যেতেই হবে।

আমার কাছে কোলের মেয়েটিকে সমর্পণ করে অচিন্ত্যর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম সেই কাঠফাটা রোদের মধ্যে। পৌঁছলাম চৌরঙ্গীর একটা অভিজাত হাউসে।

সেইদিন সিনেমাতে পাশাপাশি বসে প্রথম আমি অনুভব করলাম, অচিন্ত্যর সঙ্গে আমার দেহের ব্যবধান যতটা থাকা উচিত তার চেয়ে অনেক কমে গেছে। গায়ে গা ঠেকল কয়েকবার, কিন্তু কিছু বললাম না।

সিনেমার শেষে অচিন্ত্যর গাড়িতে উঠে বাড়ি ফিরব, সে ঝোঁক ধরল একটু গঙ্গার ধারটা ঘুরে যাব। বললাম, চলুন।

সেদিন সেই সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে মোটরে হাওয়া খেতে খেতে আত্মজ্ঞানশূন্য অচিন্ত্য কি কথা বলেছিল বা কি করেছিল তার ফিরিস্তি দেবার দরকার নেই রজতবাবু, তবে অচিন্ত্য তার স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করে গিয়েছিল অনেকখানি। খিদিরপুর ডক এরিয়ার কাছাকাছি একটা চক্কর মেরে গাড়ি আবার গঙ্গার কিনারা ধরে চলবার চেষ্টা করছে—অচিন্ত্যর একটা হাতের মধ্যে আমার একখানি হাত ধরা, তার হাত কাঁপছে। মুখের কথা অসংলগ্ন। আমি সোফারকে বললাম, গাড়ি সোজা ভবানীপুরের দিকে নিয়ে চল।

বাড়ি ফিরে অচিন্ত্যর জন্যে নানারকম খাবারের ডিস সাজালাম। চায়ের পট থেকে চা ঢালবার আগে ডিসটি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, খাবারগুলো খান।

অচিন্ত্য সামান্য কয়েকটা টুকরো মুখে দিল। বোধ হয় তার খাবার ক্ষমতাও সে সময় ছিল না। চা খেতে খেতে তাকে বললাম, অচিন্ত্যবাবু, আমার ভুলের মাসুল আজ আমি সম্পূর্ণ দিয়েছি। এর পর আর কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, ইচ্ছাও নেই। ভবিষ্যতে আপনিও আমার কাছে আর কিছু আশা করবেন না। আপনার সঙ্গে চিরাচরিত পন্থায় নরনারীর গতানুগতিক সম্পর্ক স্থাপন করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই তা বোধ হয় আপনি এতদিনে বুঝেছেন। সুতরাং অনুগ্রহ করে আমার জীবন থেকে যদি নির্বাসিত হন তো কৃতার্থ হই। আপনার অনুমানে একটু ভুল হয়েছে, নিজের সংসার ও পরিবেশ সম্পর্কে আমি একেবারে উদাসীন নই। আপনাকে

সাহচর্য দিয়ে আমার যেমন সুখ তেমনি পারিবারিক দায়িত্বও রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। তবে নিছক বন্ধুত্বের দাবিতে যদি কোনদিন এখানে আসেন তো খুশী হব অচিন্ত্যবাবু। নইলে জীবনের কঠোর সত্যকে নাটকায়িত করে তোলার প্রয়োজন তো দেখছি না।

অচিন্ত্য অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। চায়ের পেয়ালা খালি হয়ে গিয়েছিল। বললাম, আর একটু গরম চা দেব ?

অচিন্ত্য ঘাড় নাড়ল। পুরো এক কাপ গরম চা ঠিক এক চুমুকেই খেয়ে ফেলল সে। আশ্চর্য! তারপর সোজা উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, আমি লজ্জিত অলকা দেবী।

সিঁড়ি দিয়ে সে যখন নীচে নামছে আমার স্বামী তখন বাড়ি ঢুকছেন। নীচেই দুজনের দেখা হল। অচিন্ত্য চলে গেল।

উনি ওপরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, অচিন্ত্যকে আজ একটু ক্লান্ত আর গম্ভীর দেখলাম যেন। কোথাও গিয়েছিলে নাকি ?

বললাম, সিনেমায় আর গঙ্গার ধারে। ছবিটা হয়তো ওর ভাল লাগে নি।

অচিন্ত্যর সঙ্গে সেই শেষ দেখা। তারপর আর একদিনও এ বাড়িতে সে আসে নি। শুনেছি অনেকদিন হল বোম্বাইয়ে গিয়ে বাস করছে। বিয়েও করেছে নাকি।

রজত যেন প্রায় সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিল অলকার কথা শুনতে শুনতে। অলকা থামতে বলল, এইখানেই গল্প শেষ হল তাহলে। এবারে একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন। গলাটা শুকিয়ে গেছে, বোধ হয় আপনারও।

অলকা লজ্জিত ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চা খেয়েই রজত বিদায় নিল। অচিন্ত্য হালদারের কাহিনী বা অলকার মানসিক বিপর্যয় সম্পর্কে কোনও উদ্বেগই প্রকাশ করল না। নিজে যা বলতে চেয়েছিল তাও বলা হল না তার। মামুলী দু-চারটি কথা সেরে যাবার সময় বলে গেল, পরে সময়মত টেলিফোন করব।

অলকা ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা।

রজত চলে যাবার পর অলকা অনেকক্ষণ বসে রইল সেইখানে—সেই চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে। আধকাপ চা তখন জুড়িয়ে জল হয়ে এসেছে। অলকার দৃষ্টি কিন্তু স্থির নিবদ্ধ ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপরে রাখা একগুচ্ছ বর্ণাঢ্য কাগজের তৈরি ফুলের দিকে। চমৎকার ফুলগুলি করেছে, নষ্ট হবে না কোনদিন।

নিজের জীবনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে অনেক সময় পেরিয়ে গেল। একসময় অলকার মনে হল চোখের কোণটা যেন ভিজে ভিজে লাগছে। হাত দিয়ে দেখল দুটি শীর্ণ জলরেখা গড়িয়ে পড়েছে দুই গণ্ড বেয়ে। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখটা মুছে নিল।

শোবার ঘরে এসে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল এবার অলকা। উজ্জ্বল টিউব-লাইটের আলোয় কখনও একটু দূর থেকে কখনও বা আয়নার গায়ে মুখটি লাগিয়ে নানাভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল নিজেকে। কই, না তো! বয়সের কোনও ছাপই তো তার মুখে পড়ে নি! যৌবনের বাঁধুনি তো এতটুকু শিথিল হয় নি! আশ্চর্য! ফোলা ফোলা গাল দুটিতে এবং ওষ্ঠাধরে এখনও কিছুটা লালিমা দেখা যাচ্ছে। একটি রেখা পর্যন্ত পড়ে নি মুখে। এতটুকু কুঞ্চিত হয় নি দেহচর্ম। একরাশ কালো চুলের অরণ্যে বিন্দুমাত্র রূপোলী আভাস জাগে নি।

অথচ বয়স তো আর ক বছরেই চল্লিশ ছুঁয়ে বসবে।

আচ্ছা, অচিন্ত্যর কাহিনী আজ শোনার পর রজত কি আর তার জীবনে থাকবে! কি দরকার ছিল অচিন্ত্যর কথা ওকে বলার! নিজের মনে একটা ধিক্কার জাগল অলকার। রজত যদি আর না আসে! রজত যখন থাকবে না, সেই সেদিন—

মিসেস অলকা মিত্র বসে বসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে লাগল। চোখের সামনে ফুটে উঠল তৃণচিহ্নহীন একটা মরুপ্রান্তরের ছবি।

রজত চৌধুরীর মনস্তত্ত্ব আরও একটু জটিল, একটু যেন এলোমেলোও বটে। মেজাজটা উগ্র রোমান্টিক। পেশা

চাকরি হলেও সেটা খানিকটা শখের বলা যায়। কলকাতায় পৈতৃক দুখানি বাড়ির ভাড়া থেকে যা আয় হয় সংসার প্রতিপালনের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। তবু রজত একটা চাকরি নিয়েছে। লোকের কাছে বলে অবসরবিনোদনের সদিচ্ছায়। কিন্তু তার আসল পরিচয় সে সাহিত্যপ্রেমিক। রজতের মত একজন বিচক্ষণ ও দরদী সাহিত্যসমালোচক অত্যন্ত দুর্লভ। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তার বহু রচনা তাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ছাড়া শিল্প-কলায় সঙ্গীতে তার গভীর অনুরাগ। সংসারে মা, তিনটি ছোট ভাইবোন, স্ত্রী ও একটি সন্তান তার পোষ্য। পারিবারিক জীবনে রজত সুখী।

অলকার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল এক ইংরেজ বেহালাবাদকের বাজনা শুনতে গিয়ে। পাশাপাশি সীট পড়েছিল দুজনের। হলের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই সাহেব, দু-চারজন মাত্র এদেশী লোক। পরিচয় হয়েছিল দুজনের সহজ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে। প্রথম দিনেই রজতের শিল্পীমন দারুণ একটা উন্মাদনা বোধ করেছিল অলকার সান্নিধ্যে। অলকার ব্যক্তিত্ব তো বটেই, সুমার্জিত কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়েছিল রজত। অলকাও আকস্মিকভাবে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের বাড়িতে। তারপর থেকে অলকা গভীর আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। সাহিত্য-শিল্প নিয়ে অলকা চর্চা করে যথেষ্ট, তা ছাড়া সঙ্গীতের ব্যাপারে তার একটা স্বাভাবিক দক্ষতাও আছে। সুতরাং দুটি সমধর্মী মন পরস্পরকে আশ্রয় করল অতি সহজেই।

ক্রমশঃ বাস্তব জীবনের নানা দিক তাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল পরিপূর্ণ সত্যরূপ নিয়ে। অলকা জানল রজতকে, রজত জানল অলকাকে। বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠল।

রজতের কোনও বিষয়ে গোঁড়ামি নেই। পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক শাসন সবকিছুর সম্পর্কেই তার একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী আছে। আর তারও ওপরে আছে যুক্তিবাদী তীক্ষ্ণ একটি মন। যা সে ভাল বুঝবে তা করবে দ্বিধাহীন চিত্তে।

রজত কদিন অত্যন্ত চিন্তাকুল এবং বিমর্ষ হয়ে রইল। বোঝা গেল গভীর একটা তত্ত্ব নিয়ে গভীরতর চিন্তায় সে ব্যস্ত। দৈনন্দিন বাঁধা কাজের বাইরে আর কিছুতে তার আগ্রহ নেই।

দেখতে দেখতে প্রায় দু সপ্তাহ কেটে গেল। অলকার সঙ্গে এর মধ্যে আর যোগাযোগ ঘটে নি তার। একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর যেন কে তুলে দিয়েছে তাদের মাঝখানে। অচিন্ত্য হালদার? মাঝে মাঝে নিজের মনেই ভাবে রজত। রজত জানে সে নিজেও যেমন, অলকাও তেমনি ব্যাকুল হয়ে আছে। দুটি শুধু মুখের কথা—এর বেশি তারা তো আর কিছুই চায় না। তবে অলকার এই ভাবান্তর কেন হল! রজত ভাবতে থাকে।

দক্ষিণের বারান্দায় সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে একটা মোড়ার ওপর বসে ছিল অলকা। অন্ধকারটা জমাট হয়ে নামবার আগেই দূরের বাড়িগুলো কেমন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মল্লিকদের বাড়ির ছাতে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল কয়েকজন, তারাও কখন নেমে গেছে।

ঘুড়িটা অনেক উঁচুতে উঠেছিল অলকা বারান্দা থেকে বসে দেখেছে। এখন তার মনে হল ওরা চলে যাবার আগে ঘুড়িটাকে নামিয়ে নিয়ে গেছে কী! এমনও তো হতে পারে, ঘুড়িটা হয়তো আকাশে উড়ছেই। কোন দিন আর কেউ তাকে নামিয়ে আনতে পারবে না। শত-সহস্র চেষ্টাতেও নয়। অনন্তকাল আকাশের কোলে খেলা করে একদিন ঘুড়িটা ওই মহাশূন্যের শূন্যতার মধ্যেই হারিয়ে যাবে। মনে হল, রজতের সঙ্গে তার সম্পর্ক মনের সুতোয় গাঁথা হয়ে ওই ঘুড়িটার মত অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, এখন তাকে ওই কল্পলোক থেকে এই মাটির জগতে নামিয়ে আনার সাধ্য তাদের কারুরই নেই। নেই বলেই সেদিন অলকা বাধ্য হয়েছিল অচিন্ত্যর কাহিনীটা রজতকে শোনাতে। রজত

কদিন আসছে না কেন? রজতও কি তারই মত অক্ষম? না না, তা হতে পারে না।

অলকা চমকে উঠল। ঘরের আলোটা জ্বেলে ভৃত্য গোবিন্দ ডাকছে, নীচে রজতবাবু এসেছেন। দেখা করতে চাইছেন আপনার সঙ্গে।

অলকার মুখে অকারণেই রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। গোবিন্দর তা লক্ষ্য করার কথা নয়। সামলে নিয়ে অলকা বলল, তা নীচে দাঁড় করিয়ে এলি কেন? বসবার ঘরে নিয়ে আয়।

না, উনি বসবেন না বলছেন। কী একটা দরকারী কথা আছে, নীচেই বলবেন। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

অলকা বিস্মিত হল। একটু যেন অভিমানও হল তার। নীচে নেমে রজতকে দেখেই কিন্তু প্রথমটা থমকে গেল সে। এ কী চেহারা হয়েছে রজতের! এই বারোদিনে যেন বারোটা বছর বয়স বেড়েছে তার। মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সর্বশরীরে একটা গভীর ক্লান্তি ও নৈরাশ্যের ছাপ।

—এ কি চেহারা হয়েছে আপনার রজতবাবু, কি ব্যাপার? নীচে থেকেই চলে যাবেন বলছেন কেন?

রজতের দৃষ্টিটা যেন আগের চেয়ে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ বলে মনে হল অলকার। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে কেমন যেন অস্বস্তিই বোধ করতে লাগল সে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়।

রজত যেন বহু দূরের মানুষ, মনে হল বহু দূর থেকে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে অলকার কানে—আমি আজ এখনই চলে যাব অলকা দেবী। কদিন একটু মানসিক বিপর্যয় গেছে, তাই শরীরের এই দশা। আপনাকে একবার দেখতে নিতান্ত ইচ্ছে হল বলে চলে এলাম। একটা অনুরোধ করব, অবাক হবেন না। কাল বিকেলের দিকে একবার বেরুতে পারবেন? ইচ্ছে আছে গঙ্গার ধারে কোথাও গিয়ে একটু বসব। মনে রাখবেন আপনার কাছে এই আমার প্রথম অনুরোধ, হয়তো বা শেষও।

অলকা মৃদুস্বরে বলল, সেই জন্যেই আপত্তি করব না, কিন্তু হঠাৎ এই খেয়াল কেন? মনে হচ্ছে দারুণ একটা সমস্যার কিছু সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছেন!

রজত হাসল, একটু বিবর্ণ সে হাসি: বিশেষ কয়েকটা কথা বলব ভেবে রেখেছি অলকা দেবী, এবং সেটা একটু নির্জনে বাইরেই বলতে চাই। তাহলে ওই ঠিক রইল। আমি আসছি কাল পাঁচটা নাগাদ ট্যাক্সি নিয়ে।

স্বীকৃতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল অলকা। অপার বিস্ময় তখন তাকে ঘিরে ফেলেছে। রজতের গমনপথের দিকে অপলকে চেয়ে রইল সে।

ঠিক সাড়ে ছটায় দুজনে এসে পৌঁছল অপরাহ্নের ম্লান আলোয় বিষণ্ণ গঙ্গার ধারটিতে। চৌরঙ্গীর এক কোণে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে অনেকটা পথ তারা হেঁটে এসেছে। রেলিঙের পরে রেললাইন—লাইন পার হয়ে সাদা পাথরের বেঞ্চি পাতা। তারা দুজন বসল সেখানে। দেশী-বিদেশী খানকয়েক জাহাজ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু লোকের চঞ্চল আনাগোনা সেগুলিকে মুখর করে রেখেছে। এরই মধ্যে আলো জ্বলে উঠেছে জাহাজগুলির ভেতরে। এখান থেকে বসে বেশ চমৎকার লাগছে দেখতে।

রজত অপলকে সেই দিকে চেয়ে ছিল, অলকাও। সময়ের স্রোত বয়ে চলেছে নীচের ওই গঙ্গার প্রবাহের মতই। জলের স্রোতে শব্দ ওঠে, সময়ের স্রোত বয়ে চলে নিঃশব্দে। সেই শব্দহীন সময়ের স্রোতের অনেকগুলো ঢেউ খাবার পর অলকা বলল, কি বলবেন বলেছিলেন রজতবাবু।

রজতের চেতনা ফিরে এল যেন। অলকার দিকে একটু ঘুরে বসে কী একটা কথা বলতে চাইল সে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে নেমেছে, ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না অলকার মুখখানি। তবু রজতের মনে হল অলকার ওই বড় বড় দুটি চোখ এই অন্ধকারের চেয়েও অনেক বেশি কালো। ওই দুটি চোখের অতলান্ত অন্ধকারে ডুবে যাওয়াতে অনেক বেশি শান্তি।

অলকা বলল, কই, বলুন রজতবাবু।

গভীর ভাবাবেগে রজতের সমস্ত কথা যেন অবরুদ্ধ

হয়ে গেছে। তার সমস্ত শক্তি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। রজত চৌধুরীর রোমান্টিক মন চাইছে পিছিয়ে সরে যেতে।

রজত চুপ করেই রইল।

অলকার ধৈর্য আর কোন বাধা মানছে না। এক সময় অসহিষ্ণু হয়ে সে বলল, আপনার কিছু কথা আমাকে বলার ছিল রজতবাবু, আর তা শুনতেই আমি এসেছিলাম। তা যখন আর হল না তখন চলুন, ওঠা যাক।

এইবার রজত যেন একটা কঠিন আঘাত অনুভব করল তার সারা দেহে মনে। তার সমগ্র অস্তিত্বে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল। এবং সেই বিপুল সংঘাতের মধ্যে থেকে জেগে উঠল চিরকালের সেই পুরুষ-হৃদয়, যে হৃদয়ের কাছে নারীর সকল প্রশ্নের জবাব মিলেছে এতকাল, যে হৃদয়ের শান্তির নির্ঝর যুগ যুগ ধরে চিরন্তন রমণীর সকল দাহের নিবৃত্তি ঘটিয়ে এসেছে।

রজত বলল, অধীর হবেন না অলকা দেবী। আজকের এই পরিবেশে যা বলতে চাই তার অনেকখানিই হয়তো বলতে পারব না, আমার না-বলা কথা আপনার বুদ্ধি দিয়েই অনুমান করে নেবেন। সেদিন আপনি আমায় পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের কথা বলেছিলেন মনে আছে নিশ্চয়ই। আমি নিজেও বরাবর এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। আর এ কদিন আমি বিশেষ করে ওই বিষয়টা নিয়েই চিন্তা করেছি। অলকা দেবী, আমাদের দুজনের সামনে ওর চেয়ে বড় সমস্যা প্রকৃতপক্ষে আর নেই। ওই সীমারেখার বাইরে কি আমরা কিছুতেই যেতে পারি না!

অলকা বলল, আমি সেদিন আপনাকে তাই তো অচিন্ত্যর কাহিনী পুরোপুরি শুনিয়েছি। ওর কথা মনে হলেই নানা চিন্তা আমাকে পরিণাম সম্বন্ধে বড় বেশীমাত্রায় সচেতন করে তোলে রজতবাবু।

রজত এবার সোজা হয়ে বসল। বলল, সে বিষয়ে আপনার ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল অলকা দেবী। অচিন্ত্য হালদারকে নিয়ে জীবনের উজ্জ্বলতম দিকটির কথা কোনমতেই কল্পনা করা যায় না। অচিন্ত্য ব্যাচেলর মানুষ—জীবনে তার পূর্ণতা আসে নি। বিবাহিত জীবন ছাড়া এই পূর্ণতা আসতে পারে না কখনই। এই অপূর্ণ মানুষের কাছে নারী ভোগের সামগ্রী হয়েই থাকবে, ভালবাসার পাত্রী হয়ে উঠবে না কোনদিন। আপনার পরিপূর্ণ জীবনের পটভূমিতে তাই অচিন্ত্যের মত একটা অর্ধমানবের স্থান কোনমতেই হতে পারে না। অচিন্ত্য হালদারের কাল্পনিক কাহিনীর আড়ালে কি আজও আপনি নিজেকে লুকোতে চাইছেন?

অলকা চমকে উঠল। আহতস্বরে প্রশ্ন করল, অচিন্ত্যর কাহিনীটা কাল্পনিক বলে মনে করছেন কেন রজতবাবু? আমার জীবনে অচিন্ত্য সত্যিই এসেছিল।

রজতের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল: অচিন্ত্য কোনদিনই আপনার জীবনে আসে নি, আসবে না অলকা দেবী। বাস্তবের রজত আপনার দ্বিধা-শঙ্কাগ্রস্ত মনে কাল্পনিক অচিন্ত্যর জন্মদান করেছে এটুকু আমি বুঝতে ভুল করি নি। কিন্তু কেন আপনার এই অহেতুক শঙ্কা অলকা দেবী! আমরা তো জীবনে অনেক দিয়েছি। জীবনে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য যা ছিল তা আমরা তো যথাযথ পালন করেছি। তবে কেন আমরা জীবনে সহজ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব না! কেন আমরা পেছিয়ে থাকব! জীবনের কোনও একটা স্তরে কি আমরা পাশাপাশি এসে মিলতে পারব না কোনদিন? এ অধিকারটুকু যদি আমরা না অর্জন করতে পারলাম তবে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়! বাঁধা ছকের জীবন অনেকের জন্যে কিন্তু সকলের জন্যে নয়। সহস্র কিংবা লক্ষের মধ্যে কি একটিও ব্যতিক্রম হতে পারে না!

রজত থামল। অলকার স্থির উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, কথা বলব বলেই আজ এখানে এসেছি। কিন্তু দেখছি বলার কথা বেশী নেই আমার। আপনি কিছু বলবেন না অলকা দেবী?

অলকা অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল, তারপর বলল, আপনার কথাগুলো আমাকে দারুণ ভাবিয়ে তুলেছে রজতবাবু। স্বীকার করছি অচিন্ত্য হালদারের কাহিনীটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু এমন ঘটনাই কি জীবনে

স্বাভাবিক নয়! যাই হোক আমি আপনার কাছে হার মানলাম।

হার স্বীকার করে আপনি আমায় অভিভূত করলেন।—রজত বলল, জীবনে আমার অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আপনাকে হারিয়ে দেওয়ার কল্পনামাত্র নেই সেখানে—এ কথা হলফ করে বলতে পারি।

অলকা একটু থেমে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করল: গঙ্গার জলটা কেমন ঘন কালো দেখাচ্ছে বলুন তো?

আপনার ওই গভীর দুটি চোখে শুধু গঙ্গার জলের কালো নয়, আমাদের মনের সব কালিমাটুকু স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠুক এই কামনাই আজ করি অলকা দেবী। চলুন, রাত অনেক হল।

অলকা উঠল না। দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল আরও কিছুক্ষণ। পাশাপাশি দুটি মনের ভাবনা একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

একসময় রজত আবার সচেতন হয়ে ডাকল, রাত অনেক হয়েছে অলকা—

মধ্যপথেই তাকে থামিয়ে দিল অলকা: দেবী নয়, আজ থেকে তোমার কাছে আমি অলকা রজত। আজ আমরা অনেক কাছাকাছি এসে গিয়েছি, না?

মন্ত্রমুগ্ধের মত রজত বলল, হ্যাঁ অলকা।

অলকার স্বর অত্যন্ত করুণ শোনাল: আমরা কেন নিজেদের বঞ্চিত করব রজত! নিয়মের কঠিন বন্ধনে চিরদিন বাঁধা পড়ে থেকে নিজেদের ব্যক্তিসুখকে কেন বিসর্জন দেব! আমাদের ভালমন্দ আমরা কেন বুঝব না, তার জন্যে অন্যের দিকে চাইবার দরকার আমাদের কেন হবে? রজত, আমরা এতদিন অনেক ভুল করে এসেছি, তাই না?

আমরা অনেক বড় ভুলের হাত থেকে বেঁচেছি অলকা।—রজত গাঢ়স্বরে উত্তর দিল।

* * *

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তারা দুজন এগিয়ে চলেছিল চৌরঙ্গীর আলোকোজ্জ্বল সমারোহ লক্ষ্য করে।

রজত বলল, অলকা, তোমার কল্পনার অচিন্ত্য চেয়েছিল তোমার দেহটাকে আর আমি চেয়েছি তোমাকে। আমাদের তফাত তো এইখানেই।

অলকা যেন স্বপ্নের মধ্যেই উত্তর দিল, হ্যাঁ রজত, তোমার কথাই ঠিক।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিল সারি সারি গাছের নীচে গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত মসৃণ পথের বুক চিরে। অলকার একটা হাত রজতের হাতের মধ্যে।

এই অন্ধকারের মধ্যে আমার পাশে হেঁটে যেতে তোমার কেমন লাগছে অলকা?—রজত প্রশ্ন করল।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই তো এতটা পথ হেঁটে এলাম রজত। তবু মন্দ লাগছে না। কারণ অন্ধকার প্রায় শেষ হয়ে এল, ওই তো সামনেই অনেক আলোর মেলা।

একটা আলোকিত জায়গায় এসে পৌঁছল তারা। অলকা একবার চকিতে চেয়ে দেখল রজতের দিকে। তারপর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে চলতে লাগল দুজনে।

একসময় অলকার চোখে পড়ল রজতের মাথার ওপরে একটি দেবদারু গাছের পাতা—কখন ঝরে পড়েছে, রয়েই গেছে।

সেই পাতাটিকে পরম স্নেহে নিজে হাতে নিয়ে অলকা বলল, এটা তোমার জয়ের প্রতীক রজত, অচিন্ত্যর হার হয়েছে তোমার কাছে। এটিকে যত্ন করে রেখে দিয়ো।

গভীর আবেগে সেই পাতাটিকে অলকার হাত থেকে নিজের হাতে নিল রজত।

তারপর পথ চলতে চলতেই একটু হাসল। হাসল অলকাও।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

শীতাংশু মৈত্র

নয়

কিন্তু এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, উপন্যাসে শুধু নরনারী-সম্পর্কের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি প্রতীচ্যমুখী; বরং এ কথা মনে করার প্রভূত যুক্তি রয়েছে যে, উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষার প্রতীচ্যময়তা সবচেয়ে বেশী প্রকট। যে উপন্যাসগুলিতে নরনারীর সম্পর্কই প্রধান উপজীব্য, যেমন চোখের বালি, নৌকাডুবি, দুই বোন, শেষের কবিতা, চতুরঙ্গ—সেগুলিতেও আর যে একটি জিনিস লক্ষণীয় সেটি হল রবীন্দ্রনাথের হিউম্যানিজম। সে মানব-প্রীতি শুধু নারীকেই যে নতুন ব্যক্তিমূল্য দিতে চাইছে তাই নয়, সে মানুষমাত্রেরই অধিকারে এবং বাঁচার দাবিতে আস্থাশীল। তাঁর কাছে 'A man is a man for a' that' (কালান্তরে উদ্ধৃত)। এ দাবি এতখানি পরিমাণে বঙ্কিম মানতে পারেন নি; তিনি রক্ষণশীলতার সঙ্গে আপোস করেছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তার এটি একটি প্রধান কারণ। "বাস্তব" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন: "বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেন না স্বামীর প্রতি হিন্দু রমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তাহা তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়।"

রবীন্দ্রনাথও যে এককালে রক্ষণশীল ছিলেন না তা নয়। এ কথা বললে সত্যভাষণই হবে যে, প্রথম যৌবনের কিছুকাল তিনি সনাতনীই ছিলেন। সেই কালে তিনি রামমোহন রায়েরও মহত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে "তিনিই হিন্দুধর্মের জীবনরক্ষা করিয়াছেন।" খ্রীষ্টীয় বিপ্লব ঠেকানোই নাকি রামমোহনের প্রধান কীর্তি। সে সময় তাঁর কাছে "ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম।" তিনি যে তারস্বরে মেঘনাদবধ কাব্যের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন ১৮৮২ সনে, তারও মূলে এই প্রথম যৌবনের অতিশয়িত ঐতিহ্য-প্রবণতা। তাঁর মতে মধুসূদন যে অন্যায় করেছেন তার কারণ তিনি ভারতীয় হিন্দু-ধর্মের আদর্শের মর্যাদা এবং মহত্ত্ব না বুঝে পৌরুষ আর দম্ভকেই পূজা করেছেন—এমন কি রামায়ণকে বিকৃত করতেও দ্বিধা করেন নি। প্রথম যৌবনের অতি-ভাষণের পর্যায় অতিক্রম করার পরেও যে তিনি মাঝে মাঝে, যেমন স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে, সনাতন প্রাচ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নি তা নয়। ১৮৯২ সনেই তিনি লিখেছেন:

"আমাদের পরিবারে নারীহৃদয় যেমন বিচিত্রভাবে চরিতার্থতা লাভ করে এমন ইংরেজ-পরিবারে অসম্ভব। এইজন্যে একজন ইংরেজ মেয়ের পক্ষে চিরকুমারী হওয়া দারুণ দুরদৃষ্টতা। তাদের শূন্য হৃদয় ক্রমশ নীরব হয়ে আসে, কেবল কুকুরশাবক পালন ক'রে এবং সাধারণ হিতার্থে সভা পোষণ করে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করে।...আমাদের বিধবার নারীপ্রকৃতি কখনও শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনও শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনও অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনও উদাসীন থাকে না।...বরং একজন বিবাহিত রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে, কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদ্বৃত্ত থাকতে প্রায় দেখা যায় না।" (অবশ্য হৃদয় এত ভরা থাকলে কেন যে বিদ্যাসাগর মশাই তাদের দুঃখে এত বিচলিত হয়েছিলেন তা বোঝা দুষ্কর। কিন্তু

সে কথা পরে।) তারপরে আবার ঐ একই প্রবন্ধে বলছেন, "এ কথা বলতেই হয় ইংরেজ স্ত্রীলোক অশিক্ষিত থাকলে যতটা অসম্পূর্ণ-স্বভাব থাকে আমাদের পরিপূর্ণ গৃহের প্রসাদে আমাদের রমণীর জীবনের শিক্ষা সহজেই তার চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করে।"

[প্রাচ্য ও প্রতীচ্য]

কিন্তু কই সেই সম্পূর্ণাঙ্গী প্রাচ্যা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে? তাঁর উপন্যাসে যারা ভিড় করে এল তারা সকলেই প্রাণোচ্ছল, গতিশীল, বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিসত্তা, নানাভাবে খণ্ডিত উদ্বেজিত ব্যাহত আবার কচিৎ বা সমাহিত। বৈচিত্র্যময় মানুষের বিচিত্র সত্তার স্বীকরণ পশ্চিমী হিউম্যানিজম্ থেকেই এসেছে—সেই হিউম্যানিজম্ থেকে যা Measure for Measure-এর Angeloকে স্বীকার করে, Prosperoকে স্বীকার করে আবার Macbeth, Iagoকেও স্বীকার করে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে শেক্সপীয়ারের বিস্তার এবং সর্বগ্রাহিতা রবীন্দ্রনাথে নেই। তিনি শেক্সপীয়ারের চেয়ে অনেক বেশী Selective বা বাছবিচার-পরায়ণ। তিনি শেক্সপীয়ারের Othello সহ্য করতে পারতেন না; ইয়াগোর মত চরিত্র বা Measure for Measure-এর Claudio-র জীবনের ঘটনা বা Pericles-এর Brothel Scene তিনি আঁকেন নি বা আঁকতে পারেন নি। তবু যে সীমার মধ্যে তিনি বিচরণ করেছেন তা বঙ্কিমী চতুঃসীমাকে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে বাংলা সাহিত্যকে। একদিকে চারুলতা, বিনোদিনী, ললিতা, বিমলা, দামিনী, লাবণ্য, এলা—অন্যদিকে আশা, কমলা, মেজরাণী, বড়ো রাণী, যোগমায়া—আবার হেমনলিনী, সুচরিতা, তার ওপর আনন্দময়ী; বেহারী, নলিনাক্ষ, নিখিলেশ, পরেশবাবু, সন্দীপ, বিনয়, অতীন, গোরা, অমিত রায়। জীবনের বহু বৈপরীত্য, বহু অসামঞ্জস্য, অনেক আশা আরও অনেক বেশী ব্যর্থতা দিয়ে গড়া জীবনের রাসলীলা এই নরনারীর মিছিল। বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্ত-বিষবৃক্ষের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে এরা জীবনের বড় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আপনাদের স্থান নির্বাচন করে নিতে চায়, এদের ঐহিকতা ও মর্তপ্রীতি, এদের জীবনতৃষ্ণা এবং চলমানতা—এ সবের কোন ঐতিহ্য প্রাচ্যের সাহিত্যে ছিল না; জীবনেও ছিল না, এল রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে।

এই জীবনতৃষ্ণার বীভৎস প্রকাশ 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে। Ibsenএর ghostরা মানুষকে আশ্রয় করেই বাঁচে; তারা heredity বা বংশধারার অস্বাস্থ্যকর উপাদানগুলির ধারক। মানুষের চরিত্র-পরিবর্তনের পথে তারা বাধা। মানুষ তাই নিজেই নিজের শত্রু। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের অশরীরীরা অতৃপ্ত মর্তপ্রেমের অস্থিরতায় শুস্তার স্থির জলতলকে অপ্সরীর কেশদামের মত কুঞ্চিত করে তোলে; তাদের ছায়াসর্বস্ব লাবণ্যবিলাসে পুরনো প্রাসাদ শিহরিত হয়ে ওঠে; তারা মর্তের জীবের প্রাণরসটুকু শুষে নিয়ে এক অদ্ভুত প্রতিজিঘাংসা চরিতার্থ করে। তারা যা পায় নি, যে জীবন থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে তা অন্যেরা কেন ভোগ করবে—এই তাদের দুর্জয় ক্ষোভ। ওই প্রাসাদের প্রতিখানি পাথর তাদের অতৃপ্ত কামনার আক্ষেপে সারা রাত্রি থরথর করে। কোন মানুষ সেই প্রাসাদে থাকলে হয় জীবন হারায়, নয় মাথা।

কিন্তু ওই যে তৃষ্ণার্ত ছায়াগুলি, যারা যে মর্তকে হারিয়েছে তারই জন্যে পাগল, তারা মৃত্যুর পরেও এই মর্তের চেয়ে শ্রেয়ান কিছু পায় নি, পাবার আশাও রাখে না। এই মর্তভূমির যে ক্ষুদ্র অংশটুকুকে তারা চিনেছিল সেই প্রাসাদটুকুকে ঘিরেই তাদের অবিরাম যাওয়া আসা।

যদি বলা যায় ওই তৃষ্ণাতুর ছায়াগুলি আর কেউই নয়, ওরা যুগযুগান্তের পথিপার্শ্বস্থিত চিরায়মান মানবাত্মা—আমাদের জানিয়ে দিতে চায় যে তারা জীবনে কিছুই পায় নি, শুধু চেয়েছে; শুধু চাওয়াটাই একমাত্র সত্য, পাওয়াটা নয়; শুধু আর্তনাদই করা তাদের ভাগ্য। তারা জানিয়ে দিতে চায় যে 'It is an ancient tale of wrong.' ক্ষুধিত পাষাণের কাহিনী আমাদেরই কাহিনী। আমাদেরই বঞ্চিত, হাত-ফসকে-যাওয়া জীবন আমাদের বহুযুগের স্মৃতি-ভারাক্রান্ত মনে যে বেদনার আক্ষেপ সৃজন করে 'ক্ষুধিত-পাষাণ' তারই কাহিনী। তা যদি না হত তাহলে কেবল প্রেতের নৈশ আবির্ভাবের কাহিনী পড়ে আমরা এমন গভীর নাড়া খেতাম না। এ যেন চেকভের সেই "ঘুমো" গল্পের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়

পরিবেশে প্রেতের চুমোতে রূপান্তরিত করলেন। প্রেত, সে কিছুতেই মানুষের জগৎকে পায় না আর মানুষ কিছুতেই মোহিনী ছায়াকে পায় না। চেকবের গল্পে এই পারম্পরিকতা নেই এবং না থাকারও অর্থ আছে। পারম্পরিকতা থাকলে চুমোতেই চুমোর শেষ হত; ওই একটি ঘটনা জীবনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা এবং লোভনীয়তাকে প্রতিবিম্বিত করতে পারত না।

উনিশ শতকে যখন ধনীগৃহের প্রাসাদের বিলাসের উজ্জ্বলতায় নির্ধনেরা সম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে দিত, যখন সে ঐশ্বর্য ঈর্ষা জাগাত, ঘৃণা জাগাত না, সেই সময়ে ফ্রন্ট থেকে গৃহাভিমুখী, সেই গ্রামে সাময়িক আশ্রয়-প্রার্থী একদল সৈনিককে, সেই গ্রামেরই অলঙ্কারস্বরূপ এক অবসৃত জমিদার, একদিন রাত্রে ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। নিজেদের সম্বলের মধ্যে যা ছিল তাই পরে, সুবাসিত হয়ে, সৈনিকেরা বনপথ দিয়ে অগ্রসর হতে হতে দূর থেকে সেই গৃহের আলোকসজ্জা দেখে, মথের মত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। উপস্থিত হল এসে সেই প্রাসাদের প্রশস্ত নৃত্যকক্ষে—নৃত্য কিন্তু মুখোশপরা। যারা নাচে আগ্রহী নয় তারা, আরও বহু উন্মুক্ত কক্ষের যে কোনটিতে অন্য যে কোন প্রমোদে নিযুক্ত হয়ে পড়ে। একজন সাধারণ সৈনিক ঘুরতে ঘুরতে একটি ঘরে এসে দাবাখেলা দেখতে মশগুল। সে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যেতে গিয়ে অসংখ্য ঘরের মধ্যে পথ হারিয়ে এক অন্ধকার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়; দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে পথভ্রান্ত হয়ে। হঠাৎ নারীসজ্জার খসখস শব্দে এবং সৌরভে ঘর ভরে যায়। দুটি বাহু সৈনিককে জড়িয়ে ধরে; তার মুখে পড়ে সাগ্রহ চুম্বন। তারপরেই অন্ধকার ঘর থেকে চকিতে সে মেয়েটির অন্তর্ধান।

সৈনিক সারাজীবনের প্রায় অর্ধেক খুঁজে তাকে পায় না; শেষে একদিন সেই শূন্য প্রাসাদের সামনে, শুষ্ক নদীতে এক পুলের ওপর দাঁড়িয়ে, চূড়ান্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বোঝে, এর পেছনে ছুটলে পরিণতি হচ্ছে উন্মত্ততা।

'ক্ষুধিত পাষাণে'র নায়কও মরণাপন্ন। অশরীরী মোহিনী আর অন্ধকারে চুম্বনদাত্রী—মূলতঃ এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। চেকবের কিন্তু গল্পের নায়ক-নায়িকা মানুষ বলে এবং ঘটনা মানবীয় স্তরে সীমাবদ্ধ বলে তাঁর কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট উপস্থাপিত হয়েছে, আর রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে পরোক্ষ উপায়ে; কিন্তু ব্যঞ্জনার দিক থেকে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ আরও সার্থক। 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়ে কি মনে হয় না যে, যে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' অথবা 'প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে, ভালবেসিয়াছি' সেই রবীন্দ্রনাথই বলছেন, এ জীবন-পিপাসা যাবার নয়, এ যায় না; অপস্রিয়মান মানবাত্মা শুধু বলতে পারে:

> আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
> ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
> এপারের ভালবাসা। বিরহস্মৃতির অভিমানে
> ক্লান্ত হয়ে, রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

মর্ত-কেন্দ্রিক এই বিশ্ববীক্ষা উপন্যাসে যেমন বহু-বিপুল চরিত্র সৃষ্টি করেছে, তেমনি করেছে ছোটগল্পে। এমন নিরাসক্তভাবে চরিত্র ও ঘটনাসৃষ্টি বিশ্বের সাহিত্য-সৃষ্টির ইতিহাসে বিরল। এই নিরাসক্তিই তো শিল্পীর একান্ত কামনার ধন। যে শিল্পী বিষয়ের মধ্যে, আপন আবেগের বা বাসনার চরিতার্থতা খোঁজে সে শিল্পীর চেতনা খণ্ডিত, তার সৃষ্টিও খণ্ডিত, রসাভাস-দুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের এই impersonality বা অনাসক্তিই তাঁকে দিয়ে সন্দীপ, বিমলা বা মধুসূদনকে সৃষ্টি করিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সচেতন মনে যে বিশ্ববীক্ষা আপন বিশাল ছায়া বিস্তার করে বসে আছে তা হল 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। মা গৃধ।" এই যে প্রাচ্য চেতনা, যা হাত বাড়িয়ে গ্রাস করতে নিষেধ করে, যা ত্যাগ করতে বলে, এটি রবীন্দ্রচেতনার মূলীভূত সত্য হলেও, ইহমুখী চেতনার তীব্রতাও কবিমানসে মোটেই কম নয়, এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর চেতনার এই দিকটিরই অকুণ্ঠ প্রকাশ।

পশ্চিমী ইহকেন্দ্রিক চেতনার শেষ কথা chauvinism নয়, internationalism, কেন না, জাতিবৈর ঐহিক জীবনের শ্রেষ্ঠ স্তরে পৌঁছানোর পথে বাধা, জাতি-বৈর মানবিকতার পরিপন্থী, জাতিবৈর একটা গোটা জাতকে অমানুষ করে দেয়। আবার আক্রমণাত্মক জাতিবৈর ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মাবার সুবিধা না পেলেও,

এখানে ছিল এবং এখনও আছে জাতিভেদ, (জাতি কথাটিকে এই আলোচনায় nation বা group বা race যে কোন অর্থে নেওয়া চলে) পারস্পরিক ঘৃণা, এবং চূড়ান্ত অনৈক্য ও স্বাতন্ত্র্য। যদিও ভারতবর্ষে ইউরোপীয় imperialism-এর জন্ম হয় নি তবু এই অযৌক্তিক, জীবনদ্বেষী আচারপুঞ্জ মানুষকে মানুষের মূল্য দিতে অস্বীকার করেছে। পশ্চিমী যুক্তিবাদ ও হিউম্যানিজম্‌ ভারতীয় জীবনের এই নিষ্ঠুরতা এবং অর্থ-হীনতা মধু-বঙ্কিমের কাছেই প্রকট করেছিল; রবীন্দ্রনাথে এসে, আর কোন আপোসরফার মনোবৃত্তি প্রশ্রয় না পেয়ে, তারা 'গোরা'-তে চূড়ান্ত আঘাত পেল। ভারত-বর্ষে পশ্চিমী nationalism জন্মাবার আগেই, এবং পশ্চিমী imperialism-এর কোন সম্ভাবনা না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ nationalism, অন্ধ-আচারপরায়ণতা এবং মানবতা-বিরোধী সর্বপ্রকারের সামাজিক ভেদবুদ্ধিকে এক পদক্ষেপে অতিক্রম করে, 'গোরা'-তে এসে পৌঁছালেন। এটি ঘটল ১৯০৫ সনের স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার পরেই এবং রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনে পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করে ফিরে আসবার পর। 'গোরা' উপন্যাসের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ আর কিছুই রেখে-ঢেকে বললেন না:

"গোরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—আনন্দময়ী তাঁহার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন।

গোরা আসিয়াই তাঁহার দুই পা টানিয়া লইয়া পায়ের উপর মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুই হাত দিয়া তাহার মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন।

গোরা কহিল, 'মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।

'মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে।'"

এর আগেই গোরা পরেশবাবুর কাছে বলেছে, "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।" 'গোরা'য় রবীন্দ্রনাথ এক নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখছেন। দুঃখের বিষয় এই যে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী হল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষ আজ যেন সত্যিই স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

সে ভারতবর্ষকে যে চাইলেই পাওয়া যাবে না, তার জন্যে যে প্রত্যেককে মূল্য দিতে হবে, 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'—এ কথা আমরা আজও স্বীকার করছি না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইখানেই গান্ধীজীর মত মেলে নি। গান্ধীজী সত্যাগ্রহের কথা বলতেন, আত্মিক শুদ্ধির কথা বলতেন, মেশিন ছাড়িয়ে চরকা ধরিয়ে স্বরাজ এনে দেবার কথা বলতেন। কিন্তু আত্মিক শুদ্ধির পন্থা যে অহিংসা, তা কেমন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে, বিশেষ করে অপর পক্ষের অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তা লোকে বুঝে উঠতে পারে নি; তাই চৌরিচৌরা ঘটেছিল। আর চরকা ধরলে যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না তা আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষেই প্রমাণিত। ১৯০৫-এর 'বয়কট' আন্দোলনকেও গান্ধীজী পরে প্রয়োগ করেছিলেন রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে। তারও কোন প্রত্যক্ষ তাৎকালিক ফল দেখা যায় নি। বরং সেই বিলিতি কাপড় পোড়ানোর মধ্যে দিয়ে নিজেদের যে দুর্বলতা, ঈর্ষা এবং ভাঙবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়েছিল তার দিকে বারে বারে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। রাজনৈতিক আন্দোলন হঠাৎ কায়দা করে ফললাভ করতে চায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই ফাঁকি দিয়ে ফল পাবার ফাঁকি ধরা পড়েছিল। তাই আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা সেই ফাঁকির চূড়ান্ত মূল্য দিচ্ছি জীবনের সর্বাঙ্গীণ অধোগতিতে। ১৯০৫-এর আন্দোলন থেকে দূরে সরে এসে রবীন্দ্রনাথ যেমন 'গোরা' লিখলেন আমাদের সঙ্কীর্ণতার আর কূপমণ্ডূকতার প্রতিবাদে, তেমনি ১৯১৬ সনে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল দুর্বলতাকে বিশ্লেষণ করে লিখলেন 'ঘরে-বাইরে'। 'ঘরে-বাইরে' একদিকে যেমন নরনারীর সম্পর্কে

ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-দর্শনের স্ফুটতর প্রকাশ তেমনি অন্যদিকে হল কংগ্রেস-পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল র্বলতার উদ্‌ঘাটন। এবং এ উদ্‌ঘাটন প্রতীচ্য দৃষ্টিভঙ্গী-মনুপ্রাণিত। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের রাজনৈতিক তব্যটুকু রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে নির্ভীক স্পষ্টতায় প্রকাশ করেছেন :

"আমার দেশ আছে এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে এইজন্য যে-দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।...আমি সেদিন দেশকে যে-কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম সে বিশেষ-কিছু নতুন কথা নয় এবং তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে স্বদেশ-হিতৈষীর কানে সেটা কটু শোনায়। কিন্তু আর-কারো মনে না থাকতে পারে, আমার স্পষ্টই মনে আছে যে, আমার এই সকল কথায় দেশের লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।...এর দুটি মাত্র কারণ; প্রথম—ক্রোধ, দ্বিতীয়—লোভ। ক্রোধের তৃপ্তিসাধন হচ্ছে এক রকমের ভোগসুখ; সেদিন এই ভোগসুখের মাতলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল,—আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চলছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্ছি এবং ভাষায় আমাদের কোন আব্রু রাখছি নে। এই সকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন জাপানি আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন। কেবলই শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় নয়।'...তা ছাড়া আরও একটি কথা ছিল, সে হচ্ছে লোভ। ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিস পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে অনেক সস্তায় পাব—হাত-জোড়-করা ভিক্ষের দ্বারা নয়, চোখ-রাঙানো ভিক্ষের দ্বারা পাব, এই ফন্দির আনন্দে সেদিন দেশ মেতেছিল। ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে reduced price sale, সেদিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালির কপালে পোলিটিকাল মালের সেইরকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল।...তাই তখনকার কালের এক জননেতা বলেছিলেন, আমার এক হাত ইংরেজ সরকারের টুঁটিতে, আর-এক হাত তার পায়ে।...এমনটা যে হল তার কারণ বাইরে নেই, তার কারণ আছে আমাদের নিজেরই ভিতরে। অনেক দিন থেকেই আমাদের ধর্মে কর্মে এক দিকে আছে হৃদয়াবেগ আরেক দিকে আছে অভ্যস্ত আচার।...অন্তঃকরণের জড়তায় যে-ক্ষতি সে-ক্ষতিকে কোনো কিছুতেই পূরণ করা যায় না।... তখন অক্ষয়ের লোভ আলাদিনের প্রদীপের গুজব শুনলেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে।... আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধদ্বারে যে-মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল।...সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি;...কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো।...এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক।...মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত শক্তির দাবি করলে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সংকীর্ণ করে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয় নি; এথেন্স মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে; তার সেই জয়পতাকা আজও মানবসভ্যতার শিখরচূড়ায় উড়ছে।... চরকা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোনো উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে—মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকায় সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিসটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।"

অবশ্য চরকাও আমরা কাটি নি, মেসিনও তখন তেমন চালাই নি। শুধু টুঁটিতে হাত আর পায়ে হাত

দিয়েই উত্তেজনা বাড়িয়ে চলেছি। তার ফল যা হবে এবং হচ্ছে বলে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা আজকের দিনের ভারতবর্ষে হুবহু ঘটে যাচ্ছে :

"একদা যখন পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংসক্ত ছিলুম, তখন আমরা কেবলই পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্যক্রটি স্মরণ করিয়েছি—আজ যখন আমরা পরপরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্সকে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির পোষণপালন করতে চাচ্ছি। তাতে উত্তরোত্তর আমাদের যে-মনোভাব প্রবল হয়ে উঠছে সে আমাদের চিত্তের আকাশে রক্তবর্ণ ধুলো উড়িয়ে বৃহৎ জগৎ থেকে আমাদের চিন্তাকে আবৃত করে রাখছে। প্রবৃত্তির ক্রত চরিতার্থতার দিকে আমাদের উত্তেজনা সে কেবলই বাড়িয়ে তুলছে। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে-পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোট, তার দীপ্তি নেই; সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলছে। এই বুদ্ধি কখনো কোনো বড় জিনিসকে সৃষ্টি করে নি। আজ পশ্চিম দেশের এই ব্যবসায়বুদ্ধিকে অতিক্রম করে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যম দেখা দিয়েছে।...অর্থাৎ যারা স্বাজাত্যের বাঁধন কেটে ঐক্যের সাধনায় ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়েছে, তারা নিজের অন্তরে মানুষের ভিতরকার অদ্বৈতকে দেখেছে।...আর আমরাই কি কেবল যেমন 'পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং' তেমনি করে আজ এই শুভদিনের প্রভাতে কেবল পরের অপরাধ স্মরণ করব?" (সত্যের আহ্বান, ১৩২৮)।

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে 'ঘরে-বাইরে'র সমস্ত তত্ত্বটুকুই বিধৃত এবং রবীন্দ্রনাথের নিজেরই স্বীকৃতি প্রমাণ করছে এই সার্বভৌম মানবিকতার দর্শন তিনি ইউরোপ থেকেই পেয়েছেন। যদি কেউ বলেন যে জনসাধারণকে বর্তমান-কালে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল হিসেবে দেখার শিক্ষা এদেশের ঐতিহ্য থেকেই রবীন্দ্রনাথে সঞ্চারিত হয়েছিল তাহলে আবার রবীন্দ্রনাথেরই কথা উদ্ধার করে দেখাতে হবে যে, ভারতবর্ষ ঐতিহাসিক কালের মধ্যে মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয় নি; সে মর্যাদা দিয়েছে ইউরোপ এবং আমরাও পেয়েছি ইউরোপ থেকে :

"লোকসাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণীদিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।

"আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না।...একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড় ছিল।"

[ক্রমশঃ]

প্রাণপাথেয়

শ্রীদেবব্রত রেজ

[পূর্বানুবৃত্তি]

থীবস্ নামে রাজ্য। তার রাজা মরে গেছেন। রানী যোকাস্টা ও রাজ্য ভর্তৃহীনা। রাজ্যে নেমেছে মহামারী। টিরেসিয়াস রাজপুরোহিত, তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। তিনি বললেন স্ফিংক্স নামে একটা রক্তপিপাসু শক্তি রাজ্যের প্রান্তে কোথাও আবির্ভূত হয়েছে। তাকে জয় করতে না পারলে থীবস্ ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু যেই তাকে জয় করতে যায় তাকেই সেই মহাপ্রাণী প্রথম কয়েকটি প্রশ্ন করে। কেন প্রশ্ন করে? বিনা অজুহাতে কোন প্রাণীকে ধ্বংস করা যায় না, সম্ভবতঃ সেই জন্যে। প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না, পরিবর্তে বড় বড় বীর বড় বড় যোদ্ধা প্রাণ দিয়ে আসে।

একদিন তার প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে এল ইডিপাস—পূর্ণযৌবনা, সমাজের এক নামহীন পরিত্যক্ত সন্তান। ঠিক ঠিক উত্তর দিল। স্ফিংক্স হার মানল। ইডিপাস রাজা হল থীবসের—তার রানী হল বিধবা যোকাস্টা।

আমাদের সকাল থেকে সন্ধ্যার পটভূমিতে এই যে যন্ত্রেরা অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে এরা একত্রে মিলে স্ফিংক্স। থীবস্ আমাদের এই পৃথিবী। এই স্ফিংক্সের প্রশ্ন আজ মানবতার প্রশ্ন। তরুণ ইডিপাস আমরা, সৈন্যেরা শ্রমিকেরা। আধুনিক মানবতার প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক জবাব দিলে আমরা এই থীবসকে পাব। যোকাস্টাকেও পাব। যোকাস্টা এই বিপুলা প্রকৃতি। আমাদের সকলের জননী।

বরেন আবার কাহিনীর সূত্র ধরে এগিয়ে গেলেন। তারপর ইডিপাস যখন যোকাস্টার ক্ষেত্রে তিনটি সন্তানের জনক হলেন তখন রাজ্যে আবার লাগল মহামারী, দুর্ভিক্ষ। কে এক দূত এসে জানাল এই যোকাস্টা তাঁর নিজেরই জননী। তখন যোকাস্টা নিজের গলায় লাল ওড়নার ফাঁস পরিয়ে আত্মহত্যা করলেন আর ইডিপাস যোকাস্টার কোমরবন্ধের কাঁটা দিয়ে নিজের চোখ দুটো অন্ধ করে, কন্যা ইলেকট্রার হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন নিরুদ্দেশে।

এই লাল ওড়না আমাদের ভোগদর্শন, লালসার মতবাদ। প্রকৃতির ওপর মানুষের কামনার অত্যাচার। বহিঃপ্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতি দুয়েরই ওপর। প্রকৃতি এই অত্যাচার সইবে না। বন্ধ্যা হবে বহিঃপ্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতি মরবে। আর আমরা অন্ধের মত জগৎময় নিরুদ্দেশের পথে পথে ঘুরে মরব।

এতক্ষণ ধরে যে আকাশ নিস্তব্ধ হয়েছিল তা এবার গুমরে উঠেছে। আকাশের মধ্য থেকে পৃথিবী ও দিগন্তের ছেদ পর্যন্ত ব্যবধানটাকে ছিন্নভিন্ন করে শাখাপ্রশাখাযুক্ত বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল।

আকাশের বিদ্যুৎ-ছটাকে উপলক্ষ্য করে জনতার বৃহদংশ উঠে পড়ল। ধর্মঘটী জনতার কাছে বরেনের বক্তব্য প্রলাপের মত শোনাল।

বরেন তখনও আচ্ছন্নের মত বলে চলেছেন, যুগে যুগে মানুষ প্রকৃতিকে শাসন করতে চেয়েছে। তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। যে যুগে গ্রীক পুরাণ সৃষ্ট হয়েছে সে যুগের মানুষ প্রকৃতিকে অনুভব করেছে রক্তে, প্রবৃত্তিতে, কামনায়। তাই সে রক্তের মধ্যে, প্রবৃত্তির মধ্যে, কামনার মধ্যে যে বিশাল প্রকৃতি তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। আজ আমাদের যুগে আমরা প্রকৃতিকে শুধু প্রবৃত্তির মধ্যে নয়, বুদ্ধির মধ্যে, ধীর মধ্যে উপলব্ধি করেছি। তাই আমরা বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃতিকে অতিক্রম করতে চেয়েছি। সেদিন প্রকৃতিকে যোকাস্টারূপে দেখেছি, আজ দেখছি জড় প্রকৃতিরূপে। সেদিনের বীরত্ব ছিল

রক্ত দিয়ে তার ঋণ মুক্ত করায়, আজকের বীরত্ব বুদ্ধি দিয়ে তাকে জয় করায়। শিশু যেমন ধীরে ধীরে মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বেড়ে ওঠে, স্বাধীন হয়ে ওঠে, তেমনি মানুষ স্বাধীন হয়ে ওঠে প্রকৃতির সঙ্গে তার শিশু আর স্তন্যের সম্পর্কটাকে ছেদ করে। প্রথম ছিন্ন করে দেহের সম্পর্ক, তারপর মনের। প্রথমে প্রবৃত্তির, তারপর বুদ্ধির। আজকের এই বুদ্ধিসৃষ্ট যন্ত্র হবে আমাদের নতুন মুক্তির উপায়।

যে মানুষ প্রকৃতিতে একাকী সে কথা বলে নিজেকেই শুনিয়ে। অপরকে শোনাবার তাগিদ তার থাকে না। বরেন নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়েই এত কথা বললেন।

এই আত্মগত বক্তৃতা শেষ করে বরেন চারদিকে চেয়ে দেখলেন সভায় একজন ছাড়া আর কেউ নেই। মঞ্চের ওপর কয়েকজন মিস্ত্রী তখনও রয়েছে, মাইক্রোফোন লাউড স্পীকারগুলো সরিয়ে নেবার অপেক্ষায়।

বরেনের বক্তৃতা শেষ হলে এই মিস্ত্রীরা তাড়াতাড়ি সভার সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আকাশে মেঘ এসেছে ঘোর করে। তারা ভাব দেখাল এই মেঘই যেন তাদের ব্যস্ত করে তুলেছে।

বরেন অপ্রতিভ হয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মিস্ত্রীরা সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে একে একে চলে গেল। কর্নেল একা নীচে মাটিতে এতক্ষণ বসেছিল। সবাই যখন চলে গেল তখন সে ধীরে ধীরে উঠে এসে বরেনের পাশে এসে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে যা বলল তার মর্ম :

ওদের নেতা হবে উকিল মোক্তার, জালিয়াৎ-জুয়াচোর, এম্. এল্. এ., ব্যারিস্টার। অতি ছোট যাদের মন, ছোট কুলীধাওড়ার খুপরির মত আশা, তেমনি ছোট কল্পনা, তারা এই ঐরাবত যন্ত্রের উপর কী করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে?

বরেন কিছু না বলে ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে নেমে চলে গেলেন।

বরেন আচ্ছন্নের মত বাড়ি ফিরে এলেন।

বরেনের বাড়িতে দুখানা শোবার ঘর। এর একখানা এখন বরেনের, অপরটা কোলাপোতার। দুটো ঘরের মাঝখানে দরজা। এই দরজায় পর্দা। কোলাপোতা যেদিন এই বাড়িতে এলেন সে রাত্রে এই মাঝের দরজা খোলা ছিল। তারপর থেকে দুজনের কেউ এটাকে বন্ধ করতে পারেন নি। দুজনেই বুঝলেন এই বন্ধ করাটাই লজ্জার। তাই সেদিন থেকে এই দরজাটা সব সময় খোলা থাকে—কি দিনে কি রাত্রে। মাঝে অবশ্য পর্দাটা দোলে।

এই দরজাটার কোল ঘেঁষে দুটো ঘরে দুটো পালঙ্ক। এঘরে বরেনের পালঙ্কে নীল বিছানা, ওঘরের পালঙ্কে লাল। ওঘরের পড়ার টেবিলে ছোট্ট একটি সর্পশাসনরত গ্রীক ভাস্কর্যমূর্তির প্রতিরূপ, এঘরের টেবিলে একখণ্ড কিউবিস্ট ভাস্কর্য—বহুতলবিশিষ্ট, গাণিতিক রেখায় আবদ্ধ, অদ্ভুত মসৃণ, একটা প্রায় গোলাকার পদার্থ। কোনও অজ্ঞাত প্রাণীর কোনও দেহসন্ধি স্থাপনের অস্থির মত।

এইসব গৃহ-সরঞ্জাম ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের।

বরেন ঘরের মধ্যে ঢুকতেই বাইরে হু-হু শব্দে প্রবল বর্ষণ নামল। বাইরে ভারী বুটের ছোটাছুটির শব্দ উঠল, প্রহরীরা বৃষ্টি থেকে সরে দাঁড়াল।

বরেনের সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক তীব্র বিদ্যুৎও প্রবেশ করল ঘরে।

বরেন ঘরে ঢুকে দেখলেন টেবিলের ওপর একখানা কাগজে একছত্র ফরাসী কবিতা :

'On ne pu plus dormir sans rever de romance'—'অঁ নে পু প্লু দরমির সাঁ রেভে দ্য রোমাঁস!' 'রোমান্সের স্বপ্ন না দেখে আর তুমি ঘুমুতে পারবে না।'

লেখাটি ভাঙা ভাঙা দীর্ঘায়িত অক্ষরে লেখা। নীচে রয়েছে নাম আর তারিখ। ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ তাঁর মৃত্যুর দিনেই লিখে গেছেন। কোনও ফরাসী কবির কবিতা থেকে হয়তো উদ্ধার করেছেন। পঙ্‌ক্তিটা পড়ে বরেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোন্ রোমান্সের স্বপ্ন দেখেছেন বৈজ্ঞানিক ঠিক তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে?

কোলাপোতা খাবার নিয়ে এলেন। খাবারটা টেবিলে রেখে নিম্নস্বরে বললেন, অঁ নে পু প্লু দরমির সাঁ রেভে দ্য রোমাঁস! ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে এইটে পেয়েছি।···কিন্তু কী ভাবছ?

ভাবছি রোমান্স।

দুজনে একত্রে আহার শেষ করে নিজের নিজের শয্যায় চলে গেলেন রাত্রির মত। মাঝের পর্দাটা একবার এ-ঘরের মধ্যে একবার ও-ঘরের মধ্যে পতাকার মত পতপত করে উড়ছে হাওয়ায়। বাইরে প্রকৃতির দুর্যোগ এখনও অব্যাহত।

বরেন শুয়ে শুয়ে ভাবছেন, কী করে মেলাবেন তাঁর শেষ বক্তৃতা আর রোমান্স, এই প্রকৃতির দুর্যোগ আর রোমান্স, শ্রমিকদের স্ট্রাইক আর রোমান্স,ওই যন্ত্র সমাবেশ আর রোমান্স!

দু ঘরেই আলো নেবানো।

ও-ঘর থেকে কোলাপোভা জিজ্ঞাসা করে, তুমি এখনও জেগে রয়েছ?

হ্যাঁ, এখনও। এই দুর্যোগে ঘুম আসছে না।

আমিও ঘুমোই নি।

এবার ঘুমোও।

ভীষণ একলা, ভয় করছে।

এই তো আমি রয়েছি এখানে।

কোলাপোভা কয়েক নিমেষ চুপ করে থেকে বলল, মাঝে পর্দা।

ঘর তো আসলে একটাই।

তবু মনে হচ্ছে আলাদা, এতটুকু পাতলা দেওয়ালের ব্যবধান তোমার আমার শিয়রের মাঝখানে, তবু মনে হচ্ছে আমরা যেন কত—কত—দূরে! এমন মনে হচ্ছে কেন বরেন?

মাঝখানে এমন একটা আড়াল রয়েছে যার ভেতর দিয়ে চেয়ে দেখলে কাছের জিনিস, কাছের মানুষ, সব, বহু দূরে—প্রায় অসীমে মনে হয়।

কী এটা?

এটা? এটা কামনা—সেক্স! এই পর্দাটা বাইরে নেই কোলাপোভা, এটা মনে। একদিকে কাম অপরদিকে বাকী সবটা।

কোলাপোভা উত্তর দেয় না। চুপ করে থাকে। বাইরে একটা বিদ্যুৎ-ছটা নিমেষের জন্যে শাখাপ্রশাখা মেলে জ্বলে উঠে মিলিয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরে ঘন কালো রাত্রির ছাদের ওপর গুরু গুরু শব্দের পিপেরা দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত গড়িয়ে যায়।

ঘুমিয়েছ।—জিজ্ঞাসা করেন বরেন।

ভয় পাচ্ছি।

এক মনকে দু ভাগ করে যতক্ষণ এই পর্দাটা ঝুলবে ততক্ষণ ভয়। ততক্ষণ কাম স্ফিংক্সের মত অর্ধসিংহী অর্ধমানবীর মত মনের এদিকে হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে ওদিকটাকে আড়াল করে।

কিন্তু জান বরেন, কী দারুণ একাকীত্ব!

সেক্স চিরকাল একা। ওর পিছনে কবর, স্ফিংক্সের পিছনে পিরামিডের মত!

ঠিক বলেছ।—কোলাপোভা বলে ওঠে সভয়ে।

ইউরোপের ওপর রিফিউজী হয়ে যখন ঘুরেছি তখন আমি এই সেক্সের ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে দেখেছি। যেন থীবসের স্ফিংক্স আবির্ভূত হয়েছিল!

আমি এখানেই দেখতে পাচ্ছি—

কবে থেকে দেখতে পাচ্ছ?

যেদিন থেকে তুমি আমার জীবনে এসেছ।

আমি স্ফিংক্স?

তুমি কেন হবে! তুমি আমারই মত মানুষ।

তবে?

স্ফিংক্স এই সেক্স—এই সেক্স থেকে লোভ, গৃধ্নুতা, আত্মম্ভরিতা, নিষ্ঠুরতা, একাকীত্ব। আজকের সভ্যতায় এই সেক্স সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত হয়ে গেছে। সমস্ত সংস্কারের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে শ্বাপদের মত স্বাধীন হয়ে গেছে। ব্যক্তির এই অবাধ কাম সমাজকে,সভ্যতাকে গ্রাস করছে। আমার মনে হয় ব্যক্তির সেক্সকে রূপান্তরিত করলে ভাবী সভ্যতার চেহারা বদলে যাবে।

বরেন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, কোলাপোভা, আমি কি তাই একা? আমার মধ্যে যে লুকনো সেক্স তাই কি আমায় এত একা করে দিয়েছে? হ্যাঁ, এই একার মধ্যে অন্ধ হয়ে থাকতে চাই ন আমি। আমি এক মনকে দু ভাগ করে দেওয়া যে পর্দা সেটাকে ঘুচিয়ে দিতে চাই—সেক্সকে মনের অন্য অংশে সঙ্গে যুক্ত করে দিতে চাই।

কী করে দেবে?

ডাঃ সুব্রহ্মণ্যম্ পথনির্দেশ করে গেছেন। মনে ক তোমাতে আমাতে এমন একটা কিছু সৃষ্টি করছি

তোমার আমার—সব মানুষের, যেব হিংসা দুঃখ সুখের ওপরে। ধর একটা তত্ত্ব বা একটা কীর্তি। এই সৃষ্টির মধ্যে তুমি আমি মিলিত হব, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আমাদের ভালমন্দের ওপরে।

তবু মনে হয় আমার ভালটা তোমার ভালর জন্যে কাঁদবে: আমার মন্দটা কাঁদবে তোমার মন্দের জন্যে। আমার বুকের মধ্যে কে যেন ঘোমটায় মুখ ঢেকে অনবরত কাঁদছে।

তখন মিলবে যদি মিলুক আমার ভালর সঙ্গে তোমার ভাল, আমার মন্দের সঙ্গে তোমার মন্দ। তখন তোমার আমার নীচুতলার যে মিলন—সেই নীচের মিলনটা জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে, অনুভূতিতে, আকাঙ্ক্ষায়—উপরের মিলনের সঙ্গে একই ধারায় মিলতে পারবে। নীচের তলায় সেক্সের মাটিতে যে মিলন, সেই মিলনের ওপর, উপরের মিলনের যে প্রসন্নতা সেই প্রসন্নতার আলো পড়বে। সেক্স তখন অন্ধ হবে না, দৃষ্টি-অন্ধ-করা সাময়িক ব্যাধি হবে না, বুদ্ধিকল্পনাধী-নিভিয়ে-দেওয়া অন্ধকার হবে না—সেক্স তখন চিত্তের প্রসাদ হয়ে উঠবে।

রোমান্সের কী হবে?

রোমান্স তো ওই ওপরের আলো!

কিন্তু তোমার ওই দুঃখ-সুখের ওপর, কীর্তির মধ্যে কল্পিত যে মিলন, সৃষ্টির মধ্যে যে মিলন, তার আবার রোমান্স কী? নরনারী তো সৃষ্টির জন্যেই মেলে! নতুন মানুষ সে কি সবচেয়ে চরম আর পরম সৃষ্টি নয়?

এখানে মেলায় প্রকৃতি। আমরা প্রকৃতির বশীকরণ শক্তির বাইরে মিলতে চাই।

কিন্তু বরেন,অঁ নে পু প্লু দরমির সাঁ রেভে অ রোমাঁস।

কোয়ার্টারের পাশেই পীচ-ঢালা পথ। সহসা বরেন ও কোলাপোতা শুনলেন এই পথ দিয়ে সেই দুর্যোগের মধ্যেই বন্যার জলের মত কোলাহল করে জনস্রোত ছুটে চলেছে। কোথায়?

কোলাপোতা বিছানার উপর উঠে বসে বলল, ওই দেখ বরেন, ওই হল প্যাশন—জীবনের উত্তেজনা।

বরেন জানলা দিয়ে পথের ওপর প্রবহমান জনস্রোতের দিকে চেয়ে রইলেন বহুক্ষণ। জনতার উত্তেজনা অজ্ঞাতসারে তাঁর শিরায় প্রবেশ করল। অদৃষ্ট উত্তাপের মত এই উত্তেজনার তাপ লাগল তাঁর মনে। অবচেতন মনের উত্তেজনা, প্যাশন একটা সর্বজনীন আকারে আকারিত হয়ে গেল। বরেন জনতার সঙ্গে মিশে গেলেন মনে মনে।

বরেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন এই জনতার সঙ্গ নিলেন তখন এই জনতা রায়ের বাংলোটাকে ঘিরে ফেলেছে—সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে। ঘিরে ফেলে ফুঁসছে। এই সাপটা শির তুলেছে গেটের কাছে। গেটের একটা থামের ওপর দাঁড়িয়ে মুক্তেশ্বর হাত-পা ক্ষিপ্রগতিতে নেড়ে নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে জনতাকে।

বরেনের মনে হল চারদিক খুব পাতলা এক ধরনের জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। এই দুর্যোগে চাঁদ পাবে কোথায়? কারখানা চালু থাকলেও বা বলা যেত স্ল্যাক ঢালবার স্থান থেকে বিচ্ছুরিত আলো বায়ুঅণুদের গায়ে ঠেকতে ঠেকতে এতদূর পৌঁছেছে। এ আলো তাঁর মন থেকে বিচ্ছুরিত উত্তেজনার আলো। প্যাশনের আলো। যে আলোয় বাস্তব অভিজ্ঞতা স্বপ্নসাদৃশ্য লাভ করে।

মনে হল দক্ষিণা হাওয়া বইছে জোরে। কোথায় দক্ষিণা হাওয়া? স্পর্শেন্দ্রিয় দক্ষিণা হাওয়ার স্পর্শ নিজের মধ্যে নিজেই সৃষ্টি করেছে। এই হল প্যাশনের স্পর্শ। এই হাওয়ার বেগে ছায়াখচিত জ্যোৎস্নার মসলিনখানা পৃথিবীর বুকের ওপর দুলছে। এ এক অদ্ভুত রোমান্স! অঁ নে পু প্লু দরমির…

ওই বাংলোটা যেন বৃহৎ কোনও রঙ্গমঞ্চের তুলি-আঁকা একটা অলীক সেট। অভিনয় শেষ হয়ে গেছে, এবার এর কৃত্রিম দরজা-জানলা আঁকা পটগুলো খুলে স্থানান্তরিত করা হবে।

চাঁদনী রাত্রে কোথাও কোনও গল্পকাহিনীর দেশে, একটি বিরাট অজগর সাপ একটা খেলনার বাড়িকে ঘিরে ফুঁসছে। ক্ষীণ আলো মাখানো। তা সে তারার আলোই হোক, দূরের বিজলী বাতির দিশাহারা আলোতেই হোক কিংবা উত্তেজনায় বিচ্ছুরিত মনের আলোতেই হোক। ক্ষীণ আলোমাখা সহস্র সহস্র মানুষের মুখগুলো এই বিরাট কুণ্ডলী পাকানো সাপটার গায়ে আঁশের মতন।

গেটের থামের ওপর দাঁড়ানো মুক্লেশকরের মাথাটা এই সাপটার মাথা, যেন ইতস্ততঃ দুলছে।

এক নিমেষের জন্য জনতা স্তব্ধ হয়ে গেল। দূরে ডাঃ সুব্রহ্মণ্যমের নির্জন বাংলোর দেবদারু কুঞ্জ থেকে পাখির কলরব উঠছে থেকে থেকে। নৈঃশব্দ্যের গহ্বরের মধ্যে শব্দের ঝোরা ঝরছে থেকে থেকে। একটি কাঠ-ঠোকরা পাখি এই গভীর রাত্রিতেই কোনও একটা গাছের কাণ্ডে নতুন আশ্রয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। তার ঠোঁটের আঘাত নৈঃশব্দ্যের ওপর হাতুড়ির ঘায়ের মত পড়ছে বার বার। অনন্তকালের মধ্যে যেন সাম্প্রতিক কাল বোনা হচ্ছে। তার মাকু চলার শব্দ উঠছে।

বাংলোর বাগানে কোনও নিমচামেলি গাছে গাঢ়গন্ধী ফুল ফুটেছে—অন্ধকারে, আলোর অপেক্ষা না রেখেই।

বরেন অনাদিকালের একখণ্ড রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন যেন।

বরেনের সমগ্র চিত্ত একটা দারুণ উৎকণ্ঠায় মুহ্যমান হয়ে গেছে। এক রকম জড়তা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। বুঝতে পারছেন যে, যা তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে দেহমন চেতনা-সমেত জড়িয়ে ধরেছে তা একটা বিপুল উত্তেজনা—বিরাট প্যাশন।

সহসা গেটের থামের ওপর দাঁড়িয়ে মুক্লেশকর চিৎকার করে উঠল: তোড় দেও!

বরেনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কর্নেল। সে রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, ডাকৃটর সাহাব, আপ ফরমাইয়ে।

কোন্ অজ্ঞাত উত্তেজনার প্লাবনে বরেনের দেহমন স্রোতে তৃণের মত অবশ হয়ে ভেসে গেল।

তাঁর দৈনন্দিন ভাবনার দিগন্ত অবলুপ্ত হয়ে গেছে। নৈর্বক্তিক অনুভবের ঢেউয়ে, এই প্রাত্যহিক চেতনার সৈকতে পোঁতা ছোট ছোট যুক্তির খুঁটির যে সারি সেই সারি গেল ভেসে। বরেন আত্মহারা হয়ে গেলেন।

যে আগুন এই চরাচরকে চালিত করছে জ্বালার প্রেরণায়, সেই আগুনের কুণ্ড জ্বলে উঠল মনে।

বরেনের অজ্ঞাতসারে তাঁর কণ্ঠ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল—তোড় দেও!

নীচু ঢেউ-খেলানো সাদা প্রাচীর ছাপিয়ে মানুষের বন্যা সেই রঙ্গমঞ্চের রঙ-করা কাঠের সেটের মত বাংলোটাকে গ্রাস করল।

মঞ্চটাকে গ্রাস করল বটে কিন্তু অভিনেতাকে, নায়ককে খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি তখন নতুন আর একটা ভূমিকায় নেমেছেন।

এদিকে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে কোলাপোতা বরেনের ফিরে আসার অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনছে। দূর থেকে ভেসে আসা কোলাহলে, জানলার বাইরে যে প্রলম্বিত পথ সেই পথের উপর ছুটন্ত লোকের চিৎকারে, একটা অদ্ভুত রোমান্সের আভাস পেল কোলাপোতা। এই কি সেই রোমান্স যে রোমান্সের স্বপ্ন না দেখে তোমার ঘুমোবার জো নেই?

ধঁ নে পু পু দরমির সাঁ যেতে ভ রোমাঁস।

সন্ধ্যার অনেক পরে স্টুডিয়ো থেকে ফিরে শীলভদ্রের দক্ষিণ কলকাতার বাড়ির তেতলার ঘরে তাপস আর এক রোমান্সের স্বপ্নে মশগুল। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ একটা নিশাচর পাখী বাইরে থেকে ভেন্টিলেটারে আশ্রয় নেবার ব্যর্থ চেষ্টার পর তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উড়ে চলে গেল।

শীলভদ্র তাঁর শেষ উইলে সুস্মিতাকে সর্বস্ব দান করে সেই উইলের একটা নকল তাপসের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যেদিন হোক, যখনই হোক, যে কোন অবস্থাতেই হোক সুস্মিতা তাপসের কাছে পৌঁছলে তাপসকে শীলভদ্রের সমস্ত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ অধিকার সুস্মিতাকে ছেড়ে দিতে হবে।

শীলভদ্রের এই উইল জেনে তাপসের মনে মিশ্রিত ভাবের উদয় হয়েছে। একদিকে আশা করেছে সুস্মিতা হয়তো এই উইলের কথা জানেই না আর একদিকে ভয় পেয়েছে সে যদি ধূমকেতুর মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে সব দাবি করে? ইতিমধ্যে সে তার ফিল্ম ব্যবসায়ে কয়েক লক্ষ টাকা লগ্নী করে ফেলেছে। এর বেশীর ভাগ অবশ্য শীলভদ্রের টাকা।

এইসব দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তাপস ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে আর রোমান্সের স্বপ্ন দেখছে। এলই বা সুস্মিতা! সুস্মিতা ফিরে এলে তাপস তাকে যেমন করেই হোক বিয়ে করবে! পরক্ষণেই বিদ্যুৎ-দীপ্তির পর অন্ধকারের মত আশঙ্কা নামে মনে—যদি বিয়ে করে ফিরে আসে সুস্মিতা! আসুক বিয়ে করে, তাপস মনে মনে জোর দিয়ে বলে, আসুক বিয়ে করে—সে বিয়ে সে যেমন করেই হোক ভেঙে দেবে। ভেঙে দিয়ে নিজেই তাকে বিয়ে করবে। কী করে কেমন করে সে সব পরে বিচার করবে বলে তুলে রেখে দিল মনের একটা ওপরের তাকে। ব্যাপারটা তাপস যত সহজে মনে মনে সমাধান করে ফেলল প্রকৃতপক্ষে তা যে অত সহজ নয় সে উপলব্ধিটা তার মনের তলায় ঠিকই বিরাজ করছিল। তাই তার মন নিজের উদ্বেগটাকে আশ্বস্ত করার জন্যে একটা অদ্ভুত কল্পনা-বিলাসে মেতে উঠল।

নিজেকে নিজেই বলল, মনে কর সুস্মিতা হঠাৎ তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিয়ে তো করেই নি, বিয়ের জন্যে বাক্‌দত্তাও হয় নি কোথাও। ঠিকই ভেবেছ, বরেনকে সে পাবে কোথায়? বরেন তো উধাও হয়ে গেছে।

মনে কর, সে ফিরে এসে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছে। তাপস নিজেকে নিজেই তালিম দিচ্ছে।

কী বলবে তুমি? বলবে, ভালবাসি। তোমাকে আমি ভীষণভাবে ভালবাসি। তারপর? তারপর তাপসের কল্পনা মূক হয়ে পড়ে। আলমারি থেকে নতুন ফিল্মের স্ক্রিপ্টটা বের করে পড়তে শুরু করে, বার বার পড়ে মুখস্থ করতে থাকে একটা বিশেষ সংলাপ।

কখন যে সে ড্রেসিং টেবিলের দেহপ্রমাণ আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে তা টের পায় নি। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চেয়ে দেখল ঘন বেগুনি রঙের পুরু সিল্কের পর্দাটার পটভূমিকায় তার প্রতিবিম্বটা অভিনেতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আয়নায় চেয়ে থাকতে থাকতে দেখল কে একজন পর্দা ঠেলে ঘরে এল। একেও প্রতিবিম্ব মনে হল। প্রতিবিম্বের বিপরীত দিকে যে একটা বাস্তব আকার থাকে তা তার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল না। কিন্তু মূর্তিটা যখন ঘরের মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে এল তখন তাকে স্পষ্ট দেখে তাপস বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল।

হঠাৎ এক দমক বৃষ্টি শার্শীর ওপর শব্দ করে মিলিয়ে গেল। বিস্মিত তাপস যার প্রতিবিম্ব দেখল সে স্মিতা। স্মিতা সত্যিই ফিরে এসেছে।

মুহূর্তের মধ্যে স্ক্রিপ্টখানা খোলা আলমারির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক চক্র ঘুরে স্মিতার সামনে এসে জানু মুড়ে কার্পেটের উপর বসে দু হাতে মুখ ঢেকে রুদ্ধগলায় বলল, তুমি আবার আমাকে নষ্ট করতে এলে কেন? একবার তো নষ্ট করেই গেছ, যেটুকু বাকী ছিল সেটুকুও নষ্ট করতে এলে আবার?

এই সংলাপটা সে সংগ্রহ করেছে স্ক্রিপ্টটা থেকে। নায়িকা বলছে নায়ককে বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে।

স্মিতার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। ভিজে মাথা থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল চোখের কোল বেয়ে। এই ধারার কয়েকটি বিন্দু তাপসের ব্রিলিয়ানটাইন মাখানো চুলের ওপর শিশিরবিন্দুর মত ঝরে পড়ে ঘরের বিজলী আলোয় ঝকমক করে উঠল।

মুখের থেকে হাত সরিয়ে তাপস উঠে দাঁড়াল। দেখল স্মিতার পূর্বের চেহারা নেই। বহুদিন ধরে পথ হেঁটে এলে মানুষের চেহারায় যে রুক্ষতা যে উদাসীনতা দেখা দেয় সেই রুক্ষতা আর উদাসীনতা দেখতে পেল তাপস স্মিতার দেহময়, আপাদমস্তক। স্মিতার এই রূপান্তরিত রূপ তার কারুণ্যে তাপসের মুখ থেকে আর একটা সংলাপ টেনে বের করে আনল, তুমি যেন স্বপ্ন থেকে উঠে এসেছ স্মিতা, আমার স্বপ্ন থেকে! কিংবা আমার ভয় থেকে! তুমি যেমন সুন্দর হয়েছ তেমনই ভয়ঙ্কর হয়েছ!

তাপসের এই সংলাপে প্রলাপের অর্থহীনতা কিন্তু স্মিতার বোধের মধ্যে এল না।

তাপস নিজের কণ্ঠকে যথাসম্ভব রোধ করে বলে, তুমি আর যাবে না বল?

আচ্ছন্নের মত দূরাগতস্বরে বলে স্মিতা, কোথায় যাব?

তাপস আনন্দে অধীর হয়ে কী করবে খুঁজে পেল না। কয়েকমুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ কোণে ছুটে গিয়ে রেডিয়োটা খুলে দিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে রেডিয়োতে একটা সুর ভেসে উঠল। চীনা সার্কাসের বাজনা। তাপস হঠাৎ ছুটে এসে স্মিতার হাত দুটো নিজের দু হাতের মুঠোয় ধরে কী করবে খুঁজে না পেয়ে বুকের কাছে উঠিয়ে আনল। স্মিতার হাত দুটো ভীষণ ঠাণ্ডা ঠেকল। মানুষটা যেন রেফ্রিজারেটর থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে।

স্মিতার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, ইস্, এ কী! তুমি যে বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেছ! কাপড় ছেড়ে এস। ওই ঘরে তোমার পুরনো আলমারিটা এখনও আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। ওর মধ্যে তোমার পুরনো শাড়ি থাকলেও থাকতে পারে। দাঁড়াও, চাবি এনে দিচ্ছি।

শীলভদ্রের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার আগে এ বাড়ির সমস্ত চাবি একটা রিঙে গেঁথে স্মিতা তাপসকেই দিয়ে গিয়েছিল।

তাপস জঙ ধরে যাওয়া চাবির গোছাটা এনে তার হাতে আবার ফিরিয়ে দিল।

* * *

গভীর রাত্রিতে উন্মাদের মত হাসিতে পেল তাপসকে। বালিশে মুখ গুঁজে সেই হাসিটাকে চেপে রাখল। মনে মনে বলল, এইই সুযোগ, বিয়েটাকে আর বিলম্বিত করা চলবে না।

এদিকে স্মিতা তার পুরনো ঘরে পুরনো বিছানায় একখানা পুরনো শাড়ি পরে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। যেদিন বয়েসের সঙ্গে প্রথম আলাপ সেদিন এই শাড়িখানাই ছিল তার দেহ জড়িয়ে। এই শাড়িটা যেন তার চরম ও পরম আশ্রয়। এই পরম আশ্রয়ে আজ সে বহুদিনের পর নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। ঘুমুচ্ছে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর পাহাড়ী খাদের কানায়। তবু নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

[ক্রমশঃ]

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ্‌স্‌ পাস্ট' [তিন]

"The only true paradise is paradise lost."

ক্ষণকালের স্বর্গ থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়ে স্মৃতির প্রদীপে সেই স্বর্গীয় মুহূর্তকে জ্বালিয়ে তোলাই শিল্পকর্ম,—প্রুস্ত এ কথা বারবার বলেছেন : "The years of happiness are the years that have gone ; only suffering can make it possible for a writer to work." 'ফুলের গন্ধে চমক লাগা' দিনের, 'মধুকর গুঞ্জরণে ছায়াতলকাঁপা' মধ্যাহ্নের, 'ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণীর বাসরপ্রদীপ' জ্বালা রাতের ফুরিয়ে যাওয়া আলো নতুন করে জেলেছেন প্রুস্ত, মুছে যাওয়া চর আবার জেগে উঠেছে 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ্‌স্‌ পাস্টে'। জীবনের মৃত মুহূর্তকে অমৃতত্ব দান করেছেন প্রুস্ত এই সময়হারা সময়ের অমর স্বরলিপিতে। এই স্বরলিপিতেই চিরকালের মত ধরা পড়েছে ক্ষণকালের কণ্ঠস্বর। প্রুস্তের জীবন-সংগীতের বিস্মৃত মূর্ছনা বাঁধা পড়েছে যে স্বরলিপিতে, 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ্‌স্‌ পাস্ট'ই তার বিশ্ববন্দিত পরিচয়। নিজের কণ্ঠস্বরের এমন নিখুঁত, এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বরলিপি বিশ্বসাহিত্যেও বিরল বিস্ময়।

এই বিস্ময়কর গ্রন্থ রচনার জন্যে প্রুস্ত সারাজীবন নিজেকে প্রস্তুত করেছেন।

ছেলেবেলায় Vivonne-এর তীর ধরে যেতে যেতে প্রুস্তের মনে হত কোন পোড়ো-বাড়ির ভগ্নাবশেষের মধ্যে ঝোপজঙ্গলা বেতসীলতার তলে প্রোথিত আছে জীবনের রহস্য। যৌবনের আগুনরাঙা দিনেও সেই রহস্যকে মুক্ত করার নেশা তাঁকে মুক্তি দেয় নি। স্মৃতির ধূসর সেই পাণ্ডুলিপির পাতা তখনও তিনি উল্টে চলেছেন, যদি পেয়ে যান জীবনরহস্যের উত্তর—এই আশায়। ১৮৯৮-১৯০৪ সনের মধ্যে নোট-বইয়ের পাতা ভরে উঠেছে তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'Jean Santeuil'-এর উপাদানে। এ রচনায় কাটাকাটি অথবা অদলবদলের কোনও চিহ্ন নেই। জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত এই বইয়ের বহু পাতাই ছেঁড়া যা থেকে আঁদ্রে মরোয়াঁর ধারণা এ বই তিনি নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছেন।

আবার মরোয়াঁই বলেছেন যে এই বইতেই : "We, today, find in it most of the qualities which we so much love in 'A la Recherche du Temps Perdu.' It foreshadows many of the scenes which had an obsessional hold on Proust and were, later, to be given their final form !" এর পরেও মরোয়াঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "All the same, he was right not to publish it just then."

প্রুস্ত যে একমাত্র উপাদান তাঁর মহত্তম উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন সেই উপাদানকে রক্তমাংসের চেহারা দেবার সময় হয় নি তখনও। সময় হয় নি, কারণ প্রুস্তের বাবা-মা তখনও বেঁচে। এই গ্রন্থের প্রথম পাঠক হতেন তাঁরাই, আর তাই "...he had found it impossible to treat frankly of certain matters which he felt to be essential." তখনও লক্ষ্য করার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি ছিল না। কিন্তু চরিত্র লক্ষ্য করাই প্রুস্তের

শুধু দেখা লেখকের কখনই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না: "But to observe was not enough for Proust."

প্রুস্তের চোখে বাঁচার 'মানে' সৌন্দর্যের অন্বেষণ। সুন্দরকে বন্দী করে রেখেছে 'কুৎসিত'-দানব কোথায় তারই উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন প্রুস্ত জীবনে এবং রচনায়। রূপকথার গল্পে বন্দিনী রাজকুমারীকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে রাজপুত্র। হাতে তার খাপখোলা বাঁকা তলোয়ার। দরজা থেকে দরজায় ঘা দিয়ে দিয়ে ফিরছে সে। তারপর হতাশার অন্ধকারতম মুহূর্তে হঠাৎ খুলে যায় সেই সিংহদ্বার সেই ঘরের, যেখানে সোনার খাটে অন্ধকার বিদিশার নিশার মত চুল মেলে দিয়ে বসে আছে, রূপোর খাটে তার পা। বসে আছে তারই পথ চেয়ে সুন্দরকে যে মুক্ত করতে আসে বারে বারে এই কুৎসিতের কারাগারে, সেই যে চিরবিদ্রোহী। জীবনের রূপকথাও সেই এক অপরূপ কথাই:

"Beauty, he held, is like the princess in the fairytale who has been shut away in a castle by a formidable magician. We try, in vain, to force a thousand doors in an effort to release her, and most men, in their haste enjoy life, abandon the attempt. But Proust was prepared to give up everything in his determination to reach the prisoner. Then, suddenly, a day came, a day of revelation, of illumination, of certainly when the secret and dazzling reward was put into his hands. 'One had knocked at all the doors, only to find that they opened on to nothing', he says, 'and the only one through which one could enter, and had tried for a hundred years without success to find, one bumped into without being aware of its existence, and it opened.'"

কী সেই রহস্য—প্রশ্ন করেছে মরোয়া, যা জানবার জন্যে জীবনের সব সুখ তুচ্ছ করে বেরিয়েছেন, প্রুস্ত, এই হার-না-মানা খেলা খেলবার করেছেন দুঃসাহস: "What were going to be the themes of Proust's gigantic symphony"; উত্তর দিয়েছেন মরোয়া নিজেই: "The first with which he began and ended his book, is the Theme of time."

তাই বলেছি আমরাও, প্রুস্তের 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগস্ পাস্ট' 'সময়ে'র অমর স্বরলিপি। এই স্বরলিপি পড়ে যে গান তিনি বাজিয়েছেন তা সকল মানুষের জীবন-সংগীত হয়ে উঠেছে। এ তাঁর একার জীবনের গান নয়। প্রুস্তের সাহিত্য-সত্য হচ্ছে এই যে, "Just as there is a geometry of in space, so there is a psychology in time." আমরা সবাই সময়ের সঙ্গে সংগ্রামে সব সময়ের জন্যে সৈনিক। এই যুদ্ধ সময়ের শুরু থেকে সময়ের সারা পর্যন্ত বিরামহীন জীবনরঙ্গ। আমরা ভালবাসি, কাঁদি হাসি, বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরি, আশায় উদ্দীপিত হই, হতাশায় ভেঙে পড়ি; শেষ পর্যন্ত সময়ের হাতে সব হারাই আমরা। আলো আশা ভালবাসা হাসা কাঁদা সব চুরি করে এখনও পর্যন্ত অধৃত তস্কর, মানুষের শত্রু 'সময়'। ["The whole life of a human being is a battle against time. He longs to cling to a love, to a friendship, to convictions; but out of the depths oblivion slowly mounts, and hides away his loveliest and dearest memories."]

প্রুস্ত জানতেন, সময়ই অধীশ্বর সবকিছুর। মানুষ তার হাতের পুতুল। ["But Proust knew that the self, plunged into the sea of time, disintegrates. Very soon a day will come when there will be nothing left of the man who has loved, suffered or made a revolution."] শুধু যে প্রেম, বিদ্রোহ, বেদনাই মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ বদলায় তা নয়, যে পথ দিয়ে আমরা হাঁটি, যে বাড়িতে আমরা বড় হই, সব সরে যায়, মুছে যায়। ["Houses, streets and roads are as fugitive, alas! as the years."]

কেন এমন হয় ? ছেলেবেলার সেই ঘর তো তেমনই থাকে, পথ,—সেও তো পড়ে আছে যেমন ছিল সে যৌবনের যৌবনভরা বসন্তের দিনে। তবে ? এমন হয় তার কারণ :

"...for they were situated not in space but in time, and the man who goes back to them is no longer the child or the youth who dressed them in the colours of his passion."

তবুও—তবুও আমাদের সব গিয়েও কিছু থাকে। সকালবেলার 'আমি' সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নে দেখা দেয় আবার। সেই যে 'আমার' নানা রঙের দিন যা‌গ্য সোনার খাঁচায় রইল না, তারা হঠাৎ এসে দাঁড়ায় চলতে চলতে চোখের সামনে। বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসে চেনা দিনের কান্নাহাসি, চমকে দেয় তারা, চলতে চলতে থামিয়ে দেয় আচমকা :

"Yet, our former selves are not wholly lost, since they can live again in dreams and even in our waking state."

ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজেকে পুরোপুরি আবিষ্কার করতে যখন আমরা সময় নিই রোজ সকালে এবং প্রমাণ করি যে "...We have never wholly lost it." কিছুই শেষ পর্যন্ত হারায় না। সময় যাকে চুরি করে, স্মৃতি তাকে ফিরিয়ে দেয় :

"Marcel, towards the end of his life, could still hear, deep in himself, 'the jerky, metallic tinkle, shrill and clear, of the little bell' which in his childhood, used to herald Swann's arrival at the garden door. The sound, therefore, must have lived on in himself. It follows from this that time past is not entirely dead, as it seems to be, but has become incorporated with us. ' This is the creative idea at the root of Proust's book. We set off in search of time which is seemingly no more, though actually it is still present and merely waiting to emerge once again into existence." [Andra Morois : The Art of Writing]

সময় সেই দৈত্য—ভালবাসা, আলো, আশা, হাসা, কাঁদার রমণীকে যে চুরি করে নিয়ে গেছে চোখের পলক না ফেলতে। স্মৃতি সেই জীয়নকাঠি যার স্পর্শে মৃত ভালবাসা, আলো আশা, হাসা কাঁদার পাষাণ রাজকন্যা জেগে ওঠে আস্তে আস্তে ; চোখে আবার পলক পড়ে তার।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেরই সত্য এই। আর সত্য বলেই প্রুস্তের থিম্-সং, "Only true paradise is paradise lost." আমাদের প্রত্যেকের জীবনসংগীতেরই অনিবার্য স্বরলিপি :

"In each one of us there is something permanent, namely the past. By recapturing it we are enabled, at certain privileged moments, 'to have an intuition of ourselves as absolute entities.' And so it is that to the first theme—Time the destroyer, an answer is given by a complementary theme—Memory the preserver."

যে কোনও ভাবে এই স্মৃতিকে জাগালেই কিন্তু প্রুস্তের কার্যসিদ্ধি হবে না। ["Proust's basic contribution was to teach mankind a certain manner or evoking the past."]

কী সেই উপায় তাহলে ? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই মরোয়াঁ প্রুস্তের অতন্দ্রতাকে আবিষ্কার করেছেন প্রতিভা হিসেবে। মরোয়াঁর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সচেতনভাবে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করে, দলিল ও অন্যান্য প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করে, বিচার-বিশ্লেষণ এবং যুক্তির সাহায্যে অতীতকে পুনর্গঠন করা যায় কিন্তু তাতে সফল হবে না প্রুস্তের করণীয় :

"But no deleberate act of memory will ever give us that sensation of the past breaking through into the present which alone makes the permanence of the self perceptible."

সম্ভব হবে তা যদি "Only if involuntary memory comes into play can we recover lost time. How, then, is this set in motion ?

By the coming together of a present sensation and a memory. The past goes on living in tastes and smells."

এক কাপ চায়ে চুমুক দিতেই তীব্র আনন্দ পেলেন প্রুস্ত। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল প্রশ্ন। কেন এত আনন্দ? খুশীর কারণ চায়ের কাপে নেই; নিজেই তার উৎস প্রুস্ত,—এই উত্তর পেলেন নিজের কাছ থেকে, নিজের প্রশ্নের এই এক অবধারিত উত্তর। স্মৃতিচারণ শুরু হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। ফিরে গেলেন প্রথম চামচ ভরে চা খাবার মুহূর্তে। বহুবার মনে হল, এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের দুর্বহ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই বর্তমানের দুশ্চিন্তা আর ভবিষ্যতের আশার অন্ধকার-আলোকে ডুব দেন, কিন্তু পারলেন না প্রুস্ত। হঠাৎ খুলে গেল অতীত দিনের সিংহদ্বার:

"The taste was that of the little crumb of madaleine..."

এই চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পুরনো দিনে প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস আমরা আগে আলোচনা করেছি; তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই; তাই সে কথা থাক। তার পরিবর্তে এখন এই প্রসঙ্গে মরোয়াঁ যা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি হোক। মরোয়াঁর মতে "Such an occurance gives to the artist the feeling that he has conquered eternity. Nothing can be truly savoured and preserved except under the aspect of eternity which is also that of art. This is the essential, the foundamental and new subject of La Recherche du Temps Perdu."

প্রুস্তের আগে, মরোয়াঁর সুস্পষ্ট অভিমতে, আর কেউ কেউ এর হদিস পেলেও প্রুস্তের মত অন্তঃস্পর্শী নয় তাঁদের কারুর প্রতিভার রশ্মি। তাঁরা রহস্যপুরীর সিংহদ্বারে করাঘাত করেছেন; সেই কক্ষের দ্বারে যেখানে বন্দিনী রাজকন্যা অপেক্ষা করে প্রতি যুগেই সত্যের খাপখোলা বাঁকা তরবারির জন্যে; কিন্তু কেউই অবারিত করতে পারেন নি তার অর্গল। কেবল প্রুস্ত পেরেছেন:

"Only Proust saw that, in association with a first memory, and as though coupled to it, a whole world which had seemed to be buried in oblivion, could be made to come from a cup of tea."

আঁদ্রে মরোয়াঁ আরও বলেছেন, যে মহৎ অন্বেষক প্রুস্ত যার সন্ধানে ক্ষ্যাপার মত হাতড়ে ফিরেছেন পরশপাথর, সে বস্তু তিনি ঘরে-বাইরে প্রেমে-সংগ্রামে কোথাও পান নি। না পেয়ে এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, "that such an absolute can be bound only outside time."

সময়ের স্বরলিপি বলেছি আমরা প্রুস্তের 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ্‌স্ পাস্টকে'। কিন্তু প্রুস্তের এই বই তা ছাড়াও আরও কিছু। আঁদ্রে মরোয়াঁ এরই সম্পর্কে সবই বলেছেন, আবার কিছুই বলেন নি। সে কথাটা কী, আমরা অতঃপর তাই বলে যবনিকা টেনে দেব প্রুস্ত-পর্যায়ের ওপর।

সেকথাটির আভাস দিয়েছেন মরিয়াক: "Even more then the intermissions of the heart, we have, in Marcel Proust, the intermissions of happiness. Whence come this gusts of joy?" মরিয়াক উত্তর দিয়েছেন এর এই বলে যে, "That a great artist partially draws aside for us the veil of ugliness and insignificance which leaves us incurious before the spectacle of the universe."

মরোয়াঁর সম্পূর্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি যে তার প্রমাণ:

"As Van Gogh, from a straw-bottomed chair, as Degas or Manet from an ugly woman, created masterpieces, so does Proust take an old cook, a small damp-mould, a room in the country, a hawthorn tree, and says to us: 'Look more closely: beneath these simple things lie all the secrets of the world.'"

আমরা বলব: 'এহ বাহ্য। আগে কহ আর'।

[ক্রমশঃ]

সুরমা

শ্রীঅতীন্দ্র ঘোষ

ভদ্রসমাজে শোনবার কথা নয় সুরমার নাম। তবে ভদ্রসমাজে থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে যারা গা ঢাকা দিয়ে গোপন অলিগলি খুঁজে বেড়ায় তারা জানে আর জানি আমি।

আমি ডাক্তার। সুরমার অন্তিম সময়ে আমি তার পাশেই ছিলাম। তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ। কোন এক কঠিন ব্যাধিতে তার মৃত্যু হয়; আমি তা প্রকাশ করতে চাই না। কারণ আড়াই বছর তার চিকিৎসা করেছিলাম আমি।

মৃত্যুর দুদিন আগে সুরমা আমার হাতে একটা মোটা খাম দিয়ে বলেছিল, ডাক্তারবাবু, দিন আমার ঘনিয়ে এসেছে; এই চিঠিখানা আপনাকে দিয়ে গেলাম, আমার মৃত্যুর পর এটা আপনি পড়ে দেখবেন।

সুরমার দেহান্তরের দিন সাতেক পরে খামখানা খুলে আমি খুবই অবাক হলাম। তার মধ্যে ছিল আমার নামে একটা উইল আর তার জীবনী-লিপিবদ্ধ একখানি বড় চিঠি। তার সঞ্চিত পঞ্চাশ হাজার টাকা ও বসত বাড়িখানা আমার নামে সে উইল করে দিয়ে গেছে বিনা শর্তে। চিঠিখানা পড়ে আমি আরও অবাক হলাম এই কারণে যে আমাদের দেশে পতিতাদের সম্বন্ধে যে ধরনের নিন্দা ও কুৎসা প্রচলিত, সুরমা কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। কেন না তার মধ্যে পবিত্রতাই বেশি। তাই নির্ভয়ে তার এই চিঠিখানি প্রকাশ করবার মনস্থ করলাম।

ডাক্তারবাবু,

জীবনে অনেক পুরুষের সংস্পর্শে এসেছি—তাদের মধ্যে সমাজের সর্বনিম্ন শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সম্মানিত পুরুষই ছিল। কিন্তু তারা কি সকলেই দুশ্চরিত্র, অসৎ ও লম্পট? তাদের মধ্যে সচ্চরিত্রসম্পন্ন অনেক জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। একটা কথা কি জানেন ডাক্তারবাবু, পুরোপুরি সর্বগুণসম্পন্ন ও নিষ্কলঙ্কিত জীবন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই নেই আবার অসৎ ও লম্পট ব্যক্তির যে একেবারে গুণহীন কলঙ্কিত জীবন তাও নয়। বাহ্যতঃ আমরা জ্ঞানী ব্যক্তির গুণ ও নিষ্কলুষিত জীবনযাপনই দেখতে পাই কিন্তু এইসব সজ্জন ব্যক্তিরও অন্তরে যেন কোথায় একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে; আর তা ধরা পড়ে আমাদের কাছেই।

আমি যে কঠিন ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হলাম তার শুরুতেই আপনাকে ডেকে আনি আমার চিকিৎসার জন্যে। বয়সে আপনি প্রবীণ এবং এই শহরের একজন খ্যাতনামা ডাক্তার। কিন্তু আপনি চিকিৎসায়, ব্যবহারে, কথাবার্তায় ও চলাফেরায় এত কঠিন ও কঠোর যে আমি প্রথমে ভেবে পাই নি আপনি কী করে এতবড় প্রসিদ্ধ একজন ডাক্তার হলেন। আর ঠিক তার পরেই বুঝেছি পদ্মফুলের বহির্দিকটা যেমন কঠিন ও কর্কশ অথচ ভেতরের পদ্মনাল কত সুন্দর, নরম ও পরিষ্কার; ঠিক তেমনি বাইরে আপনি কঠিন ও কঠোর হলেও ভেতরে আপনার মন অত্যন্ত সরল শান্ত কোমল ও সহানুভূতিশীল। তাই আপনার প্রতি আছে আমার গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আজ পর্যন্ত আমার জীবনী কাউকে জানাই নি; আর কাউকে জানাতে গেলে সে বিরক্ত হবে, কিন্তু আপনি হবেন না। আপনি আমার ডাক্তার; আমার মানসিক ও শারীরিক কষ্ট আপনি বুঝেছেন। তাই শেষ সময়ে নিঃসন্দেহে আপনাকে আমার জীবনকথা জানাচ্ছি। সব-কিছু জানবার পর আশা করি আমার ব্যথা আরও তীব্রভাবে উপলব্ধি করবেন।

প্রথম দিন আপনাকে আমার অসুখের অবস্থা বিস্তৃতভাবে বলাতে আপনি বলেছিলেন, ওষুধ দিয়ে রোগের উপশম করতে পারি কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হবে না।

তবুও সুদীর্ঘ আড়াই বছর আপনাকে দিয়েই আমি চিকিৎসা করিয়েছি এই ভেবে যে মৃত্যু যখন হবেই তখন আপনার হাতেই হোক।

প্রথম যেদিন আপনি আমার বাড়ি এলেন তখন রাত আটটা। দেওয়ালে টাঙানো পাশাপাশি দুজন যুবা পুরুষের ফোটো দেখে আপনি খুবই অবাক হয়ে আমার দিকে ভ্রকুঞ্চিত চোখ তুলে একবার তাকিয়ে ছিলেন। আমি তখন তার কোন জবাব দিই নি। আজ সেই ভ্রূকুঞ্চিত চাউনির জবাব দিচ্ছি; পড়লেই বুঝতে পারবেন আমার সঙ্গে সেই দুজন পুরুষের কি সম্বন্ধ ছিল।

এঁদের নাম আপনিও শুনেছেন। কারণ স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের প্রখ্যাতনামা রাজনীতি-বিদদের মধ্যে এঁরাও দুজন। তাঁদের একজন সুঠাম সুন্দর বলিষ্ঠ ও আর একজন গৌরবর্ণ এবং প্রথম জনের চেয়ে একটু বেশী লম্বাচওড়া ও স্বাস্থ্যবান।

পতিতার ঘরে জন্ম নয় আমার। ভদ্র ও সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেছি আমি। লেখাপড়াও কিছু শিখেছি। বাবা বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানার কোন এক শহরে ওকালতি করতেন। ওকালতির প্রথম দিকেই বাবার প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পায়। ফলে তিনি এই শহরে একজন নামজাদা উকিল বলেই অভিহিত হন। কিন্তু ভাগ্যচক্রের ফেরে তিনি ধীরে ধীরে রাজনীতি দলে ভিড়ে যান; ফলে ওকালতির প্রসারও ক্রমে ক্রমে কমে আসতে থাকে কারণ তিনি প্রায়ই কোর্টে যেতেন না। শহরে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ি; এই শহরেই আমার জন্ম, বড় হয়ে পড়াশুনো করেছিও এখানে।

সেবার আমাদের শহরে বিরাট জনসভা হবে। বড় বড় বিপ্লবী নেতারা এসেছেন বক্তৃতা দিতে। এরকম মাঝে মাঝে হয়। বাবা ওকালতি প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, সংসারেও যেন একটা অভাব-অনটন দেখা দিয়েছে; আমি তখন নবম শ্রেণীতে পড়ি। বাবা রাজনীতি নিয়ে এত মেতে আছেন যে বাড়ির দিকে তাঁর একটু নজর দেওয়ার সময়ও নেই। আজ সভা-সমিতি, কাল বিপ্লবীর অফিস, পরশু অন্য শহরের জনসভায় বক্তৃতা, চতুর্থ দিন কলকাতায় যাওয়া, পার্টির কাজ ইত্যাদিতে জীবন ব্যস্ত।

দু বছর বয়সে আমার মা মারা যান। বাড়িতে বাবা। আমাকে মোটেই দেখতে পারতেন না তিনি। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। তবুও সন্তানের প্রতি মায়েদের যেটুকু স্নেহ-মমতা তাও আমি পাই নি। আমার আর কোন ভাই বোন নেই। মা প্রথমে বাড়ির চাকর ও পরে ঝিকে বিদায় দিলেন। ফলে বাড়ির ঝি-চাকরের কাজ থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কর্ম আমাকে একাই করতে হত। তবুও মার স্নেহ-ভালবাসা কোনদিন পাই নি। মাঝে মাঝে তিনি বাবাকে বলতেন, সংসারের যা কাজ তা দীপা একাই করতে পারে। তিনি আমাকে একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। সব সময়ই দুর্ব্যবহার করতেন। তাঁর এই দুর্ব্যবহারের ফলে আমার জীবনধারণ একেবারে দুর্বিষহ হয়ে উঠল। যতই কাছে যাবার চেষ্টা করেছি তাঁর ততই আঘাত পেতে হয়েছে আমাকে। একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু বিফল হওয়ায় শেষে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে লাগলুম।

আমার নাম আপনি কেন যারা শহরের খুব গোপন অলিগলিতে এসে রাত কাটিয়ে যায় তারাও জানে সুষমা বলেই, কিন্তু আমার আসল নাম হচ্ছে দীপ্তি।

যাক, কিছুদিনের মধ্যে সৎমা আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। উঠে-পড়ে লেগে একজন পাত্রও ঠিক করলেন। কিন্তু বাবার ঠিক পছন্দ না হওয়ায় তিনি খুঁতখুঁত করতে লাগলেন। অথচ তিনি নিজে খুঁজে যে একজন পাত্র ঠিক করে আনবেন সে সময়ও তাঁর নেই। গ্রাজুয়েট ছেলে, মাইনে বেশ ভালই। সরকারী চাকরি। আমার আর পড়াশুনা হল না। বার্ষিক পরীক্ষার দু মাস আগেই বিয়ে হয়ে গেল।

চলে গেলাম স্বামীর ঘর করতে এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। মা ও আমি দুজনেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললায়।

কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস। বিয়ের ছ মাস পরে স্বামী মারা গেলেন ক্যান্সার রোগে—যা বিয়ের আগে জানা যায় নি। মাও হয়তো জানতেন না এ কথা। হাজার শত্রু হলেও জেনেশুনে কি আর তিনি এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারতেন। বৈধব্য নিয়ে আবার বাপের বাড়ি ফিরে এলাম আমি।

সৎমা আবার কোপানলে দগ্ধ হতে লাগলেন। অকালে বিধবা হওয়ায় বাবাও মনে খুব আঘাত পেয়েছেন।

হ্যাঁ, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, আমাদের শহরে বিরাট জনসভা। এক সপ্তাহ ধরে এ সভা চলবে। প্রখ্যাতনামা অনেক বিপ্লবী নেতা এসেছেন। তাঁদের দু-একজন আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করছেন। শহরে আরও বিপ্লবীদের বাড়ি আছে; যাঁরা এসেছেন তাঁদের সকলেরই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমার ঘরে টাঙানো ফোটোর যে দুজন যুবা পুরুষ তাঁদের ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের বাড়িতে। এঁরা দুজন পরম বন্ধু। যেখানেই যান, যেখানেই থাকেন একসঙ্গে সব-কিছু করেন। একজনের চেহারা এত সুন্দর যে আঙুল দিয়ে টোকা দিলে রক্ত ফেটে পড়ে। দেহ বলিষ্ঠ ও কান্তিময়, চুলগুলো একটু কোঁকড়া, নাতিদীর্ঘ দেহবিশিষ্ট গম্ভীর চিন্তাশীল সত্যিকারের দেশসেবক। আর দ্বিতীয় জনের গায়ের রঙ গৌরবর্ণ, আরও বেশী শক্তিশালী ও কান্তিময়, প্রথমের চেয়ে লম্বা ও চওড়ায় দেহের আকার বড়। কপালে তিনটি চিন্তার রেখা সদাই দৃষ্টমান। প্রথম জনের মন বেশ কোমল ও সরল এবং প্রায়ই সহাস্যবদন। আর দ্বিতীয় জনের মন একটু কঠিন ও কঠোর—প্রায়ই মৌন। মন ও চেহারায় উভয়েই বিপরীত ধর্মাবলম্বী অথচ এঁদের দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। একসঙ্গে এঁরা অনেকবার জেল খেটেছেন। অন্যান্য নেতারাও জেল খেটেছেন তবে এঁদের মত একসঙ্গে নয়। এঁদের কেউ বলে জোড়মাণিক, কেউ বলে কানাই-বলাই আবার কেউ বলে রাম-লক্ষ্মণ। আমি তাঁদের প্রথমকে রাম ও দ্বিতীয়কে লক্ষ্মণই বলব।

আমার তখন বয়স আঠার। দেহে ভরা যৌবন, যৌবনের স্বাদ পেয়েছি বটে কিন্তু সাধ মেটে নি। মিটবেই বা কি, করে—অল্প বয়সে হলাম বিধবা। রাম-লক্ষ্মণের সেবা-শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করলাম আমি। আর তা না করে উপায়ও ছিল না কারণ এঁদের দেখবার মতন বাড়িতে আর কেউ ছিল না। আমার মা হচ্ছেন অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী। পাঁচ-ছ বছর আগেও যখন আমাদের বাড়িতে নেতারা আসতেন তখন বাড়ির ঠাকুরই সবকিছু করত। এখন তো আর ঠাকুর নেই। যাই হোক বাইরের ঘরের একটাতে এঁদের থাকার ব্যবস্থা হল। প্রতিদিন স্নানের জল থেকে আরম্ভ করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য যাবতীয় কাজ আমি নিজেই করেছি।

একবার বাইরের ঘর, আর একবার ভেতরের ঘর করে কি ভাবে যে সারাদিন কেটে যেত বুঝতেই পারতুম না। অন্য সময় এত বেশী কাজ করলে কিছুটা ক্লান্তিবোধ করতুম কিন্তু তখন যেন তা মোটেই অনুভব হত না। বরঞ্চ বেশ আনন্দের সঙ্গেই করে যেতুম। রাম আমার সঙ্গে মন খুলেই কথাবার্তা বলতেন। আমার তো সভায় যাওয়ার সময় হত না তাই তিনি সভায় কে কেমন গরম গরম বক্তৃতা দিলে, কে কতক্ষণ সময় নিলে, শ্রোতাদের মধ্যে কেমন তার প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সভার কথা রোজ এসে আমাকে বলতেন। কিন্তু কি জানি কেন এ বাড়িতে আসা পর্যন্ত লক্ষ্মণ বেশী কথাবার্তা বলতেন না আমার সঙ্গে, প্রায়ই মৌন আর আমার ওপর কেবলই তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি। রাম যখন কথা বলতেন তিনি পাশে বসে আমার ওপর স্থিরদৃষ্টি রেখে নিঃশব্দে তা শুনতেন। হয়তো তিনি তাঁর দৃষ্টি দিয়ে আমাকে বুঝতে চেষ্টা করতেন।

আমি তাঁদের উভয়ের পায়েই আমার দেহ মন ও প্রাণ ঢেলে দিলাম। যে আমাকে দু হাতে বুকে তুলে নেবে আমি তাঁরই। কারণ দুজনকেই আমার ভাল লেগেছে। তাঁরা যতক্ষণ ঘরে থাকতেন আমি তাঁদের ঘরের আশেপাশেই থাকতুম। রাম বলতেন, দীপ্তি, তুমি ভাল ভাল খাবার খাইয়ে আমাদের যেমন মোটা আর তাজা করে দিচ্ছ তাতে কি আর গরম গরম বক্তৃতা না হয়ে পারে। আমি বললাম, ভালই তো, আজকাল যে যত বেশী গরম গরম বক্তৃতা দিতে পারবে তার তো ততই নাম; বক্তৃতায় কাজ হোক আর নাই-ই হোক।

অন্যদিন যে সময়ে সভা থেকে ফিরে আসতেন আজ যেন তার দু ঘণ্টা আগেই রাম ক্লান্তদেহে ফিরে এসে বললেন, দীপ্তি, আজ একসঙ্গে ঝাড়া দু ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছি, বড্ড ক্লান্ত; গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমায় এক কাপ চা খাওয়াতে পার?

আমি দেরি না করে তাড়াতাড়ি চা নিয়ে এসে দেখি

নতুন **নির্মল** হাফ-বার সাবানে
কাচলে আপনার কাপড়চোপড় হবে

JWTKPN

তিনি বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে শুয়ে আছেন। আমার হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে এক চুমুক খেয়ে পলকহীন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, জীবনের সদর-মহলেই বেশী সময় কাটিয়ে ছিলাম, অন্দর-মহলে যে এত স্নেহ-প্রীতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকতে পারে তা আজই জানতে পারলাম। আগে জানলে কি আর অন্দর-মহল ছেড়ে সদর-মহলে শুষ্ক জীবনে ঘুরে বেড়াই! আমি বললাম, বয়স তো পার হয় নি, এখন থেকে না হয় অন্দর-মহলেই বিচরণ করুন না। আমার দিকে মুচকি হেসে আবার চায়ের কাপে মুখ দিলেন তিনি। আমি পাশে অর্ধশায়িত। চা খাওয়া শেষ হলে জিজ্ঞেস করলাম, আর এক কাপ এনে দেব? তিনি বললেন, না থাক, এখন একটু বিশ্রাম করি। একটু চুপ করে আবার বললেন, আমার বড় মাথা ধরেছে; দীপ্তি, আমার মাথাটা একটু টিপে দেবে? ধীরে ধীরে মাথা টিপতে লাগলুম। ডাক্তারবাবু, ঠিক এই সময় আমার দেহ ও মনের যে কী অবস্থা তা আপনাকে লিখে বোঝাতে পারব না।

হঠাৎ ঘরের বাইরে থেকে মা আমায় ডাকলেন, দীপ্তি, এদিকে এস। তিনি আমাকে আমার শোবার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে একবার আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে পরে কর্কশস্বরে বললেন, ভুলে যেয়ো না যে তুমি বিধবা।

ভুলে গিয়েছিলাম যে সত্যি আমি বিধবা। মনে ভীষণ আঘাত পেলাম। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মন বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বিধবা হয়েছি তো কি হয়েছে? আমার দেহের রূপ, যৌবন ও লাবণ্যতা এ সবের কি কোন মূল্য নেই? আমার কি জীবন বৃথাই কাটবে? সমাজ কি এতই নিষ্ঠুর? কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লুম। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি আজ আর তা ঠিক মনে নেই। হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে উঠে শুনতে পেলুম মা বলছেন, শুধু শুয়ে থাকলে সংসারের কাজ কী করে চলে? লোকজন সবাই ফিরে এসেছে, তাদের সব কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না? তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

এ অঞ্চলের মধ্যে আমাদের বাড়িতেই বিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা ছিল। বাড়িতে বৈঠকখানা থেকে আরম্ভ করে সদর-মহল ও অন্দর-মহল মিলিয়ে ত্রিশখানা ঘর। পার্টির লোক অনবরতই আসা-যাওয়া করে। এই ভাবে একবছর কেটে গেল।

সেদিনের রাত্রের কথা আমার আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে। রাম ও লক্ষ্মণ রাত প্রায় এগারোটায় বাড়ি ঢুকে বললেন, আমরা যে এসেছি কেউ যেন না জানতে পারে, আজকের রাত থেকে কাল খুব ভোরে এখান থেকে পালিয়ে যাব। হঠাৎ রাত চারটের সময় পুলিস বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। রাম-লক্ষ্মণকে গ্রেপ্তার করে পুলিস তাদের হেড-কোয়ার্টার্সের দিকে নিয়ে গেল।

সে রাত্রে ওঁরা আসা অবধি আমি তাঁদের কাছেই প্রায় সব সময় কাটিয়েছি। হঠাৎ এ রকম একটা ঘটনা যে নিমেষের মধ্যে ঘটে যাবে আমি তা কল্পনাও করতে পারি নি। অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি—কি ব্যাপার? কিন্তু ওঁরা কিছুতেই কোন কথা আমাকে বললেন না। আহারের সময় দুজনেই বললেন, দীপ্তি, জীবনে আর তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়তো হবে না। কষ্ট হয়তো অনেক দিয়েছি, অপরাধও করেছি অনেক—তবু ক্ষমা করো। আমি যেন নির্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার ঠিক একটু পরেই জানতে পারলাম হিজলী খালের ধারে গত পরশু এক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়েছে। রাম-লক্ষ্মণ সেই লুণ্ঠনকারীদের দলে ছিলেন কিনা তা বলা কঠিন তবে পুলিসের সন্দেহ যে তাঁরাও দলে ছিলেন।

ভোর না হতেই আমি, বাবা ও পার্টির আরও কয়েকজন চলে গেলাম জেলখানায়। ওঁদের খালাস করে আনবার জন্যে বাবা প্রাণপণ চেষ্টা করে কেসটাকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে কোর্টে উপস্থাপিত করলেন। যেদিন স্পেশাল ট্রাইবুনালে অতিরিক্ত জজ মিঃ দত্তের এজলাসে ওঁদের মামলার শুনানি আরম্ভ হল, সেদিন শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁদের দেখবার জন্যে কোর্টের বারান্দায় ও আশেপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা কয়েকজন একপাশে ছিলাম। সকলেই ভেবেছিল ফাঁসি হবে দুজনের কিন্তু বাবার ওকালতির সুনিপুণতায় ফাঁসির পরিবর্তে হল রামের পাঁচ বছর আর লক্ষ্মণের তিন বছর কারাদণ্ড।

রামকে হিজলী জেলে আর লক্ষ্মণকে বাঁকুড়া জেলে

রাখবার ব্যবস্থা হল। জেলখানার কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে রাম পনেরো দিন অনশন করেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। নির্দিষ্ট সময়ের দু বছর আগেই গভর্নমেন্ট তাঁকে মুক্তি দেয়।

মুক্তি পাওয়ার পর এঁদের কাজকর্ম খুব ধীরে ধীরে গোপন ভাবে চলতে থাকে। এমনি ভাবে প্রায় ছ মাস কেটে যায়। রাম আমার প্রতি যে বেশ আসক্ত এবং এ কয়েক মাসের মধ্যে আমার ওপর তাঁর স্থির জিজ্ঞাসু নেত্রের চাউনিতে বেশ বুঝতে পেরেছি যে তাঁর মনের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

হঠাৎ একদিন রাত্রে বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে চাপা গলায় রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে তর্ক হচ্ছে আমাকে নিয়ে এও শুনতে পেলাম।

পরদিন রাম সন্ধ্যার দিকে বাড়ি না থাকায় লক্ষ্মণ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, দীপা, তোমাকে একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, সেখানে গিয়ে কি তুমি একা থাকতে পারবে?

আমি জবাব দিলাম, কেন, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না?

সেটা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে কিনা তাই ভাবছি।

আপনি যদি সঙ্গে থাকেন তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

তাহলে রাজি আছ তুমি পুরোপুরি?

হ্যাঁ।

তবে আজই রাত তিনটের ট্রেনে রওনা হব, প্রস্তুত হয়ে থেক। আমি ঠিক সময়ে উঠে তোমার দরজায় গিয়ে তিনটে টোকা দিলে তুমি একটা স্যুটকেস ও ব্যাগ নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসবে।

কোথায় যাব, কী পরিবেশ সেখানে, কেন যেতে চাইছি এবং মঙ্গলজনক কেন হবে না এ প্রশ্নগুলো তখন মনে একটুও জাগে নি। জাগলে কি আর এ পাপ-জীবন গ্রহণ করতাম? আর তিনি যে আমার এই সর্বনাশটি করবেন তাই বা কে জানত! ভেবেছিলাম যে এখান থেকে যে কোন উপায়ে পালাতে পারলেই যেন বাঁচি। এখানে থাকলে আমি কিছুতেই সুখী হব না। দূরে গেলে বোধ হয় আমরা দুজনে সুন্দরভাবে সংসার বাঁধতে পারব।

যে সমাজ বালবিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য মত দেয় না, তার ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা করে না, রূপ-যৌবনের কোন মর্যাদা বোঝে না, এমন নিষ্ঠুর নির্দয় সমাজ আমি মানি না। এ রকম সমাজে ধর্ম আর অধর্মই বা কী?

দ্বিতীয় দিন রাত প্রায় আটটার সময় যে স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম তার নাম বেনারস। স্টেশন থেকে একটা রিক্শা ভাড়া করা হল। লক্ষ্মণ রিক্শাওয়ালাকে কী একটা জায়গার নাম বলাতে সেও ঘাড় নেড়ে যেতে লাগল সেই দিকে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ভরসাহয় ছোট একটা গলিতে এসে রিক্শাটা থামল। আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে লক্ষ্মণ ঢুকলেন একটা বাড়ির ভেতর। পাঁচ মিনিট পরে চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বছরের এক প্রৌঢ়া মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। প্রৌঢ়াটি তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরে রিক্শা থেকে নামিয়ে বলল, এস মা, এস।

আহা! মহিলাটির কী মিষ্টি ভাষা! আজ বুঝতে পারছি তার ওই মিষ্ট ভাষণের মধ্যে ছিল কতবড় নির্মম ষড়যন্ত্র। এক হাতে স্যুটকেসটা নিয়ে সে আমাকে সঙ্গে করে ভেতরে ঢুকল। লক্ষ্মণ তাঁর ব্যাগটা আর কাঁধ থেকে নামালেন না। ভেতরে গিয়ে আমাকে বললেন, আমি সব বলে দিয়েছি ঠিক করে। আজ এখানেই খেয়ে শুয়ে পড়। আমি হোটেলে থাকব। কাল ভোরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব। এখন চলি, হয়তো হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে লক্ষ্মণের অনেক কথা ছিল কিন্তু কিছুই বলা হল না। ভাবলাম কাল সকালে যখন আসবেন তখন না হয় বসে দু দণ্ড গল্প করা যাবে।

পরদিন বেলা দশটা বাজতে চলল কিন্তু লক্ষ্মণের দেখা নেই। আমি আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলাম না। তারপর সেই মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলাম, কই, লক্ষ্মণদা তো এখনও এলেন না! প্রত্যুত্তরে মহিলাটি বলল, আসবে বাছা, আসবে। অনেকেই আসবে। অত ব্যস্ত হয়ো না।

কিন্তু লক্ষ্মণ আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি।

ছিলাম ভদ্র ঘরের মেয়ে, হলাম পতিতা। আর সেই দিন থেকে শুরু হল প্রেতজীবন। জীবনে বেঁচে থাকার পালা নিয়ে শুরু হল লড়াই। ডেপুটি-কালেক্টর, স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপক, ছাত্র ও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আমার এখানে এসেছেন। রাজনীতি, সাংসারিক ও ভগবৎ-বিষয়ে বিভিন্ন লোকের কাছে বিচিত্র ধরনের কথাবার্তা শুনেছি।

আমার জন্তে তাঁদের দেশের কাজ ব্যাহত হবে এই ভেবে লক্ষণ আমার এই সর্বনাশ করলেন। বৃটিশের পরিবর্তে একজন নিরীহ নারীর ওপর এরকম নির্মম প্রতিশোধ নিয়ে তার ক্ষতি করাই কি তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের মূলমন্ত্র ছিল? আমার অনুপস্থিতিতে হয়তো তাঁরা নতুন উদ্দমে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কাজ করতে পেরেছেন। আমি এখন সমাজচ্যুত। কিন্তু ভারত এখন স্বাধীন হয়েছে। আর এই স্বাধীনতার মূলে একাধারে আমারও রয়েছে মহান্ ত্যাগ। লক্ষণ এখন দেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বাঁকুড়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করে হত্যা করায় রামের ফাঁসি হয়। যে বছর ফাঁসি হয় তার ছ মাস পরে বাবাও পরলোক গমন করেন।

মৃত্যুর আড়াই বছর আগে এই কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে সবকিছু ছেড়ে দিলাম আমি। জীবনে এসেছে ধিক্কার। ভুল করেছি। মস্তবড় ভুল, কিন্তু তা তো আর এখন শোধরাবার সময় নেই অনেক পাপও করেছি তাই তার ফল ভোগ করছি কিন্তু এই পাপের মধ্যে কি কোন উৎসর্গ ও পবিত্রতা নেই ডাক্তারবাবু? এটা কি সত্যি পাপ? আর য তাই-ই হয় তবে তার জন্তে কি আমি সম্পূর্ণ দায়ী না এর মূলে আরও কেউ দায়ী?

আমি পতিতা, আমার কেউ নেই; আপনার প্রা আমার গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস। তাই পাপবৃত্তিদ্বার অর্জিত আমার সঞ্চিত পঞ্চাশ হাজার টাকা ও বসত বাড়িখানা আপনার নামে উইল করে দিলাম; আশা করি নিঃসঙ্কোচে ও বিনা দ্বিধায় অভাগার এই সামান্ত দান গ্রহণ করে আমার মত এবং আমার চেয়েও দরিদ্র অনাথা মেয়েদের সাহায্য করবেন, যেন তারা আমার মত পাপপঙ্কে লিপ্ত না হয়। আপনার সঙ্গে এটা আমার শর্ত নয় তবে আপনার প্রতি এটাই আমার বিশেষ শেষ অনুরোধ। আমি পাপী হতে পারি কিন্তু আমার টাকা-কড়িতে পাপের স্পর্শ লাগে নি; কাজেই তারা পাপী নয়। আপনার কাছে নির্লজ্জের মত সব কথাই প্রকাশ করলাম। আশা করি ক্ষমা করবেন। আমার অন্তিম প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

আপনার
সুরমা

সাহিত্যে সমাজচিত্র

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

চেতনার উৎস ও বিকাশ মানুষের মনে। মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চেতনাপ্রবাহেরও একটা ক্রম-সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়। অ-সম্প্রসারিত ব্যক্তি-চেতনা নিয়ে মানুষ যখন সমাজে বিচরণ করে তখন সে স্বয়ং-কেন্দ্রিক। তার জীবনের বৃত্ত তখন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ—তুলনা করা যেতে পারে পদ্মের কুঁড়ির সঙ্গে। প্রকৃতি-জগতে পদ্মের কুঁড়িরও অস্তিত্ব আছে, কিন্তু অজস্র পাপড়ি নিয়ে উন্মীলিত ফুলের সৌন্দর্য নেই। সীমিত ব্যক্তিচেতনা যখন ব্যষ্টিচেতনায় প্রসার লাভ করে তখন তা সহস্রদল পদ্মের সৌন্দর্যে বিলসিত হয়ে দর্শকের বিস্মিত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ব্যক্তিমনের ছোট্ট আকাশ থেকে ব্যষ্টিমনের উদার আকাশে উত্তরণ যেন ক্ষীণস্রোতা গিরিনির্ঝরিণীর সীমাহীন সমুদ্রের জলে মিশে যাওয়ার মত।

ব্যক্তিমনের সীমায়িত পরিধি থেকে ব্যষ্টিমনের উদার অনুভূতির রাজ্যে মনের এ গতি অবশ্য বাধাহীন নয়। মানুষের স্বার্থান্ধ দুঃখের অনুভূতি মনের এ ব্যাপ্তির পথে আবর্তের সৃষ্টি করে। দুর্বল মানসিকতাগ্রস্ত আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি সে আবর্তে পড়ে দিশেহারা হয়—হারিয়ে ফেলে জীবন-বিকাশের প্রসারিত রাজপথ। আর যে সব সবল ব্যক্তিপুরুষ বলিষ্ঠ চেতনার প্রভাবে সঙ্কীর্ণ জীবনাবর্তকে অতিক্রম করে মানবাদর্শের বৃহৎ লক্ষ্যের অভিমুখী হন তিনিই লাভ করেন মানুষ হিসেবে পরম চরিতার্থতা। জগতের মহৎ সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টিমাত্রই এ মানব মাহাত্ম্যের বাণীস্পন্দিত।

বর্তমান সঙ্কীর্ণ জীবনচেতনাকেন্দ্রিক আবিল জীবনাবর্ত অতিক্রম করে যখন কোন লেখক প্রসারিত ব্যক্তিচেতনা নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন তখন আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে আশান্বিত হই। সম্প্রতি এ ধরনের একখানা বই হাতে এসেছে: প্রতিষ্ঠিত লেখক বনফুলের 'হাটে-বাজারে'। রচনাকে প্রচলিত যে অর্থে শিল্পসমন্বিত রূপকর্ম বলা হয়—এই বইখানি হয়তো সে পর্যায়ের নয়, সাম্প্রতিক পাঠক-সমাজের আকাঙ্ক্ষিত মনোহারী কাহিনী সৃষ্টির দিকেও লেখকের মনোযোগ নেই। একজন মানবহিতব্রতী ডাক্তারের সমাজসেবাব্রতের নেহাত সাদামাঠা কাহিনী সহজ ভঙ্গীতে বিবৃত করা হয়েছে ১৭৮ পৃষ্ঠার মিতায়তন এ গ্রন্থখানিতে। কাহিনীতে ব্যক্তিমনের অস্পষ্ট রহস্যজগতের রূপসন্ধানেই যাঁদের আনন্দ তাঁরা হয়তো সমাজজীবনের বাস্তবধর্মী এ চিত্র-সমষ্টি দেখে আনন্দ পাবেন না; কিন্তু ব্যক্তি বা সমাজ-জীবন নিয়ে রোমান্টিক কল্পনার বুদ্বুদ সৃষ্টিতে যাঁরা আগ্রহী নন, আমাদের সমাজের বাস্তব রূপ দেখে যাঁরা কখনও আনন্দে উদ্বেলিত হন, আবার কখনও বা বেদনায় অভিভূত হন—তাঁদের কাছে বনফুলের এ বাস্তবধর্মী সমাজচিত্র একই সঙ্গে চিন্তা ও আনন্দের খোরাক যোগাবে নিশ্চয়ই।

বর্তমান যুক্তিবাদী জীবন-দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ নিরাকার ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। তাই বলে এঁদের নাস্তিকও বলা চলে না। জীবন-চিন্তার দিক দিয়ে এঁরা বুদ্ধিবাদী। বিশ্বসৃষ্টিতে অপ্রত্যক্ষ ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও প্রত্যক্ষ মানুষের ওপর এঁদের বিশ্বাস সীমাহীন। এ মানবপ্রত্যয়ের প্রভাবে জাঁ পল সার্ত্র বলেন:

"Atheistic existentialism, of which I am a representative declares with greater consistency that if God does not exist there is at

least one being whose existence comes before its essence, a being which exists before it can be defined by any conception of it that being is man or as Heidegger has it, the human reality."

'হাটে-বাজারে'র লেখক সেই বুদ্ধিজীবী অস্তিত্ববাদীদেরই একজন।

অস্তিত্ববাদীরা সৃষ্টির মধ্যে মানুষের অস্তিত্বকেই শুধু একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাস করেন না, এঁরা মানুষের মর্যাদায়ও বিশ্বাসী। মানুষ একটি নির্জীব পাথর বা টেবিলের চাইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ মানুষের একটি সজীব ব্যক্তিমন আছে—যে মন তাকে নিত্যনিয়ত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলছে এবং এই অন্তর্নিহিত তাড়না সম্পর্কে যে মন সচেতন। এই ব্যক্তিক দৃষ্টি ও অনুভূতির অধিকারই মানুষকে স্থাপন করেছে ভবিষ্যৎ-বোধহীন নিকৃষ্ট জীব-জগৎ ও উদ্ভিদ-জগতের ঊর্ধ্বে। এই সদাজাগ্রত ব্যক্তি-সচেতনতা আছে বলে মানুষই বোধ হয় নিজের কর্মের জন্য অপর সকল জীব থেকে বেশী দায়ী। এ দায়িত্বকে শুধুমাত্র ব্যক্তির দায়িত্ব বলে মনে করলে ভুল করা হবে। মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং ব্যক্তি যদি নিজের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে পরোক্ষ ভাবে সে সমাজ তথা বৃহৎ মানব-জীবনের ক্ষতি করে।

সমাজ-জীবনে ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কে অস্তিত্ববাদীদের মত বনফুলও অতি-সচেতন।

ব্যক্তিজীবনে মানুষের সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হল শান্তি। অস্তিত্ববাদীরা কিন্তু মনে করেন শান্তি হল সেই সব মানুষেরই জীবনবেদ—যাঁরা নিষ্ক্রিয়, যাঁরা সাধারণতঃ আশা করেন তাঁদের কর্তব্যটুকু অপরে করে দেবে। অস্তিত্ববাদীদের দৃঢ় প্রত্যয়—এ জগতে কর্ম ছাড়া অপর কিছুর সত্য অস্তিত্ব নেই। মানুষের লক্ষ্য, মানুষের অনুভব এবং মানুষের কর্মের ওপরই নির্ভর করে মানুষের সক্রিয়তার অস্তিত্ব: "Man is nothing else but what he purposes, he exists only in so far as he realises himself, he is therefore nothing else but the sum of his actions, nothing else than what his life is."

এ কর্মনির্ভরতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বনফুল তাঁর 'হাটে-বাজারে' গ্রন্থে।

সাধারণতঃ মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের বাধা হিসেবে নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে দায়ী করে থাকে। তারা বলে থাকে—আমরা অনেক কিছু করতে পারতাম, অনেক কিছু হতে পারতাম, শুধু প্রতিকূলতার জন্যই…। অস্তিত্ববাদীরা কিন্তু এ সমস্ত সম্ভাবনাকে সত্য বলে মেনে নিতে নারাজ। তাঁরা বলেন: "There is no love apart from the deeds of love, no potentiality of love other than that which is manifested in loving; there is no genius other than that which is expressed in works of art."

এঁদের মতে বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বই একমাত্র নির্ভরযোগ্য বস্তু; মানুষের স্বপ্ন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মাপকাঠি দিয়ে মানুষের পরিচয় পেতে গেলে অনেক সময় ঠকতে হয়।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, শুধুমাত্র মানুষের কৃত কর্মের মধ্যেই কি মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়? একজন শিল্পীর প্রতিভার প্রকাশ কি শুধুমাত্র তাঁর আঁকা কয়েকখানি ছবির মধ্যেই? অস্তিত্ববাদীরা বলেন, অবশ্যই তা নয়। অস্তিত্ববাদীদের মতে মানুষের প্রকৃত পরিচয়—যে কাজগুলো করবে বলে সে হাতে নিয়েছে এবং সে কাজ করতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক মানুষের সঙ্গে সে যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে—তার মধ্যে।

অস্তিত্ববাদীদের মত 'হাটে-বাজারে'র লেখক বনফুলের লক্ষ্য পারিপার্শ্বিক মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন।

অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শনকে নিষ্ক্রিয় শান্তির দর্শন বলা চলে না। এর কারণ, এ দর্শন মানুষের পরিচয় খোঁজে মানুষের কর্মের ভেতর। এ দর্শন নৈরাশ্যবাদীর দর্শনও নয়, বরং বলা চলে তীব্র আশাবাদীর দর্শন। এ কথা বলবার হেতু এই যে, এই দর্শন বিশ্বাস করে মানুষের নিয়তি মানুষের কর্মের ওপর মুখ্যতঃ নির্ভরশীল: কর্মের মধ্যেই মানুষের আশা, কর্মের মধ্যেই মানুষের জীবনের প্রকাশ। অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শনকে তাই বলা চলে

কর্মনীতি এবং কর্মের পথে অগ্রসর হবার জন্ত নিজের কাছে নিজের অঙ্গীকার গ্রহণের দর্শন। এ দর্শন একান্তভাবে মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাসী। বস্তুমূল্য থেকে পৃথক মূল্যসমৃদ্ধ মানবতাবাদী জগৎ সৃষ্টিই এ দর্শনের মূল লক্ষ্য। এই জগৎসীমার মধ্যেই মানুষ নিজের ও অপরের মূল্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শন নিরীশ্বর সত্য কিন্তু মানুষের মূল্যে বিশ্বাসী। তাই কেউ কেউ এ দর্শনকে হিউম্যানিজমের প্রকারভেদ বলে মনে করেন। হিউম্যানিস্টেরা মানবসত্তাকেই চরম এবং মানুষের মূল্যকেই পরম মূল্যবান বলে বিবেচনা করেন। অস্তিত্ববাদী দর্শন এরকম কোন সিদ্ধান্তকে মেনে নেয় না। এর কারণ মানুষের মূল্য কতখানি তা তো এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় নি। সে অবস্থায় সৃষ্টির মধ্যে মানবসত্তাকে একমাত্র মূল্যসমৃদ্ধ অস্তিত্ব মনে করা ভুল বইকি। মানবতার এমন একটি বিপুল ব্যাপ্তি আছে যাকে অগাস্ট্ কোঁতের মত কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে সীমায়িত করতে গেলে তার গৌরবহানিই করা হবে।

বনফুলও অস্তিত্ববাদীদের মত বিপুলব্যাপ্ত মানব-জীবনের মূল্যে বিশ্বাসী।

সক্রিয় মানবসেবাব্রতের মধ্যে সত্তার ক্রমসম্প্রসারণ ও উত্তরণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন প্রবীণ সাহিত্যিক বনফুল তাঁর 'হাটে-বাজারে' নামক সমাজচিত্রে। এ জীবনকাব্যের নায়ক সদাশিব ডাক্তারের জীবনে রোমান্টিক চেতনার কোন চমকপ্রদ বৈচিত্র্য নেই সত্য, কিন্তু বাস্তব-ধর্মী এ জীবনচিত্রে মানবতার এমন একটি সংহত মহিমা প্রকাশ পেয়েছে যা সামাজিক মানুষের মনকে সবলে আকর্ষণ করে তার সীমায়িত জীবনচিন্তার সংকীর্ণ পরিধি থেকে একটি বৃহত্তর জীবন-বিকাশের দিকে।

'হাটে বাজারে' জীবনকাব্যের নায়ক ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য বিপত্নীক। একমাত্র মেয়েও বিবাহিতা হয়ে স্বামীর সঙ্গে বিলেত চলে গেছে। কলকাতায় বাগবাজারে তাঁর পিতার বহুদিনকার একটি ভাড়াটে বাড়ি ছিল। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি কলকাতায় ফিরে না গিয়ে বিহারের একটি শহরে বসবাস করেন। ডাক্তার সদাশিবের মন সামাজিক। মানুষের সাহচর্য ছাড়া তিনি বাঁচতে পারেন না। তাই তাঁর খালি বাড়িকে ভরে তুলেছেন তিনি বেকার ভাইপো চিরঞ্জীব ও তাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী মালতীকে দিয়ে। আর বাড়িতে আছে আওবলাল— বহুদিনকার পুরনো রাঁধুনি। কিন্তু এতেও তাঁর সামাজিক মন তৃপ্ত হয় না। মাঝেমাঝেই তিনি বহু লোককে নিমন্ত্রণ করেন বাড়িতে খাওয়ার জন্ত। মানুষকে খাইয়ে তিনি তৃপ্তি পান।

চাকরি করবার সময় সদাশিব প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে অনেক টাকা জমিয়েছিলেন। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি ভাবলেন সে টাকার ওপর নির্ভর করে তিনি কোন প্রিয়জনের কাছে থেকে জীবনের বাকী দিনগুলো আনন্দে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু কোথায় সে প্রিয়জন যার কাছ থেকে তিনি জীবনে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পারেন? স্মৃতির দিগন্ত অনুসন্ধান করে তাঁর মনে হল, "আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব যারা বেঁচে আছে, তারা নামেই আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব। প্রেম নেই কারো মনে। আছে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, আর তার উপর একটা প্রেমের ভান। ঝুটো প্রেমের মেকী অভিনয়ে মন আরো বিষিয়ে ওঠে।"

সংস্কারান্ধ সভ্য সমাজের ঝুটো প্রেমের মেকী অভিনয় ডাক্তার সদাশিবের মনকে নৈরাশ্যপীড়িত করলেও একেবারে স্তিমিত করতে পারে না। মানবসমাজকে ভালবাসবার উদার অনুভূতি তাঁর এতদিনকার সীমাবদ্ধ মনের উদ্বর্তন ঘটায়। তাঁর নবজাগ্রত হৃদয়-অনুভব অবলম্বন খুঁজে পায় সমাজের নীচু স্তরের মানুষের মধ্যে। প্রকাণ্ড মোটরগাড়িটা নিয়ে ডাক্তার সদাশিব ঘুরে বেড়ান হাটে-বাজারে। আর বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে ঔষধপথ্য বিতরণ করে তাদের ভালোবেসে তাঁর নিঃসঙ্গ মন খুঁজে পায় জীবনে পরম পরিতৃপ্তি। তাঁর সম্প্রসারিত সক্রিয় মানবপ্রেমের আকর্ষণে পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্র মানুষগুলোও বৃহৎ হয়ে তাঁর আত্মীয়শ্রেণীভুক্ত হয়ে ওঠে।

ডাক্তার সদাশিবের মানবপ্রীতি এত সক্রিয় যে মেছুনীর নাতজামাইকে 'বাবাজি' বলে উল্লেখ করতে তাঁর বাধে না। সমাজের নীচুতলার জীবের প্রতি সদাশিবের প্রীতি যেমন প্রখর তেমনি ভাক্তার অন্তায় কাজের সমালোচনায়ও তাঁর কর্মপদ্ধতি একটু অদ্ভুত। মৎস্যবিক্রেতা আবদুল

তাঁর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁকে টাটকা বলে পচা মাছ গছিয়ে দিয়েছিল। ডাক্তার সদাশিব সে মাছ রান্না করিয়ে টিফিন-কেরিয়ারে করে হাটে নিয়ে আসেন। তারপর আবদুলের মুখে সে রান্না মাছ গুঁজে দিয়ে সেই অন্যায়ের প্রত্যুত্তর দেন। বাজারে গিয়ে অসাধু মৎস্য-বিক্রেতাদের কাছে আমরা তো নিত্যনিয়তই ঠকছি। কিন্তু ডাক্তার সদাশিবের মত অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে আমরা এগিয়ে যাই কজন? এই ভাবেই তো সমাজে অসাধুতা প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে আমাদের সমাজকে কীটদষ্ট গলিত করে ফেলছে।

কিন্তু তাই বলে সমাজের সমস্ত ব্যক্তিই কি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার অসাধুতা একেবারে লোপাট হয়ে যাবে? বিবর্তনের ধারায় মানুষ তো এখনও মনুষ্যত্ববোধের চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় নি—এখনও তো মানুষ অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ হলেও অস্তিত্ববাদীদের মত ডাক্তার সদাশিব বিশ্বাস করেন বিবর্তনের ধারায় মানুষ একদিন সম্পূর্ণতা লাভ করবে। তাই তিনি মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্বাসী। মানুষকে বিশ্বাস করতেই তাঁর আনন্দ। "অনেকবার ঠকেও সদাশিব ভয় পান না, কারণ তিনি গরু নন, মানুষ। তাই তিনি মানুষকে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করে আনন্দ পান।"

সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ডাক্তার সদাশিবের মন যেমন উদ্দীপ্ত হয় তেমনি আত্মীয়স্বজন এবং সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকদের স্বার্থান্ধ ভদ্রতা-বোধহীন ব্যবহারে তিনি বিমর্ষ হন। নিতান্ত আত্মীয়তার খাতিরেই সদাশিব পাওনাদার-লাঞ্ছিত স্ত্রীর পিসেমশাই নিতাইবাবুকে অর্থ সাহায্য করতে দ্বিধা করেন না, অথচ স্বকার্য উদ্ধার করবার পর এ পরমাত্মীয়টি তাঁদের না জানিয়ে উধাও হয়ে যান। গরিব প্রতিবেশী বিধুবাবুর ছেলেকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেও এই লোকটির ব্যবহারে তিনি যখন অপমানিত বোধ করেন তখন মানুষের ভদ্রতাবোধ সম্পর্কে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ জাগে।

বনফুল অভিজ্ঞতার মানুষ। কলকাতা থেকে দূরে বাস করলেও কলকাতার সংস্কৃতি-অভিমানীদের ঠাট বজায় রাখবার ইচ্ছা দূরান্তবর্তী অনেক আত্মীয়ের জীবনকে কিরূপ বিপর্যস্ত করে তোলে তার কৌতুককর বর্ণনা দিয়েছেন তিনি 'হাটে-বাজারে' গ্রন্থে। "কলকাতার লোকদের চেঞ্জে যাওয়া একটা বাতিক। বিশেষত: কোথাও বিনা পয়সায় থাকবার খাওয়ার জায়গা যদি থাকে তা হলে তো কথাই নেই, কোন রকমে থার্ড ক্লাসের ভাড়াটা যোগাড় করে ছুটবে সেখানে।" কলকাতার অধিবাসীদের সম্পর্কে এ মন্তব্য সর্বাংশে সত্য না হলেও বহুক্ষেত্রে যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। 'রায় বাহাদুর', 'রায় সাহেব' প্রভৃতি একদা-প্রচলিত সরকারী উপাধি ব্যাধির মত কি করে সামাজিক মানুষের জীবনকে জর্জরিত করে তুলত তারও একটা কৌতুকোজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন বনফুল উক্ত বইয়ে। আমাদের গলিত সমাজের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণে বনফুলের দৃষ্টি প্রায় আণু-বীক্ষণিক। সমাজের কারও ভাল দেখতে না পারাটা যেন আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কারও মেয়ের ভাল বিয়ে হলে বন্ধুবান্ধবেরা দেঁতো হাসি হেসে আনন্দ প্রকাশ করেন বটে কিন্তু তাঁদের ভাবে ভঙ্গীতে ঈর্ষার ভাবটা গোপন থাকে না। "পরশ্রীকাতরতা জিনিসটা বিষ্ঠার মত, ফুল দিয়ে চাপা দিলেও তার দুর্গন্ধটা গোপন করা যায় না।...সরলতা এবং মহত্ত্ব যেমন চোখে মুখে স্বতঃস্ফূর্ত হয়, কুটিলতা ও নীচতাও তেমনি হয়।"

আমাদের মেরুদণ্ডহীন সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও রিটায়ারমেণ্টের পর নিজেকে কি রকম অসহায় বোধ করেন তার সজীব বর্ণনা দিয়েছেন বনফুল ছুটবিহারীর জীবনচিত্রে। সবজজ হয়ে রিটায়ার করবার পর ছুটবিহারীর কাজ হল বাজার করা, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সামলানো এবং সময় পেলে হিসেব করা কি করে পেনসনের টাকা দিয়ে সংসার চালানো যায়। কোন রকম সমাজচিন্তাহীন এ ধরনের কূপমণ্ডুক লোক কর্মবিরতির পর যে বৈরাগ্য সাধনায় মেতে উঠবেন তাতে আশ্চর্য কী? ছাত্রজীবনের অমেয় সম্ভাবনাময় এরকম কত ব্যক্তিজীবন সংকীর্ণ সমাজচেতনার অভাবে যে এভাবে নিরাশায় মরুপ্রান্তরে হারিয়ে যাচ্ছে তার খবর কজন রাখে!

সুখ্যাত ডাক্তারিতে উন্নতি লাভ করাকেই আমরা

সমাজজীবনে একটা উচ্চমর্যাদাপূর্ণ আসন দিই বলে এ লক্ষ্যসাধনের জন্ত মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে আমরা কত অধঃপতিত হয়ে যাই তার প্রমাণ কেরানী তপেনবাবুর কল্পিত জীবনচিত্র। চাকরির উচ্চতম ধাপে পৌঁছবার জন্ত নিজের তরুণী বোন রঞ্জনাকে প্রতি সন্ধ্যায় আপিসের বড়বাবুর সামনে নাচাতে তিনি দ্বিধা করেন না। আধুনিক সমাজে এরকম ঘটনা সব ক্ষেত্রে না ঘটলেও একেবারে অবাস্তব নয়। বনফুল মন্তব্য করেছেন: "দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মহাভারতের আমলেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আগে সমাজে তাদের স্থান ছিল একটা বিশেষ পল্লীতে, বিশেষ সীমার মধ্যে। গৃহস্থের অঙ্গনে তাদের বসতি ছিল না। এখন আমাদের সমাজ ভেঙে যাচ্ছে ক্রমশঃ। পুরনারীদের মধ্যে কে বরনারী, কে বারাঙ্গনা তা এখন ঠিক করা মুস্কিল। মালা ভ্রমে সাপকে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছেন অনেকেই। এ দেশেও ফরাসী সমাজ গজিয়ে উঠল।"

আমাদের ব্যক্তিজীবনের স্বার্থান্ধতা ও মিথ্যাচার সরকারী অর্থের অপচয় ঘটিয়ে সরকারকে পর্যন্ত কি ভাবে দুর্বল করে দিচ্ছে তাও বনফুলের দৃষ্টি এড়ায় নি। গ্রামের মধ্যে যেখানে পুলের চিহ্ন মাত্র নেই সে কল্পিত পুলের মেরামতি বাবদ ওভারসিয়ার চক্রবর্তী প্রতি বছর বছর বিল করে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করত। উপরিস্থের কাছে তার এ মিথ্যাচার ধরা পড়ার পরও পরের বছর সে গতানুগতিক বিল উপস্থিত করে বলল: "যে পুল গত দশ বছর ধরে বছর বছর মেরামত হচ্ছে, এবার সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকলে সন্দেহ হবে না তাদের? এবার বিলটা পাশ করে দিন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজটা ভেঙে ফেলবার একটা অর্ডার আর এষ্টিমেটও দিয়ে দিন। তারপর থেকে আর বিল আনব না।"

আমাদের দেশের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কার্যাবলীর এ একটা নমুনা মাত্র। এ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর বনফুলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে আমাদের সংস্কৃতির অন্ততর ক্ষেত্র স্বাষ্টধর্মী সাহিত্যের দিকে। ডাক্তার সদাশিবের যাবকতে লেখক বলেছেন:

"আধুনিক বাংলা উপন্যাস পড়লাম সেদিন একখানা। ইনিয়ে বিনিয়ে কেবল মেয়েমানুষের কথা। কেবল Sex, Sex আর Sex—ও ছাড়া অন্ত প্রসঙ্গই নেই। ওই কথা নানা রঙে ফেনিয়ে নানা ঢঙে বলবার চেষ্টা করেছেন ভদ্রলোক। আমার মনে হল ভদ্রলোক Sex-starved। মনে হল গল্প লেখার ছুতোয় তারিয়ে তারিয়ে কামরসটা নিজেই তিনি যেন উপভোগ করছেন। অপরের পক্ষে যা বীভৎস ও জুগুপ্সাজনক তাঁর পক্ষে তাই স্বাভাবিক।...কোন নৈতিক বক্তৃতা দিয়ে এদের সংশোধন করা যাবে না। আসল কারণটা সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক। জীবনকে ভোগ করবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু লোভ আছে প্রচুর।"

সাম্প্রতিক কালে রচিত বহু উপন্যাস সম্পর্কে বনফুলের এ মন্তব্য উপেক্ষণীয় নয়। আধুনিক কোন কোন ঔপন্যাসিক রচনায় প্রকৃত সমাজচেতনার পরিচয় দিলেও অধিকাংশ লেখকের কাহিনীই কামকলার বিজ্ঞপ্তে যে নোংরা অবক্ষয়ী সাহিত্যে পরিণত হচ্ছে এ কথা অস্বীকার করা যায় কী?

আমাদের তথাকথিত সভ্যসমাজের বিচিত্র মতিগতি দেখে ডাক্তার সদাশিব নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "আজকাল 'কালচার্ড' মানেই স্বার্থপর—আত্মকেন্দ্রিক।" সভ্য মানুষ সাধারণতঃ উপকারীর উপকারের কথা মনে রাখে না। একটি স্বার্থের কাজ হাসিল হলে অপর স্বার্থ উদ্ধার করবার জন্ত সে সক্রিয় হয়। এ রকম স্বার্থান্বেষী লোকের উদাহরণ সমাজে অহরহই দেখা যায়। কিন্তু জিতু জেলের মত সমাজের নীচুশ্রেণীর জীব ডাক্তার সদাশিবের উপকারের কথা কখনও ভুলতে পারে না। ঝড় জল মাথায় করে উপকারী ডাক্তারকে এগিয়ে নিতে সে স্টেশনে এসে হাজির হয়।

বনফুল আমাদের সমাজ-জীবনের দুর্বলতার আর একটি কারণ নির্দেশ করেছেন—দলাদলি। স্বদেশেই হোক প্রবাসেই হোক যেখানে বাঙালী সেখানে দলাদলি হবেই, এটা যেন স্বতঃসিদ্ধের মত দাঁড়িয়ে গেছে। "দুর্গাপূজায় তিন চারটে দল, লাইব্রেরীও একাধিক, কোনটাই ভালভাবে চলে না। প্রত্যেকটাতেই দলাদলি আর ঘোঁট, ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ এদেশে জন্মেছিলেন তাই তাঁর নামে 'জয়ন্তী' মাঝে মাঝে হয়।...উৎসবের

মাঝে কি যে প্রহসন হয় তা বুঝবার ক্ষমতাও এদের নেই।"

আমাদের ঐতিহ্যপ্রীতি ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলবার জন্যে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যারা রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ অরবিন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের নিয়ে মাতামাতি করে, বাঙালীর ইতিহাস সম্পর্কে তাদের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা ডাক্তার সদাশিবকে হতাশ করেছে। আসলে এঁদের জীবন ও কর্মের আদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণাও অনেকের নেই। এঁদের নিয়ে মাঝে মাঝে নাচ-গান-বক্তৃতার মজলিস বসায় সাধারণ বাঙালী মুখ্যতঃ নিজেদের জাহির করবার জন্য। এ ধরনের মনোবৃত্তি জাতীয় জীবনকে উজ্জীবিত না করে অধঃপতনের দিকে আকর্ষণ করছে বলেই ডাক্তার সদাশিবের ধারণা। অবশ্য এ ধারণার ব্যতিক্রমও দেখেছেন ডাক্তার সদাশিব আত্মনির্ভর অরুণের চরিত্রে। আত্মনির্ভরতাই জাতিকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যের অভিমুখী করবে বলেই তাঁর বিশ্বাস।

সমাজে যারা অসহায় দরিদ্র, জীবনে তারা সব দিক থেকেই বিড়ম্বিত। একদিকে যেমন চলেছে তাদের ওপর শাসনের নামে পুলিসী জুলুম তেমনি অর্থশালী লোকের বখা ছেলেরা তাদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে শ্রমিক ইউনিয়ন স্থাপন করেও তাদের কম ঠকাচ্ছে না। বনফুলের সন্ধানী দৃষ্টিতে সমাজের কোন গলদের দিকই এড়ায় নি।

আজকাল বিত্তকুলীন সমাজে মূল্যহীন মানুষও কি-ভাবে মূল্যবান মানুষ বলে বিবেচিত হয় তার নিদর্শন দুবার ফেল-করা বিলিতী ডিগ্রীধারী সদাশিব ডাক্তারের বন্ধু। ওকে দেখে সদাশিবের মনে হয়েছে: "টাকার জোরে বাবাজীরাও আজকাল 'দেবী', তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাও প্রথম শ্রেণীর প্রথম সারে দেদীপ্যমান।"

এ পরিস্থিতি তো আমরা সমাজে হামেশাই দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

লেখক বনফুল নিজে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। বিদেশী বিজ্ঞাপনের প্যাম্ফলেট-পড়া ডাক্তারদের বিদ্যার বহর তাঁর অজানা নয়। তাই 'আপ-টু-ডেট' নামধের ডাক্তারদের যখন তিনি 'বিদেশী ঔষধ ব্যবসায়ীদের দালাল' বলে ঘোষণা করেন তখন এ মন্তব্য আমাদের কাছে মিথ্যা বলে মনে হয় না। বনফুলের মতে অবিবেকী ডাক্তার (যাদের সংখ্যা সমাজে বেশী) চুরির ক্ষেত্রে মাথবোয়ান আর কম্পাউণ্ডারেরা ছিঁচকে চোর। অনেক সময় মাথবোয়ালেরাও দুর্নীতির ক্ষেত্রে এই ছিঁচকে চোরদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মানবসেবাব্রত গ্রহণ করেও যারা এভাবে অসাধুতাকে প্রশ্রয় দেয় তাদের যে কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত এ কথা বোধ হয় সকল বিবেকবান লোকই স্বীকার করবেন।

সদাশিব ডাক্তারের ডায়েরীর মাধ্যমে বনফুল আমাদের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সরকারী শাসনের যে নমুনা দিয়েছেন তা কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত। "ইংরেজদের হাত থেকে শাসনভার আজকাল যাঁদের হাতে গেছে তাঁরা যে শুধু অকর্মণ্য তাই নন, তাঁরা অসাধুও। এঁদের শাসনকালে দেশের সত্যিকার উন্নতি কিছুই হয়নি।"

আমাদের স্বাধীন দেশের শাসকদের জীবনে ও শাসন-ব্যবস্থায় অনেক দোষ-ত্রুটি আছে সত্য কিন্তু সে সম্পর্কে এরকম হঠাৎ একতরফা রায় দান প্রগল্ভ উক্তির মত শোনায়। ঠিক তেমনই আর একটি উক্তি হচ্ছে: "স্কুল-কলেজে ছেলেদের শিক্ষা হয় না, তারা গুণ্ডা হচ্ছে।" "অফিসার আর মিনিস্টাররা সব মুরগি আর ডিম নিজেরা খেয়ে ফেলেন। পাবলিককে দেবার মত কিছু অবশিষ্ট থাকলে তো দেবে!"

গান্ধীজীর অতিপ্রিয় হরিজন ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-তোষণ-নীতিকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন বনফুল। যদিও দেশের সর্বজনীন কল্যাণকর ভাষা হিসেবে হিন্দী বা ইংরেজীর আপেক্ষিক মূল্য এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় নি তবুও ইংরেজীর সপক্ষে একতরফা রায় দিয়ে তিনি ইংরেজীনবিসদের প্রীতিভাজন হবার চেষ্টা করেছেন। জমিদারী প্রথা লোপ করে বা জমির সিলিং করে সরকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লোপ করবার কি ভাবে চেষ্টা করছেন তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মজুরদের মজুরি সাত-আট গুণ বেড়েছে—এ উক্তি পরিসংখ্যানসম্মত নয়। শিক্ষকদের, কেরানীর এবং গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেতন মজুরদের বর্তমান আয়ের অনুপাতে বাড়ে নি এ কথা ঠিক, কিন্তু ডাক্তারদের রোজগার এখন আগের থেকে অনেক পরিমাণে বেড়েছে (সৎ এবং অসৎ উভয় উপায়ে) এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বনফুল

রেছেন, "যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ত্যাগে ভারতবর্ষ াধীনতা অর্জন করেছে কর্তৃপক্ষ তাদের মান সম্বন্ধে দাসীন।" কিন্তু দেশের এ শাসনকর্তৃপক্ষ মুখ্যতঃ এ ধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক নয় কী? আসলে যাদের সাধুতায় ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে দেশের মধ্যবিত্ত স্প্রদায় আজ ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করছে তারা আজও বনিকার অন্তরালে অবস্থান করে অত্যাচারের কলকাঠি াড়ছে। বনফুলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় নি।

স্বাধীনতার পরবর্তী প্রাদেশিকতার উগ্র আত্মপ্রকাশ ও জাতিবিদ্বেষের কথা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু বিদেশী তোষণ একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। এ তোষণ-নীতি ভাল কি মন্দ এককথায় এর সমাধান করা যায় না। তবে বনফুলের এ কথার সঙ্গে কেউ অমত হবেন না যে দেশের স্বাধীনতা মূলতঃ নির্ভর করে দেশের লোকের সদিচ্ছা ও চরিত্রবলের ওপর। এ কথাটা কর্তৃপক্ষেরা বোধ হয় ভুলে গেছেন।

বনফুলের মতে দেশের শাসন বা শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা নেতৃত্ব করছেন "তাঁদের মধ্যে অনেকেই অপদার্থ, স্বার্থপর, অসাধু। তাঁরা অসাধু বলেই দেশের অসাধুতা নিবারণ করতে পারছেন না।...সুতরাং চোর ডাকাত জুয়াচোর কালোবাজারীতে দেশ ভরে যাচ্ছে।" এটি একটি বহুপ্রচলিত কথারই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু দেশ ও জাতিকে এই দুষ্ট শক্তির কবল থেকে উদ্ধার করে গৌরবান্বিত করতে হলে যে সক্রিয় কর্মপন্থা অনুসরণের প্রয়োজন তার সুনির্দিষ্ট কোন ইঙ্গিত দেন নি বনফুল বর্তমান গ্রন্থে।

সদাশিব ডাক্তার প্রচলিত অর্থে 'ধার্মিক' নন, রাজনীতি বা সমাজনীতি আলোচনার ছুতোয় পরনিন্দা করাও তাঁর স্বভাব নয়, নেতা হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাঁর নেই। তিনি স্ব-ধর্মনিষ্ঠ। চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সাহায্যে সমাজ-সেবা করাই তাঁর জীবনের ব্রত। এ ব্রত উদ্‌যাপন করতে গিয়ে তিনি সাধারণ লোকের সহজ ভালবাসা পেয়েছেন, আর সে ভালবাসার মধ্যেই স্বাদ পেয়েছেন একটি নতুন জীবনের। তিনি বুঝতে পেরেছেন, সাধারণ মানুষের ভালবাসা পেতে হলে সমাজের উচ্চ মঞ্চ থেকে নেমে এসে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হবে—"ঘনিষ্ঠ না হলে ভালবাসা যায় না।" এই ছোট্ট বাক্যটির মধ্য দিয়ে একটি গভীর কথা শুনিয়েছেন বনফুল সংস্কারাচ্ছ সামাজিক মানুষকে। আজ দেশের মানুষ শ্রেণীভেদ বর্ণভেদ ভুলে দেশের সমষ্টিগত কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারছে না, তার কারণ পারস্পরিক অবিশ্বাস—যে অবিশ্বাসের উৎসে রয়েছে সামাজিক মানুষের প্রীতিহীনতা। আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক মানুষকে যে সহজে কাছে টেনে নিতে পারি না তার প্রধান কারণ আমাদের সংস্কারান্ধতা। স্বধর্মনিষ্ঠার প্রভাবে সদাশিব ডাক্তারের সেই সংস্কারমুক্তি ঘটেছিল যার ফলে তিনি আবদুল, আলী, ভগলু, কেবলি, ফালতু, রহমান, কমল, জগদম্বা, সুখীয়া, বিলাতী সাহ আরও অনেক নগণ্য লোককে আত্মীয় মনে করতে পেরেছিলেন। সদাশিব ডাক্তারের মানবতাবোধ পুঁথিগত নয়—বলিষ্ঠ ও সক্রিয়। নতুন সমাজ গঠনের জন্য আজ আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই সক্রিয় মানবতাবোধের। এই ধরনের মানবতার প্রেরণাতেই সদাশিব ডাক্তার নীচু শ্রেণীর মেয়ে গীতা, কেবলি, ছিপলি, কশাই গুদুর ও সিদ্দিকের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়াতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু সদাশিবকে সবচেয়ে ভাবিয়ে তোলে সমাজের নীচ শ্রেণীর তুলনায় মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের ট্র্যাজেডি।

সমাজের নীচুতলার জীবদের শিক্ষায় খরচ নেই, সংস্কৃতির ভড়ং নেই। তাই তারা তবু খেতে পায়। কিন্তু সমাজের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়? লোকপ্রচলিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভড়ং বজায় রাখতে গিয়ে বর্তমানে তাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে ইচ্ছা সত্ত্বেও তারা ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভাল খেতে পায় না। "স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে এদের সমস্যা তো উত্তরোত্তর জটিলতর হচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে এদের, চারদিকে নানা বিধিনিষেধের প্রাচীর তুলে এদের নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা করছেন সরকার।" সদাশিবের চিন্তা হয়: "এদের বাঁচবার উপায় কী? বিদ্রোহ? এরা কী বিদ্রোহ করতে পারবে?"

শক্তিমানের বিরুদ্ধে শক্তিহীনের বিদ্রোহের জন্য চাই অসীম সাহস, অটুট চরিত্রবল। না হলে বিদ্রোহ করে জয়লাভের সম্ভাবনা নেই। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সংহত শক্তির অভাবে পৃথিবীতে কত সমাজ-বিদ্রোহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই সমাজপ্রেমিক বনফুল গান্ধীজীর মতই অনুভব করেছেন: "অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজনও

বিশুদ্ধ-চরিত্রের যোদ্ধা যদি মাথা তুলে দাঁড়ায়, তা হলেই যুদ্ধ জয় হবে। এ যুদ্ধে সৈনিকের সংখ্যা বেশী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোথায় সেই একজন বিশুদ্ধ-চরিত্র perfect সৈনিক ?"

বলিষ্ঠ ও সক্রিয় সমাজচেতনায় অনুপ্রাণিত লেখক বনফুল এ প্রশ্ন রেখেছেন আমাদের সামাজিক মানুষের সামনে। কিন্তু বঞ্চিত জনসমাজ সমাজবিদ্রোহের জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে কী করে ? তাদের দৃষ্টিও যে আজ প্রচলিত সমাজসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন, চিত্ত বহু দুষ্ট প্রভাবের দ্বারা বিক্ষিপ্ত।

তাই বিবেকবান দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বনফুল অনুভব করেন জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ যে কোন কর্মেই লিপ্ত থাকুন না কেন 'অন্যায় অসভ্য অসুন্দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য।' অন্যায়কে আঘাত করবার জন্য ব্যক্তিমাত্রই যদি ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা পরিহার করে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ না করেন তাহলে সমাজে একতন্ত্রী শাসন প্রশ্রয় পাবে। এই মতের সমর্থন খুঁজে পান তিনি মনীষী লাস্কির বিখ্যাত রচনা 'The Danger of Obedience' নামক প্রবন্ধে যেখানে লাস্কি বলেছেন :

"Tyranny depends upon nothing so much as the lethargy of a people Autocracy is born above all of the experience that it need not expect active resentment against injustice. This is the inner truth of Thoreau's famons sentence 'that under a Government which imprisons any unjustly the true place for a just man is also a prison.'"

'হাটে-বাজারে' গ্রন্থের নায়ক ডাক্তার সদাশিব এতদিন শুধু প্রাণের প্রেরণায় মানবসেবাব্রতের মধ্যে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এখন সে সহজ প্রাণ-চেতনার সঙ্গে এসে মিলিত হল আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের মননশক্তি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে গিয়ে দুষ্কৃতকারীর হাতেই ঘটল শেষ পর্যন্ত তাঁর শোচনীয় মৃত্যু। এমনিই হয়। মানবেতিহাসের পৃষ্ঠা খুললেই আমরা দেখি যুগে যুগে কত মহাপ্রাণ সামাজিক মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আত্মাহুতি দান করেছেন। তাঁদের দেহ ধ্বংস হয়েছে কিন্তু দুর্বল সামাজিক মানুষের জন্য তাঁরা রেখে গেছেন মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের মহান আদর্শ।

মুখ্যতঃ বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্রের সমষ্টি হলেও বনফুলের 'হাটে-বাজারে' গ্রন্থ সেই মহৎ জীবনের বাণী-স্পন্দিত। নেহাত রঙীন কল্পনার পাখায় ভর করে রোমান্টিক প্রেমের বুদ্বুদ সৃষ্টি না করে বাঙালী কথাশিল্পীরা মাঝেমাঝেও যদি এরূপ সমাজচিত্র সৃষ্টি করবার দিকে মনোযোগী হন তাহলে এ যুগের বাংলা সাহিত্য বর্তমান অবক্ষয়ের অবস্থা কাটিয়ে মূল্যসমৃদ্ধ সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হবে।*

---

* বনফুলের 'হাটে-বাজারে' ১৩৬২ খ্রীষ্টাব্দের রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ।

পঞ্জিকা-সঙ্কট

(প্রত্যুত্তর)

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

বিগত ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ মহাশয় "পঞ্জিকা বিভ্রাট" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ভারত সরকার নিযুক্ত পঞ্চাঙ্গ শোধন কমিটি (Calendar Reform Committee) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই পত্রিকারই ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় উক্ত আলোচিত বিষয়ের প্রত্যেকটিরই যথাযথ ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ একটি উত্তরও প্রকাশ করা হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীযুক্ত ভঞ্জ মহাশয় পুনরায় উক্ত বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়া কয়েকটি বিশেষ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়াছেন। পূর্ব প্রবন্ধে যদিও উত্থাপিত সকল সংশয়েরই নিরসন করা হইয়াছিল, তথাপি মনে হইতেছে যে পূর্বসিদ্ধান্ত প্রচারিত অয়নদোলন সম্বন্ধীয় অবৈজ্ঞানিক মতবাদটি আমাদের দেশবাসীর মনে এমনই দৃঢ়মূল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে যে পুনঃপুনঃ সেটির সম্যক্ আলোচনা ও বিশ্লেষণ না করিলে সাধারণ লোকের মন হইতে সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে না এবং তাহাদের নিকটে প্রকৃত সত্যও প্রতিভাত হইবে না। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে শ্রীযুক্ত ভঞ্জ মহাশয়ের পঞ্চাঙ্গ শোধন সংক্রান্ত সংশয়যুক্ত বিষয়ে পুনরায় আলোচনার সূত্রপাত করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে এবং 'শনিবারের চিঠি'র কর্তৃপক্ষ এই আলোচনার সুযোগ দিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয় যে কমিটির পঞ্জিকা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান, তথ্যসংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সম্বলিত বিবরণী (Report of the Calendar Reform Committee) পাঠে বঙ্গদেশের [illegible] অধ্যাপক পণ্ডিত মহাশয় বঞ্চিত রহিয়াছেন বোধ করি তাহার দুরূহতা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জটিলতাবশতঃ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রিপোর্টটি মাত্র একটি ভাষায় লিখিয়া সকলের পক্ষে বোধগম্য করিতে হইলে ইংরাজী ভাষায় ব্যবহার ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না, এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জটিল বিষয়গুলিরও এক্ষেত্রে অবতারণা করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। তবে সংক্ষেপে বিষয়টি জানিতে হইলে রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গের ভূমিকা পাঠ করা যাইতে পারে এবং আশা করি তাহা হয়তো অনেকেই করিয়াছেন।

কমিটির রিপোর্টে পূর্বসিদ্ধান্ত প্রচারিত অয়নদোলন মতবাদের যে সমালোচনা করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত ভঞ্জ মহাশয় তাহার প্রতিই বিশেষভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং ভ্রান্ত এই অয়নদোলন মতবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথম প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ভঞ্জ মহাশয় যে সকল বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন মৎকর্তৃক প্রকাশিত উত্তরে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্যক্‌ভাবেই করা হইয়াছিল। সুখের বিষয়, বর্তমান আলোচ্য প্রবন্ধে ভঞ্জ মহাশয় আমার প্রদত্ত উত্তর-গুলির অধিকাংশেরই যথাযথভাবে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। সুতরাং যাহারা হিন্দু জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট আর নূতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন থাকিতেছে না; আমার পূর্ব প্রদত্ত উত্তর কিংবা বর্তমান আলোচ্য প্রবন্ধটি ভালভাবে পাঠ করিলেই সকল সংশয়ের নিরসন হইবে। তথাপি প্রধান প্রধান দুই-একটি বিষয়ের এক্ষেত্রে পুনরালোচনা করা সঙ্গত মনে হইতেছে।

জ্যোতিষ সিদ্ধান্তসমূহের রচনাকাল সাধারণতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী ধরা যাইতে পারে, কেন না ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ব্যতীতও গণনার দ্বারা দেখা যায়

বিশুদ্ধ-চরিত্রের যোদ্ধা যদি মাথা তুলে দাঁড়ায়, তা হলেই যুদ্ধ জয় হবে। এ যুদ্ধে সৈনিকের সংখ্যা বেশী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোথায় সেই একজন বিশুদ্ধ-চরিত্র perfect সৈনিক ?"

বলিষ্ঠ ও সক্রিয় সমাজচেতনায় অনুপ্রাণিত লেখক বনফুল এ প্রশ্ন রেখেছেন আমাদের সামাজিক মানুষের সামনে। কিন্তু বঞ্চিত জনসমাজ সমাজবিদ্রোহের জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে কী করে ? তাদের দৃষ্টিও যে আজ প্রচলিত সমাজসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন, চিত্ত বহু দুষ্ট প্রভাবের দ্বারা বিক্ষিপ্ত।

তাই বিবেকবান দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বনফুল অনুভব করেন জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ যে কোন কর্মেই লিপ্ত থাকুন না কেন 'অন্যায় অসত্য অসুন্দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য।' অন্যায়কে আঘাত করবার জন্য ব্যক্তিমাত্রই যদি ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা পরিহার করে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ না করেন তাহলে সমাজে একতন্ত্রী শাসন প্রশ্রয় পাবে। এই মতের সমর্থন খুঁজে পান তিনি মনীষী লাস্কির বিখ্যাত রচনা 'The Danger of Obedience' নামক প্রবন্ধে যেখানে লাস্কি বলেছেন :

"Tyranny depends upon nothing so much as the lethargy of a people Autocracy is born above all of the experience that it need not expect active resentment against injustice. This is the inner truth of Thoreau's famous sentence 'that under a Government which imprisons any unjustly the true place for a just man is also a prison.'"

'হাটে-বাজারে' গ্রন্থের নায়ক ডাক্তার সদাশিব এতদিন শুধু প্রাণের প্রেরণায় মানবসেবাব্রতের মধ্যে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এখন সে সহজ প্রাণ-চেতনার সঙ্গে এসে মিলিত হল আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের মননশক্তি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে গিয়ে দুষ্কৃতকারীর হাতেই ঘটল শেষ পর্যন্ত তাঁর শোচনীয় মৃত্যু। এমনিই হয়। মানবেতিহাসের পৃষ্ঠা খুললেই আমরা দেখি যুগে যুগে কত মহাপ্রাণ সামাজিক মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আত্মাহুতি দান করেছেন। তাঁদের দেহ ধ্বংস হয়েছে কিন্তু দুর্বল সামাজিক মানুষের জন্য তাঁরা রেখে গেছেন মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের মহান আদর্শ।

মুখ্যতঃ বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্রের সমষ্টি হলেও বনফুলের 'হাটে-বাজারে' গ্রন্থ সেই মহৎ জীবনের বাণী-স্পন্দিত। নেহাত রঙীন কল্পনার পাখায় ভর করে রোমান্টিক প্রেমের বুদ্বুদ সৃষ্টি না করে বাঙালী কথাশিল্পীরা মাঝেমাঝেও যদি এরূপ সমাজচিত্র সৃষ্টি করবার দিকে মনোযোগী হন তাহলে এ যুগের বাংলা সাহিত্য বর্তমান অবক্ষয়ের অবস্থা কাটিয়ে মূল্যসমৃদ্ধ সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হবে।*

---

* বনফুলের 'হাটে-বাজারে' ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ।

পঞ্জিকা-সঙ্কট

(প্রত্যুত্তর)

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

বিগত ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ মহাশয় "পঞ্জিকা বিভ্রাট" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ভারত সরকার নিযুক্ত পঞ্চাঙ্গ শোধন কমিটি (Calendar Reform Committee) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই পত্রিকারই ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় উক্ত আলোচিত বিষয়ের প্রত্যেকটিরই যথাযথ ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ একটি উত্তরও প্রকাশ করা হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীযুক্ত ভঞ্জ মহাশয় পুনরায় উক্ত বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়া কয়েকটি বিশেষ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়াছেন। পূর্ব প্রবন্ধে যদিও উত্থাপিত সকল সংশয়েরই নিরসন করা হইয়াছিল, তথাপি মনে হইতেছে যে সূর্যসিদ্ধান্ত প্রচারিত অয়নদোলন সম্বন্ধীয় অবৈজ্ঞানিক মতবাদটি আমাদের দেশবাসীর মনে এমনই দৃঢ়মূল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে যে পুনঃপুনঃ সেটির সম্যক্ আলোচনা ও বিশ্লেষণ না করিলে সাধারণ লোকের মন হইতে সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে না এবং তাহাদের নিকটে প্রকৃত সত্যও প্রতিভাত হইবে না। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে শ্রীযুক্ত ভঞ্জ মহাশয়ের পঞ্চাঙ্গ শোধন সংক্রান্ত সংশয়যুক্ত বিষয়ে পুনরায় আলোচনার সূত্রপাত করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে এবং 'শনিবারের চিঠি'র কর্তৃপক্ষ এই আলোচনার সুযোগ দিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয় যে কমিটির পঞ্জিকা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান, তথ্যসংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সমন্বিত বিবরণী (Report of the Calendar Reform Committee) পাঠে বঙ্গদেশের অনেক টোলের অধ্যাপক পণ্ডিত মহাশয় বঞ্চিত রহিয়াছেন বোধ করি ভাষার দুরূহতা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জটিলতাবশতঃ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রিপোর্টটি মাত্র একটি ভাষায় লিখিয়া সকলের পক্ষে বোধগম্য করিতে হইলে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না, এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জটিল বিষয়গুলিরও এক্ষেত্রে অবতারণা করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। তবে সংক্ষেপে বিষয়টি জানিতে হইলে রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গের ভূমিকা পাঠ করা যাইতে পারে এবং আশা করি তাহা হয়তো অনেকেই করিয়াছেন।

কমিটির রিপোর্টে সূর্যসিদ্ধান্ত প্রচারিত অয়নদোলন মতবাদের যে সমালোচনা করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত ভঞ্জ মহাশয় তাহার প্রতিই বিশেষভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং ভ্রান্ত এই অয়নদোলন মতবাদ সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথম প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ভঞ্জ মহাশয় যে সকল বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন মৎকর্তৃক প্রকাশিত উত্তরে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্যক্‌ভাবেই করা হইয়াছিল। সুখের বিষয়, বর্তমান আলোচ্য প্রবন্ধে ভঞ্জ মহাশয় আমার প্রদত্ত উত্তর-গুলির অধিকাংশেরই যথাযথভাবে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। সুতরাং যাহারা হিন্দু জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট আর নূতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন থাকিতেছে না; আমার পূর্ব প্রবন্ধের উত্তর কিংবা বর্তমান আলোচ্য প্রবন্ধটি ভালভাবে পাঠ করিলেই সকল সংশয়ের নিরসন হইবে। তথাপি প্রধান প্রধান দুই-একটি বিষয়ের এক্ষেত্রে পুনরালোচনা করা সঙ্গত মনে হইতেছে।

জ্যোতিষ সিদ্ধান্তসমূহের রচনাকাল সাধারণতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী ধরা যাইতে পারে, কেন না ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ব্যতীতও গণনার দ্বারা দেখা যায়

যে ওই সময়েই সিদ্ধান্তসমূহ হইতে লব্ধ গ্রহস্থান ও প্রকৃত গ্রহস্থানের পার্থক্য ন্যূনতম ছিল। সূর্যসিদ্ধান্তের রচনাকাল আরও কিছুকাল পরে। আর্যভট্ট (৪৯৯ খ্রীঃ), বরাহমিহির (৫৫০ খ্রীঃ) বা ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খ্রীঃ) কোথাও সূর্যসিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন নাই কিংবা সূর্যসিদ্ধান্তোক্ত কোন মতবাদেরও সমালোচনা করেন নাই। একমাত্র ভাস্করাচার্যই (১১৫০ খ্রীঃ) তাহা করিয়াছেন। আর্যভট বা ব্রহ্মগুপ্ত অয়নাংশ বা অয়নগতি (অয়নচলন বা বা অয়নদোলন যাহাই হোক) সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে আর্যভট এবং ব্রহ্মগুপ্ত মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহারা যে সিদ্ধান্তশাস্ত্র রচনা করিলেন তাহা সম্পূর্ণভাবেই সায়ন অর্থাৎ প্রকৃত মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে (অর্থাৎ যেদিনে সূর্য বিষুবরেখা বা বাসন্তক্রান্তিপাতবিন্দু অতিক্রম করে এবং দিবারাত্রির মান সমান হয়) তাঁহাদের মেষাদি হইত। স্থূলতঃ বিচার করিতে গেলে হইতও তাহাই, কেন না তখন পর্যন্ত অয়নাংশের মান সামান্যই ছিল, উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং অয়নচলন বা অয়নদোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে এই দুই মনীষীর নামোল্লেখ বাঞ্ছনীয় নহে। বরাহমিহির কিন্তু অয়নচলন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি জানিয়াছিলেন যে, প্রাচীনকালে অশ্লেষার মধ্যবিন্দুতে দক্ষিণায়ন হইত, তাঁহার কালে পুনর্বসুতে হইতেছে। সুতরাং অয়নান্তবিন্দু যে সচল তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু অয়নচলনের গতিবেগ তিনি নির্ধারণ করেন নাই বা কোথাও তাহার উল্লেখ করেন নাই। অয়নের যে চলন আছে মাত্র ইহাই তিনি বলিয়াছেন। তৎপরে আমরা অয়নগতি সম্বন্ধে এবং তৎসহ অয়নাংশ সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাই 'আধুনিক' সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে।

বর্তমানে যে আকারে আমরা সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ পাই তাহা গণিত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। উহাতে গ্রহাবস্থান গণনার জন্য যে সকল সূত্র (formula) এবং ধ্রুবকসমূহ (constants) দেওয়া আছে সেগুলি অবশ্য উন্নত ধরনের নহে, কেন না উহার দ্বারা গণনা করিলে আকাশস্থ প্রকৃত গ্রহাবস্থানের সঙ্গে এখন আর গণিতাগত গ্রহস্থানের ঐক্য হয় না, কিন্তু গণনার সূত্রসমূহ (ধ্রুবকসমূহ নহে) বেশ উন্নত ধরনের। এইজন্য সূর্যসিদ্ধান্ত সর্বজনমান্য জ্যোতির্গ্রন্থ এবং এইজন্যই বহুকাল ধরিয়া সূর্যসিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তরভারতে (বঙ্গদেশসহ) পঞ্জিকা গণনার কার্য চলিয়া আসিয়াছে। বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের পূর্বে আর একখানি সৌরসিদ্ধান্ত বা সূর্যসিদ্ধান্ত ছিল, যাহা বরাহমিহির কর্তৃক সঙ্কলিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের অঙ্গীভূত। বরাহমিহিরের সময়েও (৫৫০ খ্রীঃ) এই সূর্যসিদ্ধান্তের বিশেষ খ্যাতি ছিল গণনাফলের সূক্ষ্মতার জন্য, কেন না তিনি বলিয়াছেন :

পৌলিশ তিথিঃ স্ফুটোঽসৌ তস্যাসন্নস্তু রোমকঃ প্রোক্তঃ।
স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূরবিভ্রষ্টৌ ॥

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে বরাহের সেই ক্ষুদ্র আকারের সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থই কালক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে এবং বরাহের সূর্যসিদ্ধান্ত হইতে ইহাকে পৃথক করিবার জন্যই পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থকে আধুনিক সূর্যসিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন। এই সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের প্রণেতা কিন্তু কোন ঋষি নহেন বা ঋষিপদবাচ্য কোন ব্যক্তিও নহেন। সূর্যসিদ্ধান্তের উক্তি ধরিতে গেলে বলিতে হয় যে 'ময়' নামক এক মহা-অসুর (Assytian বা Babylonian কি ?) সূর্যের অংশসম্ভূত এক পুরুষের (কোন কোন সংস্করণে এই প্রসঙ্গে রোমকনগরের উল্লেখ আছে) নিকট হইতে গ্রহগতির জ্ঞানলাভ করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনেকে হয়তো মনে করেন যে আর্যভট বা বরাহমিহির ইহার রচয়িতা, কিন্তু তাহা সত্য নহে। যাহাই হউক, আমরা কিন্তু মনে করি যে ভারতেরই কোন জ্যোতির্বিদ এই সুবৃহৎ ও সর্বজনমান্য গ্রন্থের রচয়িতা, বাহিরের কোন অসুর নহে।

সূর্যসিদ্ধান্তের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে গ্রন্থে একটি রচনাকাল দেওয়া আছে যাহা অবিশ্বাস্যরূপে প্রাচীন। ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে এখন হইতে প্রায় বাইশ লক্ষ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের রচনাকাল ধরিতে হয়। সে যাহাই হউক, দেখা যায় যে আর্যভট, বরাহমিহির বা ব্রহ্মগুপ্তের কালে আধুনিক সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহাদের কালে এই গ্রন্থের প্রচলন থাকিলে এই গ্রন্থের উত্তরকালের জ্যোতির্বিদ্‌গণ সম্বন্ধীয় আলোচনা

ওই মনীষিগণ নিশ্চয়ই প্রভাবিত হইতেন। সুতরাং মনে হয় যে ৫০০ খ্রীঃ অব্দের পরে বর্তমান আকারের এই গ্রন্থ রচিত। গ্রহোক্ত গ্রহগতির দ্বারাও রচয়িতার একপ্রকার কালনির্ণয় করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতিতে বলা হয় যে রচয়িতার কালে গণিত গ্রহস্থান ও প্রকৃত গ্রহস্থানের মধ্যে পার্থক্য থাকিবে না বা উহা ন্যূনতম হইবে। এই পদ্ধতিতে গ্রহস্থান বিচার করিলে গ্রন্থরচনা কাল আরও পরবর্তী হইয়া পড়ে। যাহাই হউক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে যে সূর্যসিদ্ধান্ত রচিত হয় নাই এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

এই সকল আলোচনা যদিও আপাতদৃষ্টিতে এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়, কিন্তু ইহা অবতারণা করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য ইহাই যে সূর্যসিদ্ধান্তের রচয়িতা যিনিই হইয়া থাকুন, তিনি কোন ঋষি নহেন এবং তিনি অতি প্রাচীনকালের লোকও নহেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ১৩০২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের অয়নাবস্থান সম্বন্ধীয় কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর নহে।

অয়নের গতিসম্বন্ধে সূর্যসিদ্ধান্তে যে নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :

কল্যাদিতে (৩১০২ খ্রীঃ পূঃ) অয়নাংশ শূন্য ছিল, তাহার পর ১৮০০ বৎসর ধরিয়া অয়নান্তবিন্দুদ্বয় ও সম্পাত-বিন্দুদ্বয় (পশ্চাদ্দিকে অপসৃত না হইয়া) পূর্বদিকে অপসৃত হইয়াছে এবং ১৩০২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে এই অপসরণের পরম মান ২৭° হইয়াছিল। তাহার পর হইতে অয়নগতি পশ্চাম্মুখী হইয়াছে এবং এই অপসরণের মান কমিতে কমিতে আবার ১৮০০ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪৯৯ খ্রীঃ অব্দে ইহার মান (যাহাকে অয়নাংশ বলা হয়) শূন্য হইয়াছিল। এই পশ্চাৎগতিতে অয়নান্তবিন্দুদ্বয় এখনও চলিতেছে এবং ১৮০০ বৎসর পরে অর্থাৎ ২২৯৯ খ্রীঃ অব্দে অয়নাংশের মান ২৭° হইবে এবং তাহার পরে উহা আবার হ্রাস পাইতে থাকিবে। বর্তমানে এই মতে অয়নাংশ ২১°/৫৭′ আরও ৩৩৭ বৎসর পরে অয়নাংশের মান পরমত্ব প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ ২৭° হইবে এবং তৎপর আবার উহা হ্রাস পাইতে থাকিবে।

সূর্যসিদ্ধান্তে প্রদত্ত এই অয়নগতি অনেকটা দোলকের গতির ন্যায় (Pendulum motion) সেইজন্য ইহাকে অয়নদোলন মতবাদ বলা হয়। আর আধুনিক মতবাদ অনুসারে অয়নবৃত্ত চিরকাল পশ্চাদপসরণ করিয়াই চলে, কোনদিন পূর্বাভিমুখী হয় না, এইরূপ চলিতে চলিতে প্রায় ২৬,০০০ বৎসর পর সম্পূর্ণ চক্র আবর্তন করিয়া পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসে। বর্তমান এই মতবাদকে অয়নচলন বলা হইয়া থাকে।

সূর্যসিদ্ধান্ত মতে অয়নগতি বৎসরে ৫৪″ বিকলা এবং এই একই গতি লইয়া অয়নান্তবিন্দু ৩৬০০ বৎসর ধরিয়া পশ্চিমে ও ৩৬০০ বৎসর ধরিয়া পূর্বে ভ্রমণ করে। এই গতিবেগের কখনও কোনপ্রকার হ্রাস কল্পনা করা হয় নাই, এমন কি ৩৬০০ বৎসর পরে উহা স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়া দিক পরিবর্তন করিবার সময়েও উহার গতিবেগের কোন বৈষম্য কল্পনা করা হয় নাই। কোন দোলকের গতি কিন্তু এরূপ নহে। উহা থামিবার পূর্ব হইতেই উহার গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং পরে মুহূর্তের জন্য থামিয়া যায়। আবার দিক পরিবর্তন করিবার পরে ক্রমে ক্রমে উহার বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সূর্যসিদ্ধান্তের কল্পিত অয়নগতি অনেকটা ভবঘুরের 'মাকু'র গতির ন্যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে যে গতির সৃষ্টি হয় তাহা হয় অপরিবর্তনীয় একমুখী গতি কিংবা ক্রমশঃ হ্রাস বা বৃদ্ধি সমন্বিত গতি। স্থির গতিবেগ সমন্বিত কোন বস্তু প্রাকৃতিক নিয়মে চলিতে চলিতে হঠাৎ গতিবেগ অপরিবর্তনীয় রাখিয়াই ঠিক বিপরীত দিকে ভ্রমণ আরম্ভ করে না। সুতরাং এই অয়নদোলন (তথাকথিত) মতবাদ সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। প্রাকৃতিক যে সকল নিয়ম আছে, তাহাদ্বারা এই মতবাদ সিদ্ধ হয় না, এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারাও ইহা সিদ্ধ হয় না, কেন না ১৩০২ খ্রীঃ পূর্বাব্দের বা তাহার পূর্বেকার পর্যবেক্ষকের এই মতবাদের পরিপোষক কোন উক্তি নাই। পূর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে মাধ্যাকর্ষণ নিয়মকে আশ্রয় করিয়া গতিবিজ্ঞানের সূত্রাবলী প্রয়োগ করিলে অয়নচলনের গতিবেগ নির্ণয় করা যায় এবং তাহা চিরকালই একমুখী গতি (পশ্চাম্মুখী)। সুতরাং সাধারণ যুক্তি, উচ্চগণিত, গতিবিজ্ঞান বা পরিদর্শন কোনদিক হইতেই এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না।

আমাদের সিদ্ধান্তশাস্ত্রসমূহে উল্লেখ আছে যে পাতসমূহ চিরকাল পশ্চান্মুখী—'বিলোমগাঃ পাতাঃ'।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানও তাহাই বলে। রবিবর্ষের বহিত বিষুববৃত্তের যে দুইটি সংযোগস্থল সে দুইটি সম্পাত-বিন্দু নিবাম পাতবর্তী; উহারা চিরকালই পশ্চামুখী, কোনকালেই পূর্বাভিমুখী গতিসম্পন্ন উহারা হইতে পারে না।

ভারতেরই জ্যোতির্বিদ ধীমান্ ভাস্করাচার্য প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে সূর্যসিদ্ধান্তের এই অবাস্তব গতিকল্পনাকে অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে অয়নদোলন মতবাদকেই অস্বীকার করিয়াছেন মাত্র তাহাই নহে, সূর্যসিদ্ধান্ত প্রদত্ত অয়নগতিও তিনি গ্রহণ করেন নাই। সূর্যসিদ্ধান্তের অয়নগতি ৫৪ বিকলার পরিবর্তে তিনি ৫৯ বিকলা গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সিদ্ধান্তীয় বর্ষমানের সহিত প্রকৃত সায়ন বর্ষমানের যে পার্থক্য তাহা হইতে উক্ত ৫৯ বিকলা অয়নগতিই পাওয়া যায়। জ্যোতিষসংক্রান্ত অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও ভাস্করাচার্য ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সূর্যসিদ্ধান্তে যে ৫৪ বিকলা বার্ষিক অয়নগতি দেওয়া আছে তাহা প্রকৃত নহে, উহাও ভ্রান্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রই জানেন যে বার্ষিক অয়নগতি কিঞ্চিদধিক ৫০ বিকলা।

শ্রীভক্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে সম্পাতস্থান ২২৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পরে আবার পূর্বাভিমুখী হয় কিনা তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য আরও ৩৩৮ বৎসর প্রতীক্ষার প্রয়োজন। অর্থাৎ উক্ত কাল পরে যদি দেখা যায় যে সম্পাতবিন্দু আর ফিরিতেছে না, মাত্র তখনই বর্তমান বিজ্ঞানের অয়নচলন মতবাদ স্বীকার করা যাইতে পারে, তৎপূর্বে নহে। কিন্তু অতদিন অপেক্ষা করিবার কি কোন প্রয়োজন আছে? বর্তমানে সূর্যসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গণিত যে কোন পঞ্জিকা অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে, ২১ বা ২২ অংশ অয়নাংশ ধরিয়া ৮ই বা ৯ই চৈত্র অর্থাৎ ২২শে বা ২৩শে মার্চ তারিখকে উক্ত পঞ্জিকায় রবির সম্পাতবিন্দু অতিক্রমের কাল বা সায়ন মেষাদি (Vernal equinox) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু পর্যবেক্ষণজাত উক্ত সঞ্চারের কাল উহার প্রায় দেড় দিন পূর্বে, অর্থাৎ ২০শে বা ২২শে মার্চ তারিখে। অতএব এখনই দেখা যাইতেছে যে সূর্যসিদ্ধান্তের মতবাদকের অয়নাবস্থান পর্যবেক্ষণজাত অবস্থান হইতে দূরবিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উক্ত মতবাদের অসত্যতা উপলব্ধি করিতে ৩৩৮ বৎসর কেন, আর একদিনও কি অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে?

আমাদের পূজাপার্বণের অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ বিশেষ ঋতুতে করণীয়। ঋতুসমূহ আবার সায়ন বৎসরের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং পূজাপার্বণের জন্য যে পঞ্জিকা রচিত হইবে তাহার ভিত্তি হওয়া উচিত সায়ন বৎসর, নিরয়ণ বা অন্য কোনপ্রকার বৎসর নহে। তদ্রূপ কৃষিকার্যাদি আরম্ভ করিবার জন্যও বিশেষ বিশেষ ঋতুর বিশেষ বিশেষ সময়জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাও পাওয়া যায় একমাত্র ঋতুনিষ্ঠ বা সায়নপঞ্জিকা হইতেই। সুতরাং একমাত্র সায়ন ভিত্তিতে রচিত পঞ্জিকাই সর্বার্থসাধক। পঞ্জিকা রচনাপদ্ধতির সংস্কার করিতে হইলে সায়ন বা ঋতুনিষ্ঠ বর্ষমান গ্রহণই সংস্কারকের প্রথম কর্তব্য। ভারত সরকারের পঞ্জিকা সংস্কার কমিটিও তাহাই করিয়াছেন।

সূর্যসিদ্ধান্ত-গৃহীত বর্ষমান সায়ন নহে, সুতরাং উহা পঞ্জিকা রচনাকার্যের অনুপযুক্ত। উক্ত বর্ষমান নিরয়ণও নহে—উহার মান সায়নবর্ষ অপেক্ষা ২৪ মিঃ অধিক ও নিরয়নবর্ষ অপেক্ষা ৩ মিঃ অধিক।

পঞ্জিকা গণনায় সায়নবর্ষ গ্রহণ না করার ফলে ভবিষ্যতে ঋতুবিভ্রাটজনিত যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইবে সূর্য-সিদ্ধান্ত রচনার কয়েক শতাব্দী পরে যখন জ্যোতির্বিদগণের নিকটে তাহা প্রতিভাত হইল, তখন সিদ্ধান্ত জ্যোতিষকে সমালোচনার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন অজ্ঞাত-নামা জ্যোতির্বিদ 'অয়নদোলন' মতবাদ সম্বন্ধীয় কয়েকটির শ্লোক রচনা করিয়া সূর্যসিদ্ধান্তে সংযোজিত করিলেন। ইহাদ্বারা বুঝানো হইল যে যদিও প্রকৃত মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবস সৌরচৈত্রান্ত দিবস হইতে ক্রমে বিভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহার ফলে স্থায়ী কোন ঋতু বিপর্যয়ের আশঙ্কা নাই, কেন না অয়নদোলন মতবাদ অনুযায়ী সম্পাতবিন্দু পুনরায় চৈত্রান্তে ফিরিয়া আসিবে এবং সৌর-মাসের সহিত ঋতুসমূহের পূর্বসম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু অয়নদোলন মতবাদ অবাস্তব প্রতিপন্ন হওয়াতে সে কল্পনা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া বুঝা গেল।

এক্ষেত্রে প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে সূর্যসিদ্ধান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে ৯ হইতে ১২ সংখ্যক শ্লোক জুড়িয়ে এই

অয়নদোলন ও অয়নাংশ সম্বন্ধীয় মত উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের অন্য কোথাও অয়নাংশ সম্বন্ধে আর ইঙ্গিত মাত্র নাই। বিচার করিলে দেখা যায় যে এই চারিটি শ্লোক বাদ দিলেও গ্রন্থের অন্যান্য অংশের কোন ক্ষতি হয় না। ইহার কারণ এই যে আর্যভটাদির সিদ্ধান্তগ্রন্থের ন্যায় সূর্যসিদ্ধান্তগ্রন্থেরও রচয়িতার মনে এই ধারণাই ছিল যে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপেই সায়ন, এবং ইহার দ্বারা চিরকাল সৌরমাস ও ঋতুসমূহের সমন্বয় রক্ষিত হইবে। এই কারণেই তাঁহাদের গ্রন্থে এবং আদিতে সূর্যসিদ্ধান্তেও অয়নাংশের কোন উল্লেখ ছিল না। কিছুকাল পরে যখন দেখা গেল যে সৌরচৈত্রান্ত দিবসের পূর্বেই মহাবিষুব সংক্রান্তি ঘটিতেছে, তখনই অয়নাংশ কল্পনার উৎপত্তি হয়, এবং অয়নাংশ সম্বন্ধীয় উক্ত শ্লোক-চতুষ্টয় সূর্যসিদ্ধান্তে প্রক্ষিপ্ত হয়।

সূর্যসিদ্ধান্তের বর্ষমান ধরিয়া থাকিলে কিঞ্চিদধিক প্রতি ৬০ বৎসর অন্তর প্রকৃত সম্পাতবিন্দু (Vernal equinox) অর্থাৎ প্রকৃত মহাবিষুব সংক্রান্তি চৈত্রান্ত দিবস হইতে একদিন করিয়া পূর্বে ঘটিতে থাকিবে, এবং ১৮০০ বৎসরে এক মাস অগ্রবর্তী হইবে। ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্রান্ত দিবসে মহাবিষুব সংক্রান্তি ঘটিত, ২২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনান্ত দিবসে উহা ঘটিবে এবং এইরূপে প্রকৃত মহাবিষুব দিবস ক্রমে পিছাইয়া পড়িতে থাকিবে। সংহিতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে যেভাবে ভারতীয় ঋতুসমূহের বিভাগ করা হইয়াছে, তাহাতে আশ্বিন ও কার্তিক মাস শরৎ ঋতুর অন্তর্গত এবং তদনুসারে আশ্বিন ও কার্তিক মাসে শারদীয়া দুর্গাপূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সিদ্ধান্তশাস্ত্রসমূহ রচনার কালে ওইরূপ ঋতুবিভাগই ছিল। অয়নান্তবিন্দু সরিয়া যাওয়ায় বর্তমানে ৭ই ভাদ্র হইতে ৬ই কার্তিক পর্যন্ত শাস্ত্রোক্ত বিচারে শরৎকাল। বর্তমান গণনাপদ্ধতি চলিতে থাকিলে কিছুদিন পরে (অর্থাৎ ২২৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্নিহিত-কালে) ১লা ভাদ্র হইতে ৩০শে আশ্বিন পর্যন্ত হইবে শরৎকাল। আরও কিছুকাল পরে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস হইবে শরৎকালের অন্তর্ভুক্ত। তখন আশ্বিন শুক্লাসপ্তমীর দুর্গাপূজাকে আর শারদীয়া দুর্গাপূজা বলা চলিবে না, যদিও শাস্ত্রে 'শরৎকালে মহাপূজা' করিবারই বিধান আছে। সুতরাং পঞ্জিকা গণনার জন্য সূর্যসিদ্ধান্তীয় বর্ষমানের পরিবর্তে ঋতুসিদ্ধ বা সায়ন বর্ষের গ্রহণ এবং যাহাতে বর্তমানের সৌর ভাদ্র ও আশ্বিন মাসকে শরৎ ঋতুর সহিত বাঁধিয়া না দিলে উপায় নাই।

অয়নদোলন মতবাদ যে প্রমাণসিদ্ধ নহে, তাহা দেখাইবার জন্য শতপথ ব্রাহ্মণের এক উক্তির উল্লেখ করা হইয়াছিল। অবশ্য উহা করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। কেন না যে গতিবিজ্ঞান (Dynamics) ও মহাকর্ষের (Universal Gravitation) নিয়মাবলীর সাহায্যে গণনা করিয়া বর্তমানে পৃথিবী হইতে প্রক্ষিপ্ত বস্তুকে চন্দ্রপৃষ্ঠের বিশেষ স্থানে সংস্থাপিত করা সম্ভব হইতেছে এবং যাহার উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবী হইতে গ্রহান্তরে গমনও হয়তো শীঘ্রই সম্ভব হইবে, সেই মহাকর্ষের নিয়ম ও গতিবিজ্ঞানই বলিতেছে যে অয়নদোলন মতবাদ অসত্য এবং অয়নচলন মতবাদই বিজ্ঞানসিদ্ধ, সেক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্যের বিশ্লেষণ দ্বারা উহার সপক্ষে আর দৃঢ়তর কি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে? এই অর্থে শতপথ ব্রাহ্মণের আলোচনা অবশ্য নিতান্তই অবান্তর ইহা সত্য। কিন্তু উক্ত আলোচনায় ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যে শতপথ ব্রাহ্মণের উদ্ধৃত শ্লোকটির রচয়িতা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার দ্বারাও অয়নদোলন মত অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়। বলা হইয়াছে যে কৃত্তিকানক্ষত্রপুঞ্জ পূর্বদিক হইতে বিচ্যুত হয় না। প্রতিদিনই পূর্বদিকে উদিত হয়। এই উদয় সূর্যসান্নিধ্যবশতঃ গ্রহগণের যে নৈমিত্তিক উদয়াস্ত হয় সেরূপ নহে। সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ যেরূপ প্রতিদিন ন্যূনাধিক ২৪ ঘণ্টা পরে উদিত হয়, ইহাও সেই উদয়। আর সূর্য চন্দ্র প্রভৃতিকে যেরূপ বিভিন্ন সময়ে উদয়কালে প্রকৃত পূর্বদিক হইতে বিচ্যুত হইতে দেখা যায়, এই কৃত্তিকাপুঞ্জ সেরূপ বিচ্যুত হয় না, ইহাই ব্রাহ্মণকার বলিয়াছেন। সূর্য যেদিন যেদিকে উদিত হয় তাহাই পূর্বদিক এই কথা প্রাকৃত-জনসুলভ। কোন বিদ্বান ব্যক্তি এই কথা কল্পনা করিতে পারেন না, বেদরচয়িতা ঋষিগণের তো কথাই নাই। সূর্যোদয়ের স্থান ঋতুভেদে উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণপূর্ব দিগংশের মধ্যে আন্দোলিত হয়। কিন্তু কৃত্তিকানক্ষত্র প্রতিদিনই পূর্বদিকে উদিত হইত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ত্রিপ্রশ্নাধিকারের নিয়মাবলীর সাহায্যে কৃত্তিকার উদয়সংক্রান্ত এই উক্তি বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া

যায় যে কৃত্তিকাপুঞ্জের ক্রান্তি (Declination) তৎকালে শূন্যাঙ্ক পরিমিত ছিল অর্থাৎ উক্ত তারকাপুঞ্জ ব্রাহ্মণকালে খ-বিষুব রেখার উপর অবস্থিত ছিল। সুতরাং জ্যোতির্গণিত অবলম্বনে এই সিদ্ধান্ত আইসে যে তৎকালে সম্পাতবিন্দুর অবস্থান কৃত্তিকানক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানের অর্থাৎ বৃষ রাশির ৬ অংশেরও অধিক ছিল, তাহা না হইলে কৃত্তিকার ক্রান্তি শূন্যতা লব্ধ হয় না। সুতরাং তৎকালে অশ্বিন্যাদি বা মেষাদি হইতে অপরদিকে ৩৬° অংশেরও অধিক দূরে সম্পাতবিন্দুর অবস্থান পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা সূর্য-সিদ্ধান্তোক্ত ২৭° দোলন-সীমার অনেক অধিক।

পঞ্জিকার গণনার জন্য সায়ন বৎসর গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত লইলে আমাদের পঞ্জিকা গণনা পদ্ধতিতে পঞ্জিকা শোধন কমিটি আর যে সকল পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছেন সেগুলি স্বতঃই আসিয়া পড়ে। প্রচলিত পদ্ধতির ন্যূনতম পরিবর্তন দ্বারা পঞ্জিকা সংস্কার সাধন করিতে হইলে উহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। এই একই কারণে ২২শে মার্চ বা প্রচলিত ৮ই চৈত্র তারিখে যে বৎসর আরম্ভ হইতেছে তাহার প্রথম মাসের নাম চৈত্র ভিন্ন অন্য কিছু করিলে তাহাও পরম বিভ্রান্তিকর ব্যবস্থা হইত। 'নক্ষত্রনামা' মাসগুলি সায়ন বৎসর গ্রহণের ফলে অতঃপর নক্ষত্রের সহিত সম্বন্ধবিরহিত হইবে, ইহা সত্য। তখন মাসগুলির নাম মাত্র পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রকৃত কালে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট ঋতুতেও) ধর্মকৃত্যের অনুষ্ঠান প্রাথমিক কর্তব্য, ইহা সাধন করিতে মাসের নামগুলি যদি পারিভাষিকত্বই প্রাপ্ত হয় তবে তাহাতেও ঋতুবিভ্রাট অপেক্ষা গুরুতর কোন ক্ষতির কারণ নাই। এই সামান্য ত্যাগ দ্বারা আমরা পঞ্জিকার ভ্রমজনিত অকালে ক্রিয়া-কলাপ করিবার দায় হইতে মুক্ত হইব।

শ্রীযুক্ত ভঞ্জ মহাশয়ের প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশগুলিও প্রতিবাদযোগ্য। কিন্তু লেখক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া মৎকর্তৃক পূর্বে প্রদত্ত উত্তরাবলীরও বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আর নূতন করিয়া বিষয়গুলির সমালোচনা আবশ্যক হইতেছে না। গণিতশাস্ত্র বা জ্যোতির্বিদ্যা লইয়া যাঁহারা কিছু চর্চা করেন তাঁহারা পূর্ব প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করিলে উত্তরগুলি আর জটিল মনে হইবে না।

প্রবন্ধশেষে শ্রীযুক্ত ভঞ্জ মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে আরও তদন্তসাপেক্ষ আর্যভট্টের ফাঁসিটা স্থগিত রাখিলেই ভাল হইত। দেখা যাইতেছে যে সূর্যসিদ্ধান্তের অয়নদোলন মতবাদ অগ্রাহ্য করায় জন্যই উক্ত শ্লেষবাক্য। কিন্তু আর্যভটের (আর্যভট্ট নহে) নাম এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয় কি কারণে তাহা বোধগম্য হইতেছে না। আর্যভট ভারতীয় জ্যোর্বিদকুলের পরম নমস্য ব্যক্তি। কিন্তু তিনি তো অয়নদোলন মতবাদ প্রচার করেন নাই, এমন কি সূর্যসিদ্ধান্তগ্রন্থও তাঁহার রচিত নহে। তবে অয়নদোলন মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিলে আর্যভটের ফাঁসি হইবে কেন? সূর্যসিদ্ধান্তের ন্যায় উন্নত ধরনের জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ ভারতের পরম গৌরবস্থল। এই উচ্চাঙ্গ গ্রন্থের মধ্যে পরবর্তী কালে যে অজ্ঞাতনামা জ্যোতির্বিদ তস্করের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অয়নদোলন মতবাদাত্মক কয়েকটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিলেন, তাহার যদি ফাঁসি হইয়াই থাকে তবে আর যাহারই হউক সুধী সমাজের উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই।

কুমারসম্ভব

হীরালাল দাশগুপ্ত

মৃত্যু-ঠাণ্ডা চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে অন্ধকার
অরণ্যের প্রাণ-পিণ্ড কেঁপে কেঁপে ওঠে বারংবার
সংজ্ঞাহীন বিবর্ণ ব্যথায়। সমতল হেম-অঙ্কে স্রোত হিমানীর!
উদ্বেলিত তুঙ্গ বক্ষ চড়াই-উৎরাই। এখানে কি কোনদিন
কোনো রমণীর
পায়ের নূপুর বেজেছিলো? মাইল-মাইল নদী নয়—
বরফের কান্না—
ছল্ করে জল নিতে এ ঘাটে কি কোনোদিন এসেছিলো
বিরহিণী রাধা?

হয়তো কখনো কোনো দুর্যোগের ক্ষণে এক দুঃসাহসী
যাত্রী এসে
বহুদূর দেশ থেকে উপস্থিত হত! তার পর রাত্রিশেষে
চলে যেত আপনার পথে। হয়তো বা রেখে যেত
অক্ষরিত কোন অভিমত
কেটে কেটে পাষাণ-ফলকে। ভুলে যেত পথশ্রম।
ধুয়ে যেত পথ
পা-ধোয়ার সাথে সাথে। ভৌগোলিক কৌতূহলে
ইতিহাসে চির অলক্ষিতা,
বারে বারে গর্ভবতী পৃথিবীর সৃষ্টি-মহোৎসবে
মৌন-উপেক্ষিতা,
অমৃতের তপস্যায় মৃত্যু-মায়া-ভ্রূকুটিনাশিনী,
তপঃক্লিষ্ট ক্ষীণতনু তুষারিণী—উত্তর-বাসিনী!

অকস্মাৎ পৃথ্বিগর্ভে প্রলয়-কম্পন! তাণ্ডব নৃত্যের
তালে-তালে
অরণ্য পর্বত কাঁপে! আদিগন্ত সমাচ্ছন্ন ধূম্র জটাজালে।
অনির্বাণ যৌবনের অগ্নি-তপস্যায় সিদ্ধি পার্বতীর।
ত্রি-নয়ন-বহ্নি-শিখা—মহামৌন—মহাশান্ত—মহাযোগী-
রুদ্র ধূর্জটির
ধ্যানভঙ্গ হল! দিকে দিকে শঙ্খধ্বনি। ললনা-ললিত
কণ্ঠে চাপা কলরব।
এতদিনে—এতক্ষণে—মহাকাল সন্ধিক্ষণে—কুমারসম্ভব!

আবির্ভাব

রামপ্রসাদ সেন

বহ্নির সাথে আলোক-বন্যা
প্লাবিল শূন্য সব।
মহাঅম্বরে সম্ভব হ'ল
যা ছিল অসম্ভব!
যুগভানু যবে অস্তে নামিল,
সে ঘনতিমির-পলে,
সহসা উবরি অগ্নি-সিন্ধু—
দ্বিতীয় সূর্য জ্বলে!

আকাশগঙ্গা, পাতালগঙ্গা
আজি হুতাশন পূর্ণি,
ব্যাপিল গগন লহরে লহরে
জাগায়ে অনল ঘূর্ণি!
ধূমকেতু ঘোষে অশুভ বার্তা
পাবক প্রবাহে পশি!
রক্ত-তারকা ধিকি ধিকি জ্বলে,
উল্কা পড়িছে খসি!

তুলী, বক্র গ্রহের চক্র
মজ্জিত রসাতলে।
হেরো, বিগত তপনে বন্দনা করি,
আগত সূর্য জলে!
দর্পিত রাহু-কেতু,
নির্বোধ সম ঘুরিছে শূন্যে,
খুঁজিয়া না পায় হেতু!
আপনা লুকাতে ছায়া নাহি পায়,
চাহে ধরণীর পানে।
পৃথিবীর জীব পারে কি বলিতে
অভাবনীয়ের মানে?
তমসাময় আঁধার বসুধা,—
হাঁপ ধরে আসা কালো!
রাষ্ট্রপতিরা ভাষণ দিতেছে
নিবায়ে প্রতিটি আলো!
লুব্ধ তাহারা, স্বার্থের লাগি
অসুরে আনিয়া বশে,
পুষিয়া রেখেছে নারী শিশুঘাতী
বিজ্ঞানী-রাক্ষসে।
নরক-মন্ত্রী, অঘোরপন্থী
সেই বিজ্ঞানী দল।
ডাকিনী মন্ত্রে রচিল যন্ত্র,—
মানবনাশিনী-কল।
রক্তপিপাসু, অতিলোভী তারা
স্বর্ণ-পদক গলে,
হানে উল্লাসে মারণ-অস্ত্র
আকাশে, ভূমিতে জলে!

বহে অহরহ রুধির প্রবাহ,
নরবলি ক্ষণে ক্ষণে।
আর্তকণ্ঠ চাপা পড়ে যায়,
দানবের গর্জনে।
কাঁদিছে তাহারা যুক্তিনিগড়,
উক্তি করিছে জড়ো।
তর্কে হারিয়া নির্বোধ নর
হ'ল নির্বোধতর।
বিজ্ঞানী সাথে মিলিয়া যক্ষ
আনি নরনারী ধরি।
নাশিল সবার শ্রবণ, নয়ন,
বুদ্ধি, চেতনা হরি।
বন্দী করিল দেহ শৃঙ্খলে,
পঙ্গু করিল মনে।
সহসা উদিল দ্বিতীয় সূর্য
এ হেন সন্ধিক্ষণে।
বিদীর্ণ করি নভোমণ্ডল,
তম-আবরণ নাশি,
অবারণ স্রোতে তরল-অগ্নি
ধরণী ফেলিল গ্রাসি!
পুড়িল দানব, পুড়িল মানব,
লতা পাতা ফল শস্য!
স্বর্ণপদক বক্ষ পুড়িয়া
পলকে হইল ভস্ম!
তারি সাথে পোড়ে যক্ষের-দাস—
বিজ্ঞানী দলে দলে!
আজি আলোকে আগুনে ব্যাপিয়া বিশ্ব
দ্বিতীয় সূর্য জলে!!

সাম্প্রতিক সাহিত্যের সংকট

অনিল চক্রবর্তী

কথিত আছে, রবীন্দ্রনাথকে একদা এক ভদ্রলোক তাঁর জীবিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। কবি উত্তরে বলেছিলেন, কবিতা লিখি। কিন্তু প্রশ্নকর্তা জবাবটিকে একেবারেই গায়ে না মেখে বারবার একই প্রশ্ন করতে থাকেন। অর্থাৎ কবিতা লেখা যে কারও জীবিকা হতে পারে এ-কথাটা তিনি কষ্ট করেও কল্পনা করতে পারেন নি। দৈনন্দিন জীবনের একটি ছোট্ট ঘটনা মাত্র—কিন্তু এইটুকু ঘটনা থেকেই একটি দেশের শিক্ষিত সমাজের কাব্যপ্রীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। তবু আমাদের লজ্জা ঢাকবার এবং দুঃখ ভোলার মত সান্ত্বনা এই যে, কবিতার এ দুরবস্থা কেবল আমাদের দেশেই নয়, যে-দেশ বহুকাল যাবৎই ক্রমান্বয়ে বহু সৎ কবির জন্ম দিয়ে এসেছে সেই ইংরেজের দেশেও কবিতা সম্পর্কে প্রায় একই রকম ধারণা। সত্যি কিনা জানতে হলে পাঠককে অনুরোধ করি, দয়া করে আর্নল্ড্ বেনেটের 'লিটারেরি টেস্ট' নামক অত্যন্ত ছোট্ট বইটি যেন একবার পড়ে দেখেন। উদ্ধৃতি দিতে চাই না। কারণ, কথাগুলো এমনই নিষ্ঠুর যে তা কোন কবি বা কবিতারসিকের কানেই সুখশ্রাব্য বলে মনে হবে না। শুধু দুটো দেশ থেকেই অনুমান করা শক্ত হবে না, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কবিতার একই অবস্থা। এ থেকেই বোঝা যায় দেশে-দেশে কবির সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক, কবিতার পাঠকসংখ্যা সর্বত্রই এবং সর্বকালেই সে অনুপাতে কম। তার একটা সহজ কারণ খুঁজে বার করা বোধ হয় কঠিন কাজ নয়।

আবহমানকাল পৃথিবীর বড় বড় সমালোচকেরা কবিতা সম্পর্কে বহু কথা বলে আসছেন, তা থেকে অন্ততঃ এ সিদ্ধান্তে আসা চলে যে, কবির বাণী জীবনের গভীর কথা গভীর সুরে বলে। মানতে বাধা নেই, কেন না এ সত্যকে চিরকাল মানুষ স্বীকার করে আসছে। কিন্তু খটকাটা অন্য জায়গায়। কবিতার প্রতি এই বীতরাগ বোধ হয় তার জন্মলগ্নে এত গভীর ছিল না। সংশয় ও বিরাগের জন্ম অনেক পরে। যাঁরা সাহিত্যের খবর রাখেন তাঁদের জানানো নিষ্প্রয়োজন যে, গদ্য রচনায় কাহিনী পরিবেশনের রীতি কবিতার জন্মের বহু পরেকার ঘটনা। পরেকার বললেও সবটা বুঝিয়ে বলা হল না। সত্য কথা এই যে, যখন গল্প-উপন্যাসে কাহিনী রচনা করে পাঠকসাধারণের প্রীতি-উৎপাদনের চেষ্টা দেখা দিল বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে, তখন কাব্যসাহিত্য অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলে এসেছে। কিন্তু এই দীর্ঘ পথের ইতিহাসে বিশেষ কোন অঘটন চোখে পড়ে না। তার কারণ, কবিতা সম্বন্ধে যে রীতিপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তা মোটামুটি বজায় রাখতে তৎকালীন কবিদের বাধা ছিল না। ফলে তাঁরা পাঠক এবং শ্রোতাদের একই সঙ্গে দুটি ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে সক্ষম হয়েছেন—এক কাব্যপ্রীতি, দুই গল্প শোনা। তার মানে ছন্দোবদ্ধ কবিতার মারফত দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনাটাই ছিল প্রাক্‌গদ্যযুগের একমাত্র না হোক, প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু, আসল গোলমাল বাধল গীতিকবিতার উদ্ভবের পর থেকে। গীতিকবিতা মূলতঃ মন্ময় কাব্য। সে কাহিনী বলে না, বলে কবির প্রাণের কথা, অনুভূতির গভীরতার কথা। ছন্দলালিত্যে এবং বাণীমাধুর্যে তা যত সুন্দরই হোক, একটা অসুবিধা তার আছে যে, সে সহজ ভাষায় সোজাসুজি মনের দুয়ারে ঘা

দেয় না। যার মনের তন্ত্রীতে আঘাত লাগল সে পাগল হল, কিন্তু যার লাগল না? প্রাণের অনাহত তন্ত্রীতে সুর না বাজলে দোষ দেব কাকে, কবিকে, না পাঠককে? কাব্য হচ্ছে রূপক-সাহিত্য। এমনটা আশা করা সঙ্গত হবে না যে, সামান্য শিক্ষিত বা অধিকাংশ প্রায় অপ্রস্তুত পাঠক রূপক-সাহিত্যের ভেতর দিয়ে লেখকের মনের আসল বক্তব্যটিকে খুঁজে বের করবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করে ফিরবে। এত সময় তো নেই-ই, ধৈর্যও নেই। তার চেয়ে তারা খুঁজবে এমন কিছু, যা তাদের আনন্দ দেবে প্রচুর, অথচ যাকে বোঝবার জন্য অসাধারণ ধৈর্যের প্রয়োজন হবে না। সে সোজা গল্প শুনতে পছন্দ করে, কেন না তা তার মন এবং অবসরের অবারিত খোরাক যোগায়।

যদিও কথাসাহিত্যের উদ্ভবের পেছনে এইটেই একমাত্র বা আসল কারণ নয়, তবুও এখন বলা চলতে পারে যে, পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্যে এত বেশী গল্প-উপন্যাস রচিত হওয়ার হেতু হিসেবে এই কারণটি একটি অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু কথাসাহিত্য লেখকের মনের কথাকে স্পষ্ট ভাষায় এবং সোজাসুজি পাঠকের প্রাণের প্রান্তে পৌঁছে দেয়, সেহেতু লেখকের আসল বক্তব্যটি তাকে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যও অভিভূত করে রাখে। গল্প শোনার কৌতূহল মানুষের একটি আশৈশব প্রবৃত্তি। এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে কৌতূহল বাড়ে ছাড়া কমে না। এককালে এ বাসনার নিবৃত্তি ঘটানোর উপায় হিসেবে কথকতার প্রচলন ছিল। এদিকে তীব্র গতিতে পৃথিবী বদলে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক রীতি-নিয়মও পালটাচ্ছে। সুতরাং যে সব প্রচলিত রীতি গতির সঙ্গে তাল রেখে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারল না তার মধ্যে এই কথকতা একটি। কিন্তু তাই বলে মানুষের গল্প শোনার অদম্য ইচ্ছাটাও কি সেই সঙ্গেই মরে যাবে? না, এবং তা যায় নি যে তার প্রমাণ, দেশে দেশে গল্প-উপন্যাসের প্রকাশ এবং তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা।

কিন্তু এখানে সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের একটি স্বতঃবিরোধ দেখা যাচ্ছে। সামাজিক ব্যবস্থার পটপরিবর্তনের ফলে মধ্যবিত্তের পরিধিটা বেড়েছে এবং একেবারে আজকের খবর এই, পৃথিবীর সকল সমাজে মধ্যবিত্তের সংখ্যাই বেশী। সাহিত্যপাঠের স্পৃহা আর তাকে অনুধাবন করার মত মনের অবস্থা স্বভাবতঃই মধ্যবিত্ত সমাজের সমধিক। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন গোল বাধাচ্ছে বার বার। বলা বাহুল্য, জন্মের পর থেকে মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দেই জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চায়। তার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন যে জিনিসটির তাকে অর্জন করবার জন্য তাই মানুষের চেষ্টার ত্রুটি নেই। দিনরাত প্রাণপাত পরিশ্রম করেও মনের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করা যায় না। সাহিত্যের সঙ্গে এই প্রয়োজনটির বিরোধ অন্ততঃ আমাদের দেশে, বড় বেশী স্পষ্ট। তাই, মধ্যবিত্ত সমাজ যতই কেন না সাহিত্যকে ভালবাসুক, ষোল-আনা সাহিত্যিক হতে বুঝি কেউ ভালবাসে না। এমন একটা ধারণা আমাদের সমাজে প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মত প্রচলিত আছে যে, সাহিত্য টাকা আনে না। অথচ টাকাই জীবনের সার। এ অবস্থায় কে আর সাধ করে দারিদ্র্যকে বরণ করতে চায়; নিতান্ত যদি খেপাটে কেউ না হয়! প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতাটি স্মরণযোগ্য। অভিভাবকদের অতএব, দোষ দেওয়া চলে না। কে না স্বীকার করবে যে, কোন অভিভাবকই চান না তাঁর ছেলেদের কেউ সাহিত্যিক হোক। এমন দৃষ্টান্তের অভাব হবে না যে, আজকের দিনের বহু খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিককে জীবনের প্রথম লগ্নে অতিগোপনে, এমন কি অতীব বিপদসঙ্কুল স্থানে বসে সাহিত্যপাঠ এবং সাহিত্যচর্চার মকশ করে মন আর হাতকে পাকাতে হয়েছে। কিছুদিন আগে, অনেকেরই হয়তো মনে আছে, রসিক লেখক শিবরাম চক্রবর্তী জনৈক পত্রলেখকের পারিবারিক সংবাদ বিতরণ করেছিলেন এইরকম: তাঁর তিনটি ছেলের দুটি জীবিত আর একটি সাহিত্যিক। কেরিকেচারে বাড়াবাড়ি থাকবেই, এবং শিবরাম চক্রবর্তীও তার কিঞ্চিৎ সুযোগ নিয়েছেন। তাহলেও অভিভাবকের মনের কথাটিতে কিছু সত্য কি আর ধরা পড়ে না? হাস্যরসটি এখানে সার্থক হয়ে উঠেছে ভেতরের অর্থটি অত্যন্ত করুণ বলেই।

তবু একটা ভরসার কথা, সমাজ আর একবার পাশ

ফিরতে শুরু করেছে। সামাজিক পরিবর্তনের অন্যান্য হিসেবে মানুষের রুচিরও কিছু বিবর্তন ঘটে। সাহিত্যের দিক থেকে এই পরিবর্তনটি অনেকখানি সুফল এনে দিয়েছে এ কথাটা স্বীকার করতে দোষ নেই। সমাজ-জীবনে সাহিত্যিকের প্রতি অবহেলার মেঘ অনেকটা কেটেছে। আশা করা যায় মেঘ আরও—আরও পরিষ্কার হবে। দেশে শুধুই যে গল্প-উপন্যাস ইত্যাদির প্রকাশ ও প্রচার বাড়ছে তাই-ই নয়, সেই সঙ্গে লেখকদের সম্মান বাড়ছে, টাকাও। হতে পারে, যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে বিভিন্ন দেশের ভেতর সংস্কৃতির আদানপ্রদান তার জন্য দায়ী, কিংবা হতে পারে চিত্রশিল্পের অধিকতর জনপ্রিয়তা তার আর একটি কারণ। কারণ যাই হোক, অন্ততঃ প্রত্যক্ষ সত্যটি যে মোটামুটি আশাপ্রদ তাতে আমাদের খুশী না হয়ে উপায় নেই।

আবার সেই সঙ্গে সতর্ক হওয়ারও কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। সম্মান নামক বস্তুটি এমনি মূল্যবান লোভ যে সেখানেও ভেজাল মেশবার আশঙ্কা আছে। সাহিত্যচর্চা একটি অসাধারণ সাধনার ব্যাপার এ কথা পৃথিবীর যাবতীয় স্মরণীয় লেখকেরা বারবার প্রমাণ করলেও লেখাটা যে আদৌ কঠিন কাজ নয় তা প্রমাণ করবারও তো লোকের অভাব নেই। আর তাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এমন কি নিতান্তই অল্পশিক্ষিত মানুষও গল্প পড়তে ভালবাসে। এ রকম কি দেখা যায় না, সামান্য একটু খরচ করার মত সময় হাতে পেলে একটি নির্বিবাদী মানুষ সাধারণতঃ একখানা গল্পের (উপন্যাসও বস্তুতঃ একটি দীর্ঘতর কাহিনীই তো।) বই-ই হাতে নিয়ে বসতে চায়। তা সে বই যে গল্পই বলুক না। যাদের ব্যবসাজ্ঞান টনটনে অথচ সাহিত্যবোধের অনটন, এ সুযোগ নিতে তাদের বাধবে না। ভেজাল যদি কঠিন রোগের ওষুধেও চলে, তবে এখানেই বা চলবে না কেন?

সুতরাং প্রতিকারের কথা ভাবতে হবে বইকি। যদি এ কথা আমাদের মানতে বাধা না থাকে যে একটি দেশের মর্যাদা অনেকখানিই নির্ভর করে তার সাহিত্যের ওপর, তাহলে আমাদের অর্থাৎ পাঠকদের, একটি বড় দায়িত্ব হওয়া উচিত অপসাহিত্যকে কদাপি প্রশ্রয় না দেওয়া। কোনটা সাহিত্য নয়, ছদ্মবেশ মাত্র, তাকে যথাযথরূপে চিনতে পারাটা পাঠকের একটি বিশেষ যোগ্যতা। অপসৃষ্টি কি কেবল আমাদের সাহিত্যকেই কলুষিত করেছে? কলকাতায় বসেই আমরা কি জানি না, অত্যন্ত নিকৃষ্ট রচনাও বর্তমান য়ুরোপ বা আমেরিকার বিভিন্ন দেশে লাখো লাখো সংখ্যায় রাতারাতি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে! সে তুলনায় আমাদের দেশের নিকৃষ্ট রচনা তৈরি এবং বিক্রি তো বরং অনেক কমই। তাহলেও বলা সঙ্গত হবে না, পশ্চিমী সাহিত্য-পাঠকের মান সত্যিই নীচু। তার কারণ, যাঁরা সত্যিকারের শিক্ষিত পাঠক, অর্থাৎ যাঁরা সাহিত্যের পরম্পরাগত ইতিহাসচেতনায় সমৃদ্ধ, তাঁরা সৎসাহিত্যকে চেনেন, সে-সাহিত্যের আলোচনায় নিয়ত উৎসাহ বোধ করেন। ফলে যা সাহিত্য তার মানও যথেষ্ট নীচে নেমে যাওয়ার সুযোগ পায় না। আলোচনায় উৎসাহ বোধ আমরা করি না, তা নিশ্চয়ই সত্য নয়। কিন্তু, সে-আলোচনা সর্বক্ষেত্রে নির্বিকল্প সততার প্রশ্রয়ে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পায় না বলেই অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট আলোচনার ফলে দায়িত্ব-বোধহীন কোন কোন অবিরাম লেখক কখন বা সৎসাহিত্যিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পান। এর জন্য দায়ী সমগ্রভাবে অধিকাংশ লেখক, পাঠক এবং সমালোচকের ঐতিহ্যগত সাহিত্যচেতনার অভাব—যে চেতনা নিঃসন্দেহে সৎ ও উন্নত সাহিত্যকে চিনতে সাহায্য করে। সুতরাং নিজের দেশের সাহিত্যমানকে বাঁচানোর মহৎ অভিপ্রায়ে অন্ততঃ এটুকু যেন আমরা বুঝতে পারি, পাঠকের রুচি যদি একটা উন্নত মানকে ধ্রুব বলে চিনতে পারে, তাহলে তাদের মন এবং সময়কে নষ্ট করার সুযোগ নিতে পারবে না দায়িত্বজ্ঞানহীন সুবিধাসন্ধানীরা।

—

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

বিক্রমাদিত্য হাজরা

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর উত্তেজনা কমতে না কমতেই এসেছে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী। চারদিকে হৈচৈ মাইক বক্তৃতা প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন এবারও নেহাত কম হচ্ছে না কিন্তু বাহ্যিক হল্লোড়টা বাদ দিলে অন্তরে এই দুই মহাপুরুষের জীবনাদর্শ থেকে আমরা কতখানি যে গ্রহণ করছি তা নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সঙ্গত আশঙ্কা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেছেন, "কবির কাছ থেকে আমরা নিইনি তাঁর ভাবসাধনা, তাঁর ধ্যান, তাঁর অনুভূতি, তাঁর সৌন্দর্যচেতনা, তাঁর মানবিক মূল্যবোধ, তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। স্বামিজীর কাছ থেকেও হয়ত নেবনা তাঁর দৃপ্তভঙ্গী, তাঁর বীর্য, তাঁর জীবশিবচেতনা, তাঁর করুণাঘন প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠা, তাঁর তপোজ্জল মন্ত্র, তাঁর শক্তিসাধনার ইঙ্গিত।" [রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ : ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৬৯] সৌন্দর্য ও বীর্য-সাধনা আমাদের দেশে একেবারেই কেউ করছেন না এ কথা আমি বলব না। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় কম এবং তাঁদের খোঁজখবর রাখার গরজ আরও কম। অন্তত: প্রচার-সংখ্যার জোরে যারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে রবীন্দ্র বা বিবেকানন্দ-ভক্তির দাবিতে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছে তারা প্রকৃত নিষ্ঠাবান সাধকদের অনুসন্ধান করার প্রয়োজন বোধ করে না।

এক-একটা সময় আসে যখন সাহিত্যের বা শিল্পের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও বীর্য-সাধনার সমন্বয়ের প্রয়োজন ঘটে। চীন ভারত আক্রমণ করায় দেশে এখন সেই ধরনের একটি আপৎকাল সমুপস্থিত। কাজেই সাম্প্রতিক কালের দেশাত্মবোধক শিল্প বা সাহিত্যের বাজারে একটু খোঁজ-খবর নিলে খুব সহজে বুঝতে পারা যাবে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের আদর্শকে আমরা কতখানি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি।

* * *

চীনা-আক্রমণের পর থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং সংস্থা দেশপ্রেমের একচেটিয়া অধিকারের জন্ত তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। বলা বাহুল্য স্বয়ং সরকার-বাহাদুর এ সব প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে। সরকার হলেন দেশপ্রেমের চীফ মনোপলিস্ট; আর আর যত মনোপলিস্ট আছেন সকলকেই সরকারের লেজ ধরে চলতে হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সরকার আর কখনও এতখানি নির্জলা স্তুতির অধিকারী হন নি। কাজেই দেশপ্রেমের চীফ মনোপলিস্ট শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কী করছেন তার কিছু খবর নেওয়া ভাল। কারণ তাঁরা যা করছেন সেইটেই সকলের অনুসরণীয়। কলকাতার আকাশ-বাণী সম্পর্কে মাঘ-সংখ্যার 'প্রবাসী' কী বলছেন খানিকটা উদ্ধৃত করে শোনাই: "দেশের বর্তমান অবস্থায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু এই সব দেশাত্মবোধক গানে কতকগুলো বিশেষ ধরণের বাক্য বা কথা থাকিলেই তাহা দেশাত্মবোধক হইতে পারে না। কলিকাতা আকাশবাণীতে গত কিছুকাল যাবৎ এক এক ধরণের 'জাতীয়'-সঙ্গীত প্রচার করা হইতেছে—যাহা শ্রোতার মনকে উদ্দীপ্ত না করিয়া করে স্তিমিত ক্লান্ত। এই প্রকার গান শ্রোতার মনে একটা বিকৃত বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে। দুঃখের সঙ্গে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কলিকাতা আকাশবাণী হইতে আজকাল এমন ধরণের গান অহরহ প্রচারিত হইতেছে, যাহা কর্তৃপক্ষের মতে দেশাত্মবোধক হইলেও, প্রচারের অযোগ্য।...কলিকাতা বেতারে 'দেশাত্মবোধক' সঙ্গীতাদির প্রচার এই ভাবে

আর কিছুদিন চলিতে থাকিলে শতকরা অন্ততঃ পঞ্চাশ জন অন্ত-বেতার শ্রোতা তাঁহাদের রেডিও লাইসেন্স ক্যান্সেল করিতে বাধ্য হইবেন।"

অতঃপর 'প্রবাসী' কয়েকটি অশ্রাব্য গানের নমুনা উল্লেখ করে লিখছেন: "তারপর কতকগুলি বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত ক্রমাগত (প্রত্যহ বার সাত-আট) প্রচারিত করিয়া শ্রোতাদের কান ঝালাপালা করা হইতেছে।...ইহার উপর আছে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান 'মজদুর মণ্ডলী' এবং 'পল্লীমঙ্গল' আসর। প্রথমটি বিশ মিনিট—কাজেই অসহ্য হইলেও তাড়াতাড়ি যন্ত্রণা শেষ হয়, কিন্তু পল্লীমঙ্গল আসরটি—প্রত্যেক এক ঘণ্টা ধরিয়া চলে! এই আসরটিকে ভাঁড়ামোর আসর বলিলেও অন্যায় হইবে না। এই আসরের মোড়ল সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ।...মোড়ল মহাশয়ের ধর্মপ্রচার এবং হেডমাষ্টারী আর চলে না। ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।...মোড়ল মহাশয় মনে করেন, সকল শ্রোতাই হয় শিশু আর না হয় গাধা!"

চীফ মনোপলিস্ট যা করেন তাইতেই হাততালি দেওয়াই যে-যুগে দেশপ্রেম প্রমাণের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে-যুগে 'প্রবাসী'র এই নির্ভীক উক্তি প্রণিধানযোগ্য। 'প্রবাসী'র সৎসাহসের নমুনা হিসাবেই উদ্ধৃতিটি এখানে উপস্থিত করলাম। 'বেতার' আমার প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। কল্পনার প্রসাদবর্জিত বীর্যহীন রুচি-বর্জিত বেতার কর্তৃপক্ষ গান নাটক কথিকা ইত্যাদির নামে আজকাল যা সরবরাহ করছেন তাকে এক কথায় বর্ষাকালের সরু মোটা মাঝারি নানা সাইজের নানা কণ্ঠের ভেকের সমবেত সঙ্গীতের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। তফাত এই যে ভেকের সুর না থাক, প্রেরণা আছে। রেডিও কর্তাদের সুরও হল ছিঁচকাঁদুনে নারীকণ্ঠ, প্রেরণা হল টাকা বাজানোর রিনিরিনি। যেখানে টাকার অভাবে বিভিন্ন স্থানের উদ্বাস্তু শিল্প পরিকল্পনাগুলো বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে (যুগান্তর, ১২. ২. ৬৩), সেখানে এই রেডিও-রূপ চিরশিশুটির জন্য কোটি কোটি টাকা বরবাদ করা হচ্ছে।

* * *

দেশাত্মবোধক সাহিত্যের নামে আর এক ধরনের অদ্ভুত জীব কোন কোন পত্রিকা বড় বড় হরফে ছেপে প্রকাশ করছেন। আমি খ্যাতনামা লেখকদের লেখা দেশাত্মবোধক কবিতার কথা বলছি। আমার সামনে এ বছরের ৩৭শ সংখ্যার 'অমৃতে' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত "স্বদেশ" নামক একটি কবিতা রয়েছে। এ-ধরনের কবিতা স্কুল-ম্যাগাজিনের জন্য কোন ছাত্র বা ছাত্রী যদি লিখত তাহলে হয়তো প্রকাশিত হত; কলেজ-ম্যাগাজিনের জন্য কোন তরুণ কবি লিখলে খুব সম্ভব প্রকাশিত হত না। এ রকম একটা লোক-হাসানো কাজ করার আগে অচিন্ত্যকুমার হয়তো ভেবেছিলেন দেশাত্মবোধক গল্প এবং উপন্যাস লিখতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করা দরকার ততখানি দেশপ্রেম তাঁর অন্তরে নেই। একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে অথবা দুটি ছেলে আর একটি মেয়ের বেলেল্লাপনা নিয়ে গল্প লিখলে যে পয়সা পাওয়া যাবে দেশপ্রেমের গল্পে খুব সম্ভব তা পাওয়া যাবে না। কাজেই দেশপ্রেমের নামে bad investment করার মত অব্যবসায়ী বুদ্ধিকে অচিন্ত্যকুমার প্রশ্রয় না দিয়ে ভালই করেছেন। এ কথা কে না জানে যে যারা একান্ত বোকা তারাই দেশপ্রেমের খাতিরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় বা গায়ের একমাত্র গহনাখানা খুলে দেশরক্ষা তহবিলে জমা দেয়। বুদ্ধিমানের কাছে দেশপ্রেম অর্থ উপার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন-মাত্র।

অচিন্ত্যকুমারের কবিতার ছন্দ অমার্জিত, অন্ত্যমিল মিল নয় গোঁজামিল, শব্দ ব্যবহার গণ্ডধর্মী। পঞ্চাশ বছর আগে ডি. এল. রায় এর চেয়ে একশো গুণ ভাল কবিতা লিখেছেন। 'বর্ষিষ্ঠ পুরোনো', 'উৎকণ্ঠ-উদগ্রীব', 'জলোজ্জ্বল,' 'জমাটি-ভরাটি' প্রভৃতি শব্দবিন্যাস একশো বছর আগের কোন কবির কলমেও আসত কিনা সন্দেহ। তথাপি 'বলিষ্ঠ পানীয়ে'র জোরে এমন 'পরিত্যাজ্য পরিহরণীয়' কাব্য যে অচিন্ত্যকুমার রচনা করেছেন তাতে 'কোন মতিচ্ছন্ন নেই'।

* * *

মাঘ সংখ্যার 'নবকল্লোল' দেশাত্মবোধক গল্প প্রকাশে মনোযোগী হয়েছেন। 'দৃষ্টিহীন' ছদ্মনাম নিয়ে কোন লেখক 'যবনিকার অন্তরালে' নাম দিয়ে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস বলে কথিত বড় গল্প লিখেছেন। গল্পটির উদ্দেশ্য দেশপ্রেমের আবেগ উদ্বুদ্ধ করা কিনা ঠিক বুঝতে পারি

নি ; তবে কম্যুনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করা যে আসল লক্ষ্য তা যে-কোন পাঠক বুঝতে পারবে। তাতে অবশ্য আমার আপত্তির কিছু নেই ; কারণ যে-কোন পার্টিই ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করুক না কেন সে নিন্দার যোগ্য। কিন্তু কারও কারও কাছে দেশপ্রেম, সরকারের যে-কোন ব্যবস্থার অন্ধ স্তুতি এবং সরকার-বিরোধী দলগুলির নিন্দা প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে। এই ধরনের মনোভাব আশঙ্কার কারণ ; কারণ এর থেকে ফ্যাসিজমের জন্ম হয়। যাই হোক, এ-সব রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আপাততঃ চিন্তিত নই। আমার প্রসঙ্গ সাহিত্য। এবং সাহিত্যের অসুবিধা এই যে এর সাহায্যে কোন তথ্য প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না। দৃষ্টিহীন তাঁর কাহিনীতে লিখেছেন যে চীনের সঙ্গে পার্টির একটি গোপন চুক্তি হয়েছে যে তারা ভারতবর্ষ দখল করে পার্টির হাতে তুলে দেবে। যেহেতু এমন কোন খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি, সেহেতু সাহিত্যের মধ্যে এ জাতীয় খবর নিছক আজগুবী কল্পনা-মাত্র। রূপকাশ্রয়ী আজগুবী কল্পনার সাহিত্যমূল্য আছে বটে, কিন্তু বাস্তবধর্মিতার সঙ্গে আজগুবী কল্পনার মিলন শিল্পরস সৃষ্টি করতে সক্ষম বলে আমি মনে করি না।

লেখক তাঁর কাহিনীর এই দুর্বলতার খবর জানেন বলে কাহিনীকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য অনেক কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। খাঁটি তারাশঙ্করীয় কায়দায় তিনি নায়ক পুলিনের তিন পুরুষের দীর্ঘ ইতিহাস ফেঁদেছেন। এই ইতিহাসে যুবক বয়সে সন্ন্যাসী হওয়া আছে, সন্ন্যাস ছেড়ে সংসারী হওয়া আছে। ঘরে বধূ থাকা সত্ত্বেও বাইরে বধূর চেয়েও প্রিয়তরা বারবনিতার কথা আছে, সর্বোপরি সেই বারবনিতা চরিত্রমাধুর্যে মাতৃত্ব-রূপে যে আদর্শস্থানীয়া তার বিবরণ আছে। এক কথায় কাহিনীকে রসালো করার জন্য যে-সব অনাবশ্যক ডালপালা বাঙালী পাঠকের মনোরঞ্জনে ইতিপূর্বে সমর্থ হয়েছে লেখক সে-সবের পুরো মাত্রায় সদ্ব্যবহার করেছেন। লেখকের আসল কাহিনী-কেন্দ্র পার্টির একজন সভ্য। তার চরিত্র বা জীবন-দ্বন্দ্বের সঙ্গে এ সব ইতিহাসের কোন সুদূরতম সম্পর্কও নেই।

কিন্তু লেখক কাহিনীটিকে জমানোর জন্য আরও চিত্তাকর্ষক গল্প ফেঁদেছেন। রেণু নামে একটি মেয়ে নায়ক পুলিনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে পাওয়ার জন্যই পার্টিতে যোগ দেয়। এক রাত্রে পুলিনের সঙ্গে এক-ঘরে থাকার প্রয়োজন বোধ করায় সে বলল যে অতঃপর সে মাথায় সিঁদুর পরবে ; তাহলেই লোকে বুঝবে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। কিছুদিন পরে আবার এই রেণুই একজন ধনী ব্যক্তির মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পেরে সভা ডেকে পুলিনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে ফেলল। শুধু তাই নয়, পুলিনেরও এক পূর্ব প্রণয়িনী ছিল। হিন্দু নারীর দুবার বিয়ে হয় না বলে সেই প্রণয়িনী শর্মিলা বিবাহ-বাসর থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছিল। পুলিন যখন তার আশ্রমে এল গোপনে আশ্রয় নিতে তখন সেই আদর্শ নারী দেশদ্রোহী বলে তাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করতে ইতস্ততঃ করল না।

ব্যভিচারিণী, স্বৈরিণী, আদর্শ সতী নারী প্রভৃতি যত রকমের নারীচরিত্র পাঠকসমাজের প্রিয় তাদের সকলের একত্র সমাবেশ যদি ঘটাতে হয় দেশাত্মবোধক গল্প রচনার জন্য তবে স্বীকার করতেই হবে কাজটা বেশ কঠিন।

এক কথায়, প্রকৃত প্রেরণা ও আবেগ না থাকলে নিছক সময়ের চাহিদা মেটানোর জন্য যে শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি হয় তা এমনিই কৃত্রিম হতে বাধ্য। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। দেশাত্মবোধক সাহিত্য বলতে যে-সব নমুনা চারপাশে দেখতে পাচ্ছি তাতে বাংলা সাহিত্যের দেউলিয়াপনার পরিচয়ই উদ্ঘাটিত হচ্ছে।

আসল কথা দেশপ্রেম একটি অস্পষ্ট ভাবালুতা ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কিছু নয়। ৩৭শ সংখ্যার 'অমৃত'তে শ্রীদিলীপ মিত্র "প্রার্থনার আকাশে" নামে একটি দেশাত্ম-বোধের গল্প লিখেছেন। বাড়ির ছেলে যুদ্ধে গিয়েছে ; বৃদ্ধ অন্ধ পিতা পুত্রবধূ আর অন্যান্য ছেলেমেয়েরা মিলে যুদ্ধের আলোচনা করছে। তারা যুদ্ধের খবর পড়ছে ; গহনা বা অর্থ দান করছে, যুদ্ধরত ছেলের জন্য কখনও আশঙ্কা, কখনও গর্ব অনুভব করছে। সমস্ত গল্পটিতে আবেগের অগভীরতাসুলভ প্রচারধর্মিতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। যুদ্ধ যখন দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন দেশপ্রেম একটি সস্তা রোমান্টিক ভাবাবেগ হিসাবে থাকে না ;

মানুষের অন্যান্য আবেগ ও চিন্তার সঙ্গে জড়িত হয়ে দেশপ্রেমের একটা জটিল বাস্তব রূপ প্রকাশ পায়। তার পরিচয় পাচ্ছি না কোন গল্পে।

*　　*　　*

দেশপ্রেমের নামে এই-সব নিবীর্য বাস্তবতাবর্জিত ভাবালুতা-সর্বস্ব আর নয়তো সস্তা প্রচারধর্মী গল্প আর কবিতা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে ৫০শ সংখ্যার 'অমৃত'তে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের "সীমান্ত থেকে ফেরা" গল্পটি পেয়ে একটু মুখ বদলানোর আনন্দ পেলাম। গল্পটির বিষয়বস্তু শত্রুর উপর একটি পালটা অভিযানের কাহিনী। দুর্গম সুন্দর হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগের সঙ্গে লেখক উপস্থিত করেছেন দুর্গমতাকে উপেক্ষা করে ভয়ঙ্করের সম্মুখীন হওয়ার দুর্জয় সংকল্পের চিত্র। হিমালয়ের কাব্যের সঙ্গে যুদ্ধের কঠিন বাস্তবতার চমৎকার মিলন হয়েছে গল্পটিতে। কোথাও অনাবশ্যক আবেগ প্রকাশের বাড়াবাড়ি নেই; কিন্তু বিবরণ-গুলিই আবেগের জন্ম দেয়। দূরবর্তী কোন মেয়ে চম্পার নামটি মাঝে মাঝে উল্লেখ করে কঠোরতার মধ্যে কোমলতার আমেজ এনেছেন লেখক। কাহিনীর শেষে দলের মৃত অধিনায়কদের বর্ণনা লেখক দিচ্ছেন এই ভাবে:

"দুজনে পাথরে দেহটা শুইয়ে রাখল। ঝুঁকে পড়ে নয়ান সিং-এর চোখ দুটি দেখল। নয়ান সিং-এর পলক হারা চোখ গ্রীন পিম্পলের চূড়ার দিকে খোলা।

নয়ান সিং হিমালয়ের অলৌকিক উজ্জ্বলতা ধারণ করতে চেয়েছিল। হিমালয় ওকে তার সাতটি রঙের মধ্যে বেছে বেছে শুধু লাল রঙটি দিয়েছে।"

এই ছোট্ট বর্ণনাটির মধ্যে প্রমাণিত যে লেখক জানেন ব্যঞ্জনাধর্মিতাই সাহিত্যের প্রাণ। যে আবেগ ভাষায় অপ্রকাশিত সে-আবেগের গভীরতা অনেক বেশী।

কাহিনীটির মধ্যে ফ্ল্যাশব্যাকে কিছু কিছু টুকিটাকি ঘটনার উল্লেখ করেছেন লেখক। চীনাদের বর্বরতার কাহিনী; একটি পাহাড়ী মেয়ে নয়ান সিংকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল একবার তার কাহিনী। অনাড়ম্বর ভাষায় লেখক এগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে জওয়ানদের সাহস এবং দৃঢ়তা, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তাবোধ প্রভৃতি ফুটে উঠেছে।

দেশাত্মবোধক সাহিত্যের কয়েকটি নমুনা পরীক্ষা করে আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশে এখন যা চলছে এক কথায় তার নাম দেওয়া যায় মরসুমী ফুলের চাষ। যখন যার চাহিদা দেখা যায় আমাদের লেখকেরা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের মত বা শাড়ির দোকানীদের মত তাই সরবরাহ করেন। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলা— এর নাম আধুনিকতা বা প্রগতিশীলতা। সাহিত্যিককে নিশ্চয়ই সময়ের জাগ্রত প্রহরী হতে হবে। ফ্যাশন যদি হয় রুজ-লিপস্টিক মাখা, তবে অতিক্রান্ত যৌবনের দোহাই দিয়ে মাখতে না চাওয়া তো সেকেলে মনো-বৃত্তির পরিচয়।

তার ফলে দেশপ্রেম যেখানে একটি সদিচ্ছা মাত্র, যেখানে দেশ একটি তীব্র মানবিক আবেগ হিসাবে স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্কল্প প্রাণরক্ষার জৈবিক আকাঙ্ক্ষা থেকেও তীব্রতর প্রতিজ্ঞা হিসাবে উপস্থিত নয়, সেখানে স্বভাবতঃই কল্পনা থাকে অসাড়। যেখানে লেখকদের সাধারণ সময়ের অবলম্বন হল নিবীর্যতা, কাম-লোলুপতা, সস্তা ভাবালুতা, সেখানে চাহিদা থাকলেই কি সাহস বীর্য দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণগুলোকে কল্পনায় অধিগত করা সহজ? রেডিওতে যেমন ন্যাকামিভরা কাকলীকণ্ঠে স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্কল্প ঘোষিত হচ্ছে; তেমনি সাহিত্যেও একটু অননুভূত আবেগকে কৃত্রিম কাহিনীতে বা জোড়াতালি দেওয়া ছন্দে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে যাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ তাঁদের মধ্যেই এই কৃত্রিমতা বেশী করে নজরে পড়ছে। কিছু কিছু তরুণ লেখক বা কবির মধ্যে অনেক বেশী আন্তরিকতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততার সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব নয়। যাঁরা অচিন্ত্যকুমারের দেশাত্মবোধক কবিতা পড়েছেন, তাঁদের বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চীনের নাম বিষ' প্রভৃতি কবিতাপুস্তিকাগুলি পড়তে অনুরোধ করি।

বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিককালে যে বাস্তবতার প্রবণতা দেখা যায় তাও এই মরসুমী ফুলের ব্যাপার।

পাঠকসমাজে বাস্তবতার কিছু কিছু চাহিদা আছে এটা অনুভব করে কিছু কিছু লেখক ডিটেকটিভ বা অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বা সস্তা রোমান্টিক কাহিনী রচনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু বাস্তবতা পরিবেশন করতে যত্নবান হন। যেমন স্বনামধন্য নীহার গুপ্ত বা শক্তিপদ রাজগুরু। এই সব অলোকসামান্য লেখকদের হাতে জীবনের কদর্যতা তীক্ষ্ণ মননশীল বিশ্লেষণের ব্যাপার নয়, বরং উপভোগের ব্যাপার। পাঠকসমাজের নীতিবোধকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য তাঁরা তাঁদের কাহিনীতে কিছু কিছু নৈতিকতার প্রলেপ লাগিয়ে দেন বটে, কিন্তু আসল জিনিস হল কল্পনায় নিষিদ্ধ বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা।

মাঝে মাঝে তরুণতর লেখক-লেখিকাদের মধ্যে যে এই ব্যবসাদারী প্রবণতার ব্যতিক্রম দেখা যায় না এমন নয়। মাঘ সংখ্যার 'সিনেমা জগতে' মায়া বসুর লেখা "আঁকা-বাঁকা" নামক একটি বড় গল্প পড়ে আশান্বিত বোধ করছি। লেখাটির প্রথম দু-চার পাতা পড়েই মনে হল অনবগুণ্ঠিত বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ানোর দুঃসাহস লেখিকার আছে। অবশ্য বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যে স্বাভাবিক দূরত্বটুকু আছে তাকে অস্বীকার করেন নি। বাস্তবের কদর্যতা দেখে তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েন নি, বা নিষ্ফল ক্রোধে ফেটে পড়েন নি। জীবনের প্রতি নারী-সুলভ সহজ বিশ্বাস লেখিকার জন্মাগত বলে বাস্তবের পঙ্কে তিনি ডুবে যান নি। কদর্যতার প্রতি বিকৃত আকর্ষণ তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে নি। অনাসক্ত দূরত্ব থেকে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে লেখিকা কদর্যতার সামাজিক অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন। দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব যে অনেক নৈতিক স্খলনের জন্য দায়ী তা উদ্ঘাটন করেছেন। কিন্তু লেখিকার বিশেষত্ব এই যে জীবনের মূল্যবোধকে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। স্খলনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে বলেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। আপসোস বা আক্রোশে শক্তিক্ষয় না করে শুভবুদ্ধিকে শক্ত মুঠোয় চেপে ধর, হয়তো শেষ রক্ষা হবে—এই কথাই যেন লেখিকা বলতে চেয়েছেন। সাময়িক স্খলন-পতন-ত্রুটিকেও লেখিকা ক্ষমা করতে রাজী আছেন যদি অন্তরে শুভ-বুদ্ধি থাকে। জীবনের মূল্যবোধে এই অবিচলিত বিশ্বাস নারী বলেই লেখিকার মধ্যে সম্ভব হয়েছে। কাহিনীর মধ্যে এক নীড়-সন্ধানী নারীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, যে-মন সবকিছু ক্ষমা করতে রাজী আছে, কিন্তু যা নীড় ভেঙে দেয় তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

ঘটনা কণ্টকিত কাহিনীটির মধ্যে নায়কের জীবনে দুটি নারীর আবির্ভাব ঘটেছে। প্রথম নারীটির শিক্ষা-দীক্ষা-শালীনতা সবই বেশী; কিন্তু ধাক্কা খেয়ে অনায়াসে সে রাস্তায় নেমে এল, দুর্নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করল। অপর নারীটি অমার্জিত, কিন্তু জীবন-প্রাচুর্যে উচ্ছল; পারিবারিক প্রয়োজনে সেও রাস্তায় ঘুরছে, কিন্তু নরকের চেহারা দেখে ফিরে এসে নায়কের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করল। দুর্দান্ত স্বভাবের মেয়েটির এই অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের কাহিনীটুকু খুব মিষ্টি।

লেখিকার ভাষা সাবলীল। কাহিনী-বিন্যাসে স্বাভাবিকতার সঙ্গে নাটকীয়তাবোধের সমন্বয় আছে। ভাষায় যে শক্তি আছে দু-একটা উদাহরণেই তা পরিস্ফুট হবে:

"সমস্ত পৃথিবীটা দুলে উঠল আনন্দর চোখের সামনে। সমস্ত হৃদয়টা গলে গলে তরল আগুন হয়ে পোড়াতে চাইল সমস্ত শরীর। বুকের পাঁজরগুলি খসে পড়তে চাইল। এই প্রথম নিজেকে চিনতে পারল আনন্দ। এক ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি হয়ে ও রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইল বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীর উপর।...দুর্জয় শক্তিশালী আনন্দর বুকের মধ্যে অসহায় পাখীর মত মুখ গুঁজে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল কুমু।"

পাখীর সঙ্গে আত্মসমর্পণকামী নারীর তুলনা খুবই উপযোগী হয়েছে।

নিন্দুকের প্রতিবেদন

নারায়ণ দাশশর্মা

আসলে এটা শোনা গল্প, কিন্তু আসর জমাবার জন্য বানিয়ে বলছি, আমাদের গাঁয়ে ছিল এক কালী-মন্দির। সবাই বলত ডাকাতে কালী, ৺তারাপ্রসন্ন তন্ত্রাচার্য মশাই তালপাতার পুথি ঘেঁটে বলেছিলেন, কালী নয় ছিন্নমস্তা। তা কালীই হোন আর ছিন্নমস্তাই হোন ডাকাতে কালী ছিলেন বড় জাগ্রত দেবতা। মানত করলে যেমন হাতে-হাতে ফল পেত সবাই, তেমনি পুজোয় ভুলচুক ঘটলে আর কথা নেই, পূজরী বামুন সবংশে সাফ হয়ে যেত। মোটা মোটা দক্ষিণার লোভে একের পর এক পুরুত আসেন। কেউ এক মাস, কারও বা মেয়াদ মেরে কেটে দু মাস পর্যন্ত ; দু-তিনজনের তো তেরাত্তির পোহাল না। শেষ পর্যন্ত ডাকাতে কালীর পুজো বন্ধ হবার জো।

জমিদারবাবু তখন ব্রহ্মোত্তরের টোপ ফেললেন ; এক বিঘা দু বিঘা করে পাঁচ বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মত্র জমি পর্যন্ত নিলামের ডাক তুললেন ডাকাতে কালীর পুরুত খুঁজতে। কিন্তু যে বামুন বা ভিনগাঁ থেকে লোভে পড়ে এ গাঁ পর্যন্ত এগোয়, এ-কান ও-কান পাঁচ কান হয়ে প্রিডিসেসরদের হাল শোনা পর্যন্ত থাকে তার তাগদ। তার পরেই চোঁ-চাঁ দৌড় মারে ডাকাতে কালীর তল্লাট ছেড়ে। এমনি করে যখন একটা দুটো করে পাঁচটা অমাবস্যা বিনা পুজোয় কাটল ডাকাতে কালীর থান তখন জমিদারের কাছে জোড় হস্তে গিয়ে দাঁড়াল এই গাঁয়েরই এক উমেদার : হুজুরের অনুমতি হলে—ইত্যাদি।

কে এই দুঃসাহসী ? না, আমাদেরই গাঁয়ের ক্যাবলা চকোত্তী, অষ্টপ্রহর গাঁজার নেশায় গায়ত্রী মন্ত্র পর্যন্ত ভুলে গেছে যে বিটলে বামুন, সেই-ই ! হাতী ঘোড়া গেল তল, এখন ছুঁচো বলে কত জল ! তে-রাত্তির তো তে-রাত্তির, তোর যে এক রাত্তির পোয়াবে না ডাকাতে কালীর চোখের সামনে পড়লে। তা হোক গে, ক্যাবলা তার জন্যে তৈরি আছে। অনেক অনুরোধ-উপরোধ এমন কি ধমক-টমক দিয়েও ক্যাবলা চকোত্তীকে টলানো গেল না তার সঙ্কল্প থেকে। হুজুরের যদি অনুমতি হয় তো ডাকাতে কালীর সেবায় লাগতে চায় সে।

ব্যাটা গেঁজেল মরুক গে ছাই। এই কথা বলে জমিদার তাকে মন্দিরের চাবি ছেড়ে দিলেন। টিকিতে জবাফুল বেঁধে ক্যাবলা ডাকাতে কালীর থানে চলে গেল অকুতোভয়ে। তারপর—ক্যা তাজ্জব কী বাত, একদিন দুদিন করে মাস ঘুরে গেল, দু মাস ঘুরল, কেটে গেল তিন মাস। ক্যাবলার পায়ে কাঁটাটি ফুটল না। এমনি করে যখন ভূত-চোদ্দশী পার হয়ে অমাবস্যাও নির্বিঘ্নে কেটে গেল ক্যাবলাকান্ত চক্রবর্তীর তখন জমিদারবাবু সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে একেবারে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরলেন তার ধুলোমাখা পা দুখানি। ক্যাবলাকান্তর জয়-জয়কারে সারা গাঁ জমজমাট হল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আমি গিয়ে ক্যাবলাকে পাকড়াও করলুম। কী সুলুক করেছে বলতেই হবে আমায়। বলতে কি চায় কিছুতে, কিছুতে বলবে না। তারপর সওয়া ভরি গাঁজা ঘুষ দিয়ে আর সওয়া মণ তোয়াজ করে বার করলুম সিক্রেটস্য সিক্রেট।

ক্যাবলা বলল, জ্যান্ত কালী বলেই তো অত ঝামেলা। তা আমি ভাবলুম কি দরকার কালীকে জাগাতে যাবার ? পুজো করতে গেলেই তো মন্তরের ভুল, পুজো না করলে তো ঠিকও নেই ভুলও নেই ! আমি তাই মন্দিরে যাই, চাল-কলা গামছায় বাঁধি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসি ; মন্তর-টন্তর পড়ার লাইনে ভুলেও পা মাড়াই না। বাস, কালীঠাকুর বিনে পুজোয় যেমন চুপ ছিলেন মাসের পর মাস, তেমনি চুপ থাকছেন এখনও। কালীও আমায় ঘাঁটান না, আমো ঘাঁটাই নে কালীকে। সন্ধি বল, সুলুক বল, এই আমার সোজা বুদ্ধি।

এ গল্প মনে পড়ার হেতুটি পাঠকের সমক্ষে অবিলম্বে নিবেদন করা প্রয়োজন।

একখানি পুস্তক পাঠ করতে করতে হঠাৎ কেন যে আমার ক্যাবলাকান্ত চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ল তা আমিও জোর করে বলতে পারি না। বোধ হয় পুস্তকটির একটি অনুচ্ছেদে আমি লেখকের ক্যাবলাকান্ত-তুল্য তীক্ষ্ণ

বুদ্ধির পরিচয় দেখতে পেয়েছি বলেই এই কাহিনীর আকস্মিক স্মরণাগম। অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করছি :

"আমার জ্ঞানও অতিশয় সীমাবদ্ধ, প্রকাশশক্তি ততোধিক সীমাবদ্ধ। (তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আমি আদৌ লিখতে যাচ্ছি কেন? উত্তরে সবিনয়ে নিবেদন,...আমার...নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী...কেউই পণ্ডিত নন—আমিও নই—অথচ মাঝে-মধ্যে এঁরা কঠিন বস্তুও সহজে বুঝে নিতে চান এবং সে কর্ম আমার মত বে-পেশাদারী—নন-প্রফেশনালই—করতে পারে ভালো।...)"

এটি একটি প্রবন্ধের উপক্রমণিকা। প্রবন্ধটির বিষয়-বস্তু প্রথম বাক্যে একটি প্রশ্নের আকারে উদগ্র: 'রস কি?' এবং প্রবন্ধটির আয়তন, উপক্রমণিকা ইত্যাদি সমেত, ৮০০ শব্দের কম।

এ থেকে অনুমান করা চলে "একটি নিজস্ব পাঠক-গোষ্ঠী" জোটাতে পারলে আমাদের গাঁজাখোর ক্যাবলা-কান্তর পক্ষে 'রস কি?' এই প্রশ্নের সমাধান করা এবং এই প্রবন্ধের লেখকের পক্ষে নিরাপদ নির্বিঘ্নে ছিন্ন-মস্তার পুরোহিত হওয়া দুই-ই অনুরূপ সহজ কর্ম ছিল। সীরিয়াস বস্তুকে সীরিয়াস ভাবে না ঘাঁটিয়ে শুধু চাল-কলা গামছায় বাঁধার পলিসি অব নন্-অ্যালাইনমেণ্ট ছিন্নমস্তা এবং সরস্বতী দুয়ের মন্দিরেই সমান ফলপ্রসূ।

এক দশক কালের ওপর হয়ে গেল, বাংলাসাহিত্যে ক্যাবলাকান্তদের বড়ই প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের নাম 'রম্যরচনা' এবং সকল পাঠকই জানেন চাল-কলা-বাঁধা এই রম্যরচনা পদ্ধতির নিরাপদ সাহিত্য-আরাধনার সর্বাপেক্ষা চতুর পুরোহিতের নাম সৈয়দ মুজতবা আলী।

মুজতবা আলী অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। এবং তিনি যে অত্যন্ত চতুর লেখক, সে-সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিছুদিন আগে অপর এক লেখক সম্বন্ধে আলোচনায় আমি বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছিলাম, একই সাহিত্যিক কী করে বুদ্ধিমান অথচ জনপ্রিয় হতে পারেন তা আমি সহজে বুঝি না। মুজতবার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি অনুরূপ বিস্ময় বোধ করি নি, কারণ ইনি যতটা বুদ্ধিমান, তার চেয়ে বেশি চতুর। (যে গ্রন্থটি থেকে আমি পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিটি সংগ্রহ করেছি তার নাম—চতুরঙ্গ; এ নামের নিপাতন-সিদ্ধ ব্যাসবাক্য—চতুর ব্যক্তির সাহিত্য-রঙ্গ।) অতএব বুদ্ধিবৃত্তিকে সুলভ চাতুর্য দিয়ে ভোঁতা করে জনপ্রিয়তার প্রয়োজনে ভাঁড়ামো করা এঁর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন কর্ম নয়। হামেশাই মুজতবা তেমন দুর্বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন।

বস্তুতঃ, প্রায় দুই দশক কাল বাংলা ভাষায় রম্যরচনা নাম দিয়ে যে রীতির তথাকথিত সাহিত্যকর্ম অনুশীলিত হচ্ছে, তাতে বুদ্ধির চাইতে চাতুর্য, ব্যক্তিত্বের চাইতে মুদ্রাদোষ এবং চিন্তার মৌলিকতার চাইতে বাক্‌ভঙ্গীর লঘুত্ব ক্রমশঃই অধিকমাত্রায় আদৃত হতে থাকছে। রম্যরচনা নামকরণটি—যতদূর মনে পড়ে—অধুনা-বিস্মৃত কিন্তু একদা মারাত্মক রকম বিক্রীত পুস্তক 'দৃষ্টিপাত' প্রসঙ্গেই প্রথম উল্লিখিত হয়েছিল। রসিকজন জানেন, শুধু রসিকজন কেন আশা করি মুজতবা আলী প্রমুখরাও জানেন, সাহিত্য হিসাবে 'দৃষ্টিপাতে'র সর্বাপেক্ষা দুর্বল—প্রায় প্রক্ষিপ্ত—অংশ যে আধারকরের গাম্লিক স্টাণ্ট, পণ্যদ্রব্য হিসাবে 'দৃষ্টিপাতে'র এককালীন জনপ্রিয়তার সর্বাপেক্ষা প্রবল কারণও সেই একই অংশ। সম্ভবত লেখক স্বয়ংও এ কথাটি বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু 'জনপ্রিয়তা' নামক খামখেয়ালি প্রভুর ক্রীতদাসত্বে নিজেকে উৎসর্গ করার গরজে সে-অংশটি গিলোটিন করা তাঁর সাহসে কুলোয় নি।

আসলে রম্যরচনা বস্তুটি কিছু আর নতুন নয়। প্রত্যেক যুগে প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিক বৃহৎ সাহিত্য-কর্মের অবসরে লঘু ভঙ্গীর রচনায়ও প্রবৃত্ত হয়েছেন। রঘুবংশের মহাকবি 'ঋতুসংহার' (এমন কি, সম্ভবত শৃঙ্গারতিলকও) রচনা করেছেন; 'বিষবৃক্ষে'র স্রষ্টা 'মুচিরাম গুড়' রচনায় লজ্জিত হন নি; 'গোরা' এবং 'পূরবী'র রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এবং 'ক্ষণিকা'রও রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু লঘু রচনা মাত্রই রম্যরচনার শ্রেণীতে পড়ে না। রম্যরচনা সেই জাতের লঘু রচনা যাতে লেখকের ব্যক্তিত্ব লঘু ভঙ্গীর অন্তরালে সর্বক্ষণ উপস্থিত। রম্যরচনায় লেখকের সেই মুহূর্তের সুগভীর চিন্তা পরিবেশিত নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্ব পরিবেশিত; আর চিন্তার ভিত্তিভূমিতে ছাড়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ অসম্ভব।

যে-সাহিত্যিক রম্যরচনায় সক্ষম হবেন, তাঁর তাই চিন্তাশক্তিতে, মনস্বিতায় অক্ষম হলে চলে না; মনস্বিতার অতল সমুদ্রে, ব্যক্তিত্বের অগাধ জলরাশিতে, সহজ স্বতঃস্ফূর্ততার তরল তরঙ্গভঙ্গীর নাম রম্যরচনা। গণ্ডূষ-জলমাত্রে শফরীর অঙ্গসঞ্চালনে রম্যরচনার ক্যারিকেচার মাত্র সম্ভব—তার বেশি নয়। এই কারণে কোন একজন সাহিত্যিক আজীবন শুধু রম্যরচনার স্রষ্টা হয়ে থাকবেন, এটা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ঘটনা; জনপ্রিয় রম্যরচয়িতাকে মহৎ সাহিত্যপ্রয়াসের উপকণ্ঠে কখনই দেখতে পাওয়া না গেলে বুঝতে হবে তাঁর রম্যরচনাতে সাহিত্যের খোলস মাত্র আছে, বস্তু নেই।

সৈয়দ মুজতবা আলী রম্যরচনার রমণীয় রঙ্গভূমিতে তথা বাংলা সাহিত্যে, নেমেছিলেন প্রায় চোদ্দ বছর আগে প্রকাশিত গ্রন্থ 'দেশে বিদেশে' মারফত। প্রায় চারশো পৃষ্ঠার এই বইখানির মূল্য ছিল পাঁচ টাকা মাত্র। এর এগারো বছর পরে প্রকাশিত দুশো পৃষ্ঠার লঘু প্রবন্ধ সংগ্রহ 'চতুরঙ্গ'—মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ ন. প.। অর্থাৎ এগারো বছরে মুজতবা আলীর মূল্য পৃষ্ঠা প্রতি সওয়া এক নয়া পয়সা থেকে সওয়া দুই নয়া পয়সায় এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু ইনফ্লেশন দিয়ে এই মূল্যবৃদ্ধির ব্যাখ্যা সম্ভবে না; এমন কি একসাইজ ডিউটিও এর যথেষ্ট সঙ্গত কারণ হিসাবে মানা কঠিন। বিশুদ্ধ অর্থনীতির ডিম্যাণ্ড-সাপ্লাই নিয়মও এ ক্ষেত্রে খুব লাগসই নয়, কেন না আলী সাহেবের ডিম্যাণ্ডের তুলনায় আলী সাহেবের সাপ্লাই বৃদ্ধি কিছুমাত্র কম হয় নি। এ ঘটনার একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা হচ্ছে—'দেশে বিদেশে'র তুলনায় 'চতুরঙ্গ' যারপরনাই নিকৃষ্ট মানের রচনা; এবং শুধুমাত্র অথরের নাম দেখে যে পাঠক এই নিকৃষ্ট পুস্তক ক্রয় করবেন, আক্কেলসেলামি হিসাবে তিনি কিঞ্চিৎ অধিমূল্য দিতে প্রস্তুত থাকবেন এ তো স্বতঃসিদ্ধ।

'দেশে বিদেশে'র ফর্ম রম্যরচনার, কনটেণ্ট ভ্রমণ-কাহিনীর। নিঃসন্দেহে এই যোগাযোগ একটি রাজযোটক। ভ্রমণ-কাহিনীতে ভ্রাম্যমাণ সাহিত্যিকের গভীরতর জীবনদর্শনের চাইতে লঘুচিন্তার স্থান বেশি। বাংলা ভাষায় দীর্ঘ আয়তনের প্রথম রম্যরচনা 'পথে প্রবাসে' যে কারণে সার্থক, কনটেণ্টের সেই যথোপযুক্ততায় 'দেশে বিদেশে'ও সার্থকতার উপকণ্ঠে পৌঁছতে পেরেছিল। সেই আংশিক সাফল্যে যদি আলী সাহেবের মাথা ঘুলিয়ে না যেত, তবে তিনি বুঝতে পারতেন রম্যরচনার ফর্মে, বৈঠকী গালগল্পের ঢঙে, ট্রাভেলোগ্ এবং ফচকে গল্প লেখা যেমনই সহজ ও সঙ্গত, সেই একই ফর্মে ও ঢঙে কাব্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার সমালোচনা প্রবন্ধ লেখা তেমনই অসম্ভব কর্ম।

'চতুরঙ্গ' পুস্তকখানিতে মোটমাট একুশটি প্রবন্ধ। বিষয়বস্তুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, আবুল কালাম আজাদ, আচার্য ক্ষিতিমোহন, তুর্গেনেফ, চার্লি চ্যাপলিন প্রভৃতি যেমন সমুপস্থিত, তেমনি আবার চাচা কাহিনী, গাঁজা, 'ছুছুন্দর কা সিরূপর চামেলি কা তেল' ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ও সমান দাপটে বিরাজমান।

কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ যখন একটি পুস্তকের মধ্যে একত্র প্রকাশিত হয় তখন পাঠক স্বভাবতঃই প্রত্যাশা করবে যে বিভিন্ন রচনাগুলির মধ্যে ভাবগত, শৈলীগত, অথবা উদ্দেশ্যগত কিছু একটা ঐক্য থাকবে। কিন্তু 'চতুরঙ্গ' গ্রন্থের 'গাঁজা'-শীর্ষক রচনায় যখন বিষয়বস্তু দেখা যায় নওগাঁর সারপ্রাস গাঁজা পোড়াবার সময় সমবেত দর্শকের তুরীয় অবস্থা এবং 'চাচা-কাহিনী' উপশীর্ষক রচনায় পাওয়া যায় ইহুদি তরুণীর সঙ্গতৃষিত দুই যুবকের মজাদার কিসসা, তখন এই সব বস্তুর আশেপাশে 'পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গ সমন্বয় করেছিলেন' এই সমাচার কিংবা স্থাপত্যের প্রধান রস বিশ্লেষণ করে তার সংজ্ঞা নির্ণয় ইত্যাদি গুরুতর বিষয় অন্বেষণের জন্য আমরা আদৌ প্রস্তুত থাকি না। পাঠককে অপ্রস্তুত করে দেওয়া যদি পুস্তকটির মূল উদ্দেশ্য না হয় তবে এ জাতীয় বিষম বস্তুর খিচুড়ি পরিবেশনের কারণ দুর্বোধ্য।

কিন্তু আর একটু ঘনিষ্ঠ অন্বেষণ করলে আলী সাহেব ততটা দুর্বোধ্য থাকবেন না, যতটা আপাততঃ মনে হওয়া সম্ভব। 'চতুরঙ্গ'র প্রবন্ধগুলি প্রত্যেকটি সাময়িকপত্রের জন্য ফরমায়েশী লেখা, অধিকাংশ সম্ভবত পুজো সংখ্যা পত্র-পত্রিকার ফরমায়েশী। অর্থাৎ সাহিত্য নয়, সাহিত্যের দূর সম্পর্কের তুতো ভাই জর্নালিজমের এগুলি অনুশীলন।

সাহিত্যিকের রচনার প্রেরণা সৃষ্টির প্রেরণা ; সাংবাদিকের রচনার প্রেরণা বৃত্তির প্রেরণা। প্রথমোক্ত ব্যক্তির জীবনের তাগিদ, শেষোক্ত ব্যক্তির জীবিকার তাগিদ, তাঁদের রচনার চালক শক্তি। সাহিত্যিকের রচনা জন্মায় তাঁর হৃদয়ে, তাঁর মস্তিষ্কে; সাংবাদিকের রচনা বহুলাংশে জঠরে। বৃত্তি, জীবিকা ও জঠরের অনুশাসনে সাংবাদিকের পক্ষে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও গাঁজা উভয় বিষয়ে তাঁর রচনা-পারঙ্গমতা যুগপৎ প্রদর্শন করা—একই পুস্তকে তো বটেই, প্রয়োজন হলে একই প্রবন্ধের কলেবরের মধ্যেও—কিছুমাত্র কঠিন কর্ম নয়। কেন না লেখা তাঁর বৃত্তি মাত্র, লেখা নয় জীবনের সুগভীর রহস্যময় বীজমন্ত্র আবৃত্তি।

'চতুরঙ্গ' প্রসঙ্গ এইখানে শেষ করাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু এর পর আলী সাহেবের অন্য যে পুস্তকখানি আমার আলোচনাতে আসবে, সেটি 'চতুরঙ্গে'র চাইতেও এত বেশি অখাদ্য যে আপেক্ষিক মর্যাদাদানের জন্য এ বইটি থেকে দু-একটি প্রবন্ধের কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি।

প্রথম প্রবন্ধ 'রবিপুরাণ'। তার উপক্রমণিকায় মুজতবা বলছেন :

"রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে···যাঁরা আমাকে স্মরণ করেন তাঁরা আমার প্রাণের বৈরী। এঁরা আমাকে সর্বজন-সমক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে চান, 'দেখো, এ লোকটা কতবড় গণ্ডমূর্খ ;···আমি মূর্খ হতে পারি কিন্তু এতখানি মূর্খ নই যে তাঁদের দুষ্টবুদ্ধিজাত নষ্টামির চিন্তা ধরতে পারব না।"

কেউ যাতে লেখককে ভুলেও মূর্খতার অপরাধে অপরাধী না করতে পারে এই জন্য শুরুতেই 'বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা, আমি ঢাকার বাঙাল নহি গো' [আসলে মুজতবা আলীর বাড়ী শ্রীহট্ট জিলায়] গোছের 'মূর্খ হলেও অতখানি মূর্খ নই' বলে সাফাই গেয়ে রেখেছেন।

এ প্রবন্ধের মধ্যে একস্থলে পেলাম, "···মধুভাণ্ডের প্রতিটি ফোঁটা ফুলের কাছ থেকে চোরাই করা মাল।" চুরি করা মাল অথবা চোরাই মাল দুরকম ব্যবহারই বাংলা ভাষায় দেখা যায় কিন্তু 'চোরাই করা মাল' এরকম বাংলা রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর শান্তিনিকেতনে ছাড়া বঙ্গদেশের কুত্রাপি ব্যবহৃত হতে শুনি নি। এটা কি ছাপার ভুল? হয়তো আলী সাহেব লিখেছিলেন—চোলাই করা মাল।

শুরুর প্রবন্ধটিতেই—যাকে বলে একেবারে বিসমিল্লাহে—সৈয়দ সাহেব যতবারই নিজেকে গণ্ডমূর্খ বলে ডিক্লেয়ার করুন না কেন, ওঁর রম্যরচনায় সার্থকতার পথে বৃহত্তম বাধা কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমান। একদা 'দেশে বিদেশে'র গ্রন্থকাররূপে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী নাম লিখিত হবার পর উনি উপধায় ব্যবহৃত উপাধি 'ডক্টর' পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু নাম থেকে ত্যক্ত হলে কি হবে, অভিমান থেকে আলী সাহেব কিছুতেই ডক্টরেট ত্যাগ করতে পারছেন না। লঘু প্রবন্ধ লিখতে লিখতে অকস্মাৎ ইনি একটু গুরুতর জ্ঞানের ইঙ্গিত না দিয়ে শান্তি পান না।

'চতুরঙ্গ' পুস্তকটি এলোপাতাড়ি ভাবে নাড়াচাড়া করলেই দেখা যাবে ১ পৃষ্ঠায় তুলসীদাস থেকে কোটেশন, ৩ পৃষ্ঠায় জার্মান কবি (মুজতবা সাহেবের প্রিয় কবি বলে 'মহাকবি' বিশেষণে ভূষিত) হাইনরিষ্ হাইনের রেফারেন্স, সেই পৃষ্ঠাতেই বোস্-আইনস্টাইন থিওরি ইত্যাদি থেকে ঠারে-ঠোরে যে জ্ঞানের পরিধি দেখানোর চেষ্টা শুরু, দ্বিতীয় প্রবন্ধে দারা শীকুহ্, ঈশোপনিষদ, ব্রাহ্মধর্ম, শ্রীঅরবিন্দ, কেনোপনিষদ (কোটেশন-সমেত), ইত্যাদি কণ্টকিত চোদ্দটি ফুটনোট এবং বেদান্তবাদ, ম্যাক্সমুলর ও হেনোথেয়িজম্ ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রসঙ্গের উত্থাপন দ্বারা সেই পরিধির বিস্তৃতিকে আওার-লাইন করতে ভুল হয় নি আলী সাহেবের। আরও পড়ে গেলে দেখবেন, অলঙ্কারশাস্ত্র, দণ্ডিন-মম্মট-ভামহ প্রমুখ আলঙ্কারিক, তুর্কি ভাষা (সে নাকি আবার চুগতাই তুর্কী, ওসমানালি তুর্কী ইত্যাদি হরেক রকম), স্কচ, জর্মন, ফার্সী, তামিল কোন-কিছুতেই জ্ঞানের কমতি নেই সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের।

এঁর জ্ঞানভাণ্ডার সম্বন্ধে বক্রোক্তি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। চুগতাই তুর্কীতে দ্বিতীয়বার ডক্টরেট যদি লাভ করেন সৈয়দ সাহেব কিংবা হেনোথেয়িজমের নূতন পয়গম্বর হিসাবে যদি ওঁকে গণনা করেন ওঁর ভক্তকুল তাতে আমার বিন্দুমাত্র ঈর্ষার কারণ নেই। কিন্তু পাণ্ডিত্য দেখাতেও স্থান-বিশেষে বিচার করতে হয় এইটুকু মাত্র আমার নিবেদন।

একটি উদাহরণ উত্থাপন করছি। "নসরুদ্দীন খোজা (হোকা)" শীর্ষক প্রবন্ধে আলী সাহেব ভাষা ও ফোনেটিক্স সম্বন্ধে আপন জ্ঞান-প্রকাশ-মানসে লিখছেন :

"ইংরিজি বর্ণমালার কল্যাণে 'খোজা' কিন্তু বাঙলায় 'হোকা' রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অধুনা তুর্কী ভাষা ইংরিজি (লাতিন) হরফে লেখা হয় বলে তার রূপ hoca ; কিন্তু তুর্কীরা 'এচ' অক্ষরের নিচে একটি অর্ধচন্দ্র বা উল্টো বন্ধনী দেয় এবং তার উচ্চারণ অনেকটা স্কচ্ 'লখ', জর্মন 'বাখ্' বা ফার্সী 'খবরের' মত,······"

বস্তুতঃ 'খোজা' এবং 'খবর' শব্দ দুটির আদ্যক্ষর অভিন্ন উচ্চারণ বলেই আমরা জানি ; আরবী বর্ণমালার 'খে' অক্ষরটি দুটি শব্দে কমন ; আলী সাহেবের পাঠকদের মধ্যে কিয়দংশ আরবী কিংবা আরবী বর্ণমালায় লিখিত

ফার্সী বা উর্দু একটু-আধটু জানতে পারেন, এটি যেমন প্রত্যাশিত তেমনই অপ্রত্যাশিত পাঠকদের উল্লেখযোগ্য অংশের পক্ষে স্কচ কিংবা জর্মন ভাষার সঙ্গে পরিচয়।

তাই পাঠকের জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে লিখতে হলে ফার্সী 'খবরের' উল্লেখই যথেষ্ট ছিল (এবং খোজা ও খবর-এর খ 'অনেকটা' একরকম না বলে হুবহু এক বললেও ক্ষতি ছিল না) কিন্তু তাতে ব্যাপারটা যথেষ্ট পরিমাণে পেডাণ্টিক দেখাত না বলেই স্কচ ও জর্মনের আমদানি—যদিও ওই দুটি ধ্বনির সঙ্গে আরবী 'খে' বর্ণের ধ্বনি অভিন্ন নয়।

বিশেষতঃ এই ধ্বনি-সর্বস্ব শূন্যকুম্ভ জ্ঞান-প্রদর্শনের মিডিয়ম যখন হয় রম্যরচনার লঘুপাক প্রবন্ধ এবং "আমার নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী কেউই পণ্ডিত নন" এই ঘোষণা যখন থাকে এই গ্রন্থেরই মধ্যে, তখন আমরা আলী সাহেবকে খোলা মনে মারহাব্বা বলতে পারি না।

বলছি না যে লঘুপ্রবন্ধ রচনায় রচয়িতার সুগভীর জ্ঞানভাণ্ডারের পশ্চাৎপট নিষ্প্রয়োজন। আমার অবিনয় নিবেদন শুধু এই সে জ্ঞানের একজিবিশনিজ্‌ম রুচিবিকৃতির লক্ষণ।

সার্কাসের ক্লাউন ইচ্ছে করলেই অন্যান্য খেলোয়াড়দের বহুবিধ কসরত মোটামুটি দেখাতে পারেন, কিন্তু সেটা দেখানোর মধ্যে ক্লাউনের বৈশিষ্ট্য নেই। ক্লাউন দর্শক-মণ্ডলীর চোখে সর্বাধিক আকর্ষণীয় এই কারণেই যে তিনি প্রত্যেকটি কসরতের লঘুকরণে পারঙ্গম; তিনি সার্কাসের রম্যরচনাবিদ।

কল্পনা করুন কোনও সার্কাসের রিংমাস্টার একদিন শখ করে অথবা প্রয়োজনের তাগিদে ক্লাউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন; এবং এতাবৎ কালের সেরা ক্লাউন বলে দর্শকদের কাছে প্রচণ্ডভাবে অভিনন্দিত হলেন। তার পরদিন থেকে তাঁর দুঃখের রজনী শুরু! প্রোপ্রাইটার দেখছেন রিংমাস্টারের চাইতে ক্লাউন হিসাবে ইনি বেশী পরিমাণে দর্শকমনোরঞ্জন, অতএব ডবল মাইনে কবুল করে রিংমাস্টারকে ক্লাউন বানানো হল, কিন্তু ক্লাউন হয়েও ক্লাউন ভুলতে পারছেন না যে তিনি আসলে রিংমাস্টার—যত বেশী দর্শকের বাহবা পাচ্ছেন তিনি ততই তাঁর মাঝে মাঝে ইচ্ছে করছে, চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, ওহে দর্শকবৃন্দ, আমি কিন্তু মূলতঃ এই সার্কাসের রিংমাস্টার! দুটি-একটি কঠিন কসরত দেখিয়েও ফেলেন তিনি ফাঁক পেলেই। দর্শক তবু ভাবে, এটা বুঝি ক্লাউন মহাশয়ের লেটেস্ট ভাঁড়ামি। তারা দ্বিগুণ কৌতুকে হাততালি দিতে থাকে।

'চতুরঙ্গ' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধের উপসংহারের অবিকল অনুকরণে অতঃপর লিখতে পারি:

এস্থলে ক্লাউনের ট্রাজেডির দীর্ঘ টীকা নিষ্প্রয়োজন। টাপেটোপে ঠারেঠোরে পাঠক বুঝতে পারছেন—সার্কাস=হালের বাংলা-সাহিত্য; প্রোপ্রাইটার=পাবলিশার; দর্শক=ভক্ত পাঠক; রিংমাস্টার=ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী; ক্লাউন=আলী চাচা।

কিন্তু ভাঁড়ামি হিসাবেও সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে আলী সাহেবের কবিতা সম্পর্কে লেকচার। ২০১ পৃষ্ঠায় ইনি একটি খোলাখুলি স্বীকারোক্তি শুনিয়েছেন, "মডার্ণ কবিতা পড়ে আমি বুঝি না, আমি রস পাই না।" তথাপি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করে—এবং সেখানেই ক্ষান্ত থাকলেও কথা ছিল না—রুবাইয়াতের বিভিন্ন অনুবাদ-কর্মের মধ্যে তুলনা করে কান্তি ঘোষ ও নজরুল ইসলামকে বিচার পর্যন্ত সমাধা করতে আলী সাহেবের আটকায় নি। এর মধ্যে এইটুকু যা কমিক রিলিফ যে গোটা তিনেক রুবাইয়ের আলী সাহেব নিজেও দুমদাম করে অত্যন্ত দুর্বল পদ্য-অনুবাদ ছেপে দিয়েছেন ওরই মধ্যে।

মডার্ন কবিতা বুঝি না, কিন্তু ওমর খৈয়াম, হাইনে, এমন কি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার অবধি আমি একজন পেডেণ্টো ক্রিটিক! কেন না, ওগুলো কবিতা হলেও মডার্ন নয়। এ যেন 'গাঁজা খেতে আমার ভাল লাগে না কিন্তু চরসের আমি একজন গুণগ্রাহী'-গোছের উক্তি। শুধু ভাল লাগে বা লাগে না পর্যন্ত হলে মন্তব্যের প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু এক কবিতার ক্রিটিক হবার দুঃসাহস যাঁর তিনি লজ্জার মাথা খেয়ে কী করে বড় মুখে বলেন অন্য একশ্রেণীর কবিতা আমি বুঝি না, তাতে আমি রস পাই না। এবং 'মডার্ন কবিতা' বলতে যখন রবীন্দ্রনাথ দিয়েই শুরু।

'চতুরঙ্গ' গ্রন্থটি অবশ্য একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে বহুস্থলে সৈয়দ মুজতবা আলীর সেল্ফ ক্রিটিসিজম অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত আছে। যেমন নসরুদ্দীন সম্বন্ধে উক্ত বর্ণনা—"তিনি যেখানে চালাকী করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছেন···তার সংখ্যাই বেশী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এন্তের গল্প আছে যেখানে তিনি একটি পয়লা নম্বরের ইডিয়েট, গাড়লস্য কুৎব্ মিনার।" আলী সাহেবের ক্ষেত্রেও যে কতখানি মোক্ষম রকম মিলে যায় তার অবিশ্বাস্য প্রমাণ পেতে হলে আপনি একবার 'অবিশ্বাস্য' উপন্যাসটি পাঠ করুন।

না, ভুল বলেছি। 'অবিশ্বাস্য' পাঠ করলে আপনার গাড়লস্য কুৎব্ মিনার মনে হবে লেখককে নয়, নিজেকেই। তাই ইতিমধ্যে যদি 'অবিশ্বাস্য' পাঠ করার দুর্ভাগ্য আপনার না হয়ে থাকে তবে আর নতুন করে সে-দুর্গতির মধ্যে নাই-ই পড়লেন। গল্পটা আমিই বলে দিচ্ছি।

'অবিশ্বাস্য'র নায়ক ডেভিড ও-রেলি বিলেত থেকে

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিসের চাকরি নিয়ে এদেশে এসেছে। বয়স একুশ-বাইশ, প্রাণবন্ত মানুষ। আসার আগে বিলেতে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে এসেছিল, নিদারুণ গাঢ় প্রেম। একবছর পরে ছুটি নিয়ে বিলেত গেল বাগদত্তাকে বিয়ে করে আনতে এবং আনল। এবং বউকে নিয়ে চাকরিতে জয়েন করার পর সে আবিষ্কার করল নিজের সম্বন্ধে এই নিদারুণ সত্য যে সে "নির্বীর্য, ইম্পটেণ্ট।" স্ত্রীকে "যৌনতৃপ্তি দেবার ক্ষমতা" তার নেই।

এই হচ্ছে উপন্যাসের প্যাঁচ নং এক।

তারপর দুবছর ও-রেলি 'কঠোর সংযমে' নিজেকে স্ত্রী 'মেব্‌লের কাছ থেকে দূরে' রেখেছিল। কিন্তু তারপর এক গভীর রাত্রে নিজেকে সামলাতে না পেরে বেচারী ইম্পোটেণ্ট স্বামী স্ত্রীর কাছে গিয়েছিল। অতএব—সেই রাত্রে ভোরের দিকে মেব্‌ল তাদের বাটলার জয়সূর্যের (বর্ণনা: "মিশকালো, অষ্টপ্রহর মদে-মাতাল-রাঙা-চোখওলা হোঁৎকা") ঘরে যায়। দয়া করে ব্যাখ্যা চাইবেন না, যা লেখা আছে হুবহু তাই লিখছি আমি। এই নিয়ে শহরে যথারীতি স্ক্যাণ্ডাল রটল এবং যথারীতি মেব্‌লের একটি বাচ্চা হল।

এই হচ্ছে উপন্যাসের প্যাঁচ নং দুই।

তারপর একদিন স্ত্রী মেব্‌ল ও ছেলে পেট্রিককে বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া স্থির করল ও-রেলি। সঙ্গে যাবে বাটলার জয়সূর্য, যে ইতিমধ্যে পেট্রিকের গড্-ফাদার হয়েছে। যেদিন বিলেত রওনা হওয়ার কথা তার আগের রাতে ডিনারের সময় ও-রেলি মেব্‌ল, পেট্রিক ও জয়সূর্যকে আর্সেনিক খাইয়ে মেরে ফেলল। এবং বাগানের মধ্যে লিচুগাছের গোড়ায় গর্ত করে চাপা দিল লাশগুলো।

এই হচ্ছে উপন্যাসের প্যাঁচ নং তিন।

তারপর ও-রেলি বদলি হয়ে গেল সে জায়গা থেকে এবং তার সাকসেসর ডীন জয়েন করে প্রথম রাত্রেই স্পষ্ট দেখতে পেল খুন হওয়া তিনটি মানুষের ভূত লিচুগাছ-তলায় মিলিয়ে গেল। অতএব স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ট্রেনিং পাওয়া এ-এস্-পি ডীন গাছের তলা খুঁড়ল এবং কঙ্কাল তিনটি পেয়ে গেল।

এই হচ্ছে উপন্যাসের প্যাঁচ নং চার।

সবশেষে ও-রেলির কন্‌ফেশন ও জাস্টিফিকেশন দিয়ে উপন্যাস সমাপ্ত।

আগেই বলেছি এই বই নিয়ে কোন রকম আলোচনা করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। এতটা অখাদ্য লেখার উল্লেখ করেই আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। একই বইতে রম্যরচনা, পর্নোগ্রাফি, ভূতের গল্প, ডিটেকটিভ থ্রিলার —সব কিছু পেশ করেছেন আলী সাহেব; এবং হয়তো এই অদ্ভুত কম্বিনেশনের কল্যাণেই বইটি প্রকাশিত হবার এক বছরের মধ্যে এর ছটি এডিশনও হয়েছে। কিংবা শুধুই স্ক্যাণ্ডালাস গল্প বলে এর পপুলারিটি। আলীর লেখা থেকেই জেনেছি—"বর্মাতে একরকম ফল আছে, তার গন্ধ পচা নর্দমার মত; কিন্তু একবার সে ফল যে খেয়েছে, তার ওই ফলের জন্য নেশা হয় আফিমের চেয়েও বেশি।" মুজতবা আলী বোধ হয় তাঁর পাঠকদের কাছে ওই বর্মী ফল। পচা নর্দমার মত গন্ধ, আফিমের মত নেশা।

'অবিশ্বাস্য' আলী সাহেবের প্রথম, এবং আশা করি শেষ উপন্যাস। কিন্তু জোর করে কিছু ফোরকাস্ট করা শক্ত মুজতবা আলীর সম্বন্ধে। ক্লাউনরা সাধারণতঃ সার্কাসের অন্য সব খেলার মধ্যে ভাঁড়ামি করলেও বাঘের খেলায় নাক গলান না; কিন্তু সার্কাসের সত্য বাংলা সাহিত্যেও যে হুবহু মিলবে এ কথা নিশ্চয় করে বলি কী করে? হয়তো আলী সাহেবকে আবার দেখতে পাব উপন্যাসের খেলায় রম্যরচনার ভাঁড়ামো পুনরায় আমদানি করেছেন।

কেন না নসরুদ্দীনের গল্পে উনি লিখেছেন, মিশরী কাবাব রান্নার জন্য মাংস এবং পাকপ্রণালী সংগ্রহ করে খোজা যখন বাড়ী যাচ্ছিল, চিল এসে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে যায়; তখন খোজা বলেছিল, মাংসটা নিলে কী হবে—রেসিপিটা যে আমার পকেটে।

খোজার কাছ থেকে রেসিপিটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন আলী সাহেব, চিলের কাছ থেকে মাংস পান নি। অতএব সেই রেসিপিমাত্র সম্বল করে ওঁর পক্ষে রম্যরচনা অথবা উপন্যাস যা ইচ্ছে লেখা সমান সহজ মনে হতে পারে। কন্‌টেণ্টের কনটেন্‌মেণ্ট নয়, ফর্মের ক্লোরোফর্ম নিয়েই ওঁর হাঁকডাক।

এবং সেই কারণেই সৈয়দ মুজতবা আলী চোদ্দ বছর ধরে সাহিত্যের সঙ্গে ফ্লার্ট করার পরও এখনও ও-রেলির মত বুঝতে পারেন নি যে তিনি কতখানি ইম্পোটেণ্ট!

বুঝলে তাঁকেও আর্সেনিকের সন্ধান করতে হত। এবং আমরা সম্ভবত ওঁর লেখা গেলার চাইতে আর্সেনিক গিলতে ঢের বেশি রাজি থাকতাম।

*
* *

সংবাদ-সাহিত্য

স্মরণ

আমাদের পিতৃবিয়োগের পর এক বৎসরকাল গত ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩, ২৮শে মাঘ ১৩৬৯ তারিখে পূর্ণ হইয়াছে। সজনীকান্ত দাসবিহীন শনিবারের চিঠি একটি বর্ষ অতিক্রম করিল। এই এক বৎসর আমাদের অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেল—আমরা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি।

সজনীকান্তের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি—শনিবারের চিঠির মাধ্যমে সাহিত্য সমালোচনা এবং নূতন সাহিত্যিক সৃষ্টির দুরূহ প্রয়াস। দুইটিতেই তিনি বিপুল সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন—সাহিত্যের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অথচ বিপদসঙ্কুল অবস্থায় শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্তের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। শনিবারের চিঠিই সজনীকান্তের স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠতম স্তম্ভরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। সজনীকান্তের তিরোধানের এক বৎসর পূর্তিতে শনিবারের চিঠি তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিতেছে।

ধর্মের আড়ালে

কিছুদিন হইতে দেখিতে পাইতেছি, তথাকথিত ধর্মের উন্মাদনা ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের, মানুষকে অভিভূত ও অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছে। দিকে দিকে নিত্য নব নব গুরুর অভ্যুদয় ঘটিতেছে, সাধারণ মানুষ তাঁহাদের হাতে নিশ্চিন্তভাবে সর্বস্ব সঁপিয়া দিয়া শুধু পাদোদকসেবনেই কৃতার্থ হইতেছে। ঠাকুর বা গুরুর মহিমা সংবাদপত্রসমূহেও এমন ভাষায় কীর্তিত হইতেছে যাহা সর্বৈব ভ্রান্ত অথবা মিথ্যা। অতি মধুর মনোরম ভঙ্গিতে অলীক-কাহিনী-বিশারদেরা অতি সাধারণকে এমন অলৌকিকের মর্যাদা দিতেছেন যে, মহাপুরুষের সত্য মহিমা ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, অন্য এক বা একাধিকের গৌরব খর্ব করিয়া এমন ভাবেই একের ঐশ্বর্য বা বিভূতি কীর্তন করা হইতেছে, যাহা পিনাল কোডের ধারা অনুযায়ী আইনত অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত ছিল। অথচ তাহাই অন্ধভক্তির আতিশয্যে অনেকেই অবাধে সমর্থন করিতেছেন। সারা দেশ এমনই মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় গুরুর স্থান-পরিবর্তনও দৈনিক পত্রের সংবাদ-স্তম্ভে বিজ্ঞাপিত হইতেছে; ধূপধুনাফুলমালা-চন্দনে মায় রাজভবন পর্যন্ত সমগ্র 'সেকুলার' দেশ ঠাকুরবাড়িতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই ভক্তি-ভাবাতিশয্যের প্রতিক্রিয়ার ছিদ্রপথে নিরীশ্বরতন্ত্রীরা ইতিহাস ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া সর্বনাশা জড়বাদকে এই দেশে কায়েম করিয়া তুলিতেছেন। ধর্মসত্তা বাতিকে পরিণত হইয়াছে বলিয়া ধর্মহীন মতলববাজেরা দেশের ঐতিহ্যবিরোধী ভাবধারা প্রচারের সুযোগ পাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ যখন মানবকল্যাণসাধনে বেলুড়মঠের পত্তন করেন, তখন তাঁহার মনেও এই ধর্মোন্মাদনার আতিশয্যের আশঙ্কা জাগিয়াছিল। তাঁহার স্বরচিত বিধিবিধানের মধ্যে "মঠ (১)" অধ্যায়ের ২৩ ও ২৪ সংখ্যক বিধিতে তাই তিনি লিখিয়াছিলেন (ইংরেজী হইতে অনূদিত)—

২৩। সুতরাং এই মঠের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্তৃপক্ষকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে যেন কখনও কোন কারণে এই মঠ বাবাজীদের ঠাকুরবাড়িতে পরিণত না হয়।

২৪। ঠাকুরবাড়ি অল্প কয়েক জনের সামান্য কল্যাণ সাধন করিতে পারে, মুষ্টিমেয় লোকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারে—কিন্তু এই মঠের উদ্দেশ্য সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন।

"ভক্তি" অধ্যায়ের ২ সংখ্যক বিধিতে তিনি বলিতেছেন—

২। সঙ্কীর্তনের উন্মাদনায় নাচিয়া কুঁদিয়া শুধু দেহযন্ত্রকে বিকল করা অথবা মূর্ছা যাওয়া ভক্তি নয়—এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে।

ভারতবর্ষের একান্ত প্রয়োজন কি, তাহা স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন "মঠ (১)" অধ্যায়ের ৯, ১০, ১১ ও ১২ সংখ্যক বিধিতে :

৯। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা বিস্তারই ভারতবর্ষে প্রথম এবং প্রধান কাজ। [অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে] খাইতে না দিলে ক্ষুধার্ত লোকের পক্ষে আধ্যাত্মিক হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ক্ষুধিতকে অন্নসংস্থানের উপায়-নির্দেশই আমাদের প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইতেছে।

১০। সমাজ-সংস্কারে খুব বেশি নজর দেওয়ার আবশ্যক নাই, কারণ সামাজিক বিকৃতিগুলি সমাজ-অঙ্গের ব্যাধির প্রকাশ মাত্র, শিক্ষা ও আহার্য দিয়া সে অঙ্গকে পুষ্ট করিয়া তুলিলে বিকৃতিগুলি আপনা হইতেই দূর হইবে। সুতরাং সামাজিক বিকারের নিন্দাবাদে শক্তিক্ষয় না করিয়া মঠের লক্ষ্য হইবে সমাজ-দেহকে পরিপুষ্ট করা।

১১। চারিত্রিক শক্তি ব্যতিরেকে মানুষ কোন কিছুতেই সাফল্য অর্জন করিতে পারে না। চরিত্রের অভাবই আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধি অপহরণ করিয়াছে।

১২। আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস চরিত্র গঠনের একমাত্র উপায়। সুতরাং এই মঠ যাহাই করুক, আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস জাগাইবার জন্য সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

আশা করি, মঠের বর্তমান কর্তৃপক্ষ ও অধিবাসীরা নিশ্চয়ই এই বিধিগুলি স্মরণ রাখিয়া চলিতেছেন—আমরা দেশের অন্যত্র ধর্মের নামে ভাবাতিশয্য ও চরিত্রহীনতাই লক্ষ্য করিতেছি এবং লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইয়াছি। তাই এই দুর্দিনে স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি স্মরণ করিলাম। তাঁহার আদর্শ ও উপদেশ যে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল, স্বদেশী যুগে আমরা তাহা দেখিয়াছি। বাঙালী যুবকদের চরিত্রে তাঁহার আদর্শ এমনই দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনিয়া দিয়াছিল যে, তদানীন্তন ইংরেজ সরকার সভয়ে তাঁহার বইগুলির প্রচার বন্ধ করিয়াছিলেন।

মঠের বিধিগুলি পড়িতে পড়িতে আর একটি বিধির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, যাহার ব্যতিক্রম আজকাল একটু বেশি পরিমাণেই দেখিতেছি—পরমহংসদেবের কাল্পনিক বাণী প্রচার ও বিবিধ বাণীর "কনটেক্স্ট"-বর্জিত ভাবে অপ-প্রয়োগ। "ক্রীড্" অধ্যায়ের ১০, ১১ ও ১২ সংখ্যক বিধিতে লিখিত হইয়াছে—

১০। এই ভাবে তাঁহার সমগ্র উক্তিগুলি হইতে নিতান্ত ব্যক্তিগত যেগুলি [অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজনে একান্তে তাঁহাকেই যাহা বলা হইয়াছিল] এবং যেগুলি সকল মানুষের কল্যাণার্থ উক্ত হইয়াছিল সেইগুলি তফাত করিয়া লইতে হইবে। সর্ব-মানবীয় কল্যাণ-বাণীগুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবে।

১১। ব্যক্তিগত উক্তিগুলিও সংগৃহীত হইয়া মঠে একান্তে রক্ষিত হইবে, মঠের প্রচারকেরা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার জন্য সেগুলি জানিয়া লইবেন।

১২। ঠাকুরের একটি উক্তিতে আছে—যাহারা বহুরূপীকে [গিরগিটি জাতীয় জীব—chameleon] একবার মাত্র দেখিয়াছে তাহারা তাহার একটি রঙেরই খবর রাখে, কিন্তু যাহারা বহুরূপীর আবাস-বৃক্ষের নীচে বাস করে, তাহারা তাহার সকল রঙের খবরই জানে। এই কারণে তাঁহার কোনও উক্তিই আসল বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না, যাহা তাঁহার নিত্যসান্নিধ্যবাসী এমন কাহারও দ্বারা সমর্থিত নয় যিনি তাঁহার জীবনদর্শনকে সফল করিবার শিক্ষা তাঁহারই হাতে না পাইয়াছেন।

ব্যক্তিগত বা সাধারণ—পরমহংসদেবের বাণীগুলির যথেচ্ছ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা কবি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আজকাল যেভাবে চলিতেছে তাহাতেই বুঝিতে পারিতেছি, স্বামীজী দূরদর্শী ছিলেন বলিয়াই সকলকে এই বিষয়ে সতর্ক হইতে বলিয়াছিলেন। স্বামীজীর এই নির্দেশানুযায়ীই স্বামী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের বাণীগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা সভয়ে লক্ষ্য করিতেছি, কল্পনাবিলাসীরা তাঁহার সেই চটি বইখানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে প্রস্তুত

[শ. চি. চৈত্র ১৩৬০]

সম্মেলন প্রসঙ্গে

ডিসেম্বর হইতে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বরাবরই কলিকাতায় সভাসমিতি-সম্মেলনের বান ডাকিয়া যায়। প্রতিটি হলে, মাঠে-ময়দানে সর্বত্র লাল নীল সালু ঝুলাইয়া সে কী ধুন্ধুমার কাণ্ড! এই সভাসমিতির মরসুমে কিছু কিছু ভাল এবং উঁচুদরের অনুষ্ঠান যে হয় না তাহা নহে, কিন্তু অধিকাংশই কর্তা ও মাতব্বর ব্যক্তিদের ফ্লারিশ করিবার হুড়াহুড়িতে লঘুক্রিয়ায় পরিণত হয় তাহা বলাই বাহুল্য। সাহিত্যসম্মেলন এই সময়ের মধ্যে কয়েকটি অনুষ্ঠিত হয় এবং নূতন নূতন আয়োজনের অঙ্কুর মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে তাহাও দেখা যায়। মার্চ নাগাদ আর একটি সম্মেলন (যাহা বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন নামে ঢোল এবং খোলবাদকদের তামাশায় প্রায় প্রতিবৎসরই পর্যবসিত হয়) অনুষ্ঠিত হইবে। এই মহাসম্মেলনে বাৎসরিক ক্রিয়াকর্মাদির সকল পিণ্ডই একসঙ্গে চটকানো হইয়া থাকে অর্থাৎ সারা বছরের খণ্ড খণ্ড আমোদ-আহ্লাদ নাচ-গান-পীরিত সব একত্রে এক আধারে পাওয়া যায়। ঢাক-ঢোল হইতে আরম্ভ করিয়া শিঙ্গা রামশিঙ্গার আওয়াজ, কবিগান তরজা খেউড় হইতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ক্ল্যাসিকাল, আদিবাসী রায়বেঁশে হইতে গরবা মণিপুরী ভোজপুরী নৃত্য, সাহিত্য ধর্ম সংস্কৃতি আলোচনা হইতে রাজনীতির কচকচি মায় প্রেততত্ত্বের ব্যাখ্যা পর্যন্ত সবকিছুই এখানে দৃশ্য এবং অদৃশ্যভাবে পাওয়া যাইতে পারে। এইখানে ইন্দ্র চন্দ্র দেবতাদির একত্রে মিলন হইয়া থাকে।

সম্মেলনের ভালমন্দ গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক কথাই বলিবার আছে। আজ হইতে প্রায় অর্ধশত বৎসর পূর্বে যে বাঙালী মনীষী এই সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আর দুই বৎসর পরেই যাঁহার জন্মের শতবর্ষপূর্তি হইবে সেই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি। সম্মেলনওয়ালারা একটু স্মরণে রাখিলে নিজেরা উপকৃত হইবেন।—

"সখের ব্যাপার বলিয়াই এ সকল কাণ্ডে যাহারা সৌখিন পাণ্ডা, তাহাদেরই কিছু কালের জন্য নামডাক হয়। যাহারা জোগাড়ে, অথবা একটা কোন বিলাতী গুণবিশিষ্ট, বা ধনশালী, তাহারাই এই সম্মেলনে সখের নেতা বা পরিচালক হইয়া উঠে। সখের কাণ্ড বলিয়াই উহাদের বাহ্য চাকচিক্য খুব, ধুমধাম খুব, বাহার খুব। আর যাহারা সৌখিন, হুজুগ চাহে, বাজে প্রশংসার সোহাগ চাহে, অথবা এই হুজুগে নাড়ু নাড়িলেই গুঁড়া পড়িবে জানিয়া গুঁড়া সঞ্চয় করিতে চাহে, তাহারাই এই ব্যাপারে আসিয়া সম্মিলিত হয়। আর আসে তাহারা, যাহারা মুগ্ধ বা বিমূঢ়, যাহারা সত্যই ভাবে যে, এই সব বারোইয়ারির কাণ্ড হইতেই সমাজের কল্যাণ সম্ভাবনা আছে। যত দিন মোহটা থাকে তত দিন ইহারা দলভুক্ত থাকে; পরে সংসারের কটাহে পড়িয়া পেটের এবং বিলাসের দায়ে ইহারা যখন দশ দিক্ অন্ধকারময় দেখিতে থাকে, তখন হা টাকা হা টাকা করিতে করিতে ইহারা দল ছাড়িয়া স্বতন্ত্র হয়। কেবল আটার মতন তাঁহারাই স্থাপ্‌টাইয়া থাকেন, যাঁহারা ইহা হইতে লাভবান হন,—ইহাই যাঁহাদের ব্যবসায়—উপজীবিকা।

কিন্তু সাহিত্য সখের সামগ্রী; কাব্যামোদ সাধের বিষয়। প্রাণে সখ না থাকিলে, হৃদয়ে আবেগ না থাকিলে, প্রতিভার উন্মেষ না হইলে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। কাজেই খাঁটি সাহিত্যের উন্নতি ঘটাইতে হইলে সখের সম্মেলন করিলে অনেকটা উপকার হইতে পারে। পরন্তু এ সখ ধাতুগত হওয়া প্রয়োজন; এ সখের জন্য একটু প্রমত্ত—একটু পাগল হইতে হইবে, তবে সাহিত্যের পাগলের মেলা হইতে সুফল লাভ হইতে পারে। আর একটা কথা, যে সাহিত্য রচিবে, সে সাহিত্য দেশের রুচি, প্রকৃতি এবং ধাতুর অনুকূল হওয়া প্রয়োজন, তবে সে সাহিত্যের আলোচনায় দেশের লোকে মাতিয়া উঠিতে পারে। আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য সখের সামগ্রী হইলেও, অনেকটা ইংরেজী সখ হইতেই উহা উৎপন্ন। অনুচিকীর্ষার বশে আমরা যেমন বাহ্যিক আকার-প্রকারে ইংরেজ সাজিয়াছি, তেমনই কাব্যগাথা রচনাতেও আমরা ইংরেজী অনুকরণ করিয়াছি। আমাদের মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালার মিল্টন, আমাদের হেমচন্দ্র বাঙ্গালার পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র বাঙ্গালার বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ শেলী, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার স্তর ওয়াল্টার স্কট। আমরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি

করিয়াছি, তাহার সম্যক্ রসাস্বাদন একটু ইংরেজীনবীস না হইলে সম্ভবপর নহে। ইংরেজী শিক্ষার অতি-প্রচারের প্রভাবে, ইংরেজী ভাব সমাজে অনেকটা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাই এখন কিছু অধিক-সংখ্যক বাঙ্গালী বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যের কতকটা রসাস্বাদন করিতে পারিতেছেন। কিন্তু সে রসাস্বাদন উচ্চাঙ্গের নহে; ডিটেকটিভ গল্প, আদিরসপ্রধান উপন্যাস এবং চুটকি গল্পের উপভোগেই সে আস্বাদনের পর্য্যবসান হয়। ফলে, আমাদের প্রত্নতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতন অনেকের রুচিকর হয় না; আমাদের কাব্যগুচ্ছ দুর্বোধ্য-হেতু অনেকের পাঠ্য নহে; আমাদের সন্দর্ভ-নিবন্ধসকলও তদ্বৎ পরিহার্য্য। খবরের কাগজে চটকদার লেখা না হইলে তাহা বিকায় না, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; মাসিক পত্রে চুটকি গল্পের এবং বিচিত্র চিত্রাঙ্কনে আদিরস গড়াইয়া না পড়িলে তাহা তেমন রোচক হয় না। সুতরাং বলিতে হয় যে, আমাদের এ সখের সাহিত্য আপাততঃ দেশের হীন সখের পুষ্টি করিতেছে। তবুও বলিব যে, এ হেন বারমুখী সাহিত্যের মঙ্গল কামনা করিয়া সখের সম্মেলনেও কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে। কারণ, সাহিত্য-সম্মেলনে দেশের গোটাকয়েক খাঁটি লোককে পাওয়া যায়; তাহারা মনের কথা ব্যক্ত করিতে দেশের খাঁটি ভাষার ব্যবহার করে; তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলে আমাদের ইংরেজী গিল্টি করা প্রাণেও দেশীও ভাব জাগিয়া উঠে।...

কাজেই সখের হিসাবে বল, খোশখেয়ালের হিসাবেই বল, বারোইয়ারির ভঙ্গী অনুকরণের হিসাবেই বল,—যে হিসাবে সাহিত্য-সম্মেলন হউক না কেন, উহার দ্বারা একটু না একটু উপকার সাধিত হইবেই। রাজনীতির দৃষ্টিতে সংহতি-সাধনের উদ্দেশ্যে আমরা ত এ সম্মেলন ঘটাই না, একটা কোন গৌণ উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমরা এ সম্মেলনে যাই না। আমরা যাই কেবল আমাদের জন্য, দশ জনে দশ রকম মালা গাঁথিয়া দশ জনকে দেখাইবার জন্য। ইহাতে সুখ আছে, তৃপ্তি আছে, তুষ্টি আছে; ইহাতে উৎসব আছে, উল্লাস আছে, রঙ্গ আছে, ইহাতে মেলামেশা আছে, হাসিতামাশা আছে, আমোদ-প্রমোদ আছে।"

স্বর্ণঘটিত

"মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'তুমি সন্ন্যাসী, তোমার তো ধনের কোনো প্রয়োজন নাই—আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও। আমাকে বঞ্চিত করিয়ো না।'...সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, 'এসো।'...

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল।...চারি দিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল, 'এ সোনা আমার—এ আমি কোনোমতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।'...

মৃত্যুঞ্জয় বারবার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর-একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারি দিকে সোনা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর-কিছুই নাই।...

মৃত্যুঞ্জয় পাৎলা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোমড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলাকে লইয়া ঘরের চারি দিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারবার পদাঘাত করিতে লাগিল।...

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারি দিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল।...

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মতো ঐ সোনার স্তূপ চারি দিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে—তাহার

মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্তন নাই—মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনায় কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিণ্ডগুলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জল হইয়া, কঠিন হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে।...

সে বলিয়া উঠিল, 'আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই সুরঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?'

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'না, যাইব না।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, 'একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?'

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, 'না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মুহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।'"

উদ্ধৃত রচনাংশটুকু পড়িয়া অনেকেরই ধাঁধা লাগিবার কথা। কেহ সহসা ভাবিয়া না বসেন আমাদের অর্থ-মন্ত্রী শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামের মধ্যে অলঙ্কারের গন্ধ পাইয়া বাংলা ভাষার জনক নিরেট গদ্যলেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকেই বুঝি বা কায়দা করার চেষ্টা করিতেছেন। এই স্বর্ণাগার বড়বাজারে কোথাও নাই, ধারাগোল নামে একটি ছোট্ট গ্রামে এটি পাওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বা শঙ্কর, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও নহেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি ছোট গল্প "গুপ্তধনে" এই চরিত্র দুটির সাক্ষাৎ মিলিবে। স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধি ভারত সরকার কর্তৃক বাহির হওয়ায় যাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদেরই শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া নির্ভয় করিবার জন্য অকিঞ্চিৎকর স্বর্ণভাণ্ডারের এই বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ চিত্রটি আমরা তুলিয়া ধরিলাম। গুপ্তধন-সন্ধানী ভারত সরকার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথের "গুপ্তধন" প্রচার করিলে পায়ে ধরিয়া সাধিবার পূর্বেই রাখার বা শোনাও যাইতে পারে।

নর ও বানর

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি বানর অথবা অনুরূপ কোনও ইতর প্রাণী বাস করে। যাঁহারা মহৎ এবং অসাধারণ, তাঁহারা সেটাকে সর্বদা শাসনে রাখেন—সাধারণ মানুষেও রাখেন, কিন্তু স্নানাগারে বা শৌচাগারে অথবা আয়নার সম্মুখে একক দাঁড়াইয়া নানা বিকৃত আওয়াজ ও বিচিত্র মুখভঙ্গির সাহায্যে বানরটাকে একটু প্রশ্রয় দিয়া শান্ত করেন। যে বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে, অথবা একটা দামাল শিশু আছে, সে বাড়ির মানুষেরা সহজেই চেঁচাইয়া হল্লা করিয়া শিশুকে বিবিধ অঙ্গভঙ্গি সহ খেলা দিয়া মর্কটবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পান, পারিবারিক ও পাড়াপ্রতিবেশীর সহিত কলহ-বিবাদেও অনেকে অল্প আয়াসে এই আদিম রোগমুক্তির ব্যবস্থা করেন। যেমন ব্যক্তির মধ্যে তেমনই সমবেতভাবে সমাজের মধ্যেও বানর বাস করে। সমাজ-গত ভাবে যথেচ্ছ আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়া মাঝে মাঝে ইহাদিগকে ঠাণ্ডা রাখিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন। পূর্বে পল্লীতে পল্লীতে বারোয়ারী আসরে, বাজারে, চৌরাস্তার মোড়ে বা গ্রামসীমান্তে সঙ পাঁচালী ঢপ বাই খেমটা প্রভৃতির প্রচলন ছিল, সামাজিক বানরেরা সেখান হইতেই মানুষ হইয়া ঘরে ফিরিবার অবকাশ পাইত। কলিকাতার মত শহরেও যতদিন সমাজপতিদের শাসন ছিল, তাঁহারা বেশ্যাপল্লীতে সরস্বতী ও কার্তিক পূজার ব্যবস্থা দিয়া সমাজের বানর-অংশের যত্র-তত্র ও যখন-তখন আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতেন। "বাবু" সম্প্রদায় নিতান্ত অপ্রয়োজনে এই সকল পূজার নামে মাতামাতি করিয়া শুদ্ধ শান্ত হইয়া আসিতেন, প্রয়োজনেও অবশ্য নিঃসন্তান ধনীরা ভদ্রপল্লীর মধ্যে ঘটা করিয়া কার্তিক পূজা করিতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বেশ্যাপল্লী যখন আর নির্দিষ্ট রহিল না, তখন যেখানে-সেখানে অলিতে গলিতে সরস্বতী সাজাইয়া পূজার নামে নাচ-গান-হল্লার মধ্য দিয়া বানর-শান্তির ব্যবস্থা

স্বতই হইল, তরুণ সমাজ কর্তৃক ব্যাপক সরস্বতী পূজার ইহাই ইতিহাস। সেকালের বিদ্যাধরীরা জনসাধারণকে গ্রাম্য ছড়ায় নিম্নলিখিত মর্মে নিমন্ত্রণ করিতেন, "পিতাকে যিনি পতি করিয়াছিলেন আমি তাঁহার পূজা করিব, আপনার নিমন্ত্রণ রহিল।" বাবুরা দলে দলে যাইতেন, সারারাত ভাল ভাল গান-বাজনার সঙ্গে বাঁদরামি বেলেল্লাগিরি যাহা খুশি করিয়া গঙ্গাস্নানান্তে ঘরে ফিরিতেন। সাপও মরিত, লাঠিও ভাঙিত না। তাহা ছাড়া দোললীলা একটা বড় সামাজিক সেফ্‌টি ভাল্‌ব ছিল, জামাইষষ্ঠীতে জামাই-ঠকানো রসিকতা এবং বিবাহ-বাসরে কিঞ্চিৎ আদিরসাশ্রিত ইয়ার্কিও ছিল। ইদানীং কার্তিক পূজা উঠিয়া যাওয়াতে দোলে ও সরস্বতী পূজায় কাজ হইতেছিল। হঠাৎ কিছুকাল হইতে দেখিতেছি সামাজিক মর্কট বাংলার জাতীয় পরম উৎসব দুর্গাপূজাকেও আক্রমণ করিয়াছে এবং এই বৎসর দেখিলাম মহাকালী পূজাও আক্রান্ত হইয়াছে। ইহাতে সামাজিক ও নৈতিক শাসনের অভাব সূচিত করে। সরস্বতীর হাতে নিরীহ বীণা ও হালকা পুস্তক। ভাসানের সময় তাঁহার মুখের উপর বিকৃত অঙ্গভঙ্গি সহ নাচিলে কুঁদিলে কুৎসিত গান গাহিলে তাঁহার দিক হইতে অন্ততঃ কোনও ভয় নাই; তা ছাড়া তিনি জন্মকাল হইতেই বহুর মনোরঞ্জন-প্রয়াসী, রুচি একটু আধটু নামিলে দোষ হয় না। কিন্তু মা দুর্গা ও মা কালী? তাঁহাদের হাতে প্রাণঘাতী অস্ত্র, ছেলেরা তাঁহাদিগকেও সম্ভ্রম করিতেছে না, সামাজিক বানরকে বড্ড বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। মা-কালীর সামনে চলমান লরিতে সেদিন শিক্ষিত ছেলেরা যে কদর্য কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি ও মুখখিস্তি করিল তাঁহার খড়্গের এতটুকু মাহাত্ম্য থাকিলে তাহা হইতে পারিত না। ময়লা-নিকাশের পয়ঃপ্রণালী পল্লীতে নির্দিষ্ট থাকিলেও রাস্তা ঘাট সব জায়গা দিয়াই যদি আবর্জনা গড়াইয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে ভদ্র ব্যক্তির যে মুশকিল হয় কলিকাতাবাসীর তাহা হইয়াছে। বানরটাকে কোন্ পথে সামলাইবেন, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এখন তাহাই চিন্তার বিষয়। আর এক কথা, আগে বাজীকরণে যে সামাজিক দুষ্প্রবৃত্তি প্রশমিত হইত, আজকাল বাজি পোড়াইয়া যুবকেরা তাহা করিতে চাহিলে চলিবে কেন? ফলে দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মন্দির-প্রাঙ্গণে ছুঁচোবাজির ঠেলায় মেয়েদের প্রাণান্ত হইতেছে, বাঁদরামি থাকিয়াই যাইতেছে। পুলিস সাময়িক ও স্থানীয় ভাবে ইহা দমন করিতে পারে, কিন্তু ইহা পুরাপুরি দমন করিতে হইলে জাতীয় নেতাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন—কলিকাতায় সমাজ যখন নাই! [শ. চি. কার্তিক ১৩৫০]

কুমুদ ভট্টাচার্য

'শনিবারের চিঠি'র পাঠকদের নিকট সুপরিচিত প্রবীণ কবি কুমুদ ভট্টাচার্য গত ২২শে জানুয়ারি অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি'তে দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়া কাব্যরসিকদের তৃপ্তিসাধন করিয়াছে। এই নিরহঙ্কার স্বল্পভাষী কবি তাঁহার কবিতার ফসল লইয়া পত্রিকান্তরে বড় একটা যান নাই। কুমুদ ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে আমরা একজন অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক কবিকে হারাইয়া যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। কুমুদবাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

*
* *

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৬-২৮৩৮

শনিবারের চিঠি

৩৫শ বর্ষ

৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬৯

সম্পাদক :

শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

গুরুনিন্দা

আট

সজনীকান্তের গুরুনিন্দা তুঙ্গশিখরে আরোহণ করল রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে [১৯৩১ ডিসেম্বর] কবিগুরুর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর জয়ন্তী-উদ্‌যাপনের আয়োজন হয়েছিল। স্বভাবতঃই এই জয়ন্তীকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রচিত্ত বিশেষ ভাবে আত্মসন্ধানী ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিল। ২৩ বৈশাখ ১৩৩৮-এ লেখা 'জন্মদিন' কবিতায় কবি বলছেন :

রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
হয়ে আসে সমাপন।
আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।

এই কবিতারই উপসংহারে কবি বলছেন :

এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ ;
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা।'

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, দেশময় কবির সত্তর-বৎসরের জন্মোৎসব পালনের বিরাট আয়োজন চলছে, সেকথা মনে করেই কবি আত্ম-বিশ্লেষণমূলক কবিতা 'জন্মদিনে' লিখলেন 'প্রবাসী' ১৩৩৮ পৌষ সংখ্যায়। কবিতাটি "অপূর্ণ" নামে 'পরিশেষ' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। কবি বলছেন :

কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত অভিলাষ,
কত-না সংশয় তর্ক, কত-না বিশ্বাস,
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত-না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা,—
মনগড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিন ভেঙে করে ঢেলা,
অতীতের বোঝা হতে আবর্জনা কত
জটিল অভ্যাসে পরিণত,
বাতাসে বাতাসে ভাসা বাক্যহীন কত-না আদেশ
দেহহীন তর্জনী-নির্দেশ,
হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি
কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে দেয় পুনঃ মুছি,
কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব তরে
কত-না আকাশযাত্রা কল্পপক্ষভরে,
কত মহিমার পূজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা,

কত জয় কত পরাভব—
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই সব
ভালো মন্দ সাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।
[অপূর্ণ, পরিশেষ।

এই নিঃশেষ আত্মবিশ্লেষণ, এই বিচিত্র আত্মজিজ্ঞাসা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, কবি অহংকারে স্ফীত হয়ে জয়ন্তী-উৎসবে যোগদানের জন্যে মোটেই উন্মুখ হয়ে ছিলেন না। 'সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা' সম্পর্কে যিনি পূর্ণসচেতন তাঁর কবিমানসের অনাসক্তি সম্পর্কে ভুল হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু সজনীকান্ত ভুল করলেন। ভুল করার কিছু কারণও ছিল। এই সময়ে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় অভিজাত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পরিচয়' প্রকাশিত হয়েছে [শ্রাবণ ১৩৩৮]। পরিচয়ের দ্বিতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক পত্রিকার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে এক পত্র-প্রবন্ধ লিখলেন। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় লিখলেন কবি বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা-মূলক "নবীন কবি" প্রবন্ধ। [বিচিত্রা ১৩৩৮ কার্তিক] কিছুদিন পূর্বেই য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করে কবি দেশে ফিরেছেন। বিদেশে তাঁর আঁকা ছবিগুলি প্রশংসা পেয়েছে। শান্তিনিকেতনে ১৩৩৮ সালের রাসপূর্ণিমার দিন [৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮] শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে।" বললেন, "ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।"

রবীন্দ্রজয়ন্তী হল ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। ২৫শে ডিসেম্বর খ্রীস্ট-জন্মদিনে তার সূত্রপাত। রবীন্দ্রজয়ন্তীর স্বরূপ এবং একে অবলম্বন করে 'শনিবারের চিঠি'র উষ্মার কারণ কী ও কোথায় তা ভাল করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রজয়ন্তী সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখছেন :

"বাংলাদেশে কবিমনীষীকে সংবর্ধনা জানাইবার এই প্রথম আয়োজন—ইহার অনুকূলে কোনো রাষ্ট্রশক্তি নাই, সাধারণ শিক্ষিত লোকের এই সমারোহ। কলিকাতা টাউন হলে উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার কর্ণধার অমল হোম—ক্যালকাটা ম্যুনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক। প্রদর্শনী ও মেলার ভার ছিল জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর উপর। রবীন্দ্রজয়ন্তী সাফল্যমণ্ডিত করিবার দায়িত্ব বহুল পরিমাণে ছিল অমল হোমের। * * * অমল সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলিতে শুরু করে; শরৎচন্দ্র তাঁহাকে এক পত্রে লেখেন, 'জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন, তাঁর শিখণ্ডী মাত্র তুমি, পেছনে থেকে তিনিই তোমাকে দিয়ে সব করাচ্ছেন! এ যে বাংলা দেশ, অমল। মনে ক্ষোভ রেখো না—যে যা বলে বলুক। দেশের মুখ রেখেছ তুমি।'

"২৫ ডিসেম্বর [৯ পৌষ ১৩৩৮] টাউন হলে কবির চিত্রপ্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন দিয়া জয়ন্তী-উৎসব আরম্ভ হইল। এ ছাড়া কবির নানা বয়সের প্রতিকৃতি, তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীও প্রদর্শিত হয়। ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সভায় ত্রিপুরা-রাজপরিবারের সহিত তাঁহার দীর্ঘকালের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার কথা বিবৃত করেন।

"সেই দিন অপরাহ্ণে টাউন হলে সাহিত্যসম্মেলন আহূত হয়, এই সভায় শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। সেইদিন সন্ধ্যায় ও পরদিন সন্ধ্যায় [২৬ ডিসেম্বর] কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে 'গীত-উৎসব' অনুষ্ঠিত হইল।

"২৭ ডিসেম্বর টাউন হলে কবিসংবর্ধনা। কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মেয়র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের তরফ হইতে অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধিরূপে প্রতিভা দেবী, রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের পক্ষ হইতে জগদীশচন্দ্র বসু [তিনি অসুস্থ হওয়ায় কবি কামিনী রায়] অভিনন্দন পাঠ করিলেন। অতঃপর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় The Golden Book of Tagore নামে প্রশস্তিগ্রন্থ, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-পরিচয় সভার প্রতিনিধিরূপে ক্ষিতিমোহন সেন 'জয়ন্তী উৎসর্গ' নামে গ্রন্থ কবিকে উপহার দিলেন। কবি প্রত্যেকটি অভিনন্দনের যথাযোগ্য প্রতিভাষণ দান করিলেন।

"ইহার পর একদিন [৩১ ডিসেম্বর] বিশ্ববিদ্যালয়ের

সিনেট হলে কলিকাতার ছাত্রসমাজ কর্তৃক কবিসংবর্ধনা হইল।

"এই ছাত্র-ছাত্রী-উৎসবের অঙ্গরূপে জোড়াসাঁকোর বাটিতে 'শাপমোচন' নাটিকার মূক অভিনয় ও নৃত্যগীত হয়।

"জয়ন্তী উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান ইন্‌ডিয়া সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস-এর সদস্যদের কবিপ্রণাম। এইটি উৎসবক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় নাই—কারণ, ৪ জানুয়ারি সংবাদ আসিল গান্ধীজি গ্রেপ্তার হইয়াছেন—উৎসব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ৫ জানুয়ারি শিল্পীদের অনুষ্ঠান হইল জোড়াসাঁকোর বাটীতে। * * *

"এইবারের জয়ন্তী-উৎসবে রবীন্দ্রনাথের দুইটি নব সৃষ্টি লোকে দেখিল; একটি তাঁহার অঙ্কিত ছবির প্রদর্শনী, অপরটি হইল 'শাপমোচনে'র অভিনয়।"

[রবীন্দ্রজীবনী-৩, সং অগ্রহায়ণ ১৩৬৮, পৃ° ৪১৮-১৯।

নয়

শনিবারের চিঠি ১৩৩৬ কার্তিক সংখ্যার পরই সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় প্রকাশিত হল ১৩৩৮-এর ভাদ্র মাসে। নবপর্যায় শনিবারের চিঠি প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ শনি-গোষ্ঠীর প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। সজনীকান্ত লিখছেন, প্রবাসী প্রেস থেকে চিঠির মুদ্রণ রহিত হওয়াতেও রবীন্দ্রনাথের যে ক্রোধ শান্তি হয় নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৩৩৮ আশ্বিনের 'স্বদেশে'। দার্জিলিঙে কবিগুরুর সঙ্গে নজরুল ইসলামের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ নজরুল 'স্বদেশে' প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। তাতে নজরুল লিখলেন:

> "কবি হেসে বললেন, সজনে গাছকে কোন রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেমন চমৎকার ফুলঝুরির মত ফুল সেজে থাকে!...কবি হাসতে হাসতে বললেন, এই রকম আর একটি জীবের নাম করা চলে—দেখতে সে বেশ সুশ্রী; কিন্তু সেও ঠিক ওই কারণে সাহিত্যের আসরে একেবারে একঘরে হয়ে আছে।
>
> "আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী।"

এই সজনে গাছ এবং মুরগী-প্রসঙ্গ সজনীকান্তকে যে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করবে তা বলাই বাহুল্য। 'পরিচয়' প্রকাশের পর আশ্বিনের [১৩৩৮] শনিবারের চিঠিতে 'পরিচয়'-মারী "পরিচিতি" লিখলেন চিঠির পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্যতম ডক্টর সুশীলকুমার দে। রবীন্দ্রনাথ তাতেও শনিবারের চিঠির উপর চটলেন। কার্তিকের বিচিত্রায় "নবীন কবি" প্রবন্ধে তিনি শনিবারের চিঠির প্রতি ইঙ্গিত করে "সাহিত্যিক মোরগের লড়াই" কথাটা ব্যবহার করলেন, এবং এই সঙ্গে লিখলেন, "এই লড়াইয়ে কোনোদিন আমি যোগ দিইনি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েছি।"

কবিগুরুর এ আঘাত মর্মবিদারী। সজনীকান্ত লিখছেন, "আমাদেরও বয়স ছিল কম, রক্ত ছিল গরম। পূর্বের "সজনে ফুল" ও "মুরগী"র ঘা মনে ছিল, নূতন করিয়া "সাহিত্যিক মোরগে"র উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল... "রবীন্দ্র-জয়ন্তী"কে কেন্দ্র করিয়া। * * * তখনই আমরা "জয়ন্তী-সংখ্যা" [মাঘ ১৩৩৮] প্রকাশ করিয়া ব্যাজস্তুতিচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র-বিদূষণ করিয়া বসিলাম। * * * সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না; বিশেষ করিয়া তাঁহার ছবিকে [রবীন্দ্রনাথের চিত্র-সংবেদনা বা] "ছবিতা" আখ্যা দিয়া যে সচিত্র ব্যঙ্গ-রচনাটি [আমার রচিত, হেমন্ত-চিত্রিত] আমাদের জয়ন্তী-সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, রবীন্দ্রনাথকে উত্যক্ত ও মর্মাহত করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। তদ্ব্যতীত কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্রেও কম লঘুতা প্রকাশ পাইল না। মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসাপরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল।"

[আত্মস্মৃতি-২, পৃ° ১৬৩-৬৪।

দশ

জয়ন্তী-সংখ্যা শনিবারের চিঠির [মাঘ ১৩৩৮] সূচীপত্র নিম্নে সংকলিত হল:

১ 'কবি-বরণ' (কবিতা)—মোহিতলাল মজুমদার; ২ 'জয়ন্তী' প্রবন্ধ; ৩ প্রসঙ্গ-কথা; ৪ নৃত্যময়ী (কবিতা); ৫ জয়জয়ন্তী (জনগণমন অধিনায়কের প্যারডি); ৬ চলচ্চিত্র (ব্যঙ্গচিত্র); ৭ রবীন্দ্রনাথের

চিত্রসংবেদনা বা ছবিতা (প্রবন্ধ) ; ৮ বড়ো বুধুয় বন্দনা (কবিতা) ; ৯ দি গোল্ডেন বুক অব ট্যাগোর ও জয়ন্তী-উৎসর্গ (প্রবন্ধ) ; ১০ নটির পূজা (ব্যঙ্গ নাটিকা) ; ১১ সংবাদ-সাহিত্য ; ১২ রবীন্দ্রনাথ (প্রশস্তি কবিতা)—সজনীকান্ত দাস।

প্রথম ও শেষ দুটি কবিতা ছাড়া প্রতিটি লেখাই তীব্র তীক্ষ্ণ ও উগ্র ব্যঙ্গ-বিদূষণে পূর্ণ। কিন্তু জয়ন্তী উপলক্ষে শনিবারের চিঠির শ্রাদ্ধ-তর্পণ এইখানেই শুরু নয়, শুরু হয়েছে দু মাস আগে অগ্রহায়ণ-সংখ্যা থেকে। অগ্রহায়ণে সজনীকান্ত লিখলেন "জয়ন্তী" কবিতা :

মোরগ-লড়াই ভালই তো নয় বলছে যত বোষ্টমে,
বুনিয়াদের জমিদারি ঘুচবে এবার অষ্টমে ;
প্রভু এবার প্রবুদ্ধ,
গণ্ডুষে খাও সমুদ্র—
সুখ করেছ অষ্টপোয়া পড়বে এবার কষ্টমে।

* * *

মৃত্যু তোমায় জয় করিছে তাই হতেছে জয়ন্তী,
শকুনি চিল হুকাহুয়া জুটল এসে অগণ্‌তি !
হট্টগোলের মাঝখানে,
মন যে তোমার লাজ মানে,
এতই জানো, জানো না! 'ঘর পায় না অতি-ঘরন্তী।'

বলাই বাহুল্য এই কবিতাটি এবং জয়ন্তী সংখ্যার 'বড়ো বুধুয় বন্দনা'য় সাহিত্যিক মোরগের লড়াই এবং বুদ্ধ-বন্দনাকে সজনীকান্ত একসঙ্গে পাঞ্চ্ করেছেন।

প্রভাতকুমার বলেছেন, রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের দুটি নব সৃষ্টি লোকলোচনের গোচরীভূত হল ; এক—কবির আঁকা ছবি, দুই—'শাপমোচনে'র নৃত্যাভিনয়। এই দুটি বিষয়েই রবীন্দ্র-বিরোধী সমাজের বিরূপতা ছিল প্রচণ্ড। সজনীকান্তের লেখা "রবীন্দ্রনাথের চিত্রসংবেদনা বা ছবিতা"য় এই বিরূপতাই ভাষা পেয়েছে। বাংলার ভদ্রঘরের মেয়েদের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্যাভিনয় রক্ষণশীল সমাজমানসে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তারই কাব্যরূপ ফুটে উঠেছে সজনীকান্তের "নৃত্যময়ী" কবিতায়। "নৃত্যময়ী" সাতটি স্তবকবন্ধে রচিত একটি প্যারডি। প্রথম তিন স্তবক নিয়ে উদ্ধৃত হল :

ছিনু এতদিন কোন্ মহাঘুমে মজ্জিত—
নয়ন মেলিয়া দেখি একি আঁখি-ভ্রান্তি রে।
চৌদিকে মোর, করি বেশবাস বর্জিত
সুরসুন্দরী নাচে অপরূপকান্তি রে।
নাচে উল্লাসে মেনকা-রম্ভা-উর্বশী,
নৃত্যের তালে পড়ে কুন্তল-চুর খসি'
—দেহ হতে মোর নিতে চায় বুঝি প্রাণ ছিঁড়ে!

টানি নাই মাল মাধ্বী পৈষ্টী গৌড়ীয়া
সেবন করিনি চণ্ডু চরস গঞ্জিকা ;—
নহি উন্মাদ—উদোম ফিরি না দৌড়িয়া,
পথ চলি দেখে গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকা।
তবে একি হল ? মরিয়া ঢুকিনু স্বর্গে কি ?
স্বপ্নের ঘোরে লভিনু চতুর্বর্গে কি ?
কিম্বা এ মায়া কল্পনা-অনুরঞ্জিকা !

—স্বর্গ এ নয়, ওরে মন, নয় কল্পনা
আহা মরি মরি ! এ যে নিতান্ত সত্য রে !
নহে এ লাস্য হেমা-রম্ভার ছলনা ;
—বঙ্গমহিলা নাচিছে রঙ্গ-চত্বরে !
চরণে চরণে মঞ্জীর মৃদু গুঞ্জিয়া
তনুতরঙ্গে কলাকৌশল পুঞ্জিয়া
আপন নৃত্যে আপনি মগন মত্ত রে !

এসব রচনার সবটাই যে রবীন্দ্র-বিদূষণ-স্পৃহা-প্রণোদিত তা নয়। এর মধ্যে অনেকখানি ছিল রঙ্গ-ইয়ারকি-ঠাট্টা-মশকরা। "জয়জয়ন্তী" 'ঘন ঘন ধনমপি নায়ক জয় হে জয়ন্তীভাগ্যবিধাতা' প্রভৃতি লেখাই তার প্রমাণ। এসব রচনার মধ্যে সজনীকান্তের লেখনীস্পর্শ লেগেছে সন্দেহ নেই—কিন্তু এগুলিতে জয়ন্তী সম্পর্কে শনি-মণ্ডলীর সমবেত দৃষ্টিভঙ্গিই ভাষা পেয়েছে। সজনীকান্তের নিজস্ব জয়ন্তী-অভিবাদন প্রকাশিত হয়েছে পৌষ-সংখ্যা শনিবারের চিঠির সংবাদ-সাহিত্যে। সংবাদ-সাহিত্যের সেই প্রসঙ্গটি এখানে সবটাই উদ্ধারযোগ্য। সজনীকান্ত বলছেন :

"জয়ন্তী উপলক্ষে সকলেই কবিকে অভিবাদন জানাইয়াছেন, আমরাও জানাইতেছি।

"হে রবীন্দ্র, যৌবনে তুমি শুধু কবিই ছিলে। সুরে, ছন্দে, সংগীতে বাণীকুঞ্জকে এমন করিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছ যে, তাহার ঝঙ্কার দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যুগে যুগে প্রতিধ্বনিত হইবে।

"তারপর তোমার 'বাণী'মুখর মূর্তি দেখিলাম। সেই

'বাণী' বহন করিয়া তুমি বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ। তোমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ বিস্তার করিয়া বিশ্বাকাশে উড্ডীন হইয়াছ, কোথাও বা শ্যামল প্রান্তরের পুষ্পপল্লবিত বৃক্ষের শাখাসন তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, কোথাও বা সযত্নরচিত রাজোদ্যানের সুরম্য কুঞ্জে বসিয়া আপনার কলসংগীত ধ্বনিত করিয়াছ।

"আজ এই বৃদ্ধ বয়সে দেশে ফিরিয়া আসিলে। তোমার আজীবন সাধনায় গঠিত সহস্রদীপোজ্জ্বল, বংশী-বীণামুখরিত, মণিরত্নখচিত যে লক্ষমহল মর্মরহর্ম্য নির্মিত হইল তাহার দ্বারে আসিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ আমরা তোমার জয় উচ্চারণ করিলাম।

"তাহার কক্ষে কক্ষে যে হীরক প্রবাল, যে মণিমাণিক্য থরে বিথরে সজ্জিত হইয়াছে, কুঞ্জে কুঞ্জে যে মালতী বেলা, টগর গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা অপূর্ব। কিন্তু হায় কবি, সকল কক্ষ, সকল কুঞ্জ, সকল বাতায়ন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, মানুষ কৈ? শুভ্র শয্যা সজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু সে-শয্যায় আলুণ্ঠিত হৃদয়ের মর্মভেদী ক্রন্দন কোথায়? বৈঠকে বিশাল ফরাস আস্তীর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে প্রাণখোলা অট্টহাস্য কোথায়?

"আজ তোমার জন্মোৎসবে তোমারই একটি সংগীত বার বার মনে পড়িতেছে।

শুধু তোমার বাণী নয়গো হে বন্ধু হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।

"হে কবি, তুমি যদি শুধু কবিই না হও, যদি বন্ধু হইয়া, প্রিয় হইয়া আজ আমাদের হৃদয়ে আপনার আসন প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, তবে শুধু তোমার বাণীর দ্বারা নহে, তোমার স্পর্শের দ্বারা প্রাণের বীণা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠুক।

"তোমার সুদূর দৃষ্টি আরও নিকটে সংহত করিয়া দেখ, আজ তোমারই মর্মর প্রাসাদের নিম্নতলে, তোমারই উৎসব-নৃত্যের কল-ঝঙ্কারকে ছাপাইয়া উঠিয়া কাহাদের আর্তধ্বনি গগনভেদী হইয়াছে। এই ধরার ধূলায় যাহাদের যাত্রা; এই ধরণীর মাটীর ঘরে যাহাদের জন্ম মৃত্যু, বিবাহ; ইহারই রৌদ্রে যাহাদের হাসি, বন্যায় যাহাদের কান্না; তাহারা আজ তোমার দ্বারে আসিয়া সমবেত হইল, কিন্তু প্রবেশের অধিকার পাইতেছে না।

"আজ তোমার নিষ্কণ্টক ফুলময় রত্নসিংহাসন হইতে ক্ষণেকের জন্যও তাহাদের মাঝখানে নামিয়া আসিয়া কি বলিতে পারিবে, 'হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো দাও গো আমার হাতে?' আজ কি সত্যই বলিতে পারিবে

হৃদয় আমার চায় গো দিতে
কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় যে তার
যা-কিছু সঞ্চয়?

"এই জন্মোৎসবে আমাদের প্রার্থনা এই যে, তোমার দৃষ্টি আজ ঊর্ধ্বলোকের আকাশ-স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া নিম্নলোকের এই মাটীর স্বর্গে নিবদ্ধ হোক, ক্রোধের আলোকে অসূয়ার ভঙ্গীতে নয়, প্রীতির সুষমায়, অনুভূতির গভীর বিস্ময়ে।

"এ বিশ্ব শুধুই নীলাকাশের চন্দ্রাতপ, তারার দীপালি, ফুলের গন্ধধূপ, বীণার সংগীতবন্দনা নহে। নটরাজের নূপুরনিক্কিত নৃত্যের নৈপুণ্য ছাড়াও প্রমথের বীভৎস অট্টহাস্য, মহাকালের শবসাধনা রহিয়াছে। শুধু কুসুমকুঞ্জ নহে, কণ্টকগুল্মও আছে, সে কণ্টক যেন তোমাকে ভীত না করে, তাহার রক্তাক্ত তীক্ষ্ণাগ্র দেখিয়া যেন তোমার দক্ষিণ মুখ গুণ্ঠিত না হয়। বিশ্বের অন্তর্বর্তী এই স্বদেশ, স্বর্গের অপেক্ষা গরীয়সী এই জন্মভূমি দেবতার অপেক্ষা প্রত্যক্ষতর এই মানুষ, তোমার বাণী নয়—তোমার স্পর্শ লাভ করুক, এবং তাহাদের পুণ্য স্পর্শ লাভ করিয়া তুমিও ধন্য হও ইহাই প্রার্থনা করি, হে কবি, হে রবীন্দ্রনাথ, তোমাকে আমরা নমস্কার করি।"

এই গদ্যরচনাটির সঙ্গে জয়ন্তী সংখ্যার 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি মিলিয়ে পড়লেই গুরুর প্রতি শিষ্যের মনোভাবটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 'সংবাদ-সাহিত্যে'র নিবন্ধে সজনী-কান্তের ভাষা বক্রোক্তিতে পূর্ণ। কবিতায়ও বক্রোক্তির অভাব নেই, কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে কবিশিষ্যের কাব্য-অভিবাদন। এই কবিতায় সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে বিদ্যাসাগরকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপমা হিমালয়—এ কবিকল্পনা বিশুদ্ধ ভক্তদৃষ্টিরই পরিচায়ক।

[ক্রমশঃ]

ছাত্রদের প্রতি

বনফুল

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আপনারা আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। সর্বপ্রথমেই দেশবরেণ্য নেতা সর্বজনপ্রিয় রাজেন্দ্র প্রসাদের উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক, মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য পার্শ্বচর, ভারতীয় শিষ্টাচারের সৌম্য প্রতীক, বিদ্বান, বিদগ্ধ, মহৎ চরিত্রের আধার, ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজেনবাবুকে হারাইয়া সমস্ত দেশ আজ শোকে বিহ্বল। মনুষ্যত্বের যে মহৎ আদর্শকে তিনি জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন সেই আদর্শ যদি আমাদেরও উদ্বুদ্ধ করে তাহা হইলেই আমাদের শ্রদ্ধাপ্রদর্শন সার্থক হইবে। তাঁহার মত লোকের পুনরাবির্ভাব ঘটিবে ইহা কল্পনা করা শক্ত। তবু আশা করিয়া থাকিব যে তাঁহার মহত্ত্বের যোগ্য উত্তরাধিকারী আবার আমাদের দেশকে উজ্জ্বল করিবে।

প্রায় প্রতিবৎসরই পাটনায় কোন না কোন সাহিত্য-সভায় যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছি। কিন্তু নানা কারণে আসা ঘটিয়া ওঠে নাই। সাংসারিক ও শারীরিক বাধা-বিঘ্ন তো ছিলই, কিন্তু যাহা থাকিলে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা সহজ হয় সেই উৎসাহেরও অভাব ছিল। কোনও সাহিত্য-সভায় যোগদান করিতে আর তেমন উৎসাহ পাই না। ক্রমশঃ ইহা বুঝিয়াছি নানারূপ সামাজিক হুজুকের মত এই সব সাহিত্য-সভাও প্রধানতঃ একটা হুজুক মাত্র। আমরা সাহিত্য ভালবাসি না, সাহিত্যকে লইয়া হুজুক করিতে ভালবাসি। এ কথা অবশ্য সত্য যে সাহিত্যকে ভালবাসা সহজ নয়, সাহিত্যকে ভালবাসিবার অধিকার বা ক্ষমতা সকলের নাই। প্রকৃত সাহিত্য-স্রষ্টার মত প্রকৃত সাহিত্য-রসিকও বিরল। বহুকাল আগে লিখিয়াছিলাম :

চন্দন তবুও আছে এবং থাকিবে চিরকাল
চন্দন-রসিকও আছে হয়তো সংখ্যায় তারা কম
গড্ডলিকা সম কভু হয় না তো রসিকের পাল
সুরসিক বিধাতার অপরূপ এই তো নিয়ম।

এই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ রসিকের দল সংখ্যা-গরিষ্ঠ বেরসিকদের চাপে সর্বদা ম্রিয়মান, শুধু এ যুগেই নহে, সর্বযুগেই। কবি ভবভূতি তাঁহার কাব্য লিখিয়া তাঁহার সমসাময়িক যুগের উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। বলিয়াছিলেন কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা, সুতরাং কোনও সময়ে কোথাও না কোথাও তাঁহার সমানধর্মা লোকের আবির্ভাব ঘটিবে এবং তখন হয়তো তিনি তাঁহার সৃষ্ট কাব্য উপভোগ করিবেন।

বর্তমান যুগে যে সাহিত্য-রসিকের সংখ্যা কম তাহার প্রমাণ অজস্র। জনপ্রিয় পুস্তক, জনপ্রিয় সিনেমা প্রভৃতির অশিল্পত্বই তাহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। যে সব 'হিট' বইয়ের সম্বর্ধনা-গর্জনে আকাশ-বাতাস নিনাদিত তাহারা যে রসিকের রসবোধকেও hit করিয়া অবসন্ন মূর্ছিত করিয়া দেয় ইহা তো সর্বজনবিদিত সত্য।

সুতরাং সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল অনুষ্ঠান সারা দেশ জুড়িয়া ক্রমাগত অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে সাহিত্য-নিষ্ঠার প্রকৃত পরিচয় যে পাওয়া যাইবে না ইহা একরূপ নিশ্চিত।

এই সব কারণে সাহিত্য-সভায় আমি পারতপক্ষে যোগদান করি না।

কেবল সাহিত্য নয়, ধর্ম লইয়াও আমাদের দেশে বাড়াবাড়ির অন্ত নাই। নানা রঙের নানা ধর্ম-সভায় নানা বেশ ধরিয়া নানারূপ ধর্মধ্বজীরা প্রায়শঃই যাহা করিতেছেন তাহা আত্মপ্রচারেরই নামান্তর। প্রকৃত ধর্মের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নাই, থাকিলে ক্রমবর্ধমান

পাপের স্রোতে আমাদের সমাজ এমন ভাবে ডুবিয়া যাইত না। জীবনের সর্বক্ষেত্রই আজ যেন অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের বিহারভূমি।

সাহিত্য এবং ধর্ম একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। সাহিত্যে এবং ধর্মেই মানব নিজের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আবিষ্কার করিয়াছে। যাহা কেবলমাত্র ভঙ্গী-সর্বস্ব, দেহ-সর্বস্ব, সমাজ-সর্বস্ব বা কোনও বিশেষ মতবাদ-সর্বস্ব, যাহা জীবনকে অবলম্বন করিয়াও জীবনাতীত, যাহা মানুষকে কোন আর্থিক সম্পদ দান করে না, আনন্দই যাহার এক-মাত্র ধ্যেয় এবং একমাত্র পুরস্কার—সেই আধ্যাত্মিকতাই সাহিত্য এবং ধর্মের লক্ষ্য। প্রথম শ্রেণীর ধার্মিক এবং প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক এই আধ্যাত্মিকতারই সাধনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ আধ্যাত্মিকতায়, সাহিত্য এবং ধর্ম মানবমনের এই চরম বিকাশসাধন করিবার জন্য সতত উন্মুখ।

এই প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগিবে। অধিকাংশ মানুষই যদি বেরসিক এবং অধার্মিক হয় তাহা হইলে সাহিত্য-সভা এবং ধর্ম-সভার এত ধুম কেন? মনে হয় ইহার দুইটি কারণ। প্রথম কারণ, মানবসমাজের প্রায় আদিযুগ হইতে সাহিত্য ও ধর্ম যে শুধু সম্মানের আসন পাইয়াছে তাহা নয়, যাহারা সাহিত্য এবং ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে তাহারাও সম্মানিত হইয়াছে। খোলাখুলি ভাবে 'আমি বেরসিক', 'আমি অধার্মিক' এ কথা কোন সামাজিক মানব স্বীকার করিতে লজ্জা পায়। নিজেদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার জন্যই অনেক সময় তাই তাহারা ঘটা করিয়া সভা আহ্বান করে, মন্দির স্থাপন করে। এই কারণেই তাই এত সাহিত্যিক মুখোশ এবং গৈরিকের আড়ম্বর। ইহার আর একটা কারণও হইতে পারে। প্রত্যেক মানুষই হয় জ্ঞাতসারে না হয় অজ্ঞাতসারে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ পাইবার জন্য সত্যই উন্মুখ। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার মত আমরা সকলেই একটা পরশ-পাথর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। পরশ-পাথর কিন্তু দুর্লভ। ভাগ্যবলে তাহা দৈবাৎ মিলিয়া যায়। কিন্তু এ কথা সকলে জানে না, কিংবা মানিতে চায় না। তাই সন্ধানীদের ভিড় শ্বাসরোধকর, তাহাদের মধ্যে ভণ্ড, ধরবাজ্যা বা মোহগ্রস্ত লোকের সংখ্যাও কম নয়, তাই প্রকৃত রসপিপাসু বা রস-স্রষ্টারা এই সব সভায় আসিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

এইসব কারণে সাহিত্য-সভায় অংশ-গ্রহণ করিতে প্রায়ই ইতস্ততঃ করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার দ্বিধা বা অনিচ্ছা টেকে না। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে আহ্বান আসিলে তাহা আর উপেক্ষা করিতে পারি না। তাহাদের অনেক দোষ আছে জানি, এজন্য বহুবার তাহাদের অনেক ভৎর্সনাও করিয়াছি, ব্যঙ্গও কম করি নাই, উপদেশ দিয়াছি, প্রতিজ্ঞা-দুর্গে প্রবেশ করিয়া স্থিরও করিয়াছি আর যাইব না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে—তাহাদের ডাক আসিলে সাড়া না দিয়া পারি নাই। অনেক দিন আগে তাহাদের উদ্দেশ্যে যে ছোট কবিতাটি লিখিয়াছিলাম অনুভব করি সেই কবিতার ভাবটাই আমার মনের স্থায়ী ভাব। নানা সময়ে তাহার কিছু অদলবদল হইয়াছে সত্য, কিন্তু মূল ভাবটা ঠিক আছে। কবিতাটি এই:

তোমাদের ভালবাসি, তোমাদেরই ভালবাসি
তোমাদের ছাড়া আর কার কাছে আসব
তোমরা কাঁদলে পরে আমাকে কাঁদতে হবে
তোমরা হাসলে পরে হাসব।
জীবনের হাটে বাটে তোমাদের খেলা হাসি
তোমাদের কলরবে অসীমের বাজে বাঁশি
তোমরা চোখের মণি, তোমরা বুকের ধন
তোমরা অপরাজেয়, তোমরা চিরন্তন
তোমাদেরি ভালবাসি
চিরকাল বাসব
তোমরা কাঁদলে পরে আমাকে কাঁদতে হবে
তোমরা হাসলে পরে হাসব।

যাহারা ভালবাসার ধন, তাহাদের সহিত যখন মুখোমুখি হই তখন কিন্তু যে কথাটা তাহাদের বলিতে ইচ্ছা করে তাহা সব সময়ে বলিতে পারি না। কারণ কথাটা খুবই ছোট অথচ খুবই বড়। 'তোমাদের ভালবাসি' মাত্র এই কথা বলিয়া কি সভার বক্তব্য শেষ করা যায়? যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বা শ্রীঅরবিন্দ লইয়া খানিকটা আবোল-তাবোল বকি, বাস্তব সাহিত্য বড়, না অবাস্তব সাহিত্য বড় তাহা লইয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত

হই, সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব ভাল না মন্দ, সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রকৃত সংজ্ঞা কি এইসব গুরু-গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়া আসল বক্তব্যটা হইতে দূরে সরিয়া যাই।

কিন্তু, 'তোমাদের ভালবাসি'—এইটাই আসল বক্তব্য। তোমাদের ভালবাসি তাই তোমরা যখন বেকার হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াও তখন বড়ই কষ্ট হয়, যখন তোমরা রকে উপবিষ্ট হইয়া সকলের উপহাসাস্পদ হও তখন প্রাণে বড়ই লাগে, তোমরা যখন মনুষ্যত্ব-মর্যাদা ভুলিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধনী দুরাত্মার নিকট শির অবনত কর তখন আমারও শির লজ্জায় অবনত হইয়া যায়। তোমাদের ক্রমবর্ধমান অবনতির দিকে চাহিয়া বারবার নিজেকেই প্রশ্ন করি কেন এমন হইল। বহুকাল পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—তাঁহার মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল, বস্তুতঃ ভারতের মনীষীগণের চিত্তাকাশে দুই-একটি প্রশ্নের কশাঘাতই বিদ্যুৎবহ্নিতে বারম্বার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন: "Why is it that we, three hundred and thirty millions of people have been ruled by the last thousand years by any and every handful of foreigners ?"

এ প্রশ্নের তিনি উত্তরও দিয়াছেন: "Because they had faith in themselves and we had not. I read in the newspapers how one of our poor fellows is murdered or illtreated by an Englishman howls go all over the country. I read and weep and the next moment comes to my mind who is responsible for it all... not the English...it is we who are responsible for all our degradation."

রবীন্দ্রনাথেরও ওই এক কথা:

কার নিন্দা কর তুমি, মাথা কর নত
এ তোমার, এ আমার পাপ—

শ্রীঅরবিন্দও আরও বিশদ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন: "Our actual enemy is not any force exterior to ourselves, but our own crying weakness, our cowardice, our selfishness, our hypocrisy, our purblind sentimentalism." শত্রু বাহিরে নাই, শত্রু আমাদের ভিতরে আছে। এখন আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, আমাদের বাহিরের শত্রু ইংরেজ আমাদের হাতে শাসনভার সমর্পণ করিয়া বিদায় লইয়াছে কিন্তু আমাদের অন্ধকার ঘুচিয়াছে কি? ঘোচে নাই, আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। বরং মনে হইতেছে তিমির গাঢ়তর হইয়াছে। বিবেকানন্দ কথিত degradation, রবীন্দ্রনাথ কথিত পাপ আমাদের সমাজের সর্বস্তরকে আজও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারি নাই। স্বদেশী যুগে আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন করিতেছিলাম তখন অনেকের মনে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল সে অগ্নিও নির্বাপিত হইয়াছে। এখন আমরা নানারূপ স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত রাজনীতির স্রোতে খড়ের কুটার মত ইতস্ততঃ ভাসিয়া চলিয়াছি। লক্ষ্য শুধু স্বার্থসিদ্ধি, মহত্তর আর কোনও লক্ষ্য নাই। ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য বিদ্যালাভ বা চরিত্র-গঠন নহে, লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষা পাস করিয়া যেন-তেন-প্রকারেণ চাকুরি লাভ করা। তাহাদের অভিভাবকদের জীবনেও উচ্চতর আদর্শ নাই, একমাত্র আদর্শ টাকা। আমরা বুঝিতেও পারিতেছি না এই নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক আদর্শ আমাদের ক্রমশঃ সর্বস্বান্ত করিতেছে। গজভুক্ত কপিত্থবৎ আমরা বাহিরের ঠাট-ঠমক কোনক্রমে বজায় রাখিয়া ভিতরে ভিতরে অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িতেছি। আর সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার আমরা এ বিষয়ে এখনও উদাসীন। শুধু ছাত্রসমাজ নহে, সমস্ত দেশই যেন আজ ভাঙনের মুখে ধ্বংসোন্মুখ। মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয়, আমরা বাঁচিয়া আছি কি? মনে হয়—

আমরা মরিয়া গেছি সে কথা বুঝি নি মোরা আজও
আমরা বাঁচিয়া নাই, বাঁচিবার করি শুধু ভান
দেখিতেছ শোভা-যাত্রা? ও যে শব-যাত্রা তাই
চলেছে মড়ার দল হস্তে বহি প্রেতের নিশান।
মুখেতে মেরেছে জাবি, পাষাণে গলেছে রোজ বুক
ছাড়ায়ে গায়ের চামড়া বানায়েছে বাজা চটিজুতা

তাহাদেরি জয়গান গাহি দিয়া সুর-তাল-মান
তাহাদেরি সেবা করি পাইলেই সুযোগ বা ছুতা।
মোদের জীবন্ত বল? এ বড় আজব দেশ ভাই,
মরিলেই দাহ করা নয় জেনো এ দেশের কেতা
জীবন্তকে এরা শুধু মাঝে মাঝে পোড়াইয়া মারে
সচল মড়াই করে জীবনের অভিনয় হেথা।
এখানে মৃতের দল নাচে গায় নানান আসরে
মড়ারাই প্রিয়-প্রিয়া এদেশের মিলন-বাসরে।

প্রেত-লোকের এই বীভৎস কল্পনায় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু বরাবর অবসন্ন হইয়া থাকা মনের ধর্ম নয়। শেষ পর্যন্ত অন্তরনিবাসী আশাবাদীর কণ্ঠস্বর আবার শুনিতে পাই।

অন্তর্যামী বলেন: "তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু সমগ্র সত্য নহে। সবই ভস্ম নহে, ভস্মের নীচে অগ্নিও আছে। হয়তো তাহা কণামাত্র, তবু তাহা অগ্নি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু মেঘ দেখিয়া হতাশ হইও না, বিস্মৃত হইও না যে মেঘের অন্তরালে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের চিরন্তন দীপ্তিও আছে। এই বিশ্বাসকেই অবলম্বন কর। স্মরণ কর রবীন্দ্রনাথের কথা। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তিনি আশা করিয়া গিয়াছেন সংকটের দুর্যোগ চিরস্থায়ী হইবে না। পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া অপরাজিত মনুষ্যত্বের মহিমা আবার আত্মপ্রকাশ করিবে। আশা করিয়া থাক ওই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির, মেঘান্তরালবর্তী ওই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মহা-আবির্ভাব ঘটিবে। এই মহা হট্টগোলের মধ্যেও অনুপম সঙ্গীত আত্মগোপন করিয়া আছে, বিশ্বাস রাখ সেই সঙ্গীতই একদিন আবার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিবে।"

এই বিশ্বাসের আশ্রয়ভূমি সন্ধান করিতে গিয়া হে ছাত্রছাত্রীগণ, তোমাদেরই কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। মনে পড়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা:

মানুষ হয়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে
যুগের আগে এগিয়ে চলে হাস্যমুখে গর্বভরে
প্রয়োজনের ওজন মতো আয়োজন সে করতে পারে
ভগবানের আশীর্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।

ওই আমাদের চোখের মণি···ওই আমাদের বুকের বল
ওই আমাদের অমর প্রদীপ ওই আমাদের আশার স্থল।

তোমাদের উপরই সকলের আশা। তোমাদের মধ্যেই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত। তোমরা সাহিত্যিক না হও ক্ষতি নাই, কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা না হইলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। কিন্তু তোমাদের মানুষ হইতে হইবে, স্বদেশপ্রেমিক হইতে হইবে। শুভ্র-চরিত্র স্বদেশপ্রেমিকই অন্তর দিয়া দেশের দুঃখদুর্দশা অনুভব করিতে পারেন। ভারতবর্ষের নব-জাগরণের যুগে এইরূপ তীক্ষ্ণ-অনুভূতি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই দেশ জাগিয়াছিল। তাই আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেশ আবার মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। আবার তাহাকে মোহমুক্ত করিতে হইবে। সে দায়িত্ব তোমাদের। সে দায়িত্ব পালন করিতে হইলে শুভ্র সৎচরিত্র চাই, তীক্ষ্ণ অনুভূতি চাই। দেশের দুঃখকষ্ট প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে হইবে, তবেই তাহার প্রতিকার আসিবে। স্বামী বিবেকানন্দও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "Feel, therefore, my would be reformers, my would-be patriots. Do you feel? Do you feel that millions are starving to-day and millions have been starving for ages? Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it made you almost mad? Are you seized with that one idea of the misery of ruin, and have you forgotten all about your name, your fame, your wives, your children even your bodies? That is the first step to become a patriot..."

আমাদের দেশে এরূপ patriot এখন নাই। আশা করিব তোমাদের মধ্য হইতে সত্য-সন্ধী দেশগতপ্রাণ পরার্থপর দেশ-প্রেমিকের আবির্ভাব আবার ঘটিবে।

বহুকাল আগে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় দেশের

যুবকদের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেইটি পাঠ করিয়া আজ আমার বক্তব্য সমাপন করিব :

তোমারই অন্তরবহ্নি এ দুর্দিনে রবে নির্বাপিত
চিরন্তন অগ্নিহোত্রী ? হে তরুণ, তুমি যে সাগ্নিক।
শঙ্কাহীন বীর্যবান বীর তুমি অপ্রমত্ত-চিত্ত
সমস্ত জীবন জ্বালি পথ-ভ্রান্তে দেখায়েছ দিক
যুগে যুগে চিরকাল : কীর্তিকথা তব সমুজ্জ্বল
ইতিহাসে আছে লেখা জ্বলন্ত অক্ষরে, আছে লেখা
স্মৃতি-পটে, আশার কল্পনা-মন্তে করে ঝলমল
লক্ষ-বর্ণ মহিমায়। কোথা তুমি আজ ? দাও দেখা,
উদ্ভাসিত কর অন্ধকার, হে অগ্রণী চিরন্তন,
আদর্শ-প্রদীপ্ত তব মনীষায়। আছ তুমি জানি,
তবে কেন কষ্ট ক্ষোভ অসম্মান সহস্র বন্ধন
পুঞ্জীভূত হতাশায় প্রতি পদে পরাজয় গ্লানি ?
হে যৌবন-ভগবান, হে ভাস্বর, স্বীয় মূর্তি ধর
অন্ধকার যজ্ঞভূমে প্রাণ-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।*

—

* পাটনা কলেজের বঙ্গ-সাহিত্য-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

বসন্ত-বাহার

শ্রীশান্তি পাল

এসেছে ফাগুন, এসেছে ফাগুন
কবির পরাণে জ্বলেছে আগুন।
লতায়-পাতায় ছুঁয়েছে সবুজ,
কোকিল কুহরে বেজায় অবুঝ।
সহকার শাখে ধরেছে বউল,
বন-বনান্তে ফুটেছে মউল।
দখিণ হাওয়ায় সুবাস ছড়ায়,
বহে আনন্দ আবার ধরায়।
মৌমাছি এসে বারতা রটায়,—
প্রজাপতি চুপে মিলন ঘটায়।
বকুল চামেলি করবী টগর,
হেসে কুটিকুটি—দেখিছে রগড়।
শিমূল পারুল সোনাল পাটল,
ঘোমটা খুলেছে—টুটেছে আটল।
মাধবী মালতী অশোক পলাশ
আড়-চোখে চায়,—কে করে তলাশ ?

আহা মরি মরি হেরি কী শোভন,
বসুধা সেজেছে হৃদয়-লোভন।
আয় রে সবাই তরুণী-তরুণ,
কুয়াশা কেটেছে, জেগেছে অরুণ।
মদন আজিকে শকট হাঁকায়
হাতে লয়ে চাপ ভ্রূযুগ বাঁকায়।
এমন মঞ্জু প্রভাতবেলায়
বৃথা কি গোঁয়াবি সময় হেলায় ?
মিছা কী কাটাবি এ শুভ লগন,
গাও বসন্ত-বাহার মগন।

*

আগামী চৈত্র ১৩৬৯ সংখ্যা হইতে শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী রচিত 'রম্যাণি বীক্ষ্য—উত্তর-ভারত পর্ব' শনিবারের চিঠিতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে।

আমাদের পরিবেশ

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন আমার একটি প্রচণ্ড অহঙ্কার ভেঙে গেল। বহুদিন সযত্নে আমি এই অহমিকা মনে লালন করে এসেছি যে আমি সমাজ-সচেতন, সমাজের ভাল-মন্দের প্রতি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু সেদিন ভোরে সবকিছুই একটা প্রচণ্ড ব্যঙ্গের মত মনে হতে লাগল।

নারীকণ্ঠের বুকফাটা আর্তনাদ শুনে সেদিন ঘুম ভেঙে গেল। উঠে ঘরের দরজা খুলে তাড়াতাড়ি ছাদের শেষপ্রান্তে গিয়ে দেখি ক্রন্দনরব ভেসে আসছে রাস্তার ওপারের একটি বাড়ি থেকে। বাড়িটি গজ বিশেকের বেশী দূরে নয় আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে জানতে পারলাম যে ও-বাড়ির প্রৌঢ় গৃহকর্তা মারা গেছেন কিছুক্ষণ হল এবং কাঁদছেন তাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী। আরও খবর পেলাম যে ভদ্রলোক বেশ কিছুদিন যাবৎ রোগে ভুগছিলেন এবং গত তিনদিন যাবৎ তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল।

একবার ও-বাড়ি গিয়ে দায়সারাগোছের প্রতিবেশীর কর্তব্য সম্পাদন করলেও বারবার আমার মনে এই কথা মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল যে ধিক্ আমাকে, ধিক্ আমার সমাজ-সচেতনতার অহঙ্কারকে। সামনের প্রতিবেশী এমন মারাত্মকভাবে ভুগছেন আর আমি তার খবরটুকু পর্যন্ত রাখি না!

কিন্তু আমার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যায় কর্মস্থল থেকে ফিরে আবার ছাদের বারান্দায় দাঁড়িয়েছি। ওপাশের ঘর থেকে তখনও মাঝে মাঝে সদ্য-বিধবা নারীর করুণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। অকস্মাৎ শ'খানেক গজ দূরে একটি প্রতিবেশীর বাড়িতে বিপুল-বিক্রমে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাজি ফাটার দুমদাম আওয়াজ। দেখতে দেখতে আর সব বাড়ির ছাদে মহিলা ও শিশুদের ভিড় জমে গেল। ও-বাড়িতে বর এসেছে। বিয়ে-বাড়ির আনন্দোল্লাসের ভিতর অসহায়া নারীর কাতর বিলাপধ্বনি ডুবে গেল।

এ কোন কল্পিত কাহিনী নয়। আর আমার এ অভিজ্ঞতা এককও নয়। আজকের শহরের জীবনে এই-ই হল নিত্যকার ঘটনা। যার জন্য আমার মনে দরদ সে হয়তো চীন ফিলিপাইনস অথবা আলাস্কাতে থাকে। কিছুদিন পর আমাদের আত্মীয়পরিজন হয়তো চন্দ্রলোক অথবা অপর কোন গ্রহ উপগ্রহে থাকবে। কিন্তু ঠিক আমার পাশের বাড়ির ভাড়াটেটি আমার আত্মীয় বা বন্ধু নন, তাঁর সুখের ভাগীদার আমি নই এবং তিনিও আমার হিতাহিতের জন্য তিলমাত্র চিন্তিত নন। আজকের নাগরিক সমাজ আয়তনে বিশাল হলেও তার constituent unit অর্থাৎ অঙ্গ-উপঅঙ্গগুলির ভিতর পারস্পরিক সম্বন্ধ বা সংহতি নেই। শহরের অধিবাসী আমরা মরুভূমির অসংখ্য বালুকণার মত পাশাপাশি থাকলেও পরস্পর অসম্পৃক্ত। একদল আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী তাই একে যে মানব-সমাজ (human society) না বলে মনুষ্য-জঙ্গল (human jungle) বলছেন, তার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে।

ভারতবর্ষে যন্ত্রযুগের সূত্রপাত হয়ে গেছে বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে। এর ফলস্বরূপ গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী অভিযানও আরম্ভ হয়ে গেছে। গ্রামের কাঠামোর যেটুকু অবশিষ্ট, তার অনেকটাই আবার শহর-নির্ভর। এক কলকাতাকেই কেন্দ্র করে তার চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল ব্যাসের এলাকার সমস্ত জনপদ চেহারায় গ্রামীণ থাকলেও স্বভাবধর্মে নাগরিক হয়ে গেছে। কলকাতার feeder বা পরিপূরক এই সব গ্রামের অধিবাসীরা ডেলি প্যাসেঞ্জার। সকালবেলায় এঁরা বাড়ি থেকে বেরোন ও ফেরেন রাত্রে। ফেরার সময় অধিকাংশই শ্রান্ত ক্লান্ত। সুতরাং কোন পারিবারিক সমস্যা না থাকলে রাত্রের বাকি সময়টুকু পরের দিন কাজে যাবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করার জন্য ঘুমনো ছাড়া তাঁদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। অতএব কেবল কলকাতা আসানসোল অথবা কুলটি বর্ধমানের মত শহর নয়, তার আশেপাশের বহু বিস্তীর্ণ এলাকার গ্রামের অধিবাসীদেরও আর মানুষ

হিসাবে প্রতিবেশী মানুষের সম্পর্কে আমার বিশেষ অবকাশ বা উপায় নেই।

শহরের সন্নিকটস্থ গ্রামাঞ্চলে যদিবা কদাচিৎ এ জাতীয় সুযোগ কখনও জোটে, কারখানা-শহরগুলিতে তার অবকাশ নেই বললেই চলে। শিফ্‌ট ডিউটির জন্য আমার প্রতিবেশী এবং আমার বাড়িতে থাকার সময় এক নয় এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনও পৃথক পৃথক। তা ছাড়া কি কোয়ার্টার্স, কি বাড়ি সর্বত্র আজকাল সেলফ কনটেণ্ড ফ্ল্যাটের চাহিদা। বসবাসের এই স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে দশ হাত দূরের অন্য ভাড়াটের সঙ্গে পরিচয় হওয়া তো দূরের কথা, পাশের ফ্ল্যাটের অধিবাসীর সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি নেই। কদাচিৎ কখনও দু-চার মাসে একবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় যদি এক লহমার জন্য দেখা হয়ে গেল তো অনেক হল।

আমার বাড়ির কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীদের আগমনের বিশেষ অবকাশ নেই। আমি হয়তো দমদমে থাকি এবং আমার আত্মীয়বন্ধুরা টালিগঞ্জ যাদবপুর বা ব্যাটরা—যে কোন জায়গা থেকে এসে আমার বাড়ির সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। রক্ত-সম্বন্ধের আত্মীয় ছাড়া এই সব বন্ধুবান্ধবদের অধিকাংশই আবার জীবিকার ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্বন্ধিত। অর্থাৎ আমাদের একেবারে নিকট-প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ হবার অবকাশ এক্ষেত্রেও সীমিত।

অতএব এককথায় বলতে গেলে গ্রাম বা শহরের যে পাড়ায় আমরা থাকি, তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ পাখির সঙ্গে পাখির বাসার সম্পর্কের মত। আমাদের বাড়ি বা পাড়া কেবল আমাদের রাতের আশ্রয়। পাড়া বা প্রতিবেশীর ভাল-মন্দের সঙ্গে আমাদের কোন নাড়ীর যোগাযোগ নেই। এই রকম আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থা কতটা আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়ক, এ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার দিন এসেছে।

২

প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের এই যে অপ্রতুলতা, এর মূল কারণ হল common interest বা সাধারণ স্বার্থের অভাব। যে গ্রাম বা শহরের যে অঞ্চলে আমরা থাকি, সম্মিলিতভাবে তার সাধারণ সমস্যাবলীর সমাধান করার অবকাশ আধুনিক সমাজে ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। প্রাচীন কালের চণ্ডীমণ্ডপে প্রচুর পরিমাণে তাম্রকূটের ধূম উদ্‌গিরণের সঙ্গে সঙ্গে পরনিন্দা পরচর্চা যে হত না, এমন কথা নয়। কিন্তু ওই সব বাহ্য অবগুণের অন্তরালে একটি সাধারণ স্বার্থবন্ধন ছিল, আর ছিল সাধারণ সমস্যাবলীর সমাধান করার প্রয়াস। কালের প্রভাবে সেই প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের সমাজ আর ফিরে আসবে না এবং তার জন্য নতুন করে খেদ প্রকাশ করেও লাভ নেই। কিন্তু বর্তমান যুগোপযোগী কোন সাধারণ স্বার্থবন্ধন স্থাপন করতে না পারলে এবং সাধারণ সমস্যার সমাধানের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের পক্ষে একটি সাধারণ মিলনভূমি আবিষ্কার করতে না পারলে বর্তমান শোচনীয় অবস্থার নিরাকরণ করা সম্ভবপর নয়।

স্বাধীনতার পর আশা করা গিয়েছিল যে দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও বিশেষ করে তার সার্বজনীক ভোটদানের অধিকার ভারতবাসীদের ভিতর সাধারণ মিলনভূমি রচনা করবে। কিন্তু পর পর তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাঞ্ছিত লক্ষ্যের অভিমুখে তিলমাত্র এগোতে পারি নি। পাঁচ বছর অন্তর একবার দিনকয়েকের জন্য জনসাধারণ "নির্বাচনী জ্বরে" উন্মত্ত হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু তখনকার সেই উন্মাদনা কোন প্রকৃতিস্থ মানুষের সজ্ঞান আচরণ নয়। আর এ উন্মাদনা স্বল্পকাল স্থায়ীও বটে। এর কারণ হল এই যে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের আধারে পরিচালিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন-ব্যবস্থাতে জনসাধারণের সজ্ঞান বা সক্রিয়ভাবে করার বিশেষ কিছু নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছোট্ট একটি গোষ্ঠী প্রার্থী নির্বাচন করেন, আর একদল বিশেষজ্ঞ কর্মীর অঙ্গুলিহেলনে পার্টিগুলির প্রচারযন্ত্র মুখর হয়ে ওঠে। আর এ প্রচারে দলীয় কর্মসূচীর পার্থক্য বোঝানোর চেয়ে ব্যক্তি জাতি সম্প্রদায় ও ধর্মগত যাবতীয় বিরোধিতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রচারের প্লাবন বইয়ে দেবারই প্রয়াস হয় বেশী। এমতাবস্থায় প্রচারের এই ডামাডোলের মধ্যে সাধারণ নাগরিক যদি বুদ্ধি স্থির রেখে নিজের ভোটটি দিয়ে

আসতে পারেন, তাহলে অনেক হল। "নির্বাচনী জ্বরে"র সময়টুকু ছাড়া অন্য সময় গণতান্ত্রিক সরকারের শাসন-ব্যবস্থা চালান মুষ্টিমেয় আমলারা এবং তাঁদের প্রভাবিত করে সুযোগ-সুবিধা আদায় যাঁরা করতে পারেন, তাঁরাও স্বল্পসংখ্যক আইনসভা-সদস্য অথবা রাজনৈতিক দলের কর্মী। বিরাট সংখ্যক জনসাধারণের সক্রিয়ভাবে কোন কিছু করার অধিকার এখানে নেই। শহরের করপোরেশন মিউনিসিপ্যালিটি অথবা গ্রামাঞ্চলের জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডেও এই একই সমস্যা। পার্থক্য যদি কিছু থাকে তবে তা পরিমাণগত, গুণগত নয়।

গণতন্ত্রের অপূর্ণতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হল, তার অর্থ এ নয় যে গণতন্ত্রের মূলতত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে শতবিধ ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও প্রচলিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র সৈন্যবাহিনীর এক-নায়কত্ব অথবা একনায়কত্বের একটু চটকদার সংস্করণ সর্বহারার একনায়কত্ব অর্থাৎ কমিউনিস্ট শাসনপদ্ধতির চেয়ে সর্বাংশে শ্রেয়। গণতন্ত্রকে এ যাবৎ আবিষ্কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজব্যবস্থা রূপে মেনে নিয়ে প্রচলিত গণতন্ত্রকে আদর্শ গণতন্ত্রে পরিণত করার পন্থা নিরূপণই আমাদের উদ্দেশ্য। এর জন্য গণতন্ত্রের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের কথঞ্চিৎ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা-রূপে গণতন্ত্রের প্রথম উদ্ভব হয় প্রাচীন গ্রীসে, তার নগর-রাষ্ট্রগুলিতে। এগুলির জনসংখ্যা সাধারণতঃ দশ থেকে বিশ হাজারের মত হত এবং তাই যে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ মতামত নিরূপণ করে তদনুযায়ী কাজ করা সম্ভবপর ছিল। জনসাধারণের পক্ষে রাষ্ট্র-শাসনকার্যে এই ভাবে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করা সম্ভবপর হত বলে সে যুগের গ্রীসে ক্রীতদাস ছাড়া স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে গণতন্ত্র আদর্শ সমাজব্যবস্থারূপে বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের সংখ্যাস্ফীতি হয়েছে এবং সেই কারণে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের পক্ষে দেশ পরিচালন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাগীদার হওয়া সম্ভবপর নয়। জনসাধারণকে তাই নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করতে হয় প্রতিনিধিদের মারফত। এরই ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও অধিকাংশ জনসাধারণের আজ কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির জন্যই আবার শাসনকার্য ও শাসিতদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছে, উদ্ভব হয়েছে ভক্ত ও ভগবানের মাঝখানে পূজারীর মত।

৩

যন্ত্রবিপ্লবের পরবর্তী যুগের যান্ত্রিক মানুষকে পুনরায় মানবীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার এই সমস্যা কেবল ভারতবর্ষে নয়, এ এক বিশ্বসমস্যা। আমাদের দেশে এ সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি ও তার সমাধান আবিষ্কারের প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত প্রায় সকল মনীষীই করে-ছিলেন। ১৩১১ সনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ এর একটি অত্যুত্তম নিদর্শন।

তবে এই শতাব্দীতে এই সমস্যার প্রতি সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করার কৃতিত্ব মহাত্মা গান্ধীর। গান্ধীজী কেবল এ সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হন নি, মানবীয় সমাজ রচনার এক সুপরিকল্পিত নিদানও তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন। গান্ধীজীর বিকেন্দ্রিত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সাধারণতন্ত্রের পরিকল্পনা এরই দ্যোতক। কিন্তু পরবশ্যতা দূরীকরণের কাজেই গান্ধীজীর সময় ও উদ্যমের অধিকাংশ নিয়োজিত ছিল এবং রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত না হলে এ জাতীয় স্বয়ংশাসিত সমাজ রচনা করা সম্ভব নয় বলে নিজের জীবনকালে সূত্রাকারে এ আদর্শকে পেশ করা ও এর কয়েকটি গবেষণাগারসুলভ পরীক্ষা-নিরীক্ষা (laboratory experiment) করা ছাড়া তিনি বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি।

স্বাধীনতার পর সরকারী প্রচেষ্টায় সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার মারফত সুদূর গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত উন্নয়নমূলক কাজ করার প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরই দেখা গেল যে জনসাধারণের উৎসাহ ও সহযোগিতার অভাবে এ পরিকল্পনার নৌকো চড়াতে গিয়ে ঠেকেছে। তাই শ্রীযুক্ত বলবন্ত রায় মেহতার নেতৃত্বে এ সমস্যার অধ্যয়ন ও তার নিরাকরণের পথ আবিষ্কারের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সেই কমিটি এ সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করে। ওই রিপোর্টের মূল কথা হল এই

যে যাদের জন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা, এর সার্থকতা তাদের বুঝতে হবে এবং তারাই এর পরিকল্পনা রচনা ও তাকে কার্যান্বিত করবেন। আমলা বা প্রতিনিধিদের মারফত নয়, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে এই কর্মসূচীতে। সংক্ষেপে এরই নাম গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের কর্মসূচী। এতদনুযায়ী গ্রাম-পঞ্চায়েত, ব্লকের স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও তার উপর জেলা-পঞ্চায়েত —এইভাবে তিন ধাপ প্রতিষ্ঠানের মারফত কাজ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নিজ নিজ স্তরে এইসব প্রতিষ্ঠান-গুলির যথাসম্ভব নির্ব্যূঢ় ক্ষমতা আছে। শাসন বিচার ও উন্নয়ন কার্যের অধিকাংশ গ্রাম-পঞ্চায়েত দ্বারা কার্যকরী করা হয় এবং এই পঞ্চায়েতের কার্যকলাপে গ্রামের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ বা পঞ্চায়েতী রাজের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে প্রচলিত গণতন্ত্রকে আদর্শ গণতন্ত্রের অভিমুখে নিয়ে যাবার এক সাহসিকতাপূর্ণ প্রয়াস।

এই প্রসঙ্গে এই পরিকল্পনার ত্রুটি অপূর্ণতা সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ জেলা-পঞ্চায়েত ও প্রাদেশিক সরকারের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থির করা উচিত এবং রাজ্যসরকারের কর্মপরিচালন পদ্ধতিকে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের মূল নীতির রঙে রঞ্জিত করা প্রয়োজন। অবশ্য নতুন ব্যবস্থায় জেলা স্তর পর্যন্ত কাজ কেমন চলছে দেখে ভবিষ্যতে এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যাটির প্রতি এখনই দৃষ্টি দিতে হবে। পঞ্চায়েতী রাজের আওতায় নির্বাচন যেন রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে না হয়, তার স্পষ্ট বিধান থাকা প্রয়োজন। অবশ্য ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস ও প্রজাসমাজবাদী ইত্যাদি কয়েকটি দল ইতঃমধ্যেই এই মর্মে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সরকারের তরফ থেকেও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। এর ফলে ভক্ত ও ভগবানের মাঝখানে পূজারীর প্রয়োজন আর থাকবে না।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকাবিহীন নির্বাচন-ব্যবস্থা কোন অবাস্তব পরিকল্পনা নয়। যুগোস্লাভিয়ার ভোটার্স কাউন্সিল মোটামুটি এই নীতিরই দ্যোতক। প্রত্যেকটি পাড়ায় অর্থাৎ এমন একটি ছোট এলাকা যেখানে সবাই সবাইকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন, ভোটাররা একত্র হয়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্ত এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন। এক একটি নির্বাচনক্ষেত্রে এই রকম অনেক পাড়া বা ভোটার্স কাউন্সিল থাকতে পারে। ভোটারদের দ্বারা মনোনীত এইসব প্রার্থীরা আবার নিজেদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্ত প্রার্থী মনোনীত করবেন। শতকরা ত্রিশ চল্লিশ বা ওই রকম কোন সংখ্যক ভোট পেলে কোন প্রার্থী চূড়ান্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন বলে স্থির করা যেতে পারে। অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক দলের ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী পর্দার অন্তরাল থেকে নানা রকম রাজনৈতিক রশি টানাটানির ফলস্বরূপ প্রার্থী স্থির করবেন না। গ্রাম-পঞ্চায়েতের আয়ত্তাধীন জনসংখ্যা পাঁচ-সাত হাজারের বেশী হবে না বলে এইভাবে নির্বাচন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা আরও সহজ হবে।*

বর্তমান ভারতবর্ষে প্রতিবেশীত্ব ভাবনা সৃষ্টির একটি বেসরকারী আন্দোলনও চলছে। আমরা আচার্য বিনোবা ভাবের নেতৃত্বে পরিচালিত গ্রামদান আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করছি। ভূদান অর্থাৎ ভূমিহীনদের সঙ্গে জমি ভাগ করে উপভোগ করা থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। এর সর্বশেষ রূপ অর্থাৎ গ্রামদানের তাৎপর্য হল এই যে উৎপাদনের মাধ্যম জমির কোন ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না। গ্রামের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ককে নিয়ে গঠিত গ্রামসভার অনুকূলে সবাই নিজ নিজ ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জন দেবে এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্ত কতটুকু জমিতে কে চাষ করবেন তা স্থির করে দেবে গ্রামসভা। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতামূলক জীবনযাত্রার গোড়ায় কথা হল এই ভাবনা যে আমরা কেবল নিজের জন্ত বাঁচি না, প্রতিবেশীর সুখদুঃখের অংশীদার হওয়াও আমাদের কর্তব্য।

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত লেখকের "সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

স্বার্থসংঘাতে ছিন্নভিন্ন বর্তমান সমাজে গ্রামদান অবশ্যই এক অলৌকিক ব্যাপার। তবে মানুষের মনে মূলতঃ সদ্ভাব বিদ্যমান বলে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। এযাবৎ ভারতবর্ষে বেশ কয়েক হাজার গ্রামদান হয়েছে।

অবশ্যই গ্রামদানের ঘোষণা একটি শুভ সঙ্কল্প উচ্চারণ মাত্র। একটি বিশেষ মুহূর্তে হৃদয়ে যে সৎবৃত্তির আলোড়ন হয় তারই বাহ্য প্রকাশ হল গ্রামদান। এরপর সংগঠন ও নিত্যপরিচর্যা দ্বারা এই সৎ ভাবনাকে যদি বজায় ও উত্তরোত্তর বিকাশের ব্যবস্থা করা না যায়, তবে বিরুদ্ধ পরিবেশ এবং অন্তরের লোভবৃত্তির কারণে গ্রামদান অকার্যকরী হয়ে যেতে পারে। আর প্রকৃতঃ বাস্তবক্ষেত্রে এ রকম হয়েছেও। সুতরাং গ্রামদান আন্দোলনের সাফল্য কাম্য হলে বিনোবাজী ও তাঁর অনুগামীদের আন্দোলনের এই মৌলিক দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তবে পরবর্তী পরিণাম যাই হোক, বিনোবাজী যে একটি যুগোপযোগী সমস্যার নিরাকরণ করার প্রয়াসের মাধ্যমে একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যার সমাধানে হাত দিয়েছেন এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

গ্রামদানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর পুনর্গঠন প্রক্রিয়া। কেবল জমির পুনর্বণ্টনেই গ্রামদানের আবেদন শেষ হয়ে যায় না। গ্রামসভা অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি নরনারীকে গ্রামের তাবৎ সমস্যা সম্বন্ধে অনুধাবন করতে প্রোৎসাহিত করা হয়। গ্রামের প্রতিটি কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কাজ দেবার পরিকল্পনা তাঁরা রচনা করেন, এ কার্য সম্পাদনে গ্রামের যা resource বা সম্পদ আছে তার খতিয়ান করা হয় এবং এ পথে কি কি বাধা ও কিভাবে তা দূর করতে হবে তার বিচার-বিবেচনার পর এই লক্ষ্যাভিমুখে কাজ করার দায়িত্বও থাকে গ্রামসভার উপর। অনুরূপ ভাবে শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসগৃহ ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যার সমাধান গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় করার লক্ষ্য থাকে। অর্থাৎ ভাগ করে খাবার মনোবৃত্তিচালিত হয়ে প্রথমে গ্রামদান বা প্রতিবেশীত্ব ভাবনার সূত্রপাত করা হয় এবং তারপর বেঁচে থাকার প্রয়াসের মাধ্যমে এই প্রতিবেশীত্ব ভাবনার পুষ্টি ও বিকাশসাধনের ব্যবস্থা থাকে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে গ্রামদানকে অবশ্যই একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারধারার আখ্যা দিতে হবে।

গ্রামদানের মত শহরের জীবনকে স্পর্শ করতে পারে এমনই একটি কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে বিনোবাজীর বর্তমান বাংলাদেশ পরিক্রমার সময় এর একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিনোবাজীর পদযাত্রা কালে কাল্মী শহরের একটি ওয়ার্ড দান হয় এবং তারপর কাটোয়া এবং নবদ্বীপ শহরের সংলগ্ন এক-একটি এলাকা অনুরূপ ভাবে দান হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। ওইসব এলাকার বর্তমান অবস্থা কি, অর্থাৎ শুভ-সঙ্কল্প গ্রহণ করার পর ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের ঘোষিত আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছেন, না তাঁদের উৎসাহে ভাটা পড়েছে—এ সংবাদ আমাদের জানা নেই। তবে ওই তিনটি শহরের এক-একটি অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্ততঃ সাময়িকভাবে গ্রামদানের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন কেবল এইটুকুও যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে যে শহরেও গ্রামদান আন্দোলনের মূলনীতিকে যে কার্যকরী করা সম্ভব এই ঘটনার মাধ্যমে তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

প্রতিনিয়ত বর্ধিত হারে বিবিধ প্রকারের উপকরণ প্রাপ্তির জন্য উন্মাদ হয়ে ছুটে বেড়ানোর নাম সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ নয়। দয়া মায়া প্রেম করুণা ও সহযোগিতা ইত্যাদি মানবীয় বৃত্তির বিকাশ যে সমাজে যতটা হয়েছে, তাকেই ততটা সভ্য ও সংস্কৃত বলতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান সমাজ এবং তার অর্থব্যবস্থা পূর্বোক্ত মানবীয় বৃত্তিসমূহের বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশের মধ্যে লালিত যান্ত্রিক মানুষের অটোমেটিক সমাজে নতুন করে মনুষ্যত্বের আবাহন করা তাই এক বিশ্বজনীন সমস্যা। বিরুদ্ধ পরিবেশের কাছে নিষ্ক্রিয়ভাবে নতি স্বীকার না করে বাঞ্ছিত লক্ষ্যাভিমুখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা জীবিত মানুষের লক্ষণ। আধুনিক ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রামদানের কর্মসূচীর সার্থকতা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে পূর্বোক্ত দুই কর্মসূচী এতদাভিমুখী শেষ পদক্ষেপ নয়। দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিককে এই সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে এবং স্থান কাল অনুযায়ী এর উপযুক্ত সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করে তাকে সাকার করতে হবে।

●

অঙ্গীকার

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দু হাতে যাদের অরি-নিসূদন
অমিত শক্তি বর্ধমান,
ঘরের শত্রু বিভীষণে তারা
করবেই ঠিক সায়েস্তা।
স্বাক্ষর দেয় শোণিতে যা'রা
শত্রুরে করে হতজ্ঞান,
জন্মভূমির এতটুকু ভূমি
ছাড়বে না তারা কক্ষনো।
বর্বর যারা নৃশংস যারা
ইতিহাসে লেখা দস্যুতা,
ক্ষুধার অন্ন জোটাতে পারে না
অতএব করে বিগ্রহ,
নিগ্রহ করে স্বদেশী স্বজনে
বিতাড়িত করে হংকঙে।
সারা বিশ্বের বিদ্রূপ তারা
শান্তির মাঝে উপদ্রব ;
নিন্দিত তারা সর্বথা,
সাম্রাজ্যের লোভে লোভে তারা
দু হাত বাড়ায় চৌদিকে।
লড়বে ভারত তাদের সঙ্গে
আপোস-বিহীন সংগ্রামে—
নজির তাহার ইতিহাসে আছে
পূর্ব এশীয় দিগন্তে।
"ইত্তেফাক" "এত্তামদ্"
আর দ্বিধাহীন 'কোরবানি'
এনেছে আজাদী এই দেশে,
রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল
বর্মা কোহিমা ইম্ফালে।
এই তো সেদিন লাল কেল্লায়
চমক লাগাল জওহরলাল ;
ভুলে যাইনিকো ইতিহাসে লেখা
বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ,
ভুলে যাইনিকো ত্যাগতপস্বী
গণমহারাজ গান্ধীকে,
মহানায়কের মহাবীর্যের
ভূমিকায় যার আবির্ভাব
সেই বীরেন্দ্র নেতাজী সুভাষে
তলোয়ার যার জলন্ত,
মেঘান্ধকারে দেখায়েছে পথ
দুরদুর্গম যাত্রাতে।

তাদের জীবন-অগ্নি-দহনে
দিকে দিকে জলে স্ফুলিঙ্গ,
সেই স্ফুলিঙ্গে বাড়বাগ্নির
প্রস্তুতি চলে প্রচণ্ড,
সেই স্ফুলিঙ্গে আহিতাগ্নির
গৃহে গৃহে আজ প্রজ্জ্বলন—
জনে জনে তার সমিধ্ যোগাবে
তারি তরে আজ অঙ্গীকার।

*

॥ প্রেমচেতনা : তৃতীয় অধ্যায় ॥

॥ মৃণালিনী : মঙ্গল-মুরতি ॥

৬

মৃণালিনী দেবী পরলোক গমন করলেন ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ। বিয়ে হয়েছিল ১২৯০ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ। সুতরাং দাম্পত্য জীবন অপূর্ণ ১৯ বৎসর। মৃত্যুকালে মৃণালিনী দেবীর বয়স ত্রিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নি। রবীন্দ্রনাথের বয়স সাড়ে একচল্লিশ। কবিজায়ার এই অকাল-প্রয়াণে 'অশ্রুসাগরে' যে 'জোয়ার' এসেছিল কবির কাব্যলোকে তা কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে রবীন্দ্ররসিক সমাজ আজও সম্পূর্ণ অবহিত নন। বরং গত ষাট বছর ধরে তাঁরা এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে রয়েছেন যে পত্নীবিয়োগে রবীন্দ্রনাথ 'স্মরণে'র প্রায়-অনুল্লেখযোগ্য সাতাশটি ছোট ছোট কবিতাই মাত্র লিখেছেন। এই অধ্যায়ের প্রথমেই আমরা জীবনীকারের উক্তিচতুষ্টয় উদ্ধার করেছি। তাতে দেখা গেছে যে, প্রভাতকুমার বলেছেন, স্ত্রীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে আঘাত পেয়েছিলেন তার "একমাত্র প্রকাশ" 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ।

জীবনীকারের এই সব উক্তিরই অনুসরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমালোচকগণ। 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা'য় নীহাররঞ্জন রায় লিখছেন, "কবির স্পর্শ-কাতর চিত্তে স্ত্রীর মৃত্যু নিশ্চয়ই খুব গভীর হইয়া বাজিয়াছিল, কিন্তু সুবিস্তৃত রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক "স্মরণ" গ্রন্থের কবিতাগুলি ছাড়া আর কোথাও স্ত্রী-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, একান্ত নিবিড় ব্যক্তিগত বিরহজনিত দুঃখ এই কবিতাগুলি ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, জীবনেও আর কোথাও কোনও প্রকাশ নাই।"[৮]

নীহাররঞ্জন কবির এই মিতভাষণের কারণ নির্ণয় করে বলেছেন, "যে-শোক, যে-দুঃখ একান্ত ব্যক্তিগত, একান্ত অন্তরগত তাহা চিরকাল তাঁহার অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেই তিনি অভ্যস্ত।"[৯]

'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা'-কার উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় আরেক পদ অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বলছেন :

"স্মরণের এই কয়টি কবিতা ছাড়া স্ত্রীবিয়োগের শোক তাঁহার আর কোনও সাহিত্য-সৃষ্টিতে ব্যক্ত হয় নাই।

"বিশ্ব-সাহিত্যে শোককাব্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 'স্মরণ'কে সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। শোক-কাব্যে বিচ্ছিন্ন ও বিলাপীর যে ব্যক্তিগত অংশ থাকে, তাহাকেই সার্বজনীন অনুভূতির মধ্য দিয়া একটা রসরূপ দেওয়াতেই উহার প্রধান সৌন্দর্য। কিন্তু এই কাব্যে ব্যক্তিগত অংশ অতি সামান্য, তিন চারিটি কবিতার বেশী নয়। * * *

"রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যে শোকের প্রকাশ অপেক্ষা সান্ত্বনার অংশই বেশী। অবশ্য অধিকাংশ শোককাব্যে সান্ত্বনার অংশ সর্বশেষে আসে, কিন্তু এই কাব্যে শোককে উপলক্ষ্য করিয়া কবি মৃত্যুর দানকে গ্রহণ করিয়া বৃহত্তর সান্ত্বনার আনন্দ লাভ করিতেছেন। যে বৃহত্তর লাভের আনন্দে কবি শোক ভুলিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা একান্তই কবির মনোগত লাভ, উহা বিশ্বের সাধারণ

রসনারীচিত্তে বেশী প্রতিধ্বনি জাগাইতে পারে না। মানুষ-কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে দার্শনিক ও অধ্যাত্ম-রসিক রবীন্দ্রনাথের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছেন।

"অবশ্য অন্যান্য কবিদের নিকট শোক কাব্যের উত্তম বিষয়বস্তু হইলেও রবীন্দ্রনাথের মতো কবির নিকট আমরা শোকের কোনো কাব্যবিলাস আশা করিতে পারি না। প্রথম কারণ, তাঁহার ব্যক্তিগত শোককে তিনি নিভৃত অন্তরে চাপিয়া রাখিতে ভালোবাসেন, কোনো দিন প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার নিকট দুঃখ-শোকের কোনো স্থায়ী অস্তিত্ব নাই, এবং জন্ম-মৃত্যু একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। * * * তৃতীয় কারণ, নৈবেদ্য-যুগের পরিবর্তিত মানসিক অবস্থা। জগৎ ও জীবনের রূপলোক ও রসলোক হইতে বিদায় লইয়া, এবং চিত্তকে শান্ত, সংযত ও ত্যাগমুখী করিয়া কবি অধ্যাত্ম-সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন।"[১০]

অন্যে পরে কা কথা। রবীন্দ্রনাথের পরমাত্মীয় কৃষ্ণ কৃপালনি ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে 'স্মরণে'র কবিতাগুলির উচ্ছ্বাসহীনতার একটি মনস্তাত্ত্বিক হেতু নির্ণয় করে বলেছেন, কুড়ি বছর দাম্পত্য জীবন যাপনের পর উদ্দাম ভাবাবেগের প্রকাশ প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক নয়। তিনি বলছেন, "Some critics have noted with regret a lack of adequate passion in these elegies, but they must be very naive indeed who imagine that a man's feeling for his wife, after twenty years of living together, should still palpitate with unrestrained passion."[১১]

"naive indeed"!—কৃপালনি তাঁর দাদাশ্বশুরের চিঠিপত্রগুলি যদি ভাল করে উলটেপালটে দেখতেন তাহলে এই বক্রোক্তি প্রয়োগের পূর্বে অন্ততঃ একটু সময়ের জন্যেও চুপ করে চিন্তা করতেন। কাব্যজায়ার তিরোধানের মাত্র এক বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ আঠারো বছর দাম্পত্য জীবন যাপনের পরও কবি তাঁকে লিখছেন, "ভাই ছুটি, বড় হোক্ ছোট হোক্, ভাল হোক্ মন্দ হোক্, একটা করে চিঠি আমাকে রোজ লেখ না কেন? ডাকের সময় চিঠি না পেলে ভারি খালি ঠেকে।"[১২]

এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে আমরা প্রথম খণ্ডে বলেছিলাম, "বিবাহের কুড়ি(?) বৎসর পরেও যে-স্বামী তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে 'রোজ একটা করে চিঠি' পাবার জন্য আকুল হয়ে থাকেন, স্ত্রীর প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আকর্ষণ সম্পর্কে অন্য কোন প্রমাণ-পত্রী খুঁজে দেখা নিতান্ত অনাবশ্যক।" তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতকার ও রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচক-গণের এই সব হাস্যকর মন্তব্য দেখে শুধু একটি কথাই বলতে ইচ্ছা হয়, কবি, তুমি আমাদের ক্ষমা কর, আমরা জানি না আমরা কী প্রলাপ বকে চলেছি।

৭

বস্তুতঃ, এই সব বিভ্রান্তিকর উক্তির মূলে একটিমাত্র ধারণাই কাজ করে চলেছে যে, কবিজায়ার তিরোধানের পরে রবীন্দ্রনাথ 'স্মরণে'র ওই সাতাশটি কবিতামাত্রই লিখেছেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই চরিতকার ও সমালোচকগণ নিজ নিজ মনঃপ্রকর্ষ অনুসারে নানা যুক্তির ইন্দ্রজাল রচনা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসংযত কবি হতে পারেন, কিন্তু পত্নীবিয়োগে তাঁর হৃদয় শোকাঘাতে অভিভূত হয় নি, এ অনুমান সত্যের বিপরীত। 'স্মরণের'ই ২৫-সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন, 'জোয়ার এসেছে অশ্রুসাগরে।' এবং তা বাঁধ ভেঙে কূল ছাপিয়ে উঠছে।—

জাগো রে জাগো রে চিত্ত জাগো রে
জোয়ার এসেছে অশ্রুসাগরে।
কূল তার নাহি জানে,
বাঁধ তার নাহি মানে,
তাহারি গর্জনগানে জাগো রে।
তরী তোর নাচে অশ্রুসাগরে।

মানুষ যতই সংযত ও ধীর প্রকৃতির হোক না কেন, জীবনসঙ্গিনীর মৃত্যুতে তার অশ্রুসাগর কূল ছাপিয়ে বাঁধ ভেঙে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে—এই তো স্বাভাবিক। মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশে ইন্দুমতীবিয়োগে ধীর-চিত্ত মহারাজ অজের শোককাতরতার বর্ণনায় বলেছেন:

বিললাপ স বাষ্পগদ্গদং
সহজামপ্যপহায় ধীরতাম্।

অভিতপ্তময়োঽপি মার্দবং
ভজতে কৈব কথা শরীরিষু ॥ ৮।৪৩ ॥

অর্থাৎ, 'গতপ্রাণা প্রিয়তমার দেহ অঙ্কে স্থাপন করে মহারাজ অজ স্বকীয় প্রকৃতিসিদ্ধ ধৈর্য পরিহার করে বাষ্প-বিজড়িত কণ্ঠে বিলাপ করতে লাগলেন। অতি কঠিন লৌহও যখন অনল-সন্তাপে বিগলিত হয় তখন দেহধারী মানুষের আর কথা কি?' পত্নীবিয়োগে রবীন্দ্রনাথ শোকোচ্ছ্বাসে অভিভূত হন নি, অথবা নিজের ব্যক্তিগত শোককে তিনি বাইরে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নি, এ কথা একেবারেই সত্য নয়। মৃণালিনী দেবীর তিরোধানের সময় রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক। তখন বঙ্গদর্শন মাসের শেষভাগে প্রকাশিত হত। ৭ই অগ্রহায়ণ সম্পাদকের স্ত্রীবিয়োগ হয়। অগ্রহায়ণ-সংখ্যা বঙ্গদর্শনকে বলা যেতে পারে সম্পাদকের স্ত্রীবিয়োগ সংখ্যা। ওতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ গল্প কবিতায় সবশুদ্ধ ষোলটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে নয়টি রবীন্দ্রনাথের লেখা তাঁর পত্নীবিয়োগজনিত শোককাব্য। রবীন্দ্রনাথের যখন পত্নীবিয়োগ হয় তখন তাঁর পিতৃদেব বেঁচে আছেন। অগ্রজগণ রয়েছেন চোখের সামনে। কিন্তু কাব্যে এই শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে কবি বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন নি। বঙ্গদর্শনে এই শোককাব্য রচনা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে পরবর্তী ভাদ্র মাস পর্যন্ত। এই কয় মাসে রবীন্দ্রনাথ সবশুদ্ধ আটত্রিশটি শোক-কবিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে মাঘের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় দশটি, ফাল্গুনে নয়টি। কিন্তু পত্নীবিয়োগজনিত কবির বেদনা এখানেই স্তব্ধ হয়ে থাকে নি। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর তৃতীয় বৎসর শেষে কবি কালিদাসের অজবিলাপের নয়টি শ্লোকের অনুবাদ করে যেন পত্নীতর্পণযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়ে গিয়েছেন।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই কবিতাগুলি থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, কবির বাঁধভাঙা অশ্রুচ্ছ্বাস কূল ছাপিয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ, পত্নীবিয়োগজনিত শোককাব্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ দেশী বিদেশী কোনও কবিরই পশ্চাতে নন। বরং সকলের না হলেও, অনেকেরই পুরোভাগে তাঁর স্থান।

৮

কবির পত্নীবিয়োগজনিত যে কবিতাগুলি বঙ্গদর্শনে ১৩০৯ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩১০ ভাদ্র মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে নিম্নে তার সংখ্যানুক্রমিক তালিকা সংকলিত হল।

বঙ্গদর্শন অগ্রহায়ণ ১৩০৯ :

১ মুক্ত পাখীর প্রতি, ২ দুর্ভাগা, ৩ প্রতীক্ষা, ৪ পথিক, ৫ শেষ কথা, ৬ প্রার্থনা, ৭ আহ্বান, ৮ পরিচয়, ৯ মিলন।

পৌষ ১৩০৯ :

১০ নারী, ১১ বিশ্বদোল।

মাঘ ১৩০৯ :

১২ লক্ষ্মী-সরস্বতী, ১৩ কথা, ১৪ নবপরিচয়, ১৫ পূর্ণতা, ১৬ সার্থকতা, ১৭ সঞ্চয়, ১৮ রচনা, ১৯ সন্ধান, ২০ অশোক, ২১ জীবনলক্ষ্মী।

ফাল্গুন ১৩০৯ :

২২ জাগরণ, ২৩ বসন্ত, ২৪ উৎসব, ২৫ প্রেম, ২৬ পূজা, ২৭ সন্ধ্যাদীপ, ২৮ গোধূলি, ২৯ সম্ভোগ, ৩০ দ্বৈত-রহস্য।

চৈত্র ১৩০৯ :

৩১ ঝরণাতলা।

বৈশাখ ১৩১০ :

৩২ ভোরের পাখী, ৩৩ চৈত্রের গান।

জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ :

৩৪ সন্ধ্যা, ৩৫ যাত্রিণী।

আষাঢ় ১৩১০ :

৩৬ প্রাপ্ত, ৩৭ মেঘোদয়ে।

ভাদ্র ১৩১০ :

৩৮ চিঠি।

এই আটত্রিশটি কবিতার পঁচিশটি 'স্মরণ' গ্রন্থে এবং তেরটি 'উৎসর্গ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৩১০ বঙ্গাব্দে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্য-সংকলন 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত 'স্মরণ' গ্রন্থের প্রথম তিনটি কবিতা 'কাব্যগ্রন্থে'র "স্মরণ" বিভাগে এবং বাকিগুলি "স্মরণ" বিভাগে সংকলিত হয়েছিল। 'উৎসর্গে' সংকলিত বঙ্গদর্শনের ১৩টি কবিতার কয়েকটি 'কাব্যগ্রন্থে'র "রূপক" বিভাগে মুদ্রিত হয়। বঙ্গদর্শনে

প্রকাশিত কবির পত্নীবিয়োগের প্রথম কবিতা "মুক্ত পাখির প্রতি"। ওটিও "রূপক" বিভাগে মুদ্রিত হয়েছিল। বিভ্রান্তি সৃষ্টির এও একটি প্রধান কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মোহিতলাল মজুমদার "মুক্ত পাখির প্রতি" কবিতাটিকে স্বদেশপ্রেমের কবিতারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ "রূপক" বিভাগের অর্থবিশ্লেষণ করে "প্রবেশক" কবিতায় কবি লিখেছেন :

> ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
> রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
> অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
> সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

অর্থাৎ, সেই সব কবিতাই "রূপক" পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে যেগুলিতে ভাব এমন রূপ পরিগ্রহ করেছে যাতে "সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা" সার্থক হয়ে উঠেছে। কাজেই, 'রূপক' নামকরণ ভাব বা বিষয়বস্তুগত বিন্যাসের ফল নয়, তা প্রকরণগত বিন্যাসেরই পরিণাম। সেইজন্যেই "মুক্ত পাখির প্রতি," "ভোরের পাখি" এবং "ঝরণাতলা"র মত কবিতাও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত আটত্রিশটি কবিতা 'স্মরণ' এবং 'উৎসর্গে' কিভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তা জানা অত্যাবশ্যক। বঙ্গদর্শনে প্রকাশের ক্রমিক সংখ্যারই এখানে অনুসরণ করা হল :

বঙ্গদর্শনের ক্রমিক সংখ্যা	শিরোনামা	গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা
১	মুক্ত পাখির প্রতি	উৎসর্গ ৩১
২	দুর্ভাগা	উৎসর্গ ৪১
৩	প্রতীক্ষা	স্মরণ ৩
৪	পথিক	উৎসর্গ ৪২
৫	শেষ কথা	স্মরণ ৪
৬	প্রার্থনা	স্মরণ ৫
৭	আহ্বান	স্মরণ ৬
৮	পরিচয়	স্মরণ ৭
৯	মিলন	স্মরণ ৮
১০	নারী	উৎসর্গ ৪৩
১১	বিষদোল	উৎসর্গ ৩৮
১২	লক্ষীসরস্বতী	স্মরণ ৯
১৩	কথা	স্মরণ ১০
১৪	নবপরিচয়	স্মরণ ১১
১৫	পূর্ণতা	স্মরণ ১২
১৬	সার্থকতা	স্মরণ ১৩
১৭	সঙ্কল্প	স্মরণ ১৪
১৮	রচনা	স্মরণ ১৫
১৯	সন্ধান	স্মরণ ১৬
২০	অশোক	স্মরণ ১৭
২১	জীবনলক্ষ্মী	স্মরণ ১৮
২২	জাগরণ	স্মরণ ২৫
২৩	বসন্ত	স্মরণ ১৯
২৪	উৎসব	স্মরণ ২০
২৫	প্রেম	স্মরণ ২১
২৬	পূজা	স্মরণ ২৬
২৭	সন্ধ্যাদীপ	স্মরণ ২৩
২৮	গোধূলি	স্মরণ ২৪
২৯	সম্ভোগ	স্মরণ ২৭
৩০	দ্বৈতরহস্য	স্মরণ ২২
৩১	ঝরণাতলা	উৎসর্গ ৪৪
৩২	ভোরের পাখি	উৎসর্গ ১
৩৩	চৈত্রের গান	উৎসর্গ ৩৩
৩৪	সন্ধ্যা	উৎসর্গ ৩৬
৩৫	যাত্রিণী	উৎসর্গ ৪০
৩৬	গ্রাম	উৎসর্গ ৩৪
৩৭	মেঘোদয়ে	উৎসর্গ ৩৩
৩৮	চিঠি	উৎসর্গ ১১

৯

'স্মরণ' ও 'উৎসর্গে'র এই কবিতাগুলির আপেক্ষিক বিচারে দেখা যাবে যে আয়তনের দিক দিয়ে স্মরণের সাতাশটি কবিতার চেয়ে উৎসর্গের তেরোটি কবিতা অনেক বড়। স্মরণের সাতাশটি কবিতার পঙ্ক্তিসংখ্যা সবশুদ্ধ ৪৮০, আর উৎসর্গের তেরোটি কবিতার পঙ্ক্তিসংখ্যা ৬৯৩। পত্নী-বিয়োগে রবীন্দ্রনাথ এই ১১৭৩ পঙ্ক্তি কবিতা রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হবে 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের "শেষ খেয়া", "গোধূলি লগ্ন" ও "প্রভাতে"

—এই তিনটি কবিতা। তাদের মোট পঙ্ক্তিসংখ্যা ১২৩। তাহলে সবশুদ্ধ দাঁড়াল স্মরণের ৪৮০, উৎসর্গের ৬৯৩, এবং খেয়ার ১২৩—অর্থাৎ ১২৯৬ পঙ্ক্তি।

এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত 'শিশু'র কয়েকটি কবিতা। যেখানে মাতাপুত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বাৎসল্য-রস উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম।"[১৩] আর "খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠমধুর সম্বন্ধ সেইটি আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী—তখন খুকী ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল। সেইজন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রাঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ ও বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারি নে।"[১৪]

অবশ্য 'শিশু'র কবিতাগুলিতে করুণ-রস নয়, বাৎসল্য-রসেরই প্রকাশ ঘটেছে। তাই শিশুর কবিতাগুলিকে পত্নীবিয়োগজনিত প্রত্যক্ষ শোককাব্যের অন্তর্ভুক্ত আমরা করতে চাই নে। কিন্তু খেয়ার প্রথম আট-দশটি কবিতা, বিশেষ করে "শেষ খেয়া" ও "গোধূলি লগ্ন"—শোককাতর কবিচিত্তের আকাশে সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রাঙিয়ে উঠেছে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ ও বর্ণ আকর্ষণ করে কবির অশ্রুবাষ্প যে বিহ্বল বেদনাকে প্রকাশ করেছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে স্মরণ ও উৎসর্গের কবিতাগুলির। খেয়ার "প্রভাতে" কবিতাটিও কবির 'দুখযামিনীর বুকচেরা ধন'।

শিল্পরূপের দিক দিয়ে স্মরণের চেয়ে উৎসর্গ ও খেয়ার কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। স্মরণের সাতাশটি কবিতার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ আঠারোটি সনেট, একতৃতীয়াংশ, অর্থাৎ নটি ভিন্নতর স্তবকবন্ধে গ্রথিত। তন্মধ্যে চারটি ষণ্মাত্রিক ও একটি পঞ্চমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রীতির কবিতা। উৎসর্গের "ভোরের পাখী", "মেঘোদয়ে", "গ্রাম", "চৈত্রের গান", "সন্ধ্যা" ও "বকুলতলা" এবং খেয়ার "শেষখেয়া" কবিতাটি খাসাঘাতপ্রধান রীতির বিচিত্র স্তবকবন্ধে রচিত। তন্মধ্যে 'গ্রামে'র স্তবক ছয় পঙ্ক্তির, কিন্তু 'মেঘোদয়ে'র স্তবক আঠারো পঙ্ক্তির। চৈত্রের গান ও সন্ধ্যা কবিতাযুগল খাসাঘাতপ্রধান রীতির ত্রিপদীবন্ধে বিরচিত। পঞ্চমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রীতিতে লেখা হয়েছে উৎসর্গের "চিঠি" কবিতাটি। ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রীতির কবিতা হল উৎসর্গের মুক্তপাখির প্রতি, বিষদোল, দুর্ভাগা, পত্রিক, নারী এবং খেয়ার প্রভাতে ও গোধূলি লগ্ন। সপ্তমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান রীতিটিকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে অল্পই ব্যবহার করেছেন। তন্মধ্যে দুটি মৃণালিনী দেবীকে নিয়ে লেখা। প্রথম কবিতাটি হল 'মানসী'র "বধূ"; দ্বিতীয় কবিতাটি 'উৎসর্গে'র "যাত্রিণী"। পত্নীবিয়োগে শোককাতর কবিচিত্তের সার্থকতম প্রকাশ এই কবিতাটি। রবীন্দ্র-কাব্যালোকে অনাদৃত এই কবিতাটি এই প্রসঙ্গে সমগ্র-ভাবেই উদ্ধারযোগ্য :

যাত্রিণী

মন্ত্রে সে যে পূত
রাখির রাঙা সুতো,
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে
আজ কি আছে সেটি হাতে ?
বিদায় বেলা এলো মেঘের মতো ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে দুহাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষু দুটি ছেপে
ভরে যে এল জলধারা।
আজকে বসে আছি পথের একপাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে,
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথহারা ;—
সেই যে বামহাতে একটি সরু রাখি
আধেক রাঙা, সোনা আধা
আজো কি আছে সেটি বাঁধা ?

পথ যে কতখানি
কিছুই নাহি জানি,
মাঠের গেছে কোন্ শেষে,
চৈত্র ফসলের দেশে।
যখন গেলে চলে তোমার গ্রীবামূলে

দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে ছিল খুলে,
মাল্যখানি গাঁথা সাঁঝের কোন্ ফুলে
লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে।
একটুখানি তুমি দাঁড়িয়ে যদি যেতে,
নতুন ফুলে দেখো কানন ওঠে মেতে।
দিতেম ত্বরা করে নবীন মালা গেঁথে
কনকচাঁপা বনছায়ে।
মাঠের পথে যেতে তোমার মালাখানি
প'ল কি বেণী হতে খলে ?
আজকে ভাবি তাই বসে।

নূপুর ছিল ঘরে
গিয়েছ পায়ে পরে,
নিয়েছ হেথা হতে তাই,
অন্যে আর কিছু নাই।
আকুল কলতানে শতেক রসনায়
চরণ ঘেরি তব কাঁদিছে করুণায়,
তাহারা হেথাকার বিরহ বেদনায়
মুখর করে তব পথ।
জানি না কী এত যে তোমার ছিল ত্বরা,
কিছুতে হল না যে মাথার ভূষা পরা,
দিতেম খুঁজে এনে সিঁথিটি মনোহরা
রহিল মনে মনোরথ।
হেলায় বাঁধা সেই নূপুর দুটি পায়ে
আছে কি পথে গেছে খুলে,
সে-কথা ভাবি তরুমূলে।

অনেক গীত গান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সাঁঝে
অনেক অবসরে কাজে।
তাহারি শেষ গান আধেক লয়ে কানে
দীর্ঘপথ দিয়ে গেছ সুদূর পানে,
আধেক জানা সুরে আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুন গুন স্বরে।
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো,
ফুটল তব পূজা-তরে।
মাঠের কোনখানে হারাল শেষ সুর
যে গান নিয়ে গেলে শেষে,
ভাবি যে তাই অনিমেষে।

সপ্তমাত্রিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দকে বলা যেতে পারে বাংলা মন্দাক্রান্তা ছন্দ। তিন চারের অক্ষর দিয়ে গড়া দুটি পর্বাঙ্গে ওর প্রতিটি পর্ব বেদনার বিহ্বলতাকে যেন বিমথিত ও আলোড়িত করে তোলে। বিলাপচারী শোককাতরতার এর চেয়ে যোগ্যতর পর্বপর্বাঙ্গ আর নেই। বস্তুতঃ, যাত্রিণী কবিতার স্তবকচতুষ্টয় অশ্রুক্ষরা বেদনায় বিহ্বল। শোকের নিবিড়-ঘনতায় ঐকান্তিক, অথচ আন্তরিকতায় অকৃত্রিম। 'রাখির রাঙা সুতো'র প্রতীকটি দাম্পত্যচেতনার পবিত্রতম ঘনিষ্ঠতম বন্ধনসংকেত।

১০

পত্নীবিয়োগে রচিত রবীন্দ্রনাথের যে তেতাল্লিশটি কবিতার কথা [স্মরণ ২৭, উৎসর্গ ১৩, খেয়া ৩] আমরা বলছি, তার প্রথমতম কবিতা হল 'মুক্ত পাখির প্রতি'। মুক্ত পাখি ও খাঁচার পাখির রূপকে এর ভাবসত্যের উন্মেষ হয়েছে বলে কবিতাটি কাব্যগ্রন্থে 'রূপক' পর্যায়ে সংকলিত হয়েছিল। কবিতাটি শোকার্ত রবীন্দ্রচিত্তে আকাশের প্রথম দান। পত্নীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছিলেন একলা নির্জন অন্ধকার ছাদে। শোকের ঘনীভূত কালিমায় তাঁর মানস-আকাশ আর মহাবিশ্বের আকাশ এক হয়ে গিয়েছিল। দেহমুক্ত প্রাণ মুক্ত-পাখি হয়ে সেই তমসাচ্ছন্ন আকাশে মৃত্যুর অন্ধকার পেরিয়ে অমৃতলোকের আলোক-তীর্থের যাত্রী হয়েছে। দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ কবিপ্রাণ হয়েছে খাঁচার পাখি। মুক্ত পাখিকে ডেকে খাঁচার পাখি বলছে :

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্-দিগন্ত ঢাকি।—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে ওগো,
আমরা খাঁচার পাখি,—
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,

আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর ?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া ?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া ?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি ?—
তোমা পানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখি।

পত্নীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু ওই একটি কবিতাই লিখতেন তাহলেও অনায়াসে বলা যেত পত্নীবিয়োগ-বেদনায় তিনি কী গভীর ভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু শুধু একটি নয়, তেতাল্লিশটি কবিতার ওটি একটি মাত্র। ১২৯৬ পঙ্ক্তির মাত্র ৪৮ পঙ্ক্তি।

শোকের প্রথম আঘাতের বিহ্বলতা স্মরণের ১, ৪ ; উৎসর্গের ৩৩ (মেঘোদয়ে), ৪০ (যাত্রিণী), ৪১ (দুর্ভাগা) ও ৪২ (পথিক) সংখ্যক কবিতায় ; এবং খেয়ার "শেষ খেয়া"য় প্রকাশিত হয়েছে। স্মরণের প্রথম কবিতায় কবি তাঁর উপাস্যদেবতাকে সম্বোধন করে বলছেন :

আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
কর গো আড়াল করো।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হতে হেথা হরো।
প্রভাত জগৎ হতে মোরে ছিঁড়ি
করুণ আঁধারে লহো মোরে ঘিরি,
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক
তব স্নেহবাহুডোর।

স্মরণের চতুর্থ কবিতায় কবি বলছেন :

তখন নিশীথ রাত্রি ; গেলে ঘর হতে
যে পথে চলনি কভু সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো বলিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায়-বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্বমাঝে বাহিরিলে একা,
অন্ধকারে খুঁজিলাম, না পেলাম দেখা।
মঙ্গল-মুরতি সেই চিরপরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত।

বাইচরণে গড়া তিনটি স্তবকে রচিত এই কবিতার শেষ স্তবকের অন্তিম চতুষ্কে কবি বলছেন :

আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে—
হে কল্যাণী, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,
মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা তরে ?

তীব্র বিচ্ছেদবেদনার মধ্যেও এই পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষাই কবিচিত্তে বেদনাকে অনতিদুঃসহ করেছে। উৎসর্গের ৩৩-সংখ্যক কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত। কবিতাটির নাম "মেঘোদয়ে", বেরিয়েছিল বঙ্গদর্শনে ১৩১০ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে। পত্নীবিয়োগের পরে সেই প্রথম আষাঢ় এল কবিজীবনে। কবি বলছেন :

দেখো চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
আর করো না দেরি।
ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরণ,
দাঁড়াও তোমায় হেরি।
দাঁড়াও গো ওই আকাশ কোলে,
দাঁড়াও আমার হৃদয় দোলে,
দাঁড়াও গো ওই শ্যামলতৃণ 'পরে,
আকুল চোখের বারি বেয়ে
দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে,
জন্মে জন্মে যুগে যুগান্তরে।
অমনি করে ঘনিয়ে তুমি এসো,
অমনি করে তড়িৎ-হাসি হেসো,
অমনি করে উড়িয়ে দিয়ো কেশ।
অমনি করে নিবিড় ধারাজলে
অমনি করে ঘন তিমিরতলে
আমায় তুমি করো নিরুদ্দেশ।

উৎসর্গের ৪১-সংখ্যক কবিতাটির রচনায় গানের ঢং এসে গেছে। পত্নীবিয়োগে কবি যে-সব গান রচনা করেছিলেন তার নিশ্চিত ও নিঃসংশয় সন্ধান সম্ভব কিনা রবীন্দ্র-সংগীত-বিশেষজ্ঞগণ বলতে পারেন। কিন্তু সে অনুসন্ধিৎসা যে একান্ত-বাঞ্ছনীয় তা বলাই বাহুল্য। আমাদের ধারণা সেই শোক-গীতগুলির প্রথম রচনা উৎসর্গের এই কবিতাটি। "দুর্ভাগা" নামে বেরিয়েছিল বিরহের প্রথম মাসে, অগ্রহায়ণের (১৩০৯) বঙ্গদর্শনে।

পথের পথিক করেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।

কবি বলছেন :

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে
সেই আলো মোর সেই আলো।
সাথি যে আছিল নিলে কাড়ি,
কী ভয় লাগালে, গেল ছাড়ি।
একাকীর পথে চলিব জগতে
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

এই একাকীর পথে চলার কথাই প্রকাশিত হয়েছে উৎসর্গের ৪২-সংখ্যক কবিতায়। এই কবিতাটিও "পথিক" শিরোনামায় ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল। কবিতাটির প্রথম পঙ্ক্তি—'আলো নাই, দিন শেষ হল, ওরে পান্থ, বিদেশী পান্থ।' কবিতাটির তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে কবিমানসের পথক্লান্ত অসহায় করুণ অবস্থাটি ফুটে উঠেছে :

রজনী আঁধার হয়ে আসে, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
ওই যে গ্রামের 'পরে
দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দীপহীন পথে কী করিবি একা
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

এত বোঝা লয়ে কোথা যাস, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
নামাবি এমন ঠাঁই
পাড়ায় কোথা কি নাই ?
কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

এই মনোভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা "শেষ খেয়া"র অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পথক্লান্ত পথিক দিনশেষে বসে আছে খেয়াপারের ঘাটে। অন্ধকার নদীস্রোতে একটি-দুটি করে নৌকো ভেসে যাচ্ছে। কবি বলছেন :

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।

পথক্লান্ত কবিচিত্ত দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ছায়ার মায়ায় আবিষ্ট হয়েছে। 'ঘোমটা-পরা' কথাটি বিশেষ ভাবব্যঞ্জক। আজ তাঁর চিত্তে 'কাজভাঙানো গান' বেজে উঠেছে। কবি বলছেন, 'ওপারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্ মায়া গেয়ে গেল কাজভাঙানো গান।' এই চিত্রকল্পটি স্মরণের ২১-সংখ্যক কবিতাকে ম[illegible] করিয়ে দেয়—

আমার দিনান্ত-মাঝে কঙ্কণের কনক কিরণ
নিদ্রার আঁধারপটে আঁকি দিবে সোনার স্বপন

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় উৎসর্গের "মেঘোদয়ে" কবি[illegible] দুটি পঙ্ক্তি—

ওগো তোমার আনো খেয়ার তরী,
তোমার সাথে যাব অকূল 'পরি।

মনে পড়ে উৎসর্গের ৩৪-সংখ্যক "গ্রাম" কবিতাটি কবি বলছেন :

পালের তরি কত যে যায় বহি দখিন বায়ে,
দূর প্রবাসের পথিক এসে বসে বকুলছায়ে ;
পারের যাত্রিদলে
খেয়ার ঘাটে চলে,

মনে পড়ে উৎসর্গের ৪১-সংখ্যক "দুর্ভাগা" কবিতার অন্তর[illegible] একটি চিত্রকল্প—

ঘাটে বাঁধা ছিল খেয়া-তরি,
তাও কি ডুবালে ছল করি ?

এর পর আর "শেষ খেয়া"র অর্থ আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না। দিনান্তে ক্লান্ত নিঃসঙ্গ এবং লক্ষ্যহারা কবিচিত্তের হাহাকার ওই কবিতায় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। কবি বলছেন :

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর-পানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
ঘরেও নহে, পারেও নহে যেজন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।

ফুলের বার নাইকো আর ফসল যার ফলল না,
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো সাঁঝের আলো জ্বলল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।

পত্নীবিয়োগের ফলে রবীন্দ্র-কবিচিত্তে একদিন এমন নিঃসহায় নিঃসম্বল মুহূর্তটি এসেছিল এ কথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। 'দিনের আলো যার ফুরালো সাঁঝের আলো জ্বলল না'—এই রূপকল্পটির ব্যঞ্জনা বহুদূর প্রসারিত। যে গৃহলক্ষ্মী একদিন সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে কবির প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন আজ তিনি নেই। তাঁর অভাবে কবিগৃহ অন্ধকার। স্মরণের ২৩-সংখ্যক "সন্ধ্যাদীপ" কবিতায় কবি বলছেন :

বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্মকীর্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তূপাকার উদ্যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি ; নানা দিক হতে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির।

বলাই বাহুল্য, এসব কবিতায় কবিচিত্তে পত্নীবিয়োগজনিত নিঃসহায় রিক্ততার আর্তিই নিঃসঙ্কোচে নির্বারিত হয়েছে। কবির এই চেতনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে ইন্দুমতীর বিয়োগে অজের বিলাপচারী কাতরতা। অজ বলছেন, তুমি কি জান না যে, আমি শুধু নামমাত্রই পৃথিবীপতি, আমার যত কিছু আকর্ষণ, যত কিছু অনুরাগ, সে সমস্তই তোমাতে কেন্দ্রীভূত। ননু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ ॥ ৮।৫২ ॥

যার মধ্যে পুরুষের ভাবনিবন্ধনারতি সেই সুখদুঃখের অংশভাগিনী জীবনসঙ্গিনীর তিরোধানে দুর্বিষহ বেদনার একটি আনুষঙ্গিক চেতনা হল মৃত্যুকামনা। কবি "প্রতীক্ষা" কবিতায় [স্মরণ-৩] বলছেন :

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি লবে মোরে রথে,
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হতে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে।

১১

বিলাপচারী শোক স্বভাবতঃই অতীত-স্মৃতিচারী। উৎসর্গের ৩৪-সংখ্যক "গ্রাম" কবিতাটিতে কবির শোকার্ত চিত্তপটে স্মরণের তুলি নানা চিত্র রচনা করেছে। 'আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে।'

এই দিঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,
এই আঙিনা ডাকনামে তার জানে পরিচয়।
এই পুকুরে তারি
সাঁতার-কাটা বারি ;
ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণ-লেখাময়।

এই চিত্রটি পুনরায় 'মানসী'র "বধূ" কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দুটিরই ভাবানুষঙ্গ প্রায় এক।

'জীবনস্মৃতি' রচনার প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না।" বলেছেন, "জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে,—সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—সুতরাং, পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।"[১০] শোকাভিহত চিত্তের স্মরণ-সরণি অতিক্রমণের সময় কবির এই উক্তির কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

স্মরণের ১৬-সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন :

সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরে
চেয়ে দেখি একদৃষ্টে,—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছ সে-জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী।
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্মর-রাগিণী
তোমার সে কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার।
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজহস্তে করিছ বিস্তার
কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা।

আপনার পানে চেয়ে বসে বসে ভাবি এই কথা—
কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে,
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছে কাছে।

কত রাত্রিদিনের কত সাধ—কবিজায়ার কত অপূর্ণ বাসনা কবিকে ঘিরে আজ গুঞ্জরণ করে ফিরছে। তাঁর সকল কথা তিনি মুখ ফুটে বলতে পারেন নি। নিজেকে অজ্ঞাতবাসে রেখে সংসারকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। নিজের অধিকারের দাবি রেখেছিলেন সবার পশ্চাতে। কবি বলছেন :

মৌননেত্রে বলো তব জীবনের অসমাপ্ত কথা
ভাষাবাধাহীন বাক্যে। দেহমুক্ত তব বাহুলতা
জড়াইয়া দাও মোর মর্মের মাঝারে একবার—
আমার অন্তরে রাখো তোমার অন্তিম অধিকার।
[স্মরণ-১০।

জীবনে যিনি নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন তাঁর সকল পাওনা এখন থেকে কবিকে প্রতিদিন প্রতিশোধ করে দিতে হবে। আঁখি-সলিলে হবে তাঁর তর্পণ। কবি বলছেন :

আজিকে তুমি ঘুমাও আমি জাগিয়া রব দুয়ারে,
রাখিব জ্বালি আলো।
তুমি তো ভালো বেসেছ আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
আমার লাগি তোমার আর হবে না কভু সাজিতে,
তোমার লাগি আমি
এখন হতে হৃদয়খানি সাজায়ে ফুলরাজিতে
রাখিব দিনযামী।
[স্মরণ-২৬।

কবি তাঁর দেবতার চরণে নিজের দোষত্রুটির জন্যে ক্ষমা চেয়ে বলছেন :

তারে যাহা কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিছু
আজি সে-প্রেমের হার।
[স্মরণ-২।

১২

মানুষের সংসারে শোকদুঃখ যাই থাক না কেন, প্রকৃতির সংসারে ঋতুঋতুর লীলা অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকে। অগ্রহায়ণে কবিজায়ার তিরোধান; দু-তিন মাস না যেতেই এসেছে বসন্ত। কবি "বসন্তযাপন" প্রবন্ধে তাঁর সেদিনকার মনোভাব—শোকার্তচিত্তে বসন্তাগমের প্রভাবের কথা বললেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদর্শনের ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। কবি বলেছেন :

"দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাহ্নে প্রান্তরের মধ্যে নববসন্ত নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্যে মনুষ্য-জীবনের ভারি একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করিতেছি।...

"বাহিরে চারিদিকেই যখন হাওয়া-বদল, পাতা-বদল, রং-বদল, আমরা তখনো গোরুর গাড়ীর বাহনটার মতো পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমানভাবে টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তায় ধুলা উড়াইয়া চলিয়াছি। বাহক তখনো যে লড়ি লইয়া পাঁজরে ঠেলিতেছিল,—এখনো সেই লড়ি।...

"বসন্তের দিনে-যে বিরহিণীর প্রাণ হা হা করে, একথা আমরা প্রাচীন কাব্যেই পড়িয়াছি—এখন একথা লিখিতে আমাদের সংকোচ বোধ হয়, পাছে লোকে হাসে। * * * আমরা কি বসন্তের নিগূঢ় রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্প পল্লবের কেহই নই? তাহারা যে আমাদের ঘরের আঙিনাকে ছায়ায় ঢাকিয়া, গন্ধে ভরিয়া, বাহু দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা কি আমাদের এতই পর যে, তাহারা যখন ফুলে ফুটিয়া উঠিবে আমরা তখন চাপকান পরিয়া আপিসে যাইব—কোনো অনির্বচনীয় বেদনায় আমাদের হৃৎপিণ্ড তরুপল্লবের মতো কাঁপিয়া উঠিবে না?...

"হায়রে সমাজ-দাঁড়ের পাখি! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখদুটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল—তবু তোর পাখাদুটা আজ বদ্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম!"[১০]

প্রসঙ্গতঃ, এই উক্তিতে "হায়রে সমাজ-দাঁড়ের পাখি" —এই রূপকল্পটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার একটু প্রয়োজন আছে। "মুক্ত পাখির প্রতি" কবিতায় কবি নিজেকে বলেছেন 'খাঁচার পাখি'। এখানে খাঁচা

াখিই হয়েছে 'সমাজ-দাঁড়ের পাখি'। পাখির রূপকল্পটিই াবার ফিরে এসেছে উৎসর্গের প্রথম কবিতা "ভোরের াখি"র পরিকল্পনায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমাদের আবার ফরে আসতে হবে।

"বসন্তযাপন" প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে মরণে'র ১৯ ও ২০-সংখ্যক কবিতা এবং 'উৎসর্গে'র ৫-সংখ্যক "চৈত্রের গান" কবিতাটি। স্মরণের ১৯-সংখ্যক বিতাটির শিরোনামা "বসন্ত"। কবি বলছেন, পাগল সন্ত-দিন কতবার তাঁদের দুজনের ডাকে বীণাহাতে তিথির বেশে এসেছে। কবি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কবিজায়াও তার ডাকে সাড়া দেন নি। আজ কবির পাশে কবিজায়া নেই। আজ আবার এসেছে বসন্ত।—

আজ তুমি চলে গেছ, সে এল দক্ষিণ-বায়ু বাহি,
আজ তারে ক্ষণকাল ভুলে থাকি হেন সাধ্য নাহি।
আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি,
তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি।
[স্মরণ-১৯।

স্মরণের ২০-সংখ্যক কবিতার নাম "উৎসব"। কবি নিজেই বসন্তকে ডেকে বলছেন, 'এসো বসন্ত, এস আজ তুমি আমার দুয়ারে এস।' 'বেদনা আমার ধ্বনিত করিয়া কর তব উৎসব।'

সেই কলরবে অন্তর মাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া
দ্যুলোকে ভূলোকে বাঁধি এক দল
তোমরা করিবে যবে কোলাহল,
হাসিতে হাসিতে মরণের দ্বারে
বারে বারে দিবে নাড়া—
সেই কলরবে অন্তর মাঝে
পাব, পাব আমি সাড়া।

উৎসর্গের "চৈত্রের গান" কবিতায় কবি তাঁর কর্মহারা সৃষ্টিছাড়া মনকে সম্বোধন করে বলছেন :

আজকে নবীন চৈত্র মাসে
পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা,
আজ জেগেছে যে-সব ব্যথা
এই জীবনে নাইকো তাহার হেতু।

কবি বলছেন :

সোনার তুলি দিয়া লিখা
চৈত্রমাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্বধন-তরে।

গাছের পাতা যেমন কাঁপে
দখিন-বায়ে মধুর তাপে
তেমনি মম কাঁপছে সারা প্রাণ।
কাঁপছে দেহে কাঁপছে মনে
হাওয়ার সাথে আলোর সনে,
মর্মরিয়া উঠছে কলতান।
• • •
দূর আকাশের ঘুম-পাড়ানি
মৌমাছিদের মন-হারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া
ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান।

এই 'জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান', আর 'চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান' খেয়া কাব্যগ্রন্থের "শেষ খেয়া"র 'ওপারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্ মায়া গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গানে'র সুরটির সঙ্গেই একসূত্রে বাঁধা।

১৩

বিরহের দিনে প্রেমিকের চিত্ত যেমন অতীত-স্মৃতিচারী হয় তেমনি গভীর অনুধ্যানের মুহূর্তে সে-চিত্তে তত্ত্ব-চিন্তারও উদয় হয়। মৃত্যুতত্ত্ব, মিলনতত্ত্ব। উৎসর্গের ৩৮ সংখ্যক "বিশ্বদোল" কবিতায় কবি মৃত্যুতত্ত্বের কথা বলেছেন। মৃত্যু তো মহাকালের চিরকালের লীলা।—

ডান হাত হতে বাম হাতে লও
বাম হাত হতে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কে বা জানে।

এই তত্ত্বদৃষ্টিতে মৃত্যু তো বিলুপ্তি নয়। এই পরম বিশ্বাসেই কবি বলেন :

আছে তো যেমন যা ছিল।
হারায় নি কিছু ফুরায় নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল।
* * *
আছে সেই আলো আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।
এই মতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

'আছে সেই আলো, আছে সেই গান, আছে সেই ভালোবাসা।' পরম নাস্তিচেতনায় দাঁড়িয়ে এই অস্তিবাদ-ঘোষণার মধ্যেই প্রেমতত্ত্ব ও মিলনতত্ত্বের মূল কথাটি বলা হয়ে গেছে। কবিজায়া একদিন বধূবেশে তাঁর সংসারে এসেছিলেন। 'সে কি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ ?' কবি বলছেন, না, তা নয়,—

শুধু এক মুহূর্তের এ নহে ঘটনা,
অনাদি কালের এই আছিল মন্ত্রণা।
দোঁহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব দোঁহে,
বহুযুগ আসিয়াছি এই আশা বহে।
[স্মরণ-১৫ ।

দাম্পত্যমিলনের মধ্যে এই যুগলতত্ত্বই বিশ্বতত্ত্ব। স্মরণের "দ্বৈতরহস্য" কবিতায় এই তত্ত্বই অবিস্মরণীয় কাব্যরূপ পেয়েছে :

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
* * *
যে-ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ-গন্ধ-গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

১৪

দ্বৈতমিলনের সেই রহস্য-আভাস মিলনের চেয়ে বিরহের মধ্যেই স্ফুটতর হয়ে ওঠে। বিরহরসিক কবি বলেছেন, সঙ্গম ও বিরহের মধ্যে বিরহই অধিকতর কাম্য, কেন না সঙ্গে সেই একলা থাকে, বিরহে ত্রিভুবন সে-ময় হয়ে যায়। 'সঙ্গে সৈব তথৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।' এই ত্রিভুবন-তন্ময়-হয়ে-যাওয়া চেতনাকেই কবি অনুভব করেছেন স্মরণের ৬-সংখ্যক "আহ্বান" কবিতায়।

আজি বিশ্বদেবতার চরণ-আশ্রয়ে
গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক্‌ সিন্দুরের লেখা।
একান্তে বসিয়া আজি করিতেছি ধ্যান
সবার কল্যাণে হ'ক তোমার কল্যাণ।

৯-সংখ্যক "লক্ষ্মী-সরস্বতী" কবিতায় পাই :

হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর।
সরস্বতী-রূপ আজি ধরেছ মধুর,
দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদল-দলে।
মানস-সরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রচিছে তোমায়।
* *
সেই বিশ্বমূর্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মী-সরস্বতী-রূপে পূর্ণরূপ ধরে।

কিন্তু এতেই কবি তৃপ্ত নন। গৃহলক্ষ্মীকে বিশ্বলক্ষ্মী রূপে পাওয়ার মধ্যে কল্পনার প্রসার যতই থাক্‌, দেহধারী মানুষ তাতে পরিপূর্ণ সান্ত্বনা পেতে পারে না। সে দেহরূপের মধ্যেই পুনর্মিলনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মৃত্যুতীর্ণ এই পুনর্মিলনের চেতনাতেই কবির শোককাব্য একটি সার্থক পরিসমাপ্তি রচনা করেছে। তারই উপলব্ধি স্মরণের নানা কবিতায় ছড়িয়ে আছে। ৮-সংখ্যক "মিলন" কবিতায় কবি বলছেন :

মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা সনে
এ বিচ্ছেদ-বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।

১১-সংখ্যক "নবপরিচয়" কবিতায় কবি বলছেন :

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে। * * *
মরণের সিংহদ্বার দিয়া
সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া।

১৭-সংখ্যক "অশোক" কবিতায় পাই :

বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি
কে জানিত তব শোক সেইমতো করি
আনি দিবে অকস্মাৎ জীবনে আমার
বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার।

১৮-সংখ্যক কবিতায় তাই দেখি বিশ্বলক্ষ্মী আবার জীবন-লক্ষ্মী হয়ে কবিজীবনে ফিরে এসেছেন।—

সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী ;
আমার জীবনে আজি সাজাও তেমনি
নির্মল সুন্দর করে। * * *
* *
যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এস দ্বার খুলি ধীরে।
*

সেথা দুইজনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।

নিভৃত মন্দিরের পুজাগৃহে জীবনসঙ্গিনীকে নূতন করে আহ্বান করার এই বাসনাই ভাষা পেয়েছে উৎসর্গের ৪৩-সংখ্যক "নারী" কবিতায় :

সাঙ্গ হয়েছে রণ।
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন।
* *
স্নিগ্ধ-হসিত বদন-ইন্দু
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু,
মঙ্গল কয়ো, সার্থক করো
শূন্য এ মোর গেহ।
এসো কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থবারি।
* *
অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ
খোল হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
এলো-কেশপাশে শুভ্রবসনে
জ্বালাও পূজার বাতি।
এসো তাপসিনী নারী,
আনো তর্পণবারি।

এই নব-মিলনাভিলাষই নানা রহস্যানুভূতির মধ্য দিয়ে পুনর্মিলনের নব নব চেতনার স্তর রচনা করেছে। উৎসর্গের ১১-সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন :

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ।
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।

উৎসর্গের ৪৪-সংখ্যক "ঝরণাতলা" কবিতায় এই নবমিলন-রহস্যটি অতীন্দ্রিয় অনুভবের রূপকে প্রকাশিত হয়েছে। 'আমাদের এই পল্লীখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা।' সেখানে দেবদারুর কুঞ্জে রাখালেরা ধেনু চরায়। এই মায়াপল্লীতে ওই বনের ধারে ভুট্টাক্ষেতের পাশে ছায়াতলে যেখানে ঝরণায় জল ঝরে সেখানে ছিল কবিজায়ার নিবাস। কবি আজ আকাশে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করছেন :

ওগো তুমি কেমন আছ, আছ মনের সুখে?
খোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন্ মুখে?
নাইকো পাহাড়, কোনোখানে ঝরণা নাহি ঝরে,
তৃষ্ণা পেলে কোথায় যাবে বারি পানের তরে?

কবিজায়া বলছেন, সেই পল্লী, সেই পাহাড়, সেই ঝরণা সবই আছে। তখন কেঁদে কবি বলছেন, 'সবই আছে, আমরা তো নেই।'—কবির এই কাতরোক্তির উত্তর এল :

সে কহিল করুণ হেসে, "আছ হৃদয়-মূলে।"
স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝরণাকূলে।

কবিজায়ার সঙ্গে কবির এই নবমিলনের লগ্ন হল গোধূলি ও সন্ধ্যা। উৎসর্গের ৩৬-সংখ্যক "সন্ধ্যা" কবিতায় এই নব-মিলনের কথা কবি আমাদের শুনিয়েছেন। কবি পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে অস্তলোকের কাছাকাছি বসেছিলেন। তখন তাঁর মনে এলো সন্ধ্যামিলনের স্বপ্ন। কবি বলছেন :

মোর ভালে ঐ কোমল হস্ত
এনে দেয় গো সূর্য-অস্ত
এনে দেয় গো কাজের অবসান,
সত্য-মিথ্যা ভালোমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান।
* * *
যেমনি তব দখিন-পানি
তুলে নিল প্রদীপখানি
রেখে দিল আমার গৃহকোণে।
গৃহ আমার এক নিমেষে
ব্যাপ্ত হল তারার দেশে
তিমির তটে আলোর উপবনে।
আজি আমার ঘরের পাশে
গগনপারের কারা আসে
অঙ্গ তাদের নীলাম্বরে ঢাকি।
আজি আমার দ্বারের কাছে
অনাদি রাত স্তব্ধ আছে
তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি।

স্মরণের ২৩ ও ২৪-সংখ্যক "সন্ধ্যাদীপ" ও "গোধূলি" শীর্ষক কবিতায়ও একই চেতনা ভাষা পেয়েছে। এই চেতনাই অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে খেয়ার "গোধূলি লগ্ন" কবিতায়। গোধূলির আবির্ভাবে কবি বলছেন :

আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে।
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে
সোনার গগন রে।

বলাই বাহুল্য, স্মরণের ১১-সংখ্যক কবিতায় কবি মরণের সিংহদ্বার দিয়ে যার আবির্ভাবের কথা বলেছেন, যিনি কবিজীবনে "নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে নিঃশব্দ চরণপাতে" এসেছেন, তাঁর সঙ্গেই মিলনের জন্যে গোধূলি লগ্ন বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে।

এই নবমিলনের আশ্বাসেই প্রিয়ার মৃত্যুজনিত বিরহ-বেদনা এক অভিনব আনন্দের প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে। খেয়ার "প্রভাতে" কবিতাটি কবিহৃদয়ের সেই অশ্রুসরোবরে আনন্দ-পদ্ম-বিকাশেরই রহস্য-কাহিনী। কবিজায়ার তিরোভাবে কবির প্রথম কবিতা ছিল "মুক্ত পাখির প্রতি"। সেদিন দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে আকাশভুবন

গহন কালিমায় ছিল অবলুপ্ত। মৃত্যুর সেই তমসাতীরে দাঁড়িয়ে মুক্ত পাখির প্রতি কবির প্রার্থনা ছিল—

হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর।
সকল মেঘের ঊর্ধ্বে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি,
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখি।

বঙ্গদর্শনের ১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'উৎসর্গে'র প্রথম কবিতা—"ভোরের পাখি"তে কবি বলছেন:

এত আঁধার মাঝে তোমার
এতই অসংশয়।
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাক, "দাঁড়াও পথে,
সূর্য আসেন স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়।"
এত আঁধার মাঝে তোমার
এতই অসংশয়।

ভোরের পাখির এই অসংশয় আলোকের আহ্বানসংগীতেই বিরহবিদীর্ণ কবিহৃদয় সাড়া দিয়েছে। এই অনুভূতির কথাই খেয়ার "প্রভাতে" কবিতায় পরিস্ফুট। জীবনে আঁধার সত্য নয়, আলোই সত্য। 'জীবনস্মৃতি'র "মৃত্যুশোক" অধ্যায়ে পরম বেদনার মধ্যে দাঁড়িয়েই কবি এই সত্য ঘোষণা করেছেন। "প্রভাতে" কবিতায় কবি বলছেন:

এক রজনীর বরষণে শুধু
কেমন করে
আমার ঘরের সরোবর আজি
উঠেছে ভরে।
হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু-
সলিলমাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমনে রাজে।
একটি মাত্র শ্বেতশতদল
আলোক-পুলকে করে ঢলঢল
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিলমাঝে।

কবিজায়ার মৃত্যুতে শোকের অতল অশ্রুসিন্ধুতে নিমজ্জিত কবি অবশেষে পেলেন আলোক-পুলকে ঢলঢল-করা একটি মাত্র শ্বেতশতদল। মৃত্যুর অন্ধকার বিরহ-রজনী পেরিয়ে চিরমিলনের প্রভাতে এই পরম প্রাপ্তিতেই কবিহৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। কবি বলছেন:

আজি একা বসে ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি,
দুখযামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।
ইহারই লাগিয়া হৃদ্ বিদারণ,
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারই বদন
বক্ষে লেখি।
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।

এই হৃদ্‌বিদারণ 'এত ক্রন্দন' 'এত জাগরণ' পেরিয়ে অবশেষে জীবনরসিক কবি খুঁজে পেলেন অশ্রুসাগর-সলিলে উদ্ভাসিত অমলকান্তি হৃদয়ের আনন্দকমলটিকে। কবিজায়ার মৃত্যুর তমসাচ্ছন্ন অমানিশার অবসানে কবি-জীবনে ফুটে উঠল প্রভাত-আলোর শুভ্র শতদল-পদ্ম।

[ক্রমশঃ]

* * *

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

৮ দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৫১), প্রথম খণ্ড, পৃ° ২২৪।

৯ তদেব।

১০ প্রথম ওরিয়েণ্ট সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ° ৩৫৬-৩৫৭।

১১ Rabindranath Tagore: A Biography, দ্বি° ১৯৬২, পৃ° ১৯৭-৯৮।

১২ দ্রষ্টব্য, কবিমানসী-১, পৃ° ২৪৮।

১৩ মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা পত্র। দ্রষ্টব্য, কবি-মানসী-১, পৃ° ২৬৪।

১৪ তদেব। পৃ° ২৬৫।

১৫ জীবনস্মৃতি, দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী-১৭, পৃ° ২৬৩।

১৬ বিচিত্রপ্রবন্ধ, পৃ° ৮৫-৯০।

মেয়েরা পশম বোনে

উমা দেবী

মেয়েরা পশম বোনে।
আঙুলে আঙুলে চলে কত কারুশিল্পের চাতুরী,
হৃদয়ে তাদের আজ বেদনার নিবিড় মাধুরী—বোনে আর গল্প শোনে—
—"এ নেফার অধিবাসী বাস করে যে গহন পার্বত্য অঞ্চলে
সেখানে শৈলের শ্রেণী দুরারোহ সুকৃষ্ণ দুর্গম,
তবু সন্তানের চোখে মায়ের সে রূপ অনুপম,
হাজার অজানা ফুলে, পক্ব স্বাদু লক্ষ লক্ষ ফলে
নিত্য ভোজ অরণ্যমহলে।
সেখানে শত্রুর হানা অতর্কিতে—তাই সেরা সেরা
ছুটে গেছে বীর জোয়ানেরা।"
মেয়েরা পশম বোনে, আঙুলে আঙুলে দ্রুত শিল্পের চাতুরী
মনে মুখে বেদনার বিস্মিত মাধুরী।

—"ভারতে উত্তরপূর্ব সীমান্তপ্রদেশ
এই নেফা দুর্গম পর্বতময়,
পূর্বদক্ষিণের সীমারেখা ব্রহ্মদেশ
তিব্বত উত্তরপূর্বে পশ্চিমে ভুটান,—
চারিদিকে ঘিরে আছে অরণ্য বিস্ময়
প্রকৃতির অফুরন্ত দান।
কামেং, সুবনসিরি, সিয়াং, লোহিত,
তিরাপ—এ সব শুধু মানুষের মনগড়া নাম।
এ পাঁচ স্তম্ভে তো নয় অরণ্যের ভিত
পৃথিবী সুন্দর—তার বনশ্রেণী নয়নাভিরাম
হিমালয় উৎসভূমি—দক্ষিণে আসাম।
সেখানে গিয়েছে ছুটে বীর জোয়ানেরা
প্রোথন করেছে দর্পে সৈনিকের ডেরা।
বিদেশের দস্যু হানাদার
বুঝুক এবার।"

মেয়েরা পশম বোনে—বোনে আর গল্প শোনে—
চোখে আগুনের কণা সুনীল কাজল
মুখে হাসি—দৃষ্টি ভরা-স্বপ্নে সমুজ্জ্বল।
—"এই নেফা সৃষ্টি করে গেছে প্রাচীনেরা,
এ যেন স্বপ্নের দেশ স্মৃতিসৌধে ঘেরা।

ভগ্ন স্তূপ, শূন্য গুম্ফা, পরিত্যক্ত প্রাসাদের ধ্বংস অবশেষ
মূর্ত করে অতীতের সমৃদ্ধি অশেষ।
রাশি রাশি রত্নের সম্ভার
সাক্ষ্য দেয় সম্পদের কোনো একদার।
এই সেই দেশ যার রূপ পৌরাণিক
অমর কাহিনী যার রুক্মিণীহরণ,
পরশুরামের হাতে কুঠার-আঘাতে আকস্মিক
যেখানে পড়েছে ভেঙে মন্দিরের অবরুদ্ধ দ্বার—
তাম্রময়ী তাম্রেশ্বরী দেবীর আগার,
লক্ষ লক্ষ যাত্রী এসে তীর্থবারি করেছে বরণ।
উর্বশীর জন্মস্থান এই দেশ, তাই কি এমন মনোরম
তাই কি দেশের নাম—দেশের প্রাচীন নাম শ্রী-'উর্বশীয়ম্'?
পুরাণ পুরানো নয়—সে যে চির নূতনের দেশ
হৃদয়ে লুকানো থাকে যার লুপ্ত ঠিকানার নিশ্চিত উদ্দেশ।
—এখন সেখানে গিয়ে পৌঁছিয়েছে জোয়ানেরা বীর—
হানাদার শত্রুদের প্রাণ তাই ভয়েই অস্থির।"

মেয়েরা পশম বোনে—ভিজেখড়-মরাঘাস-সবুজ রঙের
ব্যালাক্লাভা, সোয়েটার, মোজা আর হাতের দস্তানা
মাপা-জোকা ঠিক-ঠাক ইঞ্চিমাপে টানা
এক তার দুই তার পশমের উল্টো-সোজা অনেক ঢঙের
মেয়েরা পশম বোনে—বোনে আর গল্প শোনে
—"এই নেফা, ভারতের সঙ্গে যার নাড়ীর সংযোগ
অস্ত্রে নয় বস্ত্রে নয়, আচারে ও আচরণে নয়,
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উদার সম্ভোগ
যে দেশের ধর্মসমন্বয়,
ভারতের অঙ্গ এক সেই নেফা সভ্যতার ক্রীতদাস নয়,—
পার্বত্যপ্রকৃতি তার নিজেতে তন্ময়!
অতিথিবৎসল এরা। অতিথির যোগ্য সমাদর
এদেরও আদর্শ; আর সমতার জীবনদর্শন
গ্রহণ করেছে এরা। সাধ্যমত ভূমির কর্ষণ
এদেরও তৃপ্তির বস্তু। লোভহীন আরণ্যজীবন
কোমল এবং শান্ত। সামাজিক কর্মে তৃপ্ত মন।
যেমন একটি বীজ মৃত্তিকার অন্ধকার কোলে
ধীরে ধীরে মেলে পাখা, ধীরে ধীরে আকাশে ছড়ায়
শাখা ও পল্লবগুলি; ফলে পুষ্পে দোলে

সৃষ্টির রহস্যসত্তা—ক্রমোৎকর্ষ চায়—
তেমনি এরাও ক্রমে রূঢ়মূল তরুদের মত
আপন ঐতিহ্যে ক্রমবিকাশের গৌরবে সতত অধিষ্ঠিত ছিল ;
কিন্তু এক হানাদার অতিলোভী দস্যুদের আক্রমণ এদের জীবনে এনে দিল
অনিশ্চয়তা গ্লানি উৎকট আঘাত
অকস্মাৎ।
কিন্তু আর ভয় নাই—আমাদের জোয়ানেরা আছে
পার্বত্য জীবনে সেই অরণ্য-অঞ্চলে আর স্পন্দমান রহস্যের কাছে
আমাদের জোয়ানেরা বীর—শত্রু তাই ভয়েই অধীর,
আহত পশুর মত আপনাকে গুপ্ত রেখে পালায় সে অস্থির অস্থির।"

মেয়েরা পশম বোনে—বোনে আর গল্প শোনে।
তাদের ভায়েরা যত জোয়ান এবং বীর
তাদের ভায়েরা যত জোয়ান এবং ধীর—
তাদের জন্য তত ব্যাকুল—ব্যাকুল তারা
তাদের জন্য তত আকুল আত্মহারা
মেয়েরা পশম বোনে—বোনে আর গল্প শোনে—
—"এই নেফা, এর আদিবাসীরা সরল,
বিচিত্র জীবনধারা বীরত্বে প্রবল
লোকগাথা লোকনৃত্য লোক-গীতে তারা
এনেছিল জীবনের নতুন চেহারা।
আপাতানি উপজাতি প্রকৃতির বেহুঁশ সন্তান—
মাথায় ময়ূরপুচ্ছ পুরুষের, মেয়েদের আভরণদান
করেছে বেতসতরু। দুর্ধর্ষ ও সাহসী ভীষণও
তাগিন। নোকটি আর ওয়াঞ্চো এখনও
নরমুণ্ডশিকারের স্বপ্ন দেখে কাঠের প্রতীকে
অরণ্যের গহন যদিও বাধা দেয় লোকের দৃষ্টিকে।
তবু দেখ কত শত বৌদ্ধ মঠ দুর্গ ও মন্দির
মিশমিরা গড়েছিল। দুর্ধর্ষ ডাফলা বীর
সহায়ক ছিল কাজে। ঐতিহ্য:চেতনা আকাসের
দিয়েছিল শক্ত ভিত। মিরি উপজাতিরা সরল ;—প্রাণপ্রাচুর্যের
ধর্মে এরা গার্হস্থ্যে বিশ্বাসী। উদ্দাম আবোর
বহুধা বিভক্ত তবু সমশিক্ষা আদর্শে বিভোর
বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত নদীর মতো
চেয়েছিল একদার সমুদ্র সতত।

আদিম অবস্থা থেকে আধুনিকতার—বৈচিত্র্য ও বিকাশের সর্ব অধিকার
এখানে গিয়েছে দেখা—এখনো রয়েছে চিহ্ন তার।
বহুতন্ত্রী ভারতের বীণাযন্ত্রে এরা ছিল স্বতন্ত্র ঝঙ্কার—রাগ আলাপনে।
তবু মিথ্যা আস্ফালনে
উত্তরে প্রমত্ত ও আরক্ত দস্যুরা
করেছিল করতল-গত। আজ ভয় নাই, সে শত্রুরা
পলায়ন-পর। আজ জোয়ানেরা সগর্বে দাঁড়িয়ে
নেফার সীমান্তরেখা দৃষ্টি থেকে যায় নি হারিয়ে।
ভারতের জোয়ানেরা বীর—দুর্ধর্ষ ও প্রত্যয়ে গম্ভীর,
শত্রু তাই পলায়নপর—ভয়ে অস্থির অস্থির।"

মেয়েরা পশম বোনে—বোনে আর গল্প শোনে—
—"এই নেফা, এর অধিবাসীরা সকলে
শান্তিতে সুন্দর আর বিভূষণে নিতান্ত মৌলিক,
সৌন্দর্যের সৌধ গড়ে অরণ্যের কোলে
মিরি-মিশমি মেয়েদের রূপ অলৌকিক—বলে গেছে জনৈক কে ঐতিহাসিক।
মিশমি পর্বত এর অতি ভয়ঙ্কর
অন্তঃসুনিহিত তত্ত্ব মৃত্যু-থরথর।
তিরাপ পর্বত সেও কেড়ে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মদেশ থেকে
বয়ে গেছে শ্যামরেখা এঁকে
এরা ধনী অরণ্যসম্পদে, খনিজ সম্পদে এরা ধনী,
ধনী এরা সম্পদে মনের,
নানাবর্ণ কাষ্ঠ আর হাতীর দাঁতের
শিঙ ও শামুক আর পলা অলংকারে
সুসজ্জিতা এদের রমণী
রঙ-বেরঙের কত আশ্চর্য নকশার মিল বস্ত্রের বাহারে,
হাস্যে লাস্যে নৃত্যোৎসবে বিবিধ-বরণী
নেফার তরুণচিত্ততরণতরুণী।
কি দুঃসহ স্পর্ধা সেই মত্ত দস্যুদের
ভাবে মনে শত্রুভোগ্যা নারী ভারতের"—
মেয়েরা পশম বোনে—জলে ওঠে চক্ষে চক্ষে অগ্নির ঝিলিক
বলে—"ধিক্ ধিক্"—
মেয়েরা পশম বোনে, বোনে আর গল্প শোনে—
—"ভয় নাই, বিজাতির স্পর্ধা ভেঙে দিতে
ভারতের জোয়ানেরা গিয়েছে সেখানে। আচম্বিতে

বীর যোদ্ধাদের দেখে হঠেছে শত্রুরা—
দুর্বলের অত্যাচারে দক্ষ ভীরু ওরা—
ভারতের জোয়ানেরা বীর, শত্রুদের টলেছে শিবির
পলায়নে রত ওরা ভয়ে আজ অস্থির—অস্থির।"

মেয়েরা পশম বোনে—বোনে আর গল্প শোনে—
—"এই নেফা, হাজার দশেক ফিট উচ্চতায় যার
কামাং সীমান্তে গ্রাম তোয়াং—যেখানে
জন্মেছেন মাতা ষষ্ঠ দালাই লামার—
বড় বড় বৌদ্ধমঠ দাঁড়িয়ে এখানে।
বৌদ্ধধর্মগ্রন্থমালা—দুষ্প্রাপ্য পুঁথির
সম্পদ রয়েছে জমা। পাঠাগার, গুম্ফা, গুহা, মঠ
তিনশত বৎসরের মহতী স্মৃতির
নিদর্শন রয়েছে প্রকট।
আশ্চর্য শিল্পের বোধ—অবাক্ বিস্ময়
গ্রন্থে গ্রন্থে চিত্র আঁকা সূক্ষ্মস্বর্ণময়—
মলাট সোনার পাত তারো কারুকাজ,
সোনার অক্ষরলিপি—রূপকথা আজ!
সদাচার, হাস্যময়, অধিবাসী মোনপো এরাই
ভালবাসে ফুল, ঘর—কাঠের খোদাই
সূক্ষ্ম কাজে মনোহর। রূপো দিয়ে তৈরি তলোয়ার
মৃত্তিকার পানপাত্র—টুপি আর টুকিটাকি ঘর সাজাবার
—সবই সূক্ষ্ম কারুময়। অবাক্ বিস্ময়!
পথের দু'পাশে জ্বলে সুগন্ধি জ্বালানি
সুগন্ধ কাষ্ঠে ও পত্রে। যেন এ পবিত্র ধূপদানি
উঠেছে সৌরভঘন আকাশের দিকে—পাহাড় ছাড়িয়ে
দ্বারে দ্বারে সৌন্দর্যের মনোরম অভিব্যক্তি বুদ্ধলীলা নিয়ে।
আর বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে সারি সারি জ্বলে দীপশিখা
অরণ্যললাটে যেন দীপ্ত ললাটিকা।
—এই নেফা, তবু সেই শত্রুরা বর্বর
ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুণ্য ভূমির উপর।
—আমাদের জোয়ানেরা বীর—বীরত্বে নিষ্ঠায় আর প্রত্যয়ে গভীর—
দস্যুদের টলেছে শিবির।—শত্রু পলায়নপর—দেখ, ভয়ে অস্থির—অস্থির।"

মেয়েরা গল্প শোনে—বোনে আর গল্প শোনে,
—"বিদেশের দস্যু হানাদার, বুঝুক এবার"—

চোখে আগুনের কণা সুনীল কাজল
মুখে হাসি—দৃষ্টি ভরা-স্বপ্নে সমুজ্জ্বল—
বক্ষের দীপক রাগে বেদনার মীড়,
বোনে আর মনে ভাবে শীত যে নিবিড়,
এখন বরফ পড়ে কিংবা তুষারের হাওয়া শীতল রাত্রির
—নেফায় জোয়ান যারা—তারা ভাই—ভারতের বীর
অগ্নিতরী বেয়ে চলে তারা লক্ষ সূর্য সম প্রত্যয়ে নিবিড়—
মেয়েরা পশম বোনে দ্রুততর আঙুলের শিল্পের চাতুরী,
স্নেহাকুল হৃদয়ের উত্তাপ-মাধুরী
সঞ্চারিত পশমের এক তার দুই তার উল্টো সোজা নানান ঢঙের,
ভিজেখড়-মরাঘাস-সবুজ রঙের
ব্যালাক্লাভা, সোয়েটার, মোজা আর হাতের দস্তানা
মাপা-জোকা ঠিক-ঠাক ইঞ্চিমাপে টানা—
মেয়েরা পশম বোনে—বোনে আর জোয়ানের গল্প শোনে—
ভারতের জোয়ানেরা বীর
যারা—প্রত্যয়ে ও নিষ্ঠায় গভীর।

—

পরের তরে

তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

সকালে অতটা মনে ছিল না রেখার। ঘরদোরের কাজ মিটিয়ে ছেলেমেয়েদের হাতে জলখাবারের বাটি ধরিয়ে দিয়ে, রান্নাঘরে গিয়ে এক ফাঁকে আঁচ দিয়ে এসেছে। তখনও খেয়াল হয় নি। স্বামী শম্ভুচরণ বিছানায় শুয়ে সদ্য-দিয়ে-যাওয়া কাগজ পড়ছেন। রেখা জানে চা না পেলে উনি উঠবেন না। পাতকোতলায় ঝি একরাশ বাসন নিয়ে বসেছে। চায়ের কেটলিটা আগে মাজিয়ে নিয়ে আবার রান্নাঘরে ফিরে এসে চায়ের জল চাপাতে গিয়েই হুড়মুড় করে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। দেওয়ালের অপর দিকে—পাশের বাড়ির রান্নাঘরে। একটি দেওয়ালের ব্যবধানে দু বাড়ির রান্নাঘর বিভক্ত। মাথার চালের একাংশ এদিকে, আর একাংশ ওদিকে। শব্দটা শুনেই রেখার কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল। ও-বাড়ির কচি বউটা আবার কি সব হুড়-মুড়িয়ে ফেলল কে জানে! এখুনি হয়তো অসিতবাবুর তর্জন-গর্জন শুরু হবে। তারপর সারাটা দিন এরই রেশ ধরে ছেলেমানুষ বউটা বকুনি খেয়ে মরবে।

তর্জন-গর্জন সত্যিই শোনা গেল। কিন্তু ভিন্ন সুরের, ভিন্ন ধরনের। এর পরেই রেখার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, জয়া আজ ও-বাড়িতে নেই। গতকাল অসিতবাবুর বড় সম্বন্ধী এসেছিলেন, ছোট বোনকে নিয়ে গেছেন কয়েক-দিনের জন্যে। নিজে দূর দেশে থাকেন। ছুটির কদিন বোনটিকে কাছে রাখতে চান।

রেখা শুনল ও-বাড়ির দশ-বারো বছরের বাচ্চা চাকরটা বকুনি খাচ্ছে। পরম কৌতুকে চুপ করে বসে সব কথা শুনল রেখা। ওপরের চালার ফাঁক দিয়ে কথাগুলো খানিকটা চাপা সুরে ভেসে আসছে। চাকরটারই যেন সব দোষ। চা চিনি খুঁজতে রান্নাঘরে ঢুকেছিল অসিতবাবু। সাজানো ডিবে-ডাবাগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে একসময় সব হুড়মুড়িয়ে ফেলে বসে আছে।

কোথায় কী আছে না আছে, বাড়ির চাকরের সব নাকি দেখে রাখা দরকার। আদর দিয়ে, ওকে কিছু শিখতে না দিয়ে এই বাড়ির মাঠাকরুনটি নাকি মাথা খেয়ে বসে আছে ওর।

নিজের চায়ের জল উথলে উঠতেই শাড়ির আঁচল দিয়ে কেটলিটা নামিয়ে রাখল রেখা। চায়ের সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে চা করতে বসল। প্রথম কাপটি স্বামীর। চায়ের লিকার অল্প কাপে ঢেলে দেখে নিতে হয় লিকার ঠিক হয়েছে কি না। তারপর চিনি দুধের পরিমাণেও নিখুঁত সামঞ্জস্য থাকা চাই। চা খাওয়া নিয়ে শম্ভুচরণের বেশ একটু খুঁতখুঁতে বাই আছে। সাত রাজ্য ঘুরে এসে, সে যত অবেলাই হোক বাড়ির এক কাপ চা না খেয়ে সুস্থির হতে পারেন না।

চা করতে করতে কী খেয়াল হল, রেখা চায়ে চিনি একটু অল্প করে দিল। ইচ্ছে করে। কাপ পেয়ালা হাতে নিয়ে উঠে গিয়ে শম্ভুচরণের হাতে দিয়ে এল। তারপর নিজের কাপ নিয়ে চা ছাঁকতে বসেই টের পেল, শম্ভুচরণ বড় ঘর ছেড়ে এগিয়ে আসছেন। চা হাতে সোজা রান্নাঘরে চলে এসে বললেন, এ কী! চিনি দিতে ভুলে গেছ যে!

হাসি চেপে রেখা বলল, ভুলে গেছি!

শম্ভুচরণ বললেন, ভুলে হয়তো যাও নি, কিন্তু একটু যেন কম মনে হচ্ছে।

চিনির ডিবে চামচ এগিয়ে দিয়ে রেখা বলল, আন্দাজ মত নিয়ে নাও।

আকাশ থেকে যেন পড়লেন শম্ভুচরণ। মেঝের ওপর বসে পড়ে স্ত্রীর আনত মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। বারো বছর বিবাহিত জীবনে এই ধরনের কথা যেন এই প্রথম শুনছেন।

রেখার নিজেকে সামলে রাখা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বলল, কী হল? একেবারে মাটিতে বসে পড়লে!

শম্ভুচরণ বললেন, আমার চিনির আন্দাজ কি আমি বুঝি?

তোমার কোন্ আন্দাজটা তুমি নিজে বোঝ?

গাম্ভীর্যের ভান করা স্ত্রীর মুখের আনাচে-কানাচে হাসির ছটা নজর এড়াল না শম্ভুচরণের। এবার বুঝলেন ওটুকু রসিকতা। স্বামীর আন্দাজ নিতে গিয়ে নিজে ইচ্ছে করে বে-আন্দাজ হয়ে যাওয়ায় একটা আনন্দ আছে। শম্ভুচরণ বললেন, নিজের সবকিছু আন্দাজ-টান্দাজের বালাই অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়ায় কী যে স্বস্তি, তোমরা কী বুঝবে? তোমরা তো শুধু এগুলো দু হাত ভরে কুড়িয়ে নেওয়ার আনন্দেই আত্মহারা।

রেখা হেসে ফেলে বলল, থাক, খুব হয়েছে নিজের বড়াই। এবার তুমি নিজের কাজ সার গে। বেলা বাড়ছে।

শম্ভুচরণ উঠে গেলেন। পাশের রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। কতদূর কাজ এগোল কে জানে! অসিতবাবু নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারে নি জয়ার হাতে। সে যোগ্যতা জয়ার নাকি নেই। অসিতবাবুর শখ ছিল শহুরে মেয়ে ঘরে আনার। কিন্তু ভাগ্যে এসে পড়েছে গ্রামের মেয়ে। কোন শখ নেই, সৌখিনতা নেই, ঘরের চতুষ্কোণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে গ্রামের মেয়েরা পছন্দ করে। একেবারে গেঁয়ো ভূত, অনেকবার এই ব্যঙ্গোক্তি শুনেছে রেখা এ-ঘরে বসে।

পাঁচ বছরের মেয়ে নমিতাকে ডেকে এক কাপ চা ও-বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে কিনা ভাবল রেখা। তার পরেই মত পালটাল। না, থাক। নিজে তৈরি করে খাওয়ার ঝক্কিটা বুঝুক।

উনুনটা খালি যাচ্ছে। ডালের জল ফুটছে। বাজারের টাকার জন্যে ওদিকে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছেন শম্ভুচরণ। বাইরে বেরিয়ে বাজারের থলে আর টাকা ওর হাতে দিতেই বললেন, কী কী আনতে হবে?

রেখা বলল, যা খুশি এন।

সে আবার কী! রোজই তো বলে দাও কী কী আনতে হবে।

রেখা হাসিমুখে বলল, আজ নিজের খুশিমত আন না দেখি। রান্নাটা তোমার খুশিমত হলেই হল তো।

আর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে তাড়াতাড়ি রান্না-ঘরে চলে গেল রেখা।

শম্ভুচরণ স্ত্রীর এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করলেন। রান্নাঘরে বসে সকালের সেই চাপা হাসির

আভাসটা এখনও দেখতে পেলেন ওর মুখে। কোন কিছুরই হদিস খুঁজে পেলেন না। বুঝলেন বাজার নিয়ে আজ একটা গোলমাল হবে। নিজের পছন্দ-অপছন্দ মোটেই মেলে না স্ত্রীর সঙ্গে।

বাজারে বেরবার মুখে দেখলেন ছেলেমেয়েগুলো খেলছে। বললেন, ওরে, তোরা পড়তে বসবি না?

তারপরে অনুচ্চ কণ্ঠে স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললেন, দেখছ গো, এরা কী রকম খেলে বেড়াচ্ছে?

রেখা চেঁচিয়ে বলল, তা আমি কী করব! তুমি ওদের পড়তে বসতে বলতে পার না?

শম্ভুচরণ ছেলেমেয়েদের একটা দাবড়ানি দিলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। পাশের ঘরে বোধ হয় রান্না চড়েছে। কে রাঁধছে! কী রান্না হচ্ছে!

তুই বেটা কোন কাজের নোস। মার কাছে কিছু শিখে নিতে পারিস নি? চালটা ধুয়ে নিয়ে আয়। কত চাল নিবি?

আমি তো জানি না বাবু।

জানি না! তবে কী জানিস? নিজের পেটে কতটা আঁটে তার আন্দাজটাও তো আছে, না তাও নেই?

ডাল নামিয়ে, সাঁতলে ভাতের জল চড়াল রেখা। এখনও তাহলে ও-বাড়িতে রান্নাই চড়ে নি! আটটা বাজল। জয়া থাকলে আরও এগিয়ে যেত রান্না। রেখাকে হারিয়ে ওর রান্না রোজ আগে আগেই হয়ে যায়। মাস তিন-চার হল বিয়ে হবার পর নতুন ঘর করতে এসেছে জয়া। ছেলেপুলের এখন কোন ঝামেলা নেই। তাই ওর কাজ এগিয়েই চলে। মাঝে মাঝে গলা তুলে এ-ঘর আর ও-ঘরের মধ্যে কথা হয়।

তোমার কি রান্না হয়ে গেল জয়া?

না দিদি, তরকারি চাপিয়েছি।

তখন হয়তো ভাত চড়েছে রেখার।

রেখা বেশ বুঝল, আজ ও-বাড়ির ভদ্রলোকের বোধ হয় ভাল করে খাওয়া হবে না। হলেও অফিসে নির্ঘাত লেট হবে। হোক। যে কটা দিন জয়া না থাকে, রোজ যেন অফিসে লেট হয় অসিতবাবুর। এতদিন বকুনি দিয়েছে জয়াকে, এবার কয়েকটা দিন বকুনি শুনুন নিজে। এক অফিসেই চাকরি করে এ-বাড়ির আর ও-বাড়ির কর্তারা। গল্প শোনা যাবে পরে।

শম্ভুচরণ বাজারের থলেটা ঝপাং করে ফেললেন। বললেন, দেখ বাপু, যা পারি এনেছি। রাগারাগি কর না।

থলেটা মেঝেতে উজাড় করে ঢেলে রেখা দেখল, আর সবই ঠিক আছে, শুধু চচ্চড়ির আনাজপাতির মধ্যে বেগুন নেই, কুমড়ো নেই। যেখানে একরকম শাক হলে চলে সেখানে শাক তিন রকমের।

শম্ভুচরণ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী গো, সব ঠিক আছে তো?

উত্তরে যা বলার বলতে গিয়ে মুখ তুলে থেমে গেল রেখা। স্বামীর অসহায় মুখখানা দেখে হেসে ফেলল, বলল, বেশ হয়েছে। এই তো তুমি নিজের খুশিমত বেশ বাজার করতে পার।

এতটা উচ্ছ্বসিত হবার মত বাজার যে মোটেই করেন নি শম্ভুচরণ সে জ্ঞান তাঁর আছে। এসব বিষয়ে ওঁর নিজের ওপরই বিশেষ আস্থা নেই। দেরি হয়ে যাবার ভয়। আর কথা না বাড়িয়ে স্ত্রীর মনোভাবটা বোঝবার চেষ্টা করতে করতে ঘরে চলে গেলেন।

শম্ভুচরণ চলে যেতেই চুপিচুপি ও-বাড়ির বাচ্চা চাকরটা এসে দাঁড়াল। রেখা ওকে দেখে ভারি খুশী। বলল, কি রে, তোদের রান্নার কতদূর?

চাকরটার মুখ শুকিয়ে আছে। আহা বেচারি! দেখলে মায়া হয়। সকাল থেকেই বকুনি খাওয়ার ছাপ মুখে চোখে। ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, বাজার থেকে এসে দেখি শুধু ভাত নেমেছে।

তাহলে! কী খেয়ে যাবে তোর বাবু?

উৎকণ্ঠাটা আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ল কতকটা নিজের অজানতেই।

চাকরটা বলল, তাই তো অনেক বুঝিয়ে বলে এসেছি, মাছের ঝোলটা কী করে রাঁধতে হয় ও-বাড়ির মার কাছ থেকে জেনে আসি।

রেখা হাসতে হাসতে সব বুঝিয়ে দিল। একবার নয়—দু-তিনবার করে। চাকরটা চলে গেল।

শম্ভুচরণ অফিসে চলে যাওয়ার পর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দুপুরে শুয়ে শুয়ে রেখা ভাবছিল, সত্যিই ও-

বাড়ির মানুষটা ভারি অবুঝ প্রকৃতির। জয়া যাবার সময় দেখা করতে এলে রেখা বলেছিল, উনি এ কটা দিন আমাদের কাছে খেলেই পারেন। জয়া বলেছিল, রক্ষে করুন দিদি। ওঁকে এ কথাই অনেক আগে বলেছি। বললেন, ভারি তো রান্নার কাজ। ওই নিয়ে তোমরা সারা জন্ম কাটাও। ও কী একটা কাজের কাজ, ও আমি এক মিনিটে সারতে পারি। বললাম, না হয় হোটেলেই এ কটা দিন ব্যবস্থা করে নাও। তাতেও রাজি নন। বললেন, বিয়ের আগে ওসব চলে। বউ বাপের বাড়ি গেছে বলে আমি হোটেলে খাব?

স্বামীর নকল করে এমন ভাবে কথাগুলো বলেছিল জয়া যে দুজনেই হেসে লুটোপুটি। আমার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে দিদি। আমার কোন দাম নেই ওঁর কাছে। যাবার সময় এই কথাগুলো বলতে বলতে কেমন মনমরা হয়ে গিয়েছিল জয়া।

সত্যিই মেয়েটার কপালে দুঃখ আছে। স্বামীর মন সে নাকি পায় নি। সে যদি স্বামীর সঙ্গে এখানো সেখানে হৈচৈ করে ঘুরে বেড়াতে পারত, পটের বিবির মত সেজে-গুজে ফিটফাট হয়ে থাকত, তাহলে নাকি উনি খুশী হতেন। কলেজে পড়েছেন, বড় বড় শহরে ঘুরেছেন, শহুরে মেজাজ ওঁর। চাকর রাখা হয়েছে। সে নাকি রান্না করবে। তাকে রান্না শেখাতে হবে। এসব কিছুই করে নি জয়া। একেবারে গেঁয়ো মেয়ে। তাই ওর স্বামী ওকে একটুও ভালবাসেন না। ঝগড়াঝাঁটি বকাবকি লেগেই আছে। কী করে স্বামীর মন পাওয়া যায় অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে জয়া মুখটা করুণ করে। আহা, একেবারে ছেলেমানুষ! কিন্তু ওর প্রশ্নের কী উত্তর দেবে রেখা! এর উত্তর বা সমাধান প্রশ্ন করে আলোচনা করে কি পাওয়া যায়? নিজেদেরই বুঝে নিতে হয়, শিখে নিতে হয়। জয়ার জন্যে সত্যিই বড় কষ্ট হয়। অমন সুন্দর মেয়ে, সরল মেয়ে স্বামীর কাছে কোন দাম পেল না।

সন্ধ্যেবেলা শম্ভুচরণ যখন ফিরে এলেন রেখা তখন রান্নাঘরে। বেরিয়ে এসে স্বামীকে পাখা করতে করতে বলল, আজ অসিতবাবুর দেরি হয়ে যায় নি?

শম্ভুচরণ একটু অবাক চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কেন বল তো?

রেখা হাসি চেপে বলল, বলই না, আমি যা জিজ্ঞেস করছি।

খানিকক্ষণ ভেবে শম্ভুচরণ বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ তুমি। দেরি হয়েছে বইকি। সাহেবের ঘরে ডাকও পড়েছিল। তা তুমি বাড়িতে বসে অফিসের খবর রাখ কী করে?

রেখা কোন জবাব দিল না। মিটিমিটি হাসতে লাগল। স্ত্রীর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে হঠাৎ যেন সকাল থেকে বারকয়েক এ ধরনের হাসির রহস্যটা এতক্ষণে বুঝতে পারলেন শম্ভুচরণ। বললেন, ও, জয়া নেই! তাই অফিস যেতে দেরি। আর তাই তুমি এত খুশী। আশ্চর্য মানুষ তোমরা। ও বেচারি নাকাল হচ্ছে, আর তুমি—

রেখা বলল, শখ করে নাকাল হওয়া। সবতাতেই বাহাদুরি। আমি বলেছিলাম, জয়াও রাজি ছিল। কিন্তু উনি এখানে খেতে নারাজ। জয়ার কথা গ্রাহ্যেই আনে না। এখন বুঝুক কত ধানে কত চাল।

রান্নাঘরে গিয়ে রেখা শুনল ও-বাড়িতে তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। একে সাহেবের বকুনি, সারাদিনের খাটুনি, তার ওপর এখন প্রচণ্ড খিদে। কোন কিছুর ব্যবস্থা নেই। সব করে নিতে হবে। হবেই তো গণ্ডগোল। অন্ততঃ এ বেলাটা রোজ খেতে রাজি হওয়াটা উচিত ছিল। অফিস থেকে ফিরে এসে পুরুষমানুষ কখনও নিজে রান্না করে খেতে পারে! অত তর সয় কারুর!

হঠাৎ ও-বাড়ির হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। পরক্ষণেই চাকরটা এসে দাঁড়িয়েছে: মা, স্পিরিট আছে?

কেন রে!—রেখা একেবারে চমকে উঠল।

চায়ের জল নামাতে গিয়ে বাবুর আঙুলটা পুড়ে গেছে।

তাই নাকি!

সব কাজ ফেলে উঠে দাঁড়াল রেখা। কিসের একটা আতঙ্কে মুখের ভাবটা কেমন হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করল, কতটা পুড়েছে? সমস্ত হাতটা?

না না, এই একটুখানি, একটা আঙুলের—

তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঢুকল রেখা। স্পিরিট-ক্যানটা হাতে নিয়ে শম্ভুচরণকে বলল, তুমি একবার শীগগির ও-বাড়ি যাও। অসিতবাবু হাত পুড়িয়েছে।

শম্ভুচরণ খালি গায়ে সবে একটু আরাম করে গড়াচ্ছিলেন মেঝেতে। উঠে বসে বললেন, তাই নাকি!

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি এই ক্যানটা নিয়ে শীগগির যাও।

শম্ভুচরণ তাড়াতাড়ি গেঞ্জিটা মাথায় গলিয়ে যেতে যেতে বললেন, তা যাব বইকি।

তারপর আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, কিন্তু—

বাকি কথাটা স্ত্রীর মুখের ভাব দেখে আর বলা হল না। বুঝলেন, রসিকতা বোঝার মত মনের অবস্থা এখন ওর নেই।

একটু পরেই ফিরে এসেছিলেন শম্ভুচরণ।

এমন কিছুই হয় নি অসিতবাবুর। খুব সামান্য। কিন্তু সামান্য হলেও কিসের একটা অস্বস্তিতে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল রেখা। সারা সন্ধ্যেটা এভাবেই কাটল। ও-বাড়িতে আর কোন সাড়াশব্দ নেই। খেতে রাজী করিয়ে এসেছেন শম্ভুচরণ। আপত্তি আর করেন নি অসিতবাবু। উপায়ই বা আর কী আছে! হাতটা বেচারির পুড়ে গেছে। হয়তো এখনও যন্ত্রণা হচ্ছে। ওর জন্যে কষ্ট হচ্ছে রেখার। কষ্ট আসলে জয়ার জন্যে। জয়ার হয়ে কষ্ট পাচ্ছে রেখা। জয়াকে অসিতবাবু না ভালবাসুক, কিন্তু জয়ার জীবনের সবকিছুই তো ওর স্বামী। প্রাণ গেলেও কখনও এতটুকু কষ্ট করতে দেয় না তার স্বামীকে। অথচ এই স্ত্রীর মূল্যই নেই ওর কাছে।

ও-বাড়িটা একেবারে নিঝুমপুরী। কোন সোরগোল নেই। চাকরটা এসে একবার খাবার নিয়ে গেছে। বাবু নাকি চুপ করে শুয়ে আছে।

রাত্রে শুতে যাবার আগে নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল রেখা। এ-ঘরের সবাই তখন ঘুমে অচেতন। ও-বাড়ির ঘরটা কোনাকুনি দেখা যায়। ঘরটা অন্ধকার। আজ জয়া নেই। একা শুয়ে আছে অসিতবাবু। ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতের যন্ত্রণাটা এখন নিশ্চয়ই ভুলেছে। কাল সকালে আবার কী রকম থাকবে কে জানে! ঘা না হয়ে যায়! ঘাটা হয়তো শুকোবে, দাগ থেকে যাবে। ও দাগটা জয়া এসে দেখবে। ওর জন্যেই দাগটা পড়েছে। কিন্তু ওই দাগটা শরীরের একটা আঙুলের একটুখানি জায়গা নিয়েই কি শুধু সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে? জয়ার জন্যে ওর স্বামীর মনের ছোট্ট কোন একটা জায়গায় ও কি আঁচড় কাটবে না?

ও-ঘরের আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠল। অসিতবাবু উঠেছে। জানলা খোলা। সব দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে উঠে বসল অসিতবাবু। মুখটা শুকনো—বড্ড শুকনো। চুলগুলো এলোমেলো। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ভেতর দিকে। টেবিলের সামনে, দেওয়ালে, ঠিক আলোর নীচে ছবিতে জয়া হাসছে। পাশে দাঁড়িয়ে অসিতবাবু। বিয়ের সেই ছবিটা। সেই সরল কচি মুখের মেয়েটা হাসছে স্বামীর পাশে বসে। ছবি তোলবার সময় তখন কী ভেবেছিল জয়া? হাসছিল কেন? মনের মত স্বামী পাওয়ার আনন্দেই কী?

কিন্তু অসিতবাবু ও কী করছে! ফিরে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ছবিটার দিকেই কি চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু কী আশ্চর্য! জানলার গরাদ দু হাতে আঁকড়ে ধরল রেখা। ওই তো ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা তুলে আলতোভাবে ছবিটা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—বেশ কিছুক্ষণ। তারপর চেয়ার টেনে বসে ওই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতেই কাগজ কলম টেনে নিল।

আর এতক্ষণে জানলার গরাদে মাথা রেখে বুক ভরে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিল রেখা। জয়াকে এখুনি একবার কাছে পেলে বেশ হত। না, সে অনেক দূরে। একটা চিঠিই বরং এখুনি লিখতে হবে জয়াকে। জয়া এই প্রথম অসিতবাবুর চিঠি পাবে, ওই সঙ্গে রেখার চিঠিও। দুটি চিঠির ভাষা ভিন্ন সুরের। অসিতবাবুকে যেভাবে একটু আগে দেখা গেছে, সে দৃশ্য সে নিজে ব্যক্ত করতে পারবে না। সে দৃশ্যের অলক্ষ্যদ্রষ্টা রেখা নিজে, আর কেউ নয়। অন্ধকার আকাশের তারাগুলো মুখ টিপে হাসছে—রেখার মত। রেখা সেদিকে চেয়ে ভাববার চেষ্টা করল কোন্ চিঠিটা পেয়ে বেশী খুশী হতে পারে মেয়েরা? জীবনে এই প্রথম স্বামীর বিরহ-বেদনার কালো কালো আক্ষরিক ভাষাগুলো পড়ে বেশী আনন্দ পাবে, না, অলক্ষ্যে দেখা ওই ছবিটুকুর নিখুঁত বর্ণনায় বেশী তুষ্ট হবে, তৃপ্তি পাবে?

—

ডাহুকী

হিমাদ্রি চক্রবর্তী

হালকা বেগুনী রঙ, নাকি অপরাজিতার মত নীল? উহুঁ, তাও নয়।

দুপুর-গড়ানো বিকেল-ছোঁয়া নির্জন ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে হৈমন্তী আকাশ দেখছিল। ফোলা ফোলা পাতা নাচিয়ে, চোখের কোণে ভাঁজ ফেলে দৃষ্টিটাকে সূক্ষ্ম করল হৈমন্তী। একটু বাদেই চোখ টান করে ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলে আবার তাকাল। মনে মনে ভাবল হালকা বেগুনী রঙই তো মনে হচ্ছে, না অপরাজিতার মত নীল? বিরক্ত ভাবে কপালের উড়ো চুলগুলো সরিয়ে হৈমন্তী ঝুঁকে পড়ে আকাশটাকে দেখল আবার। উত্তরের দিকটা, ওই যে জোড়া গীর্জার মাথায় মোরগের ঝুঁটিটার কাছে ওইখানটা, কেমন কচি কলাপাতার মত মনে হচ্ছে না? বিভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত আকাশটা চষে ফেলল হৈমন্তী। হৈমন্তীকে খেপিয়ে মজা দেখবার জন্য আকাশ যেন একটা বর্ণচোরা চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে বসে আছে তখন থেকে।

হতাশ ভাবে উপর থেকে অপলক দৃষ্টি সরিয়ে এনে নীচে তাকাল হৈমন্তী। রোদ্দুর নেই। ট্রামলাইনগুলো ম্যাড় ম্যাড় করছে ছায়াতে। সিরসির শব্দ উঠল একটা। ট্রাম আসবে। ট্রাম আসবে কথাটা মনে হতেই ছাদের আলসেতে অলস ভাবে ফেলে-রাখা নরম দেহটা শক্ত হয়ে উঠল। চট্‌ করে আঁচল গুছিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল হৈমন্তী। অবনী আসবে।

একটা ময়াল সাপের মত ট্রামের মাথাটা বাঁক ঘুরল। উপরের লাল আলোটার চোখ-রাঙানী দেখে হেসে ফেলল হৈমন্তী। ইশ, বাবু আসছেন, সবাই তফাত যাও। ঝুঁকে পড়ে ট্রামের অপস্রিয়মান জানলাগুলোয় উৎসুক ভাবে চোখ বোলাতে লাগল হৈমন্তী। কিন্তু কই, অবনী নেই তো! থাকলে হৈমন্তী এখান থেকে স্বচ্ছন্দে দৃষ্টি দিয়ে বিঁধতে পারত তাকে। যদি ওদিকটায় বসে থাকে! কিন্তু তাই বা কী করে হয়; হৈমন্তীর দৃষ্টিতে বিদ্ধ হবার জন্যেই যে অবনী এদিককার জানলায় বসে রোজ। অধৈর্য ভাবে ছাদের খসখসে শানে পা ঘষতে ঘষতে হৈমন্তী ঘাড় উঁচু করে দূরের ট্রাম-স্টপটা দেখল। লোক নামল অনেক, উঠল কম। কই, এল না তবে এবারও! হয়তো পরের ট্রামটায় আসবে অবনী। অফিস ছুটি তো সাড়ে চারটেয়। ফরসা মোমের মত কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। আঙুরের মত টুবো টুবো আঙুলে ঘাম মুছে হৈমন্তী ঠোঁট উলটে ভাবল আবার, সাড়ে চারটে না হাতী। মার্কেন্টাইল ফার্ম, আজ হয়তো খাটিয়ে মারছে লোকটাকে। ওই আর একটা ট্রাম আসছে!

দিদি, এই দিদি!—দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে উঠল ছোট বোন জয়ন্তী: এই দিদি, নীচে চল্‌, মা ডাকছে।

হৈমন্তী ঝুঁকে পড়ে একাগ্র ভাবে ট্রাম দেখছিল। ট্রামটা ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে পাশ কাটিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে নিরাশ গলায় আস্তে আস্তে বলল, না, এটাতেও এল না।

জয়ন্তী সিঁড়ির-দরজায় হেলান দিয়ে মৃদু হাঁপাচ্ছিল। দিদির দিকে তাকিয়ে সিঁড়ি ভাঙার ক্লান্তিটা ওর চোখে হঠাৎ করুণ হয়ে গেল। বুকের কাপড় টেনে এগিয়ে গিয়ে হৈমন্তীর পিঠে হাত রেখে বলল, প্রতাপদা এসেছে। মা তোকে ডাকছে, নীচে চল্‌।

হৈমন্তী উদাস গলায় বলল, কেন?

বললাম না, প্রতাপদা এসেছে। তা ছাড়া বড়দাও তোকে ডাকছে, কি দরকার আছে।

হৈমন্তী এতক্ষণে যেন সজাগ হল। কিন্তু নীচে নামবার কোন ব্যস্ততা দেখা গেল না তার মধ্যে। লোটানো আঁচল বাঁ হাতে টেনে নিয়ে ছাদের আলসেতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে অন্যমনস্ক ভাবে বলল, প্রতাপ! কোন্ প্রতাপ বল্ তো?

জয়ন্তী অধৈর্য ভাবে বলল, তুই চিনবি না, বউদির কি রকম পিসতুতো দাদা হয়।

অবাক হল হৈমন্তী। বউদির দাদাকে চিনবে না কেন ও! চিন্তাটা মনের ভিতর জট পাকাচ্ছিল। অন্যমনস্ক ভাবে ছোট বোনকে বলল, আমি চিনব না কেন? তুই চিনলি কি করে?

জয়ন্তী বিব্রত হল। হৈমন্তী যে পুরো দু বছর বাড়ির বাইরে পা দেয় নি সে কথা ওকে এখন বোঝাবে কী করে। প্রতাপকে বউদির বাপের বাড়িতে দু-একবার দেখেছে জয়ন্তী। মনে মনে কথাগুলো সাজিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, বা, প্রতাপদা এই তো আমাদের বাড়ি প্রথম এল।

নীচে মার গলা শোনা যেতেই ব্যস্ত ভাবে ডাকল, এই দিদি, শীগগির চল্, তোর জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে।

শ্লথ পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে সিঁড়ির মুখে হঠাৎ উৎকর্ণ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল হৈমন্তী। আর একটা ট্রাম আসছে মনে হচ্ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ন্তীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, দাঁড়া, এই ট্রামটা দেখে যাই—যদি আসে।

জয়ন্তীর অস্বস্তিটা তখন চরমে উঠেছে। বকের মত গলা উঁচু করে ফাঁকা ট্রামলাইনটা একনজর দেখে নিয়ে দিদিকে দু হাতে জাপটে ধরে নীচে নিয়ে যেতে যেতে বলল, দূর, ওটা ট্রাম নয়, কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার গাড়ি।

নামতে নামতেও উৎসুক ভাবে ঘাড় ফিরিয়ে হৈমন্তী দেখল দরজার ফ্রেমে আঁটা বর্ণচোরা আকাশ।

হৈমন্তী অসাধারণ সুন্দরী। কড়ির মত সাদা গায়ের রঙ, টানা টানা চোখ, টিকোলো নাক, তার উপর কোমর ছাপিয়ে নামা ঘন কালো চুলের রাশ। ভিতরের বারান্দায় গোল করে পাতা বেতের চেয়ারে দাদার পাশে গিয়ে বসল হৈমন্তী। কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওপাশে বসা প্রতাপকে খুঁটিয়ে দেখল একবার, তারপর নিশ্চিন্ত ভাবে বলল, আমাকে একটু চা দেবে বউদি, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

শ্রীমন্ত সিঁড়ির মুখে হৈমন্তীর নির্লিপ্ত চেহারা দেখে আশ্বস্ত ভাবে কতকগুলো ছাপানো ফর্মের অক্ষরের ঠাসবুনুনীতে ডুবে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি মুখ তুলে স্ত্রীকে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মন্টিকে চা দাও লতা।

তারপর প্রতাপের দিকে তাকাল। শ্রীমন্ত বোনকে ভালবাসে। প্রতাপ বুঝতে পারল আর তাই অনুতপ্ত দৃষ্টি গভীর হবার আগেই মিষ্টি হেসে দু হাত জড়ো করে বলল, নমস্কার।

সরল ঋজু গলা। সদ্য চায়ের কাপটা মুখে তুলেছিল হৈমন্তী। হাতটা কেঁপে গেল। কাপ নামিয়ে রেখে প্রতাপকে আবার দেখল। নিজের অজানতেই ছোট একটা প্রতিনমস্কার করে চুপ করে মাথা নীচু করে বসে রইল।

ওদিকে রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে প্রতিমুহূর্তে ভয়ঙ্কর রকমের কিছু একটা আশঙ্কা করছিল জয়ন্তী। এই বুঝি দিদি রেগে গিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসে এই সময় ছোট ভাই লোটন ছাড়া আর কারও কথা শোনে না হৈমন্তী। ও হতভাগাটাও সময় বুঝে বেরিয়েছে ডাণ্ডাগুলি খেলতে।

* * *

জয়ন্তীর এমন ধারণার সঙ্গত কারণ আছে। প্রথম প্রথম জানলার গরাদ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে চু করে দাঁড়িয়ে থাকত হৈমন্তী ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ধীরে ধীরে লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে লাগল। অস্থির ভাবে সা ঘরে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ এগিয়ে এসে সাজানো গোছানো আলনার জামাকাপড়গুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করত। মাকে চিরুণী ছুঁড়ে মেরেছি একদিন। কিন্তু তার চেয়েও লজ্জাকর ব্যাপার ঘ গেছে এর আগে। নামজাদা বিলিতী লাইফ-ইন্সিও কোম্পানির লোক এসেছিল। হৈমন্তীর কয়েকটা স দরকার ক্লেম-ফর্মে। অবনীর ডেথ সার্টিফিকেটখা নাড়তে নাড়তে বেশ মোলায়েম গলাতেই বলছিলে ভদ্রলোক, দেখুন মিসেস মজুমদার, যদিও ব্যাপারা পুরোপুরি অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া কিছু নয়, আর তা

নেকদিন হয়ে গেছে—তবুও মানে, আপনার মনে কি হু—

হৈমন্তী পাথরের মূর্তির মত বসেছিল ভদ্রলোকের কে তাকিয়ে। কথাগুলো মোটেই তার মাথায় ঢোকে । ভদ্রলোক টাইয়ের নটটা একটু আলগা করে গলা-কারি দিয়ে আমতা আমতা করে আবার বললেন, মারা বার কিছুদিন আগেই আবার উনি একটা মোটা টাকার লিসি করেছিলেন কিনা, তাই মানে, এটা অবশ্য একটা টিন স্টেটমেন্ট—

ভদ্রলোক নিজেই খুব বিব্রত বোধ করছিলেন বোঝা গেল।

হৈমন্তীর গলা চিরে হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরুল। ঠে দাঁড়িয়ে উন্মাদের মত কাগজপত্র টান মেরে ফেলে য়ে একছুটে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে সশব্দে রজা বন্ধ করে দিল ওপাশ থেকে। লাইফ-ইন্সিওরের ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কন্তু মুখভাব দেখে সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন বলে মনে ল না। কাগজপত্র কুড়িয়ে নিয়ে নীচু গলায় দাদার ঙ্গে কথা বললেন অনেকক্ষণ। ইন্‌স্যানিটির লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। অবশ্য এরকম একটা মেণ্টাল শক্! ছাদে ওঠবার সিঁড়ির দিকে একবার তাকিয়ে ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। বলে গেলেন পরে আসবেন আবার।

* * *

প্রতাপের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী আশ্বস্ত হল। নিবিষ্ট মনে একটার পর একটা কাগজে সই করে গেল হৈমন্তী। সপ্রশংস দৃষ্টিতে কাগজগুলো নিয়ে প্রতাপ গভীর গলায় বলল, আর আপনাকে বিরক্ত করব না হৈমন্তী দেবী।

হৈমন্তী অন্যমনস্ক। দূরের লাল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ ভাবে কিছু শোনবার চেষ্টা করছিল। সুর নয়, কি একটা সুরের রেশ যেন ভাসতে ভাসতে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে কানের পাশে। কি ওটা? পুরিয়া না টোড়ী? ঝুঁকে পড়ে কান পেতে সুরটাকে মরমে নেবার চেষ্টা করল হৈমন্তী। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঠিক মীড়ের মাথায় এসে গুলিয়ে যাচ্ছে না? না না, ওই তো! হৈমন্তী শক্ত করে টেবিলটা চেপে ধরে আরও ঝুঁকে বলল।

লতা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীমন্তর দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। মা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এগিয়ে গিয়ে হৈমন্তীর পিঠে হাত রেখে বলল, কি হল মন্টি, অমন করছিস কেন?

হৈমন্তী চমকে উঠে ঘুরে তাকিয়ে দেখল, মা। লজ্জা পেয়ে অপ্রতিভ গলায় আস্তে আস্তে বলল, হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল।—তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে উত্তেজিত গলায় বলল, পেয়েছিলাম, জান মা, পেয়ে-ছিলাম। ইশ একটু হলেই পেয়েছিলাম। আমি জানি ওটা, ওটা—

নিজের মনের খেই হারিয়ে ফেলল হৈমন্তী আবার। ওট, পুরিয়া না টোড়ী! স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে মনে করবার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ, তারপর হতাশ ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে সটান বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিল।

শ্রীমন্তর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে বিদায় নিল প্রতাপ। অবনীর লাইফ ইন্সিওরের টাকা হৈমন্তী শেষ পর্যন্ত পেয়েছে। কোম্পানি বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে মৃতের উত্তরাধিকারিণীর বর্তমান মানসিক দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে এখানকার এক নামজাদা বৃটিশ ব্যাঙ্কে হৈমন্তীর নামে ওই টাকা জমা রেখেছে। প্রতাপ সেই নামজাদা বৃটিশ ব্যাঙ্কের একজন দায়িত্বশীল সিনিয়র অ্যাসিস্টান্ট। এম.কম.-এ ফার্স্ট ক্লাশ ছিল। চাকরিটা পেতে খুব অসুবিধে হয় নি।

ট্রাম-রাস্তায় পা দিয়ে প্রতাপ চারদিক তাকাল। বাদামী রঙের বিকেল ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। ট্রামটা ঝাঁকুনি দিয়ে থামবার আগেই লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সে। ফুট-বোর্ডে অপেক্ষমান বৃদ্ধকে দেখে থামল। চোখ তুলে দেখল ট্রামের ভিতর অন্ধকারের রাজত্ব। ঠিক ছাদের অন্ধকার সিঁড়িতে এলোচুল হৈমন্তীকে। প্রতাপ হৈমন্তীকে দেখছিল, কন্‌ডাক্টর দেখছিল প্রতাপকে। ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম ছেড়ে দেবার পর প্রতাপের হুঁশ হল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে প্রতাপ হেঁটে চলল তার চিন্তাকে সাহায্য করতে।

* * *

ঠিক দু বছর আগে অবনীর মৃত্যুর খবরটা পেয়ে শ্রীমন্ত মূঢ়ের মত ছুটে গিয়ে কেবল হৈমন্তীর পাশে দাঁড়াতে পেরেছিল। কীই বা আর সে করতে পারত! তখনও হৈমন্তীর গা থেকে বিয়ের গন্ধ যায় নি। কাঁপা আঙুলে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে মনে মনে ভাবছিল হয়তো এ খবর সত্যি নয়। অবনীর নিখুঁত ইয়োরোপীয় চেহারাটা ভেসে উঠছিল কেবলই চোখের সামনে।

জয়ন্তীও মনে মনে প্রার্থনা করেছিল, এ খবর যেন সত্যি না হয়। দিদির খাটের পাশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সকলে অপেক্ষা করছে বাইরে। হৈমন্তী চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মূর্ছা যায় নি। চিত্রাপিতের মত বসে থেকে খবরটা শুনেছিল। সুরঙ্গ-পথে মেল-ট্রেন যাওয়ার গুম্ গুম্ শব্দ কানের পাশে বাজতে বাজতে যেই হঠাৎ সরে গেল, অমনি হৈমন্তীর বুকের ভিতর একটা কান-ফাটানো তীক্ষ্ণ হুইসিল বেজে উঠল নিঃশব্দে। কোন কথা না বলে সে সোজা উঠে চলে গেল ছাদে। নির্জন অপরাহ্নের আকাশ হৈমন্তীকে ফাঁকি দিয়েছিল সেদিন। হালকা বেগুনী—না না, তবে কি অপরাজিতার মত নীল? অনেকক্ষণ ছাদে ঘুরে বেড়িয়েছিল হৈমন্তী একা একা সেদিন চারপাশের সতর্ক দৃষ্টির সামনে।

সেই থেকে শুরু। প্রায় বিকেলের নির্জন ছাদে এ সময়টা উঠে আসে হৈমন্তী মার চোখে ধুলো দিয়ে। আকাশটাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে অনেকক্ষণ। তারপর হতাশ ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে নীচে তাকায়। ছাদের আলসেতে ঝুঁকে পড়ে রৌদ্রম্লান ট্রামলাইনের সিরসির শব্দ শোনে উৎকর্ণ ভাবে। ট্রাম আসবে কথাটা মনে হতেই হৈমন্তীর শিথিল দেহটা খোঁচা-খাওয়া সাপের মত শক্ত হয়ে ওঠে। অবনী আসবে!

শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক বলতে গেলে চুকেই গিয়েছে, অনেকদিন কেউ কারও খবর নেয় না। হৈমন্তীর কিন্তু খবরের অভাব নেই। দরকারী-অদরকারী সবকিছু জানা চাই ওর। জয়ন্তীর কলেজ যাবার পথে খপ করে ওর হাত টেনে ধরে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ রে জয়ন্তী, আজ এত সেজেছিস কেন, কেউ আসবে বুঝি?—পরমুহূর্তেই আবার পড়ার ঘরে গিয়ে লোটনের সাজানো বইপত্র ফের গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলে, লোটনবাবু, এত বড় হয়েছ কিন্তু বড় অগোছাল তুমি। আজ ইস্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে পড়বে তুমি।—লোটন তখুনি রাজী। দিদির কাছে পড়াই তো মজা। কোন দিকে খেয়াল থাকে নাকি ওর। খানিকক্ষণ ইংরেজী কি ইতিহাস বই নিয়ে পাতা ওলটায়, তারপর উঠে গিয়ে জানলার ধারে আড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ইতিহাস বই থেকে মুখ তুলে লোটন মাঝে মাঝে দিদিকে দেখে। কি করুণ আর সুন্দর দিদিকে দেখতে! ঠিক রাণা ভীম সিংহের পত্নী পদ্মিনীর মত! জহর-ব্রত করতে যাচ্ছে। জহর-ব্রত করতে যাচ্ছে কথাটা মনে হতেই কিন্তু লোটনের কান্না পায়। তখন আর পড়ায় মন বসে না। এর থেকে ছোড়দির কাছে পড়াই ভাল ছিল, বড্ড মারে ছোড়দি পড়া না পারলে। কিন্তু কই, এমন মন খারাপ হয় না তো!

* * *

হৈমন্তী ছাদে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম ট্রামটা চলে গেল। অপস্রিয়মাণ জানলাগুলোর প্রত্যেকটা দেখল সে। নেই, এটাতে এল না অবনী। কিছুক্ষণ গেল। দ্বিতীয় ট্রামটা আসতে দেরি করছে। মোড়ের মাথায় লাল আলোটা দেখা যাচ্ছে এখন। হৈমন্তী উৎসুক ভাবে ঝুঁকে পড়ল আবার। এর আগেরটায় প্রথম জানলাটা দেখা হয় নি। অধৈর্য ভাবে ছাদের খসখসে শানে পা ঘষতে লাগল হৈমন্তী। এইবার আসছে। ওই তো! ওই—

উত্তেজিত হাতে কপালের উড়ো চুল সরিয়ে হৈমন্তী আরও ঝুঁকে দাঁড়াল। ঘাড়টা সেইরকম বাঁ দিকে একটু কাত করে ভুরু বাঁকিয়ে ওপরে তাকাল। কিন্তু মুখটা ভাল করে দেখবার আগেই চলে গেল ট্রামটা। তড়বড় করে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম আঙুরের মত টুবো টুবো আঙুলে চেপ্টে দিয়ে হৈমন্তী ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঝামার মত খরখরে আলসেতে ঘুষি মারল জোরে। চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্তের আভা ফুটে উঠল মুঠির পিছনে।

ট্রাম-স্টপ থেকে একজন ভদ্রলোক ওদের বাড়ির দিকেই আসছে। হৈমন্তী অনাসক্ত ভাবে দেখল লোকটাকে, তারপর নিজের হাতের ক্ষতটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল মনোযোগ দিয়ে। দূরে জোড়া গীর্জার

মাথায় মোরগের ঝুঁটির কাছে আকাশ ফ্যাকাশে হলুদ। চিলেকোঠার দরজায় কিন্তু রোদ্দুর থরথর করে কাঁপছে রঙিন প্রজাপতির মত।

হাফপ্যান্টের পিছনে জলখাবার খাওয়া হাত মুছে উপরে উঠে এল লোটন। গিয়ে দিদিকে জড়িয়ে ধরে বলল, নীচে চল্ দিদি, প্রতাপদা ডাকছে।

হৈমন্তী আঁচল টেনে ছাদের আলসেতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, তারপর ভুরু কুঁচকে অন্যমনস্ক ভাবে বলল, প্রতাপ! কোন্ প্রতাপ বল্ তো?

হৈমন্তীর ছড়ে-যাওয়া আঙুলে শক্ত করে চাপ দিয়ে লোটন বেসুরো গলায় চেঁচাল: বা রে, প্রতাপদাকে তোর মনে নেই? সেই যে কয়েকদিন আগে এসেছিল আমাদের বাড়িতে—

হৈমন্তী মনে করবার চেষ্টা করল। অনভ্যস্ত হাতে ছুঁচে সুতো পরাবার মত প্রতাপকে ওর স্মৃতির দুয়ার দিয়ে গলাবার চেষ্টা করল। সন্দিগ্ধ ভাবে লোটনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের বাড়ি এসেছিল!

লোটন অবাক হয়ে দিদিকে দেখে। দেখতে এত সুন্দর দিদিকে, অথচ ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে! চারপাশের নির্জন বিকেলের ছমছমানিতে লোটনের মন খারাপ হয়ে গেল। নরম গলায় বলল, চল্ দিদি, সবাই বসে আছে।

জয়ন্তী কলেজ থেকে দেরি করে ফিরে দেখল দরজায় প্রতাপ দাঁড়িয়ে আছে। দাঁতের ফাঁকে এলাচদানা চিবুতে চিবুতে মার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, আজ চলি মাসীমা, আর একদিন আসব আবার।

বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠে থেমে গেল জয়ন্তীর। দিদি আজকে আবার—

মাঝে মাঝে এসো বাবা, লোকের সঙ্গে একেবারে কথা কইতে পারে না বলেই হয়তো মেয়েটা এমন—

মার গলাটা আর্ত শোনাল। জয়ন্তী চিলের মত ছোঁ মেরে তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল, কি, কি করেছে দিদি?

প্রতাপ যেন অনেক উঁচু থেকে জয়ন্তীকে দেখল। শান্ত গলায় জবাব দিল, কিছু হয় নি। আজ আমার সঙ্গে অনেক গল্প করলেন তোমার দিদি।

জয়ন্তী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রতাপের দিকে তাকাল। বুকের কাছে শক্ত করে চেপে-ধরা বইখাতার দেওয়াল ভেঙে জোরে নিঃশ্বাস পড়ল তার ছোটখাটো দেহটা কাঁপিয়ে। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম অস্বস্তি মনের আরও গভীরে কাঁটার মত বিঁধে রইল যেন। বলি বলি করেও বলা হল না, এখনই যাচ্ছেন কেন, আর একটু বসুন না।

ঘরের ভিতর কাপড় বদলাতে বদলাতে পাশের আয়নায় মুখ দেখল জয়ন্তী। তেলতেল ঘামে কালো দেখাচ্ছে। শুকনো গামছায় কপাল ঘষতে ঘষতে দেখল সামনের বড় ঘরের মেঝেতে ক্যারাম-বোর্ড পাতা। উপরের ঘুঁটিগুলো ইতস্ততঃ ছড়ানো। পাশে এঁটো প্লেট আর কাঁচের গ্লাস। লোটন পড়ার বইগুলো সাজাতে সাজাতে উৎসুক ভাবে বলল, জানিস ছোড়দি, দিদি আমাদের সঙ্গে ক্যারাম খেলছিল আজ।

জয়ন্তী সাবানের বাক্সটা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, আমাদের সঙ্গে মানে, তুই আর কে?

প্রতাপদা একদিকে, আর একদিকে আমি ও দিদি। প্রতাপদার খেলা দেখেছিস তুই? হাসতে হাসতে সেঞ্চুরী-বোর্ড করে। আমরা প্রথমটা তো নীল-গেম খেলাম।

উৎসাহের চোটে লোটন বই-খাতা ছুঁড়ে ফেলে জয়ন্তীকে টেনে নিয়ে গেল ওঘরে। কেউ যেন তাকে ক্যাষ্টর অয়েল বা ওই জাতীয় কিছু খেতে বলেছে এমন মুখ করে শায়া-ব্লাউজ কাঁধে ওঘরে ঢুকল। হৈমন্তী বিছানায় আধশোওয়া ভাবে একটা রঙ-চঙে ম্যাগাজিনের পাতা উলটে ছবি দেখছে। প্রতাপদা এনেছে নিশ্চয়ই, জয়ন্তী মনে মনে ভাবল। হৈমন্তী ফিরে তাকাল, চোখ দুটো ভারী শান্ত। কী করুণ অথচ কী সুন্দর দেখাচ্ছে দিদিকে! জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে এনে জয়ন্তী তীক্ষ্ণভাবে তাকাস চারদিক—সদ্য-সাজানো-গোছানো শেষ করে নতুন ভাড়াটে-বউ যেমন দেখে। ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে চোখ আটকে গেল এক জায়গায়। হৈমন্তীর কনুইয়ের ওপাশে বালিশটার কোণে চকচক করছে জিনিসটা। ছোঁ মেরে তুলে আনল জয়ন্তী সোনালী রঙের একটা সুদৃশ্য ছোট শিশি, তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল ভুরু কুঁচকে। লোটন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, ওটা কি সেন্ট বল্ তো? ক্যালিফরনিয়ান পপি।

প্রতাপদা দিদিকে দিয়েছে।—তারপর এগিয়ে এসে বলল, খুব সুন্দর গন্ধ, শুঁকে দেখ্।

জয়ন্তী এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলল, থামবি তুই?

হৈমন্তী আবিষ্টের মত চোখ তুলে এতক্ষণে যেন ছোট বোনকে দেখল। নির্লিপ্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, কি রে ওটা, ওই সেণ্টটা বুঝি?

তারপর সোজা হয়ে বসে বিছানায় দু হাতে ভর রেখে অন্যমনস্ক ভাবে বলতে লাগল, ভারী চেনা গন্ধটা, খুব হালকা আর মিষ্টি।

একখণ্ড নরম সিল্কের মত মনটা ছড়িয়ে দিতে চাইল যেন ও। কী যেন? ঠিক কিসের মত যেন? চিন্তার মৃদু উত্তেজনায় ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হৈমন্তী। চোখের তারা বড় বড় করে, হাতের মুঠি শক্ত করে চেপে ধরে মিনিটখানেক প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করল গন্ধটা, তারপর হতাশভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে ধপ করে বসে পড়ল খাটে।

জয়ন্তীর এতক্ষণের অস্বস্তিটা হঠাৎ উবে গেল। অপরাধী মন ঘরের চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পালিয়ে এল চৌকাঠের এপারে। অস্পষ্টভাবে লোটনকে পড়ার ঘরে যেতে বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

শ্রীমন্ত অফিস বেরোয় সকাল নটায়। তারপর জয়ন্তী আর লোটন প্রায় একসঙ্গে। লোটনের হৈ-চৈ সবচেয়ে বেশী। হাঁকডাকে অস্থির করে তোলে সবাইকে। ওরা বেরিয়ে যাবার পর ঘড়ির কাঁটাটা যেন হঠাৎ থেমে যায়। এগারটা বাজবার আগেই নিঃশব্দ দুপুর যেন শিকড় গেড়ে বসে এ বাড়িতে।

ভাঁড়ার ঘরের কোণে মার সঙ্গে বসে খায় হৈমন্তী। আতপ চালের ভাত, আলুসেদ্ধ আর ঘি। প্রথম প্রথম ভাতগুলো পাতে নিয়ে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ত একসময়। আজকাল সহজ ভাবে খেতে খেতে মাঝে মাঝে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে। আজকাল কি যেন ভাবতে চেষ্টা করে হৈমন্তী। কিন্তু ভাবনার পথ বন্ধ। মনটা যেন ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে ব্যর্থ হয়ে। ডেলা-পাকানো ভাতের গ্রাসটা নাড়াচাড়া করতে করতে হৈমন্তী আড়চোখে মার দিকে তাকায়। বয়স হয়ে গেছে মার। রূপোর তারের মত পাকা চুলগুলো ছড়িয়ে আছে ফরশা শীর্ণ পিঠের উপর। মা যেন খুব দুঃখী, এ সংসারে কেউ নেই যেন তার। পরক্ষণেই কিন্তু একটা গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। এতক্ষণ কী ভাবছিল সে? চোখের তারা বড় বড় করে, ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলে হৈমন্তী চারদিক তাকায়, ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় বিব্রত। হৈমন্তী বুঝতে পারে দূর থেকে ওকে সবাই পাহারা দেয়, এমন কি লোটন পর্যন্ত। মার চোখ ফাঁকি দিয়ে বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে হৈমন্তী পালিয়ে আসে ছাদে। শ্রীমন্ত প্রথমটা খুব বকাবকি করত। বুঝিয়েও বলেছে কতদিন। কিন্তু হৈমন্তী পারে নি নির্জন বিকেলের হাতছানি উপেক্ষা করতে।

রাতে শুতে গিয়ে খাটের পাশে থমকে দাঁড়ায় হৈমন্তী। পাশের বিছানায় জয়ন্তী ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকবার দাঁড়ানো জানলায় আবার গিয়ে দাঁড়ায় সে। এ সময়টা কিন্তু অদ্ভুত লাগে। অন্য সব সময় থেকে এ সময়টা সম্পূর্ণ আলাদা। একা একা চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। লক্ষ যোজন দূরের আকাশের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে নিজেকে যেন অনুভব করতে পারে হৈমন্তী। দেহটা ভারশূন্য। হৈমন্তী বিদেহী আত্মার মত মহাশূন্যের নিকষ অন্ধকারে যেন ভেসে বেড়ায়। নির্জন ফুটপাথে কোন রাতচরা গরু অকারণে ক্ষুরের খটখট শব্দ তুলে কিছুদূর গিয়ে আবার চুপ করে দাঁড়ায়। সামনের বকুল গাছে একটা কাক ঘুম-জড়ানো চোখে হঠাৎ কা-কা করে ডেকে ওঠে। ঠিক তখুনি একটা করুণ কান্না যেন বুকে এসে বাজে। দু হাতে জানলার গরাদ শক্ত করে চেপে ধরে হৈমন্তী। আকাশ বড় দূর, বড় নির্জন আর অন্ধকার। কাঁপা কাঁপা পায়ে কোনরকমে বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে সে।

* * *

হৈমন্তী অপলক দৃষ্টিতে দেখছিল প্রতাপের আঙুল। কী মোটা মোটা আঙুলগুলো! অথচ অব্যর্থ নিশানা। বোর্ডের ঘুঁটিগুলো বিদ্যুতের মত ছিটকে গিয়ে পড়ছে পকেটে। সামনের বড় ঘরটায় মেঝেতে বসে ক্যারাম

খেলছিল ওরা দুজন। লোটন কিছুক্ষণ বসে উসখুস করে নীচে নেমে গেছে ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে। পাশের ঘরে মা ছাড়া আর কেউ নেই।

রাস্তার দিকের জানলাগুলো বন্ধ। ফিকে অন্ধকার চারপাশে, এবার হৈমন্তীর দান। ফরশা সরু সরু আঙুলে স্ট্রাইকারটা শক্ত করে চেপে ধরে হৈমন্তী বসে ছিল। পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে প্রতাপ বলল, কি হল হৈমন্তী, এবার তোমার দান। কই, মার?

প্রতাপ কিছুদিন হল হৈমন্তীকে তুমি বলতে আরম্ভ করেছে। শ্রীমন্তই বলেছিল, মন্টি তোমার চেয়ে অনেক ছোট প্রতাপ, ওকে তোমার আপনি আপনি করতে হবে না। কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে শ্রীমন্তর স্ত্রী লতা একটা পিতলের ধূপদানী পরিষ্কার করছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে এসে রায় দিল, হ্যাঁ, মন্টিদি আমার চেয়ে বেশী বড় নয়। প্রতাপ মৃদু হেসে চুপ করেছিল। লতার বিয়েই হয়েছে প্রায় চব্বিশ বছর বয়সে অথচ শ্রীমন্তর হিসেব অনুযায়ী হৈমন্তীর চব্বিশ চলছে এখন।

প্রতাপ তাড়া দিল, কই, মার হৈমন্তী?

অ্যা—কি যেন!

হৈমন্তী সোজা হয়ে বসল এতক্ষণে। মনে মনে ভাবল মনটা যেন ছাদে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। ছাদের কথা মনে হতেই একটু চঞ্চল হয়ে উঠল সে। ইতস্তত: করতে দেখে প্রতাপ খপ করে হৈমন্তীর হাতখানা চেপে ধরে স্ট্রাইকারের উপর বসিয়ে দিল একটা কালো ঘুঁটি তাক করে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল হৈমন্তী। নির্জন ঘরে কেউ নেই। মা পাশের ঘরে কম্বলের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে। হৈমন্তী ভয় পায় নি। প্রতাপের দিকে বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। এ স্পর্শটাও তার চেনা। ঠিক যেন—ঠিক কিসের মত যেন! প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল কথাটা। দু চোখের তারা বড় বড় করে, হাতের মুঠি শক্ত করে, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল হৈমন্তী। আঁচল মাটিতে লোটাচ্ছে খেয়াল নেই। দরজার পাল্লা শক্ত করে চেপে ধরে যন্ত্রণাকাতর চোখে প্রতাপের দিকে তাকাল সে। কথাটা যেন মনের এক হিম-শীতল ঘরের আবছা অন্ধকারে লুকিয়ে আছে, চিনেও চিনতে পারছে না হৈমন্তী।

হৈমন্তী—

একটা বিরাট গুহার অপর প্রান্ত থেকে যেন ডাক দিল প্রতাপ। শব্দটা গম্ গম্ করে ছড়িয়ে গেল ঘরময়। সমস্ত বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে গম্ভীর ভাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল হৈমন্তী—হৈমন্তী।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল হৈমন্তী। ছুরির ফলার মত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দূরের জোড়া গীর্জার মাথায় আকাশটাকে দেখতে লাগল। হালকা বেগুনী—না না। প্রবল ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার অন্যদিকে তাকাল সে। পাতিপাতি করে হৈমন্তী খুঁজতে লাগল আকাশের রঙ। রৌদ্রম্লান ট্রামলাইনে সিরসির শব্দ উঠছে, ট্রামে আসবে এখনই। ট্রাম আসবে কথাটা মনে হতেই উৎকর্ণ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অবনী আসবে।

ট্রাম আসছে।

পিঠের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রতাপ। বেতপাতার মত কাঁপছিল হৈমন্তী। কানের কাছে গুম গুম শব্দ তুলে সুরঙ্গ-পথে মেল-ট্রেন ছুটে চলেছে দূরের উজ্জ্বল আলোর বৃত্তের দিকে। ওপারে আকাশ। অপরাজিতার মত নীল আকাশ। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রাণপণ শক্তিতে প্রতাপকে জড়িয়ে ধরে হৈমন্তী জ্ঞান হারাল। অবনী ফিরেছে।

প্রাণপাথেয়

শ্রীদেবব্রত রেজ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সেই যে সেদিন দুর্যোগের রাত্রিশেষে সুস্মিতাকে একটা কুটিরের কর্দমাক্ত মেঝেতে ফেলে রেখে শেষের পাতলা পলির ওপর পায়ের ভাঙা ভাঙা চিহ্ন খ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন শীলভদ্র তার পর থেকে ঘুমোন নি। ঘুমুতে ভয় পেয়েছেন। গৃহস্থ যেমন ভয় মুতে রাত্রির চুরির পর। শীলভদ্র দিনরাত জেগে ন নিজেকে পাহারা দেবার জন্যে।

স্মিতা যখন নিজের পুরনো শয্যায় ঘুমে অসাড় গল তখন পথ থেকে কুড়নো জনদুয়েক ভবঘুরের সঙ্গে র বাঁকুড়া জেলার শিলাবতী নদীর এক দিকের তীর ান্ধকারের মধ্যে এগিয়ে চলেছেন। নিম্নকণ্ঠে সকলে ভজন গান গাইতে গাইতে চলেছেন।

ায়ের নীচে যে মাটি তা চাঁদের আলোয় শুষ্ক চন্দনের ঃ ধরেছে। শুষ্ক রক্তচন্দনের মত। এই মাটির ওপর না। ।দনঃ ঘর্ষণে ঘর্ষণে পায়ের ত্বকে জালা ধরেছে নাঘাসদলকে মনে হচ্ছে চন্দন-মাখানো শুষ্ক কুশ।

থার উপরে নীল আকাশে পরিপূর্ণ গোল চাঁদ। র মনে হল নীল যমুনায় ভাসিয়ে দেওয়া রাধার সোনার কলস। আশ্চয এই কলস, কোনদিন এ , ভরে গেলেই ডুবে যেত। যেমন তিনি ডুবে । ওই রাধার কলসটার কানা ধরে তাঁর মন াকতে চাইছে।

তমস্তক নগ্নপদ শীলভদ্র যে ভাবমণ্ডলে আশ্রয় সেও একটা চান্দ্রলোক। তাঁর এই ভাবমণ্ডলে ার মধ্যে বিরোধ নেই। সেখানে কঠিনে একাকার। স্পষ্ট রূপ অস্পষ্টের ও সীমিত রূপ াছে। সে চান্দ্রলোকে স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে ারেখা নেই।

স্বপ্নের মধ্যে চলেছেন বলে শীলভদ্রের শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই। উপরে নীল আকাশে চাঁদের কলস ভেসে ভেসে চলেছে আর এই কলস লক্ষ্য করে শীলভদ্র চলেছেন মাটির ওপর।

যখন চাঁদ ডুবল তখন শীলভদ্র শীলাবতীর তীরে একটা ঘাটে এসে পৌছলেন। সঙ্গী একজন জানাল তাঁরা 'রাজবাড়ী'র ঘাটে এসে পৌছেছেন, এখানে নদী পেরতে হবে। পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই তাঁরা গন্তব্যে পৌছবেন।

নামে রাজবাড়ির ঘাট। প্রকৃতপক্ষে একটা ভাঙা ঘাট। এ ঘাট যখন এখানে বাঁধানো হয়েছিল তখনও নদী এখানে মারমুখী হয়ে ওঠে নি। এখন সে ঘাটকে ফাটিয়ে চৌচির করে দিয়েছে। ফাটলে ফাটলে বেনাঘাস। আর শেষ কয়েকটা ধাপ ভেঙে গড়িয়ে পড়েছে নদীর গর্ভে। ওপরের ধাপ কয়েকটা শূন্যে ঝুলছে। তাদের তলাকার মাটি ক্রুর নদী অদৃশ্য তরল নখে খুঁড়ে খুঁড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ঘাটের ওপর দিয়ে পারে ওঠার উপায় নেই। বেনাঘাসের গোড়া ধরে ধরে পাহাড়ে ওঠার মত ঘাটের পাশের খাড়া পাড় বেয়ে ঘাটে উঠতে হয়। ঘাটের ওপরেই ঘনসন্নিবিষ্ট ছোটবড় গাছের দেওয়াল। আড়াল করে রেখেছে সেই 'রাজবাড়ি'টা যার নামে নামকরণ হয়েছে এই ঘাটের। এখান থেকে গাছের মাথাগুলোর ফাঁক দিয়ে সেই রাজবাড়ির একখানা চিলেকোঠা মাত্র নজরে পড়ে।

ঘাটে উঠে শীলভদ্র একবার সদ্যঅতিবাহিত পথের দিকে ফিরে চেয়ে দেখলেন। দু ধারের প্রশস্ত বালুচরের পিঙ্গল আলিঙ্গনের মধ্যে শীলাবতী টলতে টলতে চলেছে। ঘূর্ণীর ভাব তার এখনও কাটে নি। পাথরে পাথরে ঠোকর খেতে খেতে তাকে চলতে হয়। তাই সে ঘুরে ঘুরে চলে।

এইমাত্র জল থেকে উঠেছেন বলে শীলাবতীর জলের ঘূর্ণীর বেগ এখনও যেন লেগে রয়েছে। কয়েক নিমেষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন শীলভদ্র এই ঘূর্ণী ভাবটাকে দমন করতে। প্রভাত হয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে সামনে চেয়ে দেখলেন গিরিমাটির পাড় পেরিয়ে সবুজ শালের বন। কোথাও তীব্র সবুজ, কোথাও আরক্তিম। ঠাঁই ঠাঁই ফুটন্ত পলাশ গাছে উচ্চ গ্রামের টকটকে লাল। লাল আর সবুজের নানা গ্রামের একত্র সমাবেশ।

বহু দূরে তীক্ষ্ণ নীল আকাশের কোলে মূর্ছিত গিরিশ্রেণী স্তূপীকৃত স্নিগ্ধ নীলের মত। মনে পড়ল ছেলেবেলায় রামায়ণের মধ্যে দেখা একখানা ছবি। ঊর্ধ্বলোকচারী নারদের বীণা থেকে স্খলিত পারিজাতের ছোঁয়ায় সদ্যমৃতা ইন্দুমতী স্বামী মহারাজ অজের কোলে পড়ে রয়েছেন।

এই ছবিটার স্মৃতি অজ্ঞাতসারে মনে ভেসে উঠল। আশ্চর্য, তাঁর মন থেকে যখনই যে ভাবপ্রতিমার (symbol) উদয় হয় তার রূপই নারীর রূপ! শীলভদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, হরি হরি!

রাজবাড়ি থেকে লোক এসে পৌঁছেছে ওঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য। কয়েকজন সাঁওতাল। তাদের সঙ্গে নিবিড় ছায়ার ভিতর দিয়ে স্তূপীকৃত পাতা-ঝরা, নিশ্চিহ্ন-প্রায় একটা পায়ে-চলার পথ ধরে এগিয়ে চললেন শীলভদ্র। যে গুরুগন্ধ অদৃশ্য ঘন পদার্থের পিণ্ডের মত গুল্মস্তূপের মধ্যে জমে পড়েছিল তা হঠাৎ মন্দ বাতাসে নড়েচড়ে ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে দিল। এই নিবিড় ছায়ার মধ্যে সূর্য যে সব আলোর তীর ছুঁড়ে দিয়েছেন সে সব তীরের মুখে কোনও তীক্ষ্ণতা নেই, সবুজের জড় ধরে যেন তাদের ধার গেছে নষ্ট হয়ে।

রাজবাড়িতে পৌঁছে দেখলেন সে এক অদ্ভুত প্রাসাদ। একখানা একতলা পাকাবাড়ি আশেপাশে কয়েকটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির ঘরকে চারপাশে নিয়ে ঘন শাল জঙ্গলের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হোক দীন তবু এই রাজবাড়ির কয়েক শতাব্দীব্যাপী পুরনো ইতিহাস আছে। এই রাজবংশ উৎকল ব্রাহ্মণ। কয়েক শতাব্দী পূর্বে নিজের দেশের অর্থাৎ উৎকল প্রদেশের বলবত্তরদের হাতে পরাভূত হয়ে আদিবাসী অধ্যুষিত এই জঙ্গলাকীর্ণ, পাথর কাঁকর আর দ্রুতধাবমান নদীর দেশে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। কৃষ্ণকায় শিকারসর্বস্ব অরণ্যচারীদের এই জঙ্গল পাহাড়ের প্রাকৃতিক দুর্গে এরা কখন ও কোন্ সূত্রে অনুপ্রবেশ করেছিলেন তা জানা শক্ত। তবে এদের অধিকাংশ এসেছিলেন লুণ্ঠনকারীরূপে। ছোট ছোট দস্যুদলের নেতৃত্ব নিয়ে এইসব ছোট ছোট বংশের আদিপুরুষরা এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন আর কুটিলবুদ্ধি ও সীমাহীন নিষ্ঠুরতার বলে আদিবাসীগোষ্ঠীর দলপতিদের উৎখাত করে নিজেরাই তাদের দলপতি হয়েছেন। সভ্যতার ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে এঁরা এই অসভ্যদের দেশে জায়গীর অর্জন করেছিলেন।

জঙ্গলের মধ্যে নদীর তীরে এঁরা প্রথমে মাটি দিয়েই রাজবাড়ি তৈরি করেছিলেন।

গত শতাব্দীর শেষে কোথাও কোথাও এই সব মাটির প্রাসাদের সঙ্গে দু-একটি পাকাবাড়ির সংযোজন ঘটেছে।

মহুয়া আর পলাশ, নেড়া কালো পাথর, গভীর-গম্ভীর শালের বন, পাথরে ঠোক্কর খেয়ে ঘূর্ণী লাগা নদী, অজস্র বুনো ফল, অজস্র বুনো পাখি, আর আদিম প্রজা চতুর্দিকে নিয়ে এরা সভ্যতা থেকে নিজেদের সন্তর্পণে দূরে রেখেছে।

শীলভদ্র যে রাজবাড়িতে আশ্রয় নিলেন, সেই বাড়ির রাজা নেই। শুধু রানী বর্তমান। কয়েক বৎসর পূর্বে এখানকার রাজা মাত্র তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়সে বন্ধু রতনগড়ের রাজার বাগানবাড়িতে অর্থাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোট্ট মেটে ঘরে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধের ফলে মারা গেছেন। এ ধরনের মৃত্যু এইসব বংশে অ- পরিচিত এবং প্রত্যাশিত যে যুবতী রানী নন্দি- সময়মত স্বামীর শোক গেলেন ভুলে। এখন রাজ অর্থাৎ জমিদারী দেখাশুনা করেন নায়েব আর বিপদে আপদে তাঁর দেখাশুনা করেন স্বামীবন্ধু রতনগড়ের যুবক রাজা।

এখানে শীত ঋতুতে প্রায় সমস্ত অরণ্য রিক্তপত্র হ- যায় আবার বসন্তে নবকিশলয়ে ভরপুর হয়ে ওঠে। এখানে শোক স্থায়ী নয়। শোক আর উল্লাসের অবিচ্ছিন্ন পরিক্রমা চলে একের পর অন্যের। মহুয়ার কুঁড়ি ধরার পূর্ব পর্যন্ত শোক, কুঁড়ি ফুটলে উল্লাস।

সারাদিনটা জপতপ করে কাটিয়ে দিলেন শীলভদ্র। জকাল মনে মনে নিরবচ্ছিন্ন নামজপ করে চলেছেন। যেন নিঃশ্বাস ফেলতে সময় না পায়।

সন্ধ্যার পর রাজবাড়ির একমাত্র পাকা ঘরের তলার ছাদে বসে ছোট্ট সভায় শীলভদ্র রানীকে ভূদান জ্ঞর মর্ম বোঝাতে বসেছেন। রানী আছেন আর একটি দিবাসী কিশোরী পরিচারিকা। শীলভদ্র কথকতায় সেছেন, রানী কপালের অর্ধেক পর্যন্ত ঘোমটা নামিয়ে বসে সে কথা শুনছেন আর কিশোরী পরিচারিকা কয়েক হাত ফাতে বসে আপন মনে নিজের বেণী রচনা করছেন।

শীলভদ্র বলে চলেছেন: ঈশ্বরের সৃষ্টিতে অসাম্য হাপাতক⋯ধরিত্রীর কোল সকল প্রাণীর আশ্রয়, রণীর স্তন্যে সকলের সমান অধিকার। আজ দেবতার ন্যেও যে ভূমি নির্দিষ্ট তাও নরনারায়ণের মঙ্গলের ন্য বণ্টন করে দিতে হবে। অন্যথায় দেবতা রুষ্ট হবেন।

শীলভদ্রের কথার নদী বয়ে চলেছে। কখনও উষর তত্ত্ব ক্ষেত্রের উপর দিয়ে, কখনও আবেগের তৃণে রোমাঞ্চিত অনুভব ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে, কখনও ঝরনার মত সাধারণ মানুষের দৈন্যের সমতলের দিকে। নিজের নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বলছেন রানী নন্দিনীর মুখের দিকে চেয়ে।

রানী নন্দিনী চেয়ে আছেন শাল গাছের কিরীটে উদীয়মান নতুন চাঁদের দিকে। বনভূমির গাছের মাথায় মাথায় যেন একটি কালো উপকূল তৈরি হয়ে গেছে আর সেই উপকূলের সৈকতে জ্যোৎস্নার সমুদ্র ভেঙে পড়ছে, গুঁড়ি-গুঁড়ি ফেনা শালগাছের নতুন চিকন পাতার ওপর চকচক করছে।

শীলভদ্র নন্দিনীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কথা বলে চলেছেন। জ্যোৎস্নার ঢেউ এসে ছড়িয়ে পড়ল ছাদে। আদিবাসী কিশোরীর পাথর-কালো চিকন মুখ আর অনাবৃত বাহুর ওপর পড়ে ঝকমক করে উঠল।

পরিণতযৌবনা নন্দিনী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছে চাঁদের দিকে। সৌরভের ধূমের মত তার সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না জড়িয়ে গেছে। কিংবা একরাশ শালের ফুলের মত। নন্দিনী ভাবছে এক মাস পরে যে 'শালুই' রব পড়বে তার কথা। মহুয়ার মদ⋯মাদল।

শীলভদ্র নন্দিনীকে উদ্দেশ করে কথা বলছেন। কিন্তু সে সাড়া দেয় না। নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। তার গলায় হার ঝকমক করে। কপালের ওপর শাড়ির লাল পাড় বনের পলাশ রেখার মত জ্বলে। সুস্পষ্ট সুগোল মুখখানির মধ্যে চোখ দুটো পদ্মের মধ্যে জলবিন্দুর মত টলমল করে। হাতের মণিবন্ধে, সোনার চুড়ে অশরীরী দ্যুতির চমক ওঠে মাঝে মাঝে।

শীলভদ্রের পরিচিত চান্দ্রলোক নেমে আসে তাঁর অনুভব রাজ্যে। স্থান কাল বিলীন হয়ে যায় চেতনায়। আপন মনে ভজন গান গাইতে শুরু করেন—মেরে নয়নমে বৈঠো নন্দলালা!

ভজন শেষ হলে নন্দিনী উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করে। প্রণাম সেরে উঠে আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

শীলভদ্র সান্ত্বনার সুরে বলেন, মানুষ তো একাই এসেছে মা! একাই যাবে! এক হয়ে এসেছে কেন জান? আর এককে খুঁজতে। যাবার সময় যদি দুই হয়ে যেতে পারে এই তার লক্ষ্য। এই 'আর এক' মীরার গিরিধারী, দুঃখের গিরি তিনিই ধারণ করে আছেন। তিনি এই দুঃখের গিরি ধারণ না করলে আমরা যে গুঁড়িয়ে যেতাম মা। তোমার দুঃখের গিরি তিনিই ধারণ করে আছেন। যে অনামিকায় তিনি এই গিরিটা ধারণ করে আছেন সেই গিরিটাকেই খুঁজে দেখ মা।

বনভূমির দিকে চেয়ে বললেন, এই যে সরল শাল গাছের কিরীটে আকাশ নিজের ভার রেখেছে, ওর মতই সরল কোনও অদৃশ্য অনামিকা। সেই অদৃশ্য অনামিকায় তিনি দুঃখের রাত্রিটা ধারণ করে আছেন। তোমার গিরিধারীকে খোঁজ মা। তোমার ধন-জন-সম্পদ সেই গিরিতলে ছায়ার মত একান্ত অলীক!

নন্দিনী যে দুঃখে কাঁদল তা নয়। মানুষের পরিবেশের সমস্ত পদার্থ যখন একই সময়ে তার সঙ্গে নানান কথা বলে তখন মানুষ কান্না দিয়ে তার জবাব দেয়। এই কান্নাটাকে শান্ত করে বলেন শীলভদ্র, ওটি তোমার বিরহ মা, এ বিরহ তোমাকে সইতেই হবে। জানি, এ বিরহ তুষের মত তোমার চেতনার তলায় আগুন জেলে রেখেছে; জানি, এ আগুন ঘুমে জাগরণে কখনও—কখনও নেভে না।

দূর থেকে একটা কুকুর দীর্ঘ বিলম্বিত চিৎকার করে

উঠল। সহসা শীলভদ্রের মনে হল তিনি আপন মনের ঘোরে কী সব বলছেন এতক্ষণ! সব কথা স্পষ্ট স্মরণেও আসে না। কিশোরী পরিচারিকা উঠে দাঁড়াল। সাঁওতালী ভাষায় রানীকে কী বলল।

শীলভদ্র শুনলেন কাছারির প্রাঙ্গণে একটা ঘোড়া এসে থামল। থেমে উচ্চে একটা হ্রেষাধ্বনি করল। নন্দিনী চঞ্চল হয়ে উঠল।

সলজ্জে ধীরে ধীরে বলল, দোতলার পশ্চিমদিকের কোণের ঘরে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে ঠাকুর।—বলে চলে যাবার জন্যে উদ্যোগ করল।

আচ্ছা, তুমি যাবে এখন? এস। বিশ্রাম কর গে।

নন্দিনী পরিচারিকার কাঁধে ভর রেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সিঁড়ির ওপর তার পায়ের শব্দে দেহের স্থূলতার পরিমাপ পরিষ্কার বোঝা গেল। এখনও এত শাসনের পরও মানুষের দেহ সম্পর্কে তাঁর ইন্দ্রিয় এত অতিরিক্ত সজাগ দেখে শীলভদ্র মনে মনে লজ্জায় নিজের প্রতি ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন। হরি হরি!

ছাদের যেখানে একটু আগে নন্দিনী দাঁড়িয়ে ছিল শীলভদ্র বিস্মিত হয়ে দেখলেন সে জায়গায় একটা অতি হৃষ্টপুষ্ট ধূসর সাদা রঙের বিড়াল থাবা গেড়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে। তার চোখ দুটো জলজল করছে। বিড়ালটা যেন প্রকৃতির আদিম জ্ঞান দিয়ে তাঁর মনের চিন্তার খবর পেয়েছে। কিংবা এই বিড়ালের ছদ্মরূপে একটা ক্রুর দানব তাঁর দিকে এই নির্জন আরণ্যক পরিবেশে এই আধো-অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে রয়েছে। এই দানবটা তাঁর জীবনের, তাঁর মনের অন্তরালের দুষ্ট শক্তি! এই দুষ্ট শক্তিটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাঁর মনের মধ্যে সদ্য-লেপিত একটা গ্লানিকে খুঁজে বের করতে চাইছে। এই পশুটার চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সেই গ্লানিটা আবার মনের নীচে থেকে উপরে ভেসে উঠল। কিছুতেই তাকে মনের নীচে ডুবিয়ে রাখা গেল না। সেদিন ঝড়ের রাত্রে ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে সুস্মিতাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে এসেছিলেন। আজ নিজে অজ্ঞান হয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইল তাঁর চেতনা। শীলভদ্র নিজের অজ্ঞাতসারে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

* * *

ডেপুটি ডাইরেক্টর রায়ের বাংলোর আক্রমণরত জনতা ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর বরেন শেষরাত্রে বাড়িতে ফিরলেন। বাড়ি ফিরলেন টলতে টলতে। যেন দীর্ঘদিন কোন এক সমুদ্রে ভেলায় ভেসে ভেসে এসে এই মাত্র কূলে নেমেছেন। সমুদ্রের দোল রয়েছে দেহের প্রত্যেকটা কোষে।

বরেন প্যাশনের, জৈব উত্তেজনার, সমুদ্র থেকে এই-মাত্র মাটিতে নেমেছেন।

ঘরে ঢুকে দেখলেন কোলাপোভা তাঁর শয্যার কানায় মেরুদণ্ড সোজা করে পাথরের মূর্তির মত বসে রয়েছে। তার খোদাই-করা মুখের দু পাশে সোনালী কেশের ঝরনা নেমেছে। অনাবৃত দু হাত দেহের দু দিকে একই ভঙ্গীতে পড়ে রয়েছে। সমবাহু একটা ত্রিভুজের দুটো স্থূল মসৃণ মর্মর বাহুর মত।

মনে হল ক্ষীণ কটির নীচের অংশটুকু অসাড় হয়ে পড়ে আছে পিছনে বিছানার উপর। স্ফিংক্সের মত বসে রয়েছে কোলাপোভা। কোলাপোভা যেন স্ফিংক্স।

কোলাপোভার চোখের দিকে চেয়ে দেখলেন নীলের গভীরে অন্ধকারে জ্বলনশীল ফস্‌ফোরেসেন্ট কী একটা পদার্থ রয়েছে।

কোলাপোভার মর্মর মূর্তিটা হঠাৎ কথা বলে উঠল: আমি সারারাত ধরে তোমার অপেক্ষায় আছি।

বরেন চোখ নামিয়ে কম্পিত স্বরে বললেন, জানি।

তাঁর কণ্ঠ থেকে আর কোনও কথা নিঃসৃত হল না।

বরেন!—ডাকল কোলাপোভা। এ ডাকের অর্থ, বরেন তুমি চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে দেখ।

বরেন মুখ তুলে কোলাপোভার দিকে চেয়ে দেখলেন। মাঝে মাঝে ছত্রভঙ্গ জনতা থেকে দূরে ছিটকে-পড়া কোন কোন লোক সহসা চিৎকার করে উঠছে। ঘরের পাশ দিয়ে যে পথ সে পথে দ্রুতধাবমান পায়ের শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে। কাছে ঘরের বারান্দায় বন্ধ দরজার পাশে সমগ্র প্রহরীরা মাপা তালে পায়চারি করছে।

কোলাপোভার মাথার পটভূমিতে যে খোলা জানলা তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে চাঁদ ডুবছে দিগন্তের কোলে। ডোবার সময় চাঁদের গা থেকে গলে পড়া সোনালী রঙে তার নীচের জমাট অন্ধকারের নানা স্থানে

ান ছোপ লেগে গেছে। চাঁদ যেন ধুয়ে ধুয়ে গলে ।ড়ছে।

আপাদমস্তক বিদ্যুৎস্পর্শের মত শিহরণ জাগছে ধীরে ীরে। ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মত কী একটা মাহ উঠে আসছে। এই ঢেউয়ের বেগে তিনি নিমেষের ।ধ্যে হারিয়ে যাবেন। মনের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে নলেন এই মোহ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে। চোখ কেবল ওই সামনের আকার থেকে সরে আসতে চাইছে। ।ুকিয়ে যেতে চাইছে। না, লুকোলে চলবে না। দেখতেই হবে চেয়ে; মুগ্ধের মত নয়, সমস্ত জ্ঞান দিয়ে চেয়ে দেখতে হবে।

এবার ওর আকারের দিকে চেয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। চোখের সামনে একটা বিস্ময় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চেয়ে দেখলেন চোখের আকারের দিকে, কানের অপূর্ব গঠনের দিকে। ঠোঁটের বক্রতা আর রক্তিমার দিকে। কপোলের মসৃণতার দিকে। কেশের ঢেউয়ের দিকে। অনাবিষ্কৃত গণিতে গঠিত এই রূপ, এই দেহ। এমন এক সূক্ষ্ম গণিত যা পরিচিত গণিত-বিজ্ঞানের চেয়েও সত্য, এমন গণিত যার ব্যাখ্যা মানুষের সাধ্যের অতীত—যে গণিতের অস্তিত্ব জানে অতি অল্প লোক। দুটো পরমাণুর মধ্যে যে চৌম্বক ক্ষেত্র, তার যে গণিত সে এই অপূর্ব আকারের গণিতের কাছে স্থূল। সমুদ্রের গভীরে বিদ্যুদ্বস্তু মাছের চারপাশে যে চৌম্বক-বিদ্যুৎ ক্ষেত্র তার মধ্যে নিহিত গণিত তাও স্থূল এর তুলনায়।

যে সব নির্বিকল্প সূত্র আকাশ পৃথিবী সমুদ্র প্রাণীকে ধরে রয়েছে সে সব সূত্রও এর তুলনায় স্থূল। নৈর্ব্যক্তিক গণিতের চেয়ে উচ্চস্তরের গণিত এই অপূর্ব আকার নিয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে এ রূপ বোধের অতীত। যে পদার্থকে তিনি চেনেন, যে পদার্থের ধর্মকে বুঝতে আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধীশক্তি নিযুক্ত, সেই পদার্থের রূপের চেয়ে ভিন্ন আরও বিস্ময়কর ধর্ম ওই পদার্থে, যা ওই অবয়বের ঘনিষ্ঠতায় মসৃণতায় তেজে রূপ গ্রহণ করেছে।

বরেনের মনে হল এই আকার, এই রূপ সমস্ত সৃষ্টির একটা প্রতিমা। বিশ্বরূপ। মানুষের অধিকারের অতীত।

কোলাপোভা স্পন্দিত স্বরে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি বরেন!

বরেন কী বলবেন খুঁজে পেলেন না। 'ভালবাসা' একটা তুচ্ছ কথা। ব্যবহারে ব্যবহারে বিবর্ণ, প্রায় অর্থহীন।

কিছু বলছ না যে?

আমি তোমাকে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছি কোলাপোভা! জানি না এ ভালবাসা কিনা!

কোলাপোভা তড়িৎগতিতে উঠে গিয়ে বরেনের বুকের ওপর নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিল।

বরেন অনুভব করলেন কী এক অদ্ভুত উষ্ণতা তাঁর দেহে মনে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল আগুনের দণ্ডের উপর আগুনের ফুলের মত সমগ্র চেতনা যেন ফুটে উঠল। কী একটা নতুন আবির্ভাব জন্ম নিচ্ছে চেতনা জুড়ে। তার আবির্ভাবের ঘোষণা বুকের দামামায় যেন বেজে উঠল।

সহসা দরজার বাইরে কারও হাতের অসহিষ্ণু আঘাত বেজে উঠল।

বরেন নিজেকে মুক্ত করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। কোলাপোভা টলতে টলতে গিয়ে বিছানায় ভেঙে পড়ল।

বরেন দরজা খুললেন। একজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী ঘরে ঢুকে বরেনকে একটা স্যালুট করে ঘোষণা করলেন এই মুহূর্ত থেকে তিনি নিজের ঘরে বন্দী।

বরেন কোলাপোভার দিকে চোখ ফেরালেন। পুলিস অফিসার জানালেন কোলাপোভাও বন্দী এই বাড়িতে—উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পুনরাদেশ পর্যন্ত।

বরেন কারণ জিজ্ঞাসা করলে পুলিস অফিসার একটা অসহায় ভঙ্গীর ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে এই কারণ তাঁর অজ্ঞাত।

পুলিস কর্মচারী আবার স্যালুট করে বেরিয়ে গেলেন। কোলাপোভা বিছানা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি বাইরে দরজাটা বন্ধ করতে গেল। পুলিস কর্মচারী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, পর্দাটা ফেলে রেখে দিন, দরজা বন্ধ করা চলবে না।

কেন? আমাদের আব্রু নেই?—ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করল কোলাপোভা।

জেলখানার কোন আব্রু নেই, মাদাম!—পরিচ্ছন্ন ইংরেজীতে উত্তর পেলেন।

কোলাপোঁতা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এ রকম অদ্ভুত আদেশ যে কোনও সভ্যদেশে জারি হতে পারে তা তার কল্পনার অতীত।

বরেন জিজ্ঞাসা করলেন, এই অদ্ভুত আদেশ কেন?

পুলিস অফিসার বললেন, সঠিক বলতে পারি না, সরকার সম্ভবত আপনাদের আত্মহত্যার ঝুঁকি নিতে রাজী নন।

বরেন হেসে বললেন, আত্মহত্যা করতে যাব কেন? আমার কাছে আমার জীবন কি এতই তুচ্ছ?

না, তবে প্রমাণ লোপের চেষ্টাতে তা করতে পারেন তো?

কিসের প্রমাণ?—কোলাপোঁতা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

পুলিস অফিসার আবার অসহায় ভঙ্গীর ভাষায় জানিয়ে দেন তিনি কিছুই জানেন না।

বাইরের ঘরের দরজার পর্দা দ্রুত হাওয়ায় পতাকার মত উড়তে থাকে। বরেন এই পতাকার মত চঞ্চল পর্দার দিকে কয়েক নিমেষ চেয়ে থাকেন। মনের মধ্যে একটা চিন্তা এমনি করে কিছুক্ষণ দোল খায়।

রায় এই ষড়যন্ত্রের স্রষ্টা। নিজের অপরাধটা সে বরেনের কাঁধে চাপিয়েছে। মাকড়শার মত প্রবৃত্তি এই সব মানুষের, এরা সব সময় জাল বুনছে রাষ্ট্রশক্তির দুর্গের গুপ্ত কোণে কোণে নিজেদের প্রবৃত্তির মল দিয়ে। অসতর্ক আদর্শবাদী মানুষ এদের এই জালে ধরা পড়ছে অহরহ। এরা সমস্ত সমাজকে এই রকম জালে আবৃত করে ফেলেছে। এই জাল অলক্ষ্যে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে সমস্ত সমাজে। এই জালে শুভবুদ্ধি ধরা পড়ছে, সভ্যতার গতি রুদ্ধ হচ্ছে, আকাশচারী কল্পনা পতঙ্গের মত এই জালে পড়ে নিশ্চল হয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় জাল ভেঙে দিলে অন্যত্র আবার জাল তৈরি করছে। এটা আমাদের সামাজিক দুরদৃষ্টের মত। এর হাত থেকে কোথাও নিস্তার নেই। কোনও দেশে।

এমনি খোলা থাকবে সব দরজা জানলা ঝড়ের দিনে, বাদলের দিনে, শীতে গ্রীষ্মে, রাত্রে দিনে সব সময়?—সভয়ে জিজ্ঞাসা করে কোলাপোঁতা। যাকে জিজ্ঞাসা করল সে তখন বেরিয়ে গেছে বারান্দায় পর্দার ওধারে। কোলাপোঁতা তার আতঙ্কিত দৃষ্টি ফেরাল বরেনের দিকে।

বরেন ঈষৎ হেসে বললেন, ভয় পেয়েছ কোলাপোঁতা? ভয় কি? আমরা তো আর ঘরে নেই, আমরা পথে বেরিয়ে পড়েছি। এই ঘরের হাওয়া আর পথের হাওয়া এখন থেকে সব সময় একাকার হয়ে থাকবে। এই ঘরখানার দু দিকেই পথ। দরজা বন্ধ করে এই পথ দুটোকে আলাদা করেছিলাম আমরা। আজ দুটোতে এক হয়ে গেছে।

কোলাপোঁতা বলল, খাব কেমন করে, বেশ বদল করব কেমন করে? আপন মনে যে একটু দাঁড়িয়ে থাকব তারও তো জো থাকবে না। আপন মনে তোমার দিকে যে একটু চেয়ে থাকব তারও উপায় থাকবে না। কী ভয়ঙ্কর!

বরেন পতাকার মত উড়ন্ত পর্দাটার দিকে চেয়ে দেখলেন আবার। মনে পড়ল হোল্ডের লিনের কবিতা। যদি পেতাম নিশান, নতুন ধার্মোপলি!···বাইরে বললেন, তুমি এ অবস্থাটাকে অন্যভাবে দেখ কোলাপোঁতা। মনে কর আমরা দুজনেই চলেছি। তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ, আমও। তবু আমি বুঝতে পারছি আমরা দুজনেই চলেছি একটা বিচিত্র অভিযানের পথে! যে পথে আজকের ইতিহাস চলেছে অলক্ষ্যে!

কোলাপোঁতা বিছানার ওপর বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল: এ কী ভয়ঙ্কর তা তুমি কিছুতেই বুঝবে না বরেন, তা তুমি কিছুতেই বুঝবে না।

কোলাপোঁতার এ কান্না সান্ত্বনার অতীত।

* * *

পনের দিন পরে রাত্রি দ্বিপ্রহরে সুস্মিতা আর তাপস বাসরসজ্জায় মিলিত হয়েছে। সুস্মিতার বুকের মধ্যে কে একজন অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে ক্রমাগত কেঁদে চলেছে। সান্ত্বনার অতীত সে কান্না।

কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রি। কলকাতার ছেঁড়াখোঁড়া অন্ধকারের আকাশে একফালি মলিন চাঁদ ঘষা রূপোর হাঁসুলির মত ঝুলে রয়েছে। এই আকাশের দিকে চেয়ে

াছে সুস্মিতা। সহসা আকাশের এই পটের উপর য় দুটো কালো পাখি উড়ে গেল। সুস্মিতার মনে বহু দূর আকাশ দিয়ে উড়ে গেল তারা।

সুস্মিতা আপন মনে জিজ্ঞাসা করে ওরা কোথায় চ্ছে?

কারা?

ওই পাখিরা?

কিছুক্ষণ ভেবে তাপস উত্তর দেয়, বাসা খুঁজে পায় —হয়তো পথ হারিয়ে ফেলেছে!

ও!

কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে আচ্ছন্নের মত সুস্মিতা বলে, নেক পাখি আকাশে উড়তে উড়তে ডিম পাড়ে, না?

সুস্মিতা বুঝল না তার দুর্ভাগ্য তারই কণ্ঠে তার থাটাই বলিয়ে দিল।

তাপস এই কিম্ভূতকিমাকার প্রশ্নটার সামনে মূঢ় হয়ে ড়ে। তপ্ত বাঁ হাতটা সুস্মিতার পিঠের ওপর দিয়ে কের উপর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। সুস্মিতার দেহের সমস্ত পশী সঙ্কুচিত হয়ে আসে। আজ সে প্রায় প্রত্যেক াত্রেই ঘুমের মধ্যে সাপের স্বপ্ন দেখে। তাপসের া হাতটা সাপের মত মনে হল। তবু সইতে হবে। এমনিতে সহজে সওয়া যাবে না। মনের মধ্যে কিছু একটাকে নিভিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

শীলভদ্রের সম্পদে সে মানুষ। আজ শীলভদ্রের জন্যই সে চরম বিপন্ন। আত্মায় বিপন্ন। দেহে বিপন্ন। তাই আজ সে আত্মহত্যা করতে বসেছে তাপসের অঙ্কে। মন যেন বলছে নরক, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

ভাঙা মাস্তুল তরী যেমন নিকটতম বন্দরে ভেড়ে তেমনি জীবনতরীর হালে যাদের গোলযোগ ঘটেছে তেমনি পুরুষ বা নারী একে অপরের বন্দরে নোঙর ফেলে। বৈচিত্র্যহীন পথের বৈচিত্র্যহীন মোড়ে একটা দিনের একবার দেখা, কিংবা কোন মামুলী উৎসবের স্থানে একটা মামুলী দৃষ্টি বিনিময়। এমনি সব তুচ্ছ ঘটনার ক্ষীণ স্রোত ধরে ভাঙা মাস্তুলরা একে অপরের বন্দরে ভেড়ে। শুধু যে হালের গোলযোগেই ঘটে তা নয়, এর ওপর আছে জীবনের নানা ঋতুর আবহাওয়ার বৈষম্য। উত্তপ্ত বৈশাখ, মেঘমেদুর শ্রাবণ, বিবাগী বলাকার বসন্ত, একেলার কান্না ভরা শীতঋতু, শেষে বিবাগী বাসনার নিরুদ্দেশ যাত্রার চৈত্র।

সুস্মিতা ভাবে অন্ততঃ আজ রাত্রের মত মনকে বদলে নিতে হবে। তা না হলে তাপস কী ভাববে? ভিতরের আগুন যে নিবে গেছে এ কথা ওকে জানানো যায় না। তাই মনের ভেতর খুঁড়ে খুঁড়ে ছাইয়ের তলা থেকে প্রথম যৌবনের কানা কামনার আগুনটাকে জাগাবার চেষ্টা করে। তাপসেরও সেই অবস্থা। সে তার নতুন ফিল্মের স্ক্রিপ্ট আর সেটগুলো মনে মনে ঘাঁটতে আরম্ভ করে যদি এমনি করে একটু আগুনের সন্ধান পাওয়া যায়।

তাদের শয্যার গায়েই খোলা জানলা। তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় আকাশে অদৃশ্য ধোঁয়ার পিছনে চাঁদটা ধীরে ধীরে নিভে আসছে।

তাপস প্রকাশ্যে বলে, এস, গল্প করি।

কী গল্প?

যা হোক।

বল।

তাপস নতুন স্ক্রিপ্টের গল্পটা বলে।

বিদ্রোহী দস্যু রাজবাড়িতে চুরি করতে এসেছে, চুরি করতে এসে রাজকুমারীর প্রেমে পড়েছে।

প্রেমে পড়ল কেন?···সেই কবে একদিন সে, সুস্মিতাও প্রেমে পড়েছিল!

রাজকুমারী তখন ঘরে ঘুমুচ্ছিল, তার বুকের ওপর থেকে কাপড় গিয়েছিল খসে তাই দেখে!

তারপর?

রাজকুমারী তাকে রাজসেবায় নিযুক্ত করে জাতে তুলতে চায়।

বন্দী দস্যুকে রাজকুমারীর অনুরোধে মুক্তি দেন বৃদ্ধ রাজা—কিন্তু রাজসেবায় নিযুক্ত করার আগে তার যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখতে চান।

কেন?

রাজকুমারী একটা উৎকৃষ্ট··· —তোমার মতন।

এই রকম একটা সংলাপ আছে স্ক্রিপ্টটার মধ্যে। অদ্ভুত এই হিন্দী চলচ্চিত্রের গল্প। গল্পের সূত্রে অজস্র যৌন অভিজ্ঞান গাঁথা উপমার আকারে, চিত্রের আকারে।

কী পরীক্ষা ?

দেশের প্রান্তে আছে নিষিদ্ধ দীঘি। সেই দীঘির জলের নীচে আছে সুরঙ্গ, সেই সুরঙ্গ দিয়ে যেতে হবে মৎস্যকন্যার দেশে।

নিষিদ্ধ দীঘি, সুরঙ্গ, মৎস্যকন্যা সব যৌন অভিজ্ঞান।

সুস্মিতার গায়ে ধীরে ধীরে উষ্ণতা ফিরে আসে। অনেকদিন আগের একটা বিস্মৃত উষ্ণতা।

তার সারা দেহময় অন্ধ সরীসৃপের মত তাপসের একখানা হাত চলে বেড়াচ্ছে। মাথায় আঘাত-পাওয়া দৃষ্টিহীন সাপ যেমন বিবর সন্ধান করে ফেরে।

তাপস বলে চলে, মৎস্যকন্যার কাছে আছে···

সুস্মিতা বলে শুক্তির কৌটো ?···ভাবে, আমার মনটা শুক্তির কৌটো !

তাপস বলে, সেই কৌটোতে আছে ভ্রমর। সেই ভ্রমর মৎস্যকন্যার প্রাণ। সেই ভ্রমর আনতে হবে, সেই ভ্রমর এনে রাজবাড়ির বাগানে পুষতে হবে। সেই ভ্রমর কিন্তু মধু খায় না !

সুস্মিতা বলে, সে শুধু ওড়ে, ওড়ে আর ওড়ে !

বাঃ, তুমিও তো চমৎকার গল্প বল !—অবাক হয়ে বলে ওঠে তাপস।

এস, আমরা দুজনে একটা গল্প তৈরি করি।

তাপস ও সুস্মিতা দুজনে যে সব উপমা আর প্রতীক দিয়ে গল্প তৈরি করে চলেছে তারা অবচেতনসৃষ্ট যৌন-উপমা আর যৌনপ্রতীক। দুজনে মিলে একটা বিচিত্র ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন রচনা করছে ওরা এই গভীর রাত্রিতে খোলা চোখে। আসলে ওদের দুজনের অন্তরের চোখ মুদে গেছে অনেকক্ষণ আগেই।

মৃত্যুর পূর্বে আত্মার এ এক বিচিত্র উচ্ছৃঙ্খলতা !

তাপস অনুভব করল সুস্মিতার নরম আঙুলের কয়েকটা নখ যেন তার গায়ের একস্থানে ত্বকের নীচে শিরা খুঁজে ফিরছে। তাপস গল্পের নেশায় মেতে উঠেছে। গ্রাহ্য করছে না এই সামান্য যন্ত্রণা। কিংবা এই সামান্য পীড়া তার মনে উত্তেজনার সঞ্চার করছে। বলে চলে, কিন্তু এমনি মজা যে, রাত্রে ঘুমের ঘোরে সেই ভ্রমর বুকের উপর বসলে মনে হবে কোন অপ্সরা বক্ষলগ্ন হয়ে চুম্বন করছে—আমি আমার নতুন ছবিতে এই অপ্সরা-চুম্বনের কয়েকটা শট যোগ করে দেব। আচ্ছা, বল তো সেদেশে যাবার পথে কী কী পড়বে ?

দীঘির সুরঙ্গ যেখানে সমুদ্রের নীচে মৎস্যকন্যার দেশে পৌঁছে শেষ হয়েছে সেখানে একটা বিরাট তোরণ।—বলে সুস্মিতা।···আমি একদিন দেখেছিলাম স্বপ্নে।

কী আকারের তোরণ ?

পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের সেই আশ্চর্য বিরাট পিতলের মূর্তি। মাথাভাঙা বিরাট মূর্তিটা দুটো পা দুটো দ্বীপে রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।···হ্যাঁ, দুটো দ্বীপ, আমি একটা দ্বীপ !

পুরুষ না নারী ?

সে পুরুষ···কিন্তু, না না,···সে পুরুষ নয় !

আচ্ছন্নের মত তাপস বলে, সে নারী ! দু পা বাড়িয়ে একটি ত্রিকোণাকার তোরণ সৃষ্টি করেছে সে। সেই তোরণের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে হবে মৎস্যকন্যার দেশে !

তাপস অনুভব করল কলোসাস মূর্তির মত এ মূর্তি ধাতুর নয়, এ মূর্তি জমাট বরফের !

সুস্মিতার সমস্ত দেহটা জমে যেন বরফ হয়ে গেছে। একেবারে নিশ্চল। চোখ বন্ধ করে মন্ত্রের মত বলে চলেছে, না না, সে পুরুষ নয়, সে পুরুষ নয়···সে···সে !

ভোর না হতেই তাপস শয্যা ছেড়ে সোজা স্টুডিয়োতে চলে গেল। যে ফিল্মটার কাজ চলেছে তাতে কিছু কিছু সংযোজন করতে হবে। গতরাত্রে যে সব প্রতীকগুলো পেয়েছে সেইগুলোকে সেটে রূপান্তরিত করতে হবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

প্রদোষের প্রান্তে

মূল রচনা: The Edge of Darkness—Mary Ellen Chase
অনুবাদ: রাণু ভৌমিক

প্রথম খণ্ড

সারা হণ্ট

লুসী নর্টন তার ত্রিশ বছরের প্রতিবেশিনী সারা হণ্টের কফিনের পাশে দাঁড়িয়েছিল, সারা হণ্টের জন্য এখানে সে এই শেষবার এল। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কিছুতেই সাদা সাটিনের বালিশের ওপরের শান্ত স্থির তীক্ষ্ণ-রেখাঙ্কিত মুখটির ওপরে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করতে পারছিল না বলে বিরক্ত বোধ করছিল—এমন কি অপরাধবোধে পীড়িত হচ্ছিল। যে মুহূর্তে সে লক্ষ্য করল মৃতা রমণীর নাক কী তীক্ষ্ণ ও সুন্দর, হাত বা দীর্ঘ আঙুলগুলোতে অর্ধশতাব্দীর পরিশ্রমের ছাপ একটুও নেই, এমন কি নব্বই বছরের বৃদ্ধ চামড়া অন্যান্য মৃতদেহের মত একটুও কুঁচকে যায় নি তখনই তার চিন্তাধারা উঁচু বেলাভূমিতে অশ্রান্ত পদক্ষেপে ভ্রমণরত থেডাস হণ্টের চারিদিকে ঘুরপাক খেতে শুরু করল। সে ভাবছিল এখন থেডাসের মনে কী ভাবনাস্রোত বয়ে যাচ্ছে এবং একাকী, অনুতাপদগ্ধ এই লোকটি মায়ের শেষ অদ্ভুত প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারবে কিনা! যখন লুসী মনকে একটু গুছিয়ে নিল আর মনে মনে একটু হেসে সারা হণ্টের কালো পোশাকের ওপরে পুরনো ফ্যাশানের সাদা লেসের কলার কী চমৎকার এবং ধবধবে দেখাচ্ছে তাই দেখল তখনই তার চিন্তাধারা আবার অগোছাল হয়ে গেল। সে সারার লেসের কলারটা কতবার কেচেছে বা ইস্ত্রি করেছে সেকথা ভাবছিল না—সে ভাবছিল বাড়িতে বিছানার ওপরে রাখা জোয়েলের নীল স্যুটটার কথা। বহুবার কেচেও কি সে এর চকচকে ভাব দূর করতে পেরেছে? আর জোয়েল তো এমনিতেই সব ভুলে যায়! সে কি আজ খেয়াল করে সকালে শহরে বাজার করবার সময়ে ফ্রাঙ্কফার্টাস বেশী করে কিনেছে? অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে সবাই ওটা চাইবে। কারণ, এই দুদিন কেউ বিশেষ রান্না করে নি; শুধু কথা বলে কাটিয়েছে। তারপর ওর মন জোয়ারের দিকে ফিরল। জোয়ারের স্রোত ফিরছে; কোভের নৌকো ও ডিঙিগুলো সমকোণে রেখে দূরে বয়ে যাচ্ছে। শেষে মন ফিরে এল সময়ের বৃত্তরেখায়। সামনের জানলা দুটো দিয়ে কফিনের পশ্চাতে লম্বা ছাদের বড় ঘড়িটা দেখা যাচ্ছিল। ও ভাবছিল, প্রায় এগারোটা বাজে—বেলা দুটোর মধ্যে, অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের আগে সব কাজ শেষ করতে পারবে কিনা! ঘড়ির ঘণ্টার শব্দে লুসী যেন নতুন ভাবে বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করে সারা হণ্টের সঙ্গে এই শেষ দেখা হওয়াটা তার প্রার্থিত অথবা পরিকল্পনানুযায়ী ছিল না। সময় এগিয়ে আসছে। সময় কথাটাই যেন উল্টোভাবে তাকে ঘড়ির ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়। ওর মনে পড়ল সেই কোন্ যুগে ক্যাপ্টেন হণ্ট যখন প্রথম সমুদ্রযাত্রা করেন তখন এই ঘড়িটি লণ্ডন শহর থেকে নববিবাহিতা পত্নীর জন্য এনেছিলেন। জাহাজের দুলুনির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ঘড়িটা ক্যানভাসে মুড়ে খোলের মধ্যে চিত করে শুইয়ে আনা হচ্ছিল। এক রাত্রে—মধ্য-আটলান্টিক সমুদ্রের ঝড়ে যখন নাবিকরা মালপত্র সরাচ্ছিল তখন হঠাৎ ঘড়িটা বাজতে থাকে। ওপরের তক্তার মড়মড় এবং বল্টু ও গীয়ারের শব্দ ছাপিয়ে ওঠে—জাহাজের গভীর খোলের সেই প্রতিধ্বনিময় গম্ভীর ধ্বনি সকলের মনে এক অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া ফেলেছিল।

ক্যাপ্টেন হণ্টের পুরো নাম কি ছিল? সারার চেয়ে তিনি ত্রিশ বছরের বড় ছিলেন। তখন সারার বয়স মাত্র আঠারো। হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে—ওঁর নাম ছিল টমাস জেফারসন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন হণ্ট। তিনি

এমন সময়ে জন্মেছিলেন যখন ইতিহাসে ওইসব বড় বড় নামগুলোর বিশেষ অর্থ ছিল। তাঁর মৃত্যু হয়েছে অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে। এই বাড়িটা তাঁর পূর্বপুরুষের। এই ঘরগুলোতে তিনি পায়চারি করতেন, চেয়ারে বসতেন, আবহাওয়া বিশ্লেষণ করতেন, শত শত জাহাজঘাটার দুরবস্থায় দুঃখ করতেন, খেয়া-জাহাজের অপঘাত মৃত্যুতে শোক করতেন। তাঁর একমাত্র সন্তান থেডাসকে তিনি এমন বিরাট স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন যা বর্তমান পরিবর্তিত পৃথিবীতে সার্থক হওয়া অসম্ভব। ষাট বছর বয়স্ক থেডাস এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বপ্নে আচ্ছন্ন। সেপ্টেম্বরের দিনশেষের অবিশ্রান্ত স্তব্ধতায় বেলাভূমির পাথুরে পথে ওর ভারী পদধ্বনি লুসী শুনতে পাচ্ছিল। সে যেন দেখতে পেল থেডাস পেছনে হাত রেখে দীর্ঘ স্থূল আঙুল-গুলো যন্ত্রণায় মোচড়াচ্ছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মন করুণায় ভরে উঠল, যদিও অধিকাংশ লোকই থেডাসের প্রতি অনুভব করে ঘৃণা ও অবজ্ঞা এবং তাদের এ মনোভাব অযৌক্তিক নয়।

এখন তার অব্যবস্থিত দুঃখিত মনে—যে মন অপরাধ-সচেতনতা সত্ত্বেও সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল—সারা হন্টেরই দেওয়া বইয়ের একটি গল্পে ফিরে এল। সারার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে লুসী খুব বেশী বই পড়ে নি। তাই প্রথম দিকে বইগুলো দুরূহ মনে হত। এই গল্পটিতে কোন চরিত্র দীর্ঘ ও প্রহেলিকাভরা ভাষায় বলেছিল, কেউ কোন কিছুর আসল স্বাদটুকু ঠিকমত ধরতেও পায় না, রাখতেও পারে না। আসল যা তা কেবলই হাত ফসকে চলে যাবে। যখনই মনে হবে তাকে পেয়েছ তখনই সে পালিয়ে যাবে এবং তোমার উৎসুক ব্যাকুল একাকী মন সেই পলায়নপর জীবনের জন্য অস্থির হয়ে উঠবে। লুসীর কাছে এই ধারণা সম্পূর্ণ নতুন। এমনিতে সে নিজে মধ্যে মধ্যে অস্বস্তি বোধ করত। এখন সে এই ভেবে সান্ত্বনা পেল যে শুধু তার নয় পৃথিবীর সকলের মনেই এই ভাব খেলা করে। এই ঘরে, সারার কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে এখন সব কথা মনে হল। গত ত্রিশ বছর সারাই তাকে সান্ত্বনা, বিচার-বিবেচনা এবং সাহস দিয়ে এসেছেন।

তারপরে যেন প্রথম গল্পের সত্য প্রতিষ্ঠিত করবার এবং অস্বস্তির পীড়ন থেকে মুক্তি দেবার জন্যই তার আর একটি গল্প মনে পড়ে যায়। একটি তরুণ পুরোহিতের কথা, যিনি নিজের অপরাধবোধের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। পবিত্র বেদীর কাছে মদ ও মাংস উৎসর্গ করা মাত্র তা ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল। যতবার তিনি চেষ্টা করছিলেন ততবার ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এমন কি ওরা যেন বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে ওঁর শৈশবের লালসা ও পাপপ্রবৃত্তি—যা বর্তমানের উৎসর্গীকৃত জীবনের পথে অত্যন্ত লজ্জাজনক—সেই দিকেও গড়িয়ে যাচ্ছিল। গল্পটা পড়বার পর থেকে লুসী এই তরুণের জন্য মধ্যে মধ্যেই সহানুভূতি বোধ করত আর এখন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে যেন ওঁর কষ্ট আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল।

কারণ, সারা হন্টের সঙ্গে এই শেষ সময়ে সে কিছুতেই শুধুমাত্র তাঁর কথা ভাবতে চাইছে না। ভবিষ্যতে তার জন্য যথেষ্ট সময় সে পাবে। হেমন্ত প্রায় শেষ হয়ে এল, শীতে সে হাজার হাজার ঘটনার কথা ভাববার সময় পাবে। জোয়েল জিনিসপত্র কিনতে বেরিয়ে যাবে, দোকানপাটের কাজও মন্দা। দোকানে বিক্রির টেবিলের পেছনে বসে সমুদ্রের জোয়ারের গতি দেখতে দেখতে সে যে-কোন ছবি, অদ্ভুত দৃশ্য অথবা স্মরণযোগ্য কথাবার্তা মনে মনে ভাবতে পারবে। কিভাবে সে প্রথম সারা হন্টকে দেখেছিল—বেলাভূমিতে পায়চারি করতে করতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদ্র দেখছেন—ওঁর কাছেই শুনেছিল ওঁর যৌবনে এই উপকূলরেখা কি রকম ছিল, এবং লুসীর বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীও ওঁরই শিক্ষা। এই সব এবং আরও অনেক অন্তরঙ্গ আমোদপূর্ণ সময়োচিত কথোপকথন তার মনে হচ্ছিল, কিন্তু তাই সব নয়।

স্মরণ ও বাস্তব এক নয়। উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ, যেমনি পার্থক্য স্থির নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে উল্কার কিংবা পরিপূর্ণ জলরাশির সঙ্গে জলস্রোতের। স্মৃতি দুঃখ লাঘব করে, আনন্দ দেয়, সান্ত্বনা দেয়—এমন কি পোষণও করে। কিন্তু তারা মানুষকে শক্তিশালী করতে, অজেয় করে তুলতে পারে না। তারা সজীব করে তুলতে পারে কিন্তু সহিষ্ণু করাতে পারে না। শুধুমাত্র অন্তর্দৃষ্টির উজ্জ্বল আলোক কিংবা দর্শন এই অসম্ভব সম্ভব করে তোলে।

যা লুসী নর্টন চাইছিল—সারার সঙ্গে কিছুক্ষণ একাকী থেকে নির্বোধের মত যা পাবার আশা করছিল—তা হচ্ছে মুহূর্তের জন্য হলেও সারা হন্টের দীর্ঘ, কঠিন, বিজয়ী জীবনের মূল্য উপলব্ধি করা। যদি সে কোন রকমে সেই অর্থ বুঝতে পারে—ক্ষুদ্র মুহূর্তের জন্যও তা উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে তার আর কিছুই প্রার্থনীয় নেই। সে সবকিছুরই মুখোমুখি হতে সাহস পাবে—মাছের মন্দার পরে শীত; বিলম্বিত হেমন্তের উত্তর-পূর্ব ঝড়ো হাওয়ায় মাছ ধরবার জালের আটল এবং চিংড়ী মাছের জালের কাঠগুলোর খটখট শব্দ; দোকানের ক্রমবর্ধমান অনাদায়; জোয়েলের উদ্বিগ্ন ভাবনা; রুগ্ন, ভীত, নর-নারী এবং অর্ধপুষ্ট শিশু।

সে হঠাৎ এক নতুন রকমের নীরবতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। সাধারণতঃ মৃত্যু গৃহে যে প্রকার স্থিরতা আনে এ তার চেয়েও ব্যাপক। সে যেন এই নীরবতাকে শুনতে পায়, দেখতে পায়, এমন কি গন্ধও পায়। সেই মৃতা রমণীর সমস্ত চিন্তাধারা এসে চেয়ার, দেরাজ, টেবিল, দেওয়ালে টাঙানো ছবির ভিতরে বাইরে জাল বুনছে—পলায়মান গন্ধ, কুয়াশার মালা, মৌমাছির মৃদু গুনগুনানির মত তাঁর আশা ও দুঃখ, ছোট ছোট সুখ এবং অপেক্ষমাণ বাস্তব। লুসী জানে কালই এসব চলে যাবে অনেক দূরে—শুধুমাত্র বাড়িটার নোংরা বাইরের রূপ থাকবে এবং থেডাসের জন্য ঘর গোছাতে এসে সে তাই দেখতে পাবে।

এই উপলব্ধির বিরাট বেদনার সঙ্গে সর্বব্যাপী নীরবতা মিশে অবশেষে তার মনের সমস্ত তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠা জোয়েলের সুট, ফাহকার্টাস, জোয়ারের গতি, সময়—এমন কি বইয়ের কথাগুলো যা এতক্ষণ তার চিন্তাধারা আচ্ছন্ন করেছিল তার ওপরে এক পুরু পর্দা টেনে দেয়। সে আর বেলাভূমির পাথুরে পথে থেডাসের ভারী পদক্ষেপ শুনতে পায় না, অথবা তার অশান্ত হাত দুটি দেখতে পায় না। এখন যে মুহূর্ত তার কাছে আছে সেই সময়টুকুর ব্যাপ্তি ত্রিশ বছর। সেই বৃত্তের পরিধি আরম্ভ হয়েছিল সেইদিন, যেদিন সে ও জোয়েল উন্মুক্ত আটলান্টিকের মুখোমুখি এই স্থানে এসেছিল আর আজ সারা হন্টের মৃত্যুতে তা পরিসমাপ্ত হল। সে সেই উজ্জ্বল বৃত্তের পরিধিতে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন বসবার ঘরের কার্পেটের ওপরে এটা আলোর রেখায় রেখাঙ্কিত। সে একাকী সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্য ওখানে ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা তার অর্ধ-জীবন। সে একটি নারী নয়—লুসী নর্টন নয়—যার পরনে চেক-কাটা গীংহাম পোশাক; যে চোখে বাঁকা ফ্রেমবিহীন চশমা পরে, যে তার স্বামীর সঙ্গে মৎস্য-উপনিবেশের পাইকারী দোকানপাট চালায়। তার নিজের অস্তিত্ব, ভাবনাচিন্তা সে হারিয়ে ফেলেছে। সে মুছে গেছে, তাকে ঘষে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ে সে হারিয়ে গেছে—বিচার-বিবেচনার ঢেউ, সর্বব্যাপী বিস্ময়ের ঢেউ, আশ্চর্যের ঢেউ, করুণা, আশা ও বিশ্বাসের ঢেউ এবং সর্বশেষ বিহ্বলকারী কৃতজ্ঞতার ঢেউ।

ঘড়িতে এগারোটা বাজবার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। আর সেই শব্দই যেন ও যেখানে ছিল কফিনের পাশে কার্পেটে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আলোর বৃত্তরেখা মিলিয়ে গেছে। সে আবার তার সেই চেক-কাটা গীংহাম পোশাক পরেছে। তার হাত পা যা এতক্ষণ অনুপস্থিত ছিল তা আবার অসমাপ্ত কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হয়ে ফিরে এসেছে।

২

যে একমাত্র পথ গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে তা থেকে সিকি মাইল দূরে সমুদ্রের ওপরে মাঠের মধ্যে অবস্থিত এই হন্ট বাড়িটি। সে বাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে ফিরে যাবার আগে লুসী ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে সব ঠিক আছে কিনা দেখছিল। প্রথমে ও রান্নাঘরে গেল। এ ঘরটি বসবার ঘরের পিছনের অংশ। ছোট ছেলেরা এখানে নীচু টুলে এবং এবং ছোট ছোট চেয়ারে বসবে। এই চেয়ারগুলো থেডাস ওদের জন্য তৈরি করেছে। এ সব কাজে থেডাসের হাত পাকা। নেশার বিরতির ফাঁকে সে মায়ের নির্দেশানুযায়ী ছটা কি আটটা তৈরি করেছিল। ছেলেরা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে এই চেয়ারে বসে গল্প শুনত, ওঁর তৈরী পিঠে খেত এবং ওরা কী চমৎক[illegible] শিখেছে তাই

শোনাত। খেডাস চেয়ারগুলোতে উজ্জ্বল রঙ—হলদে, নীল, লাল দিয়েছিল আর তাই ছেলেরা ওগুলোক অত ভালবাসত। ওরা সবাই আসবে। গ্রামবাসীরাও সকলে আসবে। শুধু ডেনিয়াল থারসটন অসুস্থতার জন্য আসতে পারবে না, রাণ্ডেলরা আসতে সাহস পাবে না আর ড্রুজিলা ওয়েস্টের সম্বন্ধে আগে থেকেই নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ওরা সবাই রান্নাঘরে বসবে—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, লাজুক, উৎসুক এবং একটু যেন ভীত। ওদের ভয়ের কথা ভেবেই লুসী নর্টন রান্নাঘরের পরিষ্কার মেঝেতে চেয়ার এবং টুলগুলো বৃত্তাকারে সাজাল। যদি ওরা অপরাপর দিনের মত পরস্পরের কাছাকাছি বসতে পারে তাহলে হয়তো অনেকটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।

লুসী এই ছোট টুল ও চেয়ারগুলো দেখতে ও নাড়া-চাড়া করতে ভালবাসত। ওর মধ্যে একটা লাল চেয়ার ছিল যা দেখে ওর হাসি কান্না দুই-ই পেত। খেডাস এর পেছনটা অপরাপর চেয়ারের থেকে বড় করেছিল এবং অনেক পরিশ্রমে সেই অংশটি ছোট ছোট গোলাকার পাখি দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিল। আবার কায়দাদুরস্তভাবে এতে হাতলও লাগিয়েছিল। লুসী সেই চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল সাধারণতঃ কোন লোক যখন কিছু তৈরি করে তখন সে তা করে তার পক্ষে যত যত্ন নেওয়া সম্ভব তা নিয়ে? কিন্তু অপর কারও কাছে হয়তো সেই চেয়ার, চিংড়ি-আকৃতি বয়া অথবা ছোট নৌকোটি স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং অনির্বচনীয় অথচ অপরিহার্যভাবে আনন্দ, বেদনা এমন কি এক ধরনের বিজ্ঞতার সঞ্চার করে।

লুসী রান্নাঘর পার হয়ে বৈঠকখানায় গেল। এটি হলঘর এবং সিঁড়ি পার হয়ে বসবার ঘরের ঠিক উল্টোদিকে। সারা হন্ট বৈঠকখানা ভালবাসতেন না—ওখানে খুব কমই বসতেন। কিন্তু আজ যখন দলে দলে লোক শহর ও গ্রাম থেকে প্রধান সড়ক ধরে আসছে এবং এখানকার লোকেরা তো আছেই, তখন এ ঘরটা ও শোবার ঘরটা ঠিক করে রাখতে হবে। লুসী বৈঠকখানা ঠিক করল, জানলার পর্দাগুলো সোজা ও সমান করে দিয়ে চেয়ারগুলো সারি দিয়ে সাজাল। কাজ নিয়ে ভুলে থাকবার জন্য তারপরে যেন প্রথম

খেডাস এই চেয়ারগুলো ওপর থেকে নামিয়ে ও প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে ট্রাকে করে এনে জমা করেছিল।

প্রতিবেশীরা অবশ্য খেডাসের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসবে, কারণ, নিকট-আত্মীয় কেউ নেই। যদিও জানা ছিল তবুও লুসী একবার নিঃশব্দে নামগুলো আঙুলে গুনল। ওরা সর্বসমেত এগারোজন, ডাক্তারকে নিয়ে বারো। পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে বিকেলের রোগীদের অকূলে ভাসিয়েও ডাক্তার নিশ্চয়ই আসবেন। রাণ্ডেলদের কেউ আসবে না তবে ওর ছোট মেয়েটি খুব কান্নাকাটি করে আসবার অনুমতি পেতে পারে কিংবা যদি ওকে ওরা অন্যান্য দিনের মত একা রেখে যায় তাহলে ও পালিয়ে আসবে। বসবার ঘরটা এ বৈঠকখানার চেয়ে অনেক বড় এবং চেয়ারগুলো পেছন দিকে বেশ সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হল।

৩

খেডাসের স্ত্রী অবশ্য এসে আসতেও পারে। কারণ স্ত্যান হন্ট সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই ঠিক করে বলা যায় না। পঁচিশ বছর আগে খেডাসকে বিয়ে করে ও যে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছিল তার রেশ এখনও ওর মনে প্রবল। সারা পনের বৎসর ধরে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এই মনোভাব কিছুটা দুর্বল করে স্ত্যানকে স্কুলে পড়ানোর কাজে এবং নিজের পথে চালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সারাও ওর মন থেকে তা সম্পূর্ণ দূর করতে সক্ষম হন নি। এই ভাব এখনও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অশান্ত জীবের মত তার মনকে অপরাধবোধের গ্লানিতে এবং খেডাসের প্রতি অনুচিত ভালবাসার বেদনায় উৎপীড়িত করে তুলছে। কারণ, যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক না কেন এখনও স্ত্যান ওকে ভালবাসে।

এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে এই দশ বছর স্ত্যান কখনও কখনও ওর কাছে একমাত্র ছেলে জেফের খবর দিয়ে চিঠি লিখত। জেফ তার অভিশপ্ত বাল্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন সে ক্যানসাসে গমের মাঠে ভালভাবে কাজ করছে। জেফের যে দু-একটি চিঠি ও পেত তা কখনও খেডাসকে

পাঠাত না, কারণ, ও জানত জেফের হাতের লেখা দেখলেই তার বাবার মন তিক্ত অনুতাপ ও অনুশোচনার গ্লানিতে ভরে যাবে, এবং বিশেষ কারণ এই যে জেফ এখনও তার পূর্বের ক্রোধ ভুলতে পারে নি। প্রতিবেশীদের গায়ে-পড়া অবজ্ঞাসূচক মনোভাব, গৃহের অপমানজনক দৃশ্যসমূহ, এবং লোকেরা যখন মাছ ধরবার ফাঁদ তৈরি করছে তখন তার অকস্মাৎ উপস্থিতিতে নীরবতার বিরুদ্ধে এখনও তার আক্রোশ আছে। শীতের উষায় পিতার নৌকো ডোবানো এবং তেমনি শীতের হিমসিক্ত রাত্রে মাছ ধরবার ফাঁদ পাতা এমন কি হেরিং মাছের গন্ধ সবকিছুকেই সে গালাগালি করে। ঈশ্বরের কাছে তার একমাত্র প্রার্থনা যেন ওই সব আর না দেখতে হয়। সে নিষ্ঠুরভাবে মার কাছে চিঠি লেখে। তার মা চিঠি পড়ে চোখের জল ফেলে কিন্তু সেই সঙ্গে এটুকুও বুঝতে পারে যে নিষ্ঠুরতাই নিষ্ঠুরতার জন্মদাতা। সে লেখে, ক্যানসাসে জেগে উঠে সে যখন মাইলের পর মাইল অসীম, সমতল প্রশান্ত উর্বর জমির ওপরে সূর্যকে উঠতে দেখে উইণ্ডমিলগুলো ধীরে ধীরে ঘুরছে, বালাপা গাছের কুঞ্জে গরুর পাল চরছে, তখন তার মন অসীম আনন্দে ভরে ওঠে। ঠাকুরমাকে, স্যাম পার্কার ও নর্টনদের দেখতে তার ইচ্ছা হয় বটে কিন্তু খরচ অত্যন্ত বেশী, আর মা তো তার কাছেই থাকতে পারেন, কারণ এ তো সবাই জানে যে মেনের চেয়ে ক্যানসাসের স্কুল অনেক ভাল।

স্যান হণ্টের হাতে ছটা অথবা আটটা এই রকম চিঠি জমে গেলেই সে তা থেকে বেছে নিয়ে মিসেস টমাস জে হণ্ট এই শিরোনামায় একটা লম্বা খামে ভরে পাঠিয়ে দিত। থেডাসকে ভয় পাবার কিছুই ছিল না, কারণ, প্রথমত: চিঠির কথা জানবার কোন সম্ভাবনাই তার ছিল না আর জানলেও সে মায়ের নামের চিঠির সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করবে না। মাকে সে ভয় পায়, তা ছাড়া ঘৃণ্যতম মানসিক অবস্থাতেই ওর ব্যবহার মেয়েদের প্রতি ভদ্র। এদিকে সারা হণ্টই যখন জেফের মুক্তিদাতা তখন তাঁকে সব কথা জানানোই উচিত।

সারা হণ্ট সর্বদাই চিঠিগুলো লুসীকে পড়ে শোনাতেন। অপরাহ্ণে যখন ওঁরা বসবার ঘরে বা রান্নাঘরে বসে বঁড়শি বাঁধবার থলে ও জালের মাথাগুলো তৈরি করতেন তখন তিনি ওগুলো জোরে জোরে পড়তেন। ক্যানসাস ওঁদের কাছে অসীম দূরবর্তী মনে হত এবং ওঁরা জমির এই রকম বিশাল বিস্তৃতি সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করতে পারতেন না।

—ধারণায় আসে না কেন বুঝি না,—সারা হণ্ট বলতেন, আমার মনে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারেরই একটা স্পষ্ট ধারণা হয় এবং ঈশ্বর জানেন যে আমি অনেক জায়গা দেখেছি। কিন্তু শুধুমাত্র জমি—এ কথাটা আমাকে বিহ্বল করে দেয়। পশ্চিমদেশ সম্বন্ধে আমি যেসব বই পড়েছি ও ছবি দেখেছি তাতেও আমার চোখ খোলে নি। আমরা যেসব বন্দর পত্তন করেছি তার চারপাশে বেশী জমি নেই। বোধ হয় সে জন্যই। আমাদের বন্দরের পিছনের দিকটায় সানফ্রানসিসকো, রায়ো কি মার্সেইর মত সাধারণতঃ পাহাড় থাকে কিংবা পূবদেশী বন্দরের মত কাদামাখা ধানক্ষেত। ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলোর মত চতুর্দিকে দ্বীপের মেলাও কোনটা কোনটাতে আছে। হল্যাণ্ডে অবশ্য চাতালো জমি আছে কিন্তু তার পাশে পাশে খাল। লুসী, আমি কিছুতেই কল্পনায় আনতে পারি না মাইলের পর মাইল জমি, আকাশ ছুঁয়ে জমি, দিকবাল ছুঁয়ে জমি কী রকম জানি দেখায়!

—আমিও না।—লুসী আগুনে একটি কাঠ ফেলে চা করবার জন্য জলের কেটলি বসাতে বসাতে বলে।

—ওই দৃশ্যের সাদৃশ্যে আমার মনে পড়ে বিষুবরেখার ধার ঘেঁষে সেই শান্ত স্থির সমুদ্রের কথা। যতদূর দেখা যায় নিথর সমুদ্র—এমন কি বাতাসের নিঃশ্বাসও শোনা যাচ্ছে না। হাল চালাবার পথ নেই। কিছুদিন ওভাবে কাটলেই মন জমে পাথর হয়ে যায়। কিন্তু জমি বোধ হয় মনকে এভাবে নাড়া দেয় না। জেফ সমুদ্রকে আমাদের আর সবাইয়ের মত যখন ভালবাসলই না তখন ও যে অন্ততঃ গতিহীন জমিকে ভালবাসছে তা ভালই।

—ক্যানসাসেও প্রচুর বাতাস,—লুসী বলে, আমি প্রায়ই ওখানকার বিশ্রী সাইক্লোনের কথা পড়ি।

—সাইক্লোন সব জায়গায় আছে,—সারা হণ্ট উত্তর দেন: কিন্তু তাদের রূপ, প্রকৃতি এক নয়।

লুসী বৃদ্ধা রমণীর দৃষ্টিতে শঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি নীরবে চা করতে থাকে।

—আমার এখন মনে পড়ছে,—সারা হণ্ট বলতে থাকেন, জেফের দাদু এই রকম শূন্য বিস্তৃত জমির কথা জানতেন। ওঁর মুখে গল্প শুনেছি ১৮৪০-এ যখন আমি সবেমাত্র জন্মেছি, উনি এক জাহাজ-ভর্তি চামড়া নিয়ে বুয়েনাস এরিসে গিয়েছিলেন। সেখানে আর্জেনটাইন সমভূমিতে একজন গোপালকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওঁরা সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে চেপে বেড়াতেন। সেই বিশাল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শুধু ঘাস, আকাশ আর গরুর পাল। আমার মনে আছে উনি বলতেন সেখানকার ঘাসের রঙ লালচে। চমৎকার ঘাসগুলো, হাওয়াতে রীতিমত ঢেউ খেলত। পরে কোন এক সময়ে আমি জেফকে এ বিষয়ে লিখব। আমি চাই না যে ও নিজের দাদুকে ভুলে যাক।

লুসী ওর চেক-কাটা স্কার্টের পকেট থেকে ঝাড়ন বের করে (যা সব সময়েই ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকে) টেবিল, অগ্নিকুণ্ডের ওপরের সাদা তাক এবং নীচের ফ্রাঙ্কলিন স্টোভের ওপরের প্রকৃত অথবা কল্পিত ধুলো ঝাড়তে থাকে। তারপরে ফুলদানী ও মাটির কুঁজোর ফুলগুলো ঝেড়ে ঠিক করে রাখে। স্থান হণ্টের সম্বন্ধে তখনও সে অস্বস্তি বোধ করছিল। সে তার শাশুড়ীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হবে এ ভয় লুসী করছিল না। কারণ স্থান ভাল ভাবেই জানে এতে যে পরিমাণ গোলমাল ও আলোচনার সৃষ্টি হবে তা ওকে একেবারে একার মাথার ওপরেই নিতে হবে। অবশ্য দশ বছর আগে ওকে প্রথম এই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তারপরে শত শত বার—কিন্তু তখন, সর্বদাই গ্রানাইটে তৈরী অনড় গোলাকৃতি পাথরের মত সারা হণ্ট ওর পেছনে ছিলেন।

যখন লুসী কাপড়ের আলমারির এবং খাটের মাথার ওপরে ধুলো আছে কিনা দেখতে গেল তখন বহু চেষ্টার পরে স্থান যেদিন থেডাসকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করে গেল সেই দিনটির কথা ওর মনে পড়ে এবং ও নিজে সারা হণ্টের জন্য যে অংশ অভিনয় করেছিল তা মনে মনে আবৃত্তি করতে থাকে: সারা বলেছিলেন, লুসী, তুমি ওদের বলে দিও। কারণ ওরা কখনও আমাকে কোন প্রশ্ন করতে সাহস পাবে না। তুমি তোমার নিজের মত করেই ওদের বল, তুমি জন্ম-অভিনেতা, তোমার কথা ওরা শুনবে। ওদের বল, আমিই স্থানকে থেডাসের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি আর প্রকৃত সত্যও তাই। থেডাস ওর ভালবাসা পাবার যোগ্য নয়। হয়তো এক-কালে যোগ্যতা ছিল কিন্তু এখন আর নেই। থেডাস যদি শুধুমাত্র একটি নারীদেহ চায় তাহলে এই ঈশ্বর-পরিত্যক্ত এলাকায় খ'য়ে খ'য়ে খুঁজে পাবে। অবশ্য এ কথা ওদের বলবার প্রয়োজন নেই। এই অভিশপ্ত বাড়ির পক্ষে স্থান অত্যন্ত ভাল। জেফও আমার কাছেই আরামে থাকবে। অবশ্য জেফও এখানে বেশীদিন নেই। থেডাসকে আমি এই পৃথিবীতে এনেছি, আমাকেই তার মূল্য দিতে হবে। ওদের বল, আমি এই কথা বলেছি।

লুসী নিজের মনে কথাগুলো একবার আবৃত্তি করল। সে সেদিনও তাই করেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল কোন্ কোন্ কথায় বিশেষ জোর দিয়ে এবং নিজস্ব ব্যাখ্যা কিছুটা সংযোজিত করে তাকে এই কথাগুলো বলতে হবে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এক মিনিটের জন্য বসবার ঘরে গিয়ে সে বারোটি চেয়ারের পাশে আর একটি রাখল।

৪

বসবার ঘরের আবহাওয়ার পরিবর্তনে লুসী অবাক হয়ে গেল। দশ মিনিট আগে যে ঘর দেখে গেছে এ যেন তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। চেয়ারটা রেখে ও বিনুনি-করা কার্পেটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করল যে প্রভেদটা কোথায়? জিনিসগুলো যেমনকার তেমন নেই এটা যেমনি ওর স্থির নিশ্চিত মনে হল অমনি অন্যমনস্কভাবে চশমা খুলে নিঃশ্বাসে কাঁচ ঝাপসা করে রুমাল দিয়ে মুছতে লাগল। বছরের পর বছর যখনই তার মনে অস্বস্তি অথবা অনিশ্চিত ভাব জেগেছে সে নির্বোধের মত এই রকম করে এসেছে—যেন পরিষ্কৃত কাঁচ তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবে।

বিষাদের গুরুত্ব হারিয়ে ঘরটা হালকা ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। বোধ হয় এ আমারই মানসিক প্রতিফলন—লুসী ভাবে, আমি আর আগের মত উদ্বিগ্ন বা ব্যস্ত নই। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় ও খুশী হতে পারে না। ঘরটি স্থির কিন্তু এখন আর নীরব নয়—শুধু ধীর, শান্ত। দিনশেষের স্বচ্ছ উজ্জ্বল কুয়াশামালা যখন ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে

অগ্রসর হয় তখন সমুদ্রতীর ও দ্বীপগুলোকে যেমন সুন্দর দেখায় ঘরটিকে তেমনি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

সেই কার্পেটের ওপরে দাঁড়িয়েই লুসী একটু হাসল। ওর মনে হল এই পরিবর্তনের কারণ ও বুঝতে পেরেছে। এখন আর দেওয়ালে ও ঘরের কোণে কোণে কোন অপ্রান্ত চিন্তাধারা নেই, দুঃখ নেই, হতাশা ও বেদনাভরা অসমসাহসিক সিদ্ধান্ত নেই, আশা নেই, অনুতাপ নেই, স্মৃতি নেই। সারা হন্টের আত্মা অথবা জীবনীশক্তি যা এই ঘরটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল তা চলে গেছে। শাগ দ্বীপের (যেখানে ওরা ওঁর দেহ নিয়ে যাবে) জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি তা তাঁর সঙ্গে অনাবিষ্কৃত নতুন স্থানে, অজানা সময় এবং কালের কাছে নিয়ে গেছেন। হয়তো পরিচিত দ্রব্যাদি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক ওঁর আত্মা এখনও এই পুরাতন গৃহের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো সে এখনও কারও জন্যে অপেক্ষা করছে যে বুঝতে পারবে কেন সে পৃথিবীর এই বিশেষ স্থানে কিয়ৎকালের জন্য প্রবাসী ছিল। এই চিন্তায় লুসীর মন উত্তেজনা ও আরামে পূর্ণ হয়ে উঠল এবং ও আবার হাসল। দিক-চক্রবালরেখা পার হয়ে যেখানে আকাশ ও উন্মুক্ত সাগর মিশেছে সেখানে যাত্রারত সারা হন্টের আত্মার জন্য একটি প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করবার অদ্ভুত ইচ্ছা হল লুসীর। সে বুঝতে পারছিল এ নিছক পাগলের পাগলামি কিন্তু তবুও সে সংযত হতে পারছিল না। নতজানু হয়ে কিছু বলবার আকাঙ্ক্ষায় ও পুনঃপুনঃ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। কয়েক বছর পূর্বের পড়া কিংবা শোনা কয়েকটি কথা ওর মনে হল—যা সর্বদাই ওর মনে আনন্দে অনুরণিত হয়: ঈশ্বরের অপার করুণায় বিশ্বাসীর আত্মা যাত্রা করুক। শান্তি পাক।

এতেই চলবে। কতবার সে সমুদ্রতীরবর্তী অথবা দ্বীপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পারিবারিক ছোট সমাধিক্ষেত্রে এই কথাগুলো নিজের মনে বলেছে। সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়ে উত্তেজনায় ওর মুখ লাল হয়ে ওঠে—বাতাসে চারিদিকের দাঁড়ানো অল্প কয়েকটি লোকের পোশাক উড়ছে আর আশ্চর্য এক একাকীত্বের ভারে পরস্পরের মন বিচ্ছিন্ন।

সারার আত্মার উদ্দেশ্যে লুসী ফিসফিসিয়ে কথাগুলো বলে, কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই নতজানু হতে পারে না। নতজানু হওয়া তার ঐতিহ্য এমন কি জীবনধর্মের বিরোধী। এতে সে অ-প্রকৃত ও অসৎ হয়ে যাবে—যেমনি সে কাল রাত্রে হয়েছিল, যখন ডাক্তার তাকে সারা হন্টের শয্যাপার্শ্বে দেখা হবার পরে স্টোরে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই। স্টোরে পৌঁছে দেখল এই মধ্যরাত্রেও ধীবররা পাইপ টানতে টানতে তার সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছে। চারিদিকে অস্বস্তিকর নীরবতা। সে ডাক্তারের ভাষায় তাদের শব্দহীন সম্মিলিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। এতে তার কোন ভয় ছিল না। কারণ, ডাক্তার এই কুয়াশার মধ্যেই পাহাড়ের ওপরে এক মাইল দূরবর্তী ডেনিয়াল থারসটনকে দেখতে গিয়েছিলেন।

উনি চলে গেছেন, সেই ক্লান্ত দলকে লুসী বলেছিল, এই সমুদ্র-উপকূলের একটি যুগ উনি শেষ করে দিয়ে গেলেন।

তার কথায় ধীবররা বিস্মিত হলেও মুখের রেখায় কোন ভাব প্রকাশিত হয় নি। ওরা পাইপ ঠুকে ঠুকে পরিষ্কার করে, ভোরে হোঁচট খেতে খেতে ডিঙি খুলতে যাবার আগের চার ঘণ্টা ঘুম ঘুমুতে চলে গেল। শুধু স্যাম পার্কার শুভরাত্রি জানাল।

কিন্তু যখন তারা ওপরের ঘরে শোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন জোয়েল তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

—আর কেউ এভাবে বলতে পারত না,—জোয়েল বলে, লুসী, তুমি সব সময়েই এমন ঠিক ঠিক করে বলতে পার। মধ্যে মধ্যে আমি অবাক হয়ে ভাবি তুমি কি করে ঠিক কথাগুলো খুঁজে পাও। ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই এই উপকূলের পুরাতন দিনের অবসান হল কিন্তু তাকে একটা যুগ বলে চিহ্নিত করবার কথা কে ভেবেছিল? তোমার কাছে শোনবার আগে ও কথাটা আমার মনেই হয় নি।

বিছানায় জোয়েলের প্রশস্ত কাঁধের কাছে শুয়ে লুসী একটু কাঁদল। জোয়েল শোওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছিল। লুসী মনে মনে ভাবে, পরে কোনদিন ও জোয়েলকে জানাবে যে 'যুগ' কথাটা ডাক্তারই প্রথম বলেছিল নইলে তারও মনে আসে নি।

[ক্রমশঃ]

'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত
চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

উলঙ্গ রাজা

দেবী খান

জীবনের জটিলতম সমস্যা সমাধানে
চিন্তাশীল লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত রচনা

দাম আড়াই টাকা

●

অনেকগুলি বিচিত্র প্রকৃতির মানুষের জীবনালেখ্য

অমলেন্দু চৌধুরী

বুদ্ধি ও আবেগের সমন্বয়ে রচিত মননশীল
নবাগত লেখকের প্রাণধর্মী শক্তিশালী উপন্যাস

দাম চার টাকা

●

ভ্রমণ-সাহিত্যে অতুলনীয় সংযোজন

বহুরূপে—

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

কেদার-বদরীর বহু পুরাতন পথ এই গ্রন্থে
নূতন আলোকসম্পাতে উজ্জ্বলতর হয়েছে।

দাম সাড়ে ছয় টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

জলসাঘর

দাম চার টাকা

বনফুল প্রণীত

রাত্রি

দাম তিন টাকা

যোগেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

কবীর বাণী

দাম দেড় টাকা

যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত

বিদ্যাসাগর-পরিচয়

দাম দুই টাকা

সুশীল রায় প্রণীত

আলেখ্য-দর্শন

দাম আড়াই টাকা

কুমারেশ ঘোষ রচিত

যদি গদি পাই

দাম দুই টাকা

বসুধারা গুপ্ত রচিত

তুহিন মেরু অন্তরালে

দাম তিন টাকা

সুশীল সিংহ রচিত

সাগর ও ঊর্মি

দাম দেড় টাকা

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

বিক্রমাদিত্য হাজরা

আমি জানতাম না যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা (রাজনৈতিক অর্থে) নেই এবং আমাদের লেখকদেরও কোন স্বাধীনতা (আইনগত অর্থে) নেই। 'দেশে'র পৃষ্ঠায় লেখকদের স্বাধীনতার দাবিতে যে সোরগোল উঠেছে তা দেখে অনুমান হচ্ছে যে এবিষয়ে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল। লেখকদের স্বাধীনতার আন্দোলন শুধু যে 'দেশ' পত্রিকাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে তা নয়। সংবাদপত্রের সংবাদে দেখতে পেলাম আমাদের বিখ্যাত আইয়ুব সাহেব 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সংঘ গঠন করেছেন। নামটা শুনেই বুঝতে পারা যায় আমাদের দেশের লেখকেরা স্বাধীন নন; তাঁদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীন হতে ইচ্ছুক তাঁরা তাঁদের এই স্বাধীনতার আদর্শকে প্রচার করার জন্য সংগঠিত হচ্ছেন।

আমরা যতদূর জানি আমাদের দেশটা স্বশাসিত, অর্থাৎ ভারতীয়দের দ্বারা শাসিত; আর আমাদের সংবিধানে কাগজে-কলমে লেখকদের অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সেন্সরের খবরদারি থাকলেও তা সিনেমার ক্ষেত্রে যতখানি সক্রিয়, পুস্তকাদির ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত ততটা সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। কাজেই 'দেশ' পত্রিকা এবং আইয়ুব সাহেবের চেঁচামেচি শুনে নিজের ধারণা সত্য কিনা সে বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম। 'দেশ' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা এবং পত্রিকায় প্রকাশিত আইয়ুব সাহেবের বক্তব্য পড়ে ফেললাম।

পড়ে যতদূর বুঝতে পারলাম তাতে মনে হল এই লেখকদের নিজেদের কোন স্বাধীনতার দাবি নেই; তাঁরা স্বাধীনতার সপ্তম স্বর্গে বসবাস করছেন। তাঁদের সব কান্নাকাটি সব পরের জন্যে। যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে বা কমিউনিস্ট শাসনে আছেন সেই সব হতভাগাদের পরাধীনতার জ্বালা চোখে দেখে তাঁরা অশ্রু মোচন করছেন। এমন নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা একমাত্র বাংলাদেশেই সম্ভব।

আমি যতদূর জানি, তাতে 'শিল্পীর স্বাধীনতা' পর্যায়ে যাঁরা লিখছেন তাঁদের বেশির ভাগই বৃটিশ আমলেও লিখতেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু-সংখ্যক লেখক সে সময়ে দেশের স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে কিছুই—বা বিশেষ কিছুই লেখেন নি। অর্থাৎ নিজের স্বাধীনতা না থাকলেও তাঁরা তা নিয়ে নালিশ জানান না, কিন্তু অপরের স্বাধীনতায় বিঘ্ন ঘটছে দেখলে তাঁদের চোখের জল বাধা মানে না। এরই নাম বোধ করি মহানুভবতা।

মহানুভবদের প্রতি আমি সব সময় ভক্তিতে আপ্লুত। কাজেই আগেই এঁদের পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে আমি একটি ক্ষুদ্র সংশয় জ্ঞাপন করি। এই লেখকদের নিজেদের যখন কোন স্বাধীনতার অভাব ঘটে নি, তখন 'শিল্পীর স্বাধীনতা', 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ'—এই জাতীয় শিরোনামা কেন? 'কমিউনিস্টতন্ত্রে বা দেশে স্বাধীনতার অভাব', 'কমিউনিস্টবিরোধী সাহিত্য সমাজ'—এই ধরনের শিরোনামা অধিকতর সঙ্গত হত না কী? নামের ভিতর দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অর্থ কী?

আজ সারা দেশ জুড়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এক সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ চলেছে এ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ কথা ঠিক এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি বলে একটি দুর্বল পার্টি ছিল; এবং দুর্বলতর হয়েও আজও তার অস্তিত্ব টিকে রয়েছে। বহু দিন ধরেই এই পার্টির নীতির বিরোধীরা এর বিরুদ্ধে

যুদ্ধ চালিয়ে এসেছেন। কিন্তু আজ যে ধরনের সংগ্রাম পরিচালনা করা হচ্ছে এর জাত আলাদা। এ যেন সর্বাত্মক যুদ্ধ—war of extermination—মূল সুদ্ধ উপড়িয়ে ফেলার যুদ্ধ। কেন? গণতান্ত্রিক দেশে একটি পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করার এই প্রয়াস কেন? আমাদের দেশকে চীন আক্রমণ করেছে বলে?

এদেশী কম্যুনিস্টদের মধ্যে দেশদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক নিশ্চয়ই আছে—তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। শত্রুর সঙ্গে যারা ষড়যন্ত্র করে ফাঁসীই তাদের একমাত্র পুরস্কার। তাই সমগ্রভাবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগ্রত করে চীন-বিরোধী মনোভাবকে জোরালো করা যায় এ যুক্তি হঠাৎ সঙ্গত বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু কমিউনিজমের সঙ্গে চীনা-আক্রমণের সম্পর্ক কী? চীন যদি কমিউনিস্ট না হত বা অন্য কোন অকম্যুনিস্ট দেশ যদি আমাদের আক্রমণ করত তবে কি আমরা কম বিব্রত হতাম বা দেশ রক্ষার সমস্যাটা কম তীব্রতর হত? দীর্ঘ দুশো বছর ধরে আমরা তো গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে কথিত একটি দেশের অধীনে ছিলাম। গণতান্ত্রিক ব্র্যাণ্ডের ছাপ লাগানো ছিল বলে কি সে চাবুকের আঘাতে আমরা কিছু কম যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম? গণতান্ত্রিক ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী রূপ দেখে আমরা কি সেদিন তত্ত্ব হিসাবে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলাম? তা করি নি, কারণ গণতান্ত্রিক ইংলণ্ড সাম্রাজ্যবাদী বলে নীতি হিসাবে গণতন্ত্রও খারাপ এটা কোন যুক্তি নয়। নীতি আর নীতি প্রয়োগের মধ্যে কিছু তফাত থাকে। নীতি প্রয়োগে যে দোষত্রুটি ধরা পড়ে তা দেখে নীতি-সংস্কার করা যায়। যুক্তি হিসাবে এ কথা বলা যায় যে চীন যে আজ স্বেচ্ছায় পিছিয়ে গিয়ে ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা সৃষ্টি করল, তার কারণ আর একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অসমর্থন। নীতি এক; কিন্তু প্রয়োগে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কত তফাত হয়ে গিয়েছে। চীন ভারত আক্রমণ করে বুদ্ধের সেই নীতিই প্রমাণ করল যে মানুষ ত্রিবিধ কামনার দাস—ভোগের কামনা, ক্ষমতার কামনা আর অমরত্বের কামনা। কোন তত্ত্বই মানুষের এই মৌলিক চরিত্রকে উলটে দিতে পারে না।

কাজেই কমিউনিস্ট চীন আমাদের আক্রমণ করেছে বলে আমরা ক্রুদ্ধ হয়েছি—কথাটা তা নয়। চীন আমাদের আক্রমণ করেছে—আমাদের পক্ষে এইটেই যথেষ্ট সংবাদ। আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে পুলিসবাহিনী যখন ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর বুলেট নিক্ষেপ করে তখন যেমন সে বুলেটে কিছু কম ব্যথা লাগে না তেমনি চীন কমিউনিস্ট না হয়ে যদি সর্বোদয়বাদী হত এবং সর্ববিষয়ে কোন আদর্শস্থানীয় দেশ হত তাহলেও চীনা-আক্রমণকে আমরা সমান বিতৃষ্ণার চোখেই দেখতাম। কাজেই চীনা-আক্রমণ ও কমিউনিজম ভাল কি খারাপ—এ দুটি দুই ভিন্ন প্রসঙ্গ। এই দুটি প্রসঙ্গকে এক ও অবিভাজ্য করে দেখা ও দেখানোর যে ব্যাপক প্রয়াস আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার পিছনে কিছু দুরভিসন্ধি আছে।

কমিউনিস্ট চীন আজ দেশ আক্রমণ করেছে বলে জনচিত্ত শুধু চীন নয়, কমিউনিজমের প্রতিও রুষ্ট। এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ও মনস্তাত্ত্বিক। মনস্তত্ত্ব সব সময় যুক্তির পথ ধরে চলে না। আর এই মনস্তত্ত্বের পিছনে জনচিত্তের খানিকটা আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়াও কাজ করছে। কমিউনিজম থেকে মানুষ অনেক বেশী আশা করেছিল; সেই অনেক বেশীর বদলে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট আমদানি হতে লাগল তখন সেই আশাভঙ্গের বেদনা তীব্র কমিউনিস্টবিরোধী বিক্ষোভ হিসাবে দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগসন্ধানী কায়েমীস্বার্থ এই অবস্থাকে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। চীনা-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মনোভাবকে শক্তিশালী করার চেয়ে তাঁরা কমিউনিস্টবিরোধী প্রচারকার্যে অনেক বেশী মনোযোগী হয়ে উঠেছেন।

বলা বাহুল্য কমিউনিজম বা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কমিউনিস্ট মতবাদের সঙ্গে আমার গুরুতর মতভেদ আছে। কিন্তু যতদূর জানি নানা বিপরীত মতের সহাবস্থানই গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে তোলে। আজ যে কমিউনিস্ট উচ্ছেদের প্রয়াস দেখতে পাচ্ছি তার উদ্দেশ্য কি গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করা?

বুদ্ধদেব বসু জিজ্ঞেস করছেন: "গণতন্ত্রকে যে বধ করতে চায় সে কি পারে গণতন্ত্রের আশ্রয় দাবি করতে? স্বাধীনতাকে লুপ্ত করা যার প্রতিজ্ঞা তার কি আছে

াধীনতায় অধিকার?" (দেশ: ১০ই ফাল্গুন, পৃ. ৩১০)

প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু কি জানেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রেও ঠিক একই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করা হয়? সেখানেও বলা হয় যা অক্টোবর বিপ্লবের স্বার্থের পরিপন্থী তাকে কী করে সহ্য করা যায়? সহ্য করা যায় কিনা জানি না, কিন্তু সরকার নামক যন্ত্রের এমন মহিমা যে এই যুক্তির পথ ধরে সে যে কতদূর যেতে পারে স্ট্যালিনের আমলের সোভিয়েট রাষ্ট্র তার প্রমাণ। মানুষের হাঁচি-কাশি-দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে তাঁরা বিপ্লবের বিপদকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। আমেরিকায় মাত্র কয়েক বছর আগে ম্যাকার্থির আমলে কমিউনিস্ট বিতাড়নের নামে সমগ্র সমাজে যে ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছিল তার ইতিহাস এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমন বহু ভদ্রলোক সেই সময় দিনের পর দিন নির্যাতন ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পাস্তারনাকের 'ডঃ ঝিভাগো' বইটি যখন সোভিয়েট দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তখন যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বইখানা বিপ্লব-বিরোধী। তার জবাবে একজন মার্কিন সমালোচক বলেছিলেন যে বিরুদ্ধ মতবাদকে সহ্য করতে পারার মধ্যেই গণতন্ত্রের পরীক্ষা। গণতন্ত্রের মূল কথাটা হল এই: সমস্ত দল বা ব্যক্তি যার যার মত জনতার সামনে উপস্থিত করবেন, জনতার হাতে শেষ বিচারের ভার। বিচারের ভার যদি সরকারের হাতে তুলে দেওয়া যায় তাহলে আর সে সরকার গণতান্ত্রিক সরকার থাকে না।

আমি জনসাধারণের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি তাঁরা যেন বুদ্ধদেব বসুকে এ দেশের প্রাইম মিনিস্টার করে দেন—অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্য। তাঁর মধ্যে গণতন্ত্রের জেহাদ এমন তীব্র বাণীমূর্তি লাভ করেছে যে ভরসা করি সেই এক সপ্তাহের মধ্যেই গণতন্ত্রকে নিষ্কণ্টক করার জন্য তিনি শুধু কমিউনিস্ট পার্টিকে নয় সমস্ত বামপন্থী দলগুলিকেই সেই লোকে পাঠাতে পারবেন যে লোক থেকে লোকে আর ফেরে না।

গণতান্ত্রিক দেশের কোন শক্তি যখন কোন পার্টি বা মতবাদের উচ্ছেদ কামনা করে তখন তার গতি ফ্যাসিজমের দিকে। সরকার একটি নিপীড়নমূলক যন্ত্র; এবং দেশ গণতান্ত্রিকই হোক আর যাই হোক, একবার যদি সরকারের হাতে নিপীড়নের কোন ক্ষমতা তুলে দেওয়া যায় তবে যে সে কতদূর পর্যন্ত তার অপব্যবহার করবে তা বলা যায় না।

'Your most obedient servant' বুদ্ধদেব বসু আবার বলেছেন: "এখানে শাসকদের নির্বাচন করে সর্বজন; যাঁরা রাষ্ট্র চালান তাঁরা বিরোধী পক্ষকে শুধু সহ্য করেন তা নয়, অপরিহার্য বলে জ্ঞান করেন।" (দেশ: ১০ই ফাল্গুন, পৃ. ৩০৯)

বুদ্ধদেব বসু জানেন কি না জানি না, আমাদের নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ বিষ উদ্‌গিরণ করা হয় তাতে মনে হয় না যে বিরুদ্ধ দলগুলিকে তাঁরা অপরিহার্য বলে মনে করেন। বুদ্ধদেব বসু জানেন কি না জানি না, কিন্তু আমি জানি যে এ দেশে শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারী প্রভৃতিদের ধর্মঘট বা দাবিদাওয়া প্রকাশের সময় যেসব বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় সেই সব বিজ্ঞপ্তিতে যাদের নাম থাকে তাদের নাম পুলিসের গোপন খাতায় লাল অক্ষরে লেখা হয়ে যায়; তারা কখনও সরকারী চাকরি পায় না। অথচ এই নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলনে যারা আসে তাদের অনেকেরই কোন রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না।

আমাদের দেশের সরকার একটি আধা-ফ্যাসিস্ট সরকার হয়ে উঠবেন এ আমরা দেখতে চাই না—কিন্তু 'দেশ' পত্রিকা এবং আরও কিছু কিছু সংগঠন তাকে এখন পুরোপুরি ফ্যাসিস্ট সরকার হিসাবে দেখতে চায়।

এই অনস্বীকার্য প্রবণতার প্রথম প্রমাণটি দেখতে পাওয়া যাবে শিবনারায়ণ রায়ের কথায়। তিনি বলেছেন যে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও এখন পর্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে নি। ঘটলে "চীনের আক্রমণ আমাদের কাছে এতখানি অপ্রত্যাশিত ঠেকত না: আক্রমণ করার পরও এর আসল কারণ চীনে-সাম্রাজ্যবাদ, কম্যুনিজম নয়, এই উদ্ভট তত্ত্ব উদ্ভাবন করতে আমাদের সত্যনিষ্ঠায় বাধত।" (দেশ: "চীনের আক্রমণ ও বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বয়ঃপ্রাপ্তি", ৩রা ফাল্গুন, পৃ. ২০৯)

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের দুরবস্থা দেখে রায়মশাই যে পরিমাণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাতে আমি সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু রায়মশায়ের নিজের কি খুব বেশী সত্যনিষ্ঠা আছে? তিনি বলতে চেয়েছেন যে কমিউনিজমের কাজই হচ্ছে পররাজ্য আক্রমণ করা, কিন্তু ইউরোপের ও আমেরিকার বড় বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যে এতকাল ধরে পররাজ্য আক্রমণ ও গ্রাস করায় অপরিমিত আনন্দলাভ করেছে, এবং এখনো যারা অস্ত্রসজ্জায় মগ্ন, তাদের কথা তো তিনি বলেন নি। আজ একজন সাধারণ মানুষও এ কথা বোঝে যে সমাজতান্ত্রিক আর গণতান্ত্রিক এই দুই বিবদমান শিবির পাশাপাশি রয়েছে বলেই কোন পক্ষই অকুতোভয়ে সাম্রাজ্যবিস্তারে মন দিতে পারছে না। না হলে বুড়ো হওয়ার ফলে যে গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের দাঁত পড়ে গিয়েছে এ কথা সত্য নয়।

সত্যনিষ্ঠাটা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে বলেই তলার দিকে যে আর একটা সত্য আছে তা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। মহৎ লোকদের এরকম হয়। এবং হওয়ার কারণও থাকে। শিবনারায়ণ রায় বলছেন যে যদি আমাদের সত্যনিষ্ঠা থাকত তাহলে "এই সংকটে সমর্থন এবং সাহায্যের জন্য আমরা ভৌগোলিক প্রতিবেশিত্বের চাইতে আদর্শগত সহধর্মিতাকে স্বভাবতই বেশী মূল্য দিতাম।" (ঐ, পৃ. ২০৯)

আমাদের আদর্শগত সহধর্মিতা কাদের সঙ্গে? কেন—ইংলণ্ড আর আমেরিকার সঙ্গে! কিন্তু রায়মশাই কি জানেন যে বাঘ আর বাঘের বাচ্চার মধ্যে আদর্শগত সহধর্মিতা এতই তীব্র যে বাচ্চাকে দেখামাত্র বাঘ আর আত্মায় আত্মায় ভেদ সহ্য করতে না পেরে তাকে তৎক্ষণাৎ উদরগহ্বরে পাঠিয়ে দেয়?

কাজেই রায়মশায়ের আসল উদ্দেশ্য হল ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকে যোগ দেওয়ার অনুকূল মনোভাব তৈরি করা। এটা রায়মশায়ের নিজস্ব মত মাত্র নয়; 'দেশ' পত্রিকার অফিসিয়াল মতও তাই। ('দেশ' পত্রিকা এত বেশী গণতান্ত্রিক যে তাঁদের অফিসিয়াল মতের বিরোধী কোন মত এই পত্রিকায় সহজে ছাপা হয় না।) 'দেশ' পত্রিকা বলছেন: "...আমরা যে নন এলাইনমেন্টের অনুশীলন করেছি তার কী সাফল্য হয়েছে? চীনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আমরা যখন সাহায্যের জন্য ডাক ছেড়েছি তখন আমেরিকা ও বৃটেন সাহায্য পাঠিয়েছে, কম্যুনিস্ট ব্লক থেকে সাহায্য আসেনি, বরঞ্চ বৃটিশ ও মার্কিন সাহায্য আসাতে কম্যুনিস্ট ব্লক বিরক্ত হয়েছে।" (দেশ: "বৈদেশিকী", ১৭ই ফাল্গুন, পৃ. ৩৯৭)

এ কথার নির্গলিতার্থ খুব সহজ। নিরপেক্ষতার নীতি ব্যর্থ ও অবাস্তব ভাবালুতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন না কোন ব্লকে আমাদের যোগদান করা অবশ্য-কর্তব্য। আদর্শগত কারণে কম্যুনিস্ট ব্লকে যোগ দেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই অবশিষ্ট একটি মাত্র পথই আমাদের সামনে খোলা আছে: ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকে যোগদান করা।

ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকে যোগ দেওয়ার একটিমাত্র খুব ছোট্ট শর্ত আছে। সে শর্তটিও এমন মনের মত শর্ত যে তাকে শর্ত বলেই গণ্য করা যায় না। শর্তটি হল ঘরে এবং বাইরে কমিউনিজমের বিরুদ্ধতা করা।

খুব মনের মত শর্ত বটে, কিন্তু একটি কথা আছে। আমাদের দেশের যতগুলি সক্রিয় পার্টি আছে তাদের সবগুলি কমিউনিজমের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত—কমিউনিস্ট পার্টি, আর-এস-পি, আর-সি-পি-আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এমন কি পি-এস-পি পর্যন্ত। একমাত্র স্বতন্ত্র পার্টি বাকী রইল; কিন্তু আমেরিকার রিপাব্লিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মত কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র পার্টি এক ও অভিন্ন। কাজেই ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকে যোগ দেওয়ার অর্থ হল এ দেশের সমস্ত গণভিত্তিক পার্টিকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা। এর তাৎপর্য 'দেশ' পত্রিকা না বুঝতে চাইলেও পাঠকসমাজ আশা করি বুঝবেন। দেশে একটি মাত্র পার্টির শাসন প্রবর্তিত হলে এবং কোন বিরুদ্ধ দলের অস্তিত্ব না থাকলে যে অবস্থাটা হয় তার নাম ফ্যাসিজম। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক এই ফ্যাসিজম যে কত তাড়াতাড়ি দেশকে জাহান্নামে পাঠাতে পারে তার প্রমাণ ঘরের কাছেই রয়েছে পাকিস্তানে।

কমিউনিজমের ভয় সম্পর্কে আমি সচেতন। এ নীতির মধ্যে একনায়কতন্ত্রের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু কমিউনিজমের প্রকৃতি যে কোনদিন বদলাবে না, এ কথা

কে বলতে পারে? পক্ষান্তরে 'দেশ' পত্রিকা যে পথের নির্দেশ দিচ্ছেন তাও একনায়কতন্ত্রের পথ—এবং সম্ভবতঃ আরও খারাপ ধরনের একনায়কতন্ত্র। এই ধনিক শাসিত একনায়কতন্ত্র যে কতদূর খারাপ হতে পারে 'দেশ' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই তা প্রতিপন্ন করা যায়।

"চটশিল্প আজ প্রায় এক-শ বছর ধরে কত শত শত কোটি টাকা লাভ করে এসেছে তার কতটুকু নিয়োগ করেছে নিজেদের শিল্পের এবং নিজেদেরই শ্রমিকদের জীবনের মানের উন্নতির জন্য? প্রায় কিছুই নয়।" ("অসমাপ্ত চটাব্দ": মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। দেশ, ১৭ই ফাল্গুন, পৃ. ৪৩৭-৩৮)

'দেশ' সম্পাদকের অনবধানতাবশতঃ এই যে কয়েকটি মারাত্মক লাইন ছাপা হয়ে গিয়েছে এর থেকেই বুঝতে পারা যাবে পুঁজিপতিরা দেশের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করলে দেশের অবস্থা কী দাঁড়াবে।

সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে 'দেশ' প্রচার অভিযানে অগ্রসর হয়েছে এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখককেই হাতিয়ার হিসেবে পেয়েছে। এঁরা অনেকেই 'দেশে'র দুরভিসন্ধির পুরোপুরি খবর রাখেন এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন লেখক 'দেশে'র আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। কেউ ভয়ে, কেউ অর্থলোভে, কেউ মস্তিষ্কে স্নেহ পদার্থের অভাবের দরুন, কেউ বা স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শিবরাম চক্রবর্তীর মত লেখক যখন 'দেশে'র জালে ধরা দিয়েছেন, তখন বুঝতে পারি তাঁদের পিছনে কাজ করেছে ভয়। তাঁরা জানতেন যে কমিউনিজমের সমর্থক বলে তাঁদের গণ-প্রসিদ্ধি আছে। এই অবস্থায় 'দেশ' আহ্বান না করলে তাঁরা চুপ করে থাকতে পারতেন। কিন্তু 'দেশ' আহ্বান করার পরও যদি তাঁরা চুপ করে থাকেন, তবে তো লোকের ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তার অর্থ হল জনপ্রিয়তার অবসান এবং চাকরির ক্ষেত্রে বিপন্ন হওয়া। অবস্থাটাকে একটা রূপকের সাহায্যে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যায়। 'দেশ' সম্পাদক এক হাতে পিস্তল এবং অন্য হাতে টাকার থলি নিয়ে তাদের সামনে একখানা কাগজ মেলে ধরেছেন সই করার জন্য। কাগজটিতে লেখা আছে—"আমি স্বাধীনতা চাই।" সই না করলে গুলি, সই করলে টাকা। অর্থাৎ এক কথায় স্বাধীনতা না চাওয়ার স্বাধীনতা তোমার নেই।

কিছু কিছু লেখক আছেন—যেমন বুদ্ধদেব বসু এবং সুবোধ ঘোষ—যাঁদের মানসিকতাই এমন যে কোন কিছুর বিরুদ্ধতা না করলে তাঁরা বাঁচতে পারেন না। বিরুদ্ধতা তাঁদের মনের একটা অংশ নয়—তাঁদের সমগ্র মন। বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিউনিজমের বিরুদ্ধতা করাই সহজ এবং নিরাপদ। কাজেই তাঁরা খুশী হয়ে 'দেশ' পত্রিকার জালে পা দিয়েছেন। আবার এক ধরনের লেখক আছেন—যেমন দিনেশ দাশ—যাঁরা কোন না কোন 'ইজম্' ছাড়া বাঁচতে পারেন না। দিনেশ দাশের স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায় যে তিনি সুভাষিজম্, গান্ধীজম্, লেনিনিজম্ প্রভৃতি নানা ইজমের ডাকেই সাড়া দিয়ে অবশেষে অ্যান্টি-কমিউনিজমের বন্দরে তরী ভিড়িয়েছেন।

কিন্তু বেশীর ভাগ লেখকই 'দেশে'র ফাঁদে পা দিয়েছেন নির্বুদ্ধিতাবশতঃ। তাঁরা কোনদিন বিশেষ কিছু পড়াশুনা করেন নি, কোনদিন রাজনীতি বা ইজম্ নিয়ে মাথা ঘামান নি। যে কোন ইজমের অধীনে থাকতেই তাঁদের আপত্তি নেই। কারণ তাঁরা জানেন ফুলপরী আর মেয়েমানুষ নিয়ে লিখলে কোন ইজম্-ই কোন রকম আপত্তি করবে না। তাঁরা হলেন, এক কথায়, অর্ধ-শিক্ষিত। বিশেষণটা আমি বানিয়ে বলছি না।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র বলছেন: "আমি স্বীকার করছি ও বিষয়ে আমার পড়াশুনো কম, আমি কোনদিনই কম্যুনিস্ট শাস্ত্রে কোন রস পাইনি, কিন্তু সেজন্য দুঃখিত বা অনুতপ্ত নই, লজ্জিত তো নই-ই।" (দেশ: ২৬শে মাঘ, পৃ. ১৫৬)

দিনেশ দাশ বলছেন: "প্রথমে বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, এ সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সামান্য। আর একজন কবির পক্ষে জ্ঞানের চেয়ে অনুভূতিই বড়—অনুভূতি নিয়েই তার পৃথিবী।" (দেশ: ১৭ই ফাল্গুন, পৃ. ৪০১)

এই ধরনের স্বীকারোক্তি আরও অনেকে করেছেন। নারায়ণবাবু যখন বলেন, তাঁর পড়াশুনা কম, তখন সেটাকে বিনয় বলে বুঝতে কিছু অসুবিধে হয় না। কিন্তু আমাদের গজেনদা যখন একই কথা বলেন, তখন তিনি মনে মনে

আশা করেন যে লোকে সেটাকে বিনয় বলে ভাববে। কিন্তু লোকে ঠিকই বুঝতে পারে তিনি বিনয় করছেন না, সত্যি কথাই বলছেন।

কিন্তু কত বড় ধৃষ্টতা কল্পনা করুন। যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীতে তোলপাড় লেগে গেছে সেই বিষয় সম্পর্কে কয়েকজন অর্ধশিক্ষিত লোক কিছু না জেনে কিছু না পড়ে কিছু না বুঝে শুধু লোকের মুখে মুখে কতকগুলো কথা শুনে পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন। সাধারণ লোক সামান্য কিছু পড়ে বা না পড়ে কোন মত গ্রহণ করে। কিন্তু একজন বুদ্ধিজীবী যিনি জনমত গঠন করবেন, তিনি যদি পড়াশুনা না করে ওয়াকিবহাল না হয়ে কোন বিষয়ে ছাপার অক্ষরে নিজের মতামত প্রকাশ করেন তবে গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী তা অমার্জনীয় অপরাধ। কোন মতামত প্রকাশের যোগ্যতা যাদের হয় নি শিক্ষিত মানুষের কাছে তাদের কথার কোন দাম নেই; কিন্তু সাধারণ মানুষকে তো তারা বিভ্রান্ত করবেই।

দিনেশ দাশ বলছেন, কবিরা অনুভূতি দিয়ে বোঝেন। আমি যতদূর জানি অনুভূতির জন্ম হয় অভিজ্ঞতা থেকে। কোন বিষয় সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা না থাকলে সে জিনিস সম্পর্কে আমার কোন অনুভূতি জন্মাতে পারে না। যদি জন্মায় তবে বুঝতে হবে তা অপরের থেকে ধার করা। পৃথিবীতে বাস করে চন্দ্রে বসবাসের কোন অনুভূতি হতে পারে না। কল্পনার সাহায্যে যদি সেই অনুভূতি লাভ করতে চেষ্টা করি তবে তা কাল্পনিক অনুভূতি মাত্র, বাস্তব নয়। আমি জিজ্ঞেস করি, দিনেশ-বাবু বা অপরাপর কজন লেখকের কম্যুনিস্ট আন্দোলন বা কম্যুনিস্ট দেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তজ্জাত অনুভূতি আছে? যাঁরা পড়াশুনা করে মননশীলতার পথে যান নি, যাঁদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নেই, তাঁরা কী উপায়ে কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন? একটিমাত্র উপায়ে—পরের মুখে শুনে, পরের মুখে ঝাল খেয়ে। যারা পরের মুখে শুনে নিজের মত গঠন করে তারা স্বাধীন নয়। যারা পরের মতকে নিজের মত বলে চালায় তারা অসৎ। খুবই দুঃখের বিষয় আজ একদল অসৎ অসাধু লেখক, যাঁদের মন কোনদিনই স্বাধীনতার সূর্যের আলোর আনন্দ ও যন্ত্রণা অনুভব করে নি, চিরদিন গাছের ছায়ায় কুঁকড়ে দুমড়ে সঙ্কুচিত হয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেন, তাঁরা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছেন স্বাধীনতার প্রবক্তা! এ ঘটনা একমাত্র বাংলাদেশেই সম্ভব। 'God that failed' নামক বইয়ে যে সাতজন লেখক কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লিখেছেন তাঁদের সঙ্গে এঁদের তুলনা করুন। বহু ত্যাগ স্বীকার করে, অনেক প্রলোভন উত্তীর্ণ হয়ে, সহস্র দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে কেউ একমত হন বা না হন, সকলকেই স্বীকার করতে হবে তাঁদের বলার অধিকার আছে। কিন্তু 'দেশে'র এই লেখকেরা কোন্ অধিকার ও যোগ্যতা নিয়ে কথা বলছেন? আমরা কি এমনি ভেড়া হয়ে গিয়েছি যে অসূর্যম্পশ্যা মেয়েদের মত নিজেদের অভ্যাস ও সংস্কারের চৌহদ্দী যারা কোনদিন পার হয় নি সেই সব আরও নিকৃষ্ট খোঁয়াড়ে বদ্ধ ভেড়াদের কলরব কান পেতে শুনতে বাধ্য হব?

পরিশেষে, আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে। যাঁরা 'দেশে'র পৃষ্ঠায় জোর গলায় তাঁদের স্বাধীনতা আছে আর কমিউনিজমের আওতায় গেলে স্বাধীনতা থাকে না এ কথা প্রচার করছেন তাঁরা কি কখনও নিজের মনের কাছে এ প্রশ্ন তুলেছেন যে সত্যি সত্যি তাঁদের কতখানি স্বাধীনতা আছে? প্রথম কথাই হল এ যুগে যারা অর্ধশিক্ষিত তাদের স্বাধীনতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তারা স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত যেদিকে গলা ও সংখ্যার জোর বেশী অবধারিতভাবে সেইদিকে ভেসে যাবে।

'দেশ' পত্রিকা তো স্বাধীনতার মস্ত পৃষ্ঠপোষক। যাঁরা এই স্বাধীনতার বিমলানন্দে ডগমগ হয়ে 'দেশে' লিখছেন তাঁদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা 'দেশে'র সুরে সুর না মিলিয়ে বেসুরো কিছু লিখে দেখুন না—'দেশে' ছাপা হয় কিনা? দু-একজনের বেসুরো লেখাও অবশ্য ছাপা হবে, যাঁদের প্রতিষ্ঠা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু অনেকের বেসুরো লেখাই ছাপা হবে না, হয় না।

'দেশ' পত্রিকা বলবেন, প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন নিজ নিজ মত গঠনের অধিকার আছে প্রত্যেক কাগজেরই

তেমনি নির্দিষ্ট নীতি নিয়ে চলার অধিকার আছে। আছে বইকি। এবং তাই গণতান্ত্রিক দেশে আজকে লেখকের স্বাধীনতার কথাটা প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে। প্রচুর বিত্ত না থাকলে এ যুগে কোন ভাল কাগজ প্রকাশ করা যায় না। এবং কোন বিত্তবান যখন কাগজ প্রকাশ করেন তখন সেই কাগজের নীতি নিশ্চয়ই এমন হতে পারে না যা সেই বিত্ত সংরক্ষণের পরিপন্থী হয়। এ দেশের কোন লেখকের স্বাধীন মত প্রকাশের আইনগত কোন বাধা নেই এ কথা ঠিক, কিন্তু প্রকাশ করার জায়গা খুবই কম। সেই ব্যাপারে 'দেশ' পত্রিকা এবং কমিউনিস্ট পার্টির 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, উভয়ের দরজাই লেখকের কাছে বন্ধ।

'দেশে' "শিল্পীর স্বাধীনতা" পর্যায়ে আজ পর্যন্ত যতজন লেখক লিখেছেন তাঁর মধ্যে একজন মাত্র লেখক আছেন যাঁর মন স্বাধীন। তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর বক্তব্য শুদ্ধ হোক বা না হোক তা তাঁর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি মননশীলতা থেকে লব্ধ। তা অপরের বক্তব্যের অনুকরণ নয়। একমাত্র তিনিই 'দেশে'র সম্পাদকের মুখের দিকে না তাকিয়ে লেখার সাহস রাখেন। সুখের বিষয়, নিজের স্বাধীন বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ অন্নদাশঙ্করের আছে। অন্নদাশঙ্করের মত আরও শত শত লেখক এদেশে আছেন যাঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে থাকেন; কিন্তু তাঁদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ নেই বা খুবই সীমিত।

আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছি যেসব লেখকের মন একটুও স্বাধীন নয়, সংস্কারের প্রভাব, সংবাদপত্রের প্রচার, মেজরিটির অনুশাসন, সম্পাদকের হুমকি, জনপ্রিয়তা হারানোর আতঙ্ক প্রভৃতি সহস্র বন্ধনে যাঁদের মন বন্দী, তাঁরা জাঁক করে নিজেদের স্বাধীন বলে প্রচার করে অন্য দেশের লেখকদের স্বাধীনতা নেই বলে কলরব জুড়ে দিয়েছেন। আগে নিজের দেশে নিজের প্রকৃত স্বাধীনতা (নিছক আইনগত স্বাধীনতা নয়) অর্জন করুন, তবে অন্য দেশের কথা ভাববেন।

শিবরাম চক্রবর্তী বলেছেন: "ভয়ের থেকে ক্ষুধার থেকে অনিশ্চয়ের থেকে শিল্পীর পুরোপুরি মুক্ত থাকা দরকার।" (দেশ ২রা ফাল্গুন পৃ. ২১৮)। খুব সত্যি কথা। কিন্তু শুধু ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক দেশই আজ পর্যন্ত শিল্পী ও সাধারণ মানুষের জন্য এই ত্রিবিধ মুক্তির ব্যবস্থা দিতে পারে নি। দিতে পারে নি বলেই 'God that failed'-এর সাতজন বিশ্ববিখ্যাত লেখক একদিন গণতন্ত্রের মেকী স্বাধীনতায় না ভুলে কমিউনিজমের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কমিউনিজম অবশ্য তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে নি। কিন্তু তার দ্বারা গণতন্ত্রের ব্যর্থতা অপ্রমাণিত হয় না। আসল কথা কোন তন্ত্রই আজ পর্যন্ত এই ত্রিবিধ মুক্তির সন্ধান দিতে পারছে না। আর তা পারছে না বলেই সমস্ত রকমের চিন্তা ও মত প্রকাশের পথ উন্মুক্ত থাকা দরকার। 'দেশ' পত্রিকা যে ফ্যাসিস্টসুলভ অসহিষ্ণুতার মনোভাব সৃষ্টি করছে তা বিপজ্জনক।

শনিবারের চিঠি (বাংলা মাসিক পত্রিকা) সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি
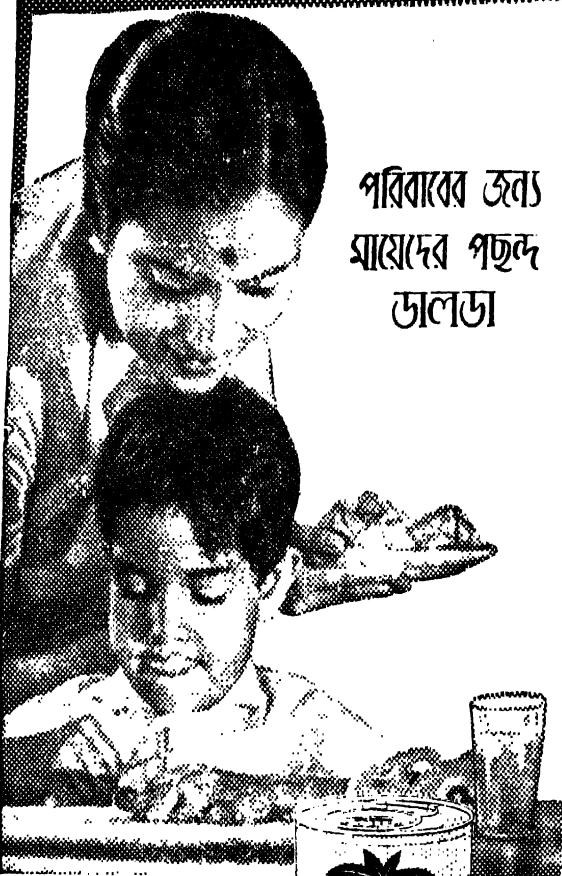
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭-এর অধিবাসী (ভারতীয় নাগরিক) শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক উক্ত ঠিকানা হইতে মুদ্রিত, প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

মালিকগণ: শ্রীমতী সুধারাণী দাস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭ ও শ্রীরঞ্জনকুমার দাস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭।

আমি শ্রীরঞ্জনকুমার দাস, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমত সত্য।

২৬।৩।৬৩	(স্বাঃ) শ্রীরঞ্জনকুমার দাস।

পরিবারের জন্য
মায়েদের পছন্দ
ডালডা
ডালডা
খেজুরগাছ মার্কা
বনস্পতি
রান্নার খাঁটি, সেরা স্নেহপদার্থ

প্র স ঙ্গ ক থা

সাহিত্যে মানুষ

শ্রীদেবব্রত রেজ

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য চরিত্রহীন। অর্থাৎ এই সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্ট হচ্ছে না। চরিত্র বলতে সুস্থ চরিত্র; অবিকৃত মানব চরিত্র। এই আলোচনার শেষার্ধে এই সুস্থ চরিত্রের স্বরূপ আলোচিত হবে।

আজ জাতীয় সংকটে কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক যে কোলাহল তুলেছেন সেই কোলাহল বিশ্লেষণ করলে তাঁদের চিন্তার ও আচরণের যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তা তাঁদের চারিত্রহীনতার দ্যোতক। এতকাল তাঁরা যে সব কারণে সমাজের একান্ত বশংবদ প্রমোদ বিতরকের কাজ করছিলেন নীরবে সেই সব কারণ তাঁরা যেন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেন তাঁরা সরবে বলছেন: শোন দেশের মানুষ, তোমাদের সঙ্গে আমরাও আছি। আমরাও তোমাদের অনুসরণ করছি।

এতকাল তাঁরা পপুলারিটি চেয়েছেন, এখনও চাইছেন। পপুলারিটির মত আত্মনাশকর, চরিত্রনাশকর একটা কল্পিত পরমার্থের কাছে তাঁরা এতকাল নিজেদের বলি দিয়ে এসেছেন। ভালই করেছেন! তাঁরা এমন কিছু বলি দেন নি যার জন্যে আমাদের দুঃখ করার হেতু আছে! যা তাঁরা বলি দিয়েছেন বলে দুঃখ প্রকাশ করছি, আসলে তা তাঁদের আয়ত্তে ছিল না কোনদিন। অর্থাৎ তাঁদের চারিত্র ছিলই না। আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তাঁদের চারিত্রের অভাবের জন্যই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে চরিত্রের অভাব।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নামধেয় রচনা অধিকাংশ শুধুমাত্র কাহিনী। অনেক ক্ষেত্রে তা জীবন-বোধের নয়, জীবনলালসার কাহিনী। সাম্প্রতিক কোন উপন্যাসে স্মরণীয় কোন চরিত্র সৃষ্ট হয় নি। চরিত্রসৃষ্টির দিকে দৃষ্টিও নেই ঔপন্যাসিকের। ঔপন্যাসিক অনুকরণ-মূলক চিত্ররচনায় ব্যস্ত। বিপর্যস্ত-ব্যক্তিত্ব, বিস্রস্তচেতন, প্রবৃত্তি-চালিত মানুষের চিত্রায়ন নিয়ে ব্যস্ত।

এ যেন বঞ্চিতের সাহিত্য-সৃষ্টি। এ সম্পর্কে এক মনস্তত্ত্ববিদের একটা বাক্য স্মরণ করতে পারি: "For the basically deprived man the world is a dangerous place, a jungle, an enemy territory... ... His value system is of necessity, like that of any jungle denizen, dominated and organised by the lower needs, espicially the creature needs and the safety needs." (A. H. Maslow, Motivation and Personality, 1954). একদল ছকে-বাঁধা সাধারণ মানুষের চরিত্র বর্ণনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন, আর একদল মানুষের মধ্যে সর্বপ্রকার রুগ্নতার সন্ধান করে ফিরছেন। রুগ্নতা সন্ধান করছে রুগ্নতা। একদিকে সাধারণ প্রবৃত্তি-চালিত মানুষের কথা, আর একদিকে বিকৃত মানসের রোজনামচা।

প্রধান লক্ষ্য যেখানে গল্প বা কাহিনী, সেখানে চরিত্র স্বভাবতঃ অবান্তর, গল্পকে ঝুলিয়ে রাখার ব্রাকেট মাত্র। ঘটনা, ঘটনা, ঘটনা! উর্ধ্বশ্বাসে বাংলা উপন্যাস ঘটনার পথ ধরে যে-নিদারুণ দুর্ঘটনায় পড়ছে অহরহ, তার চিত্রটা সত্যই ভয়ঙ্কর। আমাদের সাহিত্যের পক্ষে ভয়ঙ্কর।

ইদানীং এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিক তথাকথিত মনস্তত্ত্ব মিশিয়ে গল্পের উপাদেয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। কিন্তু

মনস্তত্ত্বের জ্ঞান তাঁদের এমনই সীমাবদ্ধ যে তাঁরা অ্যাবনরম্যাল সাইকোলজির অন্ধকার পূতিগন্ধময় আহত-প্রবৃত্তির আত্মহনন বা রিরংসার মধ্যে এফেক্ট সন্ধান করছেন।

আর একদিকে পেশাগতভাবে চরিত্র বর্ণনা চলেছে। যে কোন পেশার মানুষকে আজ সাহিত্যের দরবারে হাজির করা হচ্ছে। নূতনত্বের সন্ধান চলেছে পেশার পরিবেশে। সাহিত্য পরিবেশ-কাহিনীতে রূপান্তরিত হতে চলেছে। সমাজের অপরিচিত কোণ থেকে তথাকথিত টিপিক্যাল চরিত্রকে টেনে বের করে আনা হচ্ছে। কিন্তু সুস্থ 'স্বাধীন' ব্যক্তিত্ব চিত্রিত হচ্ছে না। সর্বজনীনতার ধুয়া তুলে, গণতন্ত্রের নাম নিয়ে, সমাজসজ্ঞানতার দোহাই দিয়ে যে সব চরিত্র সৃষ্ট হচ্ছে, তাদের মধ্যে "চরিত্র" নেই।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে চিত্রিত করা হচ্ছে নানা দিক দিয়ে। তাদের জীবনযুদ্ধের নানান চিত্র আসছে সাহিত্যে। এই জীবনচিত্রে বৈচিত্র্য এত কম, এমন বিবর্ণ নিরক্ত দীনতা, যে তাকে ঢাকতে টেনে আনতে হচ্ছে প্রবৃত্তির লীলাকে, রিরংসাকে, লোভকে। শুধু ইচ্ছাপূরণের, শুধু জীবন-ধারণের মৌল দাবির সংগ্রামের কাহিনী এসেছে। আসে নি "চরিত্র"—সুস্থ, অবিকৃত, সৃজনশীল, আত্মপ্রকাশ-ধর্মী মানবচরিত্র, যে চরিত্রে আমাদের ব্যক্তির ভরসা, জাতির ভরসা, মানুষের ভরসা। ঔপন্যাসিক আজ কাহিনীকার মাত্র। সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক কাহিনী কিংবা চলচ্চিত্র কাহিনীর রচয়িতা।

মাঝে মাঝে হয়তো দু-একটা চরিত্র এসেছে। যেমন তারাশঙ্করের কৃষ্ণেন্দু। এর কারণ লেখক স্বয়ং পজিটিভ, ইতিধর্মী, আত্মরূপায়ণধর্মী।

আমরা, পাঠকেরা, আজ চরিত্র আশা করি না। নিজেদেরই মত সাধারণ ভোগতাড়িত মানুষের চিত্রকে সাহিত্যের আভিজাত্য পেতে দেখে আমাদের আত্মশ্লাঘা বাড়ছে ঠিক, কিন্তু প্রকারান্তরে শুধু সাহিত্যের নয়, আমাদেরও সর্বনাশ ঘটছে। আমরা, মনুষ্যজীবনসাধনার কোন ধারা দেখছি না, শুধু বহুধা-বিভক্ত সাহিত্যের দর্পণে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখছি মাত্র। আজ তথাকথিত সাধারণ মানুষ, জীবনের সঙ্গে জৈবপ্রেরণার বিচিত্র সাহিত্য রসায়নে মানস-রসনার তৃপ্তি লেহন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আমরা আমাদের বহুবিধ ক্ষুধার—অন্নের ক্ষুধা, কামের ক্ষুধা, সমস্ত ক্ষুধার নিবৃত্তির চিত্র খুঁজছি সাহিত্যে। সাহিত্য আজ ক্ষুধার দর্পণমাত্র। এই ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষে ক্ষুধাসমস্যার কী বিচিত্র, কী নির্লজ্জ সমাধান!

২

চরিত্রবিচারে, ব্যক্তিত্ববিচারে, মানুষের দুই শ্রেণী। একশ্রেণীর চরিত্রের প্রেরণা জৈবদাবি পূরণের চেষ্টা। এরা অভাবচালিত চরিত্র। ইনস্টিংক্ট-চালিত চরিত্র। মনস্তত্ত্বের ভাষায় deficiency motivated চরিত্র। এই শ্রেণীর চরিত্রের চারিত্র নির্দিষ্ট হয় মানুষের মনের নীচুতলার প্রেরণার পরিতৃপ্তিতে, দেহগত বাঞ্ছার পরিপূর্তিতে, কিংবা আশু বিপদ নিবারণ চেষ্টার সাফল্যে। এই ছকবাঁধা বঞ্চিত (deprived) চরিত্রের লক্ষণ এই যে এদের পারসেপসান, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা দ্বারা, কামনা দ্বারা, সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন। আর, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে তাদেরই অভিজ্ঞতা ইচ্ছা বা কামনা বা সংস্কারের দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত, যারা মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ। আর, এটাও সর্ববাদীসম্মত যে ইচ্ছা বা কামনা বা সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন অভিজ্ঞতা সত্তাকে (reality) স্পর্শ করে না।

এই ধরনের চরিত্র ভোগের চেষ্টায় সতত ভ্রাম্যমাণ। অপূর্ণ কামনার চাপের উপশম খুঁজতে ব্যস্ত। এরা ভোগের পথ থেকে বাধা অপসারণে সদা সচেষ্ট, আর ভোগের পরিপূর্তি হলেই পরিশ্রান্ত, তৃপ্ত, নিদ্রামগ্ন, নির্বাপিত জ্ঞান। এদের জ্ঞান জৈবজীবন যাপনেই সম্পূর্ণ ব্যয়িত। জ্ঞানের কোন অংশই উপচিত হয়ে আত্মপ্রকাশের কাজে লাগে না। এদের চরমার্থ বা পরমার্থ বাঁধা এদের 'ইগো'র সঙ্গে, অহমের সঙ্গে। এদের ক্ষেত্রে অহমের বাইরে কিছু নেই। এদের ভোগচেষ্টা ব্যাহত হলেই দুঃখ। যে ফ্রাশট্রেশনের চিত্র আজ সাহিত্যে ভূরিপ্রমাণ হয়ে জমে উঠছে তা এই ব্যাহত-কামনার ক্লেশ কিংবা ফ্রাশট্রেশন।

অন্য শ্রেণীর চরিত্র সুস্থ, অবিকৃত মানবচরিত্র। সুস্থ

মানবচরিত্র শুধু পিছনে নয়, সে সম্মুখেও অবারিত। সব দিকে খোলা চরিত্র। প্রকৃতির দিকে,প্রবৃত্তির দিকে, বাসনা-কামনার দিকে, অন্য মানুষের দিকে এই সব চরিত্রেরা সম্পূর্ণ খোলা। এঁরা বাসনার আতঙ্কে মুহ্যমান নন, ইনস্টিংক্টের ভয়ে শঙ্কিত নন। এঁরা তথাকথিত অর্থে মর‍্যালও নন।

নিজের অন্তনিহিত যে স্বাতন্ত্র্য সেই স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ এদের জীবনের লক্ষ্য। নিজে যা তা-ই হওয়া। তাই বলে, তথাকথিত অর্থে মর‍্যাল হওয়া নয়।

যাকে আমরা মর‍্যালিটি বলি তা প্রধানত: অস্বীকৃতি ও অতৃপ্তি থেকে উদ্ভূত। মানুষ যদি জীবনসত্যকে, জগৎসত্যকে সহজ সরল ভাবে গ্রহণ করে তাহলে আমাদের বহু মর‍্যাল সত্য হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। প্রচলিত সমাজ, প্রচলিত-ধারণার-নিগড়ে-বাঁধা প্রকৃতির জ্ঞান, আর সেই ধারণা-আশ্রিত জগৎ ও জীবনবোধ— এদের স্থানকালের খোলসটা স্বচ্ছ হয়ে ধরা দেয় অবিকৃত মানবচরিত্রের কাছে। এই ছককাটা, সংস্কারের কাঁচি দিয়ে ছাঁটা যে জগৎ ও জীবনের ধারণা, তার আবরণ ভেদ করে অবিকৃত চরিত্রের মানুষ চিরনূতনকে, অভিনবকে, বিস্ময়কে, রহস্যকে আবিষ্কার করতে পারে। এই চরিত্র প্রকাশধর্মী চরিত্র, সুস্থ মানব-চরিত্র।

যে চরিত্র মানুষের স্পেসিজকে (species) নূতন রূপায়ণে পৌছে দিতে চায়, যে চরিত্র জীবন ও জগতের সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ নূতন নূতন সম্পর্ক স্থাপন করে, যে চরিত্র অন্তবিরোধে বহুধা বিভক্ত নয়, বিরোধকে যে আত্ম-প্রকাশের পথ বলে বেছে নেয়, সেই চরিত্র আজ অনুপস্থিত। কারণ, বাংলাসাহিত্যের অতি অল্পসংখ্যক লেখকই আজ এই চরিত্রের অধিকারী।

এ চরিত্র তথাকথিত ভাবে বোহেমিয়ান নয় কিংবা বিদ্রোহের খাতিরে বিদ্রোহী নয়। বিদ্রোহবিলাসী নয়। তাই বলে এ চরিত্র তথাকথিত কালচারের শৃঙ্খলেও বাঁধা নয়। এঁরা নিজেদের মধ্যে স্বতোৎসারিত প্রেরণার বেগে উন্মীলিত হয়ে চলেন। অনেক সময় মানসিক দিক থেকে এঁরা পরিবেশ থেকেও বিচ্ছিন্ন। এঁরা শাসিত হন নিজেদের চরিত্র দ্বারা, সমাজের নিয়মে নয়।

যে শিল্পীরা আজ শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে বিব্রত ও বিভ্রান্ত তাঁরা ভুলে গেছেন যে শিল্পীরা স্বয়ংশাসিত। তাঁরা নিজেদের চরিত্র দ্বারা চালিত, সংযত ও প্রেরিত। শিল্পীরা নিজের অন্তনিহিত প্রেরণায় চালিত বলে অনেক সময় এঁরা তথাকথিত জাতীয়তাবোধের গণ্ডীরও বাইরে। জাতীয়তাবোধ বলতে যে একটা বিশেষ স্থানকালপরিবেশ-সীমিত মানসিকতা বোঝায় এঁরা অনেক সময় তার উর্দ্ধে, মানুষের প্রতি স্বতোৎসারিত প্রেমে ও দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত।

তার কারণ, এই ধরনের চরিত্রের ভিত্তি একটা বিশেষ ভ্যালু সিস্টেম। কতকগুলি ধ্রুব ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত এঁদের মনন, চিন্তা ও আচরণ। এই ধ্রুব ধারণার যে ছক, তাও তাঁদের একান্ত নিজস্ব। তবু তাঁদের এই ভ্যালু সিস্টেমের কয়েকটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই ভ্যালু সিস্টেমের মূলে আছে দার্শনিকতা, নিজের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান ও তার প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষের স্বভাবের জটিলতা ও তার অপূর্ণতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আর সমাজ ও বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সত্য, সংস্কারহীন জ্ঞান। যে জ্ঞান ভোগচেষ্টা দ্বারা প্রভাবিত নয়। যে জ্ঞান বাসনার রঙে রাঙা নয়।

এই জ্ঞানকে মর‍্যাল বা এথিক্যাল জ্ঞান বলছি না। আসলে প্রচলিত এথিকস্ বা মর‍্যাল ভ্যালুস সাধারণ, গড় মানসিকতা থেকে সৃষ্ট। আর আমাদের যুগে গড় মানসিকতাই রুগ্ন। আসলে আজ আমরা যাকে সাধারণ বলি সেই সাধারণ রুগ্ন, প্যাথলজিক। প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে বাঁধা প্রচলিত সামাজিক ধারণার জালে জড়িত। কথা দিয়ে বাঁধা। স্লোগান দিয়ে বাঁধা। যেন কলের পুতুল। কিংবা পাভলভের পরীক্ষাধীন কোনো প্রাণী।

অবিকৃত সুস্থ মানবচরিত্র শুধু যে ভবিষ্যতের দিকে খোলা তাই নয়, তা অজ্ঞাতের দিকে, অনিশ্চিতের দিকেও খোলা। রহস্যের উপলব্ধি তার সহজাত। অবিকৃত মানবচরিত্রের একজন প্রতিভূ আইনস্টাইন বলেছেন: "The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all art and science."

বাংলাসাহিত্যে এই মিস্ট্রি আজ অনুপস্থিত। এ মিস্ট্রি, রোমাঞ্চের মিস্ট্রি নয়। এ মিস্ট্রি অজ্ঞাতের মিস্ট্রি।

এই মিস্ট্রির অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত আছে আর

এক ধরনের অনুভূতি। ফ্রয়েড যার নামকরণ করেছেন oceanic feeling। বাংলায় বলতে পারি 'পারাবারিক অনুভূতি'। এই অনুভূতিতে নিঃসীম অনাবৃত, জীবন মহদর্থে অর্থবান। এই অনুভূতিতে মানুষের অহম সাময়িক ভাবে বিলুপ্ত। নিজের বাইরে, জৈব যোগাযোগ থেকে বহুদূরে, মানুষের মন যখন কোন-কিছুতে সংহত হয় তখন যে অনুভূতির প্লাবনে সে ভেসে যায় সেই অনুভূতির সঙ্গে তুলনা হয় এই oceanic feelingএর।

সর্বজনের সঙ্গে, সর্বমানুষের সঙ্গে, একাত্মীয়তার গভীর ও প্রবল অনুভূতি এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। Alfred Adlerএর ভাষায় Gemeinschaftsgefuhl.—বহুর সঙ্গে একাত্মীয়তা।

অবিকৃত মানবচরিত্রের প্রধান লক্ষণ তার সৃজনশীলতা। এই শ্রেণীর প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে আছে বিশেষ ধরনের সৃজনশীলতা। শুধু শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়—জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের চরিত্রেরা প্রতিষ্ঠিত সেখানেই তাঁরা সৃজনশীল। সবচেয়ে বড় কথা এই সৃজনশীলতার সঙ্গে এঁদের ব্যক্তিত্ব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। নিম্নে প্রবৃত্তির স্তর থেকে উর্ধ্বে ধীস্তর পর্যন্ত। গোটা ব্যক্তিত্ব যেন একটা সুরে বাঁধা।

আর এক ধরনের সৃজনশীলতার কথা আমরা জানি। যাকে আমরা প্রতিভা নাম দিয়ে থাকি। প্রতিভার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রতিভার সৃজনশীলতার সঙ্গে প্রতিভাবানের ব্যক্তিত্বের কোন সরাসরি যোগাযোগ নেই। এই আলোচনায় আমরা প্রতিভার প্রশ্নটা বাদ দিয়েছি। আমরা অবিকৃত সৃজনশীল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছি।

যথার্থ সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব অবিকৃত ব্যক্তিত্ব।

আজ আমাদের সমাজে মানসিক দিক থেকে সুস্থ মানুষের নিদারুণ অভাব। আজ সকলে অসুস্থ। বঞ্চিত বলেই কি? বঞ্চনাকে অতিক্রম করাই সৃজনশীল মানুষের সাধনা।

জৈব অভিব্যক্তির দীর্ঘ ইতিহাস বঞ্চনা জয়ের ইতিহাস। আজ বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছে এই প্রশ্ন: আমরা আজ আমাদের ব্যাধিকে বিস্তৃত করব, না স্বাস্থ্যের চর্চা করব? মনুষ্যত্বের যে উজ্জ্বল উত্তরাধিকার আমাদের হাতে তার বিনিময়ে আমরা আজ কী অর্জন করব? বিকৃতি না প্রকাশ? বন্ধন না মুক্তি?

এ পথে বেশীদিন চলার অর্থ গোটা জাতিকে একটা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া। সে বিপর্যয় যে শুধু আত্মিক বিপর্যয়ই হবে তাই নয়, সে বিপর্যয় একদিন রাজনৈতিক বিপর্যয়ের চেহারা নিয়ে নিষ্ঠুর একনায়কত্বেরও সৃষ্টি করতে পারে। তাই সাহিত্যকে আজ সাবধান হতে হবে।

নিন্দুকের প্রতিবেদন

চার্বাক

সম্পাদক মহাশয় আমাকে একখানি নিন্দাসূচক প্রবন্ধ রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; তাঁহার পেশাদার নিন্দুকটি নাকি একমাস কালের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কারণেই 'অতিশয় অসময়ে অভাজন পরে অযাচিত অনুগ্রহ'।

অনুজ্ঞাত কর্মে প্রয়াসী হইয়া দেখিতেছি, বস্তুটি বড় সহজ নহে। নিন্দনীয় রচনা লিখিতে যদি বলিতেন তবে ততদূর কঠিন হইত মনে করি না; অন্য কোন বিষয় খুঁজিয়া না পাইলে অন্ততঃপক্ষে একখানি অটোবাইওগ্রাফি লিখিয়া পাঠাইতাম। তাহাতে নিন্দনীয় বস্তু বিলক্ষণ পাওয়া যাইত। কিন্তু পরনিন্দা করা যেমন অতীব পাপকর্ম, তেমনই আবার তাস্কর্য আদি গতানুগতিক পাপকর্মের তুলনায় ইহাতে লভ্যাংশের পরিমাণ বড়ই কম। সেজন্য পরনিন্দায় তাদৃশ উৎসাহ পাইতেছি না।

আমাদের চতুর্দিকে নিন্দার্হ বস্তুর প্রাদুর্ভাব বড় কম নহে। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পরই সংবাদপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নিশীথে শয্যাগ্রহণের সময় মশককুল ও তাহাদের রক্ষাকর্তা কলিকাতা করপোরেশন পর্যন্ত অনেকানেক বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়কে নিন্দা করিবার জন্য আমাদের রসনা তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া উঠে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি বড়জোর দৈনিকপত্রের প্যারাগ্রাফে আলোচিত হইবার যোগ্যতা রাখে; সাহিত্যপত্রের নিবন্ধ-ভুক্তির গুরুত্ব-আরোপ করিলে তাহা ইহাদের পক্ষে নিন্দাস্থলে প্রশংসা হইয়া পড়িবে।

আমার প্রিডিসেসর মহাশয়ের এ ভাবনা ছিল না। তিনি বরাবর সাহিত্যের অরণ্যে শৃগাল শিকার করিয়াছেন [দুই-একবার শৃগালচর্মাবৃত বৃদ্ধ অজ], জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি দৃক্‌পাত করেন নাই। আমিও কি তাহা হইলে সেই অরণ্যেই পদার্পণ করিব ?

বস্তুতঃ, নিন্দা-ব্যবসায়ের পক্ষে সাহিত্যের হাট বড়ই প্রশস্ত। সাহিত্যিকের মত প্রশংসালোলুপ ও নিন্দাকাতর জীব বড় একটা দেখা যায় না। দেশের মহত্তম সাহিত্যিককে প্রশংসা করিয়া তুমি চুণ্টাপ্রকাশ পত্রিকায় একটি প্যারাগ্রাফ ছাপাইয়া দাও, দেখিবে লোকপরম্পরায় তাহা একপক্ষকালের মধ্যে তাঁহার কর্ণগোচর হইবে এবং তিনি প্যারাগ্রাফটির কাটিং সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা করিবেন। নিন্দার ক্ষেত্রে এইমাত্র বিশেষ যে চুণ্টাপ্রকাশের প্রশংসা শুনিতে তাঁহার যদি দুই সপ্তাহ বিলম্ব হয়, চুণ্টাপ্রকাশের নিন্দা শুনিতে তবে বড়জোর দুইপ্রহর সময় লাগিবে। তাই বলিয়া সাহিত্যিক যে এই কথাগুলি স্বীকার করিবেন এমন নহে। সর্বদাই তিনি এমন ভান করিবেন যেন ওইসকল নিন্দা-প্রশংসা তিনি জ্ঞাত হন নাই এবং উহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র কৌতূহলও নাই। নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন সর্বদা এইরূপ ভান করিতে হয় বলিয়াই বেচারী সাহিত্যিক নিন্দা-প্রশংসায় এত কাতর।

সমাজে যদি সাহিত্যিকের সম্পূর্ণ বিপরীত কোন জীব থাকেন তবে তিনি রাজনীতিবিদ। বিস্মৃতনামা এক রসিক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, বুদ্ধিবৃত্তিসঞ্জাত বক্তব্যকে যিনি হৃদয়াবেগসঞ্জাত উক্তি বলিয়া চালাইতে পারেন তিনিই সাহিত্যিক; আর হৃদয়াবেগের বক্তব্যকে যিনি যুক্তিসিদ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি বলিয়া জাহির করেন তিনি হইতেছেন রাজনীতিবিদ। কথাটি বহুলাংশে সত্য।

সমালোচনার ক্ষেত্রেও সাহিত্যিক ও পলিটিশিয়ানের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হইবে বলাই বাহুল্য। সমালোচনায় আমার কিছুই আসিয়া যায় না, এই কথা মুখে বলিয়া সাহিত্যিক প্রকৃতপক্ষে সমালোচনার প্রত্যেকটি কমা-সেমিকোলন পর্যন্ত অনুধাবন করেন, না করিয়া পারেন না। বিপরীতপক্ষে, সমালোচনাগুলি আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করিতেছি, এই কথা মুখে বলিয়া রাজনীতিবিদ আসলে সমালোচনার আক্ষরে পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করেন না।

একটি বিষয়ে অবশ্য এই দুই বিপরীত জাতির অত্যন্ত মিল। বুদ্ধি, আবেগ, অভিজ্ঞতা, কুসংস্কার, দম্ভ কিংবা

প্রেজুডিস—যাহা দ্বারাই হউক না কেন, শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ উভয়েই স্থির-সিদ্ধান্ত হন যে তিনি ঠিকই করিয়াছিলেন ; ঈর্ষাকাতর সমালোচক আগাগোড়া ভ্রান্ত।

তাহাই যদি হয় তবে সাহিত্যের পরিবর্তে আমি পলিটিক্সের আসরেই নিন্দার মেগাফোন লইয়া নামিয়া যাই না কেন? দুই ক্ষেত্রেই ফলশ্রুতি যখন শূন্য তখন অন্ততঃ পাঠককে স্বাদ-পরিবর্তনের আনন্দ দিতে দোষ কী?

নিন্দাকর্মে আমার প্রিডিসেসর কী ভাবিয়াছিলেন জানি না, হয়তো দুই-একটি মূঢ় মুহূর্তে তিনি আশা করিয়া থাকিবেন তাঁহার সমালোচনায় কোনও সাহিত্যিকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে সে রকমের কোন দুরাশা করিবার বাতুলতা আমার নাই। সমালোচনা দ্বারা ইঁহাদের ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরাইয়া আনা এবং সাবান দ্বারা কয়লাকে ধবল করা—উভয় প্রচেষ্টা একই প্রকার পণ্ডশ্রম। আর্টের জন্যই আর্ট যেমন এককালে বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির আদর্শ ছিল, পরবর্তীকালে যেমন স্নার্টের জন্যই স্নার্টের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তেমনই আমার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সমালোচনার জন্যই সমালোচনা। সাদা বাংলায়, নিন্দা ফর নিন্দাস্ সেক। [কাপড়ের মত বাংলাকে সাদা করিতে হইলে আজকাল একটু ইংরেজীর নীল রঙ মিশাইতে হয়।]

কিন্তু সম্পাদক তাহাতেও বাদ সাধিলেন।

রাজনীতির বিষয় লইয়া নিন্দুকের প্রতিবেদন রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি শুনিয়া তিনি অননুমোদনের ভ্রূকুঞ্চনে আমাকে নিরাশ করিলেন। বলিলেন, প্রাসঙ্গিকতার সাময়িক প্রয়োজন ভিন্ন তাঁহার পত্রিকাকে তিনি রাজনৈতিক পয়ঃপ্রণালীর স্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে চাহেন। বিশেষতঃ তাঁহার সভানিন্দুককে তিনি বরঞ্চ কোকেনের ব্যবসায়ে নামিতে দিবেন, রাজনীতির ব্যবসায়ে কদাপি নহে! প্রতিবেদন লিখিবার বাসনা থাকিলে আমাকে নাকি সাহিত্যের চৌহদ্দির মধ্যেই নর্তন-কুর্দন করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইল সাহিত্য কী? সাহিত্যের অর্ণবপোত সম্পর্কে আমি যে আসলে আর্দ্রকের সওদাগর, সেই গূঢ় কথা প্রকাশ না করিয়া সম্পাদককে আমি গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলাম, সাহিত্য কী? জানিতাম এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন কর্ম। তখন সম্পাদক বিস্তর বাগাড়ম্বর করিয়া অনেক কিছু বলিয়া গেলেন, আমি কিছুই শুনিলাম না। [ইহা হইতে বুঝা যাইবে, আমি সাহিত্য এবং রাজনীতি দুইটি বিষয়ের কোনটিতেই দক্ষ নহি ; সাহিত্যে কুশলী হইলে আমি শুনিয়া যাইতাম কিন্তু বুঝিতাম না; রাজনীতিতে দক্ষ হইলে আমি তাঁহাকে বলিতেই দিতাম না, নিজেই গলাবাজি করিতে থাকিতাম।] শুনিলাম না, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম [ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে আমি সমালোচক-জাতীয় জীব: ইঁহারা কিছুই শুনেন না, কিছুই পড়েন না, কিন্তু সকলই বুঝেন, সকলই জানেন]—বুঝিতে পারিলাম যে সাহিত্য অর্থ হইতেছে কাগজের উপর মুদ্রাযন্ত্রযোগে ছাপাইয়া যাহা লিখা হয়। এইজন্যই সাহিত্য নানাপ্রকারের। যদি বাজারে পঁচিশ প্রকার কাগজ পাওয়া যায় এবং মুদ্রাযন্ত্রের প্রকার-ভেদে যদি দশ প্রকারের ছাপা সম্ভব হয় তবে দুই শত পঞ্চাশ প্রকার সাহিত্য সম্ভবে। ইহা গণিতশাস্ত্রের সত্য, পাঠক নিঃসন্দেহে মানিয়া লইতে পারেন।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে সাহিত্য কী। যাহা ছাপা হইল তাহাই সাহিত্য, যাহা ছাপা হইল না তাহা সাহিত্য নহে।

কাগজ এবং মুদ্রাযন্ত্র যেহেতু সাহিত্যের উপাদান, সেই কারণে সাহিত্যের উদ্দেশ্যও মুদ্রা এবং কাগজ; সাধারণ কাগজ নহে, মুদ্রায়িত কাগজ। নাসিক নগরীর মুদ্রাযন্ত্রে যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মুদ্রিত হইতেছে—সম্প্রতি সকল সাহিত্য ও সকল সাহিত্যিকের দৃষ্টি সেইদিকে নিবদ্ধ। সকল প্রকার সাহিত্যের মধ্যে সেই সাহিত্য অনন্য; তাহার আবেদন বিশ্বজনীন ; দরিদ্রের কুটির হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান আদর ; কারেন্সী নোট নামধেয় সেই সাহিত্য আমাদের সকলের হৃদয়কে—এবং হৃদয় হইতেও যাহা বড় সেই পকেটকে—যেরূপ উদ্বেজিত করে সেরূপ করা আর কোনও সাহিত্যের কর্ম নহে।

যখন বুঝিলাম সাহিত্য-বিষয় লইয়াই আমাকে

প্রতিবেদন লিখিতে হইবে, তখন এই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকেই আমার প্রথম স্মরণ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, সাম্প্রতিক প্রকাশনের সাহিত্য লইয়া আলোচনা করাই এই বিভাগটির দস্তুর। পুরাতন সাহিত্য-কর্মের নবতন সংস্করণকে সাম্প্রতিক সাহিত্য বলা চলিলে কারেন্সী নোট অনায়াসেই আমার প্রতিবেদনের বিষয় হইতে পারিত। বস্তুতঃ সংস্করণের সংখ্যা দৃষ্টেও কারেন্সী নোটের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কেবল নূতন সংস্করণ হইলেই নাকি নূতন সাহিত্য হয় না (সেই সঙ্গে টাইটেল পরিবর্তিত করিলে অবশ্য আলাদা কথা)—সেইজন্য কারেন্সী নোট সাহিত্য হইলেও প্রতিবেদ্য সাহিত্য নহে।

অবশেষে অনেক ভাবিতে ভাবিতে যখন আমার দেহ শীর্ণ, চক্ষু কোটরাগত, নিদ্রা অবলুপ্ত তখন একদা দৈববাণীর মত শুনিতে পাইলাম—বাজেট।

পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, কাফে-রেস্তোরাঁয়, বড়বাজারে-ছোটবাজারে, বৈঠকখানায়-রান্নাঘরে, অফিসে-আদালতে সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিলাম—বাজেট। বাজেট বস্তুটি কী তাহা আমি পূর্বে জানিতাম না, কিন্তু অবস্থাগতিকে বুঝিতে দেরি হইল না যে বাজেট একপ্রকার সাহিত্য না হইয়া যায় না। সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর জন্য সাহিত্যগতপ্রাণ বঙ্গদেশ এমন উত্তেজিত-আলোড়িত হইতে পারে না, এ বিষয়ে আমার বড় একটা সন্দেহ ছিল না। তথাপি সন্দেহ-নিরসনের জন্য এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে [তিনি শেয়ার বাজারে দালালী করিয়া থাকেন] জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, বাজেট কি সাহিত্য?

ভদ্রলোক সম্ভবত আমা অপেক্ষাও কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, মুখভঙ্গি করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, সাহিত্যের সপিণ্ডীকরণ হউক, ইণ্ডিয়ান আইরণের মূল্য শেয়ার প্রতি দুই টাকা পঁচাশি নয়া পয়সা পড়িয়া গিয়াছে, বিড়লা জুট পাঁচ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

সন্দেহ দূরীভূত হইল যে বাজেট সাহিত্য না হইয়া যায় না; এবং নূতন সাহিত্য। আধুনিক সাহিত্য ভিন্ন আর কিসের সংঘর্ষে মূল্যমানের এরূপ অধঃপাতন সম্ভব? অধুনা-যুগের বৃহৎ সাহিত্যের বিশেষত্বই তো এই যে তাহা দ্বারা জীবনের শ্রেয়সগুলির মূল্য হ্রাস পায় এমন কি লোপ পায়। দুই পঁচাশ এবং পাঁচ পঁচাত্তর শুনিয়া আন্দাজ করিলাম বাজেট বড় সহজ সাহিত্য নহে।

শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবেই শুনিতে পাইলাম, বাজেট সাহিত্য বটে। কাগজের উপর মুদ্রাযন্ত্রযোগে ছাপাইয়া বাজেটের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভলুম তৈয়ারী হয়। অতএব বাজেট অবশ্যই সাহিত্য।

অতি বৃহৎ এই বাজেট-গ্রন্থের রচয়িতার নাম শ্রীযুক্ত মোরারজী দেশাই। শুনিলাম তিনি মদ্যাদি স্পর্শ করেন না, ঘোরতর প্রহিবিশন-পন্থী, এমন কি তাম্রকূটের ধূমপানেও তাঁহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই। কোনপ্রকারের মাদকদ্রব্যের সাহায্য-ব্যতিরেকে এইরূপ স্বল্পকালের মধ্যে অতিবৃহৎ এই সাহিত্য-সৃষ্টি কী করিয়া তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইল ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাহার পর শুনিলাম শ্রীযুক্ত দেশাই ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী [বর্তমান প্রবন্ধটি যে গতানুগতিক পন্থায় লিখিত হয় নাই, ইহা রচনার জন্য প্রবন্ধকারকে যে প্রভূত জ্ঞানাহরণে ব্রতী হইতে হইয়াছে, পাঠক তাহা লক্ষ করিতেছেন তো?] এবং একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা। তখন আমার বিস্ময় দূরীভূত হইল। সাধারণ মাদকগুলির প্রতি বিরূপ হইলেও শ্রীযুক্ত দেশাই যখন রাজনীতিতে অনুরাগী, তখন তাঁহার পক্ষে বৃহৎ সাহিত্য রচনা কঠিন হইবে কেন? রাজনীতির উপর আবগারী শুল্ক বসানো হয় নাই বলিয়াই তো কিছু আর তাহার জৌলুস কমিয়া যায় না।

রাজনীতিবিদের দ্বারা বিরচিত সাহিত্য বলিয়া বাজেট আমাদের বিশেষরূপে অনুধাবনের দাবি রাখে। রাজনীতির উচ্চাভিলাষ ও সাহিত্যের কল্পনাশক্তি এই দুই তেজী ঘোড়ার জুড়িগাড়িতে উঠিয়া দেশাই মহাশয়ের বাজেট এমন লম্বা দৌড় মারিয়াছে যাহার পাল্লা শুনিলে অবাক হইতে হয়।

বাজেটের মূলধন খাতে ব্যয়ের হিসাব বাদ দিয়াও কেবল রাজস্বখাতে বাজেটে মোট ১৮৫২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। একমাত্র পেনিসিলিন ইন্‌জেকশন লইবার সময় ভিন্ন অন্য কখনও লক্ষ শব্দটির আমরা তেমন একটা ব্যবহার করি নাই, কোটি নামক এককটির তো একমাত্র ব্যবহার দেবতাদের আদমসুমারির ক্ষেত্রে। সেইজন্য ১৮৫২ কোটি টাকা বলিতে যে কী বুঝাইতেছে

প্রথমে তাহা মাথায় ঢুকিতে চাহে নাই। পরে হিসাব করিয়া দেখিলাম, যদি বাজেটের মোট রাজস্বখাতের টাকাগুলি আমার হাতে থাকিত আর আমি যদি সেই টাকার আনন্দে প্রতিদিন একবার করিয়া ট্যাক্সি চাপিয়া সোজা চাঁদের দেশ পর্যন্ত ট্রিপ মারিতাম, তাহা হইলে প্রতিদিন মাইল প্রতি পঞ্চাশ নয়া পয়সা ট্যাক্সির মীটার মিটাইয়া দিয়া চাঁদ পর্যন্ত যাওয়া এবং ফিরিয়া আসা অনায়াসে চালাইয়া যাইতে পারিতাম। না, ভুল বলিলাম। প্রতিদিন সেই পরিমাণ খরচা করিয়াও রাজস্ব খাতের মোট টাকাটা উড়াইয়া দেওয়া আমার জীবদ্দশায় কুলাইত না; দুই শত এগার বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ পৃথিবী টু চন্দ্র অ্যাণ্ড ব্যাক ট্যাক্সি ভাড়া দিয়াও এই পরিমাণ টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় হইত না। দুই চারি নয়া পয়সা পড়িয়া থাকিত।

অন্যভাবেও চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। মনে করুন বাজেটের এই টাকাগুলি আপনি একা সঞ্চয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রতিদিন আপনি একটি করিয়া টাকা বাজেটের নামে জমা করিয়া যাইতেছেন; আমাদের দশজনের আশীর্বাদে আপনি শতায়ু হইয়া একশত বৎসর যাবৎ বারমাস ত্রিশদিন ধরিয়া সঞ্চয় চালাইয়া গেলেন। হিসাব করিয়া দেখুন বাজেটের অঙ্ক সঞ্চয় করিতে হইলে আপনাকে পাঁচ লক্ষ সাত হাজার পাঁচ শত বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

তাই বলিতেছিলাম *'লাখ টাকা লাখ টাকা দু কুড়ি দশ টাকা'* গোছের আন্দাজী নজর না করিয়া বাজেটের অঙ্কগুলি একটু তলাইয়া দেখুন, বুঝিবেন বাজেটের জুড়ি-গাড়ির দৌড় কতখানি।

কিন্তু অন্য দিক হইতে বিবেচনা করিলে বাজেটের অঙ্কটি তেমন কিছু দুরতিক্রম্য মনে হইবে না। মা ষষ্ঠীর কৃপায় ভারতবর্ষে মানুষ তো আমরা একটি-দুটি মাত্র নই, পঁয়তাল্লিশ কোটি মনুষ্যসন্তানে গিজগিজ করিতেছে আমাদের দেশ। গড়পড়তা প্রত্যেকের মাথায় তাহা হইলে বার্ষিক ব্যয়ের বোঝা মাত্র একচল্লিশ টাকা করিয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গড়পড়তা বার্ষিক আয়ের অঙ্কটি পাশাপাশি না রাখিতেছি, ততক্ষণ একচল্লিশ টাকা মাত্র বাজেট খাতে খরচা করিতে আমাদের আপত্তি হইবার কথা উঠে না।

তথাপি আপত্তিকর কথা উঠিয়া থাকে। গড় পরিমাণটি লইয়া যত না আপত্তি, গড়টির নিরাপদ দিকে নিজে থাকিয়া অপরকে গড়খাইয়ের দিকে ঠেলিবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। গড় যখন একচল্লিশ, আমি না হয় চল্লিশ দিব, তুমি বিয়াল্লিশ দিও। আমি উৎরাইয়ের দিকে থাকি, গড়ের শিখর মাঝখানে রাখিয়া তুমি একটু চড়াইয়ের চড়া সুর ভাঁজ। লাউ গড় দিয়া কুমড়া কাটিবার নিয়ম রহিয়াছে যখন, আমি লাউ হই, তুমি কুষ্মাণ্ডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হও। আমি একটু সিগারেটের ভক্ত, সিগারেটের শুল্ক না চড়াইয়া চিনির উপর চড়াইয়া দাও—ডায়াবেটিস হইয়া অবধি ওই শর্করা বস্তুটা সম্বন্ধে আমার ইণ্টারেস্ট নেই। তুমি আবার শর্করার ভক্ত, তুমি তাই চেঁচাইতে থাকিলে—না না, চিনির উপর আর শুল্ক নহে, বরঞ্চ রুজ-লিপস্টিক-পাউডার ইত্যাদি প্রসাধন দ্রব্যের উপর যত ইচ্ছা কর চাপাইয়া দাও। তোমার চতুর্দশী কন্যা অমনি ভ্রূভঙ্গি করিয়া উঠিবে [যদিও আরও কয়েক বৎসর তাহার প্রসাধনের করভার তোমারই স্কন্ধে রহিয়াছে], বলিবে—কেন, দাদা যে গাদা গাদা কফি গিলিয়া থাকে সেই কফির উপর কর চাপাইলেই তো পাউডারের দিকে শনির দৃষ্টি ফেলিতে হয় না।

কাজেই বুঝিতে পারিতেছেন, বাজেট-রচনা সহজ কর্ম নহে, প্রতিবেদন রচনার মতই দুরূহ। কেবলমাত্র উচ্চাভিলাষের অঙ্কগুলির উপর কল্পনার শূন্য স্থাপন করিয়া কোটি-অর্বুদ-খর্ব-নিখর্ব সংখ্যা রচনা করিলেই বাজেট-সাহিত্যিকের কর্তব্য শেষ হইল না, সেই সংখ্যাগুলির স্ফীতোদর বোঁচকা পঁয়তাল্লিশ কোটি অনিচ্ছুক গর্দভের পৃষ্ঠে যথাযথভাবে সংস্থাপন করাও বাজেটক মহাশয়ের কঠিন কর্তব্য।

মহিলা-পাঠ্য ঘটনাবহুল উপন্যাস মাসিকপত্রে কিস্তিবন্দীভাবে লিখিতে বসিয়া খ্রীজনপ্রিয় সাহিত্যিকের যে দশা হইয়া থাকে, বাজেটের থলি লোকসভায় উজাড় করিবার সময় অর্থমন্ত্রীর দশা অনেকাংশে তাহার অনুরূপ।

ঔপন্যাসিক সে-স্থলে আদেশ-অনুরোধ-মিনতিযোগে শুনিতে থাকেন—অমুক নায়কের সঙ্গে অমুক নায়িকার বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তিনি বড়ই অন্যায় করিয়াছেন, আগামী কিস্তিতে যেন অবশ্যই বিপ্রলব্ধা নায়িকা পুনরায় পুরাতন নায়কের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারেন; অমুক পাত্রের সঙ্গে অমুক পাত্রীর বিবাহ স্থির করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই, এমন সর্বাঙ্গসুন্দরী সুলক্ষণা পাত্রীর বিবাহ একটি চিত্রকরের সঙ্গে কখনই হইতে পারে না [কে না জানে, চিত্রকরগণ প্রায়শঃ দুশ্চরিত্র হইয়া থাকেন ?]—আগামী কিস্তিতেই যেন একটি বিবাহযোগ্য এন্‌জিনিয়র, অন্ততঃ-পক্ষে আই. এ. এস. গেজেটেড অফিসর, চরিত্রকে উপন্যাসে আমদানি করিয়া তাহার পর সুযোগসুবিধামত তাহার সঙ্গেই কন্যাটির বিবাহ দেওয়া হয়; অমুক বৃদ্ধকে এখন মরিতে দিয়া ঔপন্যাসিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটি এখনও বি. এ. পাস করে নাই—আগামী কিস্তিতে যেন বলা হয় যে মৃত্যুসংবাদটি আদৌ সত্য নহে; ইত্যাদি।

অর্থমন্ত্রী লোকসভায়, সংবাদপত্রে ও বণিকসভার অধিবেশনে যে-সকল উপদেশাদি শুনিতে থাকেন, তাহাও বহুলাংশে ওইরূপ। বণিকসভা বলিতে থাকেন সুপার-ট্যাক্স হ্রাস করিয়া পরিবর্তে লবণের উপর আবগারী শুল্ক বসানো হউক। শ্রমিকসভা বলিতে থাকে, শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সকল পণ্য হইতে শুল্ক তুলিয়া দিয়া মালিকদের স্কন্ধে শতকরা একশত টাকা হারে আয়কর চাপাইয়া দেওয়া হউক। রজকসভা বলিতে থাকে, সাবান হইতে শুল্ক তুলিয়া ক্ষুরের উপর বসাও। নাপিতসভা বলিতে থাকে, সাবান ও ক্ষুর দুই হইতেই শুল্ক সরাইয়া দাড়ির উপর ট্যাক্স ধার্য হউক। ঘৃত-বিক্রেতারা চর্বির উপর, সর্ষপতৈল বিক্রেতারা শিয়ালকাঁটা বীজের উপর, দুগ্ধ-বিক্রেতারা জলের উপর শুল্ক স্থাপনের বড়ই বিরোধী। সকলেই হৈ-হৈ করিয়া অপরের পাতে ট্যাক্সের দধি দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে।

এবং অভিজ্ঞ ঔপন্যাসিকের মতই অর্থমন্ত্রীও যাহা করিবার তাহাই করিয়া যাইতেছেন। যাহার সহিত যাহার বিবাহ হইবার তাহা ঠিকই হইতেছে, যাহার সহিত যাহার বিরহ এবং মিলন হইবার কথা তাহাতে কোন প্রকার বাধা বিপত্তি মানা হইতেছে না, যাহার মৃত্যু ঘটিবার ছিল তাহার নিতান্তই মৃত্যু হইতেছে।

বিবাহ এবং প্রেমের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি দিবার আবশ্যক দেখি না, শুধু মাত্র যাঁহার মৃত্যু হইল তাঁহার নাম নীরবে উল্লেখ করিয়া রাখিতেছি। শ্রীসুনীল কর্মকার, একটি চব্বিশ ক্যারেট পরিমাণ প্রাণ, মৃত্যু—কলিকাতা, ১০ই মার্চ ১৯৬৩।

এইখানে প্রতিবেদনটি শেষ করিয়া দিলে ভাল হইত। কিন্তু যে-কথাগুলি প্রথমে বলা উচিত ছিল তাহা বলা হয় নাই।

বাজেট-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা করা উচিত ছিল, এটির প্রকাশের তারিখ, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ তারিখে লোকসভা-কক্ষে প্রথম এই সাহিত্যটি পাঠ হইয়া থাকে। এই নির্দিষ্ট তারিখটির অবশ্যই গূঢ় কোন তাৎপর্য রহিয়াছে।

মাসকাবারী মাহিনার নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উপর নির্ভর করিয়া যাহাদের অনির্দিষ্ট মূল্যমানের বাজারে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়, তাহাদের বসন্তকাল ফাল্গুনে নহে, ফেব্রুয়ারি মাসে আসিয়া থাকে। এই একটি বিবেচক মাস যখন সংসারখরচের মীটারে প্রায় সকল খাতেই ব্যয়ের মাত্রা একটু হ্রাস পাইবার ভরসা থাকে। ত্রিশ নয়, একত্রিশ নয়, মাত্র আটাশ দিন অর্ধাশনে কাটাইলেই যে-মাসের যন্ত্রণা সমাপ্ত হয়, মাসকাবারী প্রাণীর বসন্তকাল ফেব্রুয়ারি সেই নিপাতনে সিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাস।

এবং সেই জন্যই বোধ হয় গোলাপের পিছনে কণ্টকের মত, স্ফূর্তির পিছনে কাবুলীর মত এবং শ্যালিকার পিছনে ভায়রার মত, ফেব্রুয়ারির পিছনে যাহাকে আনা হয় তিনি কণ্টকের অপেক্ষা মর্মভেদী, কাবুলীর অপেক্ষা নিষ্ঠুর এবং ভায়রার অপেক্ষা বেরসিক। তাহারই নাম শ্রীযুক্ত বাজেট।

মাস দেড়েক আগেই অবশ্য প্রধানমন্ত্রী আমাদের চেতাবনী শুনাইয়া রাখিয়াছিলেন, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বক্তৃতায় যখন বলিয়াছিলেন : "Taxation would hurt and indeed should hurt !" শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম ট্যাক্সপ্রস্তাব আমাদের অধম করিয়াই

ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন পাঠে যাহা মনে হয় মূল গ্রন্থটি পাঠে যদি তাহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময় না পাওয়া যাইবে তবে প্রকাশকের কৃতিত্ব কোথায়? সেই জন্য বাজেট-সাহিত্য প্রকাশের পর দেখিলাম, প্রথম পর্যন্ত করিয়াই শ্রীযুক্ত দেশাই আমাদের রেহাই দিবেন কি না বলা যায় না, সম্ভবত দুই-চারি জনকে খতম না করিয়া ছাড়িবেন না।

তাহাতেও দুঃখ করি না। সিগারেটের মূল্য শতকরা পঁচিশ ভাগ বাড়িলে কী হইবে, গাঁজার দাম এখনও চড়ে নাই [কলিকাতা বিধানসভায় শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর যাহাই করুন, গঞ্জিকার উপর আবগারী শুল্ক বাড়াইবেন না—সকল সাহিত্যিকের পক্ষ হইতে এই নিবেদন]; কেরোসিনের দাম টাকায় ছয় আনার উপর বাড়িয়াছে তাহাতেও আপত্তি নাই, শুনিতেছি রেড়ীর তৈলের শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে; আয়করের বারো হাত কাঁকুড়ের মধ্যে সারচার্জের তেরো হাত বীজ জন্মিয়াছে তাহাতেও ভাল বই মন্দ হয় নাই—কেন না, জীবনে এই প্রথম বাধ্যতামূলক আইনের প্যাঁচে পড়িয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চয় হইবে [সেই সঙ্গে ঋণও হইবে অবশ্য]; বাসের ও ট্যাক্সির ভাড়া বাড়িবে তাহাতেও আমার বিশেষ কিছু আসে-যায় না কারণ ভিড়ের চাপে বাসের টিকিট মাসের মধ্যে কুড়ি দিনই কাটিতে হয় না এবং অপরের পয়সা ভিন্ন ট্যাক্সিতে উঠিবার মত সম্বল নাই; মোট কথা নিন্দা করিবার সঙ্কল্প করিয়া লিখিতে বসিলেও মোরারজী দেশাই মহাশয়ের বাজেটে আমি নিন্দনীয় কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না। কেবল মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট আমার কয়েকটি প্রস্তাব করিবার রহিয়াছে। তাহা কর মকুবের নহে, বরঞ্চ কর-ধার্য করিবার প্রস্তাব। সেইজন্য আশা করি, মন্ত্রীমহোদয় আমার প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিবেন। প্রস্তাব কয়টি এই:

(১) সিনেমা মাসিকপত্রে চিত্রতারকাদের ছবি ছাপাইবার উপর চড়া হারে কর ধার্য হউক। পুরুষ তারকার জন্য প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে দশ নয়া পয়সা, মহিলার জন্য পঁচিশ নয়া পয়সা এবং স্ত্রীপুরুষের জড়াজড়ি চিত্রের জন্য প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পঞ্চাশ নয়া পয়সা কর বসানো যাইতে পারে। কভারের জন্য শতকরা পঞ্চাশ টাকা সারচার্জ।

(২) পূজাসংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ উপন্যাস যদি নিরপেক্ষ বিচারে সত্যই উপন্যাস বলিয়া বিবেচিত না হয় তবে তাহার উপর প্রতি কপিতে দুই টাকা করিয়া কর বসানো হউক। নীহাররঞ্জন গুপ্ত, অবধূত, জরাসন্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি কয়েকজনার লেখা হইলে শতকরা পঞ্চাশ টাকা সারচার্জ।

(৩) চিত্রতারকার আত্মজীবনী (যাহা প্রেত্যাক রীতিতে অপরের লেখনীপ্রসূত), সাহিত্যিকের লেখা রাজনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ, পলিটিক্যাল লীডারদের সাহিত্য সম্পর্কিত লেকচার, এবং রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ-কবিতা-রম্যরচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে প্রত্যেকটির উপর প্রতি শব্দে দুই নয়া পয়সা হারে ট্যাক্স বসানো হউক। প্রত্যেকটি বানান ভুলের জন্য এক নয়া পয়সা করিয়া সারচার্জ।

(৪) 'মডার্ন' সাহিত্য—অর্থাৎ যাহা কবিতা হইলে প্রবন্ধের মত দেখাইবে, প্রবন্ধ হইলে অশোকের শিলা-লিপির মত, গল্প হইলে বীজগণিতের মত এবং উপন্যাস হইলে ধাপার প্রান্তরের মত দেখাইবে—ইহাদের উপর পৃষ্ঠা প্রতি পঞ্চাশ নয়া পয়সা হইতে দুই টাকা পর্যন্ত বিবিধহারে ট্যাক্স চাপানো হউক। 'প্রগ্রেসিভ' হইলে—অর্থাৎ কফিহাউসে আলোচিত হইলে—শতকরা পঞ্চাশ টাকা সারচার্জ।

এই চারিটি প্রস্তাব অর্থমন্ত্রী গ্রহণ করিলে অতঃপর আরও চারিশত অনুরূপ প্রস্তাব আমি তাঁহার সমীপে একান্তভাবে প্রেরণ করিব। আশঙ্কা হইতেছে সেই প্রস্তাবের কতকগুলি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয়েরও মনঃপূত হইবে না; সেই কারণে প্রকাশ্যে আলোচনা হইতে বিরত থাকিতেছি।

অনুমান করিয়া দেখিয়াছি উপরি-উক্ত চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইলে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ হইতেই বৎসরে অন্যূন দশ লক্ষ হইতে তিন কোটি টাকা কর আদায় হইবে। [অনুমানের হ্রস্ব-দীর্ঘের পার্থক্য দেখিয়া হাসিবেন না; বাজেটের বহু খাতেরই আয়-ব্যয়ে প্রাথমিক প্রাক্কলন ও চূড়ান্ত হিসাবের মধ্যে তারতম্য অনুরূপ পরিমাণে হইয়া থাকে।]

আর যদি এই সকল প্রস্তাবের একটিও গ্রহণযোগ্য মনে না হয় তবে অন্ততঃ বারো বৎসরের ন্যূন ও বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাহিত্যচর্চার উপর দৈনিক একশত টাকা করিয়া আবগারী শুল্ক যেন অর্থমন্ত্রী অবশ্য অবশ্য বসাইয়া দেন। এবং এই উদ্দেশ্যে বয়স মাপিবার জন্য যেন ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের উপর ভরসা না রাখিয়া অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক দ্বারা মানসিক বয়সের পরিমাপ করেন। বোদলেয়র বলিয়াছিলেন, লোকে বলে আমার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র: কিন্তু আমি যদি প্রতিটি দিন তিন দিনের জীবন যাপন করিয়া থাকি তবে কি আমার বয়স নবতি বর্ষ নহে?

আমাদের বহু সাহিত্যিকের বয়সই—অঙ্ক অর্থে—দ্বাদশ বর্ষের নিম্নে অথবা দ্বিসপ্ততির ঊর্ধ্বে।

সংবাদ-সাহিত্য

ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ

ভারতবর্ষের প্রথম ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম বিচক্ষণ নায়ক, জ্ঞানী ও গুণী ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের পরলোকগমনে ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্র সনাতন ব্যক্তিশূন্য হইয়া পড়িল। এ. ডিভিশনের বয়োবৃদ্ধ জওহরলালকে কোনমতেই সনাতন বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাঁহার মত পরিবর্তনশীল যুগধর্মে আস্থাবান এবং নিত্যপ্রগতিবাদী আর দ্বিতীয় নাই। আর এক অতি বৃদ্ধ অর্থাৎ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বহুরূপী সম্প্রদায়ে নাম লিখাইয়া অনেক আগেই দল হইতে কাটিয়া পড়িয়াছেন। সেই হিসাবে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকে জীবিত শেষ সনাতনপন্থী বলা হইত। তিনি পরলোকগমন করায় একটা ধারার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিল।

ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের জীবনে কর্ম, জ্ঞান, সৌজন্য ও আদর্শের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়াছিল। আচারে ব্যবহারে শান্তির প্রতিমূর্তি অজাতশত্রু আমাদের এই রাষ্ট্রনায়কের জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর। বুদ্ধিতে, বিচক্ষণতায়, পরামর্শে, উপদেশে ভারতবর্ষের রাজনীতি তাঁহার দ্বারা বহুভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপরিচালনার গুরুদায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণের পর পরিণত বয়সে এই নিষ্ঠাবান সৎ দেশসেবীর মৃত্যু হইল। সম্প্রতি সক্রিয় রাজনীতির বাহিরে থাকিলেও একজন নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতারূপে তাঁহার অস্তিত্ব আমাদের মনে সর্বদা যে সাহসের সঞ্চার করিত এই দুর্দিনে তাহার অভাবে আমরা অনেকটা হীনবল হইয়া পড়িলাম।

গোপালভাঁড়ের পত্র

"ভায়া হে, সর্বাগ্রে দাদাঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন করিয়া এই পত্রের সূচনা করিতেছি। হিমালয় বরাবর চীন আবার সৈন্য সংস্থাপন করিতেছে সুতরাং তোমাদের এখন দাদাঠাকুরই ভরসা। প্রখর গ্রীষ্মে হিমালয়ের কোলে গিয়া মৌজ করার দফা প্রায় গয়া হইয়া গেল। এই গরমে কাঞ্চনজঙ্ঘার শীতল সান্নিধ্যের জন্য তোমাদের মন আকুলিবিকুলি করিতেছে তাহা অনুমান করিতেছি, উন্নত কাঞ্চনজঙ্ঘার অলক্ষ্য মধুর আহ্বান প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে কানের ভিতর দিয়া মর্মের মধ্যে গুঞ্জরিত হইতেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু চিত্ত সংযমে রাখিয়া সবুর কর, এত শীঘ্র কাছাকাছি গেলে বিপদ আছে। ভয় নাই, সহস্র নিষ্পেষণেও তোমার কাঞ্চনজঙ্ঘা চিরদিনই উন্নত থাকিবে। তা ছাড়া তোমাদের এখন মোরারজী দেশাইয়ের করকবলিত আমলকবৎ অবস্থা। চরম বিপদের মুখে কবি কালিদাস ভবান্ যত্র করপ্রদঃ বলিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন সেকথা আশা করি স্মরণ আছে। তোমাদের যে তাহাতেও নিস্তার নাই। অপ্রেশনের ঠেলায় তোমাদের দেখিতেছি প্রাণান্ত হইবার উপক্রম।

ভায়া হে, কর এবং অপ্রেশনের কথায় কলিকাতা করপ্রেশন (করপোরেশন)-এর নাম স্মরণ হইতেছে। সেখানে কমিশনার-কাউনসিলার বিরোধ ক্রমশঃই যে আকারে সাংঘাতিক রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে তাহা ভারতবর্ষ ও চীনকেও লজ্জা দেয়। কিন্তু এই রন্ধ্রপথে শেতলা এবং ওলাবিবির আসর বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে। দেবাসুর সংগ্রামের কাহিনী অনেক দূর তো গড়াইল। কিন্তু মল্লিনাথ নাই, কে টীকার বন্দোবস্ত করিবে? টিকার অভাবে অর্ধেক শহর ছারেখারে যাইতে বসিল। দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ চতুর্গুণ হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের তো সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়া ছাড়া উপায় দেখি না।

কিন্তু সন্ন্যাসীদের দশা লক্ষ্য করিয়াছ কী? কয়েক দিন পূর্বে তোমাদের আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি মারাত্মক রসিকতা করা হইয়াছে, তাহাতেও সন্ন্যাসীরা জড়িত। বোধ হয় কেবল চেম্বার অফ কমার্স বা ওই

জাতীয় কোনও বণিক সম্মেলনের ছবি ছাপিয়া নরেন্দ্রপুরে বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকীর ক্যাপশন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ কি অন্যায় কথা! পাঁচজন নধরকান্তি পাশ্চাত্ত্য পোশাক পরিহিত ব্যক্তি চেয়ারে আসীন—তাঁহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্পীচ দিতেছেন। সামনে টেবিলের উপরে রক্ষিত পেয়ালা-পিরিচ-গ্লাস—সবই জলের মত পরিষ্কার! আনন্দবাজারের বার্তা-কু-সম্পাদকের এই ধরনের তরল ইয়ারকির গন্ধ আমাদের নিকট অতিশয় উৎকট ঠেকিয়াছে।

ভায়া হে, এই জগৎ মায়াময়। এখানে ভালমানুষীর কোনও দাম নাই, বলিবে ভিটামিন ডিফিসিয়েন্সী হইয়াছে; ভালবাসার কোনও প্রতিদান নাই, বলিবে কোনও গ্ল্যাণ্ডের অতিরিক্ত হর্মোন ক্ষরিত হইতেছে; ভাল-লাগার কোনও অর্থ নাই, বলিবে নির্ঘাত রেটিনার সেটিংয়ে কোনও গোলযোগ আছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মাথায় করিয়া নাচিতেছ অথচ রামকৃষ্ণ ডালমিয়াকে জেলে পাঠাইতেছ, স্বামী বিবেকানন্দের জন্য সারা দেশ পাগল অথচ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লাঞ্ছনার শেষ নাই। তোমাদের কুকর্মের তালিকা দিবার চেষ্টা করিব না। শিল্পীর স্বাধীনতার জন্য পাগল হইয়াছ—স্বাধীন সাহিত্য-সমাজ গঠন করিয়া সমাজপতিরা চিল্লাইতে শুরু করিয়াছে, মাঠে-ময়দানে ম্যারাপ বাঁধিয়া খোলকরতাল সহযোগে ভক্তেরা সঙ্গত করিয়া চলিয়াছে। প্রতিরক্ষা প্রতিরোধ কি এইভাবেই করিতে হয়? সে সব ভোজবাজীর মত শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। এখন সাহিত্যিকেরা পলিটিক্সে মাতিয়াছে। কেবল একটা মূল্যবান কথা স্মরণে রাখিও, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই। —ইতি গোপালদা।"

সাহিত্যে ভূগোল

গত সংখ্যার সংবাদ-সাহিত্যে প্রকাশিত 'নর ও বানরে'র জের টানিয়া আরও কিছু বলা প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি বানর অথবা অনুরূপ কোনও ইতর প্রাণী বাস করে। যেমন ব্যক্তির মধ্যে তেমনই সমবেতভাবে সমাজের মধ্যেও বানর বাস করে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও যখন কলিকাতায় বাবু কালচারের কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল তখনও বেশ্যালয়-গমন অথবা মদ্যপান বিশেষ গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত না। বাবুরা প্রয়োজনে এবং সান্ধ্য অথবা নৈশ মজলিস জমাইবার জন্য স্ত্রীলোক অথবা শরাবের সাহায্য লইতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। লুকাচুরির প্রয়োজন ছিল না। উপপত্নী রক্ষা করা বিশেষ সম্মানের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার পর যুগের হাওয়া বদলাইয়াছে। নয়া সভ্যতার প্রবল ধাক্কায় পুরাতন সব আবার ভাসিয়া গেল। গণিকালয়ে যাওয়া অথবা মদ্যপান আর প্রকাশ্যে করা চলে না। সন্ধ্যার অন্ধকারে খরিদ্দারের দল বেশ্যাপল্লীতে এবং শুঁড়িখানায় গা ঢাকা দিয়া ঢুকিতে লাগিল। আধুনিক কায়দা আবার অনেকটা উন্নত—দৈহিক লেন-দেনের জন্য বড় বড় হোটেল ও 'এমটি হাউস' এবং তরল আগুনের জন্য 'বার'-এর সৃষ্টি হইল। এই বিবর্তনের ধারা ধরিয়া আমাদের সমাজ চলিয়াছে।

সামাজিক ও আর্থিক নানা অসুবিধার জন্য যাঁহারা উপরোক্ত দুইটি আনন্দ হইতে নিজেদের বঞ্চিত রাখিতে বাধ্য হইতেছেন তাঁহারা যে অবৈধ উপায়ে আত্মতৃপ্তির পথ খুঁজিবেন তাহাতে বিচিত্র কী! এই অবৈধ পন্থাগুলির মধ্যে সিনেমা-পত্রিকার রূপ লইয়া একটি বিকৃত প্রণালী তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য আবির্ভূত হইয়াছে। ছেলে বুড়া যুবক যুবতী বৃদ্ধা তরুণী সকলেই এই পর্দার আড়ালে মুখ লুকাইয়া আত্মরতিতে মাতিয়াছেন।

লজ্জার কথা, আমাদেরও এই পাপের ভাগী হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি এইরূপ একটি কোকশাস্ত্র মার্কা সিনেমা পত্রিকা হাতে আসায় একটু চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ ঘটিয়াছে। পত্রিকাটির জন্ম খুব বেশীদিন হয় নাই। মলাটে যে ছবিখানি দেখিতেছি তাহাতে বিদ্যাসুন্দরের বিপরীত বিহার স্মরণে আসিতেছে। মলাট উলটাইবার পর একেবারে নারীর হিপস্ অর্থাৎ নিতম্ব দিয়া ঘরোয়া কথার শুরু। বোম্বাইয়ের এক অভিনেত্রীর

রতত্ব সম্পর্কিত গভীর এবং সরস তথ্যপূর্ণ আলোচনা। াহার পর বাংলাদেশের এক সর্বস্নেহধন্যা অভিনেত্রীর াত্মজীবনীর মধ্যে একটি বিশেষ আবেদনপূর্ণ ছবি—শারীরিক ভূগোলসমেত"। এই ধরনের নোংরা এবং দর্য অশ্লীল পত্রিকা আমরা ইতিপূর্বে দেখি নাই। ানুষের দ্বিতীয় সত্তা অর্থাৎ বানরসত্তাকে নাচাইতে এই াব পত্রিকার আর জুড়ি নাই তাহা স্বীকার করিতেছি। হারা পুলিসী আইনের আওতায় আসে না, অথবা রকারকে নিতম্ব প্রদর্শন করিয়াই শুধু ক্ষান্ত নহে, তরজনোচিত শব্দ এবং ছবিতে এই পত্রিকাখানির সর্বাঙ্গ াচ্ছাদিত। শারীরিক ভূগোল দেখিয়া আমরাও আশান্বিত বোধ করিতেছি। সুতরাং ভূগোল বই লইয়া বসিলাম। তাহাতে শারীরিক ভূগোলের সঙ্গে মিলিতে পারে এইরূপ কিছুই পাওয়া গেল না। তবু যাহা পাইলাম তাহার মধ্যে মালভূমি, সমভূমি, তৃণভূমি, সাভানা, ব-দ্বীপ, আগ্নেয়গহ্বর, লাভাস্রোত, খাড়া ও ঢালু উপকূল, উষ্ণ প্রস্রবণ, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, তুন্দ্রা অঞ্চল—এইগুলির নাম করা যাইতে পারে। নাম করিতেছি বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিসাবটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

এবম্বিধ বেকায়দায় পড়িয়া সিনেমা পত্রিকার দুর্বোধ্যতা ও পত্রিকাওয়ালাদের দুর্বুদ্ধিকে অভিশাপ দিতেছিলাম এমন সময়ে জনৈক সুহৃদের সমাগম হইল। তিনি আসিয়াই প্রশ্ন করিলেন, কি হে, ভাবছ কী?

সমস্যাটি আদ্যোপান্ত তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন মাত্র। তাহার পর সঙ্গের পোর্টফোলিও ব্যাগ হইতে একরাশ সিনেমা-পত্রিকা বাহির করিয়া আমার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে মেলিয়া ধরিলেন। সবগুলিই প্রায় এক ধাঁচের। যৌন আবেদন জাগানোই সব কয়টির মুখ্য উদ্দেশ্য। কদর্য ছবিকে কদর্যতর ভাবে পরিবেশন করিয়া এবং অভিনেতা অভিনেত্রীর জীবনী ইত্যাদি ছাপিয়া ইহারা কেল্লা মারিতেছে। নাম করিয়া আর লাভ কী?

আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলাম, তোমার ব্যাগে এসব যে? পড় নাকি? কেউ দেখলে লজ্জায় পড়বে তো!

বন্ধুবর মুচকি হাসিয়া বলিলেন, পড়ার কিছু নেই, তবে দেখি। নানা পোজে নটীদের ছবি দেখতে ভালই লাগে। পরোয়াও নেই—প্রায় সব কটাতেই নামকরা লেখকদের পুরো অথবা টুকরো কিছু না কিছু লেখা আছেই। এগুলোই তো পাসপোর্ট। তাই লজ্জাও হয় না।

নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, জীবিত লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য প্রায় সকলেই থ্যাদা প্যাঁচা বাঞ্ছারাম-মার্কা লেখকদের সঙ্গে কিছু না কিছু সম্ভার লইয়া একত্রিত হইয়া রহিয়াছেন।

বন্ধুবর শেষের কথাটি যাহা বলিলেন, তাহা অতি মারাত্মক। তিনি বলিলেন, এই সব জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা যদি মেয়েদের শরীরের ভূগোল সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা করে আমাদের শোনান তো বড় উপকার হয়। আর তা ছাড়া মেয়েদের শরীরের ভূগোল যথার্থ বুঝতে গেলে একটু বয়স এবং অভিজ্ঞতা থাকা তো চাই-ই।

আমার সমর্থন আদায় করিয়া বন্ধু পত্রিকাগুলি ব্যাগজাত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধের বচন

সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতিরূপে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বর্তমান বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলেরই চিন্তা করা উচিত বিবেচনায় ভাষণটির কিয়দংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম:

"বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা ও অনুন্নত অবস্থা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। অথচ ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। আশু কোন প্রতিকার সম্ভব কিনা তাহাতেও অনেক সন্দেহ আছে। বাঙালী আজ অবসাদগ্রস্ত, তাহার গৌরব ও মর্যাদা অস্তমিত, বঙ্গ বিভাগের ফলে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহার গভীর আঘাতে বাঙালীর মন আজও মুহ্যমান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালীর জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই এত বড় গুরুতর

সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে যে সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির চর্চা অথবা গভীর চিন্তাশীলতার অনুশীলন জীবনের গৌণ উদ্দেশ্য অথবা মনের বিলাসিতা রূপেই তাহার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। কোন বিষয়েই চিন্তার বা দৃষ্টির গভীরতা নাই। ক্ষণিক ও সুলভ আনন্দ, তরল ভাববিলাস, গতানুগতিক আচরণ, আপাতমনোহরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, ইহাই জাতীয় জীবনের আদর্শ হইয়া উঠিতেছে। উচ্চ আদর্শ, জীবনের মর্যাদাবোধ, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি আর তাহার জীবনকে অনুপ্রাণিত করে না। এই প্রকার অবসাদগ্রস্ত মন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল নহে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অবস্থা যে এই প্রকার জাতীয় জীবনেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। বাঙালীর মধ্যে মনুষ্যত্ব অথবা বলিষ্ঠ মানসিক শক্তির যেরূপ অভাব তাহাই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান সহায়। সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালীর উন্নতি না হইলে বাংলা সাহিত্যের খুব বেশী উন্নতি হইবার আশা কম।

কিন্তু তথাপি হতাশ বা উদাসীন হইলে চলিবে না, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যেটুকু করা সম্ভব আমাদিগকে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।"

—যুগান্তর ১৭. ৩. ৬৩

আকাদমি পুরস্কার

'জাপানে' (প্রকাশক: এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ) গ্রন্থের জন্য এই বৎসর শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ভারত সরকারের আকাদমি পুরস্কার লাভ করায় আমরা যথার্থ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। অন্নদাশঙ্কর দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার রচনা বুদ্ধিদীপ্ত—সাধারণ পাঠকের নিকট অধিক সমাদর লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু নিজস্ব রচনা-বৈশিষ্ট্যে এবং সাহিত্যধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় অন্নদাশঙ্করের একটা স্থায়ী আসন হইয়া রহিয়াছে। অন্নদাশঙ্কর একজন বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি সে সম্পর্কে সকলেই একমত হইবেন, কিন্তু একটা উন্নাসিক মনোভাব তাঁহাকে কি রচনায়, কি আচরণে পুরাপুরি এদেশী হইতে দেয় নাই। যে জনসমাদর তাঁহার হওয়া উচিত ছিল সেই পরিমাণ সম্মান ও পরিচিতি হইতে তিনিও অনেকটা বঞ্চিত রহিয়া গিয়াছেন।

আমরা প্রথমটা সন্দেহ করিয়াছিলাম বুঝি চীনের উপর রাগ করিয়া এবং তাহাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্যই ভারত সরকার জাপানের উপর এই দাক্ষিণ্যটুকু করিলেন। পরে বুঝিলাম তাহা নহে।

'জাপানে' দ্বারা এই পরিণত বয়সে অন্নদাশঙ্কর যে সম্মানটুকু লাভ করিলেন অন্যদিকে এই বৎসরেই 'আমেরিকা' দ্বারা সেই পরিমাণেই তাঁহাকে কলঙ্কযুক্ত হইতে হইল ইহা আমরা সবিনয়ে নিবেদন করিতে চাই। আমরা তাঁহার আমেরিকান পত্নী শ্রীমতী লীলা রায়ের কথাই বলিতেছি। পরবর্তী P.E.N. প্রসঙ্গে লীলাময়ের লীলা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

P.E.N. বা কলম প্রসঙ্গে

P. E. N. পত্রিকার মার্চ ১৯৬৩ সংখ্যায় শ্রীমতী লীলা রায়ের একটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। রচনাটির নাম "Bengali Literary Journals"। এই সংক্ষিপ্ত রচনাটিতে শুরু হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বাংলা সাময়িক পত্রের একটা তালিকা এবং সেই সব সাময়িক পত্রিকার মুখ্য লেখকবর্গের কিছু নামও দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'দিগ্দর্শন' হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক 'উত্তরসূরী'তে আলোচনার শেষ। দিগ্দর্শন, সমাচার দর্পণ, সংবাদ-প্রভাকর, তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা, সবুজ পত্র, বিচিত্রা প্রভৃতি মৃত এবং প্রবাসী, ভারতবর্ষ, পরিচয়, এমন কি চতুরঙ্গ, উত্তরসূরী পর্যন্ত জীবিত সাময়িক পত্রিকাগুলির নাম সংক্ষিপ্ত বিবরণী সহ এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। কল্লোল, কালিকলম ও প্রগতি সম্পর্কেও একটি প্যারাগ্রাফ লেখিকা ব্যয় করিয়াছেন এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের উল্লেখ করিতেও ভোলেন নাই। সম্ভবতঃ

অন্নদাশঙ্করের নাম রচনায় আনার জন্যই লেখিকা এই কৌশলের আশ্রয় লইয়াছেন। অন্নদামঙ্গল অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি: "The best writing of the 20's was, however, published in the older, standard periodicals like *Prabasi*, *Bharatvarsha* (1913) and *Vichitra* (1927). *Pather Panchali* by Bibhuti Bhusan Banerji appeared in *Vichitra.* So also did *Pathe Prabase* by Annada Sankar Ray and *Atashi Mashi* (?) by Manik Bandyopadhyay. It is in these magazines that we find the work of Sarat Chandra Chatterji."

আমেরিকান মহিলা বাংলা সাময়িক পত্র সম্পর্কে যথাসাধ্য গবেষণার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই বিদেশী রমণীর পাশে কি আর কেহ ছিল না যে এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করে? কহিলে—"In 1831 the first Bengali daily, *Sambad Prabhakar*, appeared under the editorship of the poet Iswar Chandra Gupta" লেখা চলিত না। 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ২৮শে জানুয়ারি ১৮৩১ 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২৫শে মে ১৮৩২ তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ইহার চারি বৎসর পরে ১৮৩৬ সনের ১০ই আগস্ট 'সংবাদ প্রভাকর' পুনরায় প্রকাশিত হইতে থাকে। তবে আর সাপ্তাহিকরূপে নহে, বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিন বার) রূপে। এইভাবে তিন বৎসর চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংবাদপত্ররূপে প্রকাশিত হইতে থাকে।

লীলা রায়ের রচনায় সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে আমরা বসি নাই। আমরা কেবল ভাবিতেছি কতখানি স্পর্ধা থাকিলে এই ধরনের একটি রচনা কোনও বিদেশী লিখিতে পারেন। কতখানি অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা থাকিলে এই ধরনের রচনা প্রকাশ করিতে একজন বিদেশিনীর PEN একটুকু কাঁপিয়া ওঠে না। সাময়িক পত্রিকার একটা মোটামুটি উল্লেখযোগ্য তালিকা দেওয়া হইয়াছে অথচ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য', এবং 'মানসী ও মর্মবাণী', 'মাসিক বসুমতী', 'উত্তরা', 'শনিবারের চিঠি', 'বঙ্গশ্রী', 'দেশ', 'পূর্বাশা' প্রভৃতির নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই।

সাহিত্যিকগণের নাম দেওয়ার ব্যাপারেও সেই একই অবস্থা। অন্যদের কথা ছাড়িয়া দিলাম—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল প্রভৃতি জীবিত শ্রেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকগণও তালিকায় স্থান পান নাই। আদিলীলা, মধ্যলীলা পার হইয়া অন্ত্যলীলায় আমাদের যেভাবে বেইজ্জত করা হইল তাহাতে প্রায় বস্ত্রহরণের লজ্জাই অনুভূত হইতেছে। বাংলাদেশে যাঁহারা এই P.E.N. প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত আছেন তাঁহারা কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। অন্নদাশঙ্করের Pen is mightier than sword কি না জানি না কিন্তু লীলা রায়ের হাতে পড়িলে তাহা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে এ কথা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি।

উক্ত P.E.N. পত্রিকার ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ সংখ্যায় আর একজন জাঁদরেলের খবর পাওয়া গেল—পাঞ্জাবের খুশবন্ত সিংহ। এই সিংহের গর্জনে দিল্লী বোম্বাই ম্যানিলা এডিনবরা তামাম দুনিয়া প্রকম্পিত হইতেছে। ভারতের ও এসিয়ার সাহিত্য সম্পর্কে নানাবিধ ফতোয়া ইনি প্রায়ই ঝাড়িয়া থাকেন। ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এসীয় লেখক সম্মেলনের একজন প্রতিনিধি হিসাবে খুশবন্তের বক্তৃতা P.E.N. পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে। এই P.E.N. পত্রিকাটির বাংলাদেশ ও বাঙালীর সম্পর্কে ইচ্ছা করিয়া অবহেলার ভাব দেখানোর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। খুশবন্তের রচনায় বাঙালী সাহিত্যিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই তিনজনের মাত্র নাম আছে। হিন্দী বা উর্দু ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলেও রচনাটিতে পাঞ্জাবের

ভাই বীর সিং, মোহন সিং, অমৃত প্রীতম, কর্তার সিং দুগ্‌গাল, কলবন্ত সিং বীর্ক (?)—সাকুল্যে এই পাঁচ জন প্রাচীন ও আধুনিক লেখক লেখিকার নাম ও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের একজনেরও নাম নাই।

রবীন্দ্র-পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত এ বৎসরের রবীন্দ্র-পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী তাঁহার "রম্যাণি বীক্ষ্য" (প্রকাশক: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস এবং এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ) নামক পর্বান্বিত ভ্রমণ-কাহিনীর জন্য এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী" (প্রকাশক এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ) নামক গ্রন্থের জন্য। উৎকর্ষের বিচারে পুরস্কার দুইটি যোগ্য পাত্রেই অর্পিত হইয়াছে। সুবোধকুমার বিপুল পরিশ্রমে ও গভীর অধ্যবসায় সহকারে এ পর্যন্ত 'রম্যাণি বীক্ষ্যে'র যে সাতটি পর্ব রচনা করিয়াছেন তাহাতে শুধু তথ্যের ও বর্ণনার সমাবেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—অসাধারণ লিপিচাতুর্যের ফলে প্রতিটি পর্ব উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই গ্রন্থ রচনায় একদিকে তাঁহাকে যেমন পর্যটকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে ঘুরিতে হইয়াছে অন্যদিকে গবেষকের মন লইয়া তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। 'রম্যাণি বীক্ষ্য' সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'র পাঠকের নিকট অধিক পরিচয়দানের প্রয়োজন নাই। 'শনিবারের চিঠি'তেই সুবোধকুমারের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। 'রম্যাণি বীক্ষ্যে'র দক্ষিণ-ভারত পর্ব (সূচনা পর্ব) এবং মধ্য-ভারত পর্ব 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছে। 'রম্যাণি বীক্ষ্যে'র পরবর্তী উত্তর-ভারত পর্ব আগামী সংখ্যা হইতে আমরা ধারাবাহিক প্রকাশের আয়োজন করিতেছি। দক্ষিণ-ভারত পর্ব, রাজস্থান পর্ব, উৎকল পর্ব, সৌরাষ্ট্র পর্ব, কালিন্দী পর্ব, দ্রাবিড় পর্ব ও মহারাষ্ট্র পর্ব (মধ্যভারত পর্ব) মিলিয়া এ পর্যন্ত মোট সাতটি পর্ব সচিত্র গ্রন্থের রূপ পাইয়াছে। 'রম্যাণি বীক্ষ্য' বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী কীর্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী' গ্রন্থটিতে লেখক বঙ্গীয় নব্যস্মৃতির বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থপাঠে বাঙালীর সমাজব্যবস্থা, আচারবিচার ও সংস্কার অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যাইবে। গ্রন্থটি বাঙালী মাত্রেরই নিকটে বিশেষ সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক দুইজনকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়া এই সুযোগে গ্রন্থগুলির প্রকাশক এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাইতেছি। বাংলাদেশের চটপট-সংস্করণী বস্তাপচা নভেল-প্রকাশকদের মত ব্যবসায়বুদ্ধি তাঁহার নাই। রুচি ও নিষ্ঠার সমন্বয়ে বহু সদ্‌গ্রন্থ তিনি বিপদের ঝুঁকি লইয়াও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থগুলির সম্মানলাভে রুচির জয় ঘোষিত হইল।

রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠায় শ্রীকমলাকান্ত শর্মার হা-হুতাশ লক্ষ্য করিয়া আমরা কিন্তু যৎপরোনাস্তি বিরক্ত বোধ করিতেছি। কমলাকান্ত তাঁহার স্বভাবসুলভ মাই-ডিয়ারী ঢঙে যাঁহাদের হইয়া 'ব্রিফ' লইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায় ছাড়া পুরস্কার পাইবার যোগ্য আর কেহ নাই।

গত বৎসর বনফুল রবীন্দ্র-পুরস্কার পাওয়াতে পুরস্কারের মর্যাদা অনেকখানি বাড়িয়াছে। কুমুদরঞ্জন, কালিদাসের একেবারে গোড়াতেই পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল—কবি হিসাবে তাঁহাদের দাবি সর্বাগ্রগণ্য হইলে যথাযথ হইত। কিন্তু তাহা যখন আর হয় নাই, বছরের পর বছর পার হইয়া গিয়াছে তখন এত বিলম্বে পুরস্কৃত হইলে তাঁহারা হয়তো বিড়ম্বিতই হইবেন। তাঁহারা মাথায় থাকুন, পুরস্কার শক্তিমান নবীনদের উপরেই বর্ষিত হউক। আমরা আশ্চর্য হইয়া যাইতেছি এই ভাবিয়া যে প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্তিকালে কুমুদরঞ্জন, কালিদাস বা আর

হ স্মর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই, সে সময় লাকান্ত কোথায় ছিলেন? উক্ত প্রমথ বিশী গাছের ইয়া তলারও কুড়াইতে চাহিয়াছিলেন। ভারত-সরকার কাদমী পুরস্কারদানে বিরূপ হইলেও সে সময় অশোক কার কনসোলেশন প্রাইজ হিসাবে বিশী মহাশয়কে চ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। কমলাকান্ত প্রদত্ত স্কারযোগ্য লেখক-তালিকায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মটি নাই, সে কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। মলাকান্ত লিখিতেছেন, "পুরস্কারপ্রাপ্ত নামের গৌরবেই রস্কারের গৌরব।" কখনোই নয়, কখনোই হওয়া চিত নয়। পুরস্কারের নামের গৌরবেই পুরস্কারপ্রাপ্তের ৌরব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথনাথ বিশী স্মৃতিপদক াইয়াছেন—ইহাতে পুরস্কারের গৌরব বাড়িল বটে, কিন্তু বীন্দ্রনাথের কী দশা হইবে? প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্র-তি পুরস্কার পাইলেন—ইহাতে প্রমথনাথেরই গৌরব দ্ধি হইল—হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

াপ্তাহিক বসুমতী

গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম—১০৮ গুড়ুম! দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডের নবপর্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীকে ণুনিশ জানাইতেছি। মহিলা সম্পাদিত এই পত্রিকাটিতে রুচি ও শিল্পবোধের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু সূক্ষ্ম হাতের অতি কোমল কারুকার্যের ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অস্বচ্ছ এবং অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—আমাদের স্থূল চোখে অনেক কিছু অদৃশ্য থাকিয়া গেল। অর্ধেক লেখা ছাপা খারাপ হওয়ার দরুন পড়া গেল না, যাহা পড়া গেল তাহা বোঝা মুশকিল। সব মিলাইয়া জয়ন্তী সেনের সম্পাদনা সম্পূর্ণ শ্রীহীন হইয়াছে। বনেদী বাড়ির ব্যাপার, সুতরাং বঙ্কিমকেই স্মরণ করিতে হয়। সেখানে কিন্তু শ্রী ও জয়ন্তী পাশাপাশি বিরাজ করিতেছেন।

"শ্রী। জয়ন্তি! সোনা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোনাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়—কিন্তু মরে না, রত্ন তুলিয়া আনে।"

বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন। আমরাও সোনা চিনি। খাটো দড়ি বলিতে সম্ভবতঃ লেখকদের স্বল্প দক্ষিণার কথাই বুঝাইতেছে। কিন্তু পাথর? সূচীপত্র ঘাঁটিয়া দেখিতেছি—অন্নদাশঙ্কর, তারাশঙ্কর, বাণী রায়। ওজনে ভারী হইলেও ইঁহাদের পাথর বলার সাহস আমাদের নাই। তাহার পর—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণ পাথর হইলে তাহার মূল্য অনেকখানি বাড়িয়া যায় আমরা জানি, সুতরাং নারায়ণশিলাও নহে। সবশেষে আছেন পরিমল গোস্বামী। 'যুগান্তর সাময়িকী'র নবীন লেখকেরা (লেখিকারা নহে) কখনও কখনও তাঁহাকে নির্দয়তায় পাথরের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। সোনা-সাপ্তাহিক বসুমতী কি পরিমল গোস্বামীরূপ পাথরেই বাঁধা পড়িয়া ডুবিবে।

উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত গোস্বামী মহাশয়ের রচনা "কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ" পড়িয়া সেই ধারণাই মনে বদ্ধমূল হইল। এইরূপ হিজিবিজি অর্থহীন রচনার কারণ কী? অত্যধিক রসিকতা-প্রবৃত্তি? আমাদের ঔষধবাতিক-গ্রস্ত হাস্যরসিক লেখকবন্ধু নাড়ুগোপাল পতিতুণ্ড একবার ভুলিয়া গর্ভরোধের ঔষধ খাইয়া ফেলিয়াছিল; বাস্, তাহার পর হইতে সে রান্নাবান্না এবং সেলাই-পদ্ধতি লইয়াই লিখিয়া চলিয়াছে প্রগল্‌ভা দেবীর ছদ্মনামে। হাসির লেখা লিখিতে সে এখন সম্পূর্ণ অক্ষম। "কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে"র মূলে ঔষধবিভ্রাট হয় নাই তো!

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র ভয়ের কারণ নাই। মাথার উপর গৌরাঙ্গ ভবনের বিবেকানন্দ এবং টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির যীশু আছেন, সর্বোপরি মহামতি অশোকের খর দৃষ্টি সদা জাগ্রত আছে। অতএব ভয় কী! সাগরের রত্ন হাতে আসিবেই। কিন্তু সাগরের পাশেই যে আর এক অশোক!

বিবেক-হীন

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী বৎসরে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্থানচ্যুতিতে আমরা বিচলিত হই নাই,

কিন্তু ঘটনাটি লইয়া কর্তামহলের বাড়াবাড়িতে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক গুরুত্বের জন্য যে বিষয়টি অত্যন্ত সিক্রেট রাখার কথা তাহার বহুল প্রচারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সংশ্লিষ্ট সকলেই আমাদের নিন্দাভাজন হইয়াছেন। বসুমতী দৈনিকের সহিত যুক্ত হইবার পর উঁহাদের বৈদ্যুতিক রোটারি মেসিনে প্রায় প্রতিদিনই বিবেকানন্দের স্তুতি ও স্তাবকতা প্রচারার্থে যে সকল পত্র ও আলোচনাদি প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত অন্তরীক্ষে থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 'টক অফ দি টাউন' হইয়া চায়ের দোকানে, শুঁড়িখানায়, কফিখানায় অনেক বেশী আলোচিত হইয়াছেন। মোটের উপর এখন ইহাই বুঝিতে পারিতেছি যে খেলিতে জানিলে একটি মাত্র কাণাকড়ি লইয়াই খেলা যায় এবং বড় লোকের রং যদি গোলাপী হয় তো তাহাকে চটকাইলেও কিঞ্চিৎ নির্যাস বাহির হইতে পারে।

বসুমতীর পত্রলেখকেরা মুখুজ্জে মহাশয়কে চরিত্রবান, বীর্যবান, মহৎ ইত্যাদি যত বিশেষণে সম্ভব ভূষিত করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা তাক লাগাইয়াছেন জনৈক মহেন্দ্রনাথ নিয়োগী ২৩. ৩. ৬৩ তারিখে প্রকাশিত পত্রে। বাছাই করা উদ্ধৃতি দিলে মজাটা বাড়িবে। সুতরাং—

"রুশ দেশের অনন্যসাধারণ ঔপন্যাসিক ডস্টয়েভস্কি কিংবা ইংলণ্ডের মানব-দরদী কথাশিল্পী ডিকেন্সের প্রাণ ও সমবেদনা লইয়া কি স্বনামধন্য সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশে সাংবাদিকরূপে আবির্ভূত হইলেন? মনে হয়, শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছেন না, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি লইয়া, শ্রবণেন্দ্রিয়ে ব্যথিতের ক্রন্দন শুনিয়া এবং হৃদয়ে আর্তের আর্তনাদ অনুভব করিয়া তিনি সংবাদের গায়ে সাহিত্য লিখিতেছেন।··· সম্ভবতঃ তিনি নিজ এলাকায় সমাসীন থাকিয়াও শরৎচন্দ্র-মানিক প্রমুখ শিল্পিবৃন্দের ভাবশিষ্য। ······আমরা ভাবিয়া অবাক হইয়া যাই যে, জীবন-দরদী লেখকের সমবেদনা কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে! শ্লেষ ও ব্যাজ-স্তুতি প্রয়োগ করিয়া, সমাজ ও ঘরছাড়া নীতিকে তীব্র নিন্দা ও কষাঘাত করিয়া সর্বমান্য সম্পাদক মানব-বন্দনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।"

রাম মরিয়া গিয়াছেন। অতএব রাম রাম রাম। 3 Ex Rum!

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: ৫৬-২৮৩৮

শনিবারের চিঠি

৩৫শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৯

সম্পাদক :
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য

॥ নবম অধ্যায় ॥

॥ সত্যবাণী দেবীর দৌত্য ॥

এক

জয়ন্তী-সংখ্যা প্রকাশের পরও বহুদিন শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্র-বিদূষণ অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল। সবচেয়ে ক্ষতিকারক হল চিঠির প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে মোহিতলালের লেখাগুলি। গুরুগম্ভীর সমালোচনার নামে মোহিতলাল সুকৌশলে রবীন্দ্র-বিরোধিতা মাসের পর মাস চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং কল্পনাতীত একটি দিক থেকে ছিন্নসূত্র পুনর্যোজনার কাজ যবনিকার অন্তরালে গোপনে গোপনে চলতে লাগল। প্রায় অসূর্যম্পশ্যা এক অভিজাতবংশীয়া নারীর কল্যাণী ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হল। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ থেকে শনিবারের চিঠিতে 'সত্যবাণী দেবী' নাম্নী এক নবাগতা লেখিকার সমাজ ও ধর্মবিষয়ক নানা রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এই সত্যবাণী দেবী আসলে একটি ছদ্মনাম। এই ছদ্মনামের অন্তরালবর্তিনী, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্রী, শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী।

হেমন্তবালা ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের বিখ্যাত জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কন্যা এবং বিখ্যাত সুরকার বীরেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠা সহোদরা। হেমন্তবালার সূত্রে নাটোর ও গৌরীপুর—এই দুই অভিজাত জমিদার-পরিবারের রাখীবন্ধন হয়েছিল। হেমন্তবালা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ জমিদার-পরিবারের কুলবধূ। জীবনের পরম আধ্যাত্মিক সংকটে তিনি 'কবিদাদা' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন। কবির কাছে তাঁর পরিচয় যখন স্পষ্ট হয় নি তখন কবি এক পত্রে তাঁকে লিখছেন, "তোমার লেখা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে তুমি লিখিয়ে, অর্থাৎ আমাদেরি দলের লোক। তাই তোমার দাবি অগ্রাহ্য করা সম্ভব হোলো না।" [১৯ বৈশাখ, ১৩৩৮]। পত্রালাপ অন্তরঙ্গ হবার পর এক চিঠিতে লিখছেন, "তোমার চিঠির ভাষা কী সুন্দর। সহজ, গভীর, অকৃত্রিম। তোমার মন তোমার ভাষায় কোথাও বাধা পায়নি, ভাবনার ভঙ্গির সঙ্গে ভাষার ভঙ্গি লীলায়িত হয়ে চলেছে। এরকম লেখা সহজ নয়। অনেকবার ভাবি তোমার এই শক্তি কেবল চিঠি লেখার খিড়কির রাস্তা দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া আসা করে কেন? চিঠি লেখার ভঙ্গি দিয়েই সদরের জন্যে কিছু কেন লেখ না? কোনো একটা সহজ বিষয় নিয়ে তোমার এক একটা চিঠি আমাকে বিস্মিত করে, আমার মনকে দুলিয়ে দেয়।"

বস্তুতঃ, হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল পত্রসাহিত্যের এক

দুর্লভ সম্পদ। শুদ্ধান্তঃপুরিকা অন্য কোন অনাত্মীয়া নারী অপরিচয়ের অন্তরালে বসে কবির কাছ থেকে এত অন্তরঙ্গ সুরের কথা টেনে বের করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ একসময় ভেবেছিলেন হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিপত্রগুলি সংকলন করে নিজের ধর্মমত সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। কবির সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় নি।

দুই

সজনীকান্তের প্রতি হেমন্তবালার স্নেহসম্পর্ক গড়ে ওঠার ইতিহাসটিও চিত্তাকর্ষক। ১৩৩৮ সালে শনিবারের চিঠি যখন নবপর্যায়ে প্রকাশিত হল তখন সজনীকান্ত ৫সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের বাসিন্দা। এই চারতলা বাড়ির একতলায় ছিল তাঁর বৈঠকখানা, দোতলায় গ্রন্থাগার শয়নঘর ও রান্নাঘর। রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের ৫বি বাড়িটি ছিল একটি বিদ্যালয়। ৫এ বাড়িতে থাকতেন জমিদার রায়চৌধুরীরা। সজনীকান্তের তখন দুটি সন্তান—খোকন আর উমা। শিশু উমা তুরতুরে পায়ে বাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে প্রায়ই রাস্তায় নেমে যেত। উমাই এই দুই অসম পরিবারের মধ্যে সম্বন্ধ রচনার সেতু হল। রাস্তায় বেরিয়ে আসা এই সুশ্রী শিশুটির প্রতি অন্তঃপুর থেকে হেমন্তবালার দৃষ্টি ছিল সজাগ। পিতামাতার সতর্ক পাহারা যখন সে পেরিয়ে যেত তখন তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করতেন হেমন্তবালা দেবী। ঝি কিংবা চাকরকে পাঠিয়ে উমাকে তিনি ধরে নিয়ে যেতেন নিজেদের বাড়িতে। পাঁচের সি থেকে যখন উমার খোঁজ পড়ত তখন সে হেমন্তবালার পরম স্নেহে অজস্র আদর ও উপহার কুড়োচ্ছে। পাঁচের এ থেকে উমার মা সুধারাণী যখন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতেন তখন তার হাতে অগুনতি খেলনা। হেমন্তবালার দুটি সন্তান—একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ওরা অবশ্য বয়সে বড়। কিছুদিনের মধ্যেই হেমন্তবালার মেয়ে বাসন্তী হল সুধারাণীর সখী; হেমন্তবালা হলেন মাসীমা। এইভাবেই উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক এই কাহিনীতে হেমন্তবালা সজনীকান্তেরও মাসীমা হলেন। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাসীমা হলেন মা। এক পত্রে সজনীকান্ত তাঁর মাকে লিখছেন, "আপনি আমা ও সুধারাণীকে বাবা-মার আসন দিয়াছেন—এত সৌভাগ্যের দাবী করিতে না পারিলেও আমরা কৃত হইয়াছি। আপনি যে সম্মান দিয়াছেন যেন তা উপযুক্ত হইতে পারি ইহাই কামনা করিতে আপনাকে দেখি নাই কিন্তু আপনার স্নেহ যে আমা নিরন্তর ঘিরিয়া আছে তাহা বুঝিতে পারি। পূর্বজন্ম বহু পুণ্যের ফলে এই জন্মে এই অপ্রত্যাশিত করুণা ল করিয়াছি—ইহা যেন না ভুলি। আমার প্র জানিবেন। ইতি প্রণত শ্রীসজনীকান্ত।" [২৫।১০।১৯৩

হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, " আমাদেরি দলের লোক।" বস্তুতঃ জীবন ও জগৎ সম্প তাঁর শিল্পিসুলভ কৌতুহল ছিল অপরিসীম। অ অন্তরে তিনি বৈষ্ণব। সম্পূর্ণ নিজের সারস্বতসত্তা সাধনার বলেই তিনি প্রতিকূল পরিবেশকে অতিক্রম শিল্পকাব্যের আনন্দ ও সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ পারতেন। সজনীকান্ত, তাঁর স্ত্রী সুধারাণী এবং তাঁ পুত্রকন্যার প্রতি তাঁর হৃদয় অপার বাৎসল্যরসে নিত থাকত। সজনীকান্তের সঙ্গে সম্পর্কের প্রথম সুধারাণী ছিলেন মধ্যবর্তিনী। সাহিত্য ও জীবনজিজ্ঞা অজস্র প্রশ্ন তিনি পাঠাতেন সুধারাণীর হাত দি রবীন্দ্রনাথের কাছেও ছিল তাঁর শিল্পিমনের অপরি কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা। তার একটা বড় স্থান সময় অধিকার করে ছিল সজনীকান্তের সাহিত্যকর্ম সংসারজীবন। সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখে "তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাতা অচিরকাল মধ্যে বুঝিতে পারি তাঁহার উপাস্য রবীন্দ্রনাথ ও নবলব্ধ পুত্রের মনান্তর হইলেও দুরতিক্রম্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আ অপরিসীম ভক্তির কথাও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল এই ব্যবধান তাঁহাকে পীড়িত করিত এবং গো গোপনে দেবতার ও ভক্তের পুনঃসংযোগ স্থাপনে তি যে পুরোহিতের ভূমিকা লইয়াছিলেন তাহা পরে জা পারিয়াছিলাম। আমি যখন আঘাতে আঘাতে বীত রবীন্দ্রনাথকে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত মনে কবি ছিলাম, তখনই যে হেমন্তবালা দেবী সুদীর্ঘ ধারাবা পত্রে আমারই দৈনন্দিন কৃতকর্মের ও পারিবা

টিনাটির খবর দিয়া তাঁহাকে আমার প্রতি ক্ষমাশীল ও হৃশীল করিবার প্রবল চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা যখন ানিতে পারিলাম, তখন কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরিয়া গল। তাঁহার সহৃদয় চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, এবং সফলতার ারাই ইতিহাস কৌতুহলোদ্দীপক হইয়াছে।" [আত্ম-তি-২, পৃ° ১৪৩-৪৪]।

কিছুদিন পরে পত্রে বারবার সুবিস্তৃত সজনীকান্ত-প্রসঙ্গ উত্থাপন করার ফলে হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথের বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন। ১৩৩৯ সালের আশ্বিন-র্তিক মাসে লেখা রবীন্দ্রনাথের একাধিক পত্রে এই বিরক্তি ধরা পড়েছে। তারই কথা উল্লেখ করে জনীকান্ত হেমন্তবালা দেবীকে লিখছেন, "আমাদের ম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে লেখার ফলে দেখিতেছি তিনি উত্যক্ত হইয়াছেন, আপনাদের এতদিনকার সম্পর্কে একটু াড়ষ্টতা আসিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনের তার চড়ায় বাঁধা। আপনি তাহাতে ঘা দিয়া হয়তো নিজের ক্ষতি করিয়াছেন। আমাদের জন্যই আপনি ইহা করিতেছেন বলিয়া মনে মনে লজ্জা অনুভব করিতেছি। শষের কয়খানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বারম্বার আপনার উত্তেজনার উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ দেখিতেছি, তিনি য়ং উত্তেজিত। আমাদের নামোল্লেখে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হইয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথকে এই সম্পর্কেই একটি চিঠি লিখিব, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম তাহাতে সুফল হইবে না। আমার ম্পাদিত কাগজে রবীন্দ্রনাথের সত্যমিথ্যা এত অধিক নিন্দা প্রচার হইয়াছে যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমার ঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহজ সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব। তাহার চষ্টা করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে দুঃখ দেওয়া হইবে। বু আপনি যখন অনুমতি লইয়াছেন তখন আমি একটি চঠি তাঁহাকে লিখিব। তাঁহার ধারণা—তাঁহার নিন্দার বসায় এঁদেশে লাভজনক। ইহা সত্য নহে। বীন্দ্রনাথের নিন্দা প্রচার করিয়া শনিবারের চিঠি তিগ্রস্ত হইয়াছে, লাভবান হয় নাই।...

"রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ আমার লেখা পড়েন না, আমার যখানি বই প্রকাশিত হইয়াছে; কোনোখানিই বীন্দ্রনাথকে পাঠাই নাই। অথচ একজন লেখককে বুঝিবার পক্ষে তাহার লেখাই একমাত্র সূত্র। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুবিধা আছে। তাঁহার লেখা আমরা পড়িতে বাধ্য। তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারি, অথচ আমার লেখা তাঁহাকে পড়াইতে পারি না। তাঁহাকে যাঁহারা বই পাঠান তাঁহাদের প্রতি তিনি প্রসন্ন নহেন, আপনার চিঠিতেই তার প্রমাণ আছে, বরঞ্চ তাঁহাদের লইয়া তিনি বিদ্রূপই করেন। রবীন্দ্রনাথ যদি কষ্ট করিয়া আমার এক-আধখানা বই পড়িতেন আমার কিছু পরিচয় পাইতেন। আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুমতি পাইলে আমার বই তাঁহাকে পাঠাইব। তৎপূর্বে পাঠাইয়া লাঞ্ছিত হইতে চাহি না।"

এই পত্রে আবার সজনীকান্তের মানস-জগতের দুটি বিপরীত কোটি একসঙ্গে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজে হেমন্তবালা দেবীকে তিনি নিরুৎসাহ করতে চাইছেন, অন্যদিকে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বই পড়ুন। একদিকে শনিবারের চিঠির সম্পাদক হিসাবে তিনি বুঝতে পারছেন যে, তাঁর কাগজে রবীন্দ্রনাথের 'সত্যমিথ্যা' এত অধিক নিন্দা প্রচার করা হয়েছে যে, তাকে অতিক্রম করে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব, অন্যদিকে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর লেখা পড়লে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারবেন অন্তরে অন্তরে তিনি কত বড় রবীন্দ্রানুরাগী। সজনী-মানসের এই দুই বিপরীত কোটিই তাঁর সারস্বত কীর্তি ও কুকীর্তির মূল কারণ।

তিন

রবীন্দ্রনাথকে সজনীকান্ত সম্পর্কে সরাসরি চিঠি লেখার পূর্বে হেমন্তবালা দেবী কৌশলে গুরু-শিষ্যের মিলন ঘটাবার একটি চেষ্টা করেছিলেন। ১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে তিনি সজনীকান্তকে পত্রদূত করে পাঠালেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। পারস্য ভ্রমণ শেষে কবি দেশে ফিরেছেন ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ (৩রা জুন, ১৯৩২)। দেশে ফিরে এসে তিনি কিছুদিন খড়দহে গঙ্গার ঠিক গা-ঘেঁষে তৈরি-করা একটি প্রাসাদে বাস করছিলেন। ছেলের ওপর মা'র হুকুম হল, কবিকে লেখা তাঁর একটি জরুরী চিঠি নিয়ে খড়দহ যেতে হবে। সজনীকান্ত সে

এই অপূর্ব সুযোগ লাভে মনে মনে খুশি হয়েছিলেন তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তিনি প্রমাদও গণছিলেন। কেন না জয়ন্তী-সংখ্যার পরও তিন-চার মাস শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্র-বিদূষণ অব্যাহত গতিতেই চলছিল। কিন্তু মা'র আদেশ, 'না' বলার উপায় ছিল না। মা পুত্রবধূ মারফত যে হুকুম জারি করেছেন, তা অমান্য করার সাধ্য তাঁর ছিল না। 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন, "সুধারাণীর নিকট প্রেরিত তাঁহার চিরকুটগুলির মর্যাদা প্রায় বাদশাহী পাঞ্জার সমান।"

অতএব সজনীকান্তকে দুরুদুরু বুকে খড়দহে কবি-সমীপে যেতে হল। খড়দহে মোহিতলালের এক সাহিত্যরসিক বন্ধু ছিলেন। সজনীকান্ত কলিকাতা থেকে ভোরবেলা রওনা হয়ে তাঁরই গৃহে প্রথমে দর্শন দিলেন। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা পাকা করে গৃহস্বামীর এক বিদুষী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে কবি-সন্দর্শনে যাত্রা করলেন। প্রাসাদে পৌঁছে সংবাদ পাওয়া গেল কবি দ্বিতলে আছেন। তার পরের বর্ণনা সজনীকান্তের ভাষাতেই ভাল মানাবে। তিনি লিখছেন :

"পুত্র রথীন্দ্রনাথ ভূতলে দ্বার রক্ষা করিতেছেন; তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া যাইবার উপায় নাই। রথীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে এক খণ্ড মসৃণ চামড়ার উপরে একটি লৌহশলাকার সাহায্যে ফুল তুলিতে-ছিলেন। আমাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলাম সেই চাহনিতেই ভড়কাইয়া গিয়া আমার সঙ্গিনী অন্তর্ধান হইতেছেন। তখন আর উপায় নাই। বসিয়াই রহিলাম। রথীন্দ্রনাথ খুব ধীর ও শান্ত কণ্ঠে ছোট্ট একটি প্রশ্নের চিমটি কাটিলেন—'কি, খবর সংগ্রহ করতে এসেছেন?' আমার 'শনিবারের চিঠি'র মেজাজ সঙ্গে সঙ্গেই চাড়া দিয়া উঠিল; বলিয়া ফেলিলাম, 'আজ্ঞে, তার জন্যে এত কষ্ট করে এতখানি পথ আসবার দরকার ছিল না, আপনাদের সব খবর বাজারেই পাওয়া যায়।'" [আত্মস্মৃতি-২, পৃ° ১৯৮-৯৯]

সেদিনকার অসংবৃত তরুণ সজনীকান্তের মেজাজ কত চড়া ছিল শেষ বাক্যটিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সজনীকান্ত লিখছেন, "শর নিক্ষেপ করিয়াই লজ্জা হইল, শান্তকণ্ঠেই বলিলাম, দেখুন, আমি দূত, সুতরাং অবধ্য। রথীন্দ্রনাথের মুখে মৃদু প্রসন্ন হাসি দেখা দিল, বলিলেন, উপরে খবর গেছে, আপনি বসুন।"

অনতিবিলম্বে সংবাদবাহী ভৃত্যের অনুসরণ ক[illegible] সজনীকান্ত কবিসমীপে উপনীত হলেন। প্রণাম ক[illegible] তাঁর হাতে হেমন্তবালা দেবীর পত্রখানি দিলেন। সজনী[illegible]কান্ত বলছেন, নতমুখ নীরব রবীন্দ্রনাথ যেন এক[illegible] অবলম্বন পেয়ে বেঁচে গেলেন। হঠাৎ অপ্রসন্নতার ধা[illegible] কাটিয়ে কবি যখন কথা আরম্ভ করলেন, সজনীকা[illegible] মনে হল, তিনি যেন একা বসে স্বগতোক্তি করছে[illegible] সম্মুখেই ছিল গঙ্গা। নদীপ্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের অত্য[illegible] প্রিয়। বর্ষায় স্ফীত গঙ্গার গৈরিক জলধারার দি[illegible] তাকিয়ে কবি বলতে লাগলেন, "এই নদীর সঙ্গে আম[illegible] ঘনিষ্ঠ নাড়ির যোগ, আমি গঙ্গার সন্তান। এই গ[illegible] যেখানে পদ্মা হয়েছে, সেখান থেকে দক্ষিণে পাবনা প[illegible] এক সময় আমার বিচরণক্ষেত্র ছিল। একটু এগিয়ে এ[illegible] নীচে চেয়ে দেখ, আমার সে যুগের বিশ্বস্ত বাহন 'পদ্মা[illegible] সংস্কার হচ্ছে। ওই 'পদ্মা'য় আমি দীর্ঘকাল বাস করে[illegible] ওকে আমি ভালবাসি, তাই ছাড়তে পারি নে। জীবনভোর অনেক খেটেছে, ওকে ছুটি দেওয়াই উ[illegible] ছিল।"

কবির স্মৃতিপথে উদিত হল তাঁর যৌবনদিনের প[illegible] তীরের দিনগুলি। স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে তিনি বল[illegible] লাগলেন, "আমি সাঁতার কাটতে খুব ভালবাস[illegible] মাঝ-পদ্মায় কখন যে বোট থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব[illegible] নিজেও জানতুম না। পুরনো মাঝি-মাল্লারা আমার [illegible] চোখের চেহারা দেখে টের পেত; ডিঙি নিয়ে তৈরি থা[illegible] তারা। যতক্ষণ দম থাকত মাথা তুলতুম না, শরীর [illegible] হয়ে এলিয়ে এলে একটা হাত বাড়িয়ে দিতুম জ[illegible] ওপরে, মাঝিরা তৎপরতার সঙ্গে এসে আমাকে ডি[illegible] তুলে নিত। এই ছিল আমার দৈনন্দিন খেলা—সর্ব[illegible] খেলা, কি বল? ডুবে যে কেন যাই নি আজও [illegible] ভাবি, ওই মাঝি-মাল্লাদের দয়াতেই।" [আত্মস্মৃ[illegible] পৃ° ১৯৯-২০০]।

সেদিন ঘণ্টা দুই সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের [illegible] ছিলেন। সাহিত্য কিংবা সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে এ[illegible] কথা রবীন্দ্রনাথ উত্থাপন করেন নি। কবির মন স[illegible]

কান্ত সম্পর্কে যতই অপ্রসন্ন থাক, তাঁর অভিজাতসুলভ আতিথেয়তার বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হয় নি। কোন অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপনমাত্র না করে তিনি সাক্ষাৎকারকে মধুর ও সুন্দর করে তুললেন। নিজের অতীত জীবনের অনেক গল্প বললেন। সজনীকান্ত লিখছেন, শরতের মেঘের মত হালকা মনে প্রসন্ন চিত্তে তিনি ঘরে ফিরে এলেন। এ সাক্ষাৎকারের মধ্যে অপূর্বত্ব বা অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না, কিন্তু ওরই মধ্যে সজনীকান্ত দূরবিসর্পিত নূতন পথের সন্ধান পেলেন। হেমন্তবালা দেবীর উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হল।

চার

এই সাক্ষাৎকারের মাস তিনেক পরের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথকে লেখা হেমন্তবালা দেবীর চিঠির বিষয় ছিল বিচিত্র। যা তাঁর মনে হত তাই তিনি চিঠিতে লিখতেন। গুরুতর জীবনজিজ্ঞাসা থেকে কন্যা বাসন্তীর সঙ্গে ছেলেমানুষী মান-অভিমান, আব্দর-আব্দার পর্যন্ত। প্রতিদিন তাঁর আশেপাশে দুঃখের বা কৌতুকের যা কিছু ঘটছে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকত তাঁর চিঠিতে। শনিবারের চিঠির আপিসে কোন্ কোন্ সাহিত্যিক আসতেন, কি তাঁরা করতেন তারও বিস্তৃত বিবরণ থাকত। প্রতিবেশী সজনীকান্তের পারিবারিক খবরও কবিকে অনেক শুনতে হত। যায় চাল-ডাল-নুন-তেলের কথাও। হেমন্তবালার এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাহিনী ও বর্ণনা অনুক্ষণ-ব্যস্ত কবিদাদার পক্ষে যে সর্বদা প্রীতিপ্রদ হত তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এই ভাবেই জননী তাঁর স্নেহভাজন পুত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিত্তের প্রাতিকূল্য ধীরে ধীরে দূরীভূত করার সজ্ঞান ও সচেতন প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৩৩৯ সালের ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিকে তাঁকে লেখা কবির চিঠিগুলি থেকে সজনীকান্ত-প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করলেই রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারা যাবে।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ (২৮ ? ভাদ্র ১৩৩৯)-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

"তুমি তোমার প্রতিবেশী সজনীকান্ত সম্বন্ধে লিখেচ। আমি চেষ্টা করি মনকে তার সম্বন্ধে সহজ করে রাখি। কারো প্রতি মনের মধ্যে বিরোধ জমিয়ে রাখতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি—আমি জানি সেটা আত্মাবমাননা। কিন্তু মানুষের অহমিকা প্রবল, সেখানে নিরন্তর আঘাত লাগ্‌লে মনকে শান্ত রাখা কঠিন, সেইজন্যে এই সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ থেকে মনকে সরিয়ে রেখে দিই। যেটা যথার্থ ক্ষোভের বিষয় সেটা এই যে, আমার দেশে আমার নিন্দার ব্যবসায়ে জীবিকা ভাল চলে; বুঝতে পারি আমার সম্বন্ধে তীব্র বিদ্বেষ কতদূর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আমার দেশে। আমার প্রতি আঘাত, আমাকে অবমাননা দেশের লোককে কতই কম বেদনা দেয়। তা যদি না হোত তাহলে আমার বিরুদ্ধে নিন্দার পণ্য এত লাভজনক হোত না। এটাকে জেনে নিয়ে শান্তভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। আমাকে আঘাত করা দেশের লোকের পক্ষে এত নির্মম ভাবে সহজ হয়েচে সেটা হয়তো আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। আমি সত্যরক্ষার দিকে দৃষ্টি করেচি লোকের মন রক্ষার দিকে নয়! বিধাতা আমাকে যত প্রশ্রয় (?) দিয়েচেন এমন অতি অল্প লোককেই দিয়েচেন, অতএব আমার পক্ষে নালিশ শোভা পায় না। এসব কথার আলোচনা ভালো নয়, এতে আত্মলাঘব ঘটে।"

৪ঠা আশ্বিন ১৩৩৯, কবি লিখছেন :

"সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে তোমাদের মেলামেশা আছে বলে আমি বিরক্তি বোধ করি এমন সন্দেহমাত্র আমার পক্ষে অগৌরবের কথা। তোমার পূর্ব চিঠিতে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজনা দেখেই মনে করেছিলুম, আমার সম্বন্ধে লোকের অকারণ দ্রোহভাব পূর্বেও বারম্বার দেখেছি আবার বুঝি তারই লক্ষণ দেখা গেল সেই কথাই বলেছিলুম। আমার বন্ধু * * সজনীকান্তেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু এমন কি আমার দৃঢ় বিশ্বাস শনিবারের চিঠিকে তিনি আমার বিরুদ্ধে গোপনে উত্তেজিত করতে সহায়তা করেন। ও তাতে আনন্দ বোধও করে থাকেন। সে জন্যে আমি যদি * * র সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করতুম—তাহলে তার চেয়ে লজ্জার কথা আমার পক্ষে কিছু হতে পারত না। * *র সমাজ মতের সঙ্গে আমার বিরোধ থাকাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে আমি হিন্দুসমাজের শত্রু অতএব কঠিন শাস্তির যোগ্য—অতএব সেই শাস্তির ব্যবস্থা করা তিনি কর্তব্য বলেই মনে করেন। শাস্তির

প্রণালী ও রুচি সম্বন্ধে মানুষের স্বভাব ও শিক্ষা দায়িক—সে সম্বন্ধেও আমার আদর্শের সঙ্গে তাঁদের মিল না থাকতে পারে কিন্তু তাই নিয়ে যদি আমি বিবাদ করতে পারি তবে সেইটেই যথার্থ গ্লানির বিষয় হোতো। সজনীকান্ত কল্পনা করচেন তাঁর লেখনী দেশের লোকের মনে আমার বিরুদ্ধে স্থায়ী অবজ্ঞা সৃষ্টি করতে পারে। যদি তা যথার্থ সম্ভব হয় তবে সেটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। বুঝে রাখা ভালো আমার দেশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি। সেটাতে আমার যথার্থ কোনো লাঘবতা নেই। আমার রচনায় যদি কোনো গুণ থাকে সেটা সজনীকান্ত বা আর কারো মতামতের উপর নির্ভর করে না সেটা আমি নিশ্চিত জেনে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। একথাও আমি নিশ্চিত জানি যে বলাকা পূরবী প্রভৃতি আমার আধুনিক রচনা সজনীকান্ত যে সত্যই ভালোবাসেন না তা নয়—তিনি যে চক্রান্তের মধ্যে আছেন তাতে সহজ মনে আমার এখনকার কিছুই ভালো লাগবার আন্তরিক স্বাধীনতা নেই। আমি তা নিয়ে যদি রাগারাগি করি তবে সেইটেই আমার শাস্তি।"

১লা অক্টোবর ১৯৩২ (১৫ ? আশ্বিন ১৩৩৯)-এর চিঠিতে আছে :

"সজনীকান্তের পরিবারের সঙ্গে তোমাদের সখ্য হয়েছে বলে তুমি যখন আমার অপ্রীতি কল্পনা করেছিলে, তখন বলেছিলেম, আমার মনের এমন বিকার যদি হোত তাহলে লজ্জিত হতুম। আমি কখনো বলিনে যে বিনা কারণে বিনা আমন্ত্রণে অতিশয় ঔদার্যের গরিমা দেখাবার জন্যে তার বাড়িতে হঠাৎ গিয়ে পড়বার জন্যে আমার ব্যগ্রতা আছে। যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে সে আমাকে নিমন্ত্রণ করত তবে নিশ্চয় যেতুম—না করলেও অকস্মাৎ তার ওখানে না যাওয়াকে যদি তুমি আমার দুর্বলতা বল তবে নিঃসন্দেহ স্বীকার করব সে দুর্বলতা আমার আছে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তাদের সম্প্রীতি ঘটেচে বলে তোমাদের প্রতি বিমুখ হব সে দুর্বলতা আমার নেই। পূর্বটা আছে বলেই এটাও আমার থাকা উচিত ছিল এই যদি তোমার মত হয় তাহলে তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না এর বেশি আর কি বলব।"

৪ কার্তিক ১৩৩৯-এর চিঠিতে কবি লিখছেন :

"সজনীকান্ত যদি আমাকে চিঠি লিখতে চান নির্ভয়ে লিখতে বোলো। আমি কখনো তাঁকে অসম্মান করব না। যাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল বা মনের মিল নেই তাঁদের সঙ্গে সেই অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক কারণ-বশত আমার ব্যবহারকে কলুষিত করতে আমি অক্ষম। অনেক সময় দেখতে পাই আমার সঙ্গে সৌহার্দ্যের অভাব অহৈতুক। আমার অবাধ দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও তা দূর হয় না। যেহেতু আমি অতিমানব নই সেইজন্যে সেটা আমাকে বেদনা দেয় কিন্তু তাই বলে আমিও বেদনা দিয়ে তার শোধ নিতে গ্লানি বোধ করি। দৈবাৎ কখনো যদি আত্মবিস্মৃত হই তবে লজ্জা পাই।"

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা অনেক পরের আরেক-খানা চিঠির অংশ সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে উদ্ধার করেছেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"হঠাৎ খবর পেলুম আমাদের বংশের কোন লোক সজনীকান্তকে নিন্দা করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছে। কিছু দিন আগে সজনীকান্ত…পত্রে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে আমার কাছ থেকে লেখা চাইবার জন্যে আশ্রমে এসেছিলেন। আমি দিতে পারি নি, তাঁকে উপেক্ষা করা তার কারণ নয়। এই অনুরোধ নিয়ে তাঁর ভাষায় ও ব্যবহারে আত্মলাঘব-জনক কিছুই প্রকাশ পায় নি। লেখার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ জানান নি এমন সম্পাদক অল্পই আছেন, তার দ্বারা তাঁরা আমাকে সম্মান করেচেন কিন্তু আত্ম-সম্মানের হানি করেচেন এমন কথা বলা অসঙ্গত। যা হোক আমাকে জড়িত করে এই রকম অন্যায় কুৎসাবাদের সৃষ্টি করায় আমি অত্যন্ত সংকোচ ও দুঃখ বোধ করচি।" [আত্ম-স্মৃতি-২, পৃ° ২৫০]।

রবীন্দ্রনাথের এসব চিঠিপত্র থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে হেমন্তবালা দেবী গুরুশিষ্যের বিচ্ছেদরেখা অনেকখানি লঘু করে এনেছিলেন। অনেকদিনের অস্বস্তিকর গুমোট কেটে গিয়ে এখন থেকে মিলনের সুবাতাস বইতে লাগল।

[ক্রমশঃ]

আগামী বৈশাখ ১৩৭০ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' বিবিধ রচনা ও আলোচনায় সমৃদ্ধ হইয়া 'বিবেকানন্দ সংখ্যা'রূপে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। পত্রিকার সম্পাদকীয় ও নিয়মিত বিভাগের রচনাগুলিতেও বিবেকানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। এই বিশেষ সংখ্যার দাম হইবে এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। রেজিস্ট্রি ডাকে আরও পঞ্চাশ নয়া পয়সা বেশি লাগিবে। গ্রাহকগণের কোন অতিরিক্ত মূল্য লাগিবে না। এজেন্টগণ তাঁহাদের চাহিদা পত্রপাঠ আমাদের জানাইয়া দিলে ভাল হয়। এই সংখ্যার সম্ভাব্য লেখক-তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বনফুল
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	শ্রীনির্মলকুমার বসু
শ্রীকালিদাস রায়	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন	শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	শ্রীঅনিল চক্রবর্তী
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য	শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী	শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	নারায়ণ দাশশর্মা
শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	বিক্রমাদিত্য হাজরা

... ...

চৈত্র ১৩৬৯ সংখ্যায় বহু গ্রাহকের চাঁদার মেয়াদ শেষ হইল। যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে চান তাঁহারা পুনরায় এক বৎসর অথবা ছয় মাসের টাকা অনুগ্রহ করিয়া ১৫ই মে তারিখের মধ্যে আমাদের কার্যালয়ে মনিঅর্ডার বা চেকে পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা আর গ্রাহক থাকিতে চান না তাঁহারাও পত্রযোগে জানাইয়া দিতে পারেন। চিঠি অথবা নূতন চাঁদা না পাইলে আমরা যথারীতি ভি. পি. পি.-যোগে পত্রিকা পাঠাইয়া দিব। ভি. পি. পি. ফেরত আসিলে আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ ইহা স্মরণে রাখিবেন।

চাঁদার হার: বার্ষিক বারো টাকা, ষাণ্মাসিক ছয় টাকা।
ভি পি. পি.-যোগে অতিরিক্ত ছাপ্পান্ন নয়া পয়সা।

কর্মাধ্যক্ষ
শনিবারের চিঠি
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

আকাশপথে কলিকাতা থেকে গৌহাটি

জগদীশ ভট্টাচার্য

আকাশ-শিল্পীর আঁকা
অপূর্ব-সুন্দর চিত্রশালা
এই বসুন্ধরা।—
শিশু-বিধাতার খেলাঘর॥

বহু নিয়ে ভেসে আছে
সাদা সাদা মেঘের পাহাড়।
মনে হয় রাশিরাশি
পেঁজা তুলো শূন্যে উড়ে যায়।
তারি ফাঁকে চোখে পড়ে
তন্বী-শ্যামা আমার পৃথিবী
শাশ্বতযৌবনা॥

কোথাও বা শহরের রয়েছে মডেল।
কোথাও মাঠের বুকে সবুজ গাঁয়ের ছবি আঁকা।
কালো কালো বিন্দুগুলি মানুষের প্রাণের সংকেত॥

কোথাও বা মামণির চুলের নীলচে ফিতে—
আঁকাবাঁকা নদী।
কুটিল পদ্মার বুকে পিঙ্গল বালুর চর
নকৃশা কাটা কাটা।
যেন বা উপুড়-করা সমুদ্রের বিশাল ঝিনুক,
অথবা বিরাট তিমি বালুজলে ল্যাজ উঁচু করা॥

হঠাৎ তাকিয়ে দেখ
ফসল-মাঠের জমি
মোজেইক-করা যেন সাজানো পাথর।
সবুজে হরিতে মিলে কী বিচিত্র রঙের বাহার।
ফ্রেমে-বাঁধা ল্যাণ্ডস্কেপ অবনীন্দ্র ঠাকুরের আঁকা॥

সমতল মাঠগুলি নিমেষে হারিয়ে যায়
ঘননীল অরণ্যের বুকে।
শুরু হয় সানুমান পর্বতের চড়াই উৎরাই।
গারো পাহাড়ের মাথা
কাফ্রীর চুলের মত
কুঞ্চিত মসৃণ।
যেন বা অগুনতি হাতী দল বেঁধে চলেছে কোথায়—
তাদের পিঠের মতো
ধূম্রবর্ণ আসামের অসংখ্য পাহাড়।
চলার পথের দড়ি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে তাদের ;
কোথাও শিখরে চড়ে
দেখেছে নগাধিরাজ দেবতাত্মা নয়,
গিরিশৃঙ্গ মানুষেরি নির্ভীক নিবাস॥

তারো ঊর্ধ্বে
পনেরো হাজার ফুট শূন্যপথ পরিক্রমা করে
মধ্যবিংশ শতাব্দীর নবমেঘদূত॥

নিঃসীম আকাশচারী মানবচেতনা
মহাশূন্যে পাখা মেলে হয়েছে উধাও।
পৃথিবীর মহাকর্ষ গেছে পার হয়ে।
চন্দ্রলোকে যাবে এক দিন ;
মঙ্গলে অথবা শুক্রে
তৈরি হবে নতুন নিবাস
সেই গ্রহান্তরচারী মানুষের চোখে
তন্বী শ্যামা শাশ্বতযৌবনা
এ পৃথিবী
নবরূপে হবে অপরূপা॥

ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমান
চৈত্র সংক্রান্তি ১৩৬৯।

রম্যাণি বীক্ষ্য

উত্তর-ভারত পর্ব

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এক

দিল্লীতে হিমালয়ের কথা শুনেছিলুম মামার কাছে। বলেছিলেন, আজকের আনন্দ লোকে কাল ভুলে যায়। গভীর দুঃখও ভোলে মানুষ। তবে তার জন্যে সময় লাগে। কিন্তু হিমালয় ভোলা যায় না একবার দেখলে। এক সন্ন্যাসী একবার বলেছিলেন—জন্মান্তরেও তার স্মৃতি জেগে থাকে, আকর্ষণ করে চুম্বকের মত। ভগবান কোথায়? কে দেখেছে ভগবান? হিমালয়ের টানেই তো মানুষ সন্ন্যাসী হয়। নয়তো এই ঘোর বস্তুবাদের দিনেও এত সন্ন্যাসী কেন হিমালয়ের বুকে! এখানে ত্যাগ কোথায়? প্রাণ ভরে এখানে সবাই সৌন্দর্য ভোগ করছে।

এই নগাধিরাজ হিমালয় এ দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত উত্তর-ভারতকে মহামহিমান্বিত করে আছে। কিন্তু এই দেবতাত্মাকে দেখবার সৌভাগ্য আমার আজও হয় নি। সমগ্র দক্ষিণ-ভারত দেখেছি, দেখেছি দ্রাবিড় দেশ। কালিন্দীর তীরে তীর্থ ও জনপদ দেখেছি। তারপর রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র। উৎকলও দেখা হল। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে আজও পৌঁছতে পারি নি। এ ভারি বিস্ময়ের কথা।

মনোরঞ্জন বলে: এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সবচেয়ে কাছের জিনিসই আমরা সবচেয়ে কম জানি।

কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। ছুটি পেলে বাঙালী বাংলার বাইরে যায় বেড়াতে। ভারতের সর্বত্র যাঁরা গেছেন, তাঁরাও হয়তো গৌড়-পাণ্ডুয়া দেখেন নি, দেখেন নি বিষ্ণুপুর ও মুর্শিদাবাদ। নবদ্বীপ বা তারকেশ্বর কজন দেখেছেন? নিজের বাড়ির বর্ণনাই কি সকলে দিতে পারেন!

এক বন্ধু একটি মজার গল্প বলেছিল। এক চাকরির পরীক্ষায় তাকে নিজের ঘড়ির ডায়ালটি আঁকতে বলা হয়েছিল না দেখে। এমন বিপদে সে নাকি আগে কখনও পড়ে নি। কী রকম অক্ষরে এক দুই তিন লেখা, তাই তার মনে পড়ছিল না, তারপর কোন্ অক্ষর আছে, আর কোন্টা নেই। শেষ পর্যন্ত ভুল হয়ে গেল চার লিখতে। চারটে দাঁড়ি দিয়ে যে চার লিখতে হয়, ভুল করে তা সে প্রথম জানল। অথচ এই ঘড়িই সে প্রতিদিন কত বার করে দেখে, তার হিসেব সে দিতে পারবে না।

মনোরঞ্জনের হিমালয় দেখার প্রস্তাবে আমি সহজেই রাজী হয়েছিলুম। পদব্রজে কেদার-বদরি আমরা যাব না, গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীও নয়। হিমালয় পার হয়ে মানস সরোবর ও কৈলাস অভিযানের বাসনাও আমাদের নেই। আমরা হরিদ্বার যাব। আর হৃষীকেশে লছমনঝুলা পার হয়ে আমরা হিমালয়ের পায়ে প্রণাম জানিয়ে আসব।

মনোরঞ্জন বলেছিল, ২রা আশ্বিন তিথ্যমৃতযোগ যাত্রাশুভ, পূজার দেরি আছে, গাড়িতে ভিড় হবার আগেই বাড়িতে ফিরে আসতে পারব।

এই আশা নিয়েই আমি বেরিয়েছিলুম। এবং অলক্ষ্যে আমার বিধাতা হেসেছিলেন। হরিদ্বারে যে আমার যাত্রা শেষ হবে না, এবং পর্বতে ও উপত্যকায় যে আমার যাত্রা দীর্ঘতর হবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। হয়তো আমি রাজী হতুম না, নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেও হয়তো ফিরে আসতুম। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, এ মানুষের নিমন্ত্রণ নয়, হিমালয় আমাকে আহ্বান করছে, টানছে আমাকে।

মামা বললেন, হিমালয় বড় খামখেয়ালি। যারা মোটরে বা ট্রেনে চেপে পাহাড় দেখতে আসে, পাহাড় দেখেই তারা ফিরে যায়। হিমালয় তাদের কাছে ধরা

দেয় না। যারা বন্ধুর দুর্গম বন্ধুর পথে পায়ে হেঁটে চলে দিনের পর দিন, ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রমে হয় কাতর, হিমালয় তাদের কাছে প্রতিদিন ধরা দেয় নানা রূপে, নানা মায়ায় ভুলিয়ে তাদের দুর্গমতর পথে টেনে নিয়ে যায়, আত্মার সম্বন্ধ হয় প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গাযমুনার উৎস দেখবার পর আমিও হিমালয়কে ভালবেসেছিলুম। বাড়ি ফিরে আসার পরও হিমালয় আমাকে টানত। মনে হত, একটা সুন্দর অজগর সাপ তার প্রবল নিঃশ্বাস দিয়ে আমাকে টানছে। রাক্ষসী হিমালয়, তাড়কার মত কুৎসিত নয়, উর্বশীর মত মোহিনী।

মামার এই বিশেষণগুলি নিয়ে আমরা সমালোচনা করি নি। যেভাবেই হোক, হিমালয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বুঝেছিলুম যে তুষার-মৌলি গিরিশৃঙ্গেই হিমালয়ের সৌন্দর্য নেই সীমাবদ্ধ, বন্ধুর দুর্গম পথ যখন আদিম অরণ্যে আর বিস্তীর্ণ হিমবাহে যাবে হারিয়ে, হিমালয় প্রকাশিত হবে নূতনতর রূপে। সে রূপ দেখতে আমরা যাচ্ছি না। সে সময় নেই, সে সুযোগ এখনও আসে নি। কোনদিন সে সুযোগ আসবে কিনা, তাও আজ জানি না।

আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম মনোরঞ্জনের ভ্রমণের বাসনা দেখে। যে লোক অফিস আর বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারে না, তার কাছ থেকে দেশ ভ্রমণের প্রস্তাব আমি আশা করি নি। প্রথমেই আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলুম। মনোরঞ্জন নিজেও জানত যে সত্য কথা না বললে আমার সন্দেহ যাবে না। তাই খানিকটা দ্বিধা নিয়ে জানিয়েছিল: দরকার আছে।

দরকার হরিদ্বারে!

মনোরঞ্জন হেসে বলেছিল: ভয় নেই, হর কি পৌড়িতে স্নানের জন্যে যাচ্ছি না, স্বর্গদ্বারে আশ্রম খুঁজতেও না। কাশীতে ভৃগুর সন্ধান পেয়েছি।

তাহলে হরিদ্বারে কেন?

এ প্রশ্ন তোমার সঙ্গত। যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি কখনও কাশীতে কখনও হরিদ্বারে থাকেন।

তবে কি কাশীতে দেখা হয়ে গেলে হরিদ্বারে আর যাবে না?

তোমার ভাবনা নেই। তোমার সঙ্গে সর্বত্র যেতে আমি প্রস্তুত আছি।

উত্তরে আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

মনোরঞ্জন মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল: কেন, পছন্দ হল না?

বললুম: দুজনের দৃষ্টি দু দিকে, আনন্দের ব্যাপারে কিছু ব্যাঘাত হবে বইকি।

মনোরঞ্জন অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর গম্ভীর ভাবে বলল: বুঝেছি।

কী বুঝেছ?

যা বোঝবার, তাই বুঝেছি।

তবু শুনি।

মনোরঞ্জন আরও কিছু গাম্ভীর্য সঞ্চয় করে বলল:

তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান,
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

আমি চকিতে তার দিকে চেয়ে বললুম: মানে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনোরঞ্জন বলল: সেরকম সঙ্গী আমি নই।

ট্রেনের কামরায় আলো তেমন উজ্জ্বল নয় মনোরঞ্জনের মুখে আমি কোন বেদনার ছায়া দেখতে পেলুম না, কৌতুকও দেখলুম না। ইচ্ছে করেই যেন সে তার মুখ ঘুরিয়ে রইল।

জানলার বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে আছে আদিগন্ত আর লোহার চাকার ঘটঘট শব্দ উঠছে অবিশ্রান্ত ভাবে কত গ্রাম কত প্রান্তর পেরিয়ে ট্রেন সামনে ছুটে চলেছে কিন্তু মন আমার এগোল না। দুরন্ত অতীতে আমি যে হারিয়ে গেলুম।

সে বুঝি বছর দু-তিন আগের ঘটনা। মনোরঞ্জ তখন জ্যোতিষ চর্চা করত না, সাময়িকপত্রেও লিখত সাপ্তাহিক ফল। বরং সেবারে পূজার সময় আম দেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে পড়ে পরিহাস করেছি পরিহাসের কারণও ছিল। পয়সার অভাবে আমা ভ্রমণের বাসনাটা বাতিল করতে হয়েছিল।

অফিস যেদিন ছুটি হল, চারটে কুড়ির লোকা সেদিন ধরতে পারি নি। সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসেছি মাদ্রাজ মেল দেখতে। রায় সাহেব অঘোর গোস্বা সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয়ে গেল। বছর কয়েক আ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যখন তাঁর টালিগঞ্জের বাড়ি

দখা করতে গিয়েছিলুম আমাকে চিনতে পারেন নি। মামার মা তাঁর পাতানো বোন ছিলেন। সেই সম্বন্ধে মামাবাবু। নিজের বোনকেই লোকে আজকাল ভুলে যাচ্ছে, তায় পাতানো বোন। আর গরীবকে চেনাও তা বিপদের কথা।

সেই মামা আমাকে এমন ভিড়ের ভিতর চিনলেন! তাঁরা বিপদে পড়েছিলেন, তাঁদের চাকর গিয়েছিল হারিয়ে। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে রামেশ্বরে যাবার সাহস তিনি পাচ্ছিলেন না।

মামী বললেন, বাবা, রামেশ্বরের নামে যাত্রা করে বেরিয়েছি, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পার না গোপাল?

মামা আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। বড় অসহায় মনে হল তাঁকে। জানলার ভিতর মামীর চোখ দুটো দেখলুম, ছলছল করছে বেদনায়। আর দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁদের মেয়ে স্বাতি উত্তরের প্রতীক্ষায় আছে বড় বড় চোখ মেলে।

আমি জাত-বাউণ্ডুলে। বাইরের আকাশ আমাকে টানে। সেই টানে ঘরে আজও মন বসল না। ভাববার সময় ছিল না। দরজা দিয়ে ঠেলে মামাকে তুলে দিয়ে আমি চলতি ট্রেনে উঠে পড়েছিলুম।

তারপর একদিন-দুদিন নয়, দীর্ঘদিন একসঙ্গে ভ্রমণ করেছি। মাদ্রাজ থেকে মহাবল্লীপুর, কাঞ্চীপুর থেকে ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা থেকে ধনুস্কোডি, রামেশ্বর থেকে কন্যাকুমারী। এই পরিবারের সঙ্গে শুধু পরিচয় হয় নি, সম্বন্ধ অন্তরঙ্গ হয়েছে। দেশে ফিরে আমাকে অনুগ্রহ করতে চেয়েছিলেন, প্রত্যাখ্যান করে আমি তাঁকে আঘাত করেছি। স্বাতিকে বলেছিলুম এই দিনগুলো আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল—

বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মুরতি।

স্বাতি এ কথার প্রতিবাদ করেছিল কঠোর ভাষায়, বলেছিল, ভুল। এ হচ্ছে দুর্বলের মনোভাব। আঙুর খেতে না পেয়ে তাকে টক ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা।

মনে মনে আমি তার এ ভর্ৎসনা মেনে নিয়েছিলুম। মনোরঞ্জন আজ আমাকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিল। সমবেদনা জানাল, না পরিহাস করল, আমি তা বুঝতে পারলুম না।

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটছে।

দুই

অমৃতসর মেলে আমরা বারাণসী যাচ্ছি। তৃতীয় শ্রেণীর বাঙ্কের উপর বিছানা বিছিয়ে নীচে আমরা গল্প করছিলুম। মনোরঞ্জন বলল: ঘুমলে নাকি?

তার প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। বললুম: না।

ঘুম পেলে উপরে উঠ।

ঘুম না পেলে?

গল্প করা চলতে পারে।

তবে তাই কর।

মনোরঞ্জন ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর বলল: তোমার কালিন্দী পর্ব ভ্রমণকাহিনী হয় নি, উত্তর-ভারতের কথাও তাতে সম্পূর্ণ নয়।

ক্রুটী স্বীকার করি।

এবারে কি ভাগীরথী পর্ব লিখবে?

উত্তর-ভারতের গঙ্গাকে ভাগীরথী বলে না। ভাগীরথী বাংলার গঙ্গা। বাংলা সম্বন্ধে যদি কোনদিন লিখতে পারি তার নাম দেব ভাগীরথী পর্ব।

তবে?

উত্তর প্রদেশ ও বিহারের বৃত্তান্ত উত্তর-ভারত পর্বেই লিপিবদ্ধ হোক।

মনোরঞ্জন তার ঝোলা থেকে টাইম টেবল বার করল। খামের ভিতর একখানা মানচিত্র আছে। চোখের সামনে সেটি মেলে ধরবার সময় বলল: কালিন্দী পর্বটি তোমাকে নূতন করে লিখতে হবে।

বললুম: তথাস্তু।

মনোরঞ্জন মন দিয়ে মানচিত্রটি দেখছিল। বলে উঠল: অন্য কোন গাড়িতে উঠলে আমরা গঙ্গার উপর দিয়ে যেতে পারতুম।

তেমন কোন গাড়িতে উঠলে রাঁচীও পৌঁছনো যায়।

তুমি তামাশা করছ, অথচ আমি তোমার জন্যেই এই কথা ভাবছি।

কী রকম?

কদিন আগে তুমি উৎকল পর্ব শেষ করলে, এইবারে তোমার উত্তর-ভারত পর্ব হবে। অথচ আমরা গোটা বিহারটা ডিঙিয়ে উত্তর প্রদেশে গিয়ে নামছি। বিহারের কথা না লিখলে তোমার কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে।

সত্যি কথা।

বিহারের সম্বন্ধে কতটুকু জানি ভাবতে গিয়ে কয়েকটি শহরের কথা মনে পড়ল। একবার এক বন্ধুর মোটরে চেপে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলুম। বন্ধু দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার, কাজের জন্যে সরকারী গাড়ি পেয়েছিল একখানা। সেই গাড়িতে শুধু দামোদর ভ্যালি নয়, হাজারিবাগ থেকে রাঁচী পর্যন্ত দেখিয়ে দিয়েছিল।

মনোরঞ্জন বলল: গয়া ও বুদ্ধগয়ার কথা আমি তোমাকে বলতে পারব।

বললুম: রাজগির নালন্দা আমরা দেখে এসেছি।

মনোরঞ্জন গম্ভীরভাবে বলল: বাকিটা টুকে মেরে দিয়ো।

হেসে উত্তর দিলুম: চমৎকার পরামর্শ।

মনোরঞ্জন বলল: হাসলে কেন!

ভ্রমণ-কাহিনী কেউ না দেখে লেখে!

লেখে না মানে! এইতো সেদিন আমাদের অধ্যাপক হাতে ভ্রমণ-কাহিনী নিয়ে বেড়িয়ে এল। তার কাছেই শুনবে কী নাস্তানাবুদ হয়েছে। বইয়ে দেখেছে রাস্তার ধারে ধর্মশালা, বাস থেকে নেমে শোনে পাঁচ মাইল হাঁটতে হবে। মালপত্র নিয়ে তার বিপদ বোঝ।

কার কথা বিশ্বাস করবে?

অধ্যাপক কেন মিথ্যা কথা বলবে!

লেখকেরই বা লাভ কী!

বই লিখে নামও হল, পয়সাও এল।

বললুম: তাহলে তো বলতে হয়, অধ্যাপকেরও পাণ্ডিত্য দেখানো হল।

অসহিষ্ণুভাবে মনোরঞ্জন কোন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললুম: একটা অনুরোধ তোমাকে জানাব। কারও সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে গেলে নিজে দেখে-শুনেই করতেই হয়, অন্যের মন্তব্য শুনে নয়। নিজের বুদ্ধিতে ডুবলেও শান্তি আছে।

মনোরঞ্জন এ কথার উত্তর দিল না। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নীরবে বসে রইল।

লোকালের মত মেল ট্রেন প্রতি স্টেশনে থামে না। মনে হয় কোন স্টেশনেই বুঝি থামবে না। এই গাড়ির ধ্বনিতে একটা অবিশ্রাম চলার ছন্দ আছে। আবহাওয়ায় একটা ঘরছাড়া বৈরাগীর মেজাজ। কেন জানি না মনোরঞ্জনের মত আজ আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারছিলুম না, বারেবারেই আমি অতীতে ফিরে যাচ্ছিলুম। কিছুদিন পূর্বেও আমার কোন অতীত ছিল না। সম্প্রতি এই শব্দটি আমার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এগিয়ে চলার বাসনা আমার অতীতের কাঁটা তাে হোঁচট খেয়ে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। একদা যে স্মৃতি সুখে ছিল তাই এখন বেদনাদায়ক হয়েছে। কিন্তু এর জ কি আমি দায়ী?

কন্যাকুমারী থেকে আমরা সোজা ফিরি নি ফিরেছিলুম মহীশূর হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ভিতর দিয়ে ব্যাঙ্গালোরের ওয়েটিং রুমে স্বাতির সঙ্গে যে গল্প হয়েছি তাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আমি বলেছিলুম, এর মনের আয়নায় আর একটা মনের ছায়া একব পড়েছিল। মন টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও সে ছ কোনদিন মুছে যাবে না।

কেন?

এই নিয়ম। এই লোহা-লক্কড় ধোঁয়া ধুলো ইঞ্জিনের শব্দের ভেতর আমার কথাটা হয়তো বে শোনাবে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় লালবাগে কিংবা বৃন্দ গার্ডেনে তা মনে হবে না। ফাঁকি থাকলে তো থাকবে!

তোমার কথা আজ হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে।

বলেছিলুম, সহজভাবে বললে তুমি লজ্জা পাবে।

পাব না।

সেই লজ্জাতেই তো তুমি আমার সঙ্গে আসছিলে

আমি লজ্জাবতী লতা নই যে তোমার কথ বুজে যাব।

তবে কি আমি ছুঁলে তুমি পাপড়ি মেলবে ?

সে উত্তাপ কি তোমার আছে ?

বলেছিলুম : আগুনের উত্তাপে হলকা লাগে। দেহ ঝলসে যায়। পাপড়ি মেলার উত্তাপের জন্যে তার সারা রাত্রির সাধনা।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কবিতা লেখ না কেন গোপালদা ?

বলেছিলুম, তোমার বিয়ের পরে লিখব।

অতদিন অপেক্ষা করে থাকবে ?

তার বিয়ের কথা আমি মামীর কাছে শুনেছিলুম। বললুম, অঘ্রাণের আর দেরি নেই। জামাকাপড়ও তো কেনা হয়ে গেল।

স্বাতি হেসেছিল। আমি গভীর ভাবে তাকিয়েও সেই হাসির অর্থ খুঁজে পাই নি। কন্যাকুমারীর সমুদ্র-বেলায় স্বাতি আমাকে বলেছিল, দেশে ফিরে গিয়ে আমাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু যাকে করতে হবে, তাকে আমি মানুষ ভাবি না।

আমি দৃষ্টি দিয়ে আমার প্রশ্ন জানিয়েছিলুম।

স্বাতি বলেছিল, লোকটা আট বছর বিলেতে কাটিয়েছে। মনুষ্যত্ব বিকিয়ে সাহেবিয়ানা এনেছে সেখান থেকে। তার সহধর্মিণীর প্রয়োজন নেই, আছে বান্ধবীর। আর সে প্রয়োজনটাও নিতান্ত জৈব।

সহসা আমার মনে হয়েছিল যে তার বিয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করি নি। তাই বলেছিলুম তেপান্তর পেরবার গল্প : কার্তিকের মত রাজপুত্তুর পক্ষীরাজে চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এল। প্রাসাদের অলিন্দ থেকে রাজকন্যা তাকে দেখছিল। বলে উঠল, রাজপুত্তুরের যে খোঁড়া পা। পক্ষীরাজের পিঠ থেকে নামিয়ে দিলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। রাজবৈদ্য দেখে বললেন সর্বনাশ। পায়ে যে কুষ্ঠ হয়েছে। নীচে থেকে পচছে।

আর্তস্বরে স্বাতি বলে উঠেছিল, কী বলছ এ সব ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বলেছিলুম, উলটো ধার থেকে একটা জোয়ান আসছে চাষাড়ে গোছের, শক্ত-সমর্থ সবল চেহারার পুরুষ। দুপদাপ করে নেমে পড়ল তেপান্তরের মাঠে। কী করে পার হবে! তার পক্ষীরাজ কোথায়! নাই বা থাকল। সুস্থ দেহ আছে, সাহসী মনও আছে। তেপান্তরের মাঠ কি সে পেরুতে পারবে না! দেখতে পেয়ে রাজা বলল, শাবাশ! রানী বলল, ওর একটা পক্ষীরাজ নেই? আর রাজকন্যা কী বলল বল তো ?

লোকটা বেদম বোকা।

ঠিক বলেছ। রাজকন্যা অমন করে চেয়ে আছে অথচ তাকে দেখতেই পেল না!

রাজকন্যার যেন খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই!

তবে বোকা বললে কেন ?

অমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটার পাশ দিয়ে গেল, খোঁড়ার কাছ থেকে ঘোড়াটা কেড়ে নিতে পারল না!

রাজপুত্রের সেপাই শান্ত্রী যে বল্লম হাতে পাহারা দিচ্ছে। হাত বাড়ালেই পেট ফুটো করে দেবে।

স্বাতি বলেছিল, হুঁ।

সেই সঙ্গেই যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেয়েছিলুম। স্বাতি কি দুঃখ পেল! হেসে বলেছিলুম, লোকটা বড়ই বেরসিক। রাজকন্যার দিকে একবারটি তার চাওয়া উচিত ছিল। কী বল ?

চায় নি আবার! খানিকটা এগিয়েই সুড়সুড় করে ফিরে আসবে।

তারপরেই বলেছিল, আমার কী মনে হচ্ছে জান ? তুমি আজ কোন নেশা করেছ।

বলেছিলুম, আজ নয়, দিন কয়েক আগে। মনে হচ্ছে, এ নেশার ঘোর সহজে কাটবে না।

সত্যিই কাটে নি। এ ঘটনার পরে অনেকদিন তো গত হল। কিন্তু স্বাতিকে তো ভুলতে পারলুম না। পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, নেশার ঘোরও তত বাড়ছে। এর পরিণাম কী হবে জানি না।

তিন

গমগম করে আমাদের গাড়ি একটা পুল পেরতেই মনোরঞ্জন উঠে দাঁড়াল। বলল : ওদের একবার দেখে আসি।

কাদের ?

উত্তরে মনোরঞ্জন একটু হেসে গেল।

হাওড়াতেই আমার মনে হয়েছিল যে তার পরিচিত কোন পরিবার এই ট্রেনে চলেছেন। আমি যখন প্ল্যাটফর্মের ঠেলাগাড়িতে বই দেখছিলুম, সে তখন অন্যত্র ব্যস্ত ছিল, কোথায় তা লক্ষ্য করি নি। কোন কৌতুহল হয় নি। ট্রেন এমন জিনিস যে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খুঁজে বেড়ালে দু-একজন চেনা মানুষ বেরিয়ে পড়েই। লোকাল ট্রেনে তো চেনা মানুষেরই ভিড়! যে ট্রেনে প্রতিদিন যাতায়াত করি, সে ট্রেনের প্রায় সবাইকেই চেনা মনে হয়। আমি ভেবেছিলুম, মনোরঞ্জন এই রকমের কোন চেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করছে।

কিন্তু এইবারে তার হাসি দেখে সন্দেহ হল। এই হাসিতে যেন খানিকটা কৌতুকের আভাস আছে।

দূর থেকে মনোরঞ্জন বলল: আমার জায়গাটুকু যেন বেদখল না হয়।

আমার হাতের বইখানা তার আসনে রেখে বললুম: হবে না।

গাড়ির গতি মন্থর হচ্ছিল। এইবারে বর্ধমানে এসে দাঁড়াবে। এখানে-সেখানে অনেকেই দাঁড়িয়েছে। অনেকেই গাড়ি থেকে নামবে। কেউ খাবার কিনতে, কেউ জল নিতে, কেউ বা একটু খোলা হাওয়ার লোভে। সঙ্গে যাদের খাবার আছে, তারা এইখানেই খাবে। কেউ কাপড়ের পুঁটলি খুলছে, কেউ টিফিন কেরিয়ার। এক-একজনের সঙ্গে এক-এক রকমের জলের বোতল। সঙ্গের জলটুকু শেষ করে নতুন জল ভরে নিতে হবে। গাড়ি থামবার আগেই ভিতরটা বেশ তৎপর হয়ে উঠল।

বর্ধমান স্টেশনটি জংসন হয়েও ঠিক জংসন নয়। এখান থেকে কোন নতুন লাইন নেই। কলকাতা থেকে যে দু জোড়া লাইন বেরিয়েছে তার এক জোড়া ব্যাণ্ডেল হয়ে আসে, আর এক জোড়া সরাসরি আসে দানকুনির উপর দিয়ে। এরা শক্তিগড়ে মিলিত হয়ে বর্ধমানে প্রবেশ করে। তারপরে একত্রে যায় খানা জংসন। সেখান থেকে একটা লাইন বোলপুর শান্তিনিকেতনের উপর দিয়ে সাহেবগঞ্জে যাবে। যাত্রীদের কেউ গঙ্গা পার হয়ে মণিহারি ঘাট থেকে যাবে কাটিহার। পূর্বে উত্তর বাংলা ও আসাম, পশ্চিমে বিস্তৃত উত্তর বিহার।

কোন যাত্রী সাহেবগঞ্জে নামবে না, যাবে ভাগলপুর মুঙ্গের কিংবা জামালপুর। ভাগলপুরে যাবার জন্য বলাইদা অনেকবার বলেছেন, একবার যেতে হবে। এই ভাগলপুরের সঙ্গে উপেনদার স্মৃতিও জড়িয়ে আছে। বিভূতিভূষণ ও শরৎচন্দ্রের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

জামালপুরে ইঞ্জিনের কারখানা। তার পাশ দিয়ে ট্রেন কিউলে যাবে। কিন্তু আমরা এই পথে যাব না। আমাদের ট্রেন আসানসোল থেকে চিত্তরঞ্জনের উপর দিয়ে কিউল যাবে। বিহারের অনেকগুলি হাওয়া বদলের জায়গা এই লাইনে—রূপনারায়ণপুর, মিহিজাম্, জামতারা, শিমুলতলা, মধুপুর থেকে গিরিডি, আর জসিডি থেকে দেওঘর। দেওঘরেই বৈদ্যনাথধাম। একসময় এই সব স্থান পূজার সময় জমজমাট হয়ে উঠত। বাংলা দেশে তখন পূজার ছুটি ছিল। স্কুল কলেজ ছুটি, হাইকোর্ট ছুটি। মাস্টার প্রফেসার উকিল ব্যারিস্টার ডাক্তার সবাই বেরতেন হাওয়া বদলে। একাধিক স্বাস্থ্যকর স্থানে বড়লোকদের বাড়ি থাকত; দিনে দিনে এই সমাজটা বদলে গেল। দেখতে দেখতে চোখের সামনেই এই পরিবর্তন হল। মানুষের আজ ছুটি বলে কিছু নেই, সময় নেই দু দণ্ড আরাম করবার। পয়সার জন্য সারাক্ষণ মানুষ ছুটোছুটি করছে। অনেকে বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন, অনেকে ক্রেতার অভাবে তা পারেন নি। একদা যে বাড়িগুলো ফুলে ফলে ছবির মত দেখাত, এখন তা পোড়ো বাড়ির মত পড়ে আছে।

এবারে আমরা অন্ধকারের ভিতর এই সব স্টেশন পার হয়ে যাব। দেখা কিছুই যাবে না। এইসব স্টেশনের খানিকটা পরিচয় পেয়েছিলুম কিছুদিন আগে। সেবারে তুফান এক্সপ্রেসে এলাহাবাদ যাচ্ছিলুম। দিল্লী থেকে মামা ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বলেছিলেন, এলাহাবাদের জ্ঞানশঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মামার কাছে যমুনোত্তরীর গল্প শুনে কালিন্দী যমুনার নামেই ভয় জন্মে গেল। সে গল্প আমি ভুলি নি, ভোলা সম্ভব নয়।

অজন্তার সেই নদীর ধারে বসে আমার মনে হয়েছিল যে জীবনের প্রথম নাটক আমার শেষ হয়ে গেল, নায়কের ভূমিকায় আর আমাকে অভিনয় করতে হবে না। অজন্তার

অপূর্ব গুহাগুলি দেখবার পর স্বাতির পাশাপাশি পা ফেলে আমি নদীর ধারে নেমে এসেছিলুম। বালির উপর, উপলের উপর। খুঁজে খুঁজে স্বাতি একটা বড় পাথর বার করল, একটুখানি ছায়াও। নিজে বসে আমাকে তার পাশে ডাকল। সঙ্কীর্ণ স্থান, তবু নিমন্ত্রণ অন্তরঙ্গ। আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে নিজের হাতটাই দিল বাড়িয়ে। আর দ্বিধা চলে না, আমি এসে ঘেঁষে বসলুম।

দু-একটা মানুষকে দেখা যাচ্ছিল কাছে ও দূরে। কে লক্ষ্য করছে আর কে করছে না, তা আমরা দেখলুম না। পৃথিবীতে আমাদেরও একটা অধিকার আছে, সে অধিকার থেকে নিজেদের কেন বঞ্চিত করব!

আজ আমাদের সামনে সমুদ্র নেই, ঢেউ নেই, নেই তার দুরন্ত গর্জন। উদার আকাশ থেকে চতুর্দশীর চাঁদ জ্যোৎস্নার মদ ঢেলে দিচ্ছে না। তবু আমার মন হয়েছে থমথমে, যেন নেশা ধরেছে। ইচ্ছে হয়েছে বলি: 'আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।'

কিন্তু এই আমিটা কে! গরিব বাংলার একটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ছেলে বই তো নয়! আমার সমাজ কী, আমার পরিচয় কী, কিসের আমার মর্যাদা! কত দেশ তো ঘুরে ঘুরে দেখলুম, কত কীর্তি, কত নরনারী। এ সব আমার দেশের ভেবে বুক হয়তো ভরে উঠেছে, কিন্তু আমাকে নিয়ে বুক ভরেছে কার! আমার মূল্য যে মাপা হয়েছে চাঁদির টাকায়, চাঁদের জ্যোৎস্নায় নয়। এত সহজে আমার নেশা হলে চলবে কেন। নিজেকে আমি সামলে নিলুম।

মামা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অনুগ্রহ আমি গ্রহণ করব না। স্বাতি যে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল তা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন না। আর এ কথাও জানতেন না যে কারও অনুগ্রহেই আমার লোভ নেই। তাঁর ধারণা, লোভ গরিবেরই, অভাব মানুষকে লোভী করে। তাঁর প্রচুর আছে বলেই তিনি এই রকম ভাবেন। যদি কম থাকত, তাহলে স্পষ্ট বুঝতে পারতেন যে অভাবে লোভ বাড়ে না, লোভ বাড়ে পেয়ে পেয়ে। যে যত পায়, সে তত চায়। গরিব ভিখারী ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু একটা টাকার জন্য কারও পকেটে হাত দেয় না। একটা পয়সার জন্য হাত পেতে বসে থাকে। যার পকেটে টাকা আছে, সেই অন্যের পকেটে হাত দেয়, সিঁধ কাটে পরের ঘরে। ভিখিরীর ধর্মজ্ঞান আছে, আত্মসম্মান আছে গরিবের। সংসারকে তারা দেখে বৈরাগীর চোখে।

এই সত্যটুকু জানা থাকলে মামা আমাকে জ্ঞানশঙ্কর-বাবুর পোষ্যপুত্র হবার জন্য আমন্ত্রণ করতেন না। স্বাতি আমাকে চিনেছিল, তাই সে বিশ্বাস করে নি আমি সম্মত হব। সম্মত হয়েছি শুনে আন্তরিক আঘাত পেয়েছিল। শ্রদ্ধা হারিয়েছিল মানুষের উপর। এলাহাবাদের সমস্ত ঘটনা তাকে অকপটে শুনিয়েও তার মন ফিরে পাই নি। একদিন যাকে সে ভালবেসেছিল, সে লোক যেন মরে গেছে। সাবিত্রীর মত সেই মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের সাধনা করতে তার আপত্তি ছিল না। কিন্তু অনেক দুঃখে সে বুঝেছে যে সে দেহে আর রক্তমাংস নেই, একটা শুকনো কঙ্কাল শুধু পড়ে আছে। তাতে প্রাণ সঞ্চার হলে সে নিজেই সারাক্ষণ ভয় পাবে। আমিও বুঝতে পেরেছিলুম যে বৈষয়িক জগতে লাভ করতে গিয়ে স্বাতিকে আমি হারিয়েছি। সে তো স্বেচ্ছায় তার মন আমার কাছে বাঁধা রেখেছিল।

দিল্লী থেকে ফেরার পথে এলাহাবাদে আমি নামি নি। সে ভয়ে না বেদনায়, তা বলতে পারব না। ভয়ও হয়েছিল। মামা বলেছিলেন, যমুনা হলেন সূর্যের কন্যা ও যমের ভগিনী। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সংসারে কারও নিস্তার নেই। মূর্খ জ্ঞানশঙ্কর সেই যমুনাকে ফাঁকি দিয়েছে। তাই তার বংশ রক্ষা হচ্ছে না। গোটাকয়েক ছেলেমেয়ে জন্মেই মারা গেল, সন্তানই হল না দ্বিতীয় পক্ষের। ভাইয়ের ছেলে পোষ্য নিল, সে বাঁচল না। উপযুক্ত সংসারী ছেলে আনল বোনের কাছে চেয়ে, অসুখ নেই বিসুখ নেই টুপ করে একদিন মরে গেল। এবারে তোমাকে ডেকেছে।

কাজেই আমারও ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে আছে।

না না, ভয় নয়। ভয়ের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম। দিল্লী ছাড়বার আগে স্বাতি যেন কী বলেছিল। তাতেই আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিলুম। তা না হলে এলাহাবাদের টিকিট কেটেও তো সেখানে

সত্যিই তাকে আগে দেখি নি। কিন্তু আমার অন্য কথা মনে হয়েছিল। এই প্রশ্ন দিয়ে মামী আমাকে জানিয়ে দিলেন যে স্বাতি আমার বোন। হোক সে দু পুরুষ আগে পাতানো সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধকেই আমার শ্রদ্ধা করতে হবে। তখনও স্বাতির দিকে আমি ভাল করে তাকাই নি, তখনও তার সঙ্গে আমার একটাও কথা হয় নি।

কিন্তু স্বাতি বড় সপ্রতিভ। বলেছিল, আমি কিন্তু গোপালদাকে দেখেছি আগে। নতুন কলেজে উঠে কনভোকেশন দেখতে এসেছি। মনে পড়ছে, গোপালদা এম. এ.-র ডিগ্রী নিলেন গোড়ার দিকে।

তারপরে মামী স্বাতির বিবাহের খবর দিয়েছিলেন। অগ্রহায়ণে দিন স্থির হয়েছে। তার জন্যে শাড়িও কিনতে চেয়েছিলেন মাদ্রাজে। কিন্তু স্বাতির পছন্দ হয় নি। নিজের জন্যে একখানা কিনে বলেছিলেন, এই শাড়ি পরে জামাই বরণ করব।

আজও তিনি জামাই বরণ করতে পারেন নি। সে সম্বন্ধ কেন ভেঙে গেল তা জানি না, জানবার কোন চেষ্টাও করি নি। কিন্তু দিল্লীর রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে কেন বিয়ে হল না, সে কথা আমি জানি। অনায়াসে অনুমান করছি। মামা নিজেও বুঝেছিলেন। বলেছিলেন, যদি বাপ তাকে আসতে দেয়, তবেই আসবে। তার নিজের আগ্রহে আমার সন্দেহ আছে।

আবু পাহাড়ে রাণার আসবার কথা ছিল। কিন্তু সে আসে নি। নিশ্চয়ই সে তার পিতার অনুমতি পায় নি। এই পিতৃভক্তির প্রশংসা যে যুগে ছিল, সে যুগ আজ গত হয়েছে। আজ স্বেচ্ছাচারিতার যুগ। ছেলে মেয়ে বড় হতে না হতেই পিতামাতাকে অগ্রাহ্য করে। ভাবে, তাদের জন্মের জন্য যারা দায়ী, তাদের লালনের নৈতিক দায়িত্বও সেই পিতামাতার। স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে স্বাধীন মতবাদ পোষণ করবে, তাদের স্বাধীন চলায় হস্তক্ষেপ করবার কারও কোন অধিকার নেই। ভাল না লাগে চুপ করে থাক, খারাপ লাগে তো পাঠিয়ে দাও বোর্ডিঙে। খরচ বন্ধ করলে চলবে না।

রাণার মত ছেলে আজও আছে। সংসার তাদের গাধা বলে। বাপকে অগ্রাহ্য করে স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখালে তা চলত না। তখন এই সংসারই তার ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করত।

স্বাতির বিবাহের জন্য মামার কোন তাড়া দেখি নি। স্বাতির মত তিনিও নির্বিকার আছেন। এবং মামীর উদ্বেগ বোধ হয় মনে মনে উপভোগ করেন।

কিন্তু আমি কেন এ সব কথা ভাবছি! এ সব তো আমার ভাববার কথা নয়! স্বাতি আমার ভ্রমণের সঙ্গী ছিল দক্ষিণ-ভারতে, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রও একসঙ্গে ভ্রমণ করেছি, পুণা দেখেছি, বোম্বাই থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এসেছি নিজের দেশে।

স্বাতিরা নিশ্চয়ই এ গাড়িতে যাচ্ছে না। আমার কথা জানতে পারলে কি তারা আড়ালে লুকিয়ে থাকত! কেন থাকত! এ সমস্তই মনোরঞ্জনের ছল। আমার দুর্বলতার কথা জানে বলেই উপহাস করার সাহস রাখে। স্বাতির কথা আমি আর ভাবব না। তার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার শেষ হয়ে গেছে। ভালই হয়েছে। যে স্মৃতি জেগে আছে, তা তিক্ত নয়। অন্তর ক্ষতবিক্ষত করে যে রক্ত ঝরে তার যন্ত্রণাও যে মধুর।

পাঁচ

জানলায় মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কোলাহল শুনে যখন ঘুম ভাঙল, তখনও প্রভাত হয় নি। অন্ধকার স্বচ্ছ হয়েছে মাত্র। ট্রেন পাটনা জংসনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছে।

মনোরঞ্জন অঘোরে ঘুমচ্ছিল, তাকে না জানিয়ে আমি এক ভাঁড় চা সংগ্রহ করে নিলুম। গাড়িতে আরও দু-একজন উঠে বসেছিলেন, তাঁরাও চা নিলেন। তারপর ঘণ্টা পড়ল, গার্ডের হুইসিল বাজল, গাড়ি ছাড়ল। আবার যাত্রা।

এই যাত্রার শেষ নেই। জীবন থামে না বলেই যাত্রাও বিরামহীন। ভাবনা তার সঙ্গে সঙ্গেই ছোটে। আলোকিত স্টেশন পেরিয়ে গাড়ি যখন মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়ল, উত্তরের আকাশ তখনও ভাস্বর হয় নি। আমার মনে হল, এই দেশের ইতিহাসও এমনি অস্পষ্ট হয়ে আছে।

ভারতে আর্য সভ্যতা এসেছে পশ্চিম থেকে পূর্বে। সে আজ খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগের কথা।

আর্যরা খাইবার ও মালাকান্দ গিরিদ্বার পেরিয়ে গোমল ও কুরম নদীর উপত্যকা দিয়ে ভারতের গান্ধার ও সপ্তসিন্ধবে এসে আধিপত্য বিস্তার করেছে। পশ্চিমে সুলেমান পর্বতমালা উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ উত্তর-পূর্বে হিমালয় আর দক্ষিণে সরস্বতী নদী। পুরুষপুর ও তক্ষশীলায় আর্য সভ্যতা দানা বেঁধেছে। আনুমানিক বারোশো খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আর্যরা সরস্বতী নদী পেরিয়ে ব্রহ্মাবর্তে পৌছলেন। নূতন ঘাঁটি হল কুরুক্ষেত্র ও থানেশ্বর। মধ্যদেশ জয় করতে আরও দু-তিনশো বছর সময় লাগল। কুরু শূরসেন কোশল দেশ। নূতন করে উপনিবেশ গড়ে উঠল ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর মথুরা শ্রাবস্তী কনৌজ অযোধ্যা কৌশাম্বী প্রয়াগ ও কাশীতে। চতুর্থ অবস্থা ধরা যেতে পারে আটশো থেকে তিনশো খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। পশ্চিমে সুরাষ্ট্র ও অবন্তী এল হাতে। বিদিশা ও উজ্জয়িনী নূতন আলোকে উজ্জ্বল হল। পূর্বদেশে বিদেহ মগধ অঙ্গ ও বঙ্গ। প্রধান উপনিবেশ হল বৈশালী রাজগৃহ ও চম্পায়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে আমাদের পুরাণ গ্রন্থে এই হিসাবের সমর্থন নেই। কলির কেটেছে মাত্র পাঁচ বছর, তার আগে দ্বাপর যুগ ছিল বারো লক্ষ ছিয়ানব্বুই হাজার বছর। ত্রেতায় রামায়ণের কাল, ভারতীয় সভ্যতা তখন উন্নতির শিখরে পৌছেছে। তার আগে সত্য যুগে সভ্যতার সম্পূর্ণ স্ফুরণ হয়েছিল। তবে কি কৃষ্ণ আর্য ছিলেন না, না রামচন্দ্র ছিলেন অনার্য রাজা! পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসের বিরোধ এইখানে। তবে শাস্ত্র প্রমাণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যে সময় আমরা নির্ধারণ করেছি, ইতিহাসেও তাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া চলে। পরীক্ষিতের জন্ম থেকে খ্রীষ্টের জন্ম পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ হল চোদ্দশো তিরিশ। পরীক্ষিতের জন্ম হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়। কাজেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল হল ১৪৩০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ প্রায় চৌত্রিশশো বছর আগে। এই কথা মেনে নিলে ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের বিরোধ অনেক পরিমাণে মিটে যায়। অন্ততঃ মহাভারতের যুগে আর্যদের প্রাধান্য দেখা যায়। অনার্যদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের গল্পও মিলে যায়। প্রশ্ন থাকে সত্য ও ত্রেতাযুগ নিয়ে। এই সব যুগের পরিমাণ দীর্ঘ না হয়ে স্বল্প হলে কি রামায়ণের কালকেও ঐতিহাসিক বলে মেনে নেওয়া যায় না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতের কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি ধ্বংস হয়ে গেল। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় ও তাঁর বংশধরেরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন ইন্দ্রপ্রস্থে, কিন্তু সম্রাট বলে সম্মান তাঁরা পান নি। নানা পুরাণে সমসাময়িক ভারতের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখি যে দেশ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কোশল বিদেহ কাশী প্রয়াগ কুরু পাঞ্চাল বিরাট রাজ্য মথুরা মগধ কনৌজ অবন্তী উজ্জয়িনী মালব পুণ্ড্রবর্ধন কামরূপ উৎকল কলিঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ। দক্ষিণ-ভারতেও ছিল অনেক রাজ্য।

ইতিহাসে আমরা দুটি রাজ্য পরাক্রান্ত দেখি। কোশল ও মগধ। মগধ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম জানি না, তবে মহাভারতের যুগে বৃহদ্রথ ছিলেন মগধের রাজা। গিরিব্রজে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বিখ্যাত জরাসন্ধ তাঁর পুত্র। মধ্যম পাণ্ডব ভীম তাঁকে বধ করেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের মৃত্যু হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে। তারপর মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন সহদেব নন্দন সোমাধি, মতান্তরে সোমাপি। জরাসন্ধ-বংশের শেষ রাজা রিপুঞ্জয় বা অরিঞ্জয়। তাঁরই মন্ত্রী ছিল সুনীক বা মুনিক। রাজাকে হত্যা করে এই মন্ত্রী নিজের পুত্র প্রদ্যোৎকে সিংহাসনে বসান। শিশুনাগ বোধ হয় এই রাজারই নাম। জরাসন্ধের পর আটাশ-জন রাজার পর শিশুনাগ বংশের দশজন রাজা রাজত্ব করেন। তারপর মহাপদ্ম নন্দ। ইনি আমাদের ঐতিসাসিক রাজা, মেগাস্থিনিসের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাঁর পরিচয় আছে।

শিশুনাগ বংশেই জন্ম হয়েছিল বিম্বিসার ও অজাত শত্রুর। বিম্বিসারের নাম এক এক পুরাণে এক এক রকম। বিষ্ণুপুরাণে তিনি বিম্মসার, বায়ুপুরাণে বিবিসার, অন্যত্র তিনি বিন্দুসার নামে পরিচিত। যে শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে, বিম্বিসার তার পঞ্চম রাজা। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী কোশল দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পুত্র অজাত শত্রুর জন্ম হয়েছিল অন্য রানীর গর্ভে। বার্ধক্যে বিম্বিসার অজাত শত্রুর হাতে রাজ্যভার দিয়েছিলেন।

রাজা বিম্বিসারের আমলেই মগধের রাজধানী গিরিব্রজ থেকে রাজগৃহে স্থানান্তরিত হয়। মিথিলার বিদেহ ক্ষত্রিয়রা তখন বারে বারে মগধ আক্রমণ করত। তাদের আক্রমণ থেকে রাজধানী রক্ষার জন্যেই বিম্বিসার রাজগৃহে যান। গঙ্গা ও হিরণ্যবাহু নদীর সঙ্গমে এই নগরকে তিনি দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত করেছিলেন। হিরণ্যবাহু শোন নদের প্রাচীন নাম। গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমে এখন কোন রাজগৃহ নেই। যে রাজগীরকে আমরা রাজগৃহ মনে করি, সে গিরিব্রজেরই গায়ে লাগা, গঙ্গা ও শোন থেকে তার দূরত্ব অনেক। একদা এই সঙ্গমের নিকটে ছিল পাটলি গ্রাম। বুদ্ধদেব যখন শেষ বার রাজগৃহ থেকে বৈশালীতে যান, তখন তিনি অজাত শত্রুর দুই মন্ত্রীকে এই পাটলি গ্রামে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণে ব্যস্ত থাকতে দেখেন। ব্রিজিবাসী উজ্জিহানদের আক্রমণ রোধেই এই দুর্গ নির্মিত হচ্ছিল। বুদ্ধদেব সব দেখে-শুনে বলেছিলেন, এই গ্রাম একদিন সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হবে।

এই গল্প আছে বৌদ্ধ গ্রন্থে। এর থেকেই মনে হয় বর্তমান রাজগীরই প্রাচীন রাজগৃহ, আর অজাত শত্রুর পুত্র উদয়ের আমলে পাটলি গ্রাম হয়েছিল পাটলি-পুত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক রাজাই আজ ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গেছেন। কিন্তু বিম্বিসার ও অজাত শত্রুর নাম ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। এঁরা বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন, এবং তাঁরই সংস্পর্শে এসে অমর হয়েছেন। বিম্বিসার শাক্ত ছিলেন এবং পরিণত বয়সে বুদ্ধের নিকট দীক্ষিত হন। বুদ্ধ যখন রাজগৃহের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন, তখন রাজা তাঁর কাছে গিয়ে বলেছিলেন :

> পরম প্রমুদিতোঽস্মি দর্শনাত্তে
> অবচিমু চ মাগধরাজ বোধিসত্ত্বম্।
> ভবহি মম সহায় সর্বরাজ্যং
> অনুভব দাস্যে প্রভুত্বং ভুঙ্‌ক্ষ কামান্॥

কিন্তু রাজা হয়ে অজাত শত্রু

> পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
> মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে।

ইতিহাস বলে তিনি নিজের পিতা বিম্বিসারকেও হত্যা করেছিলেন। আর স্বামীর শোকে কোশল দেবী প্রাণত্যাগ করেছিলেন। এই সংবাদ যখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের কানে পৌঁছল, তিনি ক্ষেপে গেলেন। বোনের বিবাহে কাশীরাজ্যের একখানি গ্রাম তিনি যৌতুক দিয়েছিলেন, প্রথমে সেইখানিই তিনি অধিকার করে নিলেন। তারপর যুদ্ধ বাধল। দীর্ঘদিন যুদ্ধের পরে শান্তি স্থাপিত হয়। প্রসেনজিৎ অজাত শত্রুর সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়ে সেই গ্রামখানি ফিরিয়ে দেন গৌরব বাড়ল মগধের।

পরবর্তীকালে অজাত শত্রুকে আমরা অন্যরূপে দেখি। কুশীনগরে বুদ্ধের নির্বাণের পর অজাত শত্রুর দূত এসে বলছে : ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়। আমিও তাঁর শরীরের এক অংশের অধিকারী। আমি তাঁর অস্থির এক অংশ পেলে তার উপর মহাস্তূপ নির্মাণ করব।

অজাত শত্রুর পর এই বংশের চারজন রাজা পর পর রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় রাজা উদয় মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করলেন। আর শেষ দুজন রাজা নন্দীবর্ধন ও মহানন্দী মগধের সীমা আরও বাড়িয়ে-ছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ্যরক্ষা করতে পারেন নি। শূদ্ররাজা মহাপদ্ম নন্দ এসে মগধ জয় করেন। নন্দ ঐতিহাসিক রাজা, অথচ নানা পুরাণে তাঁর উল্লেখ আছে। নন্দবংশের আটজন রাজা পর পর রাজত্ব করে-ছিলেন এবং গ্রীক রাজা আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাঁদের শেষ রাজা মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ছয়

আকাশ স্বচ্ছ হয়ে গেছে। সূর্যোদয়ের আর বেশি বিলম্ব নেই। মনোরঞ্জন মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল : সকাল হয়েছে ?

গাড়ির ভিতর বাতি জ্বলছে, বাইরে থেকে যে আলো আসছে, তা তেমন প্রখর নয়। কাজেই মনোরঞ্জনের প্রশ্নটা খুব অসঙ্গত নয়। বললুম : বোধ হয় হয়েছে।

বোধ হয় কেন ?

সকলের সকাল এখনও হয় নি, যাঁদের হয়েছে তাঁরা উঠে বসেছেন।

ও।—বলে মনোরঞ্জন উঠে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল : বাথরুমটা খালি আছে তো?

বোধ হয় আছে।

আবার বোধ হয়!

ওই দরজার দিকে চেয়ে ছিলুম না বলেই বোধ হয় বলছি।

ও।

মনোরঞ্জন ঝোলা থেকে তার সরঞ্জাম বার করল, তারপর বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

আমার মনে পড়ল অনেকদিন আগের কথা। কয়েকজন বন্ধুতে মিলে আমরা রাজগীরে এসেছিলুম। তখন বক্তিয়ারপুরে নেমে ন্যারো গেজের ট্রেন ধরতে হত। পাটনা পৌঁছবার আগেই বক্তিয়ারপুর। দিল্লী এক্সপ্রেস আসত ভোরবেলায়। বড় লাইনের বড় গাড়ি থেকে নেমে সরু লাইনের খেলনার মত গাড়ি। সময়মত গাড়ি ছাড়ে না, কর্মীদের মধ্যে মহা অসন্তোষ। যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এই রেল পরিচালনা করে, তারা সময়মত মাইনে দেয় না, দিতে পারে না। নানা অসুবিধার জন্য জনসাধারণ মোটর-বাসে যাচ্ছে। ভাল রাস্তা ও যান-বাহনের ব্যবস্থা আছে বলে যাত্রীরা মোটরেই যাতায়াত করছে। শুধু মাল বহনের জন্য ট্রেন, আর কিছু যাত্রী আমাদের মত। শুনলুম, বেশিদিন এ রেল চলবে না, বড় লাইন বসবে, তখন আর কারও কষ্ট থাকবে না।

একসময় আমাদের ট্রেন ছাড়ল। দেশলায়ের বাক্সের মত ছোট কামরায় বসে মনে হল, এ এক নূতন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। জানলা দিয়ে বাতাস আসে, সেই বাতাসে ভ্রমণবিলাসী মন অসুবিধার কথা ভুলে যায়। বিহার-শরিফে আমরা নামব না, নালন্দাতেও না, আমরা সোজা রাজগীর যাব। ফেরার পথে নালন্দা দেখব, সময় থাকলে বিহার। বিহার এ লাইনের সবচেয়ে বড় শহর, কিন্তু আমাদের মত যাত্রীর কাছে তার আকর্ষণ সামান্য। জৈনরা তীর্থ করতে আসে, পাওয়াপুরীর বাস ছাড়ে বিহার থেকেই।

বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগীরের দূরত্ব মাত্র তেত্রিশ মাইল। ছোট লাইনের ট্রেনে গড়িয়ে গড়িয়ে যেতেও আড়াই ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। নালন্দায় আমরা নামলুম না, পরের স্টেশন সিলাও-এর খাজা খেয়ে রাজগীর এসে নামলুম। এইখানেই এ লাইনের শেষ।

আমরা স্টেশনের নিকটে একটা হোটেলে উঠেছিলুম। বড় দীনদরিদ্র অবস্থা, কিন্তু যত্নের ত্রুটি ছিল না। স্নান সেরে খেয়ে নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম। ছুটি মাত্র দুটি দিন, রবিবারের পর সোমবার সরস্বতী পূজা। আজ রবিবার আমরা রাজগীর দেখব, কাল নালন্দা। সময় পেলে পাওয়াপুরী দেখে বক্তিয়ারপুরে সন্ধ্যার ট্রেন ধরব। মঙ্গলবার সকালে অফিস আছে।

এইখানে জানতে পারলুম যে গিরিব্রজ নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন ব্রহ্মার চতুর্থ পুত্র বসু। রামায়ণের আদি কাণ্ডে আছে যে বিশ্বামিত্র যখন রাম লক্ষ্মণকে মিথিলায় নিয়ে যাচ্ছেন, তখন এই কথা বলেছিলেন। বসুর নামে এই নগরীর অপর নাম ছিল বসুমতী, আর পাঁচটি পর্বতের মাঝখান দিয়ে সুমাগধী নদী প্রবাহিত হত।

মহাভারতের সভাপর্বেও গিরিব্রজের উল্লেখ আছে, বনপর্বে আছে রাজগৃহ নাম। অনেকে তাই মনে করেন যে এ দুটি এক জায়গা নয়। হিউএন চাঙ এর একটা সদুত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে পর্বতবেষ্টিত নগরীর নাম গিরিব্রজ, আর তার উত্তরের নূতন নগরের নাম রাজগৃহ।

মহাভারতে গিরিব্রজের আরও নাম আছে। রাজা বৃহদ্রথের নামে বৃহদ্রথপুর, এবং তারই উত্তর-পুরুষ কুশাগ্রের নামে কুশাগ্রপুর। হিউএন চাঙ এই নগরের চারিদিকে এক রকমের সুগন্ধ ঘাস দেখতে পেয়ে বলে-ছিলেন যে এই ঘাস থেকেই কুশাগ্রপুর নাম হয়েছে। এখনও এই অঞ্চল থেকেই ঘাস সংগ্রহ হয়।

প্রথমে আমরা বাজারের দিকে গিয়ে একখানা এক্কা গাড়ি সংগ্রহ করলুম। সেই এক্কাওয়ালাই আমাদের গাইড হবে। চুক্তি হল যে সবকিছু দেখিয়ে আমাদের হোটেলে ফিরিয়ে আনবে।

রাজগীরে প্রধান রাস্তা একটিই। উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। রেলের স্টেশন ছাড়িয়ে খানিকটা এগোতেই বাঁ হাতে একটা সুন্দর

মন্দির দেখতে পেলুম। একেবারে রাস্তার ধারে নয়, অল্প উঁচুতে। এক্কাওয়ালা বলল : এটি বার্মিজ মন্দির। বছর পঁয়ত্রিশ আগে ব্রহ্মদেশের একজন বৌদ্ধ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন।

এক্কাওয়ালা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল, বলল : ডান দিকে দেখুন।

ডানদিকে অজাত শত্রুর রাজধানী দেখলুম নবরাজ-গৃহ, অজাতশত্রুগড়। একটা ফলকে ইংরেজীতে পরিচয় লেখা আছে। এই মাটি ও পাথরের তিন মাইল দীর্ঘ বিরাট প্রাচীর খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বিম্বিসার কিংবা অজাত শত্রু কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

এর পর রাস্তা নীচু হয়ে নেমে গেছে, তারপর একটা পুল পেরিয়ে আবার উপরে উঠেছে। ডান হাতে যে সরু রাস্তাটা বেরিয়েছে, এক্কাওয়ালা বলল যে তারই উপর ইনস্পেকশন বাংলো ও রেস্ট হাউস। থাকার ব্যবস্থা সেখানে ভাল।

আর একটু এগিয়ে বাঁ হাতে একটা সুন্দর মন্দির দেখলুম। এক্কাওয়ালা বলল : এটি জাপানী মন্দির।

মন্দিরটি ঢালু জায়গায়, তার সামনে উঁচুতে যে ধ্বংসস্তূপ তারই নাম অজাত শত্রু স্তূপ। সরকারী ফলকে এর পরিচয় লেখা আছে। পাথরের স্তম্ভগুলি আমরা ভাল করে দেখলুম। মার্বল পাথরের মত সাদা নয়, একটু নীলাভ। এই পাথরের নাম নাকি ডলোমাইট।

আরও একটু এগিয়ে যে বিরাট বটগাছ দেখলুম, এক্কাওয়ালা তার নাম ধুনীবট বলল। বলল : পশ্চিমদিকে চেয়ে দেখুন। ইনস্পেকশন বাংলোর সামনে যে জায়গা দেখছেন, তারই নাম বেণুবন।

আমরা পাহাড়ের সন্নিকটে আসছি। এটি বিপুল পাহাড়, নাম বিপুল। এরই পাদদেশে মখদুমকুণ্ড। উপরে যে গুহা আছে, তার নাম দেবদত্ত গুহা। দেবদত্ত বুদ্ধের ভাই, পরিচয়লিপিতে লেখা আছে যে তিনি এই স্টোন হাউসে সমাধি লাভ করেছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম অব্দে।

উষ্ণ প্রস্রবণ এখানে একটি নয়। মখদুমকুণ্ডের কাছে সূর্যকুণ্ড সীতাকুণ্ড গণেশকুণ্ড। মখদুমকুণ্ডের নাম আগে ঋষ্যশৃঙ্গকুণ্ড ছিল। মখদু শাহ শরফুদ্দিন নামে এক মুসলমান সাধু এখানে বারো বৎসর বাস করেছেন। তাঁরই নামে কুণ্ডের নাম বদলেছে। নিকটে একটি মসজিদ তৈরি হয়েছে, আর মুসলমান যাত্রীদের থাকবার জন্য আছে মুসাফিরখানা।

এই পাহাড়ের মাথায় অনেকগুলি জৈন মন্দির আছে। দুটি মহাবীরের মন্দির, আদিনাথ হেমন্ত চন্দ্রপ্রভা ও সুব্রত মুনির মন্দির। একেবারে পাহাড়ের শিখরে তিরিশ ফুট উঁচু একটি ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। প্রস্তরফলকে নাকি লেখা আছে যে এইখান থেকেই মহাবীর তার জৈনধর্ম প্রথম প্রচার করেন। শুধু যে মহাবীর এখানে অনেক বর্ষা অতিবাহিত করেছেন তা নয়, বিংশতি তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রতর এটি জন্মস্থান। রাজগীর জৈনদেরও তীর্থ।

মনে পড়ছে, এক বন্ধু রহস্য করে বলেছিল, পাহাড়ের মাথায় উঠবে নাকি ?

আর একজন বলেছিল, বেশ তো, তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি, তুমি ওঠ।

আর তোমরা ?

আমরা এগিয়ে যাই, ফেরার সময় তুলে নেব।

এক্কাওয়ালা এদেশী হলেও বাংলা বোঝে। বলল : পাহাড়ে ওঠার ইচ্ছা থাকলে ভোরবেলায় বেরতে হয়। রোদে এখন কষ্ট হবে।

একটু থেমে বলল : গৃধ্রকূট পাহাড়ে তো উঠতেই হবে।

কেন ?

বুদ্ধদেবের পাহাড় আর বেশি উঁচু নয়। ও পাহাড়ে না উঠে কোন যাত্রী ফেরেন না।

এবারে আমরা ডান হাতে যে পাহাড় পেলুম, তার নাম বৈভার। এই পথটি মনে হল একটি গিরিপথ, বিপুল ও বৈভার পাহাড় যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য একটি স্বাভাবিক গিরিবর্ত্ম রচনা করে রেখেছে। এই গিরিপথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। একটি-দুটি নয়, পাঁচ-সাতটি পাহাড় একটি সমতলভূমিকে ঘিরে আছে। এক্কাওয়ালা পাহাড়ের নামগুলি আমাদের বলে দিল : একেবারে চোখের সামনে যেটা তার নাম উদয়গিরি, ডান হাতে শোনগিরি, আর রত্নগিরি বাম হাতে, বিপুল পাহাড়ের সঙ্গে তার ছেদ নেই।

এই যে একটু আগে গৃধ্রকূটের নাম করলে সেটা কোথায়?

গৃধ্রকূট কোন স্বতন্ত্র পাহাড় নয়, রত্নগিরির দক্ষিণাংশের নাম গৃধ্রকূট।

এক্কাওয়ালা আমাদের আর একটা জিনিস বলল: উদয়গিরি ও শোনগিরির মাঝখান দিয়ে রাস্তা গেছে নওয়াদার দিকে। বাণগঙ্গা বলে ওই জায়গাটাকে।

প্রায় পাঁচ বর্গমাইল বিস্তৃত এই সমতলভূমি। আজ এই ভূমি আবৃত পরিচ্ছন্ন নয়, লতাগুল্মে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। যে যুগে দুর্গ নির্মিত হত পর্বতের উপরে, নগর সুরক্ষিত হত প্রাচীর ও পরিখায়, সে যুগে এই স্থান আদর্শ নগরীর উপযুক্ত ছিল। পর্বত প্রাচীর বেষ্টিত এই নগর স্বাভাবিক কারণেই দুর্ভেদ্য ছিল। আমরা আরও বিস্মিত হয়েছিলুম আর একটা জিনিস দেখে। একটি বিরাট প্রাচীরের অবস্থান। পাহাড়গুলির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রাচীরের উচ্চতা এক মানুষের চেয়ে কম কোথাও নয়, কোথাও দুই মানুষের সমানও হবে। দৈর্ঘ্যে এই দেওয়াল মাইল পঁচিশের কম নয়। ইংরেজী নাম সাইক্লোপিয়ান ওয়াল। নগর সুরক্ষিত করবার জন্য আরও একটি দেওয়াল ছিল, তার পরিধি পাঁচ মাইল। সেটি সমতলভূমির উপর।

বাণগঙ্গায় পৌঁছে আমরা এই প্রাচীরের একটা অংশ দেখে আশ্চর্য হয়েছিলুম। প্রাচীর সেখানটায় ভেঙে পড়ে নি, এমন সুদৃঢ় আছে যে তার উপর দিয়ে যানবাহন অনায়াসে চলতে পারে।

ততক্ষণে এই অঞ্চলের সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মেছে। আমরা ঠিক করলুম যে এই দুপুর রোদে এক্কা থেকে সহজে নামব না। শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাব। নামাওঠা করব ফেরার পথে। তাই সাতধারায় নামলুম না, মণিয়ার মঠ থেকে শোনভাণ্ডারের দিকেও গেলুম না, বিম্বিসারের জেল ছাড়িয়ে গৃধ্রকূট পর্বতের পথে না গিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিলুম। শেল ইন্‌স্ক্রিপসন এরিয়াতেও না নেমে আমরা উদয়গিরি ও শোনগিরির মাঝখানের সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মে উপস্থিত হলুম। এক্কাওয়ালা বলল: এইখানে নামতে হবে, এরই নাম বাণগঙ্গা। দক্ষিণে এই পথ নওয়াদার দিকে গেছে।

স্পষ্টই বুঝতে পারছিলুম যে রাজগৃহের সীমা এইখানে শেষ হল। দূরে সেই বিরাট প্রাচীর দেখা যাচ্ছে, উদয়গিরি থেকে নেমে এসে শোনগিরির উপর উঠে গেছে। বাণগঙ্গার উপরেই ছিল দক্ষিণের দরজা। এক্কা থেকে নেমে আমরা এই অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম।

বড় শুষ্ক রুক্ষ স্থান। যে ছায়াশীতল গাছটির নীচে আমরা নামলুম, তার আশেপাশে আর কোন শ্যামল দৃশ্য নেই। প্রস্তরময় পর্বতের উপরে মধ্যাহ্নের রৌদ্র প্রকৃতিকে উপহাস করছে।

কিন্তু নয়ন মুগ্ধ হল আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে। পথের উপরে যে পুলটি দেখতে পাচ্ছিলুম, সেটি একটি নদীর উপরে। এই জলের ধারা নেমেছে শোনগিরি থেকে। পুলের নীচে দিয়ে এসেছে উদয়গিরির কোলে, তারপরে বয়ে যাচ্ছে। অনেক নীচে এই জলের ধারা, তৃণগুল্মে গাছের ছায়ায় মায়াময় স্থান। পাহাড়ের উপরে প্রাচীর দেখতে যারা উপরে উঠছিল, আমি তাদের সঙ্গ নিলুম না। আমি এই জলধারার পাশে গিয়ে বসবার জন্য নীচে পা বাড়িয়ে দিলুম।

কিন্তু না, নীচে নামবার উপায় নেই। বাধা প্রাকৃতিক নয়, বাধা সভ্যতার। এধারে যে বয়স্কা স্ত্রীলোকটি পাথরের উপর আছড়ে কাপড় কাচছিল, তাকে দেখে থামবার প্রয়োজন ছিল না। ওধারে পুলের নীচে একদল অসংবৃত মেয়ে দেখে চমকে উঠলুম। গ্রামাঞ্চলের নানা বয়সের মেয়েরা এই পথ অতিক্রম করবার সময় শীতল জলের লোভে নীচে নেমেছে। তাদের খড়কুটো কাঠের বোঝা পথের ধারে দেখতে পাচ্ছি। এক বস্ত্রের মেয়েরা কী করে স্নান করছে, তা দেখবার সাহস হল না। সভ্যতার দুর্বলতা। মন যখন অপবিত্র, তখনই ভয়। সাহস তো ধার্মিকের।

সিরসির করে হাওয়া আসছিল জলের ধার থেকে। সেই আমেজটুকু নিয়ে আমি পালিয়ে এলুম। কিন্তু বাণগঙ্গার রূপের কথা আমি ভুলব না। বাণগঙ্গা এই নদীর নাম।

দূরে একদল মহিষ চরছিল। একজন লোককেও দেখলুম সেই গাছের নীচে এসে বসেছে। কিন্তু ওরা

কোথা থেকে এসেছে তা বুঝতে পারলুম না। যতদূর দেখা যাচ্ছে তাতে লোকালয়ের চিহ্ন নেই। মানুষও নেই। সাতধারার পরেই মানুষের দেখা আর পাই নি।

পাহাড়ের উপর থেকে সঙ্গীরা নেমে এলে আমরা আবার একায় উঠলুম। একজন রাজগীর থেকে এই বাণগঙ্গার দূরত্ব অনুমান করবার চেষ্টা করল। বলল: মাইল তিনেক হবে।

কোথা থেকে ?

ওই যে, কী বলে, কুণ্ডগুলোর নাম—

একাওয়ালা বলল : সেখান থেকে সাড়ে তিন মাইল।

ফেরার পথে আধ মাইল পথ পেরিয়েই আমরা শেল ইন্‌স্‌ক্রিপসন এরিয়া পেলুম। পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটি অঙ্গন। একা থেকে নেমে আমরা ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। এই সমতল স্থানটি সম্পূর্ণ পাথরের। তার উপর নানা রকমের দাগ, রথের চাকারও গভীর চিহ্ন আছে। এই দাগগুলি কোন প্রাচীন শিলালিপি কিনা আমরা বোঝবার চেষ্টা করছিলুম। একাওয়ালা এগিয়ে এসে বলল : নানা জনে নানা রকম কথা বলে।

কী রকম ?

কেউ বলে ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ এইখানে হয়েছিল। তাঁরাই জায়গাটাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন। আবার কেউ বলে যে শোনভাণ্ডারে যে ধনরত্ন লুকনো আছে, তারই হদিস-লেখা আছে এইখানে। যে পড়তে পারবে সেই পাবে গুপ্তধন।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই লিপি এদেশে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে প্রচলিত ছিল, এবং প্রথম চার-পাঁচ শতাব্দীর লোকেরা এই লিপিই ব্যবহার করত। এ যুগে তার পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। কিছু ক্ষয়ে মুছে গেছে, কিছু যানবাহনের চলাচলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

একাওয়ালা বলল : এই যে চাকার দাগ দেখছেন, এ চাকা জরাসন্ধের রথের।

জরাসন্ধের না হলেও এ দাগ রথের চাকারই দাগ বলে মনে হচ্ছে। কাঁচা মাটির রাস্তার উপর গরুর গাড়ির চাকার দাগের মত এই চিহ্ন আজও দর্শকের কৌতূহল উদ্রেক করছে।

শেল ইন্‌স্‌ক্রিপসন কেন বলে, এ নিয়েও আমরা আলোচনা করলুম। পাথরের রঙ লালচে, কিন্তু ঝিনুকের শেলের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্যের জন্যই হয়তো এই নাম হয়েছে। এই লিপির ইংরেজী নাম শেল কিনা জানি না। Shell ইংরেজী শব্দ।

আমরা যখন গৃধ্রকূট পর্বতের দিকে অগ্রসর হলুম, তখন একাওয়ালা বলল যে বুদ্ধ-জয়ন্তীর বৎসরে নাকি অনেক বৌদ্ধযাত্রী এখানে আসতেন। তাঁদের গ্রন্থে বুঝি আছে যে এইখানে এই প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনে বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম ভিক্ষার খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। রাজা বিম্বিসারও তাঁর দর্শনের জন্য এইখানে এসে মিলিত হয়েছিলেন। আমি কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে এই কথা পড়ি নি, কিন্তু গৃধ্রকূটের সঙ্গে বুদ্ধের স্মৃতির কথা সর্বত্র পড়েছি।

রাজগিরির পাহাড়গুলির নানা শাস্ত্রে নানা নাম। মহাভারতে দেখি :

> বৈহারো বিপুলঃশৈলো বরাহ বৃষভস্তথা।
> তথৈব গিরয়শ্চৈব শুভাশ্চৈত্যক পঞ্চমা॥

বৈহার বিপুল বরাহ বৃষভ ও চৈত্যক। স্থানান্তরে অন্য নামও আছে। পালি ভাষায় ওই পাহাড়ের নাম বেভার বেপুল গিজ্‌ঝকুট পাণ্ডব ও ইসিগিলি। বর্তমানকালে এই পাহাড়গুলি বৈভাব বিপুল রত্নগিরি উদয়গিরি ও শোনগিরি নামে পরিচিত। এগুলি বোধ হয় জৈন নাম। তাদের নাকি আরও দুটি নাম আছে।

গৃধ্রকূট রত্নগিরিরই দক্ষিণের অংশ। বিপুল পাহাড় যেমন সবচেয়ে উঁচু, গৃধ্রকূট তেমনি সবচেয়ে নীচু। বিপুল পাহাড় এক হাজার ফুটের কিছু বেশী উঁচু, উপরে ওঠবার জন্য ভাল সিঁড়ি আছে। গৃধ্রকূটে ওঠবার জন্য আছে বিম্বিসার রোড। হিউএন চাঙ বলেছেন যে, রাজা বিম্বিসার এই রাস্তা তৈরি করেছিলেন বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাতে যাবার সময়। রাজার লোকেরা পাথর কেটে পথ ও সিঁড়ি তৈরি করেছে। খানিকটা উপরে উঠে যে স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়, সেইখানে তিনি রথ থেকে নেমেছিলেন, আর দ্বিতীয় স্তূপের নিকট পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁর অনুচরদের।

আমরাও ধীরে ধীরে উপরে উঠছিলুম। এক বন্ধু বলল : গৃধ্র মানে তো শকুন ?

আর একজন বলল : কূট মানে পাহাড়ের চূড়ো।

তবে কি পুরাকালে এই পাহাড়ে শুধু শকুন বসত?

আমি এ কথার উত্তর দিতে পারতুম, কিন্তু দিলুম না। পাঁচজনের কাছে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি গোপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সবজান্তা বলে লোকে নিন্দা করে না। বেশী জানা এ যুগে গুণের নয়, পাণ্ডিত্য নয় ঈর্ষার বস্তু। বেশী জানবার জন্য যে সময় উদ্যম ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়েছিল, তা অপব্যয় হয়েছে বলে লোকে মূর্খ ভাবে। ফা হিয়েনের ভ্রমণ-কাহিনীর কথা আমার মনে পড়েছিল, কিন্তু আমি তা বললুম না। ফা হিয়েন লিখেছিলেন যে মার পিশুন গৃধ্রের রূপ ধারণ করে বুদ্ধের প্রিয় সহচর আনন্দকে ভয় দেখাতে এসেছিল। আনন্দ তখন এই পর্বতের একটি গুহায় সাধনা করতেন। বুদ্ধদেব থাকতেন অন্য একটি গুহায়। তিনি আনন্দকে অভয় দেবার জন্য অলৌকিক ক্ষমতায় তাঁর একটি হাত আনন্দের কাঁধে রাখেন। এই হাত ও গৃধ্রের চিহ্ন এখনও বর্তমান বলে পর্বতের নাম গৃধ্রকূট।

উপরের এই বড় গুহাটির নাম আনন্দ গুহা। পাহাড়ের উত্তর দিকে এটি। দক্ষিণে আরও কয়েকটি গুহা আছে। এগুলি ছাড়িয়ে একেবারে উপরে উঠলে একটি প্রশস্ত চত্বর। লোকের বিশ্বাস, বুদ্ধদেব এইখানে বসে তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। এইখানে প্রাপ্ত একটি বুদ্ধের পদ্মাসন মূর্তি এখন নালন্দার জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

বাঁধানো চত্বরে বসে আমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলুম। পরম রমণীয় স্থান। নিকটে ও দূরে শুধু পর্বত, আর নীল আকাশ। মন্দ বাতাসে দেহের ক্লান্তি দ্রুত দূর হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এ তপস্যার উপযুক্ত স্থান। শুধু তপস্বীর জন্য শ্রেয় নয়, কবির জন্য প্রিয়।

একদা এই গৃধ্রকূটের দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল জীবকের আম্রবন। জীবক রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন। মগধের এই যুবক তক্ষশীলায় গিয়েছিলেন চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়নের জন্য। সে গল্প এখানে অবান্তর। এখানে তিনি তাঁর আম্রবনটি বুদ্ধকে দান করেছিলেন, এবং সেখানে একটি বিহার নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এই স্থানের নিকটেই মদ্দ কুচ্ছি, সংস্কৃত শব্দ মর্দ কুক্ষি। বিম্বিসারের রানী যখন দৈবজ্ঞের কাছে জানলেন যে তাঁর গর্ভে আছে এমন এক শিশু যে তার পিতাকে হত্যা করবে, তখন তিনি তাঁর কুক্ষি মর্দন করে সেই সন্তানকে অসময়ে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অজাত শত্রু ঠিকই জন্মেছিলেন, এবং পিতাকে হত্যা করেছিলেন। বুদ্ধের খুড়তুতো ভাই দেবদত্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে বুদ্ধকেও হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বৃদ্ধবয়সে বিম্বিসার যখন পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বুদ্ধের সেবায় মনোনিবেশ করতে চাইলেন, তখন অজাত শত্রু তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। বিম্বিসার শুধু অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁকে এমন জায়গায় কারারুদ্ধ করা হোক, যেখান থেকে প্রভুর গৃধ্রকূট পর্বত দেখা যায়। বিম্বিসারের জেল সেই কারা, যেখানে তিনি নিজে বন্দী থেকে সারাক্ষণ গৃধ্রকূট পর্বত দেখতেন। এটি নাকি জরাসন্ধেরই কারাগার ছিল। নানা দেশের রাজাদের তিনি এইখানে বন্দী করে রাখতেন।

ফা হিয়েন বলেছেন যে এখানে অম্বাপালিরও এক বাগান ছিল। সেই বাগানে এক বিহার নির্মাণ করে রাজবৈদ্য জীবক বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন অম্বাপালির পূজা গ্রহণের জন্য। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এই অঞ্চলে অশ্বজিতের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

আর একটি স্থানের বর্ণনা আছে হিউএন চাঙের বর্ণনায়। তার নাম বেণুবন। বাঁশ গাছের বন। নিকটে করণ্ড হ্রদ, বা কালন্দক নিবাপ। যে সরস্বতী নদী উষ্ণ প্রস্রবণগুলির নিকট প্রবাহিত, তার নাম ছিল তপোদা।

আড়াই হাজার বৎসর আগে বুদ্ধ আনন্দকে যে কথা বলেছিলেন, সেই কথা আমার মনে পড়ল। "ওহে আনন্দ, রাজগৃহ কী রমণীয় স্থান; তথায় গিজ্ঝকূট, গোতম, নিগ্রোধ, চোরপর্বত, বেভারগিরির পার্শ্ববর্তী সপ্তপর্ণী গুহা। ইষিগিরির পার্শ্ববর্তী সিতবন, তপোদারাম, বেণুবনে কালন্দক নিবাপ, জীবকাম্র বন, মধ্যকুচ্ছীতে মৃগারণ্য এ সমস্তই মনোহর, বড়ই সুন্দর।"

[ক্রমশঃ]

স্বর্গের শেষ ধাপে

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

দুই হাজার তের খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দিল্লীর সার্বজাতিক হোটেলে যে কক্ষের বাইরে লেখা ছিল 'রাশিয়া' তার ভেতর থেকে দুজন পুরুষ রাত প্রায় দশটার সময় দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। কথা বলতে বলতে প্রশস্ত করিডর দিয়ে গিয়ে যে কক্ষের সামনে থামল সেখানে দরজার পাশে লেখা ছিল আমেরিকা।

একজন বলল, কমরেড আমেরিকা, তাহলে আমাদের এই কথাই রইল।

আমেরিকা বলল, নিশ্চয়ই কমরেড রাশিয়া।

রাশিয়া ঘুরে দাঁড়াবার উদ্যোগ করতেই আমেরিকা চোখে একটা ইঙ্গিত তুলে মিটিমিটি হাস্যের সঙ্গে বলল, এখন ওখানেই যাচ্ছেন তো?

রাশিয়াও হেসে ফেলে বলল, কোথায় বলুন তো?

আমেরিকা বলল, না, পুরনো ঘরের কথা বলছি না, নতুন যে ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছিলেন সেখানে নিশ্চয়ই পাকাপাকি ব্যবস্থা—

ও—কি যে বলেন!—সপ্রতিভ হাস্যে রাশিয়া বলে উঠল, আপনাদের মত অত কি আর আমাদের হয়?

বলে তাড়াতাড়ি ফিরে চলল। কিছু দূর গিয়ে সমকোণে অন্য করিডর ধরে গিয়ে একটি রুদ্ধ দরজার সামনে থামল। বাইরে ফলকে লেখা অলবেনিয়া।

দরজায় তিনবার টোকা দিল রাশিয়া। একটু থামল। কোন সাড়া এল না। দরজাও খুলল না। আবার আর একটু জোরে টোকা দিল তিনবার। কিন্তু না, কোন সাড়া এল না এবারও। এক পাশে সরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রাশিয়া।

কিছুক্ষণ পরে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন মহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

রাশিয়া আগেই বলে উঠল, ও—কমরেড চীন! ভাল আছেন? আমি কমরেড অলবেনিয়ার সঙ্গে একটু কথা বলবার জন্যে অপেক্ষা করছি।

চীন গম্ভীর মুখে বলল, তা বলুন। বলে দেখুন। আমার কথা শেষ হয়েছে।

শ্রীমতী অলবেনিয়ার দিকে একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে চীন চলে গেল।

চীনের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ঢোক গিলে হজম করে নিল রাশিয়া। বলল, না, বিশেষ কোন কথা নয়। আজ গ্রেট বৃটেনে কম্যুনিস্ট সরকার গঠন হবার পরে অকম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হল। সারা দুনিয়াই যখন কম্যুনিস্ট হয়ে গেল তখন আর নিরস্ত্রীকরণে কোন বাধাই তো রইল না। কাজেই কালকের সভায় আমাদের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব সর্বসম্মতি-ক্রমে পাস হবে এটা ধরে নেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, আমরা মনে করি এর পরে পরস্পরে প্রেম ভালবাসায়ও কোন বুর্জোয়া একচেটিয়া অধিকারে শোষণ ব্যবস্থা থাকবে না।

অলবেনিয়া মুখ টিপে হাসল। মৃদু অথচ সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল, ঠিক কথাই তো। তা থাকবে কেন?

যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল এমন ভাবে রাশিয়া বলল, ভাল কথা, ওদের কাছে আপনাদের দশ কোটি টাকা সাহায্য বা ঋণ পাবার কথা শুনেছিলাম। সে চুক্তি পাকা হয়ে গেছে?

মুহূর্তের জন্যে শ্রীমতী অলবেনিয়ার মুখখানা একটু কালো হয়ে গেল। সামলে নিয়ে হেসে বলল, না হয়ে থাকলেও হবে নিশ্চয়ই। তবে শুধু ওদের কাছে কেন, এখন তো সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

রাশিয়াও হেসে বলল, অতি সুন্দর বলবার মত কথা।

কিন্তু ওই কথামত কাজ করতে বললে এখনই আপনি রাগ করবেন।

অলবেনিয়া জবাব দিল না। হাসিমুখে চুপ করে রইল।

রাশিয়া ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চলে এল। এর পর দাঁড়াল গিয়ে ভারত মার্কা দরজার সামনে। দরজা খোলা ছিল। ঢুকেই চমকে উঠল। শ্রীমতী আমেরিকানা বসবার ঘরটাতে বসে আছে।

আমেরিকানা কুঞ্চিত ভ্রূ সরল করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি তুলে বলল, আসুন। কমরেড ভারত বোধ করি ভেতরে একটু ব্যস্ত আছেন।

রাশিয়া বুঝল ব্যাপারটা। হাসি চেপে পাশের দরজার ওপর চোখ ফেলে বলল, ভারতীও নেই বুঝি ঘরে?

আমেরিকানা এবার পাল্টা মুচকি হেসে বলল, না। ওই তো 'আউট' লেখা রয়েছে। বাইরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কোথায় যেন গেল।

রাশিয়া কিছু বলবার আগেই শ্রীমতী রাশিয়ানার সঙ্গে ভারত বেরিয়ে এল।

পরিস্থিতিটাকে হালকা করে দিতে রাশিয়া সঙ্গে সঙ্গে সহাস্যে বলে উঠল, বুঝতে পারছি কারও চোখেই আজ ঘুম নেই। থাকবার কথাও নয়। নিপীড়িত মানবের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। গোটা দুনিয়া আজ কম্যুনিস্ট। দুনিয়ার মানুষ আজ মুক্ত। সাম্রাজ্যবাদ নেই, শোষণ নেই, অত্যাচার নেই। মুক্ত। গোটা পৃথিবীর মুক্ত মানুষের সমাজ আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব সত্য। ঘুম কি আর আসে আজ?

শ্রোতা তিনজনকেও আনন্দ প্রকাশের জন্যে কাঠ হাসি হাসতে হল।

ভারত বলল, তা তো বটেই। এর চেয়ে আনন্দের কথা মানুষের পক্ষে আর কি হতে পারে!

শ্রীমতী আমেরিকানা উঠে দাঁড়াতেই ভারত ব্যস্ত হয়ে ওর কাছে গিয়ে বলল, আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

আমেরিকানা চেষ্টা করেও এবার মুখের কাঠিন্য ঢাকতে পারল না। বলল, বেশ কিছুক্ষণ হল।

বা, ডাকেন নি কেন?—বলেই শ্রীমতী রাশিয়ানার দিকে তাকিয়ে একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। বলল, না, মানে ডাকলেও শুনি নি বোধ হয়।

আমেরিকানা এবার হাসল। বলল, না, তা নয়। ব্যস্ত আছেন, ডাকলে অসুবিধে হবে মনে করেই ডাকি নি।

ভারত অপ্রতিভ হাসির সঙ্গে বলল, ও। এখন বলুন? আপনারা সবাই বসুন।

রাশিয়া বলল, না, বসব না। রাত অনেক হল।

আমেরিকানা হেসে বলল, সব দেশ কম্যুনিস্ট হয়ে গেল বলে আনন্দে আমার আরও ঘুম পাচ্ছে।

বলে কোন দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল আমেরিকানা।

কিন্তু রাশিয়ানাকে নিয়ে রাশিয়া চলে যাবার একটু পরেই আবার ফিরে এল।

ভারত তখনও দুশ্চিন্তার ভ্রূকুটি মুখে নিয়ে বসবার ঘরটাতেই চুপচাপ বসে ছিল। আমেরিকানাকে দেখেই নিমেষে মুখের চেহারা বদলে সরস হাস্যে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল।

ইউরোপ মার্কা ঘরের মধ্যে তখন নাচ হচ্ছিল। শ্রীমতী চায়না কোমর দোলানো শেষ করে তাকাল ইউরোপের দিকে। ইউরোপের মুগ্ধ চোখ আর বাড়ানো হাত দেখে খিল খিল করে হেসে উঠে ঝাঁপ দিয়ে ঢলে পড়ল দুই হাতের বন্ধনে।

ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে কে যেন দরজায় বারকয়েক টোকা মারল।

শ্রীমতী চায়না হাত দিয়ে আদর করে ইউরোপের মুখ চেপে ধরল। জবাব দিতে দেবে না।

ইউরোপও জবাব দিতে চায় নি তখন।

দরজার বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাশিয়া চলে গেল।

জাপানের দরজার সামনে শ্রীমতী ভারতীর সঙ্গে ধাক্কা লাগল রাশিয়ার। ভারতী নতমুখে বেরিয়ে আসছিল। খোঁপা খোলা। কাপড় কিছুটা অগোছাল।

রাশিয়া ওকে জড়িয়ে ধরে ফেলল। হেসে বলল, পড়ে যাবেন না কি? চলুন।

কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়াল। বিপরীত দিক থেকে এসে শ্রীমতী ইউরোপা অন্য করিডরে ঢুকে গেল। একা।

ভারতীও দেখেছে। কিন্তু রাশিয়াকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওর রাগ হল। বলল, কি হল? ছেড়ে দিন—আমি যাই।

রাশিয়া দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে অপ্রতিভ হাসির সঙ্গে বলল, না না, চলুন। কোথায় যাচ্ছে তাই ভাবছিলাম।

ভারতী কিছু বলবার আগেই নিজেই আবার বলল, আর কোথায়! নিশ্চয়ই কোন প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীড়নক-দলের কারও ঘরে যাচ্ছে!

ভারতী বলল, নিশ্চয়ই তাই। ওরা নিজেরাই যখন বর্তমানে ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীল আর ভয়ানক সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের ক্রীড়নক!

রাশিয়া আর রাশিয়ানা ছুজন ছু দিক থেকে এসে প্রায় একসঙ্গেই ঘরে ঢুকল। রাশিয়া প্রথমেই সোজা জিজ্ঞেস করল, কি হল? হবে?

শ্রীমতী রাশিয়ানা মুচকি হেসে বলল, হবে। কিন্তু তোমার খবর কি? কত দিতে হবে?

রাশিয়া ভ্রূ কুঁচকে বলল, নগদ দিতে হবে কিছু। আর জিনিসপত্র।

কিন্তু কিছু মাল কিনবে তো?

রাশিয়া এবার মুচকি হেসে বলল, কিছু কিনবে।

রাশিয়ানা একটু থেমে আবার প্রশ্ন করল, আর অলবেনিয়ার ওখানে? আজও ঢুকতে পার নি বুঝি?

না।

ওদিকে শ্রীমতী আমেরিকানা বিদ্রূপের কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এসেছিল?

আমেরিকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বলল, না। বসে বসে শুধু সময়ই নষ্ট করলে। আমি জানতাম। ইউরোপকে আরবের ঘরে ঢুকতে দেখেই বুঝলাম ও আর আসতে পারবে না।

আমেরিকা বলল, কেন আর ভাবছ? আসতে পারবে না নয়, আসবে না। কিন্তু তোমার কি হল?

আমেরিকানা ছুঃখের হাসি হেসে বলল, অত ঢং আমরা পারি না। আমাদের লজ্জাসরম আছে। নতুন যৌবন দেখিয়ে দেখিয়ে গায়ে ঢলে পড়া—লজ্জায় মরি। চায়নার মত বেহায়া হতে আমরা পারব না। ইউরোপ ভদ্রলোকেরও রুচির বলিহারি যাই। ওই তো রূপ! ওখান থেকে ফিরে এসেই তো ভারতের ঘরে গেলাম।

আমেরিকা সান্ত্বনা দিয়ে বলল, বেশ করেছ। দেখা যাক।

আমেরিকানাও হতাশার ভাবটা ঝেড়ে ফেলে বলল, যাক গে। ভাল কথা, চীনের সঙ্গে রাশিয়ার সীমানার গোলমালটার কী অবস্থা কিছু খবর পেলে?

আমেরিকা হেসে বলল, ভাল। শীগগির মীমাংসা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই বলছে সবাই।

আমেরিকানা খুশী হল।

আমেরিকা ক্ষণকাল চুপ করে থেকে একটু যেন অভিযোগের সুরে বলল, কিন্তু ইউরোপ-চীনের বাণিজ্য-চুক্তিটা হয়েই গেল। সমর্থন করতে তো বাধ্যই হবে।

আমেরিকানা করুণ কণ্ঠে বলল, আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি এ কথা বিশ্বাস না করলে আমার ওপর অহেতুক অবিচার হবে।

কান্না পেল আমেরিকানার। চোখে রুমাল দিল।

আমেরিকা অভয় দিয়ে বলল, না না, আমি অভিযোগ করছি না। তা ছাড়া দোষ তাহলে তো আমারও। ইউরোপা আমাকে আমলই দিল না।

আমেরিকানা চোখ মুছে হাসল।

আফগান আর কিউবা ছুই বন্ধু ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছিল।

আফগান বলছিল, কমরেড, কিছুই বুঝতে পারছি না, বুঝলেন?

কিউবা ঘাড় নাড়ল।

আফগান একটু আহত কণ্ঠে বলল, তার মানে ?

কিউবা বলল, মানে কিছুই যে বুঝতে পারছেন না তা বুঝলাম। বুঝবেন কি করে! আমরা একদিন ওদের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত ছিলাম। তা সত্ত্বেও তখনও ওদের বুঝতে পারি নি। এখন তো আরও কঠিন। কারণ এখন সব দেশই কম্যুনিস্ট, সব মানুষই কমরেড।

আফগান একটু খোঁচা দিয়ে বলল, তখনকার কথা ছেড়ে দিন কমরেড। তখন আপনারা নিজেদেরই ভাল বুঝতে পারেন নি।

কিউবা হাসল। বলল, তা বলতে পারেন।

আফগান টিপ্পনী কাটল: আমি বলব কেন! ইতিহাস বলছে।

কিউবা বলল, কিন্তু এর ইতিহাস তিনটে আছে সে কথা ভুলে যাবেন না। আমেরিকার লেখা, রাশিয়ার লেখা আর কিউবার লেখা। আপনি আমেরিকারটা পড়েছেন মনে হচ্ছে।

আফগান হাসল: কিন্তু আমেরিকাও যে কম্যুনিস্ট দেশ সে কথাটা কমরেড ভুলে যাচ্ছেন।

কিউবা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, আরে মশাই, মানে কমরেড! সেই জন্যেই তো বলছি যে এখন বুঝতে পারা আরও কঠিন। কম্যুনিস্ট দেশে ইতিহাস কোনদিন এক রকম হয় নাকি? লেনিন-ট্রট্স্কির রাজত্বে লেখা ইতিহাস, স্ট্যালিনের রাজত্বে লেখা ইতিহাস আর ক্রুশ্চেভের রাজত্বে লেখা ইতিহাস একই ঘটনার ওপর হলেই একই হবে? কোনদিন হয়েছে? আপনি মশায় কম্যুনিজমের কও জানেন না। মলো যা—মানে কমরেড!

আফগান শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনি অত পুরনো দিনের কথা বলছেন কেন? বর্তমানকালের কথা বলুন।

কি বলব ?

আফগান এ প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ল। মাথা চুলকে বলল, ঘুরে ফিরে আমরা বোধ হয় সেই প্রথম প্রস্তাবেই ফিরে এসেছি। মানে কিছুই বুঝতে পারছি না।

ও হ্যাঁ। তাই বলছিলাম যে এখন আরও কঠিন। ইংলণ্ড ছাড়া আর সব দেশ কম্যুনিস্ট হয়েছে দশ বছর হল।

সে ইংলণ্ডও তো আজ কম্যুনিস্ট হয়ে গেল।

হ্যাঁ। কিন্তু এই দশ বছরেই কয়েকটি দেশের ক্ষেপণাস্ত্র বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ। মরণ-রশ্মি তৈরি করেছে চারটে দেশ। আর কয়েকটা শীগগিরই পারবে বলছে। কোথায় যাবেন ?

হঠাৎ সরাসরি প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল আফগান। শেষ শব্দ দুটির বাক্যার্থ গ্রহণ করে মুখ কাচুমাচু করে বলল, কোথায় যাওয়া যাবে এ সম্বন্ধে কিছু ভাবি নি এখনও।

ভাববেন না।—কিউবা শাসনের ভঙ্গীতে বলল, ভাবা আপনার অধিকারের মধ্যে নয়। আপনি ছোট দেশ। আপনি যে কোন কম্যুনিস্ট রাজ্যের সাধারণ একজন ব্যক্তি বা বলদের চেয়ে বেশি কিছু নন।

আফগান ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, এই, আস্তে। কেউ শুনবে!

শুনুক।—কিউবা চাপা কণ্ঠে বলে সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসমত চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল।

আফগান হেসে উঠল। মৃদু কণ্ঠে বলল, না, ঘরে কেউ নেই। দরজাও বন্ধ আছে। বাইরে কেউ থাকতে পারে।

কিউবা এবার সাহসের সঙ্গে রুখে উঠল: থাক না! অত ভয় পাই না। আমরাও একটা স্বাধীন দেশ। হতে পারে ক্ষেপণাস্ত্র নেই, মরণ-রশ্মি নেই।

আফগান কিছু বলবার আগেই হঠাৎ কিউবা গা ঝাড়া দিয়ে সোজা আর শক্ত হয়ে বসে বলল, তবে থাকলে আমি সুইচ টিপে দিতাম ঠিক।

আফগান আবার ঠোঁটে আঙুল দিল: বলেন কি! এখন সবাই কম্যুনিস্ট যে!

সেই জন্যেই তো।

এই ভয়ঙ্কর উক্তির সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ক্ষণকাল পরে কিউবা আবার জোর পেল যেন। বলল, বছর পঞ্চাশেক আগে একবার আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম। এই নিকৃষ্ট প্রাণী ধরাধাম থেকে মুছে

ফেলবার আয়োজন সম্পূর্ণ করে আনবার আগেই মুহূর্তে সব বানচাল করে দিল।

কে?

ওরা সবাই তখন মিলে গেল। শুধু চীন ছিল আমাদের সমর্থক। কিন্তু ওদের ছিল শয়তানী মতলব।

সেটা কি?

ওদের আশা ছিল মনুষ্যজাতি সর্বত্র ধ্বংস হলেও চীনজাতি থেকে যাবে। অন্ততঃ গোটা পৃথিবী ভোগ-দখল করবার মত একটা বড় অংশ থাকবেই।

কি উপায়ে?

অত লোক মেরে শেষ করবে কে মশায়!

আফগান হেসে ফেলল। বলল, তাও বটে।

কিউবা নিজের কথার জের টেনে বলল, যখনকার কথা বলছি তখন তবু নানারকমের মানুষ ছিল পৃথিবীতে। এখন তো মানুষের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম যুগ চলছে।

আফগান মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, কিন্তু এখনও তো বেশ বৈচিত্র্য আছে। যেমন তুঙিস্ট আছে, চেভিস্ট আছে, আর আছে টোটিস্ট।

কিউবা শ্লেষাত্মক একটা শিস্ দিয়ে বলল, আছে। এ রকম রকমফের অনেক প্রাণীর মধ্যেই আছে। গায়ের রঙ, লোম আর চেহারার তফাত এখনও অনেক আছে আমি অস্বীকার করব কেন। শুধু তুঙিস্ট, চেভিস্ট আর টোটিস্ট নয়। এর পর বিভিন্ন বাণিজ্যের স্বার্থ আছে, সীমানার স্বার্থ আছে। কিন্তু আসলে—

নতুন একটা খারাপ বিশেষণ এড়াবার জন্যে আফগান তাড়াতাড়ি যোগ করে দিল, কিন্তু আসলে সব কম্যুনিস্ট।

কিউবা একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল, হ্যাঁ। সব কম্যুনিস্ট। যে কম্যুনিস্ট দেখলে মার্ক্স লজ্জায় আত্মহত্যা করতেন।

একটু থেমে আবার বলল, আপনি তো বেরোন নি। বেরোলে দেখতেন মজা।

আফগান হেসে বলল, দেখেছি।

দেখেছেন? অমন উৎকট উলঙ্গ ব্যবসায়িক প্রেমের অভিনয় দেখে আপনার কি মনে হল? সর্বকালে এরই ভাল নাম কূটনীতি, জানেন? বিশেষ পাড়ার নীতি ... তারই জয়জয়কার।

আফগান মনুষ্যজাতির পক্ষ থেকে লজ্জা পেল। ভদ্র ভাষায় বলল, আমার মনে হল যেন আজই দল পরিবর্তনের শেষ তারিখ! আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন ক্ষেপণাস্ত্র আর মরণ-রশ্মি এখন কোন দলের বেশী? ইউরোপ-চীনের? না আমেরিকা-রাশিয়ার?

কিউবা বলল, ভুল করছেন। একদলের কিছু বেশী থাকাতে তফাত হচ্ছে না তো। ইউরোপ এক রাষ্ট্র হয়ে যাবার পরে পরিমাণে বোধ করি ওদেরই সবচেয়ে বেশী আছে। কিন্তু তাতে কি হবে। গোটা ইউরোপ আর চীন সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে যা দরকার তার অনেক গুণ বেশী আছে রাশিয়া-আমেরিকার। উলটো হিসেবে ওদেরও তাই। কাজেই পরিমাণের কম-বেশিতে কোন তফাত হচ্ছে না।

আফগান ঘাড় নেড়ে বলল, এবার বুঝলাম।

পরদিন সকালেই সভা আরম্ভ হল।

প্রস্তাব একটাই। নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব।

প্রস্তাব উত্থাপন করে আমেরিকা বলল, কমরেডগণ! মনুষ্য সমাজে এ প্রস্তাব নতুন নয়—প্রায় একশো বছরের পুরনো। যখন মাত্র একটা দেশের মানুষ সবেমাত্র কমরেড হয়ে উন্নত জীবে পরিণত হয়েছে তখন থেকেই আমাদের এ প্রস্তাব চালু আছে। আজ আমরা পৃথিবীর সব মানুষই উন্নত জীব। মানে কম্যুনিস্ট। কাজেই আজ এ প্রস্তাব গ্রহণে বাধা হবে না বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

আমেরিকা আসন গ্রহণ করলে রাশিয়া উঠল। বলল, কমরেডগণ! আমরাও বিশ্বাস করি এই নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবে কোন বাধা আসবে না। আমরা বিশ্বাস করি প্রতিক্রিয়াশীল যারা তারাই শুধু এ প্রস্তাবে বাধা দিতে পারে। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের ক্রীড়নক, যারা সম্প্রসারণবাদী তারাই শুধু এতে বাধা দিতে পারে। যারা মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের মহান আদর্শ থেকে চ্যুত হয় নি তারা নিশ্চয়ই এ প্রস্তাব সমর্থন করবে।

চীন উঠল। আলাদা একটা নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব উত্থাপন করে বলল, নিরস্ত্রীকরণ সত্যি সত্যি যদি কাম্য হয় তবে আমাদের প্রস্তাবই একমাত্র বাস্তব এবং যুক্তি-সম্মত প্রস্তাব। কমরেডগণ, আপনারা কিছু বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করলেই দেখতে পাবেন পূর্ব প্রস্তাব সাম্রাজ্যবাদের দালালদের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

আফগান আর কিউবা পাশাপাশি বসেছিল। আফগান ফিসফিস করে বলল, কিন্তু কথাটা আমি বুঝলাম না বুঝলেন?

কিউবা ঘাড় নাড়ল।

আফগান এবার আর রাগ করল না। বলল, সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক বলে গাল দিচ্ছে একজন, আর একজন বলছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী তো নেই এখন। এখন তো সবাই কম্যুনিস্ট। তাহলে?

কিউবা মহা বিরক্ত হয়ে চাপা ধমকের সুরে বলল, আরে মশায়, আপনি একেবারে বুদ্ধু। আমাদের কম্যুনিস্টদের এ সব গালাগাল কি নতুন শুনছেন নাকি? সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীড়নক বা দালাল হতে সাম্রাজ্যবাদী থাকতে হবে এমন কোন কথা আছে?

আফগান বোকার মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে হতাশ কণ্ঠে বলল, না—এমন কোন কথা নেই বোধ হয়।

কিউবা বলল, তাহলে চুপ করে শুনে যান।

বলে আফগানের মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

চীন তখন বলে যাচ্ছে: আপনারা ভুলে যাবেন না, মহান মার্ক্স লেনিনের পথ থেকে যারা সরে গেছে তারাই সংস্কারবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চেভিস্ট। সম্প্রসারণবাদী চেভিস্টরা—

বাক্যটা শেষ পর্যন্ত শুনতে পারল না আফগান। মাঝখানেই আবার চাপা সুরে বলল, কিছু বুঝতে পারছেন?

কিউবা বলল, জলের মত। আপনিও পুরনো কম্যুনিস্ট হলে বুঝতেন। মোটে তো ক বছর।

আফগান আহত কণ্ঠে শুধু বলল, ও।

চীন বলে গেল, সম্প্রসারণবাদী চেভিস্টরা নিরস্ত্রীকরণ সত্যিই চায় কিনা আমাদের প্রস্তাব দ্বারাই তার পরীক্ষা হবে।

আফগান আবার কিউবাকে আলগোছে একটু ধাক্কা দিয়ে বলল, কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না।

কিউবা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, কেন মিথ্যে কথা বলছেন? একটা নয়—আপনি অনেক কথা বুঝতে পারছেন না।

আফগান হেসে বলল, বেশ, তাই। কিন্তু দুটো প্রস্তাব প্রায় একই মনে হচ্ছে না আপনার?

কিউবা চাপা ধমক দিয়ে উঠল, না। এক কেন হবে? বিষয়বস্তু প্রায় এক হলেই প্রস্তাব এক হয় নাকি? একটা হল চেভিস্টদের প্রস্তাব, আর একটা হল তুঙিস্টদের প্রস্তাব। এক কী করে হবে? সামান্য একটা শব্দের পার্থক্য থাকলেই তো যথেষ্ট।

আফগান ঘাড় নেড়ে বলল, তা আছে মনে হয়। এবার বুঝলাম।

ইউরোপ উঠে দাঁড়াল। নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, আমরা নিরস্ত্রীকরণ চাই আমরা দুর্বল বলে নয়। এখানেই বোধ হয় আমাদের কমরেড বন্ধুরা ভুল করছেন। এ বিষয়ে আমাদের সর্বশেষ আবিষ্কার এবং সর্বশেষ পরীক্ষার কথা সাম্রাজ্যবাদীর দালাল চেভিস্টদের স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি। আশা করি এ আবিষ্কার আমাদের প্রয়োগ করতে হবে না। আমরা কমরেড চীনের প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং আশা করি সকলেই করবেন।

রাশিয়া পা থেকে একপাটি জুতো খুলে এক হাতে উঁচিয়ে ধরে বলল, আগের দিনে ইউ. এন. ও.র সভায় আমরা এ রকম করেছি। তখন আমাদের নেতা শুধু পরাক্রান্ত নয়, অতিশয় জ্ঞানী বলে আখ্যা পেয়েছিলেন। এতদিন পরে আবার আমাদের কমরেড আমাদের সেই কাজ করতে বাধ্য করলেন। শেষ আবিষ্কারের বিরুদ্ধে আমাদের এই জবাব। আমাদেরও অনেক শেষ আবিষ্কার আছে। কিন্তু আমরা মুখে বড়াই করার চেয়ে দরকার মত কাজে দেখাতে বেশী ভালবাসি।

চীনও জুতো দেখিয়ে বলল, আমরাও। তবে দরকার হবে না আশা করি।

আফগানের চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল। শেষের

কথায় কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল। কিউবাকে বলল, তবু রক্ষে! আমি ভাবলাম এই বুঝি লেগে যায়।

কিউবা শান্ত কণ্ঠে অভয় দিয়ে বলল, কোন ভয় নেই। যতক্ষণ ওরা এখানে আছে জুতো ছাড়া আর কোন অস্ত্র পাবে না। আর জুতো ছোঁড়াছুড়ি হলে বড়জোর নাকেমুখে একটু লাগাতে পারে! ওরকম অনেক জায়গায় অনেকবার হয়েছে। বিশেষ কিছু হয় না।

আফগান বলল, বাঁচলাম।

কিউবা বলল, অত তাড়াতাড়ি বাঁচারও কিছু নেই। এখানেই যদি ওদের কাছে ওইসব অস্ত্র ছাড়বার সুইচ থাকত তাহলে জুতো না তুলে সুইচই এতক্ষণ টিপে দিত নিশ্চয়। ভগ— মানে মার্ক্স-লেনিনকে ধন্যবাদ দিন যে হাতের কাছে সুইচ নেই।

আমেরিকা উঠে দাঁড়িয়েই টেবিলের ওপর একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করে বলল, আগের দিনে আমরা বিশেষ গর্জাতে জানতাম না। দরকার মত বর্ষাতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু কমরেডগণ, ভুলে যাবেন না যে কম্যুনিস্ট হবার পরে সে বিদ্যাও আমরা আয়ত্ত করেছি। ভাববেন না যে কমরেডী গালাগালি আমাদের আয়ত্ত হয় নি এখনও। কিন্তু আমরা প্রয়োগ করছি না কারণ আমরা শান্তি চাই।

কিউবা ফিক করে হেসে ফেলল। আফগানের গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল, নির্জলা মিথ্যে বলছে। আসলে তেমন আয়ত্ত করতে পারে নি। ভয়ানক কাঁচা এখনও কম্যুনিস্ট ভাষায়।

আমেরিকা বলে যাচ্ছিল, শান্তির বদলে তুড়িস্টরা যা চায় তার জন্যেও আমরা প্রস্তুত আছি। শান্তির শত্রু যারা তারা মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের শত্রু। আসলে তারা সম্প্রসারণবাদী কাউটস্কিস্ট। তারা নিকৃষ্ট বুর্জোয়া ট্রট্স্কিস্ট।

কিউবা এবার সপ্রশংস ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল, না, সত্যিই কিছু কিছু আয়ত্ত করেছে।

আফগান মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, আমারও তাই বিশ্বাস। বেশ ভাল ভাল গাল ব্যবহার করছে বলে মনে হয়।

আমেরিকা প্রশংসার জন্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বসে পড়ল।

আফগান বলল, আচ্ছা, টোটিস্টরা কিছু বলছে না কেন?

কিউবা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, কি বলবে? যার হাতে কোন ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র নেই তার কথার দাম কি?

আফগান বলল, কিন্তু ওরাও তো বাণিজ্যের খদ্দের বটে?

কিউবা বলল, তা তো বটেই। কিন্তু ওরা গাছেরও নেয় তলারও নেয়। তা নিক। হয়তো তা সত্ত্বেও কিছু বলতে পারত। কিন্তু ভয়ে ভয়ে প্রধান টোটিস্টকেই ওরা দুই দল মিলে সভাপতি করে রেখেছে দেখছেন না? বর্তমানে এই একটা জায়গাতে, মানে টোটিস্টদের নিষ্ক্রিয় করে রাখবার কাজে তুড়িস্ট আর চেভিস্টদের মতের মিল হয়েছে।

হঠাৎ একটা বিকট গর্জন শুনে আফগান আর কিউবা একসঙ্গে চমকে উঠল। ওরা লক্ষ্য করে নি, আমেরিকা বসবার সঙ্গে সঙ্গেই চীন উঠে দাঁড়িয়েছিল। অল্প কয়েকটা কথার পরে তারই এই গর্জন।

—শোধনবাদীদের দালাল। সাম্রাজ্যবাদীর গোলাম।

নতুন শব্দের জন্যে একটু দম নিতেই একপাটি জুতো এসে চীনের ঠিক কপালটায় লাগল।

চীন এক হাত কপালে দিয়ে বসে পড়ল। বসে অন্য হাতে নিজের জুতো খুলতে লাগল। খুলে মারল রাশিয়ার কপাল তাক করে।

ব্যস্। কয়েক মুহূর্তে সভা জুতো-ছোঁড়াছুড়ির রণাঙ্গনে পরিণত হল। কারও পায়ে জুতো যখন আর রইল না তখন চেয়ার টেবিল মাইক এবং কাগজ চাপা দেবার বলগুলি অস্ত্র হিসেবে বেশ কাজে লাগল।

মাত্র কয়েক মিনিট পরে সভাকক্ষ নীরব হল। একমাত্র রব টিকে রইল আহতদের গোঙানি।

—

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

শীতাংশু মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

'ঘরে বাইরে' রচিত হবার পরেই বিখ্যাত "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, সক্ষোভে স্বীকারই শুধু করছেন না, প্রায় নিরাশ হয়েই কাতরোক্তি করছেন : "যদিচ আমাদের এ কালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দশের কাজের পত্তন হইয়াছে তবু আমাদের সেকালের ভাগ্যে সেই দশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্য কেবলই ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে খামকা একটা না একটা কর্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার একমাত্র কারণ, যে দশের কথা হইতেছে তাহারা ওঠে বসে, খায় দায়, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ায় কর্তার ইচ্ছায় ;··· এত নিষ্ঠুর জবরদস্তি দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়া-ছোঁওয়ার অধিকার পর্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে তারা রাষ্ট্রব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সংকোচ বোধ করে না কেন ?" সঙ্কোচ যে করে না তার কারণ তারা মনে করেছে মনকে চোখ ঠারা যায়, নিজের ক্লেদ দূর না করেও বাড়ির বাইরেটা পরিষ্কার রাখা যায়, ঘরে একরকম বাইরে আর একরকম করা যায়। আজকে পাকিস্তান মনে করছে যে শরিয়তী সমাজ-ব্যবস্থাও রাখব আবার আধুনিক গণতন্ত্রের তলার ফলও কুড়ব—ফলে আজ সেখানে স্বৈরাচার কায়েম হয়েছে। আমরা আজ মুখে 'সেক্যুলার স্টেট' বললেও এবং আইন করে জাতিভেদ লোপ করলেও, অন্তরে অন্তরে পোষণ করে চলেছি, পশ্চিমের পলেস্তারাটা বাইরে লাগিয়ে ভেতরে ভেতরে তাগা-তাবিজের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার বাসনা। এ চেষ্টার শুরু আজকে নয়। সেই বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আজ পর্যন্ত এই কম্প্রোমাইজের তত্ত্ব তারস্বরে ঘোষণা করে করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে ঠাট বজায় রাখাটাই হয়ে উঠেছে প্রধান কর্তব্য—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রেস্টিজ। আমরা যে স্বাধীনতা চাইছি সে চাওয়াটা সত্যি কিন্তু সেই "যে আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল খোঁটায় আমাদের বলির পাঁঠার মতো বাঁধিতে চায় তাকে বলি ধিক! এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্ব সভায় আমাদের আসন পাতা চাই, আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি, খবরদার, 'ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে এমন কি ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না'—ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের এক চোখ জাগিবে আর এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।···সমাজের সকল বিভাগেই ধর্মতন্ত্রের শাসন এক সময়ে য়ুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়-জালটাকে কাটিয়া যখন সে বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল।···ইংলণ্ড এই বুড়ির শাসন অনেকদিন হইল কাটাইয়াছে।···আজ য়ুরোপের ছোটবড় যে-কোন দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে, সর্বত্রই অন্ধ কর্তৃত্ব আলগা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণসমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা নাই··· সেখানকার সমাজ বেওয়ারিশ ক্ষেত্রের মত নানা কর্তার কাঁটাগাছে জঙ্গল হইয়া ওঠে। সেখানে একালের পেয়াদা হইতে সেকালের পুঁথি পর্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান মলিয়া অন্যায় খাজনা আদায় করে।" এই সনাতন ভারতে মানুষের মূল্য তত্ত্বে আছে বটে কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে নয় এবং সে মূল্যেরই বা কি দশা হয়েছে তাও রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই নির্মম ক্রোধে বর্ণনা করেছেন :

"এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপস হইয়া গেছে।···সংসারে তাই ধর্মে কর্মে আচারে বিচারে যত সংকীর্ণতা যত স্থূলতা যত মূঢ়তাই থাক উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি সমর্থন আছে। গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, 'যে মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে,' অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বলিতেছে, 'যে বেটা সর্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে

রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবা-নাপিত বন্ধ', আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধূলা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেল, 'বাবা বাঁচিয়া থাক'।"

এই হল রবীন্দ্রনাথের ভারত-সমাজ-দর্শন। এ সমাজে দরিদ্রনারায়ণের স্থান আছে, কৃষ্ণের জীব বা হরিজনের স্থান আছে কিন্তু ব্যক্তিমানুষের স্থান নেই। এ সমাজ ভিতর-বাইরের অবিরাম দ্বন্দ্বকে ঠাটের নামাবলী চাপা দিয়ে তখনও মনে করেছে এবং এখনও মনে করছে যে এই আপসেই আমাদের সার্থকতা। অথচ এ আপস কোনও মৌলিক সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে ভারতীয় জীবনে ব্যক্তিসত্তার এত অপমৃত্যু, এখানে তত্ত্বে আর তথ্যে অহি-নকুলের সম্পর্ক। মধুসূদন দত্তের এই উপলব্ধি ছিল, বিদ্যাসাগরের ছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। রবীন্দ্রনাথে এই উপলব্ধির তাক্ষ্ণতম প্রকাশের কারণ অবশ্য ঐতিহাসিক। এক দিকে পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক অন্য দিকে তার শোষক রূপের অকুণ্ঠ বিলাস: এক দিকে স্বদেশী আন্দোলন অন্য দিকে জাতীয় চরিত্রে একান্ত অপ্রস্তুতি ও আত্ম-প্রবঞ্চনা; সবের উপরে এই বিনা আয়াসে প্রাংশুলভ্য ফল লাভের লোভ;—এই ঘটনাবলীর একত্র এবং এককালীন সমাবেশ স্বদেশী আন্দোলনের আন্তরিক দীনতাকে রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে তুলে ধরল। পাশ্চাত্ত্যের যে আত্মিক দীনতা ভারতকে পরাধীন রাখার মধ্যে প্রকট হয়েছিল তার সম্বন্ধে সচেতন থেকেও রবীন্দ্রনাথ ভারতের এই অকল্যাণীকে পাশ্চাত্ত্যের মন্ত্রেই তাড়াতে চেয়েছেন:

"য়ুরোপ ঠিক ইহার (ভারতের) উল্টা। য়ুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে। সেখানের রাজ্যে সমাজে যে কোন খুঁত দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে-শক্তি যে-মুক্তি দিতেছে সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়—তাহার বিকাশ তন্ত্রমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।"

প্রথম যৌবনের প্রাচ্যমুখিতা থেকে সরে এসে, ১৮৮৫ সনের পরবর্তী প্রায় চোদ্দ বছর ধরে প্রতীচ্যমুখী থেকে, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগে আবার 'স্বদেশী সমাজ' ও 'তপোবনে' যেন ফিরে গেলেন এবং তার পরেই সেই তপোবন-নিষ্ক্রান্তির বার্তা বয়ে নিয়ে এল 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' ইত্যাদি। আমরা সাধারণ ভাবে তাঁর ওপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যে ক্রিয়া লক্ষ্য করেছি এই দোলক-গতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ঘটে কি করে? অবশ্য ১৯০৭ সনে প্রাচ্য-নিষ্ক্রমণের পরে রবীন্দ্রনাথ আর ওই পথে অমন করে চলেন নি। গোরা যেমন আনন্দময়ীর সব গোঁড়ামি ভেঙে দিয়েছিল, স্বদেশী আন্দোলনও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই করেছিল। তিনি আর 'তপোবনে' ফিরলেন না।

কিন্তু তাঁর প্রাচ্য-স্বীকরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে যে একটি বৈশিষ্ট্যের উপর আমাদের দৃষ্টি ফিরে ফিরে আসে সে তাঁর আচারানুষ্ঠান-পরায়ণতা নয়, দেব-দ্বিজে ভক্তি নয়, তেত্রিশ কোটিকে মানা নয়, এমন কি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সংহিতা 'গীতা'য় সর্বধর্মের সারান্বেষণ নয়, নূতন করে কৃষ্ণকে আবিষ্কার নয়, দেবীচৌধুরাণীর প্রতিষ্ঠা নয়, জাতিভেদ, বৃত্তিভেদ তো নয়ই। সেটি হল আত্মিক শক্তিতে, সেই শক্তির মুখ্যত্বে (primacy) এবং তার উজ্জীবনে বিশ্বাস। তাঁর বিশিষ্ট পারিবারিক পরিবেশ, আর সেই যুগের পরিবেশ মিলে রঘুনন্দন-নির্ভর হিন্দুয়ানির মূল্য দ্রুত নাশ করলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের নূতন সংস্কৃত হিন্দুয়ানি তাঁর চোখের সামনে ঈশোপনিষদের 'সেই পাতা'খানিই নিক্ষেপ করল যেখানি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল দেবেন ঠাকুরের সামনে। তাঁর শৈশবে সেই পাতাখানি বৃহৎ সংহিতায় পরিণত হয়েছে এবং রামমোহনের বিচারনির্ভর ব্রহ্মবাদ পরিণত হয়েছে ভক্তিনির্ভর একেশ্বরবাদে। রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্বাসে আশৈশব পরিপুষ্ট। সেই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি থেকে প্রথম যৌবনে তিনি মধুসূদনের সমালোচনা করেন, রামমোহনকে দেখেন হিন্দুধর্মের ত্রাতা হিসেবে। তখন তিনি বাল্যবিবাহের উচ্ছেদেরও প্রতিকূলতা করেছিলেন। এ হল অপরিণত মনের ঐতিহ্য বিহ্বলতা। সেই বিহ্বলতার রূপটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন:

"জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন; ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।"

এই বিহ্বলতা বিচারের পরিপন্থী; অন্ধ আবেগের প্রাধান্য এখানে; কিন্তু এ স্বাভাবিক। এই ভাবালুতার স্তর ভূ-পৃষ্ঠ-নির্মাণের প্রথম অবস্থার মত। ধীরে ধীরে এর বিবর্তন হতে থাকে। এই অতি-উৎসাহের মধ্যে উপচীয়মান ভাবলোকের আসল স্থির মূর্তিটি চোখে পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু এর মধ্যেই আবার 'বাড়ির হাওয়া শেক্সপীয়রের নাট্যরসসম্ভোগে আন্দোলিত, সার ওঅল্‌টার স্কটের প্রভাবও প্রবল।' আর 'দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মত শোনা যায়।' এই "কাকলি"র উপমাটি বিশেষ লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথদের তখন নূতন, আবেগ-সর্বস্ব দেশপ্রেম সদ্য উচ্ছ্বসিত হতে গিয়ে উপচে উপচে পড়ছে। সনাতনী হিন্দুর যে আবেগ আচারে অনুষ্ঠানে পাল-পার্বণে এবং ধোবা-নাপিত বন্ধ করে নিজেকে নিঃশেষ করত রবীন্দ্রনাথদের সেই আবেগ আপনাকে প্রকাশ করার সেই সব মাধ্যম না পেয়ে এবং আপাতত ব্রহ্মাস্বাদে আগ্রহী না হয়ে দেশ-উদ্ধারের প্রথম বৈতালিকের পদ নিল। তখন কিন্তু 'আনন্দমঠ' রচিত হয়ে গিয়েছে এবং থিয়জফিস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছে।

কিন্তু তার পরেই দীর্ঘ প্রতীচ্যায়ন, কারণ হিন্দু গোঁড়ামির পুনরুত্থানের চেষ্টা। এর পুরোধা বঙ্কিম এবং শশধর তর্কচূড়ামণি। রবীন্দ্রনাথ দেশ-উদ্ধারের দীক্ষা নিতে পারেন ঋগবেদের পুঁথি সামনে রেখে। সেটা মুখ্যতঃ রাজনৈতিক আবেগ এবং তার সঙ্গে দেশের গরিমা-বোধ মিশে থাকা স্বাভাবিক। তাই বলে 'সবই বেদে আছে'র অন্ধ জড়তার প্রশ্রয় সেই রবীন্দ্রনাথ দেন কি করে যিনি প্রতীচ্যের মর্ত-প্রেমের বৈচিত্র্যে তখনই জারিত হচ্ছিলেন এবং যাঁর কাছে বিগত এক সত্যযুগে মানুষের সব সম্ভাবনার অবসান কল্পনা করা কোনক্রমেই মানসিক স্বাস্থ্যের সূচক নয়। তখনই তিনি এই যুক্তিহীন জাত্যভিমানকে গদ্যে এবং পদ্যে আক্রমণ করেছেন। এর আগেই ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যদের তিনি কৌতুকের সঙ্গেই নিরীক্ষণ করেছেন। তাদের 'ছুঁচলো সব জিবের ডগা কাঁটার মত পায়ে ফোটে।' এরা সংখ্যায় এখন যেমন তখনও তেমনি, অতি দ্রুত বেড়ে ওঠে:

> পাড়ায় এমন কত আছে কত কব তার,
> বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা-অবতার।
> দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে,
> দাঁতকপাটি লাগে, তাদের দাঁতখিঁচুনির ভঙ্গি দেখে।
> আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
> জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।

এর পরে 'কল্পনা'য় দেশপ্রেমবিলাসী রিভাইভালিস্টদের রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যবচ্ছেদ করেছেন:

> বেশভূষা ঠিক যেন আধুনিক,
> মুখ দাড়ি-সমাকীর্ণ,
> কিন্তু বচন অতি পুরাতন
> ঘোরতর জরাজীর্ণ।......
> পণ্ডিত বীর মুণ্ডিত শির,
> প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা—
> নবীন সভায় নব্য উপায়ে
> দিবেন ধর্মদীক্ষা।
> কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
> হিন্দুধর্ম সত্য—
> মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি আর
> শুধু পদার্থতত্ত্ব।
> টিকিটি যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
> ম্যাগ্নেটিজম্ শক্তি—
> তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়,
> তাই জেগে ওঠে ভক্তি।

এই সময়ের রবীন্দ্র-মানসের যথাযথ এক সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের তৎ-কৃত সমালোচনায়। স্থূল রিভাইভালিজমের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের র‍্যাশনালিজমকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন কিন্তু সরষের মধ্যেই যে ভূত তাও তিনি যুগপৎ দেখিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিম কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করতে চান পূর্ণ বিকশিত মানুষ হিসেবে অথচ তিনি তাঁর দেবত্বে এবং অবতারত্বেও বিশ্বাসী। মূল কথা হল এই যে বঙ্কিমও রিভাইভালিস্ট কিন্তু তিনি

রিভাইভালিজমের ওপর যুক্তি-বিজ্ঞানের প্রলেপ লাগাতে চান। পাছে এই প্রলেপে কোন ফাঁক থাকে সেইজন্যে তিনি মাঝে মাঝে, যার ধনে ধনী হয়েছেন সেই প্রতীচ্যকেই, ইংরেজের নামে এবং বাঙালীর মনে আত্মগরিমার সঞ্চয়-মানসে, এখানে ওখানে গালিগালাজ করেছেন (য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের 'পাশ্চাত্ত্য মূর্খ' বলেছেন; য়ুরোপীয়েরা নাকি সৌধশিখর থেকে নিজেদের ক্ষমাগুণের প্রচার করেন; মহাভারতের মত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ থাকতে আমরা নাকি মেমসাহেবদের লেখা নবেল পড়ে দিন কাটাই—ইত্যাদি)। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের এই উষ্মা সম্পর্কে বলছেন :

"পাশ্চাত্ত্য মূর্খ অর্থাৎ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি লেখক অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়াছেন।...সে কাজটাই গর্হিত।...শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমাগুণের বর্ণনাস্থলে অকারণে য়ুরোপীয়দের প্রতি একটা অন্যায় খোঁচা দেওয়া যে কেবল অনাবশ্যক হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে মূল উদ্দেশ্যটি পর্যন্ত নষ্ট হইয়াছে।...পাঠকেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন এই অংশ পাঠকালে একজন য়ুরোপীয় পাঠকের মনে কিরূপ বিদ্রোহী ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ ক্ষমা করিবার সময় ক্ষমাধর্মের মহিমা-কীর্তন যে য়ুরোপীয়দের জাতীয় প্রকৃতি এরূপ সাধারণ কথা লেখক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলা কঠিন।... বঙ্কিম সামান্য উপলক্ষ্য মাত্রেই য়ুরোপীয়দের সহিত, পাঠকদের সহিত এবং ভাগ্যহীন ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত কলহ করিয়াছেন।"

এতে বঙ্কিমের দুর্বলতাই স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করেন তাতে সনাতনী হিন্দুও খুশী নন। আবার পরবর্তীকালের ব্রাহ্মরাও খুশী নন। সেই মনোভাবটাই খাঁটি যুক্তিবাদী প্রস্থান থেকে এসেছে এবং আদর্শবাদের সঙ্গে তার কোন দ্বন্দ্ব নেই। রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণ হলেন মহাভারত মহাকাব্যের মহৎ নায়ক :

"মহাভারতের কবি-বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রত্যেক তথ্যটি প্রকৃত না হইতে পারে, কৃষ্ণের মুখে যত কথা বসানো হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি যত কার্যকলাপের আরোপ হইয়াছে তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃত্তান্তটি প্রামাণিক না হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য তিনি পাঠকদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহাই সর্বাপেক্ষা মহামূল্য সত্য। কৃষ্ণের যদি ইতিহাস থাকিত তবে সম্ভবত তাহাতে এমন সহস্র ঘটনার উল্লেখ থাকিত যাহা কৃষ্ণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার কোন স্থায়ী মূল্য নাই অর্থাৎ সে সকল কাজ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব প্রকাশ করে না— এমন কি, শেষ পর্যন্ত সকল কথা জানা সম্ভব নহে বলিয়া তাহার অনেকগুলি কৃষ্ণের যথার্থ স্বভাবের বিরোধী বলিয়াও মনে হইতে পারিত। প্রত্যেক মানুষ অনেক কাজে নিজের যথার্থ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও থাকে। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রে নিশ্চয়ই সেই সকল অনাবশ্যক এবং আকস্মিক তথ্যগুলি বর্জিত হইয়া কেবল প্রকৃত স্বরূপগত সত্যগুলি নির্বাচিত হইয়াছে...কবি বাস্তবিক ইতিহাস হইতে সত্যতম, নিত্যতম কৃষ্ণকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন।"

এ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেবপূজা নেই, ভক্তির মূঢ়তা নেই, পুনরুজ্জীবনবাদ নেই, আছে যুক্তিনির্ভর আদর্শবাদী মনের মর্ত-কেন্দ্রিক চেতনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ—তৎকালীন প্রতীচ্যের হিউম্যানিজমের ভারতীয় পরিপূরক। এ হিউম্যানিজম ইউরোপের মতই, সেশ্বর, নিরীশ্বর নয়। ইউরোপে নিরীশ্বর হিউম্যানিজমের ধারা যে ছিল না তা নয় এবং উনিশ শতকের প্রথম চার দশক পর্যন্ত তার তরঙ্গভঙ্গ আমরা এখানেও দেখেছি। কিন্তু তারপরের ধর্ম সংস্কার-আন্দোলনের প্রভাবে ওই নিরীশ্বর ধারাটি প্রায় শুকিয়ে গিয়ে সেশ্বর ধারাটিই প্রবল হয়ে উঠল। ডিরোজিওর শিষ্য কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন, আর ব্রাহ্মবাদ দিল অন্যদের আশ্রয়। সেই ব্রাহ্মবাদ ভারতীয় জাতির একটি অঙ্গ হিসেবে মুসলমানকেও গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না, বরং ঐতিহ্যকে যুক্তি ও সম্ভ্রমবোধের দ্বারা শুদ্ধ করে নেয়। কথাটা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছ উপলক্ষ্যের পেছনে বিশাল ছায়া দেখে। প্রসঙ্গটি উঠেছিল জাতীয় পরিচ্ছদ কি হবে—কোট না চাপকান তাই নিয়ে। রবীন্দ্রনাথে যেমন অন্ধ হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদ নেই, তেমনি নেই অন্ধ প্রতীচ্যপ্রীতি। অহেতুক অনুচিকীর্ষার দীনতা তাঁর কাছে অসহ্য। তিনি বলছেন :

"মুসলমানদের সহিত বসন-ভূষণ শিল্পসাহিত্যে

আমাদের 'এমন ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান হইয়া গেছে যে, উভয়ের মধ্যে কতটা কার, তাহার সীমা নির্ণয় করা কঠিন। মনের এই ঔদার্য সেই যুগে বিরল ছিল, কেন না, আগেই বলেছি, 'হিন্দু'-কলেজ নামেই যে হিন্দু রেনেসাঁসের সূচনা গীতা নিয়ে জেলে যাওয়াতে তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই ঔদার্য তিনটি ব্যক্তিতে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল : মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র এবং রবীন্দ্রনাথে। চাপকান হিন্দু মুসলমানের মিলিত বস্ত্র।...যেমন আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, তাহাতে উভয় জাতীয় গুণীরই হাত আছে, যেমন মুসলমান রাজ্যপ্রণালীতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল। তাহা না হইয়া যায় না। কারণ মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল।...এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না।"

এই রবীন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব নিলেন তখন স্বভাবতঃই তাঁকে বয়কট, গীতা, গণেশ-পূজা, নির্বিচার প্রতীচ্যদ্বেষ পীড়িত করেছিল—আরও বেশী করে এইজন্যে যে স্ব-সমাজের পুঞ্জীভূত ক্লেদ অপসারণের কোনও আগ্রহই স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হয় নি। পণপ্রথা নিয়ে যে আলোড়ন পরে হয়েছিল তার পরিণাম আজ আমরা ভাল করেই দেখতে পাচ্ছি! দ্বিধাপন্ন মনে আন্দোলনে যোগ দিয়েও গান যখন তিনি লিখলেন তাতে স্থূল ন্যাশনালিজমের বদলে লাগল ইন্টারন্যাশনালিজম এবং হিউম্যানিজমের উদার সুর। বাংলাদেশের মাটিতেই তিনি 'বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা' দেখেছিলেন। ন্যাশনালিজম বস্তুটি প্রতীচ্যের দান হলেও ওখানে তার পরিণতি হল শোভিনিজমে আর রবীন্দ্রনাথে, রামমোহনের উত্তরাধিকারক্রমে, ইন্টারন্যাশনালিজমে। ফলে সেই আন্দোলন থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তার সমগ্র কৈফিয়ত 'গোরা' এবং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে।

কর্মের ক্ষেত্রে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের এই সংঘাত, বিশেষ করে এই দেশে যেখানে সবকিছুই বিকৃত এবং অসরল, তাঁকে নিভৃত কবিকর্মের দিকেই ঠেলে দিল। ঠেলে দিলে কি হবে—কর্মের বিচিত্র জীবনলীলায় অংশ গ্রহণের আকুতি তাঁর মধ্যে পরিপুষ্ট হয়েছে প্রতীচ্যস্বীকরণের দ্বারা। ব্যাহত হয়ে তিনি অন্তরের মধ্যে খুঁজতে আসেন এই বিচিত্রের অন্তরে অক্ষুব্ধ এবং অক্ষোভ্য 'এক'-কে। এইখানে তাঁকে আশ্রয় দেয় তাঁর প্রাচ্য উত্তরাধিকার। অন্তরে বাইরে এই দোলা খেতে খেতে চলে তাঁর কাব্যজীবন। **নিজের জীবনের এই পরিণতিহীন দ্বন্দ্বকেই রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতা ভাবকল্পে রূপ দিতে চেয়েছেন।** রবীন্দ্রনাথের নিজের কাছে এই ভাবদ্বন্দ্বটি এইভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে :

"চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি। কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মত, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে। আমার সুখে দুঃখে, আমার ভালোয় মন্দয়। এই সংকল্প-সাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে, যন্ত্রেরও স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ। পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি। এ যেন অর্ধনারীশ্বরের ভাবখানা।...এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা। আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ। সংসারে এই দুই সত্তার বিরোধ সর্বদাই ঘটে। নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মানুষ গূঢ়ভাবে বহন করছে তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে নি। এই ভ্রষ্টতা মানুষের পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয়। আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কিনা এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্রার কবিতায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে।...

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
হে বিচিত্ররূপিণী।
অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।"

[ক্রমশঃ]

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র

শ্রীদীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

॥ প্রথম খণ্ড : উপন্যাস ॥

'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগস্ পাস্ট' [চার]

"My novel is not a work of reasoning; its least elements were furnished by my sensibility."

—প্রুস্ত [Lettres de Marcel Proust a Bibesco, p. 177]

মহত্তম কাব্যের এবং বৃহত্তম কথাসাহিত্যের চরিত্র এক। একটি তত্ত্বের আবরণ উন্মোচন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার প্রভাতকালে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী,' জীবনের শেষ সন্ধ্যায় সেই প্রশ্নেরই উত্তরে একটুকরো উত্তরীয় উড্ডীন অশেষ বেদনায় উচ্চারিত সেই দুটি অবিনশ্বর উক্তিতে: 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।' এই ছলনার জাল ছিন্নভিন্ন করে কে পেয়েছে তাকে? কবি সে প্রশ্নের উত্তরে সব দ্বিধা দূরে ফেলে দীপ্ত, দৃপ্তকণ্ঠ: 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

দস্তয়ভস্কির সাহিত্যকর্মের একমাত্র থিম, 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট'। একজন মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জগতের যতেক মানুষকে। যতক্ষণ না করবে, ততক্ষণ জগতের যতেক মানুষের দুঃখে রক্তাক্ত হতে একজন বারবার আসবেন। সেই চিরনির্বোধ, দি ইডিয়ট; রবীন্দ্রনাথের, নবজাতক। জিসাস ক্রাইস্টের জীবনকাব্যই দস্তয়ভস্কির কাব্যজীবন।

ফ্লবেরের জীবনসংগীত মাদাম বোভারির চোখের জলের দর্পণে ফ্লবেরের নিজের, সমস্ত মানুষের কান্নার প্রতিবিম্ব। রমণীয়ের আস্বাদ বঞ্চিত রমণে অতৃপ্ত 'অভিসারে'র অপমৃত্যুর নামই 'মাদাম বোভারি'।

প্রুস্তের থিম হচ্ছে 'প্রিসন'। সময়ের হাতে আমরা সবাই বন্দী। মুক্তির চাবিকাঠি—কেবল স্মৃতির করায়ত্ত। প্রুস্ত এই একটি তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধি দিয়ে নয়—বেদনা দিয়ে। মহৎ সৃষ্টির মূলে নেই সচেতন কোনও দীপ্তি। মহৎ সৃষ্টির মূলে আছে মহত্তর বেদনা—'অলৌকিক আনন্দের ভার'। গাছের বোঁটায় বাইরে থেকে বুদ্ধির আঘাতে ফোটানো যাবে না তাকে। বৃক্ষের বেদনার আনন্দেই কেবল ফুটবে সেই অপরূপ অনাঘ্রাত পুষ্প।

'সেন্স' নয়, 'সেন্সিবিলিটি' তাঁর উপন্যাসের উৎস, —বলেছেন প্রুস্ত। যে কথাটা বলেন নি, তা হচ্ছে, মহৎ কাব্য, বৃহৎ কথাসাহিত্য আস্বাদনের উপায়ও 'সেন্স' নয়—'সেন্সিবিলিটি'। ও বস্তু বোঝবার নয়—বাজবার।

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মাপবার যন্ত্র আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞান। মানুষের জ্ঞান তাকে অহরহ বলছে, এ রকম কোটি কোটি সৌরমণ্ডল আছে অনন্ত শূন্যে। কিন্তু আকাশের কান্না জ্ঞানবিজ্ঞানের কানে অর্থশূন্য। কবির আর শিল্পীর প্রাণে সেই শূন্যই অর্থপূর্ণ। সে অর্থ অভিধানে নেই। জলে আছে জোনাকির পাখায়, জেগে আছে তার আলোকিত বেদনায় অনন্তকাল ধরে।

কর্ণের অঙ্গে কবচকুণ্ডলের মত, প্রভাতের সর্বাঙ্গে সূর্যালোকের মত, এই তীব্র তীক্ষ্ণ প্রায় অস্বাভাবিক স্পর্শকাতরতা ছিল প্রুস্তের সহজাত। প্রুস্তের যৌবন-বেদনাও স্বাভাবিক ছিল না:

"He suffered, too, from an emotional flow which was more serious than his physical ailments. While still an adolescent, he had made the discovery that the only form of love to which he was susceptible was generally considered to be a perversity." [The Art of Writing : Andre Maurois]

মরোয়া আরও বলেছেন, আরও অবারণ ভঙ্গিতে যে 'জিদে'র মত প্রুস্তের সমাজকে অস্বীকার করার উদ্ধত দুঃসাহস ছিল না। বরং :

"It is not difficult to imagine the many long and painful struggles from which he emerged defeated : his efforts to get the better of his desires, the relapses and, finally, the certainty of failure."

মরোয়ার মতে, প্রুস্ত 'amoral' নন—'immoral'। তবে : "...suffering profoundly from his immorality, and standing in especial need of confession and analysis, which served the novelist well."

সব লেখাই শেষ পর্যন্ত 'কনফেশান'। প্রুস্তের লেখার বৈশিষ্ট্য কনফেশানে নয়। এমন কি কনফেশানের অস্বাভাবিকত্বের মহিমার মধ্যেও প্রুস্তের প্রতিভার মূল সুর উদ্‌গাত নয়। কিন্তু সে কথায় পরে আসব।

প্রুস্তের সমকামিত্ব সম্পর্কে মার্টিন টার্নেল আরও দ্বিধাহীন :

"Now it does not call for great powers of divination to see that the auother of A la recharche du temps perdu was profoundly homosexual, but unless this is realized a great deal of the later volumes are meaningless. It has often been hinted that 'Albertine' was a boy,..." [The Novel in France]

Buchet-ও বলেছেন, প্রুস্তের উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে অল্প কয়েকজনই স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ। Albertine এবং তার বন্ধু Gilberte এবং Saint-Loup শেষ দিকে পুরোপুরি 'inverts'। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আবার বলেছেন মার্টিন টার্নেল যে প্রুস্ত নাকি একদিন তাঁর ঘরে ছত্রাকার পাণ্ডুলিপির পাতা হাঁটু গেড়ে বসে গুছোতে গুছোতে তাঁর তৈরী চরিত্রগুলির দিকে তাকিয়ে চোখের জলে বলেন : 'They are all like that."

১৯২১। 'জিদে'র সঙ্গে প্রুস্তের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে 'জিদে'র জার্নালে :

"Far from denying or hiding his uranism, he displays it, and I might almost say : prides himself on it. He said that he had never loved women except spiritually and had never experienced love except with men." [Journal, p. 692 —The Novel in France-এ উদ্ধৃত]

জীবনের প্রভাত-পর্বে প্রুস্তের মাতৃ-বেদনাও বিরল-বিষণ্ণ :

"Incidents which would have left no lasting scar on a thicker-skinned boy became permanently fixed in his mind, and haunted him like souls in torment begging to be saved."

এর উজ্জ্বল একটি উদাহরণ দিয়েছেন টার্নেল। তাঁর মা সন্ধ্যায় বালক প্রুস্তের ঘরে গিয়ে দৈনন্দিন শুভরাত্রি চুম্বন দিতে একদিন অস্বীকার করেন এবং পরে এর জন্যে দারুণ অনুতাপ করেন। রাত্রির অন্ধকারে পারির রাস্তা দিয়ে ভালোবাসার কাউকে খুঁজে বেড়ানোর বেদনা, সামাজিক প্রত্যাঘাতের জ্বালা—প্রুস্তের জীবনে ও কাব্যে ছায়া পড়েছে প্রতিটি চলতি মুহূর্তের। এবং "A writer finds what recompence he can for the injustices of fate."—এই উক্তির সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে অন্ধকার উপস্থিতির নামই প্রুস্ত।

তাঁর মন নয় শুধু—তাঁর শরীরও অসুস্থ ছিল বরাবর। অসুস্থ শরীর আর অস্বাভাবিক মন নিয়ে প্রুস্ত সরে গিয়েছিলেন, সমাজ থেকে, লোকালয় থেকে দূরে, ভিড়, শব্দ আর আলো থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'cork-lined' প্রায়ান্ধকার ঘরে। বাল্য ও যৌবনের কারাগারে বন্দী নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ প্রুস্তের জীবন-বন্দনাই 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ্‌স্ পাস্ট'। সুতো বাঁধা প্রজাপতির সঙ্গেই শুধু তাঁর তুলনা চলে। প্রেম অর্থ সঙ্গ

সমাজ কিছুই তাঁকে শান্তি দেয় নি। দারুণ অতৃপ্তিতে তিনি মুখ ফিরিয়ে বসেছেন সমাজ থেকে। ডুব দিয়েছেন স্মৃতির অতলে। জীবনসিন্ধু মন্থন করে বাঁচবার জন্যে যে অমৃত তিনি উদ্ধার করে এনেছেন তার নাম তিনি দিয়েছেন 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ্‌স্ পাস্ট'। রূপসাগরে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন এই অরূপরতন। সময়কে হারিয়ে দিয়েছে কালের অধীশ্বর স্মৃতি। বেদনার, ব্যর্থতার, গ্লানির পঙ্কিলতায় প্রুস্তের প্রতিভা জন্ম দিয়েছে অবিস্মরণীয় 'স্মরণে'র শতদল।

সময়কে হারিয়ে দেবার 'সময়ে'র বাইরে দাঁড়িয়ে স্মৃতির হাতিয়ারে হরণ করতে হবে 'সময়ে'র হৃদয়, প্রুস্তের এ তত্ত্ব ঠিক অথবা নির্বোধ, এ বিচারের মধ্যে নেই প্রুস্তের প্রতিভার মূল্যনিরূপণের উপায়। প্রুস্তের প্রতিভা তাঁর বিচিত্র বেদনাকে বিপুল আনন্দে রূপান্তরিত করেছে। প্রুস্তের 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ্‌স্ পাস্ট' এই কারণেই সবচেয়ে বেশী এই একমাত্র মহিমাতেই অমরাত্মা :

"In Vinteuil's Septet there are two contrasted themes: Time the Destroyer and Memory the Preserver,…"

কিন্তু, "…in its final passages, the motif of joy emerged triumphant."

নিরবধি আনন্দের এক বিপুলা ক্রন্দন প্রুস্তের 'রিমেমব্রেন্স অভ থিংগ্‌স্ পাস্ট'।

সৃষ্টির মূলে বেদনা। কান্নার সেই কুঁড়ি থেকে কেবল এক প্রতিভাই পারে আনন্দের কুসুম ফোটাতে। প্রুস্তের প্রতিভা তাঁর একার কান্নাকে নিরবধিকাল ধরে বিপুলা পৃথ্বীর পরমাশ্চর্য অপরূপ অবিনশ্বর আনন্দে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেছেন :

"As a great philosopher can epitomize all thinking in a single thought, so can a great novelist, by exploring one single life, and fixing his attention on the humblest objects, bring into the light of day the lives of each and all of us."

প্রতিভা সেই বেদনা অপার যেই-ই কেবল বহন করতে পারে অলৌকিক আনন্দের ভার।

একসঙ্গে এত দুর্বহ দুঃখ, এমন দুরন্ত সুখ, এত বিচিত্র বেদনা, এমন বিপুল আনন্দ, একই পাত্রে এত তৃষ্ণার সঙ্গে এমন সঞ্জীবনীর পরিবেশন বিশ্বসাহিত্যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তহারা। এবং প্রুস্তের স্রষ্টা তাঁকে তৈরি করেছিলেন সকাল থেকে জীবনের অকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই মুহূর্তটির জন্যে—যে মুহূর্তে রূপের অর্গলমুক্তিতে ঘটে অপরূপের দর্শন।

"No one has better helped us to grasp in ourselves that passage from childhood to maturity, and ultimately to old age, which is what we mean by living. For that reason, his book from the very first moment of its publication, took its place among the bibles of humanity."

মহৎ সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য, এবং লক্ষণও ওই : "What we mean by living"—তারই মহৎ অন্বেষণ।

প্রুস্তের জীবনতৃষ্ণা সকল মানবজীবনের আকুল পিপাসার সংহত রূপ। কিন্তু 'রিমেমব্রেন্স অফ থিংগ্‌স্ পাস্ট' সেই তৃষ্ণার উত্তরে উপস্থিত এক বিশেষ সঞ্জীবনী। এ উত্তর প্রুস্তের একার।

প্রুস্তের এবং বিশ্বসাহিত্যের উপন্যাস প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে বলি, বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে এখানে যেসব বই বিচারের সম্মুখীন তাদের মধ্যে একটি আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যাবে লেখকদের আশ্চর্যতর অমিলের মধ্যেই। এর কোনও লেখাই যিনি লিখেছেন তিনি ছাড়া আর কেউ তা লিখতে পারতেন না। একটি 'ব্রাদার্স কারামাজোভ' লিখতে একজন দস্তয়ভস্কিরই দরকার ছিল। ফ্লবের ছাড়া 'মাদাম বোভারি,' বালজাক ব্যতীত 'দি কমেডি হিউমেন', তলস্তয় বাদে 'ওয়ার এণ্ড পীস,' স্তাঁদাল না হলে 'দি রেড এণ্ড দি ব্ল্যাক' লিখত কে? এঁরা সকলেই এই বিশেষ গ্রন্থটি লেখবার জন্যে সারা জীবন সারস্বত-সাধনা করেছেন। এঁদের কারুর বই অন্য কারুর কলমেই লেখা হত না। এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান। কিন্তু প্রত্যেকের প্রতিভাই বিশিষ্ট ও অনন্য।

প্রুস্তের 'রিমেমব্রেন্স অফ থিংগ্‌স্ পাস্ট' সেই বিশিষ্টের মধ্যেও বিরল। জীবনে ও সাহিত্যে প্রুস্ত নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ।

সমাপ্ত

শ্রীদেবব্রত রেজ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্টাফ-নার্স মৃণাল সকালে হাসপাতালে ডিউটিতে এসেছেন। এসে শুনলেন তাঁর ওয়ার্ডে এক বিচিত্র রোগীকে গতরাত্রে ভর্তি করা হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার একটা ফুটপাথে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। বিদ্যুতের চমকে মৃণালের মনে হল 'সে'। বেডের কাছে দেখলেন ঠিকই। সেই-ই। রোগীর মাথায় তাঁর ওলটানো চুলের ওপর হাত বুলোতে থাকেন মৃণাল।

সমীরের মুখে যে হাসিটা কুঁড়ির মত মুদিত হয়েছিল সেটা ফুটল ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে দিলেন সমীর। ডান হাতখানা যেন মন্ত্রচালিতের মত উঠে এল। মৃণাল হাতখানা নিজের ডান হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখলেন।

সমীর আবার চোখ বুজে খুব নিম্নস্বরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বললেন, আমায় চিনতে পারছ? আমি বহুদূর থেকে আসছি। বহুদূর থেকে। মহাভারতের যুদ্ধের পর আমি কুরুক্ষেত্র থেকে বেরিয়েছি।...আমার পায়ে যে ধুলো জমেছে দেখছ সেই ধুলো এসেছে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে, উজ্জয়িনী থেকে, কনৌজ থেকে, গৌড় থেকে, নবদ্বীপ থেকে। আমি শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনায় ছিলাম।... ছিলাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পার্শ্বচরদের মধ্যে। আসছি বহুদূর থেকে।

মৃণাল তাঁর কপালে মুখে হাত বুলিয়ে দেন গভীর আবেগে। সমীর কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকেন। আবার যেন ঘুমের ঘোরে কথা বলে ওঠেন। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি ডাক্তার! আমি মানুষের দেহকে চিনেছি ব্যবচ্ছেদ করে। মনটাকে খুঁজে পাই নি দেহের কোথাও। কিন্তু মনকে দেখেছি আমি। কেমন জান? আমার মধ্যে সে লতার মত ছায়া থেকে সব সময় মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছে আলোর দিকে। তোমার দিকে। দেখেছি আমার মধ্যে রাত্রিতে ফুলের কুঁড়ির মত নিঃশব্দে অজ্ঞাতসারে ফুটতে। তোমাকে দেখে!

মৃণালের দু চোখে অশ্রু টলমল করে ওঠে। ডাক্তার ইতিমধ্যে কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন মৃণাল টের পান নি।

সিস্টার!—ডাক্তারের ডাকে মৃণালের সম্বিৎ ফিরে আসে।

সিস্টার, তুমি মুভ্‌ড্‌ হয়ে গেছ!

মৃণাল একবার জোর করে হাসবার চেষ্টা করেন। হাসিটা ঠোঁটের কিনারা পর্যন্ত এসে ফিরে যায়।

হ্যাঁ ডাক্তার, আমি মুভ্‌ড্‌! আমি এঁকে চিনি।

আমার মনে হচ্ছে সিস্টার, তুমি একে খুব বেশী চেন! তোমার কোন—

ডাক্তারের মুখে এসেছিল হারানো-মানুষ বুঝি!

ডাক্তার গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, কিন্তু তুমি এ কি করছ সিস্টার, ওকে পরীক্ষা করেছ কি?

না তো!—কী একটা অজানা আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে যান মৃণাল।

গতরাত্রে ওঁর রক্তচাপ বেশ কম ছিল। ভোরবেলায় দেখা গেল রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী। রক্তচাপের এমন অসিলেশন আমি দেখি নি। অদ্ভুত।

নার্স পাল্‌স্‌ ধরে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে আশ্বস্ত স্বরে বললেন, মনে হচ্ছে ঠিক আছে ডাক্তার।

তবু আমাদের সাবধান হতে হবে সিস্টার। সব সময় ক্লোজ ওয়াচে রাখতে হবে।

আমি—আমি ওকে সব সময় দেখব ডাক্তার।—ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন মৃণাল।

ডাক্তার হেসে বললেন, আরও তো রোগী আছে তোমার ওয়ার্ডে সিস্টার?

মৃণাল ধীরে ধীরে বললেন, হ্যাঁ, তা আছে ডাক্তার।

ওদের প্রতিও তো তোমার কর্তব্য আছে?

হ্যাঁ, আছে, নিশ্চয়ই আছে।—দৃঢ়স্বরে বললেন মৃণাল।

এই কর্তব্যের কথা তিনি যে মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিলেন তারই স্বীকৃতি ফুটে উঠল তাঁর এই দৃঢ়স্বরে। ধীরে ধীরে সমীরের হাতখানা নামিয়ে রেখে মৃণাল ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীদের খবর নিতে চলে গেলেন। মন তাকে বলল, কিছু ভয় নেই। তুমি ওকে আর হারাতে পার না।

* * *

ডিউটি শেষ করে এসে আবার যখন সমীরের কাছে দাঁড়ালেন মৃণাল তখন ডাক্তাররা তাঁকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। রক্তচাপ খুব দ্রুত ওঠানামা করছে। ডাক্তারেরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন।

সিনিয়র ডাক্তার বললেন, মস্তিষ্কের ওপর স্তরে বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। হয়তো চেতনারও। সাধারণ চেতনা যেন তার সীমাটাকে ডিঙিয়ে যেতে চাইছে বারংবার। ডিঙিয়ে যেতে পারছে না, অদৃশ্য বাঁধে ঘা খেয়ে ফিরে আসছে।

মৃণাল কাছে গিয়ে মাথায় হাত রাখলেন। সমীরের বোধের মধ্যে এই স্পর্শের অনুভূতি জাগল। যন্ত্রচালিতের মত ডান হাতখানা উঠে এল। মৃণাল সেই হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে ফেললেন। না, আর তিনি হাতখানা ছেড়ে দেবেন না। কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না। ছেড়ে দিলেই যেন চেতনা স্খলিত হয়ে পড়ে যাবে। অন্যান্য সকলে একটা বিচিত্রগতি চেতনার সহসা অবসানের জন্যে তৈরি হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সমীরকে ঘিরে।

কিন্তু আশ্চর্য, রক্তচাপ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল। সমীর চোখ মেলেই দেখলেন, সামনে একটা মেদুর সূর্য উঠেছে। এই সূর্য ধীরে ধীরে একটা মুখের অবয়ব নিল। একখানা চেনা মুখ। বুকের মধ্যে চেতনার গভীরে মুদ্রিত একখানা চেনা মুখ। সমীরের ঠোঁটে যে সুপ্ত হাসিটা কুঁড়ির মত গুটিয়ে ছিল তা ধীরে ধীরে ফুটে উঠল।

মৃণাল সিনিয়র ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললেন, আমাকে এঁর কাছে থাকতে অনুমতি দিন ডাক্তার। এঁকে ছেড়ে গেলে চলবে না।

ডাক্তার বললেন, তা আমি দেখেই বুঝেছি। তোমার আপনজন হয়তো। তুমি ওঁকে কেবিনে নিয়ে যাও। কাছে থাক। তোমাকে আমি ছুটিও দিচ্ছি যে কদিন প্রয়োজন। বুঝেছি ইনি তোমার—

হ্যাঁ, ইনি আমার—

কে? হারানো স্বামী?

মৃণাল ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

সমীর অস্ফুট স্বরে বললেন, বহুদূর থেকে আসছি। বড় ক্লান্ত।

মৃণাল মনে মনে বললেন, জানি বন্ধু জানি, তুমি মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে এসেছ! তোমার ডান হাত আর আমি ছেড়ে দিচ্ছি না। জানি, ছেড়ে দিলেই ভাটার টানে তুমি আবার সেই দূরে—বহুদূরে ভেসে যাবে, হয়তো হারিয়ে যাবে।

* * *

এদিকে গত সন্ধ্যা থেকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত অচেতন হয়ে পড়ে আছেন শীলভদ্র শীলাবতী তীরের রাজবাড়িতে। মাঝে মাঝে চেতনার ঘোলাটে ভাবটা কেটে যাচ্ছে বাদলদিনের মধ্যে রৌদ্রোজ্জ্বল খণ্ডিত প্রহরের মত, আবার এই প্রহরখণ্ডের শেষে ঘনচ্ছায়া ঘনতর হয়ে আসছে।

শয্যার পাশে বসে আছেন বৃদ্ধ গ্রাম্য কবিরাজ আর দরজার বাইরে এক বৃদ্ধ আর এক আদিবাসী ভৃত্য নিশ্চল হয়ে বসে শালপাতার সিগার 'চুটি'তে ধূমপান করছে।

শীলভদ্রের বাক্‌শক্তি লুপ্ত। শুধু চোখ দুটো চেয়ে আছে। অন্য দুজন বৃদ্ধ তন্দ্রায় নিমীলিত নয়ন। শীলভদ্রের দৃষ্টি কোনও অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আবদ্ধ।

জানলার বাইরে সূর্য অস্ত যাচ্ছেন। মাটির লাল, আকাশের লাল, শালগাছের নতুন কিশলয়ের লাল, সব লাল মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই লাল পশ্চিম

আকাশের নীচে কোথাও জমাট, কোথাও মেঘের কোলে কাঁচা সোনার রঙে মিশে হালকা। আকাশের প্রান্তে দিনের রঙিন আশাভাঙটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে আর সেই আশাভঙ্গের রঙ ভারহীন বেগহীন অসংখ্য প্রবাহে আকাশের মার্গে পড়েছে ছড়িয়ে।

ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে এল এই রঙ। আলো জ্বালার ক্ষণ এল। শাঁখ বাজল কাছাকাছি। রানী সংবাদ নেবার জন্যে ঘরে ঢুকলেন।

সন্ধ্যার বেশবিন্যাস শেষ করে এসেছেন রানী। কেশকে কবরীতে বেঁধেছেন। পুষ্টল মুখের ওপর সুগন্ধি রেণু মেখেছেন। ঘরের মধ্যে চন্দনের গন্ধ বয়ে আনলেন।

ভাদ্রের ভরা নদীর মত দেহ। নিজের পূর্ণতার ভারে মন্থর। প্রতিমার মত ডিম্বাকৃতি সরল রেখাহীন কুঞ্চনহীন মুখে কিসের একটা প্রতীক্ষা অন্যমনস্কতার ছাপ ফেলেছে। সূর্যোদয়ের পূর্বে পাহাড়ী হ্রদের বুকের মত মুখখানা।

তবে এ সূর্য রাত্রির সূর্য, তাই আলোর আগে ছায়া ফেলেছে।

কবিরাজ চোখ মেলে রানীর দিকে চেয়ে ইশারায় শীলভদ্রের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, পরবের মধ্যে কোনও ভয় নেই। পরব বলতে বোঝালেন শালুই পরব। শালগাছে ফুল ধরলে আদিবাসীরা এই পর্বের অনুষ্ঠান করে। আমাদের বসন্তোৎসবের মত। মোড়া থেকে উঠে গলার চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভৃত্যকে সাঁওতালী ভাষায় কিছু বলে শিস-নামিয়ে-রাখা লণ্ঠনটি হাতে তুলে নিলেন। যাবার আগে ঘরের মধ্যে রানীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'চলাবাঙকানা!' রানী অন্যমনস্ক ছিলেন। আচম্বিতে এই শব্দ শুনে শুধু ঘাড় নাড়লেন।

কাছারীর প্রাঙ্গণে কে এল ঘোড়ায় চড়ে। অনুচ্চ হ্রেষাধ্বনিতে ঘোড়াটি ভারমুক্ত হওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য জানিয়ে দিল। রানী মন্থরগতিতে জানলার ধারে গিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলেন। চাঁদটা পরিপূর্ণ গোল। দূরে মাদল বাজছে।

রানীর মুখের উপর একটা চকিত ভাব বিদ্যুতের মত চমকে উঠল। শীলভদ্র চোখ মেলে চেয়ে ছিলেন। কিছু দেখলেন কিনা কে জানে। তাঁর চোখের ভিতরে ওপারে যে জ্ঞানের আকাশ সেই আকাশে কখনও মেঘ জমছে কখনও মেঘ কাটছে। সেই জ্ঞানের ভুবনে কয়েক নিমেষের জন্যে দুর্যোগটা কেটে গেল। রানী তাঁর ঈষৎ চলমান চোখের দিকে চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'গুরুজী, চলাবাঙকানা!' তারপর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আর কোন কথা বলার সময় ছিল না তাঁর। কে তাঁকে বাইরে থেকে টানছিল।

শীলভদ্র দেখছেন সামনের শূন্যটায় একটা কাল্পনিক রঙ্গমঞ্চে ছবির পর ছবির আবৃত্তি। একটা ছবিতে তাঁর স্বর্গতা মা তাঁর সাদা শাঁখাশোভিত হাতে কিশোর শীলভদ্রকে ধবধবে অন্ন পরিবেশন করছেন। একটা ছবি বন্ধুপত্নী নির্মলার ছবি। তারপর একটা দীঘির ছবি। তারপর একটুকরো দীঘির সোপান। এই সোপানের নীচে কালো জল চিকচিক করছে। কারও চোখের মতন। এর পর কলকাতার বাড়ির ছবি—বাড়িটার জানলা দরজা কিছু নেই। একটা নিশ্ছিদ্র ব্লক।

রানীর ঘর থেকে দুটো ভিন্ন গ্রামের হাসির লহর ভেসে এল। শ্রাবণের আকাশে গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁপে কেঁপে কালো মেঘ আসে যেমন!

একদল সাদা বক···নীচে ভরা নদী···নৌকোর পাল হঠাৎ ঘুরে গেল। ভয়! নদীর তীরে কে একজন বসে রয়েছে, হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে—মাথায় দুটো পাকানো কালো শিং!

সুস্মিতা নৌকো করে চলেছে···কোথায় কে জানে। তার কাঁকন ঝিকমিক করছে। কাঁকনে ঠিক্‌রে-পড়া আলো সোজা আকাশে উঠে যাচ্ছে একটা মোটা সোনালী সুতোর মত। তার কালো চুল কাঁপতে কাঁপতে মেঘ হয়ে গেল। সেই মেঘ ভেঙে পড়ল বৃষ্টিতে। বৃষ্টির ধূসর দেওয়ালটা সামনে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। অদৃশ্য বহু জনের জনতা হায় হায় করে উঠল।

কে যেন কাঁদছে···বোধ হয় রানীর ঘরে। কান্নাটা যেন কেমন! স্প্রীংয়ের মতন। আর একটা কান্না

ছুটে এল। তলোয়ারের মতন। নরেনের স্ত্রীর কান্না। আবার একটা কান্না। এবার ডুকরে ডুকরে কান্না। সব হারানোর কান্না। সুস্মিতার!

আর একটা ছবিতে দেখলেন কারা নরেনকে চিতায় পোড়াচ্ছে। অমাবস্যার রাত্রে। নদীর বাঁকে বহু দূর থেকে সাদা ধোঁয়ার সঙ্গে টকটকে লাল শিখারা লাফিয়ে উঠছে আকাশের দিকে।

ধীরে ধীরে নদীটা মিলিয়ে গেল।

শূন্যে একটা চিতা।

চিতাটা মিলিয়ে গেল।

একটা কুণ্ডলী···আগুনের—

কুণ্ডলিত আগুন উর্ধ্বে উঠে থেমে গেল।

শীলভদ্র নিজে যেন উর্ধ্বে আকাশে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন।

শীলভদ্রের চেতনার ক্ষণিক পরিচ্ছন্ন আকাশে অপ্রত্যাশিত বিদ্যুতের মত এই ধারণা খেলে গেল যে তিনি মরছেন। পরের নিমেষে চেতনার সম্মুখ থেকে সমস্ত চিত্র বিলুপ্ত হয়ে গেল। সমগ্র চেতনা একটা অস্পষ্ট অনুভূতিতে পর্যবসিত হল। কূলহীন অতল এক সমুদ্রের মত একটা অস্তিত্বহীনতার মধ্যে তিনি যেন ধীরে ধীরে অক্লেশে মিলিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে রানীর ঘরে তাঁর স্বামীর বন্ধু রাজাবাহাদুর তাঁর দীর্ঘ ও বিস্তৃত বপুটা দিয়ে রানীর শয্যা আবৃত করে অসংযত বেশবাসে শায়িত হয়ে রয়েছেন। মেঝেতে রানী নন্দিনী সূক্ষ্ম রেশমবস্ত্রে আবৃত গৌরবর্ণ মেদপিণ্ডের মত পড়ে গুমরে গুমরে কাঁদছেন, রাজাবাহাদুর সুরার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রয়েছেন। সহসা একটা বুনো গোসাপের মতন মাথাটা তুলে নন্দিনীর দিকে চেয়ে গর্জন করে উঠলেন। তাঁর নেশায় রুদ্ধ কণ্ঠে ব্যাঘ্র গর্জনের অনুকরণ কুকুরের একটা ঘেউয়ের মত শোনাল। নন্দিনী তবুও চুপ করল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এবার রাজাবাহাদুর কোনরকমে সোজা হয়ে বিছানায় বসে ধমকে উঠলেন, এই, চোপ!

তবু চুপ করল না দেখে বিছানার পাশে দেওয়ালের কুলুঙ্গি থেকে একটা শূন্য কাচের পাত্র তুলে নিলেন কম্পিত হাতে। এই শূন্য পাত্রটা মেঝের উপর বিক্ষুব্ধ মেদপিণ্ডটার দিকে ছুঁড়তে গিয়ে সেটা তাঁর নিজের পোশাকের এক জায়গায় বেধে গেল। তখন সেই পাত্রটারই উপর ক্রুদ্ধ হয়ে সেটাকে ছুঁড়ে দিলেন ছাদ থেকে ঝোলানো একটা পুরনো কাচের ঝাড়ের দিকে। কাচ ভাঙার শব্দে সমস্ত বাড়িটা ঝনঝন করে উঠল। কাচের ঝাড়ের আলোটা গেল নিভে। নন্দিনী তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার সমস্ত দেহ একটা অপমানকর যন্ত্রণায় খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল নিমেষেই। কিছুক্ষণ আগে একটা প্রবল পশু তার দেহটাকে দলিত-মথিত করে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তটাকেও।

রাজাবাহাদুর অন্ধকারের মধ্যে টলতে টলতে উঠে তাঁর ভারী পায়ের নীচে ঘরের মেঝেতে গড়িয়ে-পড়া নন্দিনীর দেহকে মাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নন্দিনী যন্ত্রণায় একটা তীব্র চিৎকার করে উঠল।

এই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে শীলভদ্রের আত্মা আর একটা নিঃশব্দ চিৎকারের মত অস্তিত্বহীনতায় অগাধ শূন্যে বেরিয়ে পড়ল। হারিয়ে গেল ভুবনের গর্ভে একটা আলোর কিরণের মত। কিংবা অনন্তের চত্বর বেয়ে অনির্দেশ্যের দিকে ধেয়ে গেল।

নন্দিনীর চিৎকার শুনে রাজাবাহাদুর বাইরে এক নিমেষ থমকে দাঁড়িয়ে পা বাড়িয়ে দিলেন নীচে নেমে যাবার সিঁড়িতে। সিঁড়িতে এক পা নামিয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন, 'চলাবাঙকানা!'

* * *

কালো স্টীলের দেওয়ালের মত রাত্রি চতুর্দিক ঘিরে বসেছে। ডিরেক্টার রায়ের চিত্তের অরণ্যের মধ্যে যত ছায়া তারা যেন বাইরে বেরিয়ে এসে কালো ষ্টীলসীটের মত শক্ত হয়ে গেছে আর রায়ের ভয় তাদের পরস্পরের সঙ্গে ওয়েল্ড করে দিয়েছে।

যুদ্ধের পর রায় যেন একটা স্টীলের পিল বাক্সে আশ্রয় নিয়েছেন। সমস্ত বিপদের বাইরে। বরেন হার মেনেছেন, তিনি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বরেনের থিসিস তাঁর নামে ছাপা হয়েছে। ছাপা হয়েছে পোলাণ্ডে। কোলাপোড়ার দেশে!

রক্তে সুরাস্রোত তরল আগুনের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। টলমল করছে সম্মিলিত ইন্দ্রিয়ের কাঠামো।

টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ছাপা থিসিসের দু দিকের দুটো পাতা সামনে খুলে রেখে রায় অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছেন তাদের দিকে।

দু হাত দিয়ে পাতা দুটো চেপে ধরে আছেন। ভয় হচ্ছে, পাতা দুটো কাগজের পাতা নয়, কোন পাখির দুটো ডানা। ছেড়ে দিলেই এই দুটো ডানা মেলে সেই পাখিটা উড়ে চলে যাবে যেটাকে বহু সাধনায় তিনি নিজের খাঁচায় পুরেছেন। বরেনকে ছেড়ে দিয়েছেন, এটাকে তিনি ছাড়বেন না। যদি এই পাখিটার পিঠে চড়ে তিনি স্থানকালের ওপরে চলে যেতে পারেন।

···কী আশ্চর্য! এর আত্মাও অমরত্বের লিপ্সায় লিপ্সিত!

মাঝে মাঝে ঘোলাটে চোখে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছেন। কেউ কোথাও নেই। সামনে টেবিলে সুরার বোতল। মাথার উপর সিলিং ফ্যানের পাখায় তাড়িত আলো কাঁচের গায়ে স্থির হয়ে বসতে পারছে না। একটা আহত পাখি যেন বসতে চাইছে কিন্তু পারছে না।

রায়ের নিজের মধ্যে কী একটা পতপত করে উড়ছে। বসতে চাইছে, বসতে পারছে না। এই রক্তমাংসের দাঁড়টার ওপর ঘুরেফিরে বসতে চাইছে, বসতে পারছে না।

চোখ দুটোকে জোর করে মেলে রায় আর একবার চেয়ে দেখলেন, কাছাকাছি, সামনে, পাশে কেউ নেই ওই বোতল আর এই ছাপা থিসিসের বুকলেটটা ছাড়া।

বিদেশিনী সঙ্গিনী ঘরে ঢুকলেন। জুতোর খুটখুট শব্দে চমকে উঠলেন রায়। যেন বুকের মধ্যে কে ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করল। অস্পষ্ট দৃষ্টি মেলে দেখতে চাইলেন। চকিতে মনে হল মৃণালের জলে ধোয়া একখানা রঙিন পোর্ট্রেট। পরমুহূর্তে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

কারখানায় শিফট্ বদলের সাইরেন চিৎকার করে উঠল।

রায়ের মাথাটা একতাল কাদার মত গড়িয়ে পড়ল টেবিলে। দু হাতের মুঠির মধ্যে থিসিসের দুটো পাতা ছিঁড়ে গুটিয়ে গেল।

চিৎকার করে উঠলেন বিদেশিনী। ছুটে এসে টেবিল থেকে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ডাক্তারকে টেলিফোন করলেন।

স্ট্রোক!

টেলিফোনটা ছেড়ে ভীতচকিতের মত চেয়ে রইলেন রায়ের মেদপিণ্ডটার দিকে। ঠোঁট থেকে অস্পষ্ট দুটো কথা বেরিয়ে এল good bye...

* * *

গভীর অন্ধকারে অজ্ঞাত এক পাহাড়ী অঞ্চলের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে একটা মোটর গাড়ি ছুটে চলেছে বরেনকে নিয়ে। রাত্রিশেষে বন্দরে পৌছতে হবে। সেখান থেকে জাহাজ ছাড়বে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

বরেনের মনে হল তিনি যেন একটা অন্ধকারের সীমা খুঁজতে বেরিয়েছেন। সামনে হেডলাইটের আলো ছাড়া অন্য কোথাও কোন আলোর চিহ্ন নেই। এই চলন্ত আলোকধারার দু ধারে অন্ধকার জমাট বেঁধে গেছে। এই জমাট অন্ধকার ভেদ করে দু পাশে কিছু দেখা যায় না। সামনে নিরবচ্ছিন্নভাবে জেগে উঠছে বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি, কালো পাথরের পিঠ আর মাঝে মাঝে এই কালো পাথরের ফাঁকে কোথাও কোথাও হাওয়ায় দোদুল্যমান অচেনা ফুলের স্তবক। মোটরের ইঞ্জিনের চাপা গর্জন, পথের বাঁক ঘোরার সময় চাকার চিৎকার—এ ছাড়া শব্দ নেই। সহসা দু-একটা পাখির চিৎকার চারদিকের নিস্তব্ধতাকে ছুরির মত চিরে ফেলে দেয়। হেডলাইটের আলোর ধাক্কায় মধ্যে মধ্যে এক ঝাঁক পাখি কলরব করে উড়তে থাকে। তাদের দু-একটা সামনের কাচে ধাক্কা খেয়ে পাথরের টুকরোর মত শব্দ করে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে।

হঠাৎ গাড়িতে বসেই টের পেলেন নরম একটুকরো প্রাণীন মাংসখণ্ডের ওপর দিয়ে গাড়ির চাকাটা গড়িয়ে গেল।

নিষ্পিষ্ট এই ক্ষুদ্র প্রাণের মুহূর্তের স্পন্দন কোটি গুণ বর্ধিত হয়ে তাঁর দেহে সঞ্চারিত হল। আর, এর ঘায়ে আর একটা বিপুল স্পন্দনের সাড়া জাগল দেহে মনে।

কোলাপোভার কোমল স্পন্দিত পেশীর স্পর্শ আর একটা জীবনের মত সঞ্চারিত হয়ে গেছে তাঁর দেহে। সেই অপূর্ব বিস্ময়কে সেদিনের শেষ ও প্রথম আলিঙ্গনে যে ভাবে উপলব্ধি করেছেন বরেন সে উপলব্ধি শুধুমাত্র পদার্থের উপলব্ধি নয়, পদার্থের মধ্যে নিহিত এক অনির্বচনীয়ের অনুভূতি। দেহ মন বুদ্ধি ও আত্মা দিয়ে পাওয়া অখণ্ড অনুভূতি। কোলাপোভার দেহের স্পন্দন তিনি সমস্ত শিরায় শিরায় অনুভব করছেন। দ্রুতগতি এই যান্ত্রিক যানের স্পন্দন, হেডলাইটের আলোর স্পন্দন, চকিতে দৃষ্টিতে ভেসে ওঠা ওই গাছের কাণ্ডের মধ্যে রসের স্পন্দন, মনের মধ্যে স্মৃতির স্পন্দন, চেতনার দুর্বোধ্য হাহাকার এই ঘনসন্নিবিষ্ট অন্ধকারের মধ্যে, সব মিলিয়ে ছিল কোলাপোভার দেহের অন্তিম স্পন্দনের মধ্যে।

* * *

সে রাত্রিও ছিল এমনি ঘন অন্ধকার। অদৃশ্য মেঘে আকাশের অসংখ্য আলোকবিন্দু গিয়েছিল নিভে। সে রাত্রির ঘটনার স্মৃতি সাধারণ স্মৃতির মত মনের মধ্যে ঘটনার ম্লান প্রতিবিম্ব নয়। হ্যালুশিনেশনের মত চিত্রকল্প নয়। ঘটনার সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি।

বাইরে ঘোর অন্ধকার। ঘরের মধ্যে স্তিমিত আলো। বরেনের ঘর আর কোলাপোভার ঘরের মধ্য থেকে পর্দাটাও গেছে সরে। একাকার হয়ে গেছে দুটো ঘর। কোলাপোভা দুটো ঘরের মাঝখানে খোলা দরজার একটা পাল্লায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সোনালী চুলের মধ্যে সোনার ধুলোর মত ছড়িয়ে পড়েছে স্তিমিত আলো। এই কদিনে কোলাপোভার মুখমণ্ডলের যে ভাষা সেই ভাষা যেন ভাষান্তরে অনূদিত হয়ে গেছে। একটা ফরাসী কবিতা যেন জর্মন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে কিংবা বাংলা পয়ার ছন্দ সংস্কৃত শার্দুল বিক্রীড়িত ছন্দে।

কোলাপোভা কঠিন হয়ে দুটো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। যেন পাথর হয়ে গেছেন। বরেন আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন কোলাপোভার এই রূপান্তরে। বরেন বারংবার বললেন, কোলাপোভা, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে, আহার সেরে বিশ্রাম কর। সারারাত জেগে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

কোলাপোভা উত্তর দেন না। ঘাড় ফিরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বারান্দায় পদচারণারত সশস্ত্র প্রহরীর দিকে চেয়ে থাকেন।

বরেনেরও নিদ্রা নেই। তিনিও নিস্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন শয্যার কানায়। ঘড়িতে রাত্রি দ্বিপ্রহর বেজে গেছে। ঘরের মধ্যে স্তিমিত আলোতে কোলাপোভার নীল চোখ কী একটা প্রতিজ্ঞার আগুনে ঝকঝক করে জ্বলছে। নিভে আসা দূরে থাক, এ আগুন স্তিমিতও হচ্ছে না মুহূর্তের জন্য।

বাইরে সশস্ত্র প্রহরীর পদচারণা বন্ধ হয়ে গেল।

জলের নীচে যে নিস্তব্ধতা সেই রকম একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। স্থির জলের উপরে মাছের পুচ্ছ তাড়নার মত এই নিস্তব্ধতার উপর প্রহরীর যে পদশব্দ উঠছিল এতক্ষণ তাও বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু ঝিল্লীর শব্দ উঠছে— নিস্তব্ধতার অব্যাহত স্পন্দনের মত।

হঠাৎ কোলাপোভা নিঃশব্দ চরণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিমেষের মধ্যে চিৎকার করে উঠলেন, বরেন, আমি একে ধরে রেখেছি, তুমি পালাও, পালাও। দেরি করো না, শীগগির পালাও।

বাইরে ধস্তাধস্তির শব্দ এই গভীর নিস্তব্ধতায় জলের মধ্যে জালে পড়ে যাওয়া একটা বিরাট মাছের ঝাপটার মত শোনাল। বরেন বেরিয়ে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখলেন, কোলাপোভা পিছন থেকে প্রহরীকে জড়িয়ে ধরেছেন। প্রহরী নিজেকে মুক্ত করার চেয়ে তার বন্দুককে সামলাতে ব্যস্ত। কোলাপোভা চিৎকার করে ওঠেন, পালাও বরেন, পালাও।

সহসা বন্দুকের গুলির শব্দ রাত্রির এই গভীর নিস্তব্ধতাকে চূর্ণ করে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র চিৎকার উঠল।

একটি প্রাণ শব্দের একটি জ্বলন্ত তীরের মত শূন্যে মিলিয়ে গেল। কোলাপোভার চিবুকের নীচে দিয়ে বন্দুকের গুলি প্রবেশ করেছে সরাসরি তাঁর মস্তিষ্কে।

প্রহরী ও বরেন দুজনে ধরে কোলাপোভার দেহটাকে ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরে আলো জ্বালা হল।

প্রহরী নিজের অজ্ঞাতসারে গার্ড অব অনারের প্রথাসম্মত ভঙ্গীগুলি পুনরাবৃত্তি করে শেষে দীর্ঘ একটি স্যালুট জানিয়ে একচক্র ঘুরে সৈনিকের পদক্ষেপে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বরেনের দেহ মন আত্মা নিয়ে যে গোটা চেতনা তা গভীর শোকে বিবশ হয়ে পড়ল। উন্মাদের মত কোলাপোভাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বহু দিন কল্পনায় মন দিয়ে আত্মা দিয়ে এই দেহটিকে আলিঙ্গন করেছেন বরেন; আজ এই প্রথম দু বাহু দিয়ে দেহ দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তখনও কোলাপোভার ত্বকের নীচে স্পন্দন বন্ধ হয় নি। চক্ষু মুদ্রিত হয়ে গেছে, বক্ষের স্পন্দন চিরকালের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেছে—তবু মনে হল, কোলাপোভার ত্বক্ আর ত্বকের নীচে যে পেশী সেই পেশী তাকে চিনতে পেরে স্পন্দিত হয়ে উঠল। যে জ্ঞান মস্তিষ্ক ছাড়াও দেহময় ব্যপ্ত হয়ে থাকে সেই জ্ঞান দিয়ে যেন কোলাপোভা তাঁর আলিঙ্গনে সাড়া দিলেন।

* * *

আজ এমন অন্ধকারে দ্রুতগামী গাড়ির চাকার নীচে যখন একটা পাখি পিষে মরে গেল তখনও তাঁর দেহের শেষ স্পন্দনটুকু এই যান্ত্রিক কাঠামোর নিজস্ব স্পন্দন ছাপিয়ে বরেনের দেহে ছড়িয়ে পড়ল। বরেনের দেহে কোলাপোভার শেষ স্পন্দনটি এই স্পন্দনটুকুর ঘায়ে পরিবর্ধিত হয়ে গেল। বরেনের দেহমন যেন একটা জীবন্ত অ্যাম্প্লিফায়ার।

রক্তমাংসের দেহ আজ তাঁর চোখে একটা নতুন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এই জীবন্ত দেহ, এই রক্তমাংসের অপূর্ব বিস্ময়। এতকাল তিনি যে তত্ত্ব নিয়ে মুগ্ধ ছিলেন তা সৃষ্টির কেন্দ্রিয় বিষয় নয়, তা সৃষ্টির কেন্দ্রের চারিদিকে গাছের কাণ্ডের উপরে মৃত ত্বকের মত প্রাণহীন আবরণ। আজ এই আবরণ ভেদ করে গেছে তাঁর ধী, তাঁর বুদ্ধি তাঁর চেতনা। সৃষ্টির এই গণিত গ্রাহ্য আবরণটার নীচে সৃষ্টির যে সার তা তাঁর চোখে আজ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে, চোখে বলতে চোখে নয়, তাঁর সমস্ত চৈতন্যে ধরা পড়ে গেছে।

মনে পড়ল কোলাপোভার কোমল মর্মরের মত দুটো পা। অঙ্গুলিতে বাঙ্ময় একটা শুভ্র বিস্ময়। রক্তাভ নখে বাঙ্ময় অঙ্গুলি। মনে পড়ল দুটো বাহু। ওই যে প্রাণ গাছের কাণ্ডে গোল হয়ে রয়েছে, গোল হয়ে রয়েছে ফুলের কুঁড়িতে, গোল হয়ে রয়েছে পতঙ্গের চোখে, সেই প্রাণ তার চরম বিকাশ পেয়েছিল ওই দুটো বাহুর ডৌলে। এই বাহুও বাঙ্ময় ত্বকে, ত্বক বাঙ্ময় মসৃণতায়; যে ভাষায় বাঙ্ময় সে ভাষা কোনদিন মানুষের মুখে ফুটবে না।

বরেন অনুভব করছেন তিনি যেদিকে চলেছেন সেই দিকে কোলাপোভা গেছেন। এমন এক ভুবনের দিকে যা চোখে দেখা যায় না, বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, কিন্তু যা রয়েছে এইখানে এখনি। এই ভুবনে তিনি কোলাপোভা খুঁজতে বেরিয়েছেন। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সন্ধান করতে।

মানুষ জানে না, সবাই এই ভুবনের অগাধ বিস্ময়ে বাস করছে। মানুষ জানে না, সবাই এই ভুবনে সন্ধানে বেরিয়েছে। এই সন্ধানে মানুষ মানুষের সঙ্গী!

সহসা পাহাড়ী পথ ছেড়ে গাড়ি এসে পড়ল সমতলে। এতক্ষণ আকাশ ছিল আবৃত, এবার উপরের আকাশে সহস্র সহস্র তারার দীপ জলে উঠল। দূর থেকে বিশাল জলরাশির একটা বিচিত্র গন্ধ ভেসে এল।
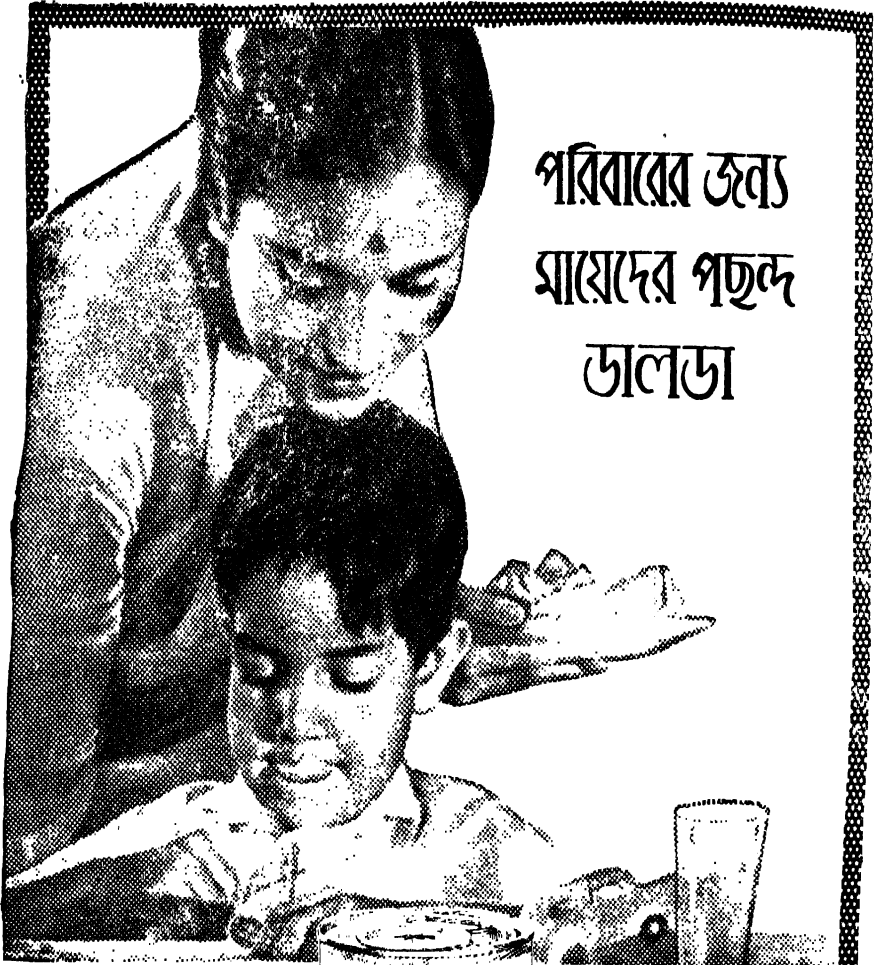
সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড : কাব্যভাষ্য

॥ প্রেমচেতনা : চতুর্থ অধ্যায় ॥

॥ ভিক্টোরিয়া : বিদেশী ফুল ॥

১

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "বিজয়া" শীর্ষক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কবিজীবনে মাদাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ভিক্টোরিয়া জন্মসূত্রে দক্ষিণ-আমেরিকার অধিবাসিনী। কিন্তু দীক্ষাসূত্রে ভারতকন্যা। তাঁর দুই গুরু—মহাত্মা গান্ধী আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁর গুরু-ঋণ স্বীকার করে বলেছেন :

"This wisdom, which in my case is not wisdom but rather feeling and intuition, I owe in great part to two men born in a distant land, belonging to a civilization and a race apparently different from mine (if not in their roots atleast in their branches): Gandhiji and Gurudev. The former, I saw and heard only once, in 1931. As to the latter, to my lasting happiness, our paths were to cross and intermingle."[১]

ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যখন দেখা হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌষট্টি। ভিক্টোরিয়া উত্তর-তিরিশ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভিক্টোরিয়ার মনোভাবকে প্লেটোর পরিভাষায় বলা যেতে পারে দিব্য-এরসের লীলা। আমাদের অলংকারকৌস্তুভের ভাষায় ভাবরতি।

১৯২৪-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে দক্ষিণ-আমেরিকার সান-ইসিড্রোতে বসন্ত ছিল অজস্র গোলাপের সৌরভে আমোদিত। এই অপূর্ব-সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিক্টোরিয়া তাঁর প্রাণের প্রিয় কবির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বলেছেন :

"That spring was, in San Isidro, limpid and warm, with an extraordinary abundance of roses. I used to spend the mornings in my room, with all the windows open, smelling them, reading Tagore, thinking of Tagore, writing to Tagore, waiting for Tagore."[২]

রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়ার প্রিয় কবি, কেন না রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' তাঁর এক আধ্যাত্মিক সংকটে তাঁর মনকে সান্ত্বনা ও আশ্রয় দিয়েছিল। যে-কবির কাব্য তাঁর মানস-সংকটে দ্বিগুণিত আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল তাঁকে দেখবার পরম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসেছিলেন ভিক্টোরিয়া। 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাই তিনি বার বার আবৃত্তি করছিলেন :

"If it is not my portion to to meet thee in this my life then let me ever feel that I have missed thy sight—let me not forget for a moment, let me carry the pangs of this sorrow in my dreams and in my wakeful hours.

মূল বাংলা কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে,

তবে তোমায় আমি পাই নি যেন
সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই,
শয়নে স্বপনে।

ভিক্টোরিয়া বলছেন, এই পঙ্‌ক্তিগুলি কণ্ঠে নিয়ে, আমি স্পষ্ট বলতে পারব না, আমি কার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম—রবীন্দ্রনাথের, না রবীন্দ্রনাথের দেবতার। কবির প্রতি অনুরাগিণী ভক্তের এই প্রতীক্ষাই পূর্ণ হল রবীন্দ্রনাথের আগমনে।

কিন্তু স্বভাব-কর্ত্রীত্বশালিনী ভিক্টোরিয়া তাঁর প্রিয় কবির সাক্ষাৎ দর্শনে সমস্ত মুখরতা হারিয়ে ফেললেন। তিনি লিখছেন:

"I felt frozen by the sudden and real presence of this distant man with whom my dreams had made me so familiar and who had been so close to my heart when all I had known of him were his poems. This is the usual reaction of shy people when faced by those whom they are eager to meet"[৩]

একলা কবির সামনে বসলে তাঁর আত্মপ্রকাশের সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে যেত। "When we were alone together, shyness deprived me of all means of expression."[৪] অনুরাগিণীর এই সলজ্জ মধুর নীরবতাই "বিদেশী ফুল" কবিতার জন্ম দিয়েছে। আমরা প্রথম খণ্ডে তার উল্লেখ করেছি।

২

রবীন্দ্রনাথের নিজের দিক থেকে তাঁর সারা জীবনের কাব্যসাধনার এ এক দুর্লভ পুরস্কার। প্রাচীন কালের কবির ভাগ্যকে আধুনিক কালের কবি ঈর্ষার চোখে দেখেছেন। কবি বলছেন:

জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে।
তোমরা আধুনিক মালবিকা,
কিনে পড় কবিতা
আরামকেদারায় বসে।
চোখ বুজে কান পেতে শোন না;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা;
দোকানে পাঁচসিকে দিয়েই খালাস।

শুধু বেলফুলের মালা নয়, কবির কণ্ঠে অনুরাগের মালা পরিয়ে দিলেন ভিক্টোরিয়া—তাঁর সাগরপারের মালবিকা। একটি গানে কবি তাঁকে বলেছেন তুলনাহীনা। "সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।" শুধু কবির ভাবতন্ময় দৃষ্টিতেই নয়, পৃথিবী-পরিব্রাজক দার্শনিক কাইজারলিংও তাঁকে একই বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। বলেছেন, ভিক্টোরিয়া এমন এক নারী যাঁর সর্বাতিশায়ী গরিমা প্রশ্নের অতীত। ভিক্টোরিয়া সারস্বতকন্যা। এমন ভক্ত-পাঠিকার অনুরাগ যে-কোন কবির পক্ষেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধের ধন। বলাই বাহুল্য কবিচিত্ত অনুরঞ্জিত হল।

এই ভ্রমণে কবির একমাত্র সঙ্গী ছিলেন লিওনার্ড এল্‌মহার্স্ট। পাঁচ বছর পরে কবি সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করে এল্‌মহার্স্টকে লিখছেন:

"The picture appeared to me so distant and yet so vividly near. The whole scene was exotic in character offering no associations with which we were familiar. The vision of it brought to me a happiness that made me feel almost sad, for it was of a kind that could no longer he repeated to-day. We two were unequal in age, but I was not aware of the diffirence for a moment, and our companionship was so utterly simple and intimate. I think you were the only one who closely came to know me when I was young and old at the same time."[৫]

কবি যখন একই সঙ্গে তরুণ ও প্রবাণ ছিলেন তখনকার কবিচিত্তের কথাই ধরা পড়েছে বুয়েনোস-এয়ারিস, সান ইসিড্রো, চাপাড মালালে লেখা কবিতাগুচ্ছে। একই সঙ্গে তরুণ ও প্রবীণ। দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রার সমুদ্রপথে হারুণা-মারু জাহাজে বসে

কবি ১৯২৪ সনের ৫ই অক্টোবর যে ডায়ারি লেখেন তাতে একটা দশ-বারো বছরের ছেলের কথা আছে যে-ছেলেটি খোলা ছাদে খালি গায়ে যা-খুশি করে বেড়ায়। কবি বলছেন আকাশের আলিঙ্গনে-বাঁধা ওই ভোলামন ছেলেটিতে একটি নিত্যকালের কথা আছে। কবির মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথা তাঁরই খুব ভিতরের কথা. গোলেমালে অনেককাল তার দিকে চোখ পড়ে নি।[৭]

বস্তুতঃ, বুয়েনোস-এয়ারিসে পৌঁছে কবির দ্বিতীয় কবিতার নাম "কিশোর প্রেম"। তার শেষ অনুচ্ছেদটি সেদিনকার কবিমানসের বাণীরূপ। কবি বলছেন :

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,
আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা।

সেই কিশোরের ভাষাতেই পরবর্তী কবিতাগুলি বিরচিত। ভিক্টোরিয়াও তাঁর প্রিয়-কবির মধ্যে একটি শিশু-সত্তাকে আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলছেন, কোন কোন দিক দিয়ে কবি ছিলেন একেবারে শিশুর মত। In some ways Tagore was like a child. শুধু তাই নয়, বয়সে তাঁর পিতার সমান এই বিদেশী কবির প্রতি তিনি মাতৃসুলভ কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হতেন এবং তাঁকে কখনও কখনও শিশুর মতই গ্রহণ করতেন। কবি তখন ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। বস্তুতঃ, জাহাজে থাকতেই তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়। তাতে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ওপরও চাপ পড়েছিল। ডাক্তারেরা তাঁকে এক-সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রাম করতে বলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আর পেরু যাওয়া হল না, সান-ইসিড্রোয় এক সপ্তাহের বদলে তিনি থাকলেন এক মাস কুড়ি দিন। এই এক মাস কুড়ি দিন ভিক্টোরিয়ার জীবনে পরম আশীর্বাদ হয়ে এল। তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করে বলছেন, "To say I did not bless the 'flu', in spite of all the concern it caused me, would be a lie."[৮] অনুরাগ প্রকাশের ভাষা এর চেয়ে সুন্দর আর কী হতে পারে!

৩

ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে লেখা কবিতাগুচ্ছকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন অলস মুহূর্তের ছায়াতলে বেড়ে ওঠা একগুচ্ছ লাজুক ফুল। একখানি পত্রে তিনি বলছেন, "...to-day I discover that my basket, while I was there, was being daily filled with shy flowers of poems that thrive under the shade of lazy hours."[৯]

কবির এই নব-অনুভূতির সঙ্গে ঋজু বা তির্যগ্‌ভাবে সম্পৃক্ত ছাব্বিশটি কবিতা দিয়ে এই 'লাজুক ফুলের গুচ্ছ' রচিত হয়েছে। এই কবিতা ষড়-বিংশতির কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

১০ নভেম্বর ১৯২৪	বুয়েনোস-এয়ারিস	শীত
১১ "	"	কিশোর প্রেম
১১ "	"	প্রভাত
১২ "	"	বিদেশী ফুল
১৫ "	"	অতিথি
১৬ "	"	অন্তর্হিতা
১৭ "	"	আশঙ্কা
২১ "	"	শেষ বসন্ত
২২ "	"	বিপাশা
২৬ "	"	চাবি
২৭ "	"	বৈতরণী
১ ডিসেম্বর	"	প্রভাতী
৪ "	"	মধু
৭ "	"	অদেখা
১০ "	"	চঞ্চল
১১ "	"	প্রবাহিণী
১৬ "	চাপাড মালাল	আকন্দ
১৭ "	"	কঙ্কাল
২৪ "	বুয়েনোস-এয়ারিস	না-পাওয়া
২৫ "	"	সৃষ্টিকর্তা
২৭ "	সান-ইসিড্রো	বীণাহারা
২৮ "	"	বনস্পতি
২৯ "	"	পথ

৯ জানুয়ারি ১৯২৫, জুলিয়ো চেজারে জাহাজে		মিলন
১০	”	অন্ধকার
১৭	”	বদল

৪

ঐই কবিতাগুচ্ছের “শীত”, “বৈতরণী” ও “কঙ্কাল”—এই তিনটি কবিতায় কবিমানসে জরা বার্ধক্য ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব এবং কবি কর্তৃক তা অস্বীকার করার অনুভূতি ভাষা পেয়েছে। “শীত” কবিতায় কবির জিজ্ঞাসা—

শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল
গানের বেলা শেষ না হতে হতে?

এর উত্তর কবি নিজের অন্তরের সারস্বত বিশ্বাসের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন। তাই কবিতার অন্তিম স্তবকে তিনি বলছেন :

মন যে বলে, নয় কখনোই নয়,
ফুরায়নি তো, ফুরাবার এই ভান :
মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুখে ফিরে আসার গান।

যাবার মুখে এই ফিরে আসার গানের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এ গানগুলি আসলে প্রেমের গান। কবি বলছেন, তাঁর মনের কথা শীর্ণ শীতের লতা নগ্ন শাখার ফাঁকে ফাঁকে হিমের রাতে লুকিয়ে রাখে ফাল্গুনেতে তাঁর প্রিয়ার চরণমূলে ফুলে ফুলে ফিরিয়ে দেবে বলেই। শীতের জরাকে জয় করার পরেই কবিচিত্তে দেখা দিল মৃত্যুর বৈতরণী। তরল খড়্গের মত ধারা তার। কবি বলছেন, তাঁর বিশ্বের আলোতে কতবার বৈতরণীর খেয়ার তরণী এসে তাঁর কত উৎসবের বাতি কালহীন বিলুপ্তির কালোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু কবি বলছেন, অদৃশ্যের উপকূলে যেখানে ধরণী তার শেষ সীমায় থেমে গেছে সেই নির্জনে মৃত্যুর অরূপতলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফোটে, সব গান দীপ্ত হয়ে ওঠে শ্রাবণের পরপারে মৃত্যুর নিঃশব্দের কণ্ঠহারে। তাই কবি বলছেন :

যে-সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে,
যে চির-মধুর
দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর।

* * *

চিত্তের নিশীথ রাত্রে গাঁথে তারা নক্ষত্রমালিকা;
অনির্বাণ আলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা।

প্রেমের মন্ত্রই যে মৃত্যু-বিজয়ের মন্ত্র, এই সত্যই এ কবিতার ফলশ্রুতি। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা “কঙ্কাল”। কবিকণ্ঠও সেখানে বলিষ্ঠ। মাঠের পথের একপাশে ঘাসের ওপর পশুর কঙ্কাল পড়ে আছে। পাণ্ডু অস্থি রাশি যেন কালের নীরস অট্টহাসি। কবি বলছেন :

সে যেন রে মরণের অঙ্গুলি নির্দেশ,
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারো অন্ত ভেদ নাহি লেশ।
তোমারো প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধুলায় অনাদরে।

কবি বলছেন, বিধির এই বৃহৎ পরিহাস তিনি কিছুতেই নন। অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত এই মহৎ সর্বনাশ তাঁর নিয়তি নয়। কেন না তিনি শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে জ্যোতির্ময় আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন—তাই তাঁর কণ্ঠে মৃত্যুবিজয়ের অভীক বাণী উচ্চারিত হয়েছে :

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপমধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।

এই কবিতাত্রয়ে উচ্চারিত মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতই কবিজীবনের প্রৌঢ়-বসন্তে তাঁর প্রেমচেতনার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে।

৫

কবির প্রৌঢ়-বসন্তের এই প্রেমচেতনায় আবিষ্ট কবিমানসের আত্মপরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে “প্রভাত” “শেষ বসন্ত”, “চাবি”, “প্রভাতী”, “মধু”, “অদেখা”, “চঞ্চল”, “প্রবাহিণী” ও “বনস্পতি” কবিতায়। “চাবি” কবিতায় কবির একটি সুকুমার বাসনা ভাষা পেয়েছে। বিধাতা তাঁর মনকে বহু কক্ষে ভাগ-করা হর্ম্যের মতন সৃষ্টি করে তার অন্তঃপুরের কক্ষটি তালাবন্ধ করে তার চাবিটি লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন।—

শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামতো অতিথির তরে ;
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।

*   *   *

সেথায় লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে,
মধ্যাহ্নে করুণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ডাকে।

কবির একান্ত কামনা, কেউ এসে তাঁর অন্তঃপুরের রুদ্ধদ্বারের চাবিটি খুঁজে পাক। তারই জন্যে কবির প্রতীক্ষা।—

মনে করি যদি কভু পাই তার দেখা
যে-পথিক একদিন অজানা সমুদ্র-উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি ;

*   *   *

অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান ;
খুলিবে সে গুপ্ত দ্বার কেহ যার পায় নি সন্ধান।

'কেহ যার পায় নি সন্ধান'—এ কথাটার মধ্যে কবিজনোচিত অত্যুক্তি অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সেই গুপ্ত দ্বার খুঁজে পাওয়ার পথের সঙ্কেত জানা যাবে মৌমাছির কাছে,—কবির এই উক্তি থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, তাঁর হৃৎকমলের মর্মকোষে সঞ্চিত প্রেমের মধুই সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষের ভাণ্ডার পূর্ণ করে রেখেছে। মৌমাছির ব্যঞ্জনাটি এই অর্থেই সার্থক।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মৌমাছি আর পুষ্পমধুর কল্পনায় পুরাতন কবিপ্রসিদ্ধিটি এখানে প্রতীপধর্মিতা লাভ করেছে। প্রাচীন কবিদের দৃষ্টিতে পুরুষচিত্তই মৌমাছি, আর প্রেমময়ী নারী মধুস্বাদী পুষ্পের উপমানে উপমিত। রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে মধুপূর্ণ কমলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে-নারী সেই প্রেমের সন্ধানে আসবে তারই উপমান মধুসন্ধানী মৌমাছি। "প্রভাতী" কবিতায় কবি বলছেন :

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি।
হৃদয়কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

অর্থাৎ কবির এই প্রেমচেতনায় আমি-চেতনার চেয়ে তুমি-চেতনাই অধিকতর ক্রিয়াশীল। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা নয়, যাকে ভালবাসি তারই প্রীতিকামনা এর লক্ষ্য। প্রীতিকামনাও নয়, প্রিয়জনের আত্মিক তৃপ্তি-বিধান করেই এ প্রেমের চরিতার্থতা। "প্রভাত" এবং "মধু" এই দুটি কবিতা বিশ্লেষণ করলেই আমাদের বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার পথে আণ্ডেস জাহাজের নৈরাশ্যপ্রপীড়িত অন্ধকার দিনগুলির অবসানে বুয়েনোস-এয়ারিসে পৌঁছে কবির মনে হল তিনি যেন সুদীর্ঘ অমারাত্রির অবসানে প্রভাতের আলোর মুখ দেখলেন। স্বর্ণসুধাঢালা সেই প্রভাতের পরিপূর্ণ অবকাশ কবিচিত্তে নূতন উপলব্ধির জন্ম দিল। তিনি বললেন :

মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশ-পদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।

"প্রভাত" কবিতায় বর্ণিত আত্মমানসের এই উপমানটিতে কবি খুশী হতে পারেন নি। "মধু" কবিতায় তাই মৌমাছির উপমানকে অস্বীকার করে এল আকাশে-ওড়া পাখির উপমান।—

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।

*   *   *

পাখির মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে
উধাও উৎসাহে ;
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়,···

অর্থাৎ মৌমাছির মত মধুসঞ্চয়ে ভাণ্ডার পূর্ণ করা নয়, পাখির মতন শুধু ওড়বার আনন্দ। আকাশের বক্ষ হতে স্বর্ণ-আলোকের মধু পাখায় নিয়ে উধাও উৎসাহে নভোবিহার। রূপকল্পটি ঈষৎ জটপাকানো। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থে কবির বক্তব্য অস্পষ্ট নয়। মৃত্তিকার মধু নয়, আকাশের আলোই এ প্রেমের অভিপ্রেয়। ভাষান্তরে তারই নাম রূপের পদ্মে অরূপমধু পান। অলংকার-

কৌস্তভের ভাষায় একে বলা যেতে পারে অসম্প্রয়োগবিষয়া প্রীতিরতি। পাক থেকে পাকান্তর প্রাপ্ত হয়ে তাও রূপের পদ্মে অরূপমধু পানেরই সহোদরা। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, পাখির রূপকল্পটি প্লেটোর 'ফিড্রাস' ডায়লগের পক্ষবান আত্মার রূপকটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[১০]

ভালবাসা যে চিরচঞ্চল—এ ধারণা কবির চিরদিনের। "চঞ্চল" কবিতায় বলছেন, "হায় রে তোরে রাখব ধরে, ভালোবাসা, মনে ছিল এই দুরাশা।" কিন্তু কবি সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন—

অনেক দুঃখে গেছে বোঝা
বেঁধে রাখা নয় তো সোজা,
সুখের ভিতে নহে তোমার
অচল বাসা।

তাই কবির সংকল্প—

এবার আমি সবফুরানো
পথের শেষে
বাঁধব বাসা মেঘের দেশে।

কিন্তু মেঘের দেশে তার বাসা হলেও, দুর্গম দূর শৈলশিরের স্তব্ধ তুষার সে নয়। সে আপনহারা ঝরনাধারায় ধূলির ধরায় নেমে এসেছে। স্তব্ধতার পাষাণ-বক্ষে সে কলমন্দ্র-মুখরা 'প্রবাহিণী'। প্রবাহিণীর আত্মপরিচয় ছলে কবি ভালবাসারই স্বরূপ বর্ণনা করে বলছেন :

মন্দ্রস্বরের মন্ত্র শুনাই
গভীর গুহার আঁধার তলে,
গহন বনের ভাঙাই ধেয়ান
উচ্চহাসির কোলাহলে।
শুভ্র ফেনের কুন্দমালায়
বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই,
যোগীশ্বরের জটার মধ্যে
তরঙ্গিণীর নূপুর বাজাই।

৬

ভিক্টোরিয়া কবিচিত্তে কিভাবে ধরা দিয়েছেন তার পরিচয় রয়েছে "বিদেশী ফুল", "অতিথি", "বিপাশা", "আকন্দ" এবং "বনস্পতি" কবিতায়। কবির কাছে একলা বসলে ভিক্টোরিয়ার কণ্ঠে কথা হারিয়ে যেত। কবিচিত্তে তারই প্রতিবেদন পড়েছে "বিদেশী ফুলে"। কবি বলছেন :

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম—
"কী তোমার নাম,"
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমার পরিচয়।

পাঁচটি স্তবকে পাঁচটি প্রশ্ন ও তার কবিকল্পিত উত্তরের মালা এই কবিতাটি। কী তোমার নাম? কোথা তুমি থাক? ভাষা কী তোমার? চেন তুমি মোরে? এবং সর্বশেষ জিজ্ঞাসা, মোরে ভুলিবে কি? শেষ প্রশ্নের উত্তরে কবিকল্পনা বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। "অতিথি" কবিতাটি স্বতঃস্ফূর্ত। ওর শেষ পঙ্‌ক্তিমিথুন—

জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,
"প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।"

"বিপাশা" কবিতায় কবি তাঁকে বলছেন মায়ামৃগী। বলছেন :

শূন্য পথে মনোরথে
ফের আকাশপার,
বুকের মাঝে নাই বহিলে
অশ্রুজলের ভার!
এমনি করেই যাও খেলে যাও
অকারণের খেলা;
ছুটির স্রোতে যাক্ না ভেসে
হালকা খুশির ভেলা।

"বনস্পতি" কবিতায় ভিক্টোরিয়া দিগঙ্গনার রূপকে ধরা দিয়েছেন। সম্পর্ক অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। "বনস্পতি" কবিতাটির আলোচনা প্রথম খণ্ডে করা হয়েছে। এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্য হবে।[১১]

ভিক্টোরিয়ার আরেকটি উপমান হয়েছে আকন্দ। কবিতাটির দুটি অংশ। প্রথম অংশে 'আকন্দবল্লভ রবি' সাগরপারের দেশে বসে তাঁর অতীত দিনের একটি স্মৃতিকে স্মরণ করছেন। একদিন ভুবনডাঙার মাঠে গোয়ালপাড়ার বাটে কবি যখন নতুনফোটা গানের কুঁড়ি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন কবির ছন্দে বাসা বাঁধার

আকাঙ্ক্ষায় আকন্দ পাঠিয়েছিল তার করুণ ভীরু গন্ধ। বসন্তের বনভূমিতে মালতী যূথী জাতির দলে আকন্দ এতদিন কবির বন্দনা পায় নি। কবি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার প্রার্থনা পূরণ করবেন। সাগরপারের দেশে মন-কেমনের হাওয়ার পাকে সেই স্মৃতি তাঁর চিত্তে করুণ সুরে বাজল। কবিতার দ্বিতীয় অংশে আছে মৌমাছির বন্ধু আকন্দের বন্দনা। তার অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন :

আকাশের একবিন্দু নীলে
তোমার পরাণ ডুবাইলে,
শিখে নিলে আনন্দের ভাষা।
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালবাসা।

কবিতাটি চাপাড মালালে লেখা। ভিক্টোরিয়া এ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কবিতাটি লেখা যখন প্রায় শেষ তখন ভিক্টোরিয়া ছিলেন কবির সামনে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। উভয়ের মধ্যে ছিল নৈঃশব্দ্যের দুস্তর ব্যবধান। ভিক্টোরিয়া বলছেন, Miles and miles of silence surrounded us. তখন বিকেলের চায়ের সময় হয়েছে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া আবদার করলেন, কবিতাটি তাঁকে তক্ষুনি অনুবাদ করে শোনাতে হবে। কবি তাঁকে আক্ষরিক অনুবাদ করে শোনালেন। ভিক্টোরিয়া বলছেন, "What he read, hesitating sometimes, seemed to me tremendously enlightening. It was as if by miracle, or chance, I had entered into direct contact, at last, with the poetic material (or raw material) of the written thing without having on the pair of gloves translations always are—gloves that blunt our sense of touch and prevent our taking hold of the words with sensitive bare hands...."[১২]

ভিক্টোরিয়া কবিকে সমস্ত কবিতাটি অনুবাদ করে তাঁকে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। পরদিন যখন কবি তাঁকে অনূদিত কবিতাটি দিলেন তখন দেখা গেল অনেক কথাই তাতে বাদ পড়েছে। ভিক্টোরিয়া এর কারণ কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন। কবি বললেন, যে-সব অংশ তিনি বাদ দিয়েছেন সেগুলি প্রতীচ্যবাসীর মনকে স্পর্শ করবে না বলেই তিনি মনে করেন। ভিক্টোরিয়া অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, কবির এ ধারণা মারাত্মক ভুল। ভিক্টোরিয়া ঠিকই বলেছেন। আকন্দ ব্যঙ্গ্যার্থে যে অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছে তাতে সে দেশ-বিশেষের সীমাকে অতিক্রম করে লাভ করেছে সার্বভৌম ব্যাপ্তি।

৭

ভিক্টোরিয়াকে উপলক্ষ্য করে লেখা প্রেমের কবিতাগুলির কাব্যোৎকর্ষ বিচার করা অসঙ্গত নয়। কবিতা রচনাকালের প্রায় পনেরো বৎসর পরে ১৯৩৯-এর মার্চে ভিক্টোরিয়াকে লেখা এক চিঠিতে কবি বলছেন, "Possibly you know that the memory of those sunny days and tender care has been encircled by some of my verses—the best of their kind ; the fugitives are made captive, and they will remain,..."[১৩] অর্থাৎ কবি এই কবিতাগুলিকে সমপর্যায়ের কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করতেন। কবিতাগুলির মধ্যে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ লাভ করা যায়। "অন্তর্হিতা" ও "আশঙ্কা" কবিতার আলোচনা আমরা প্রথম খণ্ডে করেছি। কিন্তু ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা হল "শেষবসন্ত"। এই কবিতায় কবির অনুভূতি যেমন অকুণ্ঠ তেমনি আবেগগর্ভ। প্রকাশভঙ্গিও অলজ্জ অসংকোচে স্বতঃ-উৎসারিত। আবেদন অতির্যগ্‌ ভঙ্গিতে মর্মস্পর্শী। কবি বলছেন :

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলেছিনু তাই
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।

* * *

ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো,
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।

সময় রয়েছে বাকি :
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।

*　　*　　*

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব প্রিয়ে,
সুমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

এই তিনটি স্তবকে ভিক্টোরিয়ার প্রতি কবির অনুরাগের সব কথাই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্যে "শেষবসন্ত" সত্যসত্যই অনবদ্য, অতুলনীয়।

৮

ভিক্টোরিয়ার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগকে আমরা অসম্প্রয়োগবিষয়া প্রীতিরতির সমশ্রেণীভুক্ত করেছি। শেলি এপিসাইকিডিয়নে তাঁর প্রেমচেতনা সম্পর্কে গিস্‌বোর্ণকে বলেছিলেন,—"It is a mystry ; as to real flesh and blood, you know I do not deal in these articles ."[১৪] প্রেমচেতনার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেলির সগোত্র শিল্পী। তাঁর শেষবসন্তের অনুরাগের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে "না-পাওয়া", "সৃষ্টিকর্তা", "পথ", "মিলন", "অন্ধকার" ও "বদল" কবিতাগুলিতে।

কবিমানসের রসায়নাগারে বহুবিচিত্রের সমন্বয়ে যে যৌগিক উপলব্ধির সৃষ্টি হয় তার কথাই কবি বলেছেন "না-পাওয়া" কবিতায়।—

কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাগ করে কে লইবে চিনে।

কিন্তু সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যেই কবির বিধাতার সানন্দ সমর্থন বর্তমান। "সৃষ্টিকর্তা" কবিতায় কবি বলছেন :

যে দিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহর মাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে-সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয় তিমিরে।

তাই রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ব্যক্তি-প্রেমও বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে একই ছন্দে বাঁধা। ব্যক্তিসীমায় যে অনুভূতি মিলন-বিরহের সুখদুঃখের লীলায় আন্দোলিত তা বিশ্বলীলারই অংশমাত্র। এ লীলা শিশুর খেলার মতই অহৈতুকী। ভিক্টোরিয়াকে একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "I assure you that through me a claim comes that is not mine. A child's claim upon its mother has a sublime origin—it is not a claim of an individual, it is that of humanity."[১৫] "পথ" কবিতায় এই অনুভূতিকেই পথের চেতনামূলে ভাষা দিয়ে কবি বলছেন :

বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে।

*　　*　　*

ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা,
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা।

'পূরবী'র যে-অংশে এই কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে কবি তার নাম দিয়েছেন 'পথিক'। বস্তুতঃ এ-চেতনা কবিকে গৃহের বন্ধনে বাঁধে নি, চলার পথেই তাঁকে আনন্দের বেগে এগিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে জুলিয়ো চেজারে জাহাজে বসে কবি যে কবিতাগুলি রচনা করেন তার মধ্যে "মিলন", "অন্ধকার" ও "বদল"—এই তিনটি কবিতায় ভিক্টোরিয়ার সদ্য-ফেলে-আসা দিনগুলির স্মৃতিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই সময়ে কবি ভিক্টোরিয়াকে যে-সব চিঠি লেখেন তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কবিতাগুলির প্রেরণার উৎস সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারা যায়। কবি ভিক্টোরিয়াকে একটি চিঠিতে লিখছেন, "When we were together we mostly played with words and tried to laugh away best opportunities to see each other clearly.

[৫৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রদোষের প্রান্তে

মূল রচনা : The Edge of Darkness—Mary Ellen Chase

অনুবাদ : রাণু ভৌমিক

৫

যে রাত্রে সারা হন্ট মারা গেলেন সে রাত্রে ডাক্তার দশটার পরে ওঁকে দেখতে এসেছিলেন। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে তিনি ভিজে কোটটা ঝুলিয়ে রাখবার আগে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝাড়েন। লুসী সারার বিছানার পাশে বসেছিল। ডাক্তার তাকে বললেন যে জীবনে এ রকম খারাপ কুয়াশা তিনি দেখেন নি। পঞ্চাশ মাইল আসতে তাঁর প্রায় তিন ঘণ্টা লেগেছে।

—আমার আলো দুটো রান্নাঘরের আলোর চেয়ে জোরালো,—উনি বললেন, এবং গাড়ীর উইণ্ডস্ক্রীন প্রায় স্পঞ্জের মত। প্রধান সড়কের অবস্থাই খুব খারাপ আর তোমাদের এই রোডে ঢুকতে গিয়ে তো মনে হল যেন নরকের ভেতর দিয়ে চলেছি।

উনি হাত ধুয়ে রান্নাঘরে গেলেন। সেখানে থেডাস টেবিলের ওপরে বিশ্রীভাবে শুয়েছিল। পাকা চুলে ভর্তি মাথাটা ওর হাতের ওপরে। ওর পরনে একটা ধূসর ফ্লানেলের সার্ট। গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখটা পরিষ্কার। টেবিলের ওপরে একটা খালি বোতল ও একটি পাত্র। ডাক্তার সেগুলো সরিয়ে রাখলেন।

—এবারে এভাবে ও কতক্ষণ আছে?—খোলা দরজা দিয়ে তিনি লুসীকে প্রশ্ন করেন।

—সমস্ত দিনই।—লুসী উত্তর দিল, ও সমুদ্রের তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, বাড়ি থেকে অনেক দূরে। শেষে যখন ওকে খুঁজে পাওয়া গেল তখন কিছুই করবার ছিল না। কুয়াশার জন্যে দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমি রাত্রের খাবার করে রেখেছিলাম কিন্তু ও তা স্পর্শ করে নি। আটটা বাজবার পর থেকে একটিও কথা বলে নি। তারপরে আমি যখন বললাম আজকের দিনে এ রকম করা অত লজ্জার তখন ও উত্তর দিল যে, পরবর্তী দু দিন আর মদ খাবে না। অবশ্য ওর কথায় কোন বিশ্বাস নেই।

—হতভাগা!—ডাক্তার উত্তর দিলেন। শোবার ঘরে ঢোকবার আগে উনি রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দেন।

লুসী খাটের মাথার দিকে বসেছিল। টেবিলে আলাদীন দীপ জ্বলছে। ওর কোলে সারার সেলাইয়ের বাক্স। ও একটা মোজা রিপু করতে করতে ধবধবে বালিশে শায়িতা নীরব মহিলার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। ঘর নিঃশব্দ। কিংবা যদি কিছুটা শব্দ নীল আলোর হিসহিসানি বা সারা হন্টের মুখ দিয়ে নেওয়া নিঃশ্বাস মনে হচ্ছিল, তা বাইরের গোলমালে শোনা যাচ্ছিল না।

এখনও জোয়ারে পূর্ণতা আসে নি। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাসে সমুদ্রের জল ফুলে উঠে বেলাভূমি ভাসিয়ে দিয়ে কাঁকর ও পাথরের নুড়ি নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। জোয়ার-ভাটার ওঠানামার ক্ষীণ বিরতিতে ওরা দোলানো ডিঙিগুলোর ও মাছ ধরবার বোটের গায়ে জলের ধাক্কার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পাচ্ছিল। গীয়ারের শব্দ, শেড ও গোলাঘরের পাশে জমিয়ে রাখা বয়া, ফাঁদ, দাঁড়ের তালা ও নোঙর শিকলের ঝনঝনানি এবং আরও কাছে কুয়াশা-ঢাকা লিলাক ঝোপে অবিরাম পতনধ্বনি ও স্প্রুস গাছের মাতামাতি।

লুসীর এগিয়ে দেওয়া চেয়ারে বসবার আগে ডাক্তার সারা হন্টের নাইটগাউনের উঁচু কলার খুলে স্টেথিসকোপ দিয়ে ওঁর বুক পরীক্ষা করেন। তারপরে তিনি সাদা বিছানার ওপরে রাখা ওঁর শীর্ণ নীল হাতখানি ধরে রইলেন।

—আর বেশী দেরী নেই।—ডাক্তার বলেন।

—আমি কি থেডাসকে জাগিয়ে দেব?

—কোন প্রয়োজন নেই, অবশ্য তুমি পারবে বলেও মনে হয় না। ওঁর যদি জ্ঞান ফিরেও আসে তাহলে উনি ওকে এই অবস্থায় দেখে সুখী হবেন না। ও ওখানে যথেষ্ট নিরাপদ। সকাল না হওয়া পর্যন্ত ও সুস্থ হবে না।

জোয়ারের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাইরের শব্দধ্বনিও উচ্চতর হতে থাকে। লুসী ভাবে, ওরা যেন একটি ক্ষুদ্র ভঙ্গুর ঝিনুকে রয়েছে—যাকে সমুদ্র অনবরত দোলাচ্ছে এবং কষ্ট দিচ্ছে।

—ওঁকে যতটা প্রশান্ত দেখাচ্ছে সেইরকমই সে শান্তি কি উনি অনুভব করছেন?

—হ্যাঁ। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করতাম। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

ডাক্তার লুসীর দিকে তাকালেন। সে সেলাইয়ের বাক্সটা আলোর ওদিকে রেখে দিয়ে চশমার কাচে নিঃশ্বাস ফেলে রুমাল দিয়ে সযত্নে মুছে আবার নাকে পরে।

—লুসী, আজ পর্যন্ত তুমি কতবার এই দৃশ্য দেখেছ?

—অনেকবার।—লুসী উত্তর দেয়।

—লুসীর মনে হয় ওরা যেন অনেকক্ষণ নীরব হয়ে আছে। কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে কোন প্রবল প্রয়াসের অনুভূতি নেই। বরাবরই তার মনে হয়েছে সারার জীবন এই ভাবে শেষ হবে। দুজনে শুধু থাকবে ওর পাশে—সে ও ডাক্তার। থেডাসের প্রতি ক্রোধ ও ভুলে গেল। থেডাস এখানে না থাকায় ভালই হয়েছে।

ঢেউয়ের গর্জনের বিরতির ফাঁকে বাইরে কাঠের টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়বার শব্দ হল। ফাঁদগুলো —লুসী ভাবে, এইরকম দিনে থেডাসের উচিত ছিল ওগুলো ঘরের মধ্যে রাখা।

ডাক্তার আবার কথা বলতে শুরু করেন, কিন্তু এবারের মত আর কখনও দেখি নি। তুমি বা আমি কেউ আর ঠিক এমনটি দেখব না। এখানে আসবার সময়ে রাস্তাকে গালাগালি দেওয়া এবং গর্তে পড়বার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার ফাঁকে ফাঁকে আমি এই কথাই ভাবছিলাম—মিসেস হন্টের সঙ্গে সঙ্গে এই উপকূলে একটা যুগের অবসান হবে। গত মাসে ওঁর নব্বুই পূর্ণ হয়েছে। উনি নিজেই বলেছিলেন। তার মানে উনি পাল-তোলা জাহাজের প্রথম দিকে জন্মেছিলেন। যতদিন উনি জীবিত ছিলেন অতীতের কিছুটা অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ।

—যৌবনে উনি স্বামীর সঙ্গে সব জায়গায় ভ্রমণ করেছেন।—লুসী উত্তর দিল, প্রায় কুড়ি বছর। যতদিন না জাহাজে স্টীম ইঞ্জিন চালু হয়েছিল। কিন্তু, আপনি তো আমার মত সবই জানেন!

ডাক্তার উত্তর দিলেন, উনি যখন জন্মেছিলেন তখন প্রায় তিরিশ বছর, এই উপকূল মধ্য-পশ্চিমের চেয়ে চীন ও ভারতের অনেক কাছাকাছি ছিল। যে তৃতীয় শ্রেণীর শহরটায় আমি থাকি তারাও বছরে দশ-বিশটা জাহাজ তৈরি করত এবং সমস্ত পৃথিবীতে লোক পাঠাত। সেকালের লোকদের চিন্তাধারা অন্য রকম ছিল, তারা শুধুমাত্র হেরিং মাছ প্যাক করা ও ব্লু-বেরী টিনে ভরা নিয়ে ব্যস্ত থাকত না।

—এখানেও জাহাজ তৈরি হত।—লুসী বলল, টাইডাল নদী পর্যন্ত জাহাজ নির্মাণের ডক ও উঠোন। জাহাজ জলে নামবার সময়ে তীরের যেসব ক্ষতিচিহ্ন করেছিল তার অস্তিত্ব এখনও আছে। ড্যান থারস্টনের বাড়ি পার হয়ে অন্তরীপেরও পরে যেখানে সমুদ্র গভীর এবং ঢাকা সেখানে এখনও এই সব দেখা যায়। যে শাগ দ্বীপে উনি জন্মেছেন এবং সমাহিত হতে চেয়েছেন সেখানেও পুরনো পচা কাঠ আর লোহার স্তূপ। শাগ দ্বীপে গত কুড়ি বছরের মধ্যে কোন জীবন্ত প্রাণী দেখা যায় নি, শুধু নভেম্বরে কয়েকজন শিকারী ওখানে যায়। আমি যখন এখানে সবেমাত্র এলাম তখনও কয়েক ঘর জেলে ওখানে বাস করত, কিন্তু তারাও এখন চলে গেছে। ওই দ্বীপটা যে কখনও অন্য রকম ছিল তা ভাবতেও অবাক লাগে।

—স্থান, পাত্র সবই সেকালে আলাদা ছিল।—ডাক্তার উত্তর দিলেন, সমগ্র পৃথিবী জাহাজে ঘুরে বেড়ালে মনে কখনও সঙ্কীর্ণতা থাকতে পারে না। আর, তুমি যদি নিজে নাও যাও, যারা বেরিয়েছে তাদের মুখে গল্প শোন তাহলেও অনেক কথা জানতে এবং অপরাপর বন্দর ও দেশের লোকদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। আচ্ছা, গত পাঁচ বছর হল আমি

এখানে আসছি কিন্তু উনি আমাকে আগেকার জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। তোমাকে নিশ্চয়ই বলেছেন?—ডাক্তার লুসীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

—সম্প্রতি বেশী কিছু বলতেন না।—লুসী উত্তর দেয়, কিন্তু বুঝতে পারা যেত সর্বদাই ওঁর মনে এই চিন্তাই বয়ে চলেছে। বর্তমানের জীবন তো যন্ত্রণাময়। অতীতের দিনগুলোই সুখের স্মৃতিতে ভরপুর হয়ে অন্তরের গহন কোণে বিরাজ করত।

—সমুদ্র হৃদয়কে লোহা করে দেয়—এবং এজন্যেই উনি সব ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন, ঘটনার আঘাতে ভেঙে পড়েন নি।

লুসী দেখল ডাক্তারের হাত সারার কব্জির ওপরে। উনি টিপে টিপে দেখছেন এবং কথা বলবার সময়ে একবারও ওঁর চোখ রোগীর মুখের ওপর থেকে সরে নি।

—কিছুদিন আগে আমি ওঁর জন্যে আমার বাগানের গোলাপ এনেছিলাম। তখন উনি পৃথিবীর কোথায় কি রকম গোলাপ দেখেছেন সে সম্বন্ধে বলছিলেন। অনেক জায়গার নাম উনি উল্লেখ করেছিলেন—ফ্রান্স, এজোর্স, ইংলণ্ড। কিন্তু এত সুন্দর গোলাপ নাকি উনি কোথাও দেখেন নি।

—এখন গোলাপ বাগানের কি অবস্থা?—লুসী মিষ্টকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—চমৎকার। প্রতি বছরই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই অসময়েও ফুল ফুটেছে। মনে হয় পোড়া মাটি আর ঝিনুকের তৈরী আচ্ছাদন ওদের ভাল লাগছে। এই গোলাপগুলোর জন্যে এখানে আছি, নইলে কবে চলে যেতাম।

—সত্যিই, আমিও অবাক হয়ে ভাবি কেন আপনি আছেন!—লুসী উত্তর দেয়, শুধু আপনি কেন? কোনও লোক এখানে আছে কেন?

ডাক্তার ব্যাগ থেকে খানিকটা গজ বের করে শয্যার পায়ের দিকে রাখা গামলার জলে ভিজিয়ে সারা হন্টের ঠোঁট মুছিয়ে দিলেন।

—যখন তুমি নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর পাবে তখন আমাকে জানিয়ো।—ডাক্তার বলেন, তাহলে আর আমাকে সময় নষ্ট করে ভাবতে হবে না। কারণ, আমাদের উত্তর একই।

লুসী চেয়ারে একবার নড়ে বসল। যেন ও উঠতে চাইছে।

—আমি যদি অগ্নিকুণ্ডের ওপরের সাদা তাকটায় মোমবাতি জেলে দিই তাহলে কি আপনি আমাকে বোকা ভাববেন?—লুসী প্রশ্ন করে, জোয়েল ওঁর জন্যে দুদিন আগে নতুন আলো এনেছে। উনি সর্বদা ওখানে আলো জালিয়ে রাখতে ভালবাসতেন। ওই রুপোর বাতিদান দুটো অনেকদিনের পুরনো। বসবার ঘরের ঘড়িটার সঙ্গে লণ্ডন থেকে এসেছে। আজ সকালে ওগুলো পালিশ করবার সময়ে উনি তাকিয়ে দেখছিলেন আর এখন হঠাৎ চোখ খুলে দেখতে পেলে ওঁর ভাল লাগবে।

—হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়।—ডাক্তার উত্তর দিলেন।

লুসী ঘরের ওদিকে গিয়ে অগ্নিকুণ্ডের ওপরের সাদা তাকের রুপোর বাতিদানের ছটি মোমবাতি জালিয়ে দিল। তারপরে সে বিছানার পাশের চেয়ারে বসল।

—কাল দুপুরবেলা আপনি আসবার আগে ওঁর মন যেন কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে গিয়েছিল। সুন্দ প্রণালী সম্বন্ধে বলছিলেন। আমার মনে পড়ে অনেক বছর আগে উনি এ বিষয়ে বলেছিলেন, কিন্তু এখন আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না প্রণালীটা কোথায় অবস্থিত।

—ভারত মহাসাগরের মধ্যে কোথাও।—ডাক্তার বলেন, জাভার কাছাকাছি। সর্বদাই জায়গাগুলোর পুরনো নাম বদলে যাচ্ছে—কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থান একই আছে। আমি বইয়ে পড়েছি ওই প্রণালীগুলো সাংঘাতিক। এদিকে ওদিকে শুধু ডোবানো চড়া, জলের ওপরে ভেসে-ওঠা পাহাড়ের চুড়ো, বিপজ্জনক স্রোত, আকস্মিক ঝড়। চীনদেশের উপকূলে পৌঁছবার আগে সব পার হতে হয়।

—আপনি কি 'কারগুইলেন্স' সম্বন্ধে কিছু জানেন?

—না। আমি কখনও ওই নামই শুনি নি।

—ওগুলোও দ্বীপ।—লুসী বলে, বাইরের ক্রমবর্ধমান ঝড়ে ও জোয়ারের স্রোতের ঝাপটায় নড়ে-ওঠা সেই

ছায়াচ্ছন্ন ঘরে সে একটু গর্বও অনুভব করে। আসলে ওগুলো বড় বড় পাহাড়—বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে এই পাহাড়—দ্বীপগুলো দেখতে পেলেই বোঝা যাবে সুবাতাসে আর দু সপ্তাহের মধ্যে জাহাজ সিডনী বন্দরে পৌঁছে যাবে।

—জল-কাটা জাহাজের পরে বহুলোক অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছে।—ডাক্তার বলেন।

তারপর অনেকক্ষণ ওদের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করে। কয়েক মিনিটের জন্যে যখন বাইরের গোলমাল থেমে যায় সেই নিস্তব্ধতায় লুসী ঘড়ির টিকটিক শব্দ এমন কি পেণ্ডুলামের দোলানিও শুনতে পায়। বাইরের বাতাস জানলার কাচে প্রবলবেগে ধাক্কা দেওয়াতে মোমের শিখা কেঁপে উঠে দেওয়াল কালচে করে দেয়। মোমবাতিটা মাঝে মাঝে চিমনির মধ্যে ঘুরতে থাকে। গলানো মোম পাশ দিয়ে পড়ে চিমনি কালো করে দেয়। কিন্তু আলো যে নিভে যায় নি তাতেই লুসী আরাম বোধ করে।

ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে বিছানায় ঝুঁকে পড়েন।

—লুসী, উনি চলে যাচ্ছেন।

লুসীও উঠে পাশে দাঁড়ায়। ডাক্তার লুসীর কাঁধে হাত রাখেন।

—উনি হাসছেন। লুসী ফিসফিসিয়ে বলে। চোখের জলে ওর চশমা ঝাপসা হয়ে যায়। লুসী চশমা খুলে ফেলে: দেখুন, ওঁর হাসি কি সুন্দর। বোধ হয় এখন উনি প্রিয় কোন জিনিস দেখতে পাচ্ছেন। আমাকে প্রায়ই সমুদ্রের বুকে রামধনুর খেলার কথা বলতেন। কি অপূর্ব সেই দৃশ্য! সব রঙ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আর জলের অতল তল পর্যন্ত সেই রঙের খেলা! মাটিতে সে রকম রামধনু দেখা যায় না। বোধ হয় এখন উনি তাই দেখছেন।

—হয়তো তাই।—ডাক্তার বলেন।

৬

সওয়া এগারোটার সময়ে বসবার ঘর ছেড়ে যাবার আগে লুসী সারা হন্টের কালো পোশাকের সাদা ত্রিকোণ কলারে একটু সেলাই দিয়ে দিল যাতে ওটা অন্ততঃ চোখে না লাগে। বার্ধক্যেও সারা হন্টের বেশবাস ছিল অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ ও শোভন। লুসী চাইছিল যে প্রতিবেশীরা ওঁর প্রত্যহের চেহারাটা মনে রাখে। তারপরে সে চেয়ারগুলো আর একবার গুনে জানলার পর্দা টেনে দিয়ে রান্নাঘরে থেডাসের জন্যে রাখা লাঞ্চের বাস্কেট আনতে গেল। জানলার সাদা চৌকাঠে লাল জারনিয়াম ফুল ফুটে আছে। লুসী একটি কুঁড়ি তুলে নিয়ে লাঞ্চের ঝুড়ির ঢাকায় আটকে দিল।

থেডাস তখনও সমুদ্রের বেলাভূমিতে পায়চারি করছিল। জোয়ারের স্রোতে ধীরে ধীরে জল ওপরে উঠছে। ওর পরনে প্রভাতের সেই কালো স্যুটটি। পরিষ্কার শার্ট নেকটাই নতুন ও সুন্দর ভাবে বাঁধা। ওর মা সব সময়ে বলতেন, থেডাস পিতার মত সুগঠিত, দীর্ঘদেহ ও সুশ্রী। কিন্তু ওর হাত ও দীর্ঘ আঙুলগুলো অনেকটা ওঁর মত।

এখনও সে সেই হাত দুটো পেছনে রেখে স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত মানুষের মত মোচড়াচ্ছিল। লুসীকে দেখতে পেয়ে পকেটে হাত রাখে।

—থেডাস, তোমার মাকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে।—লুসী ওর হাতে ঝুড়িটা দিতে দিতে বলে, আর, কুয়াশা ও ঝড় কেটে যাবার পরে আজকের দিনটা সত্যিই চমৎকার।

—হ্যাঁ।—ও উত্তর দেয়, লুসী, তুমি যা করেছ সেজন্য ধন্যবাদ!

—জোয়েল, স্যাম আর অন্য সবাই এসে তোমাকে নৌকো ঠিক করতে সাহায্য করবে। ওরা কাজের পরিকল্পনা করে নিয়েছে। থেডাস, তুমি একটুও ভেব না। ছোট ছেলেদের ফুল রাখবার জন্যে ফুলদানীগুলো জলে ভরে পেছনের সিঁড়িতে রেখে দিয়েছি।

—ধন্যবাদ।—থেডাস আবার বলে।

—আমি এখন যাচ্ছি। বোটগুলো প্রায় এসে গেছে। হান্না নিশ্চয়ই বেনের ডিনারের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। তোমার বাস্কেটে গরম কফি, সেদ্ধ ডিম আর মাংসের স্যাণ্ডউইচ আছে। সব খেয়ো, কেমন?

—আচ্ছা।

লুসী মুখ ফিরিয়ে বেলাভূমির ওপরের নীচু ঘাসের জমি পার হয়ে মাঠ ও গোচারণভূমির ভিতর দিয়ে গ্রাম্য বাঁধানো পথে অগ্রসর হয়।

—লুসী, তোমার পুষ্পগুচ্ছের জন্যে ধন্যবাদ।—থেডাস বলে।

৭

এতক্ষণে বোটগুলো কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। পথের দু দিকের গোল্ডেনরড ও অ্যাস্টারের ঔজ্জ্বল্যে ও বুনো ঝোপের পাহাড়ী বেরী ফুলের লালিমায় মুগ্ধ হয়ে মোড় ফিরতেই লুসী ওদের দেখতে পেল। গ্রাম্য পথে গোচারণের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে সে দেখে কিভাবে বোটগুলো কোভ তৈরি করে নোঙর ফেলে এবং প্রভাতের সফর থেকে আনা মাছ তাদের ডিঙিতে ভরে। অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের সময় নিকটবর্তী। কাজেই ওরা আজ টাইডাল নদী পার হয়ে পাউণ্ডে যাবে না—চিংড়ীমাছের গাড়িতে রেখে দেবে। একটুও বাতাস ছিল না। শান্ত জল কেটে কেটে ওরা আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লুসী ভাবে—কত হাজার হাজার বার সে এভাবে বোট আসতে দেখেছে। গ্রীষ্মের কুয়াশা ভেদ করে আবছা মূর্তি বেরিয়ে আসছে—নভেম্বরে একদম বরফে ঢাকা। উত্তরপশ্চিম বাতাসে স্পষ্ট ও পরিষ্কার দেখা যায়। আর আবহাওয়া যাই হোক না কেন ওপরে একঝাঁক গাল পাখি আশায় আশায় উড়ছে।

সাধারণতঃ ওদের কোভ একইভাবে সাজানো হয়ে থাকে। স্যামের 'লুসী এবং জোয়েল' সর্বপ্রথম। শাগ দ্বীপের দূরবর্তী কোণে স্যাম মাছ ধরে। তীরের নিকটবর্তী কালো স্প্রুসগাছগুলোর মধ্যে ওর লাল বয়াটা চমৎকার দেখায়। যুবক কার্লটন সোয়ার স্বচ্ছন্দেই স্যামকে অতিক্রম করতে পারে—যদিও সে সাত মাইল দূরবর্তী সর্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল কঠিন পাহাড়ে ও খরস্রোতে মাছ ধরে। কার্লটনের নতুন নৌকো 'মেরি ব্লজেট' কোভের ঈর্ষার বস্তু। এমন কি উপকূলের অনেকেই চকচকে সাদা বোটটার মালিককে ঈর্ষা করে। কেউ বুঝতে পারে না যে কার্লটন কি করে স্ত্রী ও দুটি সন্তান নিয়ে এই মন্দার বাজারে এর দাম সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েছে। শুধু লুসী জানে এবং তরুণ 'সোয়ারস' দম্পতির স্মরণে ওর মন আনন্দে গর্বে পূর্ণ হয়ে যায়। কার্লটন ইচ্ছে করলেই সবচেয়ে আগে যেতে পারে কিন্তু জেলেদের মধ্যে এ সম্বন্ধে ভদ্রতার নীতি খুব প্রবল এবং কার্লটনের নৌকো স্যামের অগ্রগামী হওয়া মাত্রই সে ইঞ্জিনের গতি কমিয়ে দেয় অথবা একদম থামিয়ে দেয়।

বেঞ্জামিন স্টীভেন্স ইতিমধ্যে হেরিং অন্তরীপের মাথাটা ঘুরে এসেছে। ও পশ্চিম দিকের অপেক্ষাকৃত স্রোতহীন জল—যা অন্তরীপ থেকে ম্যাকরাল উপসাগরে ফিরে এসে কূল পর্যন্ত অনেকগুলো আবদ্ধ জলরাশি ও খাঁড়ির সৃষ্টি করেছে সেখানে মাছ ধরে। বেনের বোট চমৎকার আবহাওয়াতেও একটু দোলে। ওর বোটের ভারী ওপরের অংশের কালো ছায়া সেপ্টেম্বরের দুপুরের অবিশ্বাস্য উজ্জ্বল আলোতে পাশেই পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল। ও যখন বোটের 'করমরাণ্ট' নাম বদলে 'রিচার্ড জর্ডন' রেখেছিল তখনই লাল-কালো বয়ার সঙ্গে মিলিয়ে ওপরের অংশ রঙ করিয়ে নিয়েছিল। এই পরিবর্তন এবং কয়েক বছর পূর্বে টাইডাল নদীর মোহনার সম্মেলনে ধর্মান্তর গ্রহণ প্রতিবেশী মহলে নানারূপ সহৃদয় সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল। ওর আড়ালে এইসব মন্তব্য অনেকটা অকরুণ হয়ে উঠত যদিও সবাই জানত যে বোটের নামকরণের জন্য বেনের স্ত্রীই দায়ী।

ডেনিয়াল থারস্টন অসুস্থ হয়ে তার ছোট লাল বাড়িতে আছে। ওর বাড়িটা হেরিং অন্তরীপের দু মাইলের মধ্যে উদগত শৈলস্তবকের ওপরে অত্যন্ত বিপজ্জনক স্থানে অবস্থিত। আজ সে এই মৎস্য-শিকার নৌ-বহরে নেই। প্রত্যহ এই সময়ে ডেনিয়াল ওর বোটের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকত। ওর দেহ দীর্ঘ, কাঁধ দুটি নোয়ানো। বোটটা ছোট। বড় একটা দাঁড়টানা নৌকোয় একটা ডেক যোগ করলে যেমন হয় তেমনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ টানে যেভাবে ডিঙি নৌকো বেয়ে নিয়ে যায় ডেনিয়াল এখানেও ঠিক তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। প্যাকিং কোম্পানির কাছে দেনার দায়ে বড় বোটটি এবং মাছ ধরবার আটল বিক্রি হয়ে যাবার পরে সে আর উত্তাল ফেণায়িত তরঙ্গধৌত পর্বতসঙ্কুল হেরিং

অন্তরীপে যেতে সাহস পায় না। ওর কমলা রঙের বয়াগুলো তীরের কাছাকাছিই থাকে। আজ লুসী সেই অসামুদ্রিক বোটে ওর একটু কালো যথারীতি কুঁজো মূর্তি—নৌকোর গলুইতে বসে থাকা কুকুর রোভারকে দেখতে পেল না। লুসী ভাবে, অপরাহ্নের কাজ শেষ হলে সে আর জোয়েল ওকে দেখতে যাবে।

নোরা ও শেঠ আজ ডেনিয়ালের স্থান নিয়েছে। ওরা টাইডাল নদী দিয়ে আসছে। নদীটি শাগ দ্বীপ এবং কোভের ভিতর দিয়ে গভীর প্রবল স্রোতে বয়ে যাচ্ছে। স্রোতের টানে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াবার আগে ওরা বাইরের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেল। নোরা পেছনে দাঁড়িয়ে হালের বাট ধরেছে; শেঠের একটা পুরনো ফেল্ট টুপি ওর মাথায়। শেঠ ইঞ্জিনের ওপরে ঝুঁকে আছে। অনেকদিন থেকে ও ওইরকম ভাবে বসছে—লুসী ভাবে। ব্রজেটরা নদীতেই মাছ ধরে। কারণ, নোরা বলেছে যদি তাকে ধরতে হয় তাহলে সে আর কোথাও মাছ ধরবে না। গলদাচিংড়ীর কল্যাণে তাদের বোট বেশ ভালভাবেই ভরে ওঠে। এবং মাছ-খোঁয়াড় মোটামুটি কাছে থাকায় ওরা প্রত্যহ ফেরার পথে মাছ ফেলে রেখে বাড়ি ফিরতে পারে।

উজ্জ্বল মধুর বাতাসে ভেসে এসে এখানে দাঁড়ানো লুসীর কানে সমুদ্রে যারা ফসল ফলায় তাদের পুরাতন, পরিচিত, দুর্বিনীত কর্ম ও পরিশ্রমের ধ্বনি বাজতে থাকে। রবারের পা-ঢাকা জুতোর মসমসানি, বোটের খোলে গীয়ার বদলাবার শব্দ, স্বল্পপরিসর ডেকে মাছ ধরবার সাজসরঞ্জাম—টোটা, কাঠের খাঁচা, বঁড়শীর গামলা, ফাঁদ সারাই করবার জন্য জড়ো করা হচ্ছে। নোঙর ও নোঙর-শেকলের ঝনঝনাৎ। ছিপ ও ডিঙিগুলো কাছে আনা হল। ঢিলে দড়ি ছুটে পালিয়ে গেল। দাঁড়ের তালার আটকানো শব্দ। তারপরে একটানা ছন্দোময় নিপুণ হাতের দাঁড় টানা।

৮

উঁচুনীচু, সঙ্কীর্ণ, অসমান পথ দিয়ে দোকানপাট ও স্বল্প কয়েকটি বাড়ির দিকে যেতে যেতে লুসী দিনের অপরূপ সৌন্দর্যে বারবার বিস্মিত হচ্ছিল। এক সপ্তাহ হল কুয়াশা নাছোড়বান্দার মত চারিদিক ঢেকে আছে। এদিকে সূর্যের অয়নসন্ধিকাল ঘনিয়ে এল, এমন সময়ে সব অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যদ্বাণী বিফল করে দিনটি অন্ধকার খনিতে দুর্লভ মণির মত ঝকঝক করছে। সে পাহাড় ও বড় আলোর পশ্চাতের দক্ষিণ দিগন্তরেখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল—দেখতে চাইল প্রায় মিলিয়ে-যাওয়া কুয়াশার অস্পষ্ট রেখা। কিন্তু না, কিছুই নেই। আকাশ ও সমুদ্র মেঘহীন উজ্জ্বল রেখায় মিলেছে। স্যাম পার্কার বলে ওই দিগন্তরেখার পশ্চাতে যেখানে কাক উড়ে যাচ্ছে সেখানে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্থান স্পেনের উপকূল। পোতাশ্রয়ের পশ্চাতে উত্তর দিকে জমি উঁচু হয়ে তেমনি এক প্রশান্ত নির্মেঘ আকাশে মিশেছে—এবং পশ্চিমের উচ্চ অন্তরীপের বনভূমিও তেমনি মিলে গেছে। পূর্বদিকে টাইডাল নদীর প্রশস্ত মুখ পার হয়ে শাগ দ্বীপের দীর্ঘ নির্জন উচ্চ তীরভূমি। পতঙ্গ ও ঝিঁঝির ঝনঝনানিতে আকাশ-বাতাস পূর্ণ। এখন শুভ্রকণ্ঠ পাখি নেই—প্রায় এক মাস হল ওরা তাদের স্থান নিয়েছে। আর, লুসী কোভের প্রথম বাড়িতে পৌঁছবার আগেই বাদাম ঝোপে কতক-গুলো বুলবুল দেখতে পেয়ে সুখী হল।

বাড়িগুলো ছোট। আকৃতিও বিভিন্ন। একটি পূর্বে স্কুলবাড়ি ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে এককালে এই অঞ্চলে এত লোক ছিল যে নিজস্ব স্কুলবাড়ির প্রয়োজন ছিল। আর একটি ছিল জাহাজে মোমবাতি যোগানদারের গৃহ। তৃতীয়টি মনে হয় গীর্জা; এই অনুমান সত্য—কারণ, একটা ভাঙা গীর্জার ঘণ্টার নীচের অংশ ওই বাড়ির ছাদে পোঁতা আছে। রাস্তার প্রায় ওপরের তিন-চারটি বাড়ি সম্বন্ধে কোন গল্প শোনা যায় না। সেগুলো পথের অপর পাড়ের ফিশ-হাউসগুলোর মত। সেখানে ধীবররা শীতকালে জাল বোনে। আকার গঠন বা সৌন্দর্যের দিকে না তাকিয়ে সবগুলো বাড়িই তৈরি অথবা সংস্কার করা হয়েছে। প্রত্যেকটিই সমুদ্র-সফর-প্রত্যাবৃত্ত কর্মক্লান্ত লোক ও তাদের সেবাপরায়ণ স্ত্রীলোকের বিশ্রামস্থল।

কিন্তু সব বাড়িগুলোর অন্দর বাহির খুব পরিষ্কার।

পাথরের নুড়িতে সাজানো পেটুনিয়াস, মেরিগোল্ড, নাস্টারশিয়াম, জিনিয়া ফুলে উজ্জ্বল সামনের ছোট বাগানগুলো বাদামী, ঘন সবুজ, রোদে পোড়া বোর্ড ও তক্তার ছাদ, সরু চিমনি এবং অসম ছাদগুলোকেও সুন্দর করে তুলেছে। এই অপ্রচুর বাসগৃহ ছাড়া এখানে-সেখানে উত্তর পাহাড়ের স্বল্পপরিষ্কৃত ঢালু স্থানে প্রায় আধ ডজন ক্ষুদ্রতর গৃহ আছে। সেগুলোকে বাড়ি না বলে কেবিন অথবা চালাঘর বলাই ভাল—অ্যাসবেস্টাস টালি, পুরু আলকাতরা মাখানো কাগজ অথবা বেমানান টিনের পাতে এদের ছাদ তৈরি হয়েছে। বসন্তকালে বোট বন্দরের জলে নামবার পূর্বে এবং ফাঁদ তৈরি করবার পরে ধীবরদের হাতে যে প্রচুর সময় থাকে সেই সময়ে ওরা এগুলো তৈরি করেছে। সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকালটাই এই বাড়িগুলো উপকূলবর্তী শহরের আগন্তুক দ্বারা পূর্ণ থাকে। ওরা শনিবার ও রবিবার পোলক মাছ ধরতে আসে। এই মাছ সহজেই ধরা যায়, কিন্তু একমাত্র শুকনো করে রাখা ছাড়া আর কোন কাজে লাগে না। এবং সে হিসেবেও বিশেষ সুবিধের নয়। কিন্তু, এইসব লোক ও পোলক মাছ দুই-ই কাজে আসে বিশেষতঃ সেই সময়ে যখন চিংড়ী বা হেরিং মাছ পাওয়া যায় না। কারণ, ভাল বোট নিয়ে বেরিয়ে যে কোন জেলে একদিনে কুড়ি ডলারের মত রোজগার করতে পারে। আবার যখন খেয়ালী হেরিং মাছ তারের ঘেরা পূর্ণ করে ফেলে তখন ক্রয় করা অথবা ওজন করার জন্য বড় বড় বোটে কোভ পূর্ণ হয়ে যায়, সেই সময়ে প্রায়ই বোটের বিদেশী নাবিকেরা কেবিন বাঙ্কের নোংরামি ও দুর্গন্ধে পাগল হয়ে কয়েক ঘণ্টা ভাল বিছানায় পা ছড়িয়ে শোবার আরামের জন্যে যথেষ্ট খরচ করতে রাজী হয়।

এই ঘরগুলোর ঠিক নীচেই গ্রাম্য সঙ্কীর্ণ পথের ওপারে বেলাভূমি। পশ্চাৎপটে কয়েকটি ফিশ-হাউস, স্তূপীকৃত চিংড়ীমাছের ফাঁদ ও বয়া দেখা যাচ্ছে। এখানে উন্মুক্ত সমুদ্রবক্ষ থেকে জোয়ার-স্রোত প্রবলবেগে অন্তরীপের খাঁজকাটা পাহাড়ে ও শাগ দ্বীপের দূরবর্তী কোণে ধাক্কা দিচ্ছে। এই ধাক্কায় কোভের তীরবর্তী রেখা প্রায় আধ মাইল প্রশস্ত গভীর খিলানাকার বেসিনে পরিণত হয়েছে। ফিশ-হাউসের সামনের মাটিতে আগাছা ও নানারকম ফুল নেটলস্, সামুদ্রিক গোল্ডেন-রড, টান্সি, আস্টারস, রক্তিম থুওয়ার্ট, হালকা লালচে সামুদ্রিক ল্যাভেণ্ডার। পাতলা তক্তা ও শ্লেটের ছাদগুলো ঢালু হয়ে বেলাভূমির বিচিত্রবর্ণের বাঁধানো পথে নেমে গেছে। এই পথের ঠিক নীচে কাদা, বালুভরা প্রশস্ত স্থান। ভাটার টানে সেখানে অল্প জল জমেছে, গাল পাখী পরমানন্দে ছোট ছোট কাঁকড়া ধরছে, হেরণ দাঁড়িয়ে আছে এবং বালুচর অর্ধবৃত্তাকারে ঘোরবার আগে চট করে কি যেন ভেবে নিচ্ছে। বেলাভূমির অবস্থা শোচনীয়। কারণ, যদিও এখন ছোট নৌকো ও ডিঙিগুলো স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুবার ওরা কাদায় গেঁথে যায়। তবুও এ দৃশ্য মনোরম, বিশেষতঃ আজ।

লুসী নর্টন স্টীভেন্সের বাড়ি খালি—কারণ হানা স্টীভেন্স লুসীর হয়ে স্টোরে কাজ করছে এবং বেঞ্জামিন এইমাত্র অতিকষ্টে সমুদ্রতীরে পৌঁছেছে—লুসী পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। ব্রজেটদের বাড়িটাও খালি। লুসীর চোখে কোভের কোন গৃহই অগ্রহণীয় বা অসুন্দর নয়। অবশ্য বাড়ির আকার আকৃতি বা বর্ণ সম্বন্ধে তুলনা করবার মত কোন আদর্শই ওর অভিজ্ঞতায় নেই। এগুলো শুধুমাত্র কয়েকটি লোকের বাসস্থান—যারা ওর পরিচিত, যাদের ও এতদিন পর্যন্ত ভয় পেয়েছে, করুণা করেছে, প্রশংসা করেছে, দুঃখে দুঃখিত হয়েছে এবং সদাসর্বদা ভালবেসেছে। লুসী ভাবছিল, বাগানের ফুলগুলো কি সুন্দর দেখাচ্ছে! কার্লটন সোয়ার ওর বয়াতে উজ্জ্বল নীল এবং হাতলে হলদে রং দিয়ে খুব ভাল করেছে। স্টীভেন্সের কালো সাদা, ব্রজেটদের মেটে সবুজ এবং একটু দূরে স্যাম পার্কারের লালের পাশে চকচকে নীল রংটা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

লুসী ভাবছিল, কি আশ্চর্য এই দিনটি! এই রকম রৌদ্রোজ্জ্বল, শান্ত দিনে কোভের পৃথিবী যেন মালিকের কাছে ফিরে এসেছে। মালিক তারাই, যারা এ থেকে এবং এই সামনের সমুদ্র থেকে জীবিকা অর্জন করে। শীতে ও খেয়ালী বসন্তে মধ্যে মধ্যে এমন অনেক দিন, অনেক সপ্তাহ আসে যখন এই জগতে কোন জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব থাকে না—ঝড় বৃষ্টি শীত কুয়াশা ও

স্রোতের অধিকারে চলে যায়। সেই নিষ্ঠুর শক্তিশালী শক্তি অল্পদিনের জন্যে ধরে দেওয়া জগৎকে তখন নিজের কাছে ফিরিয়ে নেয়। সেই হারিয়ে যাওয়া দীর্ঘ ঋতুতে যদি কখনও তুমি তোমার জগৎকে ফিরে পাবার চেষ্টা কর, হয়তো দেখতে পেলে দূরে একটি সোয়ালো পাখীর কালো ছায়া সাদা কুয়াশায় ঘরে ফিরে আসছে কিংবা কোন পরিষ্কার প্রভাতে জমে যাওয়া টাইডাল নদীর বুকে ছোট সালমন মাছ ধরবার তাঁবুর নীল ধোঁয়া উঠছে তখন সেই বিরাট শূন্য সমুদ্রে দাঁড়িয়ে তোমার শূন্য মনে চকিতের জন্য স্বত্বাধিকার ফিরে আসবে।

মেরী সোয়ার বাড়ির উল্টোদিকের পথে কতকগুলো নীল চিংড়িমাছের বয়ার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। ও খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওগুলো রং করছিল এবং এক-একটি রং করা হয়ে গেলেই ফিশ-হাউসের ঝোলানো বারান্দায় মাছের আঁশ বা পাথরের টুকরো দিয়ে সুবিধেমত ঠেকিয়ে রাখছিল। প্রায় কুড়ি পার হয়ে আসা এই মেয়েটির লম্বা গড়ন, বড় বড় নীল চোখ ও মুখশ্রী খুব সুন্দর। সে স্বামীর একজোড়া পুরনো পাজামা ও একটা লাল ওয়াটারপ্রুফ ওভারকোট পরেছিল। দুটোই রংয়ের ছিটেয় ভর্তি।

—লুসী, আমি যা তা করছি।—ও বলে, কিন্তু, এমন দিনে সবই মজার

—এগুলো খুব সুন্দর হয়েছে।—লুসী উত্তর দেয়, আমি চিরদিনই নীল ভালবাসি। কাল আমার মন এত ব্যস্ত ছিল যে আমি লক্ষ্যই করি নি।

—কাল ওরা এখানে ছিল না। আমি আজ সকালে আরম্ভ করেছি। কার্লটনকে অবাক করে দেব। ও রেগেও যেতে পারে। কিন্তু ওই জলে যাওয়া হলদে রং দেখে দেখে আমার মাথা ধরে যেত।

ও রঙের তুলি ও পাত্র একটা কাঠের থামের ওপরে তুলে রেখে হাত দিয়ে হালকা চুলগুলো ঠিক করে নেয়।

—লুসী, মিসেস হল্টকে কেমন দেখাচ্ছে?

—চমৎকার।—লুসী উত্তর দেয়, সত্যিই ওঁকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

—কোন্ পোশাকটা পরনে আছে?

—ওঁর কালো গাউন। গলার চারিদিকে সাদা ত্রিকোণ কলার। আমি কাল ওটা কেচে ইস্ত্রি করে রেখেছিলাম। ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে নতুন—সদ্য কেনা হয়েছে।

—খুব ভাল।—মেরী উত্তর দেয়, আবহাওয়াও চমৎকার। কার্লটন কাল রাত্রে বার বার বলছিল, এই রকম কুয়াশায় ওঁর মনোগত অভিপ্রায় অনুযায়ী সব ব্যবস্থা করা অসম্ভব। আজ সকালে উঠে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না—আবার এদিকে রেডিও রিপোর্ট একদম উল্টো।

—আবহাওয়া অফিসের লোকেরা আমাদের কোন খবরই রাখে না।—লুসী বলে, আচ্ছা, ছেলেরা কোথায় জান? ওদের এতক্ষণ স্কুল নিয়ে ফেরা উচিত।

—ওরা ঘণ্টা দুয়েক আগে অন্তরীপে গেছে। রাণ্ডেলের মেয়েটি বলছিল ড্যান থারস্টনের বাড়ি পার হয়ে একটা জলায় লাল লিলি ফুটেছে। এই অসময়ে লিলি পাওয়া যায় না বলেই জানতাম। কিন্তু ও বলল, ও দেখেছে এবং আনবেই। মেয়েটি তো একা একা ঘুরতে ওস্তাদ। আমার দুটিকে অতদূরে ওর সঙ্গে পাঠাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এমন একটি ঘটনা! ওরাও অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আর মেয়েটাকে দেখেও কি রকম মায়া হল—তাই না বলতে পারলাম না। আমার মনে হয় পশ্চিমের মেয়েটি ওর ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে অস্বস্তি বোধ করছে না কিন্তু হান্নার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। ওর একটুও ইচ্ছে ছিল না যে নাতি-নাতনীরা যায়।

—ওদের কিচ্ছু হবে না।—লুসী বলে, আমি ফুল রাখবার জন্যে বাড়ির পেছনে কুঁজো আর ফুলদানী রেখে এসেছি। থেডাসকেও বলেছি।

—থেডাস কেমন আছে?

—ভাল। ওর পক্ষে যতটা ভাল থাকা সম্ভব।—লুসী বলে, অক্টোবরের দিনগুলো এমনিই হয়। এই সময়ে বাতাসে যেন একটা সুন্দর স্থির মন্ত্রের সুর ঘুরে বেড়ায়।

মেরী সোয়ার রং-তুলি নেবার জন্যে হাত বাড়ায়।

—অক্টোবর শীতের খুব কাছাকাছি।—সে শান্ত কণ্ঠে বলে।

[ক্রমশঃ]

ভালবাসা

ভৈরব হালদার

শীতের সকাল।

ভবানীপুর অঞ্চলের একখানা ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলার ঘর। পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। জানলার পর্দা চুঁইয়ে এক ঝলক সোনালী রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে ছক-কাটা মেঝের উপর। সিঙ্গল-খাটের ওপর সুবিন্যস্ত বিছানা। একটা তে-পায়া লম্বা টুলের ওপর রেডিও। নিস্তব্ধ। রোদ-ঝকঝকে কাচের আলমারিটা বন্ধ—নীচের দিকের একটা ড্রয়ারের গায়ে ঝুলন্ত রিংসহ একতাড়া চাবি। অন্যমনস্কতার প্রমাণ মনে হয়! দুটো জানলার মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় ড্রেসিং টেবিল। তারই কাচে প্রতিফলিত হচ্ছে একটি মেয়ের সুঠাম দেহ—সুছাঁদে বাঁধা কবরীর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। পাশেই শান্তি-নিকেতনী ছবি আঁকা ভাসে একগোছা রক্ত-গোলাপ।

সুরেলা কণ্ঠে গান গাইছে অনীতা সোম। টেবিল-হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গানের একটা কলি বারবার গাইছে। যেন গাওয়া সুরের ব্যঞ্জনাটুকু মনের তারে ঠিকমত ধরা পড়ছে না। মনঃপূত হচ্ছে না সুরের বিস্তার। বারবার তাই একই কলি গাইতে হচ্ছে অনিতা সোমকে।

অনীতা দেবীর কণ্ঠস্বর এবার ধীরে ধীরে জোরালো হয়। এতক্ষণে সুরটা যেন মনোমত হল। শীত-সকালের মধুর পরিবেশ সুরের আবেশে আরও মধুক্ষরা হয়ে ওঠে।

আর ঠিক সেইমুহূর্তে মাথার ওপরে শুরু হয় সেই বিরক্তিকর পদধ্বনি।

কে যেন সুরের তালে তালে মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে তাল দিচ্ছে।

নাঃ, বিরক্তিকর!—সজোরে হারমোনিয়মের রিডগুলো চেপে ধরে অনিতা। একটা বিশ্রী আওয়াজ করে সেটা নির্বাক হয়ে যায়। সক্রোধে বসবার মণিপুরী টুলটা ছেড়ে সে ঘুরে দাঁড়ায়। এবার ড্রেসিং-আয়নার বুকে অনিতার সম্পূর্ণ দেহের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। আরক্তিম মুখমণ্ডলে ক্রোধের সুস্পষ্ট চিহ্ন। কৈশোরোত্তীর্ণ শঙ্খশুভ্র দেহবল্লরী ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে বটলগ্রীন কটকি শাড়ি আর তারই সঙ্গে ম্যাচ করেছে গায়ের হাতাওয়ালা ব্লাউজ। ডানদিককার বুকের নগ্ন অংশে চিকচিক করছে সরু একছড়া হার। টানা-টানা চোখ দুটোয় রাগ ও বিরক্তির মিশ্র প্রকাশ।

একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে উপরতলার ওই মানুষটার অসভ্য ব্যবহার। এতই সুরজ্ঞান তো সিনেমায় নামলেই হয়! মানুষের মাথার ওপর পা ঠুকে তাল দেওয়ার এই উৎকট ইচ্ছাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। আর শুধু আজ বলেই নয়, বেশ কয়েকদিন ধরেই এই উৎপাত চলেছে। অনীতা গান গাইতে শুরু করলেই ভদ্রলোকও তাল দেওয়া আরম্ভ করেন। ভদ্রলোক না হাতি! একেবারে একটা ব্রুট! না, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। আর এখুনি। অনিতা ঘর থেকে সবেগে বেরিয়ে আসে।

তিনতলার সিঁড়ি।

উন্মুক্ত দরজা। ঘরের মাঝবরাবর একখানা মস্তবড় ইজেল। ওরই নিম্নাংশে শুধু একজোড়া পা দেখা যাচ্ছে, দেহের অন্য অংশ ইজেলের আড়ালে ঢাকা। ক্ষীণ ধোঁয়ার একটা নীলচে আভাস ইজেলের মাথার উপর ভাসছে। ঘরভরা দামী সিগারেটের মোলায়েম গন্ধ। অনভ্যস্ত মানুষের কাছে কটু মনে হয়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনিতা বলে, দেখুন—

মাপ করবেন। আমার মডেলের এখন প্রয়োজন নেই। আপনার নেম-কার্ড ওই টেবিলে রেখে যান। দরকার পড়লে খবর দেব।

ইজেলের আড়াল থেকেই স্বর ভেসে আসে। ভদ্রলোক অদৃশ্য থাকলেও কণ্ঠস্বর মিষ্ট ও সুরেলা।

ব্রুট!—রাগে অনীতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রি-রি করে জ্বলতে থাকে।

তীব্রস্বরে বলে, আমি আপনার মডেল হতে আসি নি।

পরমুহূর্তে ইজেলের আড়াল থেকে সৌম্যসুন্দর একটি মানুষ বেরিয়ে আসে। সুডৌল, উন্নত-নাসা মুখ, উজ্জ্বল দুটো চোখ। গৌরবর্ণ। মুর্শিদাবাদী সিল্কের পাঞ্জাবির ভিতর দিয়ে পেশীবহুল দেহের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দীর্ঘ শক্তসমর্থ যৌবন-উচ্ছল শরীর। হাতে তুলি।

উঃ, ভগবানের কি অবিচার! এই রুটটার কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টতার মতন শরীরটাও কী অপরূপ রূপমণ্ডিত! বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য এমন একটা মানুষের মধ্যে এসে জড়ো হয়েছে, যে নাকি অভদ্র এবং রুট! অত্যন্ত বিশ্রী লাগে অনিতার।

মাপ করবেন। আমি বুঝতে পারি নি। আজকাল মডেলরা বড্ড জ্বালাতন করছে। এই তো খানিক আগেই একজন এসেছিল। ষাট বছরের এক বৃদ্ধা বলে মডেল হবে। বুঝুন একবার!—লজ্জিতমুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে রুট শিল্পী অনিতার দিকে তাকায়। অভিবাদন জানায়।

আবার সেই শ্রুতিসুখকর কণ্ঠস্বর। সুউচ্চারিত, সুললিত।

কিন্তু বাক্‌মুগ্ধ হতে আসে নি অনীতা, এসেছে তার অসুবিধার কথা জানিয়ে প্রতিবিধান করতে। তিক্তকণ্ঠে তাই অনীতা বলে, দেখুন, আমি নীচের ফ্ল্যাটে থাকি।

তাহলে তো আমরা প্রতিবেশী! দয়া করে বসুন।

এত সহজে দ্রব হবে না অনীতা সোম: আপনি বোধ হয় গান ভালবাসেন না?

কেন? গান তো আমার খুব ভাল লাগে।

তাহলে আমি যখনই গান গাই আপনি ওভাবে পা ঠোকেন কেন? মাথার ওপরে ওভাবে বিশ্রী পায়ের আওয়াজ হলে গান গাওয়া যায়!

অভিযোগ নয়—অভিমানে রুদ্ধ হয়ে আসে অনীতা সোমের কণ্ঠস্বর।

আমি আন্তরিক দুঃখিত। আর এরকম হবে না। আপনার গান আমার খুব ভাল লাগে। আপনারা, শিল্পীরা সত্যিই খাসা মানুষ।

সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী বিনয়ে বিগলিত হয়: না না, তা নয়। তা ছাড়া আপনিও তো একজন শিল্পী।

অনীতার কণ্ঠস্বর এবার খাদে নামে। একটু আগের বিরক্তিকর মানুষটাকে আর যেন তত অভদ্র মনে হয় না। এমন মানুষের ওপর রাগ করতে পারে না অনীতা।

কী বলছেন! ইজেলের বুকে তুলি বুলোই বলে কি আমি আপনাদের মতন শিল্পী! আপনার গান মানুষের প্রাণে দোলা দেয়।—সুরেলা কণ্ঠের উচ্চারিত কথাগুলো ঘরের আবহাওয়া মধুময় করে তোলে।

কই, দেখি আপনার ছবি?

নাচের ছন্দে এগিয়ে যায় অনীতা সোম। বিগলিত হয় রুট শিল্পী। মূর্তিমতী ভেনাস কি সশরীরে হাজির হয়েছেন এতদিনে!

দ্বন্দ্বের দুটি রূপ—আকর্ষণ আর বিকর্ষণ। বিভাস ঘোষ আর অনীতা সোম—পরিচয় থেকে শুরু হয় ওদের ঘনিষ্ঠতা। আর অতি অল্পদিনেই সেই ঘনিষ্ঠতা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে ওঠে। বিভাস ঘোষ আর্টিস্ট, চিত্রশিল্পী। সাদা ইজেলের বুকে তুলির আঁচড়ে সে অপরূপ রূপ সৃষ্টি করে। শিল্প তার পেশা নয়, নেশা। আপন খেয়াল-খুশিমত সে সৃষ্টি করে। খেয়ালী শিল্পীর সৃষ্টিছাড়া শিল্পকাজ। একটা নামী ব্যাঙ্কে বাপের রেখে-যাওয়া একটা মোটা টাকার অঙ্ক গচ্ছিত আছে, তারই সুদে তার একার জীবন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই চলে যায়। তাই বাড়তি রোজগারের তাগিদও নেই আর প্রচেষ্টাও নেই। আছে শুধু অখণ্ড অবসর আর শিল্প-কাজের ঐকান্তিক উন্মাদনা।

অনীতা সোম কণ্ঠশিল্পী—সুগায়িকা। কিন্তু শিল্প তার পেশা এবং নেশা দুই-ই। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বিয়ের বাজারে সহজে কাটতি হওয়ার জন্য একদিন গান আর সাধারণ লেখাপড়া করতে শুরু করেছিল। তখন গান ছিল নেশা। শিল্পের জন্যই তখন ছিল শিল্প। কিন্তু এখন আপনার বলতে আর কেউ তার এ সংসারে নেই। বাবা-মার একমাত্র সন্তান ছিল। সাধারণ সওদাগরী অফিসের সাধারণ কেরানী ছিলেন তাঁর বাবা। ইচ্ছে ছিল সুন্দরী মেয়েকে লেখাপড়া আর গান-বাজনা শিখিয়ে ভাল ঘরে বিয়ে দেবেন। সর্বগুণান্বিতা সুন্দরী অনীতার হয়তো সচ্ছল বরের অভাব

হবে না। *কিন্তু বিধি বাম! বিনা নোটিসে একদিন এপারের দেনা চুকিয়ে তিনি ওপারে চলে গেলেন। পিছনে পড়ে রইল তাঁর সাধের সংসার—বিধবা স্ত্রী আর কিশোরী কন্যা।

কঠোর সংসারে ভাসমান দুটি প্রাণ—মা আর মেয়ে। হাতের জমানো টাকায় দুজনের জীবনযাত্রা কোনরকমে বজায় রইল। অনীতার বিয়ের আশা এখন দুরাশা মাত্র। মায়ের একমাত্র অবলম্বন—তাই মাকে ছেড়ে কোথাও যাওয়ারও ইচ্ছে নেই অনীতার। তাই গান আর লেখাপড়া আয়ত্ত করে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের একটা গোপন ইচ্ছায় অনীতার মন ভরে উঠল।

তারপর একদিন সব চিন্তার ভারমুক্ত হয়ে অনীতার মাও চলে গেলেন।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে অনীতা স্বাধীনভাবে বাস করতে শুরু করেছে। দু-একটা ছোটখাটো জলসায় আত্মপ্রকাশ করায় তার সুনাম অল্প অল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। সুন্দরী, তার ওপর সুগায়িকা। অল্পদিনেই কয়েকটি ছাত্রী পেয়ে গেল। এবার এই অভিজাত অঞ্চলে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে হাতের জমানো কিছু টাকা খরচ করে ফ্ল্যাটখানা রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে নিল। দেখতে দেখতে আরও কয়েকটি ছাত্রী জুটে গেল অনীতার। এখন দুবেলা নিয়মিত ছাত্রীদের গান শেখায় আর একক জীবন যাপন করে। ইচ্ছে আছে সিনেমার প্লে-ব্যাক গাইয়ে হবে আর নামকরা গ্রামোফোন কোম্পানিতে ওর গানের রেকর্ড করাবে। একদিন ওর নাম ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। অর্থ আর সুযশ আসবে অনীতার হাতের মুঠোয়। কষ্ট আর পরিশ্রম সার্থক হবে।

শুধু গান নয়, মাঝে মাঝে কবিতাও লেখে অনীতা। কয়েকটি খ্যাত-অখ্যাত পত্রিকায় তার কবিতা প্রকাশিতও হয়েছে। নিজের লেখা গানে সুর দিয়েছে, স্বরলিপিও তৈরি করেছে। ইচ্ছে আছে বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়ানো তার কবিতাগুলো দিয়ে একখানা বই প্রকাশ করবে। এ নিয়ে কয়েকজন প্রকাশকের দরজায় ধরনাও দিয়েছিল। কিন্তু সবাই এক কথা বলেছে—কবিতার সঙ্কলন বাজারে অচল। হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে অনীতাকে। তবে কি ওর কবিতাগুলো অমনিভাবে পুরনো মাসিকের পাতার আড়ালে হারিয়ে যাবে? কবিতার পক্ষে তো এটা অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়!

অনেক ঘোরাঘুরির পর একজন তরুণ প্রকাশক জানিয়েছিলেন যে, কাগজের দাম আর আনুষঙ্গিক খরচ দিলে তিনি অনীতা দেবীর কবিতার বই ছাপতে রাজি আছেন। তারপর অনীতা দেবীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, অর্থাৎ বই যদি চলে তবে সুদশুদ্ধ খরচ উঠে আসবে। তিনি অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে অনীতা দেবীর বই বাজারে 'পুস' করবেন বলেছেন। সৌখিন অঙ্গসজ্জায় সজ্জিত করে কবিতাগুলো প্রকাশ করার একটা মোটামুটি হিসাবও অনীতা জেনে এসেছে। অনেক কৃচ্ছ্রতা সহ্য করে অনীতা তাই সঞ্চয় করছে তার মানস-কন্যাকে প্রকাশ করার জন্য। অনীতা কল্পনা-প্রবণ, আশাবাদী।

*　　*　　*

এ অঞ্চলের একটা অভিজাত রেস্টুরেন্টের ঘেরা ঘরে দুখানা চেয়ারে দুজনে মুখোমুখি বসেছিল। দুজনেই দুজনের কথা বলছিল। এখন ওরা পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অসঙ্কোচে উভয়ে উভয়ের কাছে মনের দরজা খুলে দিতে পারে।

একখানা মাংসের চপকে চামচে দিয়ে টুকরো করতে করতে বিভাস বলে, সত্যিকারের শিল্পীকে জীবনে অনেক লড়াই করতে হয় অনীতা দেবী। রুপোর চামচ মুখে নিয়ে খুব অল্প শিল্পীই জন্মগ্রহণ করেন।

না না, আমি ততবড় একজন শিল্পী নই। তবে গান আর কবিতা আমি ভালবাসি বিভাসবাবু। ওগুলোর প্রতি যেন আমার একটা রক্তের টান আছে। তা ছাড়া আপনি নিজেও শিল্পী; আপনি আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।—অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে চপের একটা টুকরো অনীতা মুখে তোলে।

জীবনে সহজে স্বীকৃতি পাওয়া খুবই শক্ত অনীতা দেবী! দেখছেন তো, আজ পর্যন্ত আমার একখানাও ছবি বিক্রি হল না! অথচ সেদিন একজিবিশনে কত বাজে ছবিও বিক্রি হতে দেখলাম।—বিভাসের কণ্ঠে ক্ষোভের সুর।

জীবনে ধৈর্যই বড় কথা। অন্য যে-কোন শিল্পীর জীবন পর্যালোচনা করলে তার সত্যতা গভীরভাবে বুঝতে

পারা যায়। শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না, তার সঙ্গে চাই অধ্যবসায়; সংসারে আর পাঁচজন মানুষের সঙ্গে শিল্পীর এইখানেই প্রভেদ বিভাসবাবু!

ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে বিভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনীতা। জীবনে এই গভীর সত্যটুকু অনেক অভিজ্ঞতা দিয়েই সে উপলব্ধি করেছে। তাই তার কথাগুলোর ভিতর দিয়ে জীবন-বেদের সেই গভীর সত্যগুলোই উচ্চারিত হয়।

শিল্পীর জীবনে হয়তো এই অধ্যবসায়ের প্রয়োজন আছে, মূল্যও আছে। কিন্তু আমি তো আর সেই বিচারে প্রকৃত শিল্পী নই। শিল্প আমার অবসর সময়ের বিলাস। হয়তো বা খেয়াল। সেদিক দিয়ে আপনি শিল্পী অনীতা দেবী!—নিঃশেষিত ডিসখানা একপাশে সরিয়ে রেখে চায়ের কাপটা টেনে নেয় বিভাস।

সব শিল্পীই অল্পবিস্তর খেয়ালী বিভাসবাবু। সংসারে আর পাঁচজনের মনের সঙ্গে তার মিল নেই। তার চিন্তার স্রোত বয়ে যায় ভিন্ন খাদে। অন্যের সঙ্গে তাই তার পার্থক্য। জীবনে স্বীকৃতি পায় নি বলে তাই শিল্পীর ভেঙে পড়লে চলবে না। আরও মহান্ সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

সমব্যথী একজন মানুষের কাছে নিঃসঙ্কোচে কথা বলে অনীতা। অর্থের অসচ্ছলতা হয়তো নেই, কিন্তু তারই মতন বিভাসও এখনও শিল্পীদের পঙ্‌ক্তিতে স্থান পায় নি। আরও পাঁচজন নাম-না-জানা শিল্পীর ভিড়ে বিভাসের নাম হারিয়ে গেছে। তার ছবি প্রদর্শনীর শোভা বর্ধন করে। অনেকেই দেখে তারিফ করে, কিন্তু ছবি কাটে না। দিনের পর দিন স্টুডিয়োর একধারে জড়ো হয়ে পড়ে থাকে।

না, হতাশ আমি হই নি অনীতা দেবী। এই মুখ-ফেরানো সমাজকে এবার আমি ব্যঙ্গের কশাঘাতে উদ্বুদ্ধ করে তুলব। নতুন একখানা রূপক ছবি আমি আঁকছি। আমার বিশ্বাস এই ছবিখানাই আমাকে বাজারে পরিচিত করে তুলবে। সেদিন বিভাস ঘোষ অচেনা থাকবে না।—ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনায় বিভাস উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

তখন আর আমাদের পাত্তা দেবেন না বলুন!—কথা-শেষের সঙ্গে সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে হেসে ওঠে অনীতা।

ঠাট্টা নয়—সে দিন আমার জীবনে আসবেই অনীতা দেবী।

চা পর্ব শেষ হয়। বয় এসে দাঁড়ায়। বিভাস দাম মিটিয়ে দেয়।

দুজনে বাইরে আসে। নিয়নের লাল-নীল আলো-গুলো জ্বলছে, নিবছে। হরেকরকম বিজ্ঞাপন। পদাতিক জনতার স্রোত। অবিরাম গতিশীল গাড়ির কিউ। প্রবহমান জীবনের চিহ্ন।

বিভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে অনীতা বলে, এবার কোথায় যাবেন?

শীতাংশুর স্টুডিয়োতে। শীতাংশু শীল। কমার্সিয়াল আর্টিস্ট। বাজারে এখন খুব নাম ওর। যাবেন নাকি ওর স্টুডিয়োতে?—আহ্বান জানায় বিভাস।

না, আমার এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে। আমি চলি।

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে দু দিকে চলে যায়।

'মরসুমী ফুল'—অনীতার কবিতার বই।

সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন ঝকঝকে মলাট, মুক্তোর মতন ঝরঝরে ছাপা। হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করে বিভাস।

কেমন হয়েছে বলুন?—সস্মিত মুখে জিজ্ঞেস করে অনীতা।

অতুলনীয়!—জবাব দেয় বিভাস, সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার আসন এবার বাঁধা।

থামুন। পাঠকেরা কিভাবে আগে নেয় দেখুন। তারপর আছে কাগজের সমালোচনা। সমালোচকেরা প্রসন্ন হলে বই কাটবে, না হলে প্রকাশকের আলমারিতে পচবে। শেষে একদিন স্থান নেবে ফুটপাথে। সাহিত্য-সাধনাও আমার সিকেয় উঠবে।

না না, অনীতা দেবী, বই আপনার নিশ্চয়ই ভাল কাটবে।

বিভাসের স্টুডিয়োতে বসে কথা হচ্ছিল।

সামনের ইজেলে ওর ব্যঙ্গ চিত্র। একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড় শিঙ উঁচিয়ে চেষ্টা করছে দড়ি ছিঁড়তে কিন্তু পারছে

না। অনেকগুলো দড়ি ওকে চারিদিক থেকে বেঁধে রেখেছে। তার দাপটে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। খুঁটোয় বাঁধা ষাঁড়টা একটা জীবন্ত চিত্র হয়ে উঠেছে।

বলিষ্ঠ তুলির টান—সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন রঙের সমাবেশ। অপূর্ব ভাবদ্যোতনা। সমগ্র ছবিখানা মনকে স্বতঃই আকর্ষণ করে। বিভাসের বহুদিনের পরিশ্রমের ফল রূপ নিয়েছে এক চিরায়ত শিল্পসৃষ্টির মাঝে।

নিজের নব-প্রকাশিত বই দিতে এসে এই খেয়ালী অজানা শিল্পীর অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি অনীতাকে মুগ্ধ নির্বাক করে তোলে। প্রতিটি রেখার গতি-প্রকৃতি আর রঙের খেলা অবাক হয়ে দেখে অনীতা।

বিভাস যে কখন উঠে গিয়ে হিটারে চায়ের জল চাপিয়েছে তা অনীতা খেয়াল করে নি। এখন জল গরম হওয়ার শব্দ শুনেই ফিরে তাকায়। বিভাস পাশে নেই।

রান্নার ছোট ঘরটার দরজা খোলা। কার্যরত বিভাসকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। জামার আবরণে চওড়া পিঠ, অযত্নলালিত ব্যাকব্রাশ-করা একমাথা কালো চুল আর সবল দুখানা হাত। অনেক—অনেক কিছু চোখে পড়ে অনীতার।

ছোট ঘরখানার দরজা থেকে বলে অনীতা, একি করছেন!

কবিকে আপন আঙিনায় পেয়েছি। তাই তাকে মিষ্টিমুখ করাব। বসুন—এখুনি আসছি।

উঁহু, সেটি হবে না। কবি হলেও আমি নারী। আজও রান্নাঘর আমাদের অধিকারে। সেখানে পুরুষের অনধিকার প্রবেশ সহ্য করব না। সমস্ত নারীর হয়েই আমি প্রতিবাদ করছি। সরুন, আমি দেখছি।

আপনার আগমন হলে তো আমি স্বস্তি পাই। নিশ্চিন্তে স্টুডিয়োতে ফিরে যেতে পারি।—হিটারের উপর থেকে উত্তপ্ত কেটলিটা নামাতে নামাতে বলে বিভাস।

কথার জবাবে কথা!

তবু অনীতার দুই কর্ণমূল রঞ্জিত হয়ে ওঠে। কে যেন একমুঠো সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে ওর গৌর মুখে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বিভাসের হাত থেকে কেটলিটা আর পেয়ালা-পিরিচগুলো কেড়ে নেয় অনীতা।

অনীতার সুডৌল মণিবন্ধের সোনার চুড়িগুলো খুশীর আমেজে উচ্ছল হয়ে ওঠে। পেয়ালা-পিরিচের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জলতরঙ্গ বাজে।

শিল্পী বিভাস বুঝতেও পারে না, ওর রান্নাঘর এক-জনের আগমনে আলোয় ভরে গেছে!

চিনি কই, চিনি?—বিভাসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে অনীতা।

কেন, এই তো কৌটোটায় ছিল। কাল এনেছি!—বিভাস এগিয়ে আসে অনীতাকে সাহায্য করতে।

কৌটো খালি। মুখটা খোলা। লজ্জিত হয় বিভাস।

এটা কি!—মিট্সেফের ভিতর থেকে একটা ঠোঙা টেনে বার করে অনীতা। কালো কালো পিঁপড়েয় ভরতি। নিশ্চয়ই চিনি—পিঁপড়ে ধরেছে।

সংসার করতে হলে মনের মানুষ আনুন।—পিঁপড়ে-গুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে অনীতা।

পাই কোথায় বলুন?—বিভাস তাকায় অনীতার দিকে। সুডৌল শঙ্খ-শুভ্র হাত দিয়ে চা করছে অনীতা। ওর কাজের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে ছন্দ-যতি মিলিয়ে সুন্দর একটা সুর।

কেন, অমিল বুঝি?—অনীতা মুখ তোলে।

হ্যাঁ। আসবেন আমার ঘরে? নেবেন আমার ভার?

বিভাসের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় অনীতার। চোখের ভাষার মাধ্যমে কী যেন বলতে চায় বিভাস। বিভাসের চোখের ভাষা মনের কথা অনীতার মনোবীণায় ঝঙ্কার তোলে। ধীরে ধীরে কে যেন অনীতার মুখে মুঠো মুঠো আবীর ছড়িয়ে দেয়।

অনীতা একসময় মুখ নামায়।

বিভাসও স্তব্ধ হয়ে যায়। আজ কী যেন হয়েছে ওর। এমনভাবে নিজেকে তো আর কোনদিন হারায় নি বিভাস! তার শিল্পীমন তো এমন আত্মবিস্মৃত নয়! কী যেন একান্ত করে পাওয়ার এক উদগ্র কামনায় ওর সারা মন উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। আর সে পরশমণি খোঁজবার জন্যে তার যৌবন মনকে ক্ষ্যাপার মতন ঘুরতে হবে না। অনীতা—অনীতা তার সেই পরশমণি। ওর শিল্পীমনের দরজায় বয়ে এনেছে বসন্তের সমারোহ—কোকিলের ডাক, ফুলের গন্ধ, প্রজাপতির রঙবাহার!

পূবের খোলা জানলা দিয়ে একটুকরো রোদ এসে ভাসছে অনীতার আনত মাথার খোঁপায়। আলোছায়ার খেলা চলছে ওর সারা দেহে। ফিকে আকাশনীল শাড়ির সঙ্গে বটলগ্রীন ব্লাউজ-ঢাকা শাঁখ-সাদা নিটোল সুঠাম দেহ। ক্ষণে ক্ষণে মুখের রঙ বদলাচ্ছে, নাকের উপর জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম; কপালের উপর কয়েকটা চূর্ণ কুন্তল উড়ে উড়ে যেন খুশীতে ভেঙে পড়ছে।

সুদুর্লভ পরিবেশে এক অবিস্মরণীয় আলোছায়ার ছবি।

বিভাসের শিল্পীমনে অনীতার আনত দেহের ঠিক এই মুহূর্তের ছবি ভাবের জোয়ার বয়ে আনে। ইজেলের বুকে এই ছবিকে রূপায়িত করার ইচ্ছায় চঞ্চল হয়ে ওঠে বিভাস। ঠিক এই ভাব, নারী-মনের গোপন লজ্জায় ভাস্বর এই মুখের ছবি—বিভাসের শিল্পীমন যেন এতদিন এরই সন্ধান করছিল। ভাড়া-করা মডেলের মুখে এ রূপ কী করে বর্ণায়িত হবে! রূপের পূজারী বিভাস, তাই রূপ দেখলে ওর শিল্পীমন তাকে ধরে রাখবার জন্যে, ইজেলের বুকে শাশ্বত রূপ দেওয়ার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে।

চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ে বিভাস।

অনীতা আরও লজ্জা পায়। মনে মনে ভয় পায়, ওর ব্যবহারের ভিতর দিয়ে ও কি বিভাসকে আঘাত করল! ওর নীরবতা কি বিরূপ অর্থ প্রকাশ করল! কিন্তু তা কেন হবে! এই কদিনের ঘনিষ্ঠতা আর সান্নিধ্য ওদের পরস্পরের কাছে পরস্পরের মনের রূপ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে নি কি! বিভাস কি বুঝতে পারে নি অনীতাকে! যত শিক্ষিত ও স্বাধীন হোক না কেন, অনীতা তো নারী—মেয়েরা তো সরবে আপন মনের কথা বলতে পারে না! শরম-কুণ্ঠা ওদের মনের কথা প্রকাশে বাধা দেয়। ও কাজ পুরুষের। তারা বলে, মেয়েরা শোনে। তাদের হৃদয় নাচে, স্পন্দিত হয়।

আপন দেহের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে মাকড়সা জাল বোনে, অনীতার মাকড়সা-মনও ভয় আর আনন্দের ঘন লালায় ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের জাল বোনে। আর একটু আগের বিভাসের কথাগুলো ওর মনে খুশীর জলতরঙ্গ বাজায়।

সাহিত্যের আসরে এত শীঘ্র যে অনীতা স্থান পাবে তা সে কল্পনা করতে পারে নি। সেদিন বই-পাড়ায় যেতেই তার প্রকাশক সরবে তাকে অভিনন্দন জানালেন। তার কবিতার বই নাকি বাজার মাত করে ফেলেছে। প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে এল।

কপিরাইটটা আমাকে বিক্রি করে দিন অনীতা দেবী। —প্রকাশক ভদ্রলোক অনুরোধ জানালেন।

কবিতা-পুস্তকের কপিরাইট কিনতে চাইছেন একজন প্রকাশক! অবাক হয়ে ভাবে অনীতা। রাতারাতি এমনভাবে সে বিখ্যাত হল কী করে! গল্প উপন্যাস হলেও না হয় কথা ছিল। লাইব্রেরীর চাহিদা মেটাতে সংস্করণের পর সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বাংলা কবিতা-পুস্তকের সংস্করণ! তার ওপর তার মতন একজন অনামা অখ্যাতা লেখিকার! অনেক ভেবে অনীতা জবাব দেয়, বেশ তো, দেব আপনাকে কপিরাইট।

একখানা উপন্যাস লিখে ফেলুন অনীতা দেবী। আপনার লেখায় হাত আছে। কাটবে ভাল।

বই ব্যবসায়ে ঝানু প্রকাশক। লেখা দেখলেই বুঝতে পারেন কার মধ্যে ভবিষ্যৎকালের লেখক লুকিয়ে আছে।

হ্যাঁ, চেষ্টা করব।—অনীতা জবাব দেয়।

না না, শুধু চেষ্টা করব বললে হবে না—লিখতেই হবে।

আর তারই ফলে তার প্রথম উপন্যাস 'না-বলা কাহিনী' প্রকাশিত হল। প্রকাশিত হওয়ামাত্র বাজারে সাড়া পড়ে গেল—কে এই অনীতা সোম? কাগজে কাগজে সমালোচনা বেরল, ভার্জিনিয়া উলফ আর পার্ল বাকের সঙ্গে অনীতা সোমের তুলনা করে বলা হল, সুষ্ঠু রচনার আদর্শ রচনার আদর্শ 'না-বলা কাহিনী'।

* * *

দোতলায় নিজের স্টুডিয়োতে আরামকেদারায় শুয়ে 'না-বলা কাহিনী'র সমালোচনা পড়ছিল বিভাস। যতগুলো পত্র-পত্রিকায় অনীতার উপন্যাসের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে সবগুলো কাগজ কিনেছে বিভাস। আর কড়া চুরুটের ধোঁয়া গিলতে গিলতে এখন সেগুলোই পড়ছে।

বাইরে শীতের মধ্যাহ্ন। ঝকঝকে রুপোর পাতের মতন

উজ্জ্বল সূর্যালোক। শব্দ-মুখর শহরকে কে যেন মুড়ে রেখেছে এই রুপোর পাত দিয়ে। শীত! না, শীতের নাম-গন্ধ নেই, আছে শুধু অফুরন্ত দীপ্তি!

ফোনটা বেজে উঠতেই বিভাস হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নেয়: কী বলছেন!—বিস্ময়ের সুর বিভাসের কণ্ঠে। যেন তারের ভিতর দিয়ে কি এক অবিশ্বাস্য সংবাদ তার কাছে ভেসে আসছে।—এতে আর আমার আপত্তির কি আছে! আচ্ছা আচ্ছা—নমস্কার।

ফোন রেখে দেয় বিভাস। খুশীতে তার মন উচ্ছল হয়ে ওঠে। আরামকেদারা ছেড়ে উঠে জানলার গরাদ ধরে বাইরে তাকায়। সামনের বাড়ির হলুদ-রঙা দেওয়ালে দৃষ্টি বাধা পায়। আকাশ! শহরের আকাশ জানলার ফ্রেমে বাঁধা। শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকা। অফুরন্ত উদারতার লেশ নেই সেখানে। জানলার ধার থেকে সরে আসে বিভাস। রঙের তুলিটা নিয়ে ইজেলের বুকে আঁচড় টানে। অকারণে স্টুডিয়োর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

কতক্ষণ যে বিভাস তন্ময় হয়ে ইজেলের বুকে তুলির আঁচড় টানছিল তা ওর খেয়াল নেই। তন্ময়তা ভাঙল অনীতার আগমনে।

আসতে পারি?

দরজার দিকে তাকাল বিভাস। খুশী-ঝরা কণ্ঠে বলল, এস, এস নীতা। ঠিক এই মুহূর্তে আমি তোমাকে মনে মনে চাইছিলাম।

কী সৌভাগ্য আমার!

জান নীতা, আমার ছবিখানা বিক্রি হয়েছে। এইমাত্র প্রদর্শনীর সম্পাদক ফোন করে জানালেন।—খুশীভরা গলায় বিভাস বলল।

জানি।—অনীতার কণ্ঠ শান্ত।

জান!—বিস্ময়াহত কণ্ঠে বিভাস জিজ্ঞেস করল।

ছবিখানা আমিই কিনলাম হাজার টাকায়।—শান্ত জবাব অনীতার।

তুমি কিনেছ আমার ছবি!—বিভাসের কণ্ঠস্বর ম্লান।

হ্যাঁ, কিনেছি। তুমি লোক লাগিয়ে আমার কবিতা-পুস্তক 'মরসুমী ফুলে'র সব কপি কিনে নিয়েছ। আর প্রকাশককে জানিয়েছ যে, আমার উপন্যাস বেরলে তার এক হাজার কপি কিনে নেবে। তাই তো তোমার ছবিখানা আমি কিনে নিলাম।—একনিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল অনীতা।

আমি—আমি কিনেছি?

হ্যাঁ। তবে যে কিনেছে তার নাম অপূর্ব রায়—বিখ্যাত স্টীভাডোর কোম্পানি রায় অ্যাণ্ড রায়ের সিনিয়র পার্টনার। আর এটুকুও জেনেছি যে, অপূর্ব রায় ও বিভাস ঘোষ একই ব্যক্তি ঠিক এই মুহূর্তে ইজেলের সামনে দণ্ডায়মান। সবই জেনেছি, শুধু তাঁর এই সদিচ্ছার কারণটি ঠিক এখনও বুঝতে পারি নি।—অনীতা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বিভাসের দিকে।

হাতের কলার-প্লেট আর তুলিটা রেখে এগিয়ে এল বিভাস। অনীতার দু কাঁধে হাত রেখে বলল, আমি তোমায় ভালবাসি অনীতা।

শিহরণ বয়ে গেল অনীতার সারা দেহে, রোমাঞ্চ জাগল।

সত্যিই আমি তোমায় ভালবাসি। তোমায় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম বলেই তো এখানে আমার অজ্ঞাতবাস। নাম বদলে এখানে স্টুডিয়ো খুললাম। দৈনন্দিন কাজের মধ্যে তোমাকে দেখব—জানব তোমার সবটুকু। তোমার প্রেম আমি আমার সাহচর্য দিয়ে জয় করতে চেয়েছিলাম নীতা!

অনীতার আনত মুখে এক ঝলক সূর্যালোক এসে লুটিয়ে পড়ল। চূর্ণ কুন্তলগুলো মৃদু মৃদু হাওয়ায় উড়তে লাগল। কর্ণমূল আরক্ত, মুখর অনীতা এই মুহূর্তে নিস্তব্ধ।

তোমাকে প্রথম দেখে মোহিত হয়েছিলাম। আজ সাহচর্যের মাধ্যমে তোমার মনের মাধুরী দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি তোমাকে একান্ত আপনার করে পেতে চাই।—গাঢ়স্বরে বিভাস মনের ভাব ব্যক্ত করল।

আরক্ত কর্ণমূল লজ্জায় আরও আরক্ত হয়ে উঠল অনীতার।

জানলার ফ্রেমে বাঁধানো আকাশে দু খণ্ড সাদা মেঘ ভাসতে ভাসতে মিশে গেলো—একাকার হয়ে আবার উত্তর থেকে দক্ষিণে হাওয়ায় ভর করে উড়ে গেল।

[ওডহাউসের একটি গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

ডাক্তার

সন্তোষকুমার দত্ত

ডাক্তার অবনী দাস তাঁর বাইরের ঘরে একটা ইজি-চেয়ারে আধশোওয়া অবস্থায় রয়েছেন। হাতে একখানি টেলিগ্রাম। এইমাত্র সেখানা পেয়েছেন। টেলিগ্রাম-পিওনের সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ দূর থেকে এখনও কানে এসে বাজছে।

টেলিগ্রামখানা পড়া সবে শেষ করেছেন, এমন সময় দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন স্থানীয় হাই স্কুলের হেড-মাস্টার তারাপদবাবু। তাঁর চোখেমুখে ব্যস্ততার ছাপ পরিস্ফুট, আসবার ভঙ্গিতে রয়েছে উত্তেজনা। সেই অবস্থায় ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আপনাকে এক্ষুনি একবার স্কুলে যেতে হবে ডাক্তারবাবু। স্কুলের একটি ছেলে জলে ডুবে গিয়েছে।

হাতের কাগজখানির দিকে একবার চোখ রেখে পরমুহূর্তে ডাক্তার তাঁর দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে শুধু অসহায় বেদনার ছাপ।

তারাপদবাবুর কথায় তখনও ব্যস্ততার আভাস: একটু তাড়াতাড়ি নিন ডাক্তারবাবু। ছেলেটিকে জল থেকে তুলতে একটু দেরিই হয়েছিল, তবে এখনও আপনি গেলে বাঁচতে পারে এই আশায় ছুটে এসেছি।

কথাটা যেন ডাক্তারের কানে গেল না। স্থির নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন তিনি।

সেই ভঙ্গী দেখে তারাপদবাবু আশ্চর্য হলেন। মনে মনে বিরক্তি বোধ করলেন কিছুটা। কিন্তু তবু সে ভাব চেপে রেখে বললেন, তাহলে আমি এগিয়ে যাচ্ছি, আপনি একটু তাড়াতাড়ি আসুন।

এই বলে যেমন তিনি পিছন ফিরেছেন সঙ্গে সঙ্গে একটি মাত্র কথা তাঁর কানে এল: না।

তারাপদবাবু ঘাড় ফেরালেন: কিছু বলছেন?

হ্যাঁ।—ডাক্তার সেই আধশোওয়া অবস্থাতেই সামান্য একটু নড়েচড়ে বললেন, আমি যেতে পারব না।

সে কি! এতক্ষণ পরে এ কথা বলছেন কেন? একজনের জীবন নিয়ে টানাটানি, আর আপনি ডাক্তার হয়ে স্বচ্ছন্দে বলছেন যেতে পারব না! আশ্চর্য!

ডাক্তার শুধু জবাব দিলেন, এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

অসম্ভবের কিছু দেখছি না তো!—তারাপদবাবুর কথায় রাগের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ: ইচ্ছে করেই যাবেন না বলুন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ডাক্তার হাতের টেলিগ্রাম-খানার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

এতখানি অবজ্ঞা হেডমাস্টার সহ্য করতে পারলেন না। দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, আচ্ছা, দেখা যাবে।

পরদিন সকালে ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে দেখলেন আশপাশের বাড়ি, এমন কি তাঁর বাড়ির দেওয়ালের গায়ে বিভিন্ন ধরনের হাতে লেখা পোস্টার লাগানো রয়েছে। স্কুলের সেই ছাত্রটি গতকাল মারা গিয়েছে। তারাপদবাবু এখান থেকে ফিরে যাবার পর আর অন্য ডাক্তার ডাকবার সময় ছিল না। তা ছাড়া এই ছোট মফস্বল শহরে একমাত্র অবনী দাস নামকরা ডাক্তার। বাকি দু-একজন যা আছে, তাদের প্রায় হাতুড়ে বললেই চলে। তবু তাদেরও ডাকবার আর অবসর ছিল না। এ খবর তিনি গতকাল বিকেলে শুনেছেন।

কিন্তু এ কি! গত পনের বছর ধরে যে শহরের মধ্যে সম্ভ্রম আর প্রীতি মেশানো ভালবাসা পেয়ে এসেছেন, এক রাত্রের মধ্যে তা এতখানি আক্রোশে পরিণত হল কেমন করে! প্রত্যেকটি পোস্টারে তাঁকে খুনী আর নরপিশাচ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ছেলেটির মৃত্যুর জন্যে দায়ী করা হয়েছে তাঁকে।

অথচ এ কথা কেউ জানল না যে, গতকাল দুপুরে টেলিগ্রামখানা পাবার ঠিক পরমুহূর্তে তাঁর পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না। ডাক্তারের সহজাত কর্তব্যবোধ ওই টেলিগ্রামের কয়েকটি কথায় চুরমার হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত রোগীর মতই উত্থানশক্তিরহিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

এখন শুধু নির্বিকার হয়ে পোস্টারগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। নির্নিমেষ নয়নে ডাক্তার সেদিকে চেয়ে রইলেন। হাতে লেখা কালো কালির ওই হরফগুলোর শক্তি কী অসাধারণ! প্রত্যেকটি কথা মনের মধ্যে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত দাগ কেটে বসছে। অথচ তিনি নিরুপায়।

হ্যাঁ, সেই কথাই সেদিন সন্ধ্যার সময় ডাক্তার তাঁর এক বন্ধুকে বলছিলেন: আমি গেলেই যে ছেলেটি বাঁচত এমন কথা নয়, তবে আমার যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেন যে যেতে পারি নি, সেকথা তোমায় এখন বলতে পারব না ভাই। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, আমার ডাক্তারী জীবনে জরুরী কল ফেরত দেওয়া এই প্রথম।

কথাটা মিথ্যে নয়। তা বলে সে কথা তো আর সকলে বুঝবে না! এই মফস্বল শহরের যুবক সম্প্রদায় আর স্কুল-কর্তৃপক্ষও বুঝলেন না। ডাক্তারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য সমানভাবে চলতে লাগল। প্রতিদিন সকাল থেকে যে ডিস্‌পেনসারীর বারান্দা রোগীর ভিড়ে ভরতি হয়ে থাকত, মাত্র দুটি দিনের মধ্যে সেখানে এক আশ্চর্য পরিবর্তন। দু-তিনটি অচেনা রোগী এসে বিস্মিত হয়ে শুধু পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, তারপর যুবক-দলের তৎপরতায় একসময় সেখান থেকে বেরিয়ে অন্য ডাক্তারের খোঁজে চলে যায়।

ডাক্তার অবনী দাস শুধু দু চোখ মেলে দেখে যান। তাঁর ভাবলেশহীন মুখে কোন রেখা ফুটে ওঠে না। তবে এটা তিনি জানেন, শহরের এই ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার একটি মাত্র উপায় তাঁর হাতে আছে, অথচ তা তিনি করতে পারেন না। সেই অসহায়তা তাঁকে অস্থির করে দেয়।

এমনি করে আরও দুটো দিন কেটে গেল।

একদিন খবর পেলেন, স্কুল-কর্তৃপক্ষ তাঁকে অত সহজে নিষ্কৃতি দেবে না। এই 'হৃদয়হীন' ডাক্তারের লাইসেন্স বাতিল করাবার জন্যে তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছেন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম সরকারী মহল পর্যন্ত তাঁদের কর্মতৎপরতা বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ডাক্তার মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেন। এতদিন আত্মপক্ষ সমর্থনের এতটুকু ইঙ্গিত জানান নি, শহরের অধিকাংশ মানুষের কটূক্তি আর বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করে এসেছেন কিন্তু আজ যদি তাঁর লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায় তাহলে এখানে বাস করার কোন অর্থ হয় না। এতগুলো মানুষের চোখের সামনে হাস্যাস্পদ হয়ে ঘুরে বেড়ানোর মত অপমান আর আছে!

এই অবস্থায় বন্ধুটিকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কি চায়?

বন্ধুটি বলল, ওদের দাবি—প্রকাশ্য সভায় তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

ডাক্তারের চোখ দুটো চকিতের জন্যে যেন জ্বলে উঠল: অবনী দাস আজ পর্যন্ত কারও কাছে ক্ষমা চায় নি। অন্যায় করলেও নয়। তবে হ্যাঁ, প্রকাশ্য সভায় আমার সেদিনের অনুপস্থিতির কারণটি সবাইকে জানিয়ে দিতে পারি এইমাত্র।

বাস্ বাস্, তাহলেই হবে।—বন্ধুটি তখনই সায় দিল, সে আমি ওদের বলে বুঝিয়ে ব্যবস্থা করব।

এক দুর্নিবার কৌতূহল আজ কয়েকদিন তাকে অস্থির করে দিচ্ছে।

পরের দিন রবিবার; ছুটির দিন। বিকেল পাঁচটায় প্রকাশ্য সভা ডাকা হয়েছে। হাই স্কুলের লম্বা হলঘরে লোক ভরতি। এমন একজন নামকরা ডাক্তারের কী বিচার হয়—তাই দেখবার জন্যে চাষী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও অনেকে উপস্থিত হয়েছে। এই শহরের মধ্যে যে কোর্ট আছে—তার মুনসেফ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁর একপাশে হেডমাস্টার, আর একপাশে ডাক্তার বসে রয়েছেন। ডাক্তারকে আজ খুবই বিবর্ণ দেখাচ্ছে। এই কয়েকদিনেই তাঁর চেহারা অনেকখানি শীর্ণ হয়েছে। চোখের কোলে কালি

পড়েছে। কয়েকদিন দাড়ি কামানো হয় নি; তবু ওই সবকিছুর মাঝখানে তাঁর মুখে একটা শান্ত ও নিস্পৃহ ভাব রয়েছে—যেন এইসব তুচ্ছ ঘটনার অনেক উর্ধ্বের মানুষ তিনি।

প্রথমেই হেডমাস্টার বক্তৃতা দিতে উঠলেন। জনসাধারণের সামনে ডাক্তার অবনী দাসের নিষ্ঠুরতা এবং হৃদয়হীনতার কথাগুলো অকাট্য যুক্তি দিয়ে ব্যক্ত করলেন। কি কি গুণ থাকলে অন্ততঃ সাধারণ ডাক্তারের উপযুক্ত হওয়া যায়—তার নির্দেশ দিলেন। সবশেষে ডাক্তার অবনী দাসের মধ্যে মানবতাবোধ এতটুকু নেই এবং থাকলে তিনি সেই জলমগ্ন বালককে বাঁচাবার অন্তিম কামনা উপেক্ষা করতে পারতেন না—এই মন্তব্য করে বসে পড়লেন। সমবেত জনতা করতালি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করল।

করতালির শেষ শব্দটি যখন মিলিয়ে গেল, সকলের দৃষ্টি যখন ডাক্তারের উপর পড়ল এবং যখন মুনসেফ তাঁকে কিছু বলবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন, ঠিক তখন—হ্যাঁ, সভার সেই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

নির্ভীক দৃষ্টি, দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে দৃঢ়তা এবং ধীর অথচ স্পষ্ট কথা শোনা গেল: হেডমাস্টারমশাই যা বলেছেন, আপাতদৃষ্টিতে দেখলে তার প্রত্যেকটি কথাই অভ্রান্ত। আমি সেদিন যাই নি, এ কথা সত্যি, তবে ইচ্ছে করে নয়। সেদিন আমাকে 'কল' দেবার কয়েক মিনিট আগে একখানা টেলিগ্রাম এসেছিল। তার মধ্যে এমন একটি খবর ছিল যা মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত শরীরকে অসাড় করে দিয়েছিল। টেলিগ্রামখানা সঙ্গে করে এনেছি, তবে নিজে বোধ হয় পড়তে পারব না। তাই সভাপতির ওপর সে ভার দিচ্ছি।

বলে পকেট থেকে সেখানা বার করে মুনসেফের হাতে দিলেন। তারপর কোনরকম অপেক্ষা না করে বলতে লাগলেন, আপনাদের দেওয়া অভিযোগ সত্যি; আমি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। না হলে এই টেলিগ্রামখানা পাবার পর আমার চোখ থেকে একফোঁটা জল পড়ে নি। এমন কি সংবাদদাতাদের টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছি—আমার যাবার দরকার নেই। এ বিষয়ে যা কিছু করণীয় তাঁরা যেন করেন।

তবে একটা কথা, আজ পর্যন্ত আমার স্ত্রীকে খবরটা জানাই নি। তাহলে তার তখনকার সেই অবস্থা আমার মত হৃদয়হীন মানুষও সহ্য করতে পারত না। তাই যতদিন সম্ভব এ খবর সকলের কাছে চেপে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম। এখন আর উপায় নেই দেখে দুশ্চিন্তা বোধ করছি। আমার অনুরোধ, টেলিগ্রামের খবরটি যেন তার কানে না যায়। আর আমার বলার কিছুই নেই। সভাপতির অনুমতি নিয়ে এবার আমি বিদায় নিচ্ছি।

ধীর শান্ত পদক্ষেপে ডাক্তার সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মুনসেফ কিছুক্ষণ আশ্চর্য দৃষ্টিতে সেই গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর টেলিগ্রামখানির অর্থ সভার মাঝখানে প্রকাশ করলেন।

যেদিন স্কুল থেকে ডাক্তারকে 'জরুরী কল' দেওয়া হয়, ঠিক সেইদিন বেলা দশটায় ডাক্তারের একমাত্র ছেলে জলে ডুবে মারা যায়। ছেলেটি পাশের মহকুমা শহরে রামকৃষ্ণ-মিশনে থেকে পড়াশুনা করত। ডুবে যাবার প্রায় আধঘণ্টা পরে মিশনের সেই বিরাট ও গভীর পুকুর থেকে তাকে যখন তোলা হয়, তখন তার জীবনের আশা একতিলও ছিল না।

*

সাময়িক সাহিত্যের মজলিস

বিক্রমাদিত্য হাজরা

তাবিজ কবচ মাদুলি বশীকরণ বটিকা ভাগ্যগণনা এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী ভেষজের বিজ্ঞাপনে সাধারণতঃ প্রশংসাপত্রের ভিড় দেখা যায়। অর্থাৎ যেসব জিনিসের মূলে কিছু গোঁজামিল বা গলদ আছে তারাই সাধারণতঃ প্রশংসাপত্রের আড়ালে আত্মরক্ষা করতে চায়। সাম্প্রতিক কালের কিছু কিছু খুব জনপ্রিয় কাগজ বিজ্ঞাপনের এই পরিচিত কৌশলটি অবলম্বন করছে বলে দেখতে পাচ্ছি। এটা মনের অগোচরে যে পাপ সেই পাপ ঢাকবার অপপ্রয়াস নয়তো? এ জাতীয় প্রশংসাপত্র ডাকযোগে আসে, না আপিসের নিরাপদ চৌহদ্দীর মধ্যেই manufactured হয় তা অনুসন্ধান করে দেখা ভাল।

২৩শে চৈত্রের পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠির নমুনা এইরকম:

"সবিনয় নিবেদন

জনপ্রিয় দেশ পত্রিকায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধমালা পাঠকমহলে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করেছে। 'শিল্পীর স্বাধীনতা'য় অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু গত ৩০ বর্ষ ২ চৈত্র, সংখ্যাটির রচনাটি অপূর্ব।...

নমস্কার ইতি

ধীরেন কর গুপ্ত"

আমার হাতের কাছে উপস্থিত নেই, তাহলে আমি দেখাতে পারতাম তাবিজ কবচ ইত্যাদির বিজ্ঞাপনে যে সমস্ত প্রশংসাপত্র প্রকাশিত হয় তার ভাষা হুবহু এই রকমের।

'শিল্পীর স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি নিয়ে আমি এ পর্যন্ত অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কমিউনিস্ট বিরোধী। কিন্তু এমন একজনের সঙ্গেও আমার আজ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নি যিনি সাহিত্যের পত্রিকা বলে বিজ্ঞাপিত একটি পত্রিকায় এই জাতের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক রচনাকে সন্দেহের চোখে দেখেন না। ট্রেনের কামরায় যে লোকটি চোর পকেটমারদের সম্পর্কে বেশী লম্বা লম্বা কথা বলে সে লোকটির দিকে একটু নজর রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এক জাতের পত্রিকা প্রকাশিত হয় যাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল কমিউনিস্ট দুনিয়া সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা। অবশ্য ও-দেশের লোক যা কিছু করে তা অনেক বেশী গুরুত্বসহকারে করে। বহু রকমের দলিল উল্লেখ করে বহু উদ্ধৃতি সহযোগে তারা একটা বক্তব্যকে হাজির করতে চায়। এ সব পত্রিকায় কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকলেও তাদের উদ্দেশ্যটা আমরা জানি বলেই সব সময়ই মনে আশঙ্কা থাকে যে তারা সত্যের একটা দিক মাত্র প্রকাশ করছে। তবু এ সব পত্রিকাকে আমি সাধুবাদ দিই এইজন্য যে এদের মধ্যে কোন ভণ্ডামি নেই।

'দেশ' পত্রিকার নীচে একটি sub-heading দিয়ে যদি লেখা থাকত—কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসা প্রচারের পত্রিকা—তাহলে আমার আপত্তি করার কোন কারণ ছিল না। যে কোন রাজনৈতিক মত বা দলের অপর দল সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত প্রচার করার অধিকার আছে এবং অপর দলও তেমনই পাল্টা কুৎসা অভিযান চালালে আপত্তি করার কারণ থাকে না। কিন্তু 'দেশ' পত্রিকার শিরোনামায় সাহিত্য পত্রিকা কথাটা লেখা না থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা জনচিত্তে এ ধরনের একটা ধারণা সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্যের ভেক ধরে রাজনৈতিক কুৎসা প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োগ করলে তাকে সদাচরণ বলা যায় কিনা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

সাহিত্য সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকার যদি কোন ঘোষিত নীতি থেকে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই এই যে কোন দল বা মতবাদের প্রতি একান্ত আনুগত্য সাহিত্য-কর্মের পক্ষে ক্ষতিকর। এই সংজ্ঞাটিকে এখন একটু পরিবর্তন করার দরকার দেখা দিয়েছে। কমিউনিজম্ যেমন একটি মতবাদ, তেমনই কমিউনিস্ট বিরোধিতাও একটি মতবাদ।

তফাত এই যে দ্বিতীয়টি নিছক নেতিমূলক, গঠনমূলক চিন্তাশূন্য। কাজেই উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে একটু পরিবর্তন করে এখন এইভাবে বলা দরকার: যে কোন দল বা মতবাদকে অনুকরণ করলেই শিল্পের কৌলীন্য ক্ষুণ্ণ হয় বটে, কিন্তু কমিউনিস্ট বিরোধিতার মধ্যে এমন কিছু অতিলৌকিক উপাদান আছে যার ফলে এই চিন্তাধারাকে উপজীব্য করলে শিল্পের শিল্পত্ব নষ্ট হবে না।

সাম্প্রতিক কালের 'দেশ' পত্রিকার একটি সংখ্যায় যে কয়টি কমিউনিস্ট বিরোধী রচনা প্রকাশিত হয়েছে তা উল্লেখ করছি: ১। সাহিত্যের শপথ, ২। বৈদেশিকী, ৩। শিল্পীর স্বাধীনতা, ৪। ভারতবর্ষ ও চীন, ৫। ড্রাগনের দাঁতে বিষ, ৬। আলোচনা।

এইসব রচনাকে এখন আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নমুনা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে অবশ্য তারাশঙ্করের রচনাটিতে ভারতবর্ষ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাস উদ্ঘাটন করে চীনের বিশ্বাসঘাতকতার রূপটিকে তুলে ধরার প্রয়াস আছে। এ প্রবন্ধটি কাজেই দেশরক্ষার চেষ্টাকে শক্তিশালী করবে। কিন্তু আর সমস্ত রচনাতেই দেশপ্রেমটা হল মুখোস, কমিউনিজম্-বিরোধিতা হল মুখ। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যাঁদের বলার আছে তাঁরা তা বলবেন বইকি! কিন্তু একটি সাহিত্যের কাগজ যদি এইটেকেই একমাত্র আলোচনার বিষয় করে তোলে তবে সাহিত্যটা আর কোন কিছুর আড়াল কিনা সেটা নতুন করে চিন্তা করে দেখতে হয়।

'দেশ' পত্রিকার গুদামে সেরা সেরা সাহিত্যিক মজুদ থাকলেও যে সামান্য কয়েকটি দেশাত্মবোধক রচনা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলিই রামা-শ্যামাদের দিয়ে লেখানো (অবশ্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতাটি ব্যতিক্রম। কবিতাটি জোরে জোরে পড়ার সময় রাস্তা থেকে ধাঙ্গড় ছুটে এসেছিল তাদের গাল দিচ্ছি মনে করে)। কিন্তু, আমাদের আশ্চর্য সৌভাগ্য, বিকৃত যৌন সমস্যা নিয়ে গল্প লেখার স্পেসালিস্ট স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দেশাত্মবোধক গল্প লিখেছেন ২৩শে চৈত্রের 'দেশে'। আধুনিক গল্প—কাজেই মেয়েলী আধো আধো বুলির ভাষায় সিম্বলের ছড়াছড়ি। প্রথম সিম্বল করাত দিয়ে গাছ কাটা হচ্ছে আর তার শব্দটা চোরের চুরি করে খাওয়ার মত শোনাচ্ছে। দ্বিতীয় সিম্বল—ঘুমন্ত হরিপদর সাদা মুখের উপর লাল পিঁপড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। করাত এবং লাল পিঁপড়ে দুই-ই চীনের প্রতীক হিসেবে লেখক উপস্থিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু অভ্যেস যাবে কোথায়? দুটোই যে সেক্সের সিম্বল লেখকের কি তা নজরে পড়ে নি? তাতে অবশ্য আমি আপত্তি করছি না, কারণ pun-sexualityর যুগে দেশ আক্রমণের মধ্যেও সেক্সের কীর্তি দেখতে আপত্তি নেই। তারপর ঘটনাস্থলে একটি মেয়ের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর স্বভাব-সুলভ রোমান্টিকতা উথলে উঠেছে। "সিল্কের মতো ফিনফিনে চুলের রাশ সমুদ্রের কালো ফেনা হয়ে বসন্ত-বাতাসে ফুলে ফুলে উঠেছে।" সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই লেখকের মনটাও দুলে দুলে উঠছে। "কাজল-পরা চোখ দুটো ভ্রমর হয়ে আছে। মালতীলতার গায়ে এক জোড়া ভ্রমর।" যার চোখ ভ্রমর, তার নখও পিছিয়ে নেই। "হিরণের নখে মাধবী পাতার গন্ধ।" তারপর নায়কের (বা নায়িকা) সঙ্গে হিরণ মেয়েটির গল্প শুরু হল—বাল্য-কালের গল্প, যখন তারা বাঘ-বন্দী খেলত (আবার, বাঘ হচ্ছে চীনের সিম্বল)। তারপর হঠাৎ সেই হিরণ মেয়েটি, যার চুল হল সমুদ্রের ফেনার মত, যার চোখ হল ভ্রমর, যার নখে মাধবী পাতার গন্ধ—সে হঠাৎ জানল যে তার স্বামী নেফা-যুদ্ধে মারা গিয়েছে এবং ঘোষণা করল, "'আমি ক্যাডেট হয়েছি। আমি চুপ করে বসে নেই।··· রাইফেল ছোঁড়া শিখছি—অলরেডি শিখে গেছি। দরকার হলে বন্দুক হাতে ফ্রন্টে যাব।'"

আমি যদি বলি, সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত একদল শিক্ষিত সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করছে দেখে তালপাতার সেপাই উঠে দাঁড়িয়ে এক খণ্ড ফাটা বাঁশকে বন্দুকের মত করে কাঁধের উপর বসিয়ে বলে, আমিও যুদ্ধে যাব তাহলে পাঠকের মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পও ঠিক সেই অনুভূতি সৃষ্টি করে। ক্লাইম্যাক্স নয়, অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স। আমি জানি না রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত জ্যোতিরিন্দ্রবাবুও দেশরক্ষার প্রয়াসের একটি প্যারডি রচনা করতে চেয়েছেন কিনা। তা যদি হয় তাহলে গল্পটি সার্থক।

শুধু এই গল্পটিতেই নয়, 'দেশ' পত্রিকায় যে কটি দেশপ্রেমের গল্প পড়েছি তার প্রায় সবগুলিতেই রণ-রঙ্গিনীদের ভিড়। দেখছি যে ঘরের মেয়েদের ফ্রন্টে না পাঠাতে পারলে বাঙালী সাহিত্যিকদের কল্পনার দরজা খোলে না। মরচে-ধরা দরজা তো, রোমান্টিসিজমের তেল একটু বেশী লাগে।

'দেশ' পত্রিকার পরিকল্পনা খুব পরিষ্কার। মেয়েরা ফ্রন্টে যাক যুদ্ধ করতে, আর আমরা পুরুষেরা ঘরে বসে ফাঁকা মাঠে পেনসিল-কাটা ছুরি দিয়ে কমিউনিজমকে কচু-কাটা কেটে খানখান করে ফেলব।

সম্প্রতি সন্তোষকুমার ঘোষ যশ অর্থ সম্মান প্রচুর পরিমাণে লাভ করে পরম সন্তোষ বোধ করে অনেক ভ্রূণের জন্ম দেবেন বলে ঠিক করেছেন। এই সব ভ্রূণের দল "অবয়বে যা পুরন্ত হয়নি ; যা প্রাণের অপূর্ব কয়েকটি প্রতিশ্রুতি মাত্র" অতঃপর 'ভ্রূণাঙ্করে' নামক নূতন বিভাগে নিয়মিত আত্মপ্রকাশ করবে। খবরটা ভালই, তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে এসব ভ্রূণেরা অবৈধ সম্পর্ক-জাত, পথে-প্রান্তরে লোকচক্ষুর অগোচরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ; দৈবাৎ 'দেশ' সম্পাদকের নজরে পড়ে যাওয়ায় সসম্মানে কাগজের পৃষ্ঠায় স্থান পাচ্ছে। আমার আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নয় একটি উদ্ধৃতি থেকে সেটা হয়তো কতকটা বোঝা যাবে :

"যে-প্রকৃতি অ-যুবতী-জরতী, যাকে সংস্কৃত-ঋতু বলে জানি, অসংযত জনান্তিকে সে তবে এখনও অবিরত, লোকলোচনের আড়ালে তার আদিমতা স্বগত ? তার রগে-রগে গর্হিত ইচ্ছা সোৎসাহ স্রোত হয়ে ফুঁসে ওঠে, রোজ সকালে সবুজ-তরমুজ সূর্য জবাই করে সে তার উৎসারিত হৃদ্‌রক্ত পান করে।

প্রকৃতি আজও প্রসূতি।"

প্রকৃতির মধ্যে গর্হিত ইচ্ছা সোৎসাহ স্রোতে ফুঁসে উঠেছে কিনা জানি না, তবে লেখকের Libido যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারছি। যাদের সাবধান থাকা দরকার তারা যেন সাবধান থাকে।

এই সব ন্যাকামি ফিচলেমি আর কাঁচা adolescent romanticism-এর রচনা পড়তে পড়তে মন যখন ক্লান্ত হয়ে ওঠে তখন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অসমাপ্ত চটান্দে'র পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে খানিকটা স্বস্তি বোধ করা যায়। ভাষা সহজ অনাড়ম্বর ; বাংলা ভাষা যেমন হওয়া উচিত তাই। লেখকের সত্য-ভাষণ ও স্পষ্টবাদিতা দেখে বুঝতে পারি এই লেখকের মন স্বাধীন, 'দেশে'র সম্পাদকের কাছে বিক্রীত নয়। নমুনা হিসাবে তাঁর একটি বক্তব্য উল্লেখ করি : "কাজেই এক ঝটকায় যাট হাজার শ্রমিক যে ছিটকে বেরিয়ে গেল এবং আরো যাট হাজার যে যাবার পথে সেটা কিছুই বিচিত্র নয়। কর্তৃপক্ষের মেজাজ যে প্রফুল্ল এবং শ্রমিকদের অন্তর যে বিপর্যস্ত, যার ফলে তারা খুন পর্যন্ত করতে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাও কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য আজ প্রায় এক-শো বছর ধরে চলেছে এই অবারিত দুঃখের কাহিনীর, এই মর্মান্তিক দারিদ্র্যের একটানা স্রোত। সোনালী সুতোর বদলে সোনার মোহর আসছে ঘরে অথচ সহস্র সহস্র মানুষের চোখের জলভরা এই বিক্ষুব্ধ অধ্যায়ের শেষ হচ্ছে না।"

মনোজ বসুর সম্পাদনায় 'সাহিত্যের খবর' নামক একটি আলোচনা-প্রধান মাসিক পত্র প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকার নামটি খুবই অবিবেচনা-প্রসূত ; এবং আমার মনে হয় নামের অকিঞ্চিৎকরতার জন্য এতদিনেও কাগজটি উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। কিন্তু পত্রিকাটির মধ্যে কিছু কিছু চিন্তাশীল এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের সাক্ষাৎ পেতে পারবেন পাঠক। আমার হাতের কাছে ফাল্গুন সংখ্যাটি রয়েছে। এর মধ্যে রঞ্জিত সিংহের লেখা 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা', চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রাধাপ্রেমের অলৌকিকত্ব' এবং দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের 'জর্জ টম্পসন ও নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চার দ্বিতীয় পর্যায়' এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

রঞ্জিত সিংহ নিঃসন্দেহে আধুনিক সমালোচকদের একজন যাঁদের ভাষা আধুনিক কাব্য-ভাষার মত দুর্বোধ্য না হলেও প্রত্যক্ষ ভাষণের অপরাধে কখনই অপরাধী নয়। জীবনানন্দ দাশকে প্রশংসা করাই যখন ফ্যাশন তখন তিনি তাঁর বিরূপ সমালোচনা করে কিছুটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। প্রবন্ধটি আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হচ্ছে জীবনানন্দ তিনটি গুরুতর অপরাধে

অপরাধী। প্রথমতঃ তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি, দ্বিতীয়তঃ তিনি টি. এস. এলিয়টের দ্বারা প্রভাবিত, তৃতীয়তঃ তাঁর লেখায় দু-একটি ছন্দের গোঁজামিল দেখা যায়। এই সব অপরাধের কতখানি প্রকৃত ও কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আমি জানি না; তবে কোন সমালোচক এগুলোকে নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পারেন। মোটের উপর দু-চারজন সমালোচক নিশ্চয়ই থাকা দরকার যাঁরা বেসুরো কথা বলেন। অসুবিধাটা সেখানে নয়। অসুবিধা এইজন্য যে প্রবন্ধটি আমি যে ভাবে বুঝেছি সে বোঝাটা ঠিক বোঝা কিনা তা বুঝতে পারছি না।

চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়ের রচনা গতানুগতিক অ্যাকাডেমিক রচনা। তাঁর বক্তব্যও সুপরিচিত। কিন্তু দ্বিজেনবাবুর ঐতিহাসিক ও তথ্যবহুল নিবন্ধটি মূল্যবান।

চীনা আক্রমণের পর আমাদের পত্র-পত্রিকাগুলি বড় মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল। গা বাঁচানোর জন্য দেশপ্রেমাত্মক কিছু কিছু রচনা প্রকাশ করার তাগিদ ছিল। আর দেশের ওরকমের থমথমে আবহাওয়ায় কাঁচা ডাঁসা টক মিষ্টি রসালো গল্প অবাধে সরবরাহ করতে খানিকটা বিবেকেও বাধছিল। ব্যাপারটা যত দূরে সরে যাচ্ছে ততই পত্রিকাওয়ালারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেন। স্লিপিং ট্যাবলেট খেতে খেতে মানুষের একটা অবস্থা আসে যখন আর ট্যাবলেট না খেলে কিছুতেই ঘুম আসে না। কাঁচা জলো সস্তা রোমান্সের অঢেল সরবরাহ দিয়ে দিয়ে পত্রিকাওয়ালারা বাঙালী পাঠকদের অবস্থা প্রায় সেই রকম করে তুলেছেন।

বলা বাহুল্য এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রসর সিনেমা পত্রিকাগুলো। এই পেট-মোটা কাগজগুলিতে সিনেমার বাজারের বস্তা-পচা খবর দেদার সরবরাহ করার পরও অনেক জায়গা থাকে। এই উদ্বৃত্ত জায়গাটা ভরাট করার জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং স্কেলে প্যাচপেচে রোমান্স সৃষ্টি করা হয়। ইস্কুলের ইঁচড়েপক মেয়েদের কচি কচি মাথাগুলো চিবিয়ে খাওয়ার পক্ষে এগুলোর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর নেই। কারণ এইসব মেয়েই সিনেমা পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা। যাঁরা একটু বয়স্ক তাঁরা সাধারণতঃ পাতা উলটে ছবিগুলো দেখে নেন। খুব পরিচিত কোন নাম নজরে পড়লে হয়তো কচিৎ কখনও অক্ষরের উপর দিয়ে দ্রুত চক্ষুযুগল একবার ছুঁয়ে যান।

কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম যে যিনি 'নবকল্লোলে' লিখেছেন, যিনি উপন্যাসে(?)র নাম দিয়েছেন 'কুমারী কন্যার মন', এবং যিনি স্বয়ং প্রীতিপূর্ণ দেবনাথের মত একটি নামের অধিকারী, তিনি অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন রচনায়। কী চমৎকার অবলীলাক্রমে গল্পটা এগিয়ে গিয়েছে। ট্রেনে পরিচয় হয়েছে নায়কের সঙ্গে নায়িকার। নায়িকা নায়ককে অনায়াসে এনে তুলেছে নিজের বাড়িতে। অবশ্য সে স্বাধীনতা তার আছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে সে চাকরি নিয়েছে; লটারীতে টাকা পেয়ে বাড়ি কিনেছে; এর চেয়ে ভাল নায়িকা কল্পনা করা সহজ নয়। নায়কেরও কোন আগু বা পিছু টান নেই, কারণ সে বেড়াতেই বেরিয়েছে। সেই নায়ক এবং নায়িকাকে লেখক একটা বাড়ির মধ্যে দীর্ঘ দু মাস ধরে আটকে রেখেছেন। এর মধ্যে কোন চরিত্র-চিত্রণের বালাই নেই, সংলাপের জৌলুস নেই, ঘটনার সেই প্রথম চমকটি ছাড়া আর কোন চমক নেই। অত্যন্ত গতানুগতিক মামুলী এই অবাস্তব কাহিনী পাঠক পড়ে যায় (মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে দিয়ে) শুধু একটি মাত্র প্রত্যাশাকে সম্বল করে। কিন্তু আশ্চর্য সংযম লেখকের। দৃঢ়তাও বলতে পারেন। সেই প্রত্যাশাটুকু তিনি কিছুতেই পূরণ করবেন না। তিনি শুধু এইটুকুমাত্র লিখে ছেড়ে দিয়েছেন:

"চোখ বুজেছি। বুঝি ঘুম আসছে। হঠাৎ একটা শব্দ। কপাটে একটা খট্ করে শব্দ। চোখ মেলে দেখতে পেলাম দরজা ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেছে। আমার ঘরের দরজা আমি তো বন্ধ করিনি! দরজা খোলা। সুপ্রীতির ঘরের দরজা ফাঁক হয়েছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ। সুপ্রীতির ঘরে আলো।

দেখতে পেলাম চৌকাঠ পার হয়ে সুপ্রীতি এসে আমার ঘরের অন্ধকারে পা ফেলেছে। আমি চোখ বুজে ঘুমের ভান করে নিঃসাড়ে পড়ে থেকে শ্বাস টানছি। একটা পরিচিত গন্ধ পেলাম। সুপ্রীতির গায়ের গন্ধ। তারপর···তারপর ঠোঁটে আমার তার কবোষ্ণ ঠোঁটের ছোঁওয়া লাগতেই চমকে উঠে···"

বাস্! এই পর্যন্ত এগিয়েই লেখক থেমে গিয়েছেন। পরের খবর হচ্ছে নায়িকার অনুরোধে নায়ক নায়িকার ঘরে গেল। এইখানেই খবর শেষ! আশ্চর্য সংযম! যাঁর নাম প্রীতিপূর্ণ তিনি এ রকম অর্ধপ্রীতিতে শেষ করলেন কী করে?

তবে লেখককে একটা কথা পষ্টাপষ্টি বলে দেওয়া ভাল। এত মামুলী গল্প সিনেমায় চলবে না; এ রকম অনেক গল্প ইতিপূর্বে সিনেমায় হয়েছে এবং মার খেয়েছে। আশায় আশায় রাতের ঘুম নষ্ট করে লাভ নেই।

কাহিনীর মধ্যে যে একটু অভাব আছে তা বুঝতে পেরে সম্পাদক মশাই এক চাল চেলেছেন। কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে বিবেকানন্দ-জীবনীর প্রদর্শিত মডেলগুলোর ফোটো-রূপ বসিয়ে দিয়েছেন। অনেকে হয়তো বলবেন, ধৃষ্টতা! আমি বলব—ডায়ালেক্‌টিক্‌স্। বিপরীতের সহাবস্থানেই তো জীবন।

এই উপন্যাসটির চেয়েও অনেক বেশী রোমহর্ষক আভা পাকড়াশীর গল্প 'আবর্ত'। সঙ্গীতজ্ঞ অরুণেন্দুর জীবনে দুই নারীর আবির্ভাব হয়েছে—একজন রাজকুমারী, অপরজন সাধারণ ঘরের গায়িকা নমিতা। এর মধ্যে স্খলিত অঞ্চলে ছুটে আসা থেকে শুরু করে রাজকুমারীর আত্মহত্যার চেষ্টা এবং নমিতা কর্তৃক তার জীবন-রক্ষা প্রভৃতি সিনেমার উপযোগী এবং চতুর্দশীদের মন-ভোলানোর পক্ষে পর্যাপ্ত উপাদান আছে। একটা ছোটগল্পের মধ্যে এতগুলো সিচুয়েশান সৃষ্টি করা কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। কিন্তু এ-সবই বাহ্য। কাহিনীর শেষে আছে দর্শন, জীবন সম্পর্কে এক সুমহান্ আবিষ্কার: "নমিতা হাসে, বড় বিপদের হাসি। বলে, এই চারটে দিন আমার কিভাবে কেটেছে তা যদি জানতে! তুমি তো ওর মন রাখতেই আমাকে একটা চিঠি লেখারও সময় পাওনি। আমি বুঝেছি অরুণেন্দু, তোমার মধ্যে আছে দুই রক্তের সংমিশ্রণ, তাই দুই জাতের মেয়েই তোমার মনকে টানে। বিশেষ করে তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থাকে একটি চিরন্তনী শিশুমনোবৃত্তি, যার দরুন তোমরা প্রিয়ার মধ্যেও খোঁজ নিজেদের জননীর প্রতিচ্ছবি।"

কাজেই আর চিন্তার কোন কারণ নেই। 'নবকল্লোল' এখন পাঠকদের সবকিছুই সরবরাহ করবে। শুধু কাঁচা রোমান্স নয়, সেই সঙ্গে বহু পুনরাবৃত্তিতে জরাজীর্ণ ভারী ভারী দার্শনিকতত্ত্বের প্রলেপ থাকবে। শুনেছি বাংলা সিনেমায় আজকাল নাকি মনস্তত্ত্বমূলক ছবিও তোলা হয়; তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে। এই গল্পটা যদি সিনেমায় গৃহীত হয় তাহলে তো দার্শনিক-তত্ত্বমূলক ছবি তোলা হচ্ছে এ কথাও শুনতে হবে।

কিন্তু আমার এক বন্ধু বললেন এখন নাকি 'উল্টোরথ'-'নব-কল্লোলে'র যুগও বিগতপ্রায়, সাহিত্যের আগামী যুগের সূচনা করছে নাকি 'মানসী'। কাজেই পাছে ব্যাকডেটেড হয়ে পড়ি এই ভয়ে 'মানসী'র দু-একটা সংখ্যা যোগাড় করে ফেললাম। একটু নাড়াচাড়া করেই বুঝতে পারলাম আমার বন্ধু একেবারে মিছে কথা বলে নি। মানব-সভ্যতার গতি এখন পশ্চাৎ-মুখী এ কথা যদি ধরে নিই, তাহলে উল্টোরথ অ্যাণ্ড কোম্পানি এতকাল এই শতকের তৃতীয় দশকের রোমান্টিক মেজাজ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছিল; এবং 'মানসী' যদি আরও পিছনের দ্বিতীয় দশকের মেজাজটি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে তবে সে নিঃসন্দেহে আরও বেশী অগ্রসর বলে দাবি করতে পারে।

বাংলাদেশে দ্বিতীয় দশকে একবার যৌবনের বান ডেকেছিল। সে সময়কার তরুণ লেখকের দল বিবাহের চেয়ে বড় প্রেম, যাযাবর প্রেম, পেশাগত প্রেম প্রভৃতি অনেক সৌখিন কল্পনার আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছেড়েছিলেন। ইসাডোরা ডান্‌কান্, দানোৎসিও প্রভৃতির জীবনী তখন উৎসাহের সঙ্গে পড়া হত। কাসানোভার স্মৃতিকথা, সাফো প্রভৃতি উপন্যাস তখনকার লেখকদের কাছে ছিল প্রেরণার উৎস। তখনকার রচনা পড়ে নবীনরা লজ্জায় ও প্রবীণরা রাগে লাল হয়ে উঠতেন, আর তাইতেই লেখকেরা পরম কৌতুক বোধ করে ভাবতেন তাঁরা প্রগতির পরাকাষ্ঠা করছেন।

তারপর পৃথিবীর উপর দিয়ে দীর্ঘ চল্লিশ বছর চলে গিয়েছে। ইতিহাসের নির্মম চক্রযান মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। নতুন অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় পৃথিবীর সর্বত্রই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর রূপান্তর ও পরিণত-বুদ্ধির প্রকাশ দেখা গিয়েছে। যাযাবর প্রেমের বালখিল্য আদর্শ এখন বড়জোর মানুষের ঠোঁটের প্রান্তে একটু

মৃতের মত শীতল এই সমালোচনায়, যদি তা শুধু বুদ্ধির গায়ে সুড়সুড়ি দিয়েই নিরস্ত হয়; যদি তাতে না মথিত হয় কল্পনা এবং আবেগ এবং বোধি?

নিন্দুক তার নিন্দার মন্ত্রোচ্চারণে খুঁজে বেড়ায় সেই অনির্বচনীয়কে, জ্ঞানের মন্ত্রে সিদ্ধার্থ আর প্রেমের মন্ত্রে নিমাই যাকে খুঁজেছিল একদিন।

মূর্তি ভেঙে ভেঙে সেই কালাপাহাড় মূর্তির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

প্রতি মাসে প্রতিবেদন উপস্থাপনার সম্বৎসর পূর্ণ হবার মুখে বর্ষশেষে আজকে কী জানি কেন ইচ্ছে করছে সালতামামি করে দেখতে। বিচার করতে ইচ্ছে করছে নিজেকে। কতটুকু সার্থকতা পেয়েছি আমার নিন্দামার্গের কঠিন নাস্তিক্যসাধনায়?

প্রতিবেদন-পর্যায়ে মনোনিবেশের প্রাক্কালে চৈত্র ১৩৬৮ সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে আমি যখন লিখেছিলাম:

"...রবি অস্তমিত হলে বেরিয়ে এসেছে ভীরুতায় হিংস্র পশুর দল গুপ্ত গহ্বর থেকে। তাই তো আজ নতুন করে প্রয়োজন এক কালাপাহাড়ের, ত্রিশ বছর আগেকার সেই কর্তব্যে নিষ্ঠুর শনিবারের চিঠির, যে আবাহন করবে ভৈরব রুদ্রকে; তাণ্ডবের প্রচণ্ডতায় হৃদ্‌কম্প জাগাবে মিথ্যা আর ভণ্ডামি, লোভ আর স্বার্থ দিয়ে তৈরী সাহিত্যের ছদ্মবেশী সুবিধাবাদকে —সুন্দরের মন্দিরে যার অন্যায় ব্যতিপ্রবেশ। ঐতিহাসিক এই প্রয়োজন কার দিকে আশায় উদ্বেল চোখে তাকিয়ে আছে, কী জানি। শুধু জানি এ কর্তব্য গ্রহণ করতে পারে নির্লোভ নির্মোহ নির্ভয়তা।"

তখন আমার সাবধানী শব্দপ্রয়োগের ছদ্মবেশ ভেদ করে দুর্বিনীত দম্ভ আত্মপ্রকাশ করেছিল, জানি।

অপরের দম্ভ দেখলে যতই রুষ্ট হয়ে উঠি না কেন, আমার চরিত্রে এই একটি গুণ আছে যে নিজের দম্ভকে ক্ষমা করতে আমার তেমন বাধে না; যদি না সে-দম্ভ শূন্যগর্ভ আত্ম-তৃপ্তির কণ্ডূয়ন-মাত্রে আমার অলস মুহূর্তকে পরিপূর্ণ করেই মিলিয়ে যায় নৈষ্কর্ম্যের অন্ধকারে; যদি সে দম্ভের শূক-কীট যথাকালে চাঞ্চল্য ত্যাগ করে পরিণত হয় প্রতিজ্ঞার গুটিপোকায় এবং পুনশ্চ যদি সে প্রতিজ্ঞার স্তব্ধ গুটিকা ভেদ করে অবিলম্বে বেরিয়ে আসে কর্মিষ্ঠ প্রজাপতি। তাহলে দম্ভকে—একমাত্র স্বীয় দম্ভকে—আমি ক্ষমা করে থাকি; এমন কি উৎসাহও দিয়ে থাকি সাধারণতঃ।

কিন্তু উল্লিখিত দম্ভোক্তিকে কি ক্ষমা করতে পারব এই সম্বৎসরের প্রয়াসের কষ্টিপাথরে?

বৎসরের শেষ প্রতিবেদনে আজ সেই প্রশ্নের মীমাংসা হোক। নাস্তিক আজ নিজের অস্তিত্বকেও যুক্তির অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করুক। নিন্দুক হোক আত্মনিন্দায় অপরাঙ্মুখ। কালাপাহাড়ের লগুড় আঘাত করুক নিজের প্রতিবিম্বকেও—পাছে সে বিগ্রহ ভেঙে ভেঙে শূন্য বেদীতে করতে চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা।

॥ এক ॥

প্রতিবেদন-পর্যায়ের প্রবন্ধগুলির যে সামান্য ত্রুটি সর্বপ্রথম দক্ষ সমালোচকের চোখে পড়বে, তা হচ্ছে এগুলোর মধ্যে উদ্দেশ্যের একাগ্রতা-হীনতা। যুক্তি-আশ্রয়ী গুরুগম্ভীর সমালোচনায় উত্তীর্ণ হতে চলেছিল যে-প্রবন্ধটি, তারই মধ্যে এই চপলমতি লেখক অকস্মাৎ অকারণে জুড়ে দিয়েছেন কথার মারপ্যাঁচসর্বস্ব লঘুধ্বনির ইয়ারকি। যেন শুধু আলোচ্যমান গ্রন্থের লেখকই একা নন, প্রতিবেদন প্রবন্ধের পাঠকও এঁর কাছে বিদ্রূপের না হোক পরিহাসের পাত্র। প্রবন্ধগুলি পড়ে বারংবার আমার মনে হয়েছে এর লেখক সমালোচনা ও ব্যঙ্গরচনা দুই উদ্দেশ্যের নৌকায় পা রেখে কসরত দেখাচ্ছেন; পাঠক মাঝে মাঝেই হর্ষপ্রকাশের হাততালিতে তাঁকে অভিনন্দিতও করছে—সবচেয়ে বেশি হাততালি দিচ্ছে যখন লেখক দু নৌকার ব্যালান্সচ্যুত হয়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন। এবং তেমন ঘটনা ঘটেছে হামেশাই।

ব্যালান্স এবং প্রোপরশন জ্ঞানের একান্ত অভাবে প্রতিবেদনগুলি যেমন সমালোচনার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারে নি, উন্নাসিকতা ও উৎকেন্দ্রিকতার আতিশয্যে তেমনই এগুলি বিশুদ্ধ হিউমারের সার্থকতা থেকে লক্ষ যোজন দূরে রয়ে গিয়েছে। দু-এক স্থলে হয়তো স্যাটায়ারের ঈষৎ আভাসে এগুলো কথঞ্চিৎ পাঠযোগ্যতা

অর্জন করে থাকবে, কিন্তু মরূদ্যানের উর্বরতা বিচার করে যাহারা মরুভূমির মূল্য নির্ণয় করার মত সেই আংশিক সার্থকতার নিরিখে সমগ্র প্রবন্ধগুলির মূল্যায়ন কঠিন, বিরক্তিকর ও নিষ্প্রয়োজন কর্ম।

রচনাগুলির দ্বিতীয় সামান্য ত্রুটি এতে ব্যবহৃত ভাষা। এতে যে তথাকথিত চলিত ভাষা নিয়োজিত, একমাত্র ক্রিয়াপদগুলি ও কয়েকটি প্রাকৃত অব্যয় এবং বিশেষণ ব্যতীত তার মধ্যে সবটাই কৃৎ-তদ্ধিত কণ্টকিত তৎসম শব্দের খেলা। সত্যিকার চলিত ভাষায় যে একটা স্বচ্ছন্দ গতিশীলতার তারল্য থাকে তৎসম শব্দের ওজনের কারণে এ ভাষায় তা অনুপস্থিত; পক্ষান্তরে সাধুভাষার পরিচ্ছন্ন ওজস্বিতা থেকেও এ ভাষা প্রাকৃত ক্রিয়াপদ ইত্যাদির সঙ্গদোষে বঞ্চিত। সম্ভবতঃ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তাধারায় অস্পষ্টতাই এ রকম ভাষা-বিভ্রাটের কারণ: সমালোচনা-প্রবন্ধের উপযোগী বাহন স্বভাবতঃই তৎসম শব্দবহুল হতে চায় অথচ লঘু পরিহাসের প্রয়োজনে তারই মধ্যে গ্রাম্য অব্যয়াদির ছড়াছড়ি না করে উপায় থাকে না লেখকের। "হাতিমির দশা দেখ—তিমি বলে জলে যাই, হাতী বলে এই বেলা জঙ্গলে চলো ভাই"—এই সৌকুমার বর্ণনা আলোচ্য প্রতিবেদনগুলির ক্ষেত্রে হুবহু মিলে যায়।

বলাবাহুল্য উপরিউক্ত অভিযোগগুলির, তথা অতঃপর অন্যান্য যে সকল ত্রুটিবিচ্যুতি অবিলম্বে আমার আলোচনায় আসবে সেগুলিরও, যথাযথ প্রত্যুত্তর দেওয়া লেখকের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু যেহেতু এই বর্ষশেষের সালতামামি প্রতিবেদনে লেখক এবং সমালোচক ঘটনাচক্রে একই ব্যক্তি, সেই কারণে এবং শুধুমাত্র সেই কারণে সমালোচনার উত্তর দেবার সুযোগ লেখককে দেওয়া কখনই সঙ্গত হতে পারে না। তাহলে যতগুলি লেখককে এতদিন ধরে নিন্দার ধোনাই যন্ত্রে আমি তুলোর মত ধুনে এসেছি, তাদের প্রত্যেককেই একটি করে রাইট অব রিপ্লাই দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। ভূমিকাতে বলেছি নিন্দুককে কী কারণে নির্মম ভাবে নিরপেক্ষ হতে হয়; আত্মসমর্থনের তুচ্ছ প্রয়োজনে নিন্দানীতি থেকে বিচ্যুত হবার মত সুবিধাবাদী নিন্দুক নই আমি। অতএব, অন্যান্য বারের মতই এবারও বিচার হবে এক্স-পার্টি। সন্দেহাতীত সুবিচার হিসাবে যে কাহিনীগুলি ইতিহাস বিশ্রুত, সেগুলি সবই একতরফা বিচার। ডুমসডের শেষ বিচারে সাক্ষ্য-দলিল সওয়াল-জবাবের অবকাশ নেই।

॥ দুই ॥

তবু কল্পনা করতে কৌতূহল হয়, আমার নির্মম নিন্দাবাদের বিরুদ্ধে নিন্দিত লেখকদের সত্যই কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর হতে পারত কি না।

প্রথম ও চতুর্থ প্রতিবেদনে আমি সাহিত্যিক নামের অযোগ্য যে লেখকের পুস্তক আলোচনা করেছিলাম, দুবার আলোচনার গৌরবে ধন্য সেই প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় অবশ্যই রাইট অব রিপ্লাই পেলেও গ্রহণ করতেন না সে সুযোগ। কেন না যদিও কঠোরতম ভাষায় আমি ওঁর রচনাকে নিন্দা করেছি, তথাপি সে নিন্দা প্রকৃতপক্ষে সেই দুখানি গ্রন্থ সম্পর্কে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশংসার সামিল। প্রথম প্রতিবেদনে আলোচিত উপন্যাসের পাতায় পাতায় যে ভোজন-বিলাসী ঔপন্যাসিকের পরিচয় মিলেছিল এবং গুরুভোজনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে যে বাথরুম-সচেতন প্রবোধবাবু উপস্থাপিত হয়ে ছিলেন চতুর্থ প্রতিবেদনে, সেই সকল ঘরোয়া পরিচয় উদ্ঘাটন সত্ত্বেও সেই দুখানি অতীব নিকৃষ্ট মানের পুস্তকের আলোচনায় একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার প্রায় তেইশ পৃষ্ঠা পরিমাণ স্থান অপব্যয়িত হয়েছে—প্রবোধবাবু বোধ হয় তাঁর সমগ্র জীবনে আর কখনও এতবড় সম্মান পান নি।

বস্তুতঃ আমি যে কজন লেখককে আজ পর্যন্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি তার মধ্যে যোগ্যতার সঙ্গে সাফল্যের পরিমাণে এত দুস্তর তারতম্য আর একজনেরও নেই। তাঁদের মধ্যে ক্ষমতার বিচারে, থুড়ি অক্ষমতার বিচারে, একমাত্র গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় ছাড়া আর কেউ প্রবোধবাবুকে অতিক্রম করতে পারেন নি; অথচ শুধুমাত্র ভাগ্যদেবতার আনুকূল্য ও ঝোপ বুঝে কোপ মারার অপূর্ব দক্ষতা সম্বল করে এই

অক্ষম লেখক এককালে সাহিত্যের পঙ্‌ক্তি-ভোজনে প্রথম সারিতে বসবার সুযোগ পর্যন্ত পেয়েছিলেন। সেই সোনার দিন যদিও আর নেই তাঁর, তবু এখনও যে এঁর লেখা বই প্রকাশিত হচ্ছে সেই কি কিছু কম বিস্ময়? শুধু প্রকাশিত হওয়া কেন, এঁর রচিত ভ্রমণ-কাহিনী গুণে যত অকিঞ্চিৎকর হোক, দামের নিরিখে এগিয়ে গিয়েছিল আমার আলোচনায় আগত প্রত্যেকটি পুস্তককে বহু পেছনে ফেলে। [হায় বেঙ্গল পাবলিশার্স!] যতদিন পর্যন্ত প্রবোধকুমারের 'এবম্বিধ' ভাগ্যবত্তা থেকে বিচ্যুতি না ঘটে ততদিন রচনার গুণসম্পর্কিত নিন্দায় ওঁর কিছুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য ঘটা অস্বাভাবিক; অনায়াসে উনি বলতে পারেন: সে কলঙ্কে নিন্দা-পঙ্কে তিলক টানি এলেন রানী। [রানী তো ওঁরই তৈরী সবার সেরা অবাস্তব ক্যারেক্টার কিনা, তাই এ লাইন বলার অধিকার আছে প্রবোধবাবুর!]

গজেন্দ্রবাবু এসেছিলেন আমার দ্বিতীয় প্রতিবেদনে। আ-হা, সে কী অপূর্ব উপন্যাস, জীবনে ভুলতে পারব না।

কিন্তু সেই ঘৃণ্য-ক্লিন্ন-জঘন্য উপন্যাস 'নীলকণ্ঠী' সমালোচনা করে আমিও কিছু আর কম অপরাধ করি নি। তখনও পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশমান সে রচনার বাছা বাছা অশ্লীল অংশগুলিকে নিন্দার প্রয়োজনে উদ্ধৃত করে আমি যে নিজের অজ্ঞাতসারে বইখানির বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, ঈশ্বর জানেন সেই বিজ্ঞাপন দেখেই কোন এক প্রকাশক তড়িঘড়ি উপন্যাসটির প্রকাশনা স্বত্ব ক্রয় করেছিলেন কি না, যেমন আগ্রহ নিয়ে সোসাইটি-মহিলারা রসালো স্ক্যাণ্ডালের প্রসঙ্গ লুফে নিতে যান তেমনই অধীর আগ্রহে? তবে ঘটনাটি একতরফা নয়; গজেন্দ্রবাবু যে প্রকাশক-সংস্থার জ্যেষ্ঠ অংশী, তারাও পরিবর্তে 'নিশিকুটুম্ব' নামক যে উপন্যাসটি প্রকাশ করতে চলেছে শুনেছি, সেটি কিয়দংশে 'নীলকণ্ঠী'রই কুটুম্ব [illegible] সজনীকান্ত দাস 'পরস্পর পিঠ চুলকানি সমিতি' পর্যন্ত দেখে গিয়েছিলেন, বেঁচে থাকলে 'পরস্পর মাথায় কাঁঠাল ভাঙা সঙ্ঘ' দেখতে পেতেন এখন।

তৃতীয় প্রতিবেদনে সম্মানিত হয়েছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিক বিমল মিত্র।

এই সর্বপ্রথম একজন সাহিত্যিকের জন্য আমি শ্রেণী নির্দেশ করছি; আগেকার দুজনার জন্য কোনপ্রকার শ্রেণী নির্ণয়ই অসম্ভব। শুধু শ্রেণী নির্ণয় কেন, সেই শ্রেণীতে বিমলবাবুর জন্য স্থান নির্দেশ করতেও আমি পেছপা হই নি। আমার বিচারে বিমল মিত্র হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের থার্ডক্লাস ফার্স্ট। এঁর ক্লাসের অন্যান্য সাহিত্যিক, যথা নীহার গুপ্ত, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, জরাসন্ধ প্রভৃতির চাইতে বিমলবাবু স্লাইটলি ভাল লেখেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন, একজন প্রবীণ (ও প্রায় অবসরপ্রাপ্ত) সাহিত্যিকের মুখে শুনেছি—বিমলবাবু নাকি আমার প্রতিবেদন-পাঠান্তে মন্তব্য করেছিলেন, ওঁর 'অতি বৃহৎ লাল মূলা' সদৃশ উপন্যাস সম্বন্ধে আমি একমাত্র স্থৌল্যের দোষারোপ করেছি, আর কিছু নয়। সেই সঙ্গে উনি নাকি অপর কয়েকজন সাহিত্যিক সম্বন্ধে আমার কঠোরতর নিন্দাবাদ শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

শুনে আমার একটি গ্রাম্য গল্প স্মরণ হয়েছিল। গ্রামের পরাক্রান্ত জমিদার পুণ্যাহ উৎসবের অনুষ্ঠান করেছেন সেদিন। প্রজারা সব যে যার সাধ্যমত প্রণামী দিয়ে উৎসবে যোগ দিচ্ছে—কেউ পাঁচ টাকা কেউ আট আনা। এমন সময় ক্যাবলাকান্ত এসে প্রণামী পায়ে রেখে প্রণাম করে দাঁড়াতেই জমিদার রাগে ফেটে পড়লেন; কী ব্যাপার, না বেচারীর হাতে টাকা-পয়সা একেবারেই ছিল না, গাছে এক কাঁদি কাঁচকলা ফলেছে, তারই চারটি ফল প্রণামী এনেছে সে। জমিদারকে কাঁচকলা প্রণামী দেয়, বড় তো বেয়াদব এ লোকটা; রেগে-মেগে জমিদার হুকুম দিলেন, ওই চারটে কলাই জোর করে গিলিয়ে দেওয়া হোক ক্যাবলাকান্তকে। পাইক-বরকন্দাজ মিলে যখন ওর হাত পা বেঁধে জমিদারের হুকুম অনুযায়ী একটির পর একটি কাঁচকলা ক্যাবলার গলায় ঢোকাচ্ছে তখন—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—দেখা গেল ক্যাবলার চোখ দুটি ক্রমেই বিমল আনন্দে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এক একটি কলা গেলানো হয়, ক্যাবলা একটু একটু করে খুশী হয়ে ওঠে। শেষে তৃতীয় কলাটি

ক্যাবলার গলায় প্রবেশ করানো হলে ক্যাবলা যখন আনন্দে ডগমগ, জমিদার আর কৌতূহল দমন করতে পারলেন না কিছুতে; শুধোলেন ওর হর্ষের কারণ। জোড় হাত করে পরম সন্তোষে ক্যাবলা বললে, হুজুর আমি তো তবু কাঁচকলা নজরানা এনেছি, আমার তৃতীয় পক্ষের বড় শালা না পেছনেই আসছে—কাঁচকলা নয়, আনারস নিয়ে!

যদি কোন অতি যুক্তিবাদী পাঠক তর্ক তোলেন, গলায় কাঁচকলাবিদ্ধ অবস্থায় ক্যাবলাকান্ত কী করে কথা কইল, তবে আর উপায়ান্তর না পেয়ে অগত্যা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, মূল গল্পে শাস্তিটা নেহাত গলার ওপর দিয়ে যাবার মত নিরামিষ ছিল না, ছিল তার চাইতে ঢের বেশী কঠিন!

বিমলবাবু যদি সত্যিই অপর সাহিত্যিকের প্রতি কঠোরতর আনারস-দণ্ড বিধানের সম্ভাবনায় পুলকিত হয়ে আপন কদলী-দণ্ডাজ্ঞাকে লঘু বিবেচনা করে থাকেন, তবে তাঁর সারল্যে আমি মুগ্ধ!

পাঁচ নম্বর প্রতিবেদনে ছিলেন 'মার্কিন থানের মার্কা' সাহিত্যিক এবং আমার পরিচিতদের মধ্যে একমেবা-দ্বিতীয়ম্ প্রতিভাবান লেখক বুদ্ধদেব বসু। ছ নম্বরের আসামী হুজুগাবতার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

এই দুই কল্লোলচর্মা বিচিত্রকীর্তি নির্বাপিত খদ্যোতকে উপলক্ষ্য করে আমি (এবং আমার পূর্বসূরী আরও অনেকে) যা কিছু নিন্দাবাদ উচ্চারণ করেছি, আজ মনে হয় এবারে তার সমাপ্তিরেখা টানার সময় এসে গিয়েছে। এঁরা আজ সুনিশ্চিত ভাবে বিগতকালের, ভক্তের দল সশ্রদ্ধভাবে এবং সমালোচকগণ যথাপ্রাপ্য অবজ্ঞার সঙ্গে বিস্মৃতির শান্তিজল এঁদের গায়ে ছিটিয়ে দিলে এঁদের আমাদের ও বাংলা সাহিত্যের সবারই মঙ্গল। না, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, যুবনাশ্ব, দামোদর, পাঁচকড়ি দে প্রভৃতি 'একদা লিখতেন'দের নিয়ে আমরা আর মাথা ঘামাতে চাই না।

অবশ্য এই শর্তে যে, এঁরা আর নতুন করে সাহিত্য রোমন্থনের ব্যর্থপ্রয়াসে আমাদের বিরক্তির উদ্রেক করবেন না। পলিটিক্যাল পেনশনের মত একটা লিটারারি পেনশনের ব্যবস্থা করলে হত না এঁদের জন্যে?

আর দুজন মাত্র সাহিত্যিক পর্যালোচিত হয়েছেন এখানে, ভঙ্গিসর্বস্ব চটকদার লেখক সমরেশ বসু ও রকল্যাণ্ডের জাতীয় সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি।

আশা করছি, আশঙ্কা বলাই যদিও সঙ্গত হত, এঁরা উভয়ে আরও লিখবেন; কারণ এঁরা সেই ওস্তাদের সগোত্র যিনি শুরু করতে জানতেন বেশ ভালই, জানতেন না কেবল শেষ করতে। থামতে শেখেন নি এঁরা। এবং যে ড্রাইভার স্টার্টার স্টিয়ারিং গীয়ার অ্যাকসিলেটার সব কিছুর ব্যবহার শিখে শুধু ব্রেকের ব্যবহার শেখে নি, তারই মত এঁদের হাতে পড়লে বাংলা সাহিত্যের কী হাল হবে ভাবতে আমার হৃৎকম্প হয়।

মুজতবা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠ করে আমাদের একজন শুভানুধ্যায়ী বলেছিলেন, আমি নাকি সৈয়দ সাহেবের কোমরের নীচে আক্রমণ করেছি। যদি তাই করে থাকি তবে তো বড় দোষের কথা। তবে কি জানেন, যে বইখানি পড়ে আমার নিন্দাবাদ মুজতবার প্রতি উদগ্র হয়েছিল তার মধ্য থেকে আলি সাহেবের কোমর চিনে বার করা বড়ই কঠিন হয়েছিল আমার পক্ষে, কোন্‌টা যে গলা, কোন্‌টা ছাতি আর কোন্‌টা কোমর সব একাকার লাগছিল তখন: সবই যেন 'ত-য-ব-র-ল'র ফর্মুলায় ছাব্বিশ ইঞ্চি!

এবং নিন্দুককে নিন্দা করে সালতামামি প্রতিবেদন রচনা করতে বসে তাঁর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও অক্ষমণীয় অপরাধ দেখতে পাচ্ছি ওই ছাব্বিশ ইঞ্চির ফর্মুলা।

"...একটা পুরানো দরজীর ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর হাঁকতে লাগল, 'খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাতা ছাব্বিশ ইঞ্চি, আস্তিন ছাব্বিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।' আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, 'এ হতেই পারে না। বুকের

মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি? আমি কি শুওর?'..."

[সুকুমার রায়—হ-য-ব-র-ল।]

এই এক বৎসরের প্রতিবেদন পড়ে মনে হয় নিন্দুকের হাতেও সেই একটিমাত্র পুরনো দরজীর ফিতে আছে, যার 'লেখা-টেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি ২৬ লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে', তাই নিন্দুক যখনই যে কোন লেখকের মোকাবিলা করছেন, তখনই সেই লেখককে একই মাপে জরিপ করছেন। প্রবোধ-গজেন্দ্র-বিমল-অচিন্ত্য-বুদ্ধ-সমরেশ-আলি এঁরা প্রত্যেকেই নিন্দুকের বিচারে ছাব্বিশ ইঞ্চি। অথচ এঁদের মধ্যেও উনিশ-বিশ কি নেই? চারশো উনিশ-বিশ কি দেখা যায় না এঁদের রচিত সাহিত্যকর্মে?

॥ তিন ॥

এরই মধ্যে রিলিফ এনেছিল নিন্দুকের কমিউনিজম সংক্রান্ত এবং প্রক্সি-নিন্দুক চার্বাকের বাজেট সংক্রান্ত প্রতিবেদন দুটি। নিন্দুক যে কতখানি অবিবেচক, সমালোচনা-কর্মে কতখানি অপারদর্শী তার বৃহত্তম প্রমাণ এই যে চার্বাকের রচনায় নূতনতর স্বাদের অপূর্ব প্রতিবেদন পাঠ করার পরও সে নির্লজ্জের মত নিজের পুরনো আসরে পুরনো ঢঙে নিন্দার ধ্রুপদ গাইতে চায় সেই পুরনো কণ্ঠস্বরে।

সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে যদি তোমার অভিযোগ হয় এই যে তাঁরা অক্ষম হয়ে পড়ার পরেও নূতন সাহিত্যিকদের নূতন প্রতিশ্রুতির জন্য সুযোগ করে দিয়ে 'একদা ছিলেনে'র প্রত্নপ্রদর্শশালায় প্রয়াত হন না, বাসী মড়ার মত অলক্ষুনে চিহ্ন হয়ে জুড়ে থাকেন সাহিত্যের অন্দর; তবে তো সেই একই অভিযোগে তুমিও অভিযুক্ত মহাকালের দরবারে। তুমিও তো আগলে রেখেছ নূতন নিন্দুকের প্রবলতর সম্ভাবনা, মানে মানে কেটে পড় নি আসর ছেড়ে দিয়ে সেই নূতনকে।

এই শেষ অভিযোগের উত্তরে আমি গিল্‌টি প্লীড করছি। এবার আমার নির্বাসনদণ্ড হোক বিস্মৃতির বৃহদরণ্যে; সেখানে অন্বেষণ করব নূতন কোন কর্তব্যের, নূতন সাধনার।

আগামী সংখ্যা থেকে চার্বাকের জন্য রেখে গেলাম আমার ক্ষণস্থায়ী রণরঙ্গভূমি। এবং আশা করি তাঁরও গ্রেসফুল একজিট ঘটবে যথাকালে।

●

[গত ফাল্গুন সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে বনফুলের 'ছাত্রদের প্রতি' প্রবন্ধের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় "যাহা কেবলমাত্র ভঙ্গী-সর্বস্ব, দেহ-সর্বস্ব, সমাজ-সর্বস্ব বা কোনও বিশেষ মতবাদ-সর্বস্ব"-এর স্থলে "যাহা কেবলমাত্র ভঙ্গী-সর্বস্ব, দেহ-সর্বস্ব, সমাজ-সর্বস্ব বা কোনও বিশেষ মতবাদ-সর্বস্ব নহে" এবং ৩৭৮ পৃষ্ঠায় "বস্তুতঃ ভারতের মনীষীগণের চিন্তাকাশে দুই-একটি প্রশ্নের" স্থলে "বস্তুতঃ ভারতের মনীষীগণের চিন্তাকাশে এই একটি প্রশ্নের" এইরূপ পড়িতে হইবে।]

সংবাদ-সাহিত্য

নববর্ষে

আমাদের গ্রাহক-পাঠক-বিজ্ঞাপনদাতা এবং লেখকগণকে বাংলা নববর্ষের প্রারম্ভে নমস্কার নিবেদন করিতেছি। ১৩৬৯-এর ক্যালেণ্ডার বাতিল হইয়া ১৩৭০-এর ক্যালেণ্ডার চোখের সামনে ঝুলিতেছে। যথানিয়মে ১২ মাস অর্থাৎ ৩৬৫ দিন পর আবার ইহাও বাতিল হইয়া যাইবে। এইভাবে বছরের পর বছর পুরাতন বিদায় হইয়া নূতন আসিতেছে ইহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে আমরা সারা বৎসরের জন্য শান্তি সমৃদ্ধি ও সুখ কামনা করিতেছি। দেশের সম্মান ও জাতির মর্যাদা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহাই হউক আমাদের একমাত্র চিন্তা, আর্ত ও পীড়িতের সেবাই হউক আমাদের প্রধান কর্তব্য। আমরা সকলের প্রতি আমাদের শুভকামনা জানাইতেছি।

ইনাম বড় না ইমান বড়

ঘন ঘন বিদ্যুৎ-বিভ্রাট, কলেরা-বসন্ত মহামারী, তুফানগঞ্জে ঘূর্ণিবাত্যায় প্রলয় কাণ্ড ও বহু মানুষের মৃত্যু, ধুবড়িতে শিলাবৃষ্টি-ঝড়ে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি, অন্নহীন স্বর্ণশিল্পীদের পদযাত্রা ইত্যাদির ভয়াবহ পটভূমিকায় কলিকাতায় সাহিত্যিকদের মিলনোৎসবের নামে বারো ভূতের এক সম্মেলন হইয়া গেল। এই সম্মেলনে মন্ত্রী, গণ্যমান্য বড়লোক, প্রকাশক, পত্রিকা-পরিচালক, লেখক-লেখিকা প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোকের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। মুরগি-মাটন, রাবড়ি, ছানাবড়া, বোতলের পানীয় ইত্যাদির ঢালাও বন্দোবস্ত ছিল। আসলে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য কয়েকজন নির্বাচিত সাহিত্যিককে কয়েকটি দৈনিক-মাসিক পত্রিকার তরফ হইতে অর্থ-পুরস্কৃত করা। টাকার অঙ্ক পাঁচ শত হইতে এক সহস্র। এই আসরের মুখ্য উদ্যোক্তা কলিকাতার দুই বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠীর দুই কর্তা। ইঁহাদের এখন পোয়াবারো। অনেকদিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছি চাকরি ইত্যাদির ব্যাপারে বহু লেখক ইঁহাদের কবলস্থ বা অধীনস্থ হইয়াছেন কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যিক কয়েকজনকে ইঁহারা বিশেষ কায়দা করিতে পারেন নাই। সংবাদপত্রে ছবি নাম বা সংবাদ প্রচারের জন্য সাহিত্যিকমাত্রেই লালায়িত হইবেন সন্দেহ নাই, বিশেষ যুগটা যখন প্রচারের। টাকার পুরস্কারটা এখন অতিরিক্ত টোপ হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। খবরের কাগজ বা সিনেমা-পত্রিকারা সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করিতে যায় কোন্ সাহসে! ইহা যদি কোনও প্রতিযোগিতার বিষয় হইত তবে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কাহাকেও পুরস্কৃত করা হইলে বলিবার কিছু ছিল না। সে যুগে কেশ তৈল 'কুন্তলীনে'র নামেও প্রতিযোগিতার বিচারে পুরস্কার দেওয়া হইত! শরৎচন্দ্র হইতে শুরু করিয়া বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকই এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক কাগুজে পুরস্কার নিছক ইনাম মাত্র। সাহিত্যিকেরা তাহা লইবার জন্য ছুটিয়া যান কেন তাহাও ভাবিয়া পাইতেছি না। আর তাহা ছাড়া এখনকার ভদ্র সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিকগণকে মানপত্র বা পদক না দিয়া টাকায় পুরস্কার দেওয়ারই বা কী প্রয়োজন? পুরস্কার যদি দিতেই হয় তো সভা ডাকিয়া এত ঘটা করিয়া রাজসূয় আয়োজনেরই বা অর্থ কী! পুরস্কার যাঁহাদের দেওয়া স্থির হইয়াছে তাঁহাদের বাড়িতে গিয়া দিয়া আসিলেই বোধ করি শোভন হয়। অন্যান্যদের কথা বাদ দিলেও কালিদাস রায় বা তারাশঙ্কর এমন একটা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন যেখানে সংবাদপত্রের কর্তারা স্বয়ং তাঁহাদের বাড়িতে গিয়া পুরস্কার দিয়া আসিলেও ক্ষতি নাই। তাহার পরিবর্তে এই জমাটি

জমায়েতে তাঁহাদের কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড় করাইবার প্রয়াস কেন? বুঝিতেছি ইঁহারাও ভদ্রতার খাতিরে সভায় উপস্থিত না হইয়া পারেন নাই। ফলে দুই খবরের কাগজের মালিক মুখ্যমন্ত্রীকে সাক্ষী রাখিয়া সকলকে বগলদাবা করিয়া মহানন্দে ফোটো তুলিয়াছেন। চমৎকার!

এই ধরনের একটি সভায় মধুসূদন ও বঙ্কিমের নাম উচ্চারিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরম হর্ষ বোধ করিতেছি। তবে আমাদের আপত্তি জনৈক বক্তা কর্তৃক উত্থাপিত লেখকদের আয়কর হ্রাসের প্রশ্নে। লেখকদের আয়কর হ্রাসের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। লেখকেরা পরিশ্রম করিয়া লিখিতেছেন, ন্যায্য আয় করিতেছেন, আর পাঁচজনের মত ন্যায্য আয়কর দিবেন বইকি! বরঞ্চ যাঁহারা অশ্লীল উত্তেজক গ্রন্থাদি (তাহার সংখ্যাই বেশী) লিখিয়া সহজেই সংস্করণের কেল্লাফতে করিতেছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে আয়কর বেশী করিয়া ধরা উচিত। এইসব লেখকের নাম করিয়া আর হোয়াইট প্রিন্টিং পেপারকে কলঙ্কিত করিব না।

আর একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগিতেছে। যাঁহাদের নামে পুরস্কার—অর্থাৎ মতিলাল, শিশিরকুমার, সুরেশচন্দ্র, প্রফুল্লকুমার ইঁহারা কি বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন? ইঁহাদের নামের পুরস্কার তবে কেবলমাত্র গল্প-কবিতা লেখকদের দেওয়া হয় কেন? খবরের কাগজের তরফ হইতে সাংবাদিকদের এবং সিনেমা পত্রিকাদের তরফ হইতে চিত্রতারকা বা টেকনিসিয়ানদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা নাই—ইঁহাদের করাল হস্ত শুধু প্রসারিত হইয়া আছে সাহিত্যিকদের দিকেই। সাহিত্যিকেরা যুগধর্মে সহজলভ্য হইয়া উঠিলেও সহজপাচ্য নহেন। ইঁহাদের হজম করা শেষ পর্যন্ত শক্ত হইবে এই কথাই আমরা সবিনয়ে নিবেদন করিয়া রাখিতেছি।

বুদ্ধ-কথা

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কুৎসা প্রচার, স্বদেশে মাইকেল মধুসূদনের প্রতি নির্মম তাচ্ছিল্য এবং মাতৃভূমির প্রতি দারুণ অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিয়া যে ব্যক্তিটি সর্বপ্রকারে নিন্দিত হইয়াছিলেন সেই সুযোগসন্ধানী মহাধূর্ত বুদ্ধদেব বসুর কথা আর একবার স্মরণ করিতে হইতেছে। এই অপরটিউনিস্ট মহাগর্বী অপরকে টিউন করিয়া অর্থাৎ কানে মোচড় দিয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই নিজ আখের বেশ গুছাইয়া লইয়াছেন। চীন এই অর্বাচীনকে যে সুযোগ করিয়া দিয়াছে তাহার পুরাপুরি সদ্ব্যবহার করিতে ইনি ছাড়েন নাই। স্বাধীন সাহিত্য সমাজ গঠিত হওয়ার পর ইঁহাকে পুরোভাগে দেখা যাইতেছে—সংবাদপত্রগোষ্ঠী আয়োজিত লেখক-সম্মেলনে ইঁহার স-সিগারেট ছবি ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। নানা অপরাধের বোঝা মাথায় লইয়া যে ব্যক্তির শূলে যাওয়া উচিত তিনি ত্রিশূল হাতে সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব করিতেছেন ইহা এক তাজ্জব ব্যাপার বলিয়া অনুমান করিতেছি। ইঁহাকে যাঁহারা প্রশ্রয় দিতেছেন তাঁহারাও দুরপনেয় কলঙ্কের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন না।

সম্প্রতি একটি সাপ্তাহিক পত্রে এই বহুরূপীর একটি অত্যাশ্চর্য কবিতার সন্ধান পাইয়া রীতিমত পুলকিত হইলাম। প্রায় চারশো শব্দ সমন্বিত একটি বৃহৎ কবিতা। প্রতিটি শব্দের যথাযথ অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিন্তু পাশাপাশি সাজাইলে একটি পঙ্‌ক্তিরও কোন অর্থ হয় না। এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই শব্দটিও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। যাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের হাতে হইলে ইহাকে স্বীকার করিতে বাধিত না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যের অধ্যাপক এবং খানকয়েক অপাঠ্য গ্রন্থের অক্ষম গ্রন্থকার। এই কবিতা হইতে কোটেশন দেওয়াও গোহত্যার সমতুল্য। কোন্ রসিকতার লোভে যে কবিতাটি রচিত হইয়াছে তাহা বলা মুশকিল। যাঁহারা ছাপিয়াছে তাহারা আরও মারাত্মক অপরাধে অপরাধী। নিঃসন্দেহে বলা যায় ইহা পাশ্চাত্ত্য কবিতার অনুকরণের চেষ্টায় বদহজম মাত্র। বাংলা সাহিত্যের প্রতি যাঁহাদের সামান্যমাত্র শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আছে তাঁহারা এই ধরনের অক্ষম অনুকৃতি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন, লুম্বিনী

পার্কের আশু বিপদের কথা ভাবিয়া আমরা বিষণ্ন বোধ করিতেছি এবং আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগে বানরের দল ক্রমশঃই উচ্চতর ডালে চড়িয়া মুখ বিকৃত করিয়া সকলকে ভেংচি কাটিতেছে।

গোপালদার পত্র

"ভায়া হে,

সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি গল্পের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভাষা এবং গল্প বলার ধরনে মনে হইতেছে ইহা বেমালুম চুরির ব্যাপার। কিন্তু চুরি মনে হইলেই তো আর চলে না, প্রমাণ চাই। প্রমাণ কোনমতেই সংগ্রহ করা গেল না। তোমরা যদি ইহার মূল খুঁজিয়া পাও তো একটা কিনারা হয়। সম্পূর্ণ গল্পটি অতি বৃহৎ—আমি অংশবিশেষ তুলিয়া দিতেছি, তোমার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দিয়ো। চুরি যদি হয়ও, রচনাটি সুপাঠ্য সন্দেহ নাই। পড়িলে, তোমার পাঠকেরাও হয়তো রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করিতে পারেন :

'...আর পাঁচজনের মতো আমিও এই পৃথিবীতে রক্ত মাংস অস্থি লইয়া জন্মিয়াছিলাম, এবং বলিতে দ্বিধা নাই, হৃদয় নামক একটা বস্তুও আমার ছিল। কিন্তু তাহা লইয়া অন্য সকলে যেমন গর্ব করিয়া বেড়াইত, আমার তাহা করার উপায় ছিল না। হৃদয়ঘটিত ব্যাপারের প্রতি আমার দারুণ একটা ভীতি ছিল, সুতরাং তাহার ব্যবহার সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। বন্ধুবান্ধবেরা যখন হাস্যপরিহাসের মধ্যে আমাকে অপদার্থ এবং জড়ভরত বলিয়া উল্লেখ করিত তখন আমি নীরবে সেই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ শুনিয়া যাইতাম। তাহাদের মধ্যে কে কয়টা প্রণয় করিয়াছে, কে আজ প্রণয়িনীর পত্র পাইয়াছে, কে কাল বান্ধবীর বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণে যাইবে তাহা লইয়াই মশগুল হইয়া থাকিত। অধিকতর ভাগ্যবানেরা পত্রের সহিত মাথার ফিতার টুকরা ও চুলের কাঁটাও যে না পাইত এমন নহে। কিন্তু ওই প্রদর্শনীর মধ্যে পড়িয়া আমি একা ছটফট করিতে থাকিতাম—চুলের কাঁটা শলাকার তীক্ষ্ণতা লইয়া আমার হৃদয়ে যেন বিদ্ধ হইত।......

সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে পরিচয়টা ঘটিয়াছিল বলিয়া যোগাযোগটা ক্রমশঃই নিবিড় হইতে লাগিল। আকস্মিকতার একটা নিজস্ব গতি আছে। সেই গতিই যেন আমাকে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিল। কিন্তু যে লক্ষ্যের দিকে আমি ধাবিত হইতেছিলাম তাহা বড় সহজ ক্ষেত্র ছিল না। তিনিও আমার মধ্যে কি দেখিয়াছিলেন জানি না, তবে তিনি আমাকে প্রশ্রয় দিতেন। আমি যেন মরুভূমির মধ্যে মরীচিকার সন্ধান পাইলাম। বক্ষে যখন প্রগাঢ় তৃষ্ণা তখন সহসা যেন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল করিয়া উঠিল। আমি তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

তখন আমার এমন অবস্থা আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে তাঁহাকে কতভাবে না বিরক্ত করিতাম—তিনিও হাসিমুখে আমার সব উৎপাত সহ্য করিতেন। প্রকৃতপক্ষে আমি তাঁহার সহিত শিশুর মতো আচরণ করিতাম। শিশু যেমন কোনও একটা কিছু হাতে পাইলেই সেটাকে একান্তভাবে দখল করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মুখে পুরিয়া দেয়, আমিও তাঁহাকে পাইবার পর হইতে সদাসর্বদা আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতাম। পাথরে শান দিলে লোহারও ধার হয়, আমার প্রেমিক মন দিন দিন শাণিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে ভাবিতাম তিনি সত্যই পাথরের মত কঠিন ও প্রাণহীন। কখনও মনে করিতাম তাহা ভুল।......

তাঁহার মতো অসামান্য প্রতিভাশালিনী নারী আমি আর দেখি নাই। তিনি যখন বড় বড় দুই আয়ত চোখের দৃষ্টি মেলিয়া আমার দিকে চাহিতেন তখন আমার মনে এক আশ্চর্য পুলকের সঞ্চার হইত। সেই দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যাহা হৃদয়ের ঠিক সেই তন্ত্রাতে গিয়া আঘাত করিতে পারে, যাহাতে শতসহস্র বেসুরা পর্দা থাকিলেও একটা নির্ভুল সুর ক্ষণমধ্যে গুঞ্জরিত হইয়া উঠে। আর একটা গুণ তাঁহার ছিল—তাঁহার কণ্ঠের সেই সুমিষ্ট হাসি,

সে হাসি আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁহার সেই সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়ে আমি তাঁহার সঙ্গে প্রেমালাপ করিতে বড়ো একটা সাহস করিতাম না। দৈবাৎ কখনও করিলে তাঁহার সেই আশ্চর্য হাসির স্রোতে আমার ছোট ছোট প্রেমসম্ভাষণের পানসীগুলা মুহূর্তমধ্যে ভরাডুবি হইয়া যাইত। আমি চমৎকৃত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম, তিনিও উচ্ছ্বসিত হাসির দ্বারা আদরে সোহাগে আমাকে শান্ত করিতেন।······

সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমরা দুইজনে অতি ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি বসিয়া নির্জন নিশীথের অপরূপ মহিমা তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম। চারিপাশে আর কেহ নাই। তাঁহার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার গায়ে লাগিতেছে—কচিৎ তাঁহার অঞ্চলপ্রান্ত বাতাসে উড়িয়া আসিয়া আমার মুখের উপর পড়িতেছে। তিনি সেই নির্জনতার মধ্যে চুপিচুপি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালবাসা যায়?······'

গল্পের গোড়ার অংশ হইতেই এইটুকু তুলিয়া দিলাম। তোমাদের স্থানাভাব, আর দিবার উপায় নাই। যদি ধরিতে না পার তো পরবর্তী অংশ হইতেও পরে দিব।

ইতি

গোপালদা"

দুই দিক

আমাদের নাগরিক জীবনে প্রত্যহ আলোক-বিভ্রাটের জন্য যে অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে তাহার প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিয়া জনৈক পত্রদাতা দুইটি কবিতা পাঠাইয়াছেন। পত্রদাতা কবিযশঃপ্রার্থী নহেন, নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই—শুধু কবিতা দুইটি ছাপিতে অনুরোধ করিয়াছেন মাত্র। পড়িলে প্রথমটা হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইলেও পরে ইহার প্রকৃত মর্মার্থ সকলেই বুঝিবেন।

বিজলীর প্রতি আলেয়া

বিজলীর প্রতি আলেয়া কহিছে হেসে
ধরা পড়ে গেছ এ কথা জেনেছি ঠিক,
তোমারে বাঁধিয়া বন্দী করিল শেষে—
তাহাকেই বলি আসল বৈজ্ঞানিক।

ধরা দিতে এসে সুনিপুণ চাতুরিতে
তুমি সরে যাও আলোর ইশারা নিয়ে,
তোমার চকিত চাহনির ইঙ্গিতে
মুগ্ধ প্রেমিকে ডাক হাতছানি দিয়ে।

বৈশাখী দিন হয়েছে প্রখর যত
তা হতে প্রখর তোমার ভ্রূকুটিখানি
তৃষাতুর জনে তাই দেখে খুশী কত
রসিক যে জন সে-ই নিল কাছে টানি।

আকাশের বুকে যত তুমি ছবি আঁক
ধরা পড়ে গেছ, তবে কেন মুখ ঢাক!

আলেয়ার প্রতি বিজলী

আলেয়ার আলো, তোমারে নমস্কার,—
বিজলী কহিল, সমুখে দেখি যে বিপুল অন্ধকার!
যা ছিল আমার দিয়েছি তো সব
শুধু তার কথা করি অনুভব,
আমারি আলোয় ধুয়ে গিয়েছিল জমাট সে আঁধিয়ার,
মানুষের হাতে হয়েছি বন্দী, এই কী পুরস্কার!

তোমারে কখনো কেহ তো বাসে নি ভালো;
আজ বুঝিতেছি তুমিই সত্য, আমরা বিফল আলো।
ব্যর্থ হয়েছে আয়োজন মোর,
আলোর বদলে আঁধারের ঘোর
ঢেকেছে পৃথিবী, সামনে পিছনে নেমেছে গহন কালো,
দিশাহারা যত পথিকের চোখে তুমিই প্রদীপ জ্বালো।

আলেয়াকে লোকে মরীচিকা বলে থাকে
বিজলী আলোর সাময়িক মায়া তাদের ভুলায়ে রাখে।
আমাদের দিন হয়ে এল শেষ
তোমারি আলোয় ভরে যাক দেশ,
কাছে থেকে দূর মায়ার বাঁধনে সবারে যেন সে ডাকে
আমরা মিথ্যা, তুমি চিরদিন কাছে টেনে নিও তাকে।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বাংলা সাহিত্যের জীবিত প্রাচীনগণের অন্যতম হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। হেমেন্দ্রকুমার একাধিক পত্র-পত্রিকার সহিত সম্পাদক হিসাবে অথবা সম্পাদনা-কার্যে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের বহু সাহিত্য-মজলিস ও বাংলা রঙ্গালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিন্তু হেমেন্দ্রকুমার স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন শিশুসাহিত্যের সার্থক স্রষ্টা হিসাবে। তাঁহার রচিত শিশু ও কিশোরপাঠ্য রহস্য, ভৌতিক বা গোয়েন্দা গল্পের বহু গ্রন্থ দীর্ঘকাল ধরিয়া সাদরে পঠিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। হেমেন্দ্রকুমারকে শিশু-সাহিত্যের এই দিকটির অন্যতম পথিকৃৎ বলা চলে। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের শিশু-শাখার অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

কয়েকটি বই

দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের পুস্তক-পরিচয় বিভাগ বন্ধ থাকায় বহু গ্রন্থ আমাদের হাতে জমিয়া গিয়াছে। সব বইয়ের পরিচয় বা সমালোচনা প্রকাশ করা এখন আর সম্ভব নহে। কোনও দিনই সম্ভব নহে। দুই-চারিখানির বেশি বইয়ের সমালোচনা যেখানে দেওয়া মুশকিল সেখানে মাসে গড়ে চল্লিশ-পঞ্চাশখানি বই আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিতেছে। সুতরাং লেখক ও প্রকাশকেরা আমাদের ক্ষমা করিবেন। গোটা ১৩৬৯ সালে আমরা সম্পাদকীয় রচনায় কোনও পুস্তকের নাম পর্যন্ত করি নাই এই লজ্জার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তিনখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের কথা প্রকাশ করিতেছি।

নেতাজি : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—প্রথম খণ্ড (সুন্দর প্রকাশন : দাম বার টাকা)। নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের স্মৃতিকথা। লেখকের পরিকল্পনা অনুসারে এই গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। সম্পূর্ণ তিন খণ্ড প্রকাশিত হইলে কর্মী, নেতা ও মানুষ সুভাষচন্দ্রের জীবনের যে পূর্ণ রূপটি ফুটিয়া উঠিবে, প্রথম খণ্ডেই তাহার আভাস পাইয়া আমরা পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি। সমসাময়িক সকল ঘটনা ও বিবরণ উদ্ধৃতিসহ তুলিয়া দেওয়ায় গ্রন্থটির মর্যাদা অনেক বাড়িয়াছে। সুভাষচন্দ্রের দেশে এই গ্রন্থের সুপ্রচার হইবে ইহাই আমরা আশা করি। গ্রন্থটিতে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি থাকায় আরও আকর্ষণীয় হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ (এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ—দাম পাঁচ টাকা)। শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরীর রবীন্দ্র-আলোচনামূলক গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথকে লেখক কয়েকটি দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন এবং নানাভাবে তাহার সার্থক বিশ্লেষণও করিয়াছেন। লেখকের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও আলোচনাপদ্ধতির জন্য প্রশংসা করিতে হয়। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুদের পক্ষে জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য গ্রন্থরূপে গণ্য হইবে।

নেফার মানুষ (আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স : দাম পাঁচ টাকা)। শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের সাম্প্রতিক বই। নলিনীবাবু আসাম মণিপুর ইত্যাদি পূর্বভারতীয় অঞ্চল সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। সেই সব অঞ্চল সম্পর্কে তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থও আছে। নেফা অঞ্চলটির প্রতি এখন সমগ্র পৃথিবীর আগ্রহ গভীর হইতে গভীরতর হইতে চলিয়াছে। আমরাও এই গ্রন্থে নেফা অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পাইয়া নলিনীবাবুকে তাঁহার বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জন্য সাধুবাদ জানাইতেছি। এই সময়ে গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া লেখক ও প্রকাশক উভয়েই আমাদের উপকার করিয়াছেন।

[৫১৮ পৃষ্ঠার পর]

Such laughter often disturbs the atmosphere of our mind, raising dust from its surface which only blurs our view."[১৬] "মিলন" কবিতার অন্তিম চরণে কবি এই কথাই বলেছেন :

রজনী কী খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজয়কামী,
বুঝিনু যবে দোঁহে পরাণপণে
খেলিনু তুমি আর আমি।

আর্জেন্টিনার প্রেমচেতনার পূর্ণাহুতি হয়েছে "বদল" কবিতা দিয়ে। কবি বলছেন :

হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি,
আমি আনিলাম দুখবাদলের ফল।
শুধালেম তারে, "যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।"

কৌতুক-হাসি হেসে সুন্দরী কবির 'দুখবাদলের ফলে'র সঙ্গে তার 'হাসির কুসুম' বদল করে নিলে। কবি বলছেন :

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
"মোর হল জয়" হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ খরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।

প্রেমচেতনায় চিরদিন হাসির কুসুমের চেয়ে দুখ-বাদলের ফলই অধিকতর মূল্যবান—এই শাশ্বত সত্যই কবির নূতন উপলব্ধিতে নবরূপে সত্যতর হয়ে উঠল।

সেণ্টেনারি ভল্যুমে লা প্লাতা নদীর তীরে কবির সঙ্গে নিজের অবিস্মরণীয় দিনগুলির বর্ণনা শেষ করে ভিক্টোরিয়া লিখেছেন, "During his stay at San Isidro, Tagore taught me a few words of Bengali. I have retained only one, which I shall always repeat to India : *Bhalobasa*. 'There is no history but of the soul.' "[১৭]

আর্জেন্টিনার এই কাহিনী দুটি অবিনশ্বর আত্মারই আনন্দমিলনের অমর ইতিহাস।

[ক্রমশঃ]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ Rabindranath Tagore : A centenary Volume, পৃ° ৪৬।

২ তদেব। পৃ° ২৭।

৩ তদেব। পৃ° ৩২।

৪ তদেব। পৃ° ৪২।

৫ "পত্র", 'পুনশ্চ'। রবীন্দ্র-রচনাবলী-১৬, পৃ° ১৯-২০।

৬ Rabindranath Tagore : A centenary Volume, পৃ° ২৩-২৪।

৭ দ্রষ্টব্য, কবিমানসী-১, পৃ° ১১-১৩।

৮ সেণ্টেনারি ভল্যুম, পৃ° ৩৪।

৯ ভিক্টোরিয়াকে লেখা চিঠি—অগস্ট ১৯২৫। দ্রষ্টব্য, সেণ্টেনারি ভল্যুম, পৃ° ৩১।

১০ দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ উপচ্ছেদ।

১১ তদেব, পৃ° ৩৬৭-৬৯।

১২ সেণ্টেনারি ভল্যুম, পৃ° ৪৩।

১৩ তদেব, পৃ° ৩৯।

১৪ এডওয়ার্ড ডাওডেন লিখিত শেলির কবিতাবলীর ভূমিকা। পৃ° xxxi.

১৫ সেণ্টেনারি ভল্যুম, পৃ° ৩১।

১৬ তদেব। পৃ° ৪৩।

১৭ তদেব। পৃ° ৪৭।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮